ক্রিকেট অমনিবাস

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলা একাডেমী : বর্ধমান হাউস : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৩৭৭

বা/এ ১৫

মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০

পাণ্ডুলিপি : ফোকলোর উপ-বিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক,
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা।

মুদ্রাকর
রেক্স রোটারী সার্ভিস
১২৫, পশ্চিম রামপুরা
ঢাকা।

প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবিব

নিবেদন

ক্রিকেট-লেখক হিসাবে বারবার একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি—ক্রিকেট কি তার বর্তমান আকার নিয়ে ভবিষ্যতে বজায় থাকবে? প্রশ্নের কারণ, ক্রিকেটের জন্মভূমি ইংলণ্ডের মাঠে দর্শকের ঘাটতি; ক্রিকেটের দ্বিতীয় বাসভূমি অস্ট্রে-লিয়াতেও উৎসাহে ভাঁটা। ওয়েস্টইণ্ডিজের দারুণ উৎসাহ এবং ভারতের হঠাৎ-উৎসাহের দিকে তাকিয়েও ভরসারক্ষা করতে পারছেন না বিচক্ষণ মানুষেরা।

ক্রিকেট যেহেতু বর্তমান আকার নিয়ে জন্মলাভ করেনি, তাই ভবিষ্যতে তার চেহারার বদল হওয়া স্বাভাবিক। যে-বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে ক্রিকেটের বর্তমান চেহারা গড়ে উঠেছে, সেই অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তার চেহারাও বদলাবে ধরে নিতে পারি। ইতিমধ্যেই কোন্ দিকে বদল হবে তার লক্ষণ দেখা গেছে—পাঁচ বা তিন অঙ্কের ক্রিকেট একাকিঙ্কা হয়ে দর্শকের আদর কাড়তে চাইছে—উপভোগের দীর্ঘ ঢালাও সুখের বদলে অল্পকালের টগ্‌বগে উত্তেজনাকে হাজির করা হচ্ছে মাঠে বিকল্প হিসাবে। অনুমান করি. এই অবিলম্বে ফুটন্ত ক্রিকেটই ভবিষ্যতের পানীয় হবে।

কিন্তু আমরা যারা একদিন বিস্তারিত ক্রিকেটকে মন ছড়িয়ে উপভোগ করেছি—আমরা কি মনকে গুটিয়ে এনে একদিনের ব্যাটে-পেটা, বলে-ভাঙা ক্রিকেটকে বন্দনামন্ত্র শোনাতে পারব? রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্রের আশ্রয়ে ক্রিকেট বর্ধিত হয়েছিল—সমাজবিজ্ঞানের এই মোটা কথাটা আমরা জানি। ধরা যাক, আমাদের দেশের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতও তাই হয়েছে। আমরা সর্বদাই অভি-জাততন্ত্রের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়েছি। তবু একই সঙ্গে ওরই আশ্রয়ে লালিত উচ্চাঙ্গসঙ্গীতকে ভালবেসেছি—তেমনি ভালবেসেছি ক্রিকেটকেও। আজ উচ্চাঙ্গসঙ্গীতকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে চলতি গানের ধমক-চমক; একদিনের ক্রিকেটের দুদ্দাড় দৌড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হার মানছে পঞ্চদিবসী ক্রিকেটের মন্দমন্থরতা। তবু মন থেকে মুছে ফেলা কি সম্ভব রাত্রি-দ্বিপ্রহরের গভীর-গম্ভীর দরবারী সুর, কিংবা দিবা-দ্বিপ্রহরের খেয়ালী ক্রিকেটের তান?

কালের প্রহারে লাঞ্ছিত বর্তমান ক্রিকেট বিদায় নেবে। কিন্তু আশা করব, সে আবার ফিরবে ভবিষ্যতের সম্পন্ন পৃথিবীতে, যখন মানুষ অবসরভোগের যথেষ্ট সময় পাবে, এবং গতির ক্লান্তিকে অনুভব ক'রে আরামে হাত-পা ছড়িয়ে মাঠে বসতে চাইবে। সেদিন আবার এই ক্রিকেটই ফিরে আসবে।

আসবে তো! পুরনো দিন কি ফেরে! পুরনো মন কি ফেরে! অর্থে অতৃপ্ত, গতিতে ক্লান্ত ঐ যেসব মার্কিন যুবক-যুবতী ভারতের পথে-পথে ঘুরে বেড়াচেছ স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের মধ্যে স্নায়ুবিশ্রাম সন্ধান ক'রে—আশঙ্কা হয়, পাছে তারা গাঁজা ও চরসে বুঁদ হয়ে থাকাকেই সমাধি বলে ভুল ক'রে বসে!

সুতরাং আমরা ভাগ্যবান—ক্রিকেটকে তার সেরা চরিত্রে দেখার সুযোগ পেয়েছি।

ক্রিকেট-অমনিবাসের এই দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদনে দেশ পত্রিকায় সুখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ, এই খণ্ডভুক্ত কয়েকটি লেখা তাঁর অনুরোধেই লিখেছিলুম, এবং তিনি লেখাগুলি সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করেছিলেন। তার একটি—ক্রিকেটের দ্বাদশ ব্যক্তি—আমার সর্বাধিক সমাদৃত রচনার মধ্যে পড়ে। এই খণ্ডের ব্যাপারে পূর্ববৎ আনুকূল্য করেছেন শ্রীভূমি মুদ্রণিকার শ্রীহিতেন্দু ভট্টাচার্য এবং পাণ্ডুলিপির উপর সতর্ক মনোযোগ রক্ষা করেছিলেন শ্রীসুকুমার সাহা।

অল্পদিন আগে ক্রিকেট অমনিবাসের প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকে আমাকে অভিনন্দিত করেছেন। আমার দিকে প্রবাহিত তাঁদের সেই প্রীতিধারাকে আমি অনেকাংশে বইয়ে দিতে চাই প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুনীল মণ্ডলের দিকে, যাঁর উদ্যোগে অমনিবাস প্রকাশিত হয়েছে এবং যাঁর বদান্য রুচি এর অতিশোভন মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা সম্ভব করেছে।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

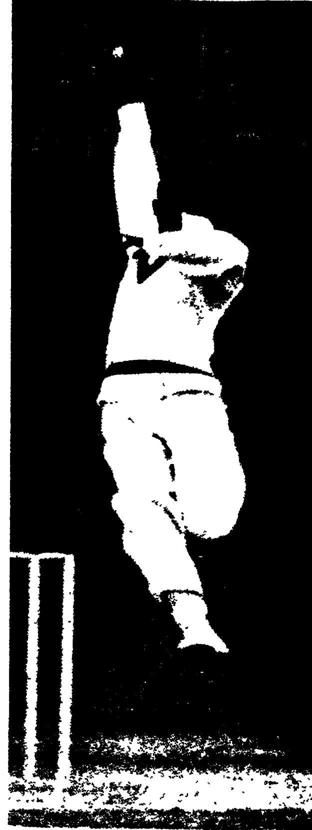


উইলফ্রেড রোডস। গত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অল-রাউন্ডার রূপে স্বীকৃত রোডসের একটি তৈল-চিত্রের প্রতিলিপি। একাগ্র চোখে, ঈষৎ নত দেহভঙ্গিতে উদাত্ত আক্রমণ। অনবদ্য দুই হাতের ছন্দ।



রনজির সুবিখ্যাত লেগ গ্লান্সের নিখুঁত ছবি —উইকেটের উপর সোজা ছুটে আসা বলে যা করেছেন। ত্রিভঙ্গ মুরারির ভঙ্গিতে পা উইকেট ঢেকেছে, অটুট দেহের ভারসাম্য, এবং অবিচলিত প্রশান্ত ভাব। বলড্যাম ও ফ্রাইয়ের 'গ্রেট ব্যাটস-ম্যান' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।







[উপরে] যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডের প্রধান ফাস্টবোলার ফ্রেডি ট্রুম্যান। 'আগুনে ফ্রেডি'—এ'র উপনাম—তা যে সার্থক, এই নিখুঁত দারুণ নিক্ষেপভঙ্গি থেকে বোঝা যায়। [ডাহিনে] রয় গিলক্রিস্ট : ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের ফাস্টবোলার : ধেয়ে লাফিয়ে পড়ছেন উইকেট এবং মুণ্ডশিকারের অভিপ্রায়ে।

[উপরে] লীলী : অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক চাঞ্চল্যকর ফাস্টবোলার। যেন শ্যেন পাখি, সাঁ করে ছুটে যাচ্ছেন ছোঁ মারার জন্য।



ভিক্টর ট্রাম্পার : ক্রীজ ছেড়ে এগিয়ে গেছেন ড্রাইভ করবার জন্য। এই অস্ট্রেলিয়ানকে ক্রিকেটের মহাক্ষত্রিয় বিবেচনা করা হয়।





[বামে] জি এল জেসপ : স্মিত হাসির সঙ্গে ব্যাট তুলেছেন, কিন্তু ঐ ব্যাট—ক্রিকেট-ইতিহাস বলে —ধ্বংসের গদা। [ডাহিনে] ইফতিকার আলি পাতৌদি লাফিয়ে বেরিয়েছেন ড্রাইভের জন্য।

[illegible]







বামে বিল ভোস, মধ্যে ডন ব্রাডম্যান, ডাইনে হ্যারল্ড লারউড। মাঝের যুবকটিকে শেষ করার জন্য ইংলণ্ডের বডিলাইন বোলিংয়ের উদ্ভব। বডি-লাইনের বাম হাত—ন্যাট ফাস্টবোলার ভোস; আর ডান হাত—ডানহাতের ফাস্টবোলার লারউড।



১৯৩২-৩৩ ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট, এডিলেডে। লারউডের বল বুকে লেগেছে ওল্ডফিল্ডের। ...খসে গেছে হাতের ব্যাট...অসীম যন্ত্রণা...আহত অন্ধের মতো টলতে-টলতে লুটিয়ে পড়ার মুখে...





[বামে ডগলাস জার্ডিন : চওড়া রঙের টুপির তলায় বাজপাখির মতো চোখ, শকুনের মতো বাঁকা নাক, অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধার রেখা ঠোঁটের কোণে। [ডাহিনে] বিল ওরিলি : এই মিডিয়াম-ফাস্ট বোলারকে ব্রাডম্যান পৃথিবীর সেরা বোলার মনে করেন। ভয়ঙ্কর বলের মতোই ভয়ঙ্কর এঁর ভঙ্গি...হিংস্র দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে বল দেওয়ার মুখে...





[উপরে] "দুরানী উঠে এলেন ক্রিকেট ইতিহাসে—চরম নাটকীয় কয়েকটি মুহূর্তকে মুঠিতে ধরে।" ১৯৬৪, ভারত-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট, ইডেনে। দুরানী এক ওভারে আউট করেছেন কাউপার, বার্জ ও বুথকে, যদিও হ্যাটট্রিক হয়নি। [ডাহিনে] 'দি ক্রিকেটার' পত্রিকার কার্টুন। 'বোলার দেখবে কি করে উইকেট? উইকেট-কীপার বুঝবে কি করে বল কোন্ দিক দিয়ে আসছে?'—কাতর জিজ্ঞাসা।





[বামে] জিম লেকার : ইংলণ্ডের রেকর্ড-সৃষ্টিকারী অফব্রেক বোলার।
[উপরে] লিয়ারী কনস্টানটাইন :







"ফিনস্‌বেরী আর্টিলারি গ্রাউণ্ডে ক্রিকেট।" ক্রিকেটের সুপ্রাচীন একটি চিত্র। ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে এই তৈলচিত্রটি আঁকেন ফ্রান্সিস হেম্যান। পুরনো যুগের ক্রিকেটের পরিবেশ এতে চমৎকার ফুটেছে। উইকেট, ব্যাট ও ক্রিকেটারদের চেহারা লক্ষণীয়। মাঠটি এখনো বর্তমান।

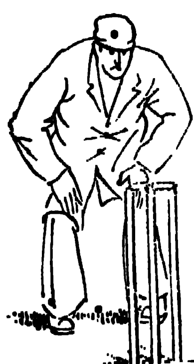


মিস উইকেট ও মিস ট্রিগার। জন কোলেটের আঁকা ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের একটি ছবি।



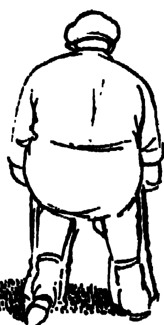
ছবির নাম 'ব্যাট অ্যাণ্ড বল।' বেরিয়েছিল ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে 'স্পোর্টস্‌ অ্যাণ্ড পাসটাইম ফর দি পীপল্‌ অব ইংলণ্ড' পত্রিকায়। শিল্পী জোসেফ স্ট্রট। চিত্রে আদম ও ইভ কাহিনীর ইঙ্গিত। স্বর্গোদ্যানে ক্রিকেটের 'সবস্থা' ইভ বলরূপী আপেল নিয়ে প্রলুব্ধ করছে ব্যাটধারী আদমকে। সচ্চরিত্র আদম অবশ্য প্রস্থানপর।

ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট









উৎসর্গ

শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ — শ্রদ্ধাস্পদেষু—

শ্রীমুকুল দত্ত — শ্রদ্ধাস্পদেষু—

"...সুতরাং কয়েকটি লেখা তৈরি হয়ে গেল। তার একটি গিয়ে পড়ল অগ্রজকল্প শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষের হাতে। সেখান থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীমুকুল দত্তের কাছে। শ্রীযুক্ত দত্ত লেখাগুলির দায় নিজের ঘাড়ে না রেখে চাপিয়ে দিলেন আনন্দ-বাজারের খেলাধুলোর পাতায়।...ফলে একসময় আমি ক্রিকেট-লেখক হয়ে গেলুম।"
[লেখকের প্রথম ক্রিকেট-বই 'ইডেনে শীতের দুপুরে'-এর ভূমিকা থেকে ।]

প্রথম সংস্করণের 'নিবেদন'

একই লেখকের লেখা ক্রিকেটের এই চতুর্থ বই [চ-তু-র্থ-ব-ই!!!] প্রকাশিত হল। এতে ক্রিকেটের মহিমাই প্রমাণিত। ক্রিকেট, বইয়ের পর বই লেখাতে পারে, বাংলাতেও!

'ইডেনে শীতের দুপুরে' যে-'রমণীয় ক্রিকেট' খেলা হয়, সে খেলার চরিত্র সংক্ষিপ্ত ভাষায়—'বল পড়ে, ব্যাট নড়ে', এবং সেই খেলা দেখে অবশ্যম্ভাবী মুগ্ধতা—'ক্রিকেট, সুন্দর ক্রিকেট!'

একই ক্রিকেটকে অগণ্য চোখে দেখা হয়—অসংখ্য মুখে বলা হয় তার কথা। এই বইয়ের একটি রচনার নাম ক্রিকেটের 'চার হৃদয়, এক চোখ।' সে নাম যে সম্পূর্ণ সার্থক নয়, তার প্রমাণ আছে এই বইতেই। সবচেয়ে অন্তর্ভেদী চক্ষু, আম্পায়ারের জ্ঞানচক্ষুর কথা নেই ঐ রচনায়। তাই বাধ্য হয়ে আম্পায়ারদের কথা এই বইয়ের অন্যত্র বিস্তারিত লিখতে হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সত্যই ক্রিকেটের অ্যাঙ্গেলের শেষ নেই। এই গ্রন্থে প্রচুর কথা ও কাহিনীতে বহুকোণ ক্রিকেটকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ক্রিকেটের এইসব কথা ও কাহিনী মূলত হাসির এবং খুশির। কিন্তু ক্রিকেটের এমন একটি স্থান আছে যেখানে জীবনের সঙ্গে মিশে সে সুগভীর, যেখানে খেলাকে অতিক্রম করে তা জীবনের খেলা। গ্রন্থশেষে তারই ক্ষণপরিচয় হয়ত মিলবে।

পি কে আর অর্থাৎ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় আইনজীবী। তিনি বলেন, দুনিয়া যে আইন মেনে চলে না তা যদি ভালভাবে জানতে চাও আইনের দুনিয়ায় এসো। দেখবে, শুধু বেআইন বাঁড়লাইনের মামলা। ক্রিকেট-মাঠে খেলা দেখার ফাঁকে এবং মাঠের বাইরে আড্ডাস্থলে তিনি 'ইনটিমিডেশনে'র নানা কাহিনীতে আমাদের রোমাঞ্চিত করে থাকেন পুনঃপুনঃ, আর তার পরিবর্তে ক্রিকেটের নতুন-নতুন গল্প শোনানোর জন্য তাগিদ যেন মুহুর্মুহু।

উক্ত প্রকার তাগিদের নির্বস্তুক সাহায্য ছাড়াও বহুজনের বস্তুগত সাহায্য আছে এই গ্রন্থের পিছনে। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী গুণেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনীলবিহারী ঘোষ, লক্ষ্মীকান্ত বড়াল, বিমল ঘোষ, ও রণেন্দ্রনাথ বসুর নাম করতেই হবে। বিখ্যাত ক্রিকেটার শ্রীপঙ্কজ রায় এবং ক্রীড়ালেখক শ্রীঅজয় বসুর সৌজন্যে কয়েকটি ছবি পেয়েছি। এই বইয়ে কয়েকটি বিদেশী গ্রন্থের ছবি ও কার্টুনের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। বিদেশী ছবিগুলি পাঠক দেখলেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া বিদেশী ক্রিকেটারদের কথা যে, বিদেশী বই থেকে নিয়েছি তা না বললেও চলবে। এই সব উত্তমর্ণদের কাছে ঋণস্বীকার করছি, ঋণশোধের ভরসা রাখি না।

২৭ আশ্বিন, ১৩৭০; ১৪-১০-৬৩ — গ্রন্থকার

ক্রিকেট ক্রিকেট মধুর ক্রিকেট
লর্ডসে হল জয়।
ক্রিকেট ক্রিকেট মধুর ক্রিকেট
আনন্দ অক্ষয়।

[১৯৫৯ সালে লর্ডসে ইংলণ্ডকে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ হারাবার পরে পরমোল্লাসে ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ানরা যে-ক্যালিপশো গেয়েছিল! উপরে তারই আংশিক অনুবাদ। ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ানরাই একালে ক্রিকেটের আনন্দকে ফিরিয়ে এনেছে।]

* * * প্রথম পরিচয়ের রোমান্স * * *

প্রথম পরিচয়ের রোমান্স! মুমূর্ষু বৃদ্ধের চোখেও আলো জ্বালায়—সে এমন জিনিস। কাব্য, সাহিত্য ও জীবনের পরম সম্পদ সেই 'শুভদৃষ্টির' পুলকের কথা জানিয়েছিলেন আমাকে জনৈক ক্রিকেটার:

"ভায়া সম্প্রদানের সময়ে তোমার বৌদির হাত ধরেও তত কাঁপিনি আর ঘামিনি যেমন হয়েছিল প্রথম ম্যাচের সময়ে ব্যাটের হাতল ধরে। রবিশঙ্করের সেতারধরা হাতে যে-শিহরণ নেই, তা নাকি আমার ব্যাটধরা হাতে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে এসে গিয়েছিল, এবং আমার প্যাডপরা থরোথরো পা থেকে নাকি নাচের নতুন ছন্দ তুলে নিতে পারতেন রবিশঙ্করের দাদা উদয়শঙ্কর।"

আমার সেই ক্রিকেটার-দাদা এমন কোনো বড়ো ক্রিকেটার নন যাঁর হাত-পায়ের কথা শুনতে আগ্রহী হতে পারেন পাঠক-পাঠিকা। বর্তমান প্রসঙ্গে আমি তাঁদের কথাই আনব যাঁদের করলিপি ও পদসঙ্গীতে সমৃদ্ধ হয়েছে ক্রিকেট-সাহিত্য। সে কাহিনী দীর্ঘ হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু গোয়ালার গলির হরিপদ কেরানীর মতো দু' একজনের কথা বাদ দিলে জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিই শুভ-দৃষ্টির সৌভাগ্য অর্জন করেছে। ইদানীং ক্রিকেটাররা সকলেই আত্মজীবনী লিখছেন (কিংবা লেখাচ্ছেন। এক লেখক বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন: আমি বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী ও আত্মজীবনী দুইই লিখে থাকি)—এবং তাঁরা তাঁদের ঐ মধুমুহূর্তের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন সানন্দে, সালঙ্কারে। সকলের কথা লেখা সম্ভব নয়, দু' একজন 'চরম' খেলোয়াড়কে নিয়ে পড়া যাক। যেমন ওয়ালী হ্যামণ্ড।

ওয়াল্টার হ্যামণ্ড হবসের পরে ও হাটনের আগে ইংলণ্ডের সেরা ব্যাটসম্যান। হবস, হ্যামণ্ড ও হাটন—এই তিন 'হ'-এর মহাপ্রাণ বর্ণের নির্ঘোষে ইংলণ্ডের ক্রিকেটমাঠ মন্দ্রিত। তিনজনেই ক্লাসিক্যাল, সুমহিম, সুসম্পূর্ণ। তার মধ্যে হবস অধিকতর নিখুঁত, হ্যামণ্ড আভিজাত্যে অগ্রণী, আর হাটন প্রতিজ্ঞায় সর্বাধিক কঠোর।

হ্যামণ্ডের যুগ। ১৯২৮-২৯-এ ইংলণ্ড-দল গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। নিউ সাউথ ওয়েলসের সঙ্গে ইংলণ্ডের খেলা। প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের টোটাল আকাশ-

ট্যুটিল—৭ উইকেটে ৭৩৪। চতুর্থ উইকেটে প্যাটসি হেনড্রেন ও হ্যামণ্ডের জুটিতে হল ৩৩৩ রান—প্যাটসির ১৬৭ ও হ্যামণ্ডের ২২৫।

হেনড্রেন ও হ্যামণ্ড ব্যাট করছেন—অনন্ত কালের পটভূমিকায় সেই সৃষ্টি-কার্য—ইচ্ছামৃত্যু ছাড়া এই জুটির মরণের আর উপায় নেই। এমন সময়ে—। পরবর্তী ব্যাপারটা কি হল—স্বয়ং হ্যামণ্ডের কথাতেই উপস্থিত করা যাক—

"তখন বলটি রোগা খাটো-চেহারার একটি ছোকরার হাতে তুলে দেওয়া হল—তার মুখ গম্ভীর ও নার্ভাস। ছেলেটিকে আমি আগে দেখিনি, বা তার নামও শুনিনি। ১৯ বছরের মতো তার বয়স এবং মনে রাখার মতো এমন-কিছু চেহারা নয়।

"তার বোলিংও এমন-কিছু নয়—সাদা-মাঠা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার নিরীহ রূপের তলায় যেহেতু সব সময়েই একটা ছোবল থাকতে পারে, সেই কথা ভেবে প্যাটসি ও আমি তিন ওভার বাড়াবাড়ি-কিছু করলুম না। মনে হয়, ঐ তিন ওভারে দশ-বারো রানের মতো করেছিলুম দু'জনে। তারপর প্যাটসি আমার দিকে চেয়ে মুখ বাঁকিয়ে হাসলেন—আমি বুঝলুম, আনাড়িটি এবার মরবে। পরের ওভারের প্রথম বল সোজা বাউণ্ডারিতে। তার পরেরটি প্যাটসি যদিও মাটিতে ঠুকে দিলেন, কিন্তু পরবর্তী দুটো বল উড়ে গিয়ে পড়ল লেডিজ-স্ট্যাণ্ডে—ওভার বাউণ্ডারি। তার পরেরটাকেও প্যাটসি একইভাবে পেটালেন। কিন্তু কোথায় কি একটা গোলমাল হয়ে গেল, বলটা সোজা উঠে পড়ল, এবং ক্যাম্বেল সহজ ক্যাচ ধরলেন। প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্যাটসি বিদায় নিলেন, লেল্যাণ্ড এলেন এবং শেষ বলটি ব্লক করলেন।

"তরুণ বোলারের পরবর্তী ওভারে আমি তার সম্মুখীন হলুম। আমি প্যাটসির শোধ তুলতে চাইলুম এবং সেই ওভারে ২৪ রান করলুম, যার ফলে তাকে সরিয়ে দেওয়া হল মিড-অফে ফিল্ডিং করতে। কেলেওয়ে অপরপ্রান্তে বল করছিলেন। তার একটা বল মিড-অফে সজোরে মেরে লেল্যাণ্ড রানের ডাক দিলেন। আমি এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু পৌঁছবার আগেই মিড-অফের সেই ছোকরাটি ধাঁ ক'রে বলটা কুড়িয়ে নিয়েই একেবারে বিদ্যুতের মতো ছুঁড়ে দিল এবং বার্ট ওল্ডফিল্ড, যিনি কোনো কিছুই ভুল করেন না, স্বচ্ছন্দে বেল তুলে নিলেন। আমি একেবারে স্তম্ভিত।

"প্যাভিলিয়নে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলাম—ছেলেটি কে? কে এই ছেলেটি—যে, নিজের পাঁচ ওভার বলে ৫৫ রান দিয়েছে অথচ যখন আমি এবং প্যাটসি এমনভাবে খেলছি যে, মনে হচ্ছিল, ট্যুরের বাকি সময়টা অক্লেশে খেলে যেতে পারি—সেইসময়ে ফিরিয়ে দিল আমাদের দু'জনকেই? আমি তাকে চিনে রাখতে চাইলুম।

"ছেলেটির নাম ডন ব্রাডম্যান।"

ব্রাডম্যানের সঙ্গে হ্যামণ্ডের চেনাশোনাটা ভালরকমই হয়েছিল। তার জের চলবে অনেকদিন। হবসের পরে ইংলণ্ডের সেরা ব্যাটসম্যান-রূপে ঘোষিত হ্যামণ্ড হয়ত ভেবেছিলেন, শুধু ইংলণ্ডের কেন—কেন পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যান আখ্যা নয়? পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যান বলে স্বীকৃতি পেতেনও যদি ঐ খাটো

অস্ট্রেলিয়ানটা না থাকত। হ্যামণ্ড স্বতঃই প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাডম্যানকে সুনজরে দেখেননি।

হ্যামণ্ড-ব্রাডম্যানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার গোটা ইতিহাস জানাবার দরকার নেই, কিন্তু এটুকু স্মরণ করিয়ে দেব, ১৯৪৬-৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ব্রাডম্যানের হাতে শেষ মার খেয়েই হ্যামণ্ডকে সরে যেতে হয়েছিল ক্রিকেট-দুনিয়া থেকে, এবং পরের বছর ১৯৪৮ সালে ব্রাডম্যান যখন তাঁর শেষ সুবিখ্যাত অপরাজিত সফর করলেন ইংলণ্ডে, তখন ইংলণ্ডের মাঠ থেকে বিনা বাদ্যে বিদায় নিয়েছেন ওয়ালী হ্যামণ্ড।

ব্রাডম্যানের সঙ্গে আর একজন বিশ্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারের প্রথম পরিচয়ের জায়গায় হ্যামণ্ড উপস্থিত ছিলেন তাঁর কুঞ্চিত ললাট নিয়ে। হ্যামণ্ডের ললাটের কুঞ্চনরেখা গভীরতর হয়েছিল...তিক্ততা...আক্রোশ...আশাভঙ্গ...

ইংলণ্ডের গডফ্রে ইভান্স যে, একালের সেরা উইকেটকীপার তা শত্রুপক্ষও স্বীকার করে। অস্ট্রেলিয়ার ডন ট্যালন হয়ত কিছুকাল নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরেছিলেন কিন্তু ইভান্স শেষ বাজিতে ট্যালনকে ছাড়িয়ে গেছেন। পূর্বকালে উইকেটকীপার-রূপে নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অস্ট্রেলিয়ার বার্ট ওল্ডফিল্ডের। ওল্ডফিল্ডের ছিল নিরুপদ্রব নৈপুণ্য। নিঃশব্দ হস্ত-কৌশলে, মহানতম চৌর্যে তিনি অদ্বিতীয়। ইভান্স অপরপক্ষে সরব, সচেতন, ভঙ্গিপ্রধান, অভিনয়প্রিয়। ইভান্স সহজ ক্যাচকে ধরেন কঠিন করে, কঠিনকে ধরেন অবহেলায়। অসম্ভব ক্যাচকে প্রায়ই সম্ভব করেন, যখন পারেন না, সেটা যে অসম্ভব ছিল, তা বুঝতে দেরী হয় না কারো ইভান্সের ভাবেগতিকে। এমন ইভান্স কথা বললে খোলা গলাতেই বলবেন সন্দেহ নেই। স্থায়ীভাবে গ্লাভস খুলে রাখলার পরে তিনি কিছু হ্যামণ্ড-প্রসঙ্গ করেছেন :

"গোড়াতেই বলে রাখি, আমি ওয়ালী হ্যামণ্ডের অধিনায়কত্বে খেলতে গর্ব-বোধ করেছিলাম। তখন অল্প বয়স, বিচারবুদ্ধি পাকেনি, সেই ১৯৪৬ সালে প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছি। আমি ভেবেছিলাম, হ্যামণ্ড নিশ্চয়ই একজন জন্ম-সিদ্ধ নেতা।

"কিন্তু বুঝিনি—উহুঁ, একদম নয়!—বুঝিনি যে, তাঁর মাঠসাজানো নিখুঁত নয়, কোনোমতেই নয়। দলের অন্য সকলে যখন ট্রেনে যাচ্ছে তখন তিনি তাঁর নিজের জাগুয়ার গাড়ীতে যাচ্ছেন—এর দোষ নিয়ে একটুও মাথা ঘামাইনি। আমি নিজের সম্বন্ধে ট্রেনের বেশি তো আশা করিনি, তাই যথেষ্ট।

"আবার বলি, ছোকরা খেলোয়াড়রূপে আমি সম্মান করতাম হ্যামণ্ডকে। কিন্তু দলের অন্য খেলোয়াড়রা করত না। তারা তাঁকে পছন্দ করত না, তাঁর সঙ্গে মানিয়ে উঠতে পারত না, ঠিকভাবে বলতে গেলে, কেউ-কেউ তাঁকে মনে-প্রাণে অপছন্দই করত।

"তারা বলত, বলবার কারণ ছিল—হ্যামণ্ড স্বার্থপর। সবকিছু নিজের সুবিধামতো গুছিয়ে নেন। হ্যামণ্ডের ধারণা, কোনো বিষয়ে তাঁর যা মত, সেইটেই ঠিক মত, অপর যে-কোনো মতই যাচ্ছেতাই। তিনি কখনো পরামর্শ চাননি। এবং ক-খ-নো-ই কাউকে প্রশংসা করেননি।

"বিরাট ক্রিকেটার ওয়াল্টার হ্যামণ্ড বুঝে ওঠার পক্ষে কঠিন মানুষ।

খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে তাঁর ভালোমন্দ ধারণা খুব স্পষ্ট এবং তা জানাতেনও স্পষ্টভাবে। এক ব্যক্তিকে তিনি গভীরভাবে অপছন্দ করতেন—ব্রাডম্যানকে।"

ব্রাডম্যানের সঙ্গে ইভান্সের প্রথম পরিচয়ের কথায় আসা যাক। ১৯৪৬-৪৭ সিরিজে এম-সি-সির সঙ্গে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার খেলা। সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় খেলছেন ব্রাডম্যান। ইভান্স ব্রাডম্যানের উইকেটের পিছনে গ্লাভস পরে দাঁড়িয়েছেন। সেই তরুণ কামনার মুঠিতে কি ধরা পড়বে না বিশ্বপ্রতিভা?

ব্রাডম্যানকে উইকেটে এসে দাঁড়াতে দেখলেন ইভান্স। স্পষ্ট বোঝা গেল ব্রাডম্যানের অসুস্থতা কাটেনি। কয়েক বৎসর অসুখে-অসুখেই কেটেছে, এখনো তিনি নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নন। ব্রাডম্যান স্ট্যান্স নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, ব্যাটের পিছন দিকটি পয়েন্টের দিকে ফেরানো। ভঙ্গি একেবারেই নিখুঁত নয়—ক্রিকেটের নীতিকথার বিচারে। কিন্তু দেহের প্রতি রেখায় কি কঠোর দৃঢ়তা—এক অলৌকিক মনোনিবেশ—শরের মতো দুটি চোখ বিঁধে আছে বোলারের হাতে।

ডিক পোলার্ড বোলার। একেবারে উইকেট-ঘেঁষে ইভান্স অপেক্ষমাণ। পোলার্ডের একটা বল ব্রাডম্যানকে সম্পূর্ণ ফাঁকি দিল। ডন সামান্য ছোঁয়া লাগাতে পারলেন মাত্র। বলটা লুফবার কোনো চেষ্টাই ইভান্স করলেন না—দরকার কি, যখন সেটি উইকেট ভেঙে দেবে নির্ঘাত!

"কিন্তু—আমি জানি না কেন—আজও জানি না কেন—তা ঘটল না!! সামলে নিয়ে শেষ চেষ্টা করলাম—কিন্তু তখন বড় বেশি দেরী হয়ে গেছে"—ইভান্স লিখেছেন।

ব্রাডম্যানের দু'রান হয়েছিল মাত্র। শুরুতেই তাঁকে সেরে দেওয়া যেত। দুর্ভাগ্য! ইভান্সের বুদ্ধিদোষে তা হতে পারল না।

আবার সুযোগ এল ৫৪ রানের মাথায়। ডন একটা ভালোরকম খোঁচা লাগালেন। অন্তত ইভান্সের পক্ষে সেটা ধরা কঠিন ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্যলক্ষ্মী কি-একটা চক্রান্ত করলেন—ইভান্স পুনশ্চ ফসকালেন।

ডন বেশি নয় ৭৬ রান করলেন, কিন্তু অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন ইভান্সের কল্যাণে।

ইভান্স দুঃখের হাসি হেসে বলেছেন—ডনকে যদি দু'রানে ধরে ফেলতাম, তাহলে ডন হয়ত ক্রিকেটে আর ফিরতেন না। তখন যা তাঁর শরীরের ও মনের অবস্থা, ঐ পতন তাঁর শেষপতন হত। আমি তাঁর পুনঃপ্রত্যাবর্তনের (আর সে কি প্রত্যাবর্তন! ঐ সিরিজে তাঁর টেস্ট-অ্যাভারেজ ৯৭·১৪) নিমিত্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম।

স্বর্গ থেকে দুটি স্বর্ণডিম্ব খসে পড়েছিল ইভান্সের অঞ্জলির উপরে। মূল্যবোধহীন বালক তাকে ফেলে দিল মাঠে। ডিম দুটি মাটিতে পড়ে ফেটে গেল এবং দুটি ডিমের ভিতর থেকে আধখানা করে মূর্তি বেরিয়ে এসে জুড়ে গিয়ে এক হয়ে মাঠের উপর অপূর্বছন্দে নৃত্য করতে লাগল—নবাবির্ভাব হল ডন ব্রাডম্যানের।

আফশোষে আনন্দে ইভান্স অধীর। জীবনের সেরা পুরস্কার দু' দু'বার ছেড়েছেন তার দুঃখ—আর পরম সুখ—আমার ত্যাগের বলেই বিশ্বক্রিকেটারের

বাঞ্ছিত পুনরভ্যুদয়!

শাস্তিস্বরূপ হ্যামণ্ড দল থেকে ইভান্সকে খারিজ করে দিলেন। উইকেট-কীপারের গ্লাভস পরে নক-আউটের অমন সুযোগ ছেড়ে দিল ছোকরা! রাগে দাঁতে দাঁত পিষলেন হ্যামণ্ড।

সিডনির দ্বিতীয় টেস্টে দলে প্রত্যাবর্তন করে ইভান্স মহান প্রতিশোধ নিলেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ঐ টেস্টে রান হয়েছিল ১০৫৪. কিন্তু উইকেট-কীপার ইভান্স একটি বাই-রানও হতে দেননি। পরমাশ্চর্য ব্যাপার।

ঐ সিডনি-টেস্টে ব্রাডম্যান ২৩৪ রান করেছিলেন (তাঁর সঙ্গে একইসংখ্যক রান করেছিলেন সিড বার্নস), এবং পরবর্তী টেস্টে আরও অনেক রান—ইভান্স সারাক্ষণ পিছনে হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলেন—যদি আর একটা সুযোগ পান—দু'বার ভুল করেছেন, সে ভুল তৃতীয় বার করবেন না—জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাঁর চাইই—ব্রাডম্যানকে একবার ধরা চাইই—কোনো সুযোগ এল না।

পরের বছর ১৯৪৮ সালে ব্রাডম্যানের শেষ ইংলাণ্ড-ট্যুর। ইভান্স এবার নিশ্চয় তাঁকে অন্তত একবার পাবেন, একবার করতলগত করবেনই ভাগ্যকে। কেণ্টের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ। কেণ্টের উইকেটকীপার ইভান্স পুনশ্চ ব্রাড-ম্যানের পশ্চাদ্বর্তী। পঞ্চাশের মতো রান হয়েছে ডনের, বল করছেন মিডিয়াম-পেস বোলার এডি ক্র্যাশ।

ডন একটা বলকে বেশ জোরের সঙ্গে ব্যাটের তলায় লাগালেন। বলটি ধরেই আনন্দে ফেটে পড়তে যান ইভান্স—সামলে নিলেন। দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য, ও-শব্দটা ব্যাটে বল লাগার নয়, মাটিতে ব্যাট ঠোকার। বিষণ্ণ মনে ইভান্স কোনো অ্যাপীল না করে বলটি বোলারকে ফেরত পাঠালেন। সুযোগ তাঁর এসেও এলো না।

সুযোগ এসেও এলো না? ব্রাডম্যান ইভান্সকে বললেন—"কী মূর্খ তুমি গডফ্রে? তুমি কয়েক বছর ধরে আমাকে পেতে চাইছ—আর আজ হাতে পেয়েও. ধরেও, তাকে বিনা ডাকে ছেড়ে দিলে।"

"তার মা—নে??? বলটা তোমার ব্যাটে লেগেছিল?"

"নিশ্চয়। রীতিমত জোরে। তোমার সুযোগ তুমি পেয়েছিলে—কিন্তু তোমার বরাতে নেই।"

আমি জানি আমার বঙ্গভাষী পাঠক এখন একটিমাত্র কাব্যছত্রই মনে-মনে আবৃত্তি করছেন:

'অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক-পল-ভর,
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশপাথর।'

বৃথা। 'পরশপাথর' রিটায়ার করলেন ১৯৪৮ সালেই।

হতভাগ্য লেন হাটন সিনেমা হল থেকে উঠে এলেন যন্ত্রণায়। এখানেও শান্তি নেই।

পাডসির ১৮-১৯ বছরের এক ছোকরা, লিওনার্ড হাটনকে টেস্ট খেলতে ডাকা

হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩৭ সালে। লেনের জীবনের প্রথম টেস্ট। জীবনের প্রথম টেস্টযাত্রার কাহিনী স্যার লিওনার্ড লিখে জানিয়েছেন :

"নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টম্যাচের পূর্বে আমার শেষ কাউন্টি খেলা হয়েছিল হালে, যার পরে আমি অবশিষ্ট ইংলন্ডদলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য লন্ডনের দিকে যাত্রা করলাম। খেলার দিন সকালে আমি প্রায় খেতেই পারলাম না। ক্রিকেট-ব্যাগ নিয়ে লর্ডসের দিকে যাওয়ার সময়েও একই উদ্বেগ আচ্ছন্ন করে রাখল। 'ডবলিউ জি গ্রেস' গেটের সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ ভয়ে মন শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল। আমি দৌড়ে পালাতে চাইলাম। আকাশ-পাতাল ভাবনায় ডুবে রইলাম। এখানে আসা কি আমার উচিত হয়েছে?

"কী যে তুচ্ছ লাগল নিজেকে! ঐ-যে সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ মহার্ঘ পোষাকে সজ্জিতা মহিলাবৃন্দকে নিয়ে এই পথে আসছেন, আমাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছেন, বহু ক্ষেত্রে গেটকীপার গেটে যাঁদের নমস্কার জানাচ্ছে পরিচিত ভঙ্গিতে—তাঁদের তুলনায় আমি কী সামান্য! আমার জন্য গেটকীপারের কাছ থেকে কোনো পরিচয়ের ইঙ্গিত নয়, তার পরিবর্তে ভ্রূভঙ্গি, যার বক্তব্য হল—এ কিম্ভূতকিমাকারটা আবার কে? গেটকীপার শুধু যদি আমার মনের অবস্থার কথা জানত—যদি জানত আমি কি-রকম নার্ভাস হয়ে পড়েছি—তাহলে হয়ত দু' একটা উৎসাহের কথা শোনাত, কে জানে!

"এর আগে লর্ডসে কাউন্টির পেশাদার খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুম ব্যবহার করেছি। সেখানে হাজির হলে আমাকে জানানো হল—এটা টেস্টম্যাচ—সুতরাং আমাকে উপরতলায় অ্যামেচারদের ড্রেসিংরুম ব্যবহার করতে হবে। . .

"তার মানে সব কিছু আলাদা—রক্ষণাবেক্ষণের বেয়ারাটি পর্যন্ত। অনুভব করতে লাগলুম, একেবারে অথৈ জলে আমি, সব গুলিয়ে যেতে লাগল..."

হাটন তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে গোল্লা করলেন। দুঃখী ছোকরাটি দুঃখ জুড়োতে চাইল একান্তে। লেন চলে গেলেন একলা সিনেমায়। অন্ধকারে আসন নিয়ে নিজের ব্যর্থতার কথা ভাবছেন—ক্রমে সিনেমা-ঘরের আরামে দেহমনে স্বস্তি আসছে—এমন সময়ে পর্দায় ছবি ফুটে উঠল। নিউজ-রীল দেখানো হচ্ছে—ইংলন্ড ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে যে-খেলা হচ্ছে তারই ছবি। পর্দায় ফুটে উঠল—নবাগত লেন হাটন মাথা নামিয়ে চলে যাচ্ছেন গোল্লা করে।

হাটন বলেছেন—"আমি উঠে পড়লুম—বেরিয়ে এলুম।"

এই হাটন ব্রাডম্যানের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন, ঐ সিরিজেই পরে করেছিলেন ৩৬৪ এবং যখন টেস্টজীবন শেষ করলেন তখন তিনি, ওয়াল্টার হ্যামন্ডকে বাদ দিলে, ইংরেজ-ব্যাটসম্যানদের মধ্যে টেস্টে সর্বাধিক রান করেছেন আর অধিনায়করূপে কোনো রাবার হারান নি।

দরজায় দুম্ দুম্ দুম্ ধাক্কা।—মা মা মা—দরজা খোলো—দরজা খোলো—ওমা—মা—?

মা জ্যাম তৈরী করছিলেন রান্নাঘরে। তাড়াতাড়ি এসে দরজা খোলেন। ছেলে ঘরে ঢুকে মাকে জড়িয়ে তিন চরকি পাক। মা উল্টে পড়ে যান আর কি!

কোনোক্রমে টাল সামলালেন। ছেলে তারপর মাকে ছেড়ে, ডিগবাজি খেয়ে, হাততালি দিয়ে নেচে বলল—মা, কি মজা!

—কি হয়েছে বল্‌না বাপু, আর জ্বালাস নি।

চান্স পেয়েছি মা, চা—ন্স! একেবারে এম-সি-সির হয়ে খেলব।

মা ছেলের স্পোর্টসকোটের উপর ময়দামাখা হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন—বেশ বাবা, বেশ। দেখো, খেলতে যাবার আগে জিনিসপত্র ঠিক করে গুছিয়ে নিও।

মা যেন কি। আমি বুঝি খালি ভুলেই যাই—ছেলের গলায় অভিমানের সুর।

ঘটনাটা অনেকটা এই রকমই ঘটেছিল। শুধু ঐ মাকে জড়িয়ে ঘুরপাক খাওয়া বা ডিগবাজি খাওয়াটুকু বাদ। ১৮ বছরের ছেলে খেলাখ্যাপা ডেনিস কম্পটনের জীবনের আজ বড়দিন। সে সাফোকের বিরুদ্ধে লেখতে যাবে এম-সি-সির হয়ে। স্কুলে তার শিক্ষকমশাই তার পরীক্ষার খাতা হাতে নিয়ে কপালে চশমা তুলে বলেছিলেন—বাবা ডেনিস...না না, আমি রাগ করে বলছি না—তবে তোমার জীবিকা কলমে নয়—ব্যাটে। ডেনিসকে ইস্কুল ছাড়তে হল, ছাড়বার সময়ে কষ্ট হচ্ছিল, সবাই খুব ভালবাসে তাকে, কিন্তু 'তৃণে পুলকিত' লর্ডসে যুগে-যুগে তার বাসস্থান। সেখানে 'মাঠের ছেলে' হবার চাকরি পেল সে। স্কোরকার্ড বেচে, রোলার টেনে, স্বপ্ন দেখতে লাগল, কবে একাজ তার শেষ হবে, কবে অন্যেরা রোলার টানবে, কার্ড বেচবে, এবং কার্ড-বেচা বন্ধ করে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকবে তারই দিকে, এখন সে যেমন হাঁ করে দেখে হ্যামণ্ডকে ব্যাটিংয়ের সময়ে।

ক্রিকেট তার দিনের দর্শন, রাত্রির ভিশন। হবস তার আদর্শ। হবসের মারের ছবি চোখস্থ করে সে ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নে ছবির রিল ঘুরতে থাকে—বিস্মৃতির সেন্সারে কাটা পড়েছে কোনো একটা ছবি হয়ত—ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে আয়নার সামনে ব্যাট ঘুরিয়ে ছন্দ-পূরণ করে নেয়—।

বাবা-কম্পটন মা-কম্পটনকে বললেন—গিন্নী, তোমার ছোট ছেলেকে যদি আজ দেখতে—কী ঠাণ্ডা, চেনাই যায় না।

—কি রকম?

—হবস্‌ ব্যাট করছিলেন, আর বাছা একেবারে চুপটি মেরে খেলা গিলছিলেন।

মা সস্নেহে চঞ্চল ছেলের দিকে তাকালেন। সস্নেহে তার বাবা তার হাত ধরে তাকে মাঠে নিয়ে যেতে লাগলেন। এমনকি নিজের ক্রিকেটদলে তাকে একটা জায়গাও দিলেন। একবার তো বিপক্ষদল তার জন্য অভিযোগই করে বসল।

—এটা কিন্তু খুব অন্যায়—এত বাচ্ছা ছেলেকে খেলানো! এটা আমাদের বোলারদের প্রতি অবিচার।

কম্পটনের বাবা হেসে বললেন—দু' এক ইঞ্চি মাথায় খাটো বলে ওকে আস্তে বল দেবার দরকার নেই। নিজেদের স্বাভাবিক খেলা চালিয়ে যান আপনারা।

তারা কি শোনে? শোনেই বা কি করে? বিবেক বলে একটা জিনিস আছে তো! ফাস্টবোলার স্লো-অফস্পিন ছাড়তে লাগল। কিন্তু যখন গোটা চারেক বাউণ্ডারি ছুটে গেল পরপর, তখন পুনশ্চ তাদের হাতের জোর-বল দৌড়ে এসে মাথা ঠুকে নমস্কার করে বলল—'বাহাদুর বেটে!'

বাবা-মা-ছেলে মিলে চমৎকার ক্রিকেট-পরিবার। এহেন বাড়িতে যদি খবর আসে, ছেলে বড় খেলা খেলতে যাবে—তাহলে? সাজো-সাজো রব। কম্পটনের মা ছেলের সার্ট কাচতে বসলেন—দুধ-সাদা হওয়া চাই সার্ট। বাবা বসলেন জুতোয় কালি লাগাতে—যাতে একদম নতুন দেখায়। তারপর বাবা মা দাঁড়িয়ে রইলেন তদারকিতে—ছেলে ব্যাগ-ভর্তি করে জিনিস নিচ্ছে। ব্যাগে প্রথমে ঢুকল প্যাট হেনড্রেনের সই-করা হেনড্রেন-ব্যাট—৩০ শিলিং দাম। তারপর প্যাড—একই দাম। তারপর সার্ট, প্যান্ট, প্লাভস, মোজা, জুতো। জিনিস সাজানো তো নয়, উৎসবসজ্জা।

অনুষ্ঠানশেষে শ্রীমান কম্পটন কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে গটমট করতে-করতে লর্ডসের বাসে উঠে পড়ল এবং সেখানে হাজির হয়ে ব্যাগ জমা করে দিল হেডকোয়ার্টারে।

কয়েক ঘন্টা পরে সে ট্রেনে চড়ে বসল। জীবনের 'সর্বপ্রধান' ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে সে। তার পাশেই ছিলেন হ্যাম্পশায়ার ও ইংলণ্ডের উইকেটকীপার জর্জ ব্রাউন। অভিজ্ঞ মানুষ, খুবই রসিক, আর সহানুভূতিশীল। কম্পটনের সঙ্গে তিনি অনেক তামাশা করলেন, উপদেশও দিলেন বেশ-কিছু, তাঁর কথায় খুব আমোদ হতে লাগল কম্পটনের, সে হাসতে লাগল প্রচুর—কিন্তু সারাক্ষণই কি একটা অস্বস্তি মনে জেগে রইল। কি সেটা? কি জানি! তবু অস্বস্তি। নিজেকে বোঝাল, সব ঠিক আছে, কিন্তু কাঁটাটা খিচখিচ করতে লাগলই।

ট্রেন যথাস্থানে পেঁছল। সঙ্গীরা উঠে পড়ল, ব্যাগ তুলে নিল, ঠিক তখনই—সর্বনাশ! ব্যাগ আনা হয়নি।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে কম্পটন ক্যাপ্টেনকে নিবেদন করে—ভেবেছিলুম যাদের কাছে জমা দিয়েছি, তারাই ব্যাগ পাঠিয়ে দেবে...

হুম্...বটে...ভালই...ক্যাপ্টেন বললেন।

লর্ডসে তার করা হল। উত্তর এল—'ফেলে যাওয়া ব্যাগ এখন পথে। কিন্তু একদিন তুমি নিশ্চয় নিজের মুণ্ডু ফেলে যাবে।'

ক্রিকেট-মাঠটি বড়ই সুন্দর। গাছে ঘেরা, ঘন সবুজ আর চমৎকার অল্প ঢালু। উইকেট নিখুঁত. দর্শক প্রীতিপূর্ণ।

বরাত মন্দ হলে যা হয়—ঝটাঝট উইকেট খসতে লাগল এম-সি-সির। দুই দলের বাইশ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এমন একজন ছিল—যার ব্যাট, বুট, শার্ট, ট্রাউজার কিছু নেই—তারই উদয়মুহূর্ত আগত। তার বয়স সতেরো, অভিজ্ঞদের মধ্যে অনভিজ্ঞতম সে। বসে-বসে কাঁপছে আর ঘামছে। পালাতে পারলে বাঁচে। মাথামোটা গর্দভের শিরোমণি, সবাই ভাবছে তার সম্বন্ধে।

ত্রাণকর্তারূপে এগিয়ে এলেন উদারহৃদয় জর্জ ব্রাউন। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, সেই অনুপাতে চওড়া, নৌকার মতো পায়ের মাপ—সেই জর্জ ব্রাউন হাসিয়ে দিলেন কম্পটনকে অমন সঙ্কট পরিস্থিতিতেও—চিন্তা কি, আমার জিনিসপত্র চাড়িয়ে নেমে পড়ো।

হাসবো না কাঁদবো—কম্পটন ঠিক করতে পারল না—লরেল পরবে হার্ডির পোষাক?

ব্রাউন গম্ভীর হয়ে বললেন—ডেনিস, ওগুলো পরে ফেলো। যে-পর্যন্ত না

তোমার জিনিসপত্র আসে, ওগুলো দিয়েই চালিয়ে নাও।

বাক্যব্যয়ের অবসর না দিয়ে জর্জ ব্রাউন বেরিয়ে গেলেন ড্রেসিংরুম থেকে।

ছ'ফুট তিন ইঞ্চির পোষাক পরল ল্যাকপেকে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। শার্টের মধ্যে যখন ঢুকল সে, মনে হল, সার্কাসের তাঁবুতে বুঝি চাপা পড়েছে! জামার হাতা গুটোচ্ছে তো গুটোচ্ছে—গজের পর গজ কাপড় তালগোল পাকাল। প্যান্ট চড়াল যখন তখন শ্রীচরণ দুটি অদৃশ্য—এক ফুট তুলতে হল প্যান্ট। কাগজ ডেলা পাকিয়ে ঢুকিয়ে-ঢুকিয়ে জুতোজোড়া কাগজের গুদোমঘর হয়ে গেল তবু প্রতিপদে ছুটে যেতে লাগল শ্রীচরণ'সু'।

তাই সই। ভিখারী আবার আচারী! বগলের তলায় খোঁচা দিচ্ছে এমন প্যাড পরে, বুক পর্যন্ত লম্বা ব্যাট হাতে নিয়ে, কুমার কম্পটন চলল ব্যাট করতে।

বোলারের হাত থেকে বল এসে গেল। কম্পটন দু'হাতে ব্যাট তুলবার চেষ্টা করল। তার আগেই মিডলস্ট্যাম্প ঘ্যাচ্। একেবারে প্রথম বলেই বোল্ড।

কম্পটনের ব্যাগ এসে গেল দেরী না করে। অতএব পরের ইনিংসে ১১০।

উপরের কাহিনীটি মজায় মাখানো। প্রথম পরিচয়ের রোমান্স—রোমান্টিক কমেডিতে দাঁড়িয়েছে ওখানে। আরও নাড়াদেওয়া পরিচয়ের সংবাদ দেওয়া উচিত—সর্বাঙ্গে শিহর-জাগানো কোনো সাক্ষাৎ-বিবরণ। ইংরেজ ক্রিকেটারের কাছে 'অস্ট্রেলিয়া' বিষামৃতমধুর শব্দ। জাভা যাওয়াও সমুদ্রযাত্রা কিংবা জাপান, কিন্তু বিলেতই আসল বিদেশ। অস্ট্রেলিয়া ইংরেজদের কাছে ক্রিকেটের বিলেত। ইংরেজরা বলে, অন্যদের সঙ্গে আমাদের 'টেস্ট', অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে 'গ্রে-টেস্ট'। অস্ট্রেলিয়ানরাও সানন্দে ঘাড় দুলিয়ে বলে—দাদা, তুমিও মহান।

ডেনিস কম্পটন ১৯৩৭ সালে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে শেষ টেস্টে জায়গা পেয়েছিলেন। খেলেছিলেন ভালোই, ব্যাটে বলে উভয়ত।

১৯৩৮, জুন মাসে সকালে চায়ের টেবিলে পিতা পুত্রের সংলাপ :

—বাবা, গত বছর তো নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভালই খেলেছি। এবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চান্স পাবো, কি বলো?

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে শান্ত গলায় পিতা বললেন—আশা করি তুমি সুযোগ পাবে। আজ বিকাল-নাগাদ সবই জানা যাবে। আজই তো দল ঘোষণার কথা।

ক্রিকেটের সরঞ্জাম পরিষ্কার করে, আর মায়ের কাজে সাহায্য করে, দুপুরটা নানাভাবে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করলেন কম্পটন। তারপর বিকাল হতেই ছিটকে বেরিয়ে পড়লেন। তখনো সান্ধ্য-কাগজ আসতে ঘণ্টাখানেক দেরী।

সময় আর কাটে না! মিনিটগুলো কি লম্বা-লম্বা রে বাবা! রাস্তায় এলো-মেলো পায়চারি করতে দেখে কড়া চোখে পুলিশ তাকাল। অপরাধীর মতো গলিতে ঢুকে পড়েন ডেনিস। অবশেষে—দূরে হকার!

কাগজটা ছিনিয়ে নিয়েই একেবারে মেলে ধরেন চোখের সামনে। প্রথম টেস্টে ইংলণ্ডদল—হ্যামণ্ড, ফার্নেস, বার্নেট, হাটন, এডরিচ, পেণ্টার, এমস, রাইট, ভেরিটি, সিনফিল্ড এবং—ক—ম্প—ট—ন—!!

—মা মা—। দরজায় আবার সেই বালকের করাঘাত ও চীৎকার—মা, আমি

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলব।

মা হাসলেন :—বাছা ঠাণ্ডা হ।

ঠিক কথা। কম্পটন কাঁপছেন পাইনপাতার মতো।

এক মহাশুক্রবারে বিল এডরিচের সঙ্গে ডেনিস কম্পটন ন্যটিংহ্যামে পেঁছিলেন। ভাগ্যক্রমে একই হোটেলে ইংরেজ ও অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট-ক্রিকেটারদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

ডন ব্রাডম্যান কম্পটনকে দেখে এগিয়ে এলেন। অস্ট্রেলিয়ার মহান অধিনায়ক হাত বাড়িয়ে বললেন—বড় খুশি হয়েছি ডেনিস তোমার নির্বাচনে। গুড লাক্।

ডেনিস চেয়ে দেখেন খাটো চেহারার বড় মানুষটিকে। না, লোকটি ভঙ্গি করছে না—আন্তরিকভাবেই বলছে। ডন ছোট বয়সেই মাঠে নেমেছিলেন, তিনি জানেন নবাগত তরুণ খেলোয়াড়কে উৎসাহদানের মূল্য কি। ডেনিস কৃতজ্ঞতাবোধ করেন।

—আরে আমাদের ঘরে এসো না কেন—ডেনিস ফিরে দেখেন—অস্ট্রেলিয়ান বাঘা-বোলার বিল ওরিলি।—চলে এসো আমাদের ঘরে, ক্রিকেট সম্বন্ধে অনেক কথা কওয়া যাবে। কম্পটন রাজি হলেন।

ব্রাণ্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে ওরিলি বললেন—তুমি যে দেখছি একেবারে খোকা আছ হে। কম্পটনকে হালকা পানীয়ের অর্ডার দিতে দেখে হা-হা করে হাসতে লাগলেন ফ্লিটউড-স্মিথের সঙ্গে ওরিলি।

ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়ায় হয়ত তুমি যাবে—ওরিলি মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন—সে-ক্ষেত্রে মনে হয় আমাদের উইকেটের ধরন জানতে তোমার ইচ্ছে আছে।

আড়াই ঘণ্টা ধরে উইকেট, ক্রিকেটার, ক্রিকেট-ক্লাবতত্ত্ব, কম্পটনের কানে বর্ষণ করলেন ওরিলি। এই দীর্ঘ 'বক্তৃতার' শেষে দেখা গেল কম্পটন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

কিন্তু এধারে রাত দশটা বাজে। কম্পটন উসখুশ, উঠি-উঠি, কখন-যাই। ঘড়ি দেখছেন বারবার। সহাস্যে সমাপ্ত করলেন ওরিলি—তবে ছোকরা মনে রেখো, আমি আর ফ্লিটউড কাল তোমার জন্য কিছু বিশেষ বস্তু পরিপাক করে রেখেছি। তা পেটে পড়লে, তরুণ বন্ধুবর, তোমাকে বেশিক্ষণ খাড়া থাকতে হবে না। একেবারে খাঁটি কথা বলছি। অকালমৃত্যু—কি করব—দুঃখিত—অকালমৃত্যু হবে তোমার...তাহলেও গুড লাক্। এখন এসো। শুভরাত্রি।

ওরিলি কি রসিকতা করছিলেন? কম্পটন ভাবলেন। কিন্তু কম্পটন অন্তত এটুকু জেনেছেন, মাঠে হৃদয়চর্চা করে না অস্ট্রেলিয়ানরা।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় দেবভোগ্য ব্রেকফাস্ট সেরে মিডলসেক্স-যমজ কম্পটন ও এডরিচ ট্রেণ্টব্রিজে হাজির হলেন ট্যাক্সিতে। খেলোয়াড়দের দেখতে দলে-দলে জমে আছে লোক—তারা চেঁচিয়ে ওঠে সহর্ষে। এডরিচ বললেন—আজ আমার জীবনের মহাদিন। কম্পটন মাথা নামিয়ে বললেন—আমারও তাই।

ড্রেসিংরুমে জমা হয়ে আছে টেলিগ্রামের স্তূপ। পড়তে-পড়তে কম্পটনের গলায় আবেগ ফেনিয়ে ওঠে...কেমন একটা অপূর্ব আচ্ছন্নতা...

কেমন লাগছে?—শুধোলেন এডি পেণ্টার—একটা সেঞ্চুরি লেখা আছে তোমার চেহারায়—

সত্যি মনে হয়—কম্পটনের গলা বুজে আসে।

ইংলন্ডের সূচনা শুভ—হাটন ও বার্নেট প্রথম উইকেটে করলেন ২১৯। ১১০ করে হাটন ফ্লিটউড-স্মিথের বলে এল-বি হয়ে বিদায় নিলেন।

এডরিচ তারপরে গিয়ে ফিরে এলেন পাঁচ রানের ব্যর্থতা কুড়িয়ে। একটা দুর্যোগের লক্ষণ দেখা গেল যেন। বার্নেট ও হ্যামন্ড টিকলেন না। স্কোর চার উইকেটে ২৮১। কম্পটনের পালা। মাঠে আছেন এডি পেণ্টার।

কম্পটন নামছেন—প্যাভিলিয়ানের মধ্য দিয়ে গেটের দিকে যাচ্ছেন—ভীষণ নার্ভাস—গেট খুলে মাঠ—সবুজ মাঠ—সবুজ মাঠের উপরে যখনি কম্পটনের বুটের কাঁটার দাগ পড়ল—তখনি মানুষটা একেবারে বদলে গেল। অদৃশ্য ধমনী বেয়ে মাঠের রক্ত ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে—নতুন রক্তের তরঙ্গ কল্লোল করতে লাগল...সেঞ্চুরি...সেঞ্চুরি...

ওরিলির পাশ দিয়ে উইকেটে যাবার সময়ে কম্পটন দেখেন—দৈত্যের মুখ-জোড়া হাসি।—গুড লাক্‌ ডেনিস, তোমাকে মাঠে থাকতে দিয়ে বেশি কষ্ট দেব না।

ঠিক আছে—কম্পটন বললেন।

গার্ড নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন—হুমড়ি খেয়ে আছে ফিল্ডাররা—ভাবটা তাদের, কতক্ষণ আর? কম্পটন স্থির করলেন—তাড়াহুড়া নয়।

কিন্তু ওরিলির কথা ফলে গেল—প্রায়!

"খুব যত্ন করে দেখছিলুম, অস্ট্রেলিয়ার 'বাঘ' গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এলো আমার দিকে—মিডলস্টাম্পের উপর ভালো লেংথের বল পড়ল। হঠাৎ ঘুরে গেল অফের দিকে। ব্যাটে খোঁচা লাগল। বলটি উঠে ফার্স্ট-স্লিপের ঠিক সামনে গিয়ে পড়ল।

"ওরিলি আকাশে দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠে যেন রণনৃত্য শুরু করলেন। অস্ট্রেলিয়ান উইকেটকীপার বেন বার্নেট আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—কি আশ্চর্য! বলটা এতখানি ঘুরল? আমার বুক ধড়ফড় করে উঠল...গিয়েছিলুম ...শুধু একটুর জন্য বেঁচেছি...

"ওরিলি জ্বলন্ত চোখে তাকালেন দ্বিতীয় বল দেবার আগে। লোকটা কি আমাকে সম্মোহিত করতে চাইছে? আমি চমকে ভাবলাম। উঁহু না, আমাকে মাপছে। পরের বলটা একেবারে আলাদা জাতের। ব্যাটের মাঝ দিয়ে বলটাকে খেললাম।

"সেই মধুর সঙ্গীত—ব্যাটে ঠিকভাবে বল লাগার শব্দ যখন থেকে আমার কানে বাজল, তখন থেকে ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছি আমি।

"অতঃপর আর চান্স-টান্স নয়। দিনের শেষে ৬৫ নটআউট, এডি পেণ্টারের সঙ্গে।"

প্যাভিলিয়নে ফিরেই কম্পটন উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতে চাইলেন, তাঁর সহযোগীরা তাঁর খেলা সম্বন্ধে কি ভেবেছে?

সবাই বলল, ওরিলি জগতের সেরা বোলার। ওরিলি সদাই বিপক্ষের দুর্বলতা সন্ধান করেন। যদি এতটুকু হদিশ পান রক্ষা নেই। ওরিলি শুধু অনেকখানি বল ঘোরাতে পারেন তাই নয়—ওরিলি সারাক্ষণ ব্যাটসম্যানের ঘাড়ে

চেপে থাকেন। ব্যাটসম্যানের আধিপত্য ওরিলির কাছে চরমতম লজ্জার বস্তু।

ওরিলির সংগে বোলার ছিলেন ফ্লিটউড-স্মিথ। আগে ডান হাতে বল করতেন। একবার অসুখ থেকে উঠে বাঁ হাতে বল দিলেন কয়েকবার খেলাচ্ছলে, দেখলেন তিনি মূলে বামপন্থী, আর...তাঁর বামপন্থা, আরও দেখা গেল, ইংলন্ডের প্রতিষ্ঠিত ব্যাটধরদের পক্ষে অতি বৈপ্লবিক।

শনিবার সকালে খেলা শুরু করতে যাবার আগে অধিনায়ক হ্যামন্ড কম্পটনকে একান্তে ডাকলেন।

—সেঞ্চুরি পুরোলে ডবল সেঞ্চুরির চেষ্টা করবে। কদাপি রিস্ক নেবে না। কথাটা মনে রেখো। গুড্ লাক—হ্যামন্ড বললেন।

সকাল থেকে হন্যে হয়ে ঘুরেও অস্ট্রেলিয়ানরা পেণ্টার বা কম্পটনকে বধ করতে পারল না। বারটা কুড়ি মিনিটের সময়ে, কম্পটনের রান যখন ৯৮, কম্পটনের চোখ চলে গেল স্কোরবোর্ডে। মনে ঝলসে উঠল একটি চিন্তা—

—আমি কি একশ করব? আমি কি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম নেমেই সেঞ্চুরি করার সৌভাগ্য অর্জন করব, যা আমার থেকে অল্প বয়সে আর কোনো ইংরেজ পারেনি?

ফ্লিটউড-স্মিথের একটি আলগা বলে কম্পটন সজোরে ব্যাট লাগালেন—দুই উইকেটের মধ্যে এডি পেণ্টার পাগলের মতো দৌড়তে লাগলেন—কম্পটনকে দুটি রান দেওয়ার উপর তাঁর জীবন যেন নির্ভর করছে—কম্পটন যখন শ্বাস টেনে সোজা হয়ে দু'পায়ে দাঁড়িয়েছেন—ব্রাডম্যান তাঁর হাতে হাত দিয়ে বললেন—অভিনন্দন!

ব্রাডম্যানেরই প্রথম অভিনন্দন।

কম্পটন কি স্বপ্নজগতে?—ওরা কার জয়ধ্বনি করে? এখনি কি ঘুম ভেঙে দেখব ওলটপালট বিছানায় শুয়ে আছি?

জ্যাক হবস সেঞ্চুরির পরেই বেপরোয়া হাঁকড়াতেন। হবস কম্পটনের আদর্শ পুরুষ। কম্পটন আদর্শবাদী হয়ে একই চেষ্টা করলেন। ফলে ১০২ রানে কট হলেন ম্যাককেবের হাতে, ফ্লিটউডের বলে।

রেকর্ড করে কম্পটন ফিরছেন। তরুণতম ইংরেজ, প্রথম অবতরণে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে সেঞ্চুরি করেছে। অধিকন্তু পঞ্চম উইকেটে পেণ্টারের সঙ্গে ২০৬ রানের রেকর্ড।—কম্পটন হাওয়ায় হেঁটে—প্যাভিলিয়ানের পথে।

সারা মাঠের অভিনন্দন, খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা—কম্পটন ড্রেসিংরুমে পৌঁছে গেছেন।

শ্রেষ্ঠ সংবর্ধনার জন্য অধিনায়ক হ্যামন্ড এগিয়ে এলেন। মুখে একরাশ বিরক্তি।—প্রথমে আমি বলতে চাই—বেশ ভাল। তারপরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—আমি কি দুশো করতে বলিনি?

কম্পটনের মুখ টকটকে।

—না না, শুরু তুমি ভালই করেছ।

লন্ডনের এক ডিনার-সভার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন সি বি ফ্রাই। হাতের গ্লাস উঁচু করে বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন, গ্লাসে গ্লাস ঠেকাই,

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের সম্মানে উৎসর্গ করা হোক আমাদের আহার্য। আপনারা এখন ভিক্টর ট্রাম্পারের স্বাস্থ্যপান করুন, যিনি প্রথম নেমেছিলেন, গিয়েছিলেন সর্বশেষে, খেলেছিলেন কল্পনাতীত খারাপ পিচে, এবং তাও হার্স্ট ও রোডসের বিরুদ্ধে!

ভোজসভা হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। কথাগুলো সত্য, কী গভীরভাবে সত্য—স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল সকলে।

লণ্ডনের উক্ত ভোজসভায় রনজির সহযোগী খেলোয়াড় সি বি ফ্রাই স্মরণ করেছিলেন ১৯০৪ সালের মেলবোর্নের একটি খেলাকে। মেলবোর্নের ভিজে পিচ জঘন্যতায় পৃথিবীতে অদ্বিতীয়, আর হার্স্ট ও রোডস সর্বকালের সেরা ন্যাটা ধীর-বোলারদের দুজন। ভিজে মাঠে হার্স্ট ও রোডসের সঙ্গে সাক্ষাতের অর্থ গুহার মধ্যে বাঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ঐ খেলায় ট্রাম্পার প্রথম এসে সবশেষে ফিরে গিয়েছিলেন, মধ্যবর্তীকালে করেছিলেন 'মাত্র' ৭৪, গোটা দল করেছিল মোট ১২২। অন্যান্যদের মধ্যে হপকিন্সের ১৮, ডাফের ১০, এবং নোবল, সিড গ্রেগরী, ট্রাম্বল ও আর্মস্ট্রং নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করে—৯।

অমনি খেলোয়াড় ছিলেন ট্রাম্পার। পরমোজ্জ্বল সুপ্রখর প্রতিভা, অথচ সদানন্দ সুস্মিত মানুষ। প্রচণ্ডতম আক্রমণের মধ্যেও সৌজন্যস্নিগ্ধ। সিডনিতে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাট করতে গিয়েছেন। মাঠ ভিজে, ভিজে মাঠের মহা-পাতক জ্যাক স্যাণ্ডার্স বল করছেন। তাঁর প্রথম বল ট্রাম্পারকে হারিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। স্যাণ্ডার্স ভাবলেন—পেয়েছি। সকলেই তাই ভাবল। ট্রাম্পার হাসলেন। এগিয়ে গিয়ে বললেন—পুরনো দোস্তের সঙ্গে একী ব্যবহার? যা হোক ভায়া, আজ তোমার দিন কি আমার দিন।

সে দিনটা কারো নয়—একমাত্র ক্রিকেট-দেবতার। ট্রাম্পার ষাট মিনিটে একটি দেবভোগ্য সেঞ্চুরি করলেন।

এবং আরও কত কি করেছেন। তাঁর সবসেরা কীর্তি ১৯০২ সালে। জাত হিসাবে ইংরেজরা হাসাহাসির ধার ধারে না কারণ তাদের আকাশ হাসে না। ১৯০২ সালে ইংলণ্ডের আকাশ গোটা গ্রীষ্মকাল হাঁচি-কাশি-সর্দিতে ভুগে-ছিল। সেই গোমড়ামুখ আকাশের সঙ্গে ভিক্টর ট্রাম্পার স্ফূর্তির লড়াই চালিয়েছিলেন। কিন্তু আকাশের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন একটি জিনিস, বিদ্যুৎ, তাকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন ব্যাটে, এবং বিদ্যুতের অক্ষরে ক্রিকেটের মহাকাব্যের অনেকগুলি পৃষ্ঠা লিখে গিয়েছিলেন মাঠে-মাঠে।

নিকষে কনকরেখার মতো সবুজ মাঠে লাল বলের রেখা টেনে সেবার ট্রাম্পার করেছিলেন ২৫৭০। পরমাশ্চর্য এই, তাঁর সর্বোচ্চ রানসংখ্যা ১২৮। অর্থাৎ ট্রাম্পার লোভী ছিলেন না, সেঞ্চুরির খুশির পরে সরে দাঁড়াতেন অনায়াস বৈরাগ্যে।

সুতরাং ট্রাম্পার—অদ্বিতীয়—অস্ট্রেলিয়ানরা বলে। ইংরেজরাও বলে না তা নয়। ক্রিকেটের পঞ্চপুত্রের মধ্যে তিনি আছেন—গ্রেস, রনজি, ট্রাম্পার, হবস্ এবং ব্রাডম্যান। তাঁর ক্রীড়ারীতি প্রকাশ করতে গিয়ে লেখকেরা ভাষার সংযম হারিয়েছেন। যিনি স্টাম্পের লাইনের ইয়র্কারকে স্কোয়ারলেগের বাউণ্ডারিতে পাঠাতেন, মিডলস্টাম্পের বলকে [illegible] পাঠাতেন সমালোচক সবিস্ময়ে

ভেবেছেন, প্রতি মুহূর্তে বেআইনী বিপদ সৃষ্টি করেও লোকটা অত রান করল কি করে? 'ট্রাম্পারের স্টাইল ছিল'—শুনে লজ্জিত হয়েছেন সি বি ফ্রাইয়ের মতো ধনুর্ধর ক্রিকেটার—'তিনি স্বয়ং স্টাইল ছিলেন।' ট্রাম্পারের আদল বোঝাবার শেষ উপায় নিয়েছেন লেখকেরা—যদি ট্রাম্পারকে বুঝতে চাও ম্যাকার্টনি, জ্যাকসন, কিপ্যাক্স, ম্যাককেবকে মিলিয়ে নাও একসঙ্গে। তাঁদের বক্তব্য—অনেক বড় খেলোয়াড় আছেন, হয়েছেন—তাঁরা অনেক রান করেছেন, সংখ্যাগুণে ট্রাম্পারকে অতিক্রমও করেছেন—কিন্তু ট্রাম্পার স্বতন্ত্র স্বর্গের ইন্দ্র। 'ব্রাডম্যান? তার ওড়া এরোপ্লেনের ওড়ার মতো। কিন্তু ট্রাম্পারের খেলার শিল্প পাখীর পক্ষবিস্তারের মতো—সে-শিল্প জানে না সে কত সুন্দর। তার হল সানন্দ স্বতঃস্ফূর্ত পাখা মেলে দেওয়া।'

ট্রাম্পারের একমাত্র তুলনা রনজি। উইসডেন বলেছে—তবু রনজিও নয়। ডাঃ ডবলিউ জি গ্রেসের শ্রেষ্ঠ সময়কে বাদ দিলে এমন কি রণজিৎ সিংজী পর্যন্ত ব্যাটিংয়ে এমন অপূর্বতা ও ধারাবাহিকতা একই সঙ্গে দেখাতে পারেননি।

তবু রনজিই। উইসডেন যে, ডাঃ গ্রেসের সঙ্গে ট্রাম্পারের তুলনা করেছেন, সে তুলনা রানের ধারাবাহিকতার দিক দিয়েই সত্য, যে-ব্যাপারে ব্রাডম্যান সকলকে অতিক্রম করেছেন, কিন্তু স্টাইলের অপূর্বতার জন্য ডাঃ গ্রেসের খ্যাতি ছিল না। তাই ট্রাম্পার ও রনজিকে পাশাপাশি না রেখে পারেননি 'ক্রিকেট লেখার ট্রাম্পার' (ফিঙ্গলটনের কথায়) নেভিল কার্ডাস:

"ঈশ্বর, যদি ইচ্ছা করতেন, নিশ্চয় ভিক্টর ট্রাম্পারের চেয়ে ভাল ব্যাটসম্যান সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু এপর্যন্ত তিনি সে ইচ্ছা করেননি। রণজিৎ সিংজীই একমাত্র ক্রিকেটার, প্রতিভায় যাঁকে ট্রাম্পারতুল্য বলা যায়। কিন্তু রনজি পর্যন্ত ট্রাম্পারের মতো সর্বশ্রেণীর উইকেটে খেলা-জেতা খেলোয়াড় ছিলেন না। এমনকি রনজিও তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ আক্রমণশক্তিকে ট্রাম্পার যেমন হঠাৎ-বিক্রমে বিধ্বস্ত করতেন, তেমন করেননি। রনজি বোলারদের সমূলে উৎখাত করতেন না, তাদের তিনি প্রলুব্ধ ক'রে টেনে আনতেন তাঁর খেলার রহস্যগভীর গোপন ইন্দ্রজালের দ্বারা বিনষ্ট ক'রে দেবার জন্য—হতভাগ্য বোলারটি তুচ্ছতায় সম্মোহিত হয়ে পড়ত। ট্রাম্পার সেখানে অসিবিদ্ধ করতেন। ...কিন্তু সে ছিল ক্ষাত্রিয়ের তরবারি। ট্রাম্পারের অপেক্ষা ক্ষত্রবীর্যসমন্বিত ক্রিকেটার কখনো হয়নি। আমি দেখতে পাচ্ছি, মনশ্চক্ষে, তাঁর সেই ব্যাট, তাঁর সেই উড্ডীন পতাকা—মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়ছে বীরকীর্তির রানগুলি। ভালো বলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার জন্য তিনি সদাই প্রস্তুত ছিলেন—ট্রাম্পার কোনোদিন 'আপনি বাঁচো, বাজে বলের জন্য অপেক্ষা করো'—এই হতভাগ্য দর্শনের পাল্লায় পড়েন নি।"

এই ট্রাম্পার, যে-ট্রাম্পার মারা যাবার পরে বলা হয়েছিল—ঈগলের পাখা থেমে গেছে, এখন কাক আর চিলের কাল। বলা হয়েছিল—ইংলন্ডের মাঠে-মাঠে এত সম্পদ ছড়িয়ে গেছেন ট্রাম্পার যে, ইংলিশ-ক্রিকেট তাঁর ভূত-দেহের কাছেও ঋণী। সেই ট্রাম্পারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের এক উপাদেয় বিবরণ লিখেছেন আর্থার মেইলী।

মেইলী কে? ব্রাডম্যান বলেছেন—তাঁর ২৫ বছরের ক্রীড়াজীবনে যে-সমস্ত ধীর-বোলার দেখেছেন, মেইলী ও গ্রিমেট তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম। গ্রিমেটের ছিল অভ্রান্ততা, মেইলীর বিষাক্ততা। গ্রিমেট উইকেটকে যত ভালবাসতেন, মেডেনকে তার থেকে কম নয়। মেইলী ভাবতেন—দূর ছাই মেডেন, ব্যাটসম্যান হাত খুলুক, হাত খুললেই ব্যাটাকে নিকেশ ক'রে দেব।' সুতরাং মেইলীর ফুলটস বল ব্যাটের উপর গিয়ে পড়ত, ব্যাটসম্যান পরমানন্দে রান বাড়িয়ে নিত। হায় তার বুদ্ধি—রোস্ট হবার আগে মেষের মেদবৃদ্ধি! 'মেইলীর যেখানে দিবালোকে ডাকাতি, গ্রিমেট সেখানে রবারের জুতো পরে চোরা-লণ্ঠন নিয়ে চুপিচুপি এগিয়ে যান।' ক্রিকেট-মহলে সুপরিচিত একটি কথা—গুগলির বর্ষণে গ্রিমেট কৃপণের শিরোমণি, মেইলী গৌরীসেন।

সেই স্পিন-কুটিল মেইলী তাঁর কল্পনার রাজপুত্র ভিক্টর ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলতে যাচ্ছেন—তারই কথা আমরা বলতে যাচ্ছি। বলতে যাচ্ছি, ছোকরা ক্রিকেটারটি কিভাবে রোমাঞ্চিত হয়েছিল, উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল হঠাৎ সৌভাগ্যে, বিভ্রান্ত হয়েছিল নানা চিন্তার কানাকানিতে, তারই ইতিহাস।' এমন হবারই কথা, কারণ নতুন ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছে যে-ছোকরা, তার কাছে ট্রাম্পার ক্রিকেটের অবতারবরিষ্ঠায়। ট্রাম্পারের খেলা দেখবার সৌভাগ্য হয়নি ছোকরাটির এ-পর্যন্ত, কিন্তু চেহারা দেখবার সুযোগ ঘটেছে—ঠিকভাবে বলতে গেলে, সুযোগ ঘটিয়ে নিয়েছে সে। ট্রাম্পার ট্রামে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ভাল করে দেখবার, তাঁর পাশে বসবার, একবার গায়ে গা ঠেকিয়ে নেবার বাসনা নিয়ে ছেলেটি সেই ট্রামে উঠে বসেছিল, তিন স্টপ একসঙ্গে পাশাপাশি গিয়েছিলও, কিন্তু হায়, সে স্বর্গসুখের তারপরেই ইতি, কারণ পকেটে পয়সা নেই এবং বেরসিক কণ্ডাক্টার এগিয়ে আসছে টিকেট কাটবার জন্য।

ট্রাম্পারের সঙ্গে আরো একটু পরোক্ষ ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়েছিল তার। ঘরে রঙ লাগাবার পারিশ্রমিকরূপে ছেলেটির এক আত্মীয় তাকে একটি ব্যাট দিয়েছিলেন, যে-ব্যাট ট্রাম্পারের, এবং যে-ব্যাটে তিনি ১৯০৪ সালে টেস্ট খেলেছিলেন। ভিক্টর ট্রাম্পার—সেই আধা পৌরাণিক, পরম রহস্যময়, হৃদয়ের দেবতা-তুল্য ট্রাম্পারের ব্যাট পেয়েছে ছেলেটি—সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। ঘরে রঙ লাগানোর জন্য পয়সা আবার কি, লাখ টাকাতেও যা পাওয়া যাবে না এমন জিনিস মিলেছে যখন!

ছেলেটি ক্ষেপে গিয়ে প্র্যাকটিশ শুরু করল। তার বন্ধুরা বলেছিল, তার কোনো-কোনো বল প্রাণঘাতী, তবে লেংথ ঠিক থাকে না। স্পিন কমিয়ে লেংথের দিক নজর দিলে উন্নতি হবে—তারাই উপদেশ দিয়েছিল। ছেলেটি শুনেছিল, দাঁতে দাঁত চেপে ভেবেছিল, জগতে হাজার-হাজার লোক ঠিক লেংথে বল দেয়, আসল স্পিন আছে ক'জনের? সুতরাং স্পিন দাও, আরো দাও, প্র্যাকটিশ বাড়িয়ে চলো।

ছেলেটি সিডনির ফার্স্ট গ্রেডে উঠল। হঠাৎ তার কাছে সংবাদ এল—আগামীকাল স্বয়ং শ্রীভগবান তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

কথাটা ঠিক এভাবে সত্য নয়, তবে প্রায় সত্য, ছেলেটি রেডফার্নের হয়ে পাডিংটনের বিরুদ্ধে খেলতে যাচ্ছে। পাডিংটনে খেলেন—

ভি-ক্ট-র ট্রা-ম্পা-র!

ছেলেটির তোলপাড়-করা মনের ভাষাচিত্র এই:

"অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, কল্পনাতীত। হতে পারে না। একটা-কিছু গোলমাল হবেই, অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধ—ভূমিকম্প—কিংবা ট্রাম্পার হয়ত অসুখে পড়লেন। ম্যাচ আরম্ভ হতে যে দু'-তিন দিন বাকি আছে, তার মধ্যে হাজার কাণ্ড ঘটে যেতে পারে।

"বিছানায় বসে দেওয়ালে টাঙানো ট্রাম্পারের ছবির দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হল সেটা যেন দুলছে...

"ঘরের কোণে দাঁড়করানো তাঁর ব্যাটটির দিকেও তাকালাম, তারপর আবার ফিরে তাকালাম তাঁর মৃদুভাবে কম্পিত ছবির দিকে। আমি, মানে, কোনোমতে যেন, বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে, ঐ চেহারাটি, আমার কাছে যা অপার্থিব দিব্যমূর্তির তুল্য, সত্যসত্যই সে দেওয়াল থেকে নেমে ব্যাটটি হাতে তুলে নিয়ে শান্তভাবে বলবে—আমারি সাক্ষাতে—আম্পায়ার, টু লেগস্, প্লিজ!"

কথাটা আর্থারের বাবার কানেও উঠল।—ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলতে যাচ্ছ? বটে! সুস্থ-সমর্থ থেকে বাড়ী ফিরো বাছা।

সান্ত্বনা দিয়ে মা বললেন—ওকি কথা? ও শেষপর্যন্ত কি ক'রে ফেলতে পারে, তা কি তুমি জানো?

শেষপর্যন্ত যাই করুক, তার আগে অনেক কিছু করেছিল, অনেক কাজ, অনেক ভাবনা। এক প্যাণ্ট দশবার ইস্তিরি করল, উইকেটের সামনে পাঁচবার পাঁচরকম বল করল, ঘরে ছটফট করল, বাইরে করল ছোটাছুটি, এবং যখন সেই স্মরণীয় শনিবার এলো, সারারাত আকাশপাতাল চিন্তার পর (যেমন, ভিক্টর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, ট্রামে ধাক্কা খেতে পারে, গোড়ালি মচকাতে পারে, ভাঙতে পারে হাত) নিতান্ত ভোরে উঠে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল—আকাশের অবস্থা কি রকম?

সেই মহাশনিবারে আকাশ নির্মেঘ নির্মল। তবু ছেলেটির বিশ্বাস হল না—না জানি কখন মেঘ ঘনায়!

শনিবার সকালের মানসিক অবস্থা মেইলীর নিজের বর্ণনায় এইরকম:

"ঘরের দিকে বারেবারে তাকাতে লাগলাম। ঘড়িটা কি স্লো? না-কি থেমে গেছে একেবারে? জেটল্যান্ড হোটেলে চলে গিয়ে মিলিয়ে নিয়ে আসাই ভালো। যাই হোক, হয়ত শেষপর্যন্ত ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে আমাকে বল করতেই হল না। আমি বল পাবার আগেই হয়ত তিনি আউট হয়ে গেলেন। কিংবা আমাকে হয়ত বল করতে দেওয়াই হল না—আমি তো নিজের ইচ্ছায় বল করতে পারি না। আচ্ছা, ঠিক এখনি ট্রাম্পার কি করছেন?...বাজি রেখে বলতে পারি নিশ্চয় তিনি প্যাণ্টে ইস্তিরি করছেন না। ধোলাই-ঘরে পাঠিয়েছেন? তাইতো মনে হয়। সম্ভবত তাঁর দু'জোড়া প্যাণ্ট আছে। না, এখন বোধহয় তিনি প্রাতরাশে বসেছেন—বেকন আর ডিম খাচ্ছেন। আচ্ছা, তিনি কি জানেন আমি তাঁর বিরুদ্ধে খেলছি? মনে হয় না যে, আমার নাম তাঁর কানে উঠেছে। আমার নাম শুনলেও তাঁর মনে বিকার আসার কথা নয়, উহুঁ! আচ্ছা লম্বা সকাল বটে! বাগানে দু'বার কোদাল চালিয়ে আসি। না না, তাজা থাকতে হবে। তাহলে

একটু শুয়ে নিই।...তা ঠিক হবে না, ঘুমিয়ে পড়ব কিনা কে জানে, তাহলে দেরী হয়ে যাবে।

"সময় একেবারে থেকে গেছে যেন। নির্দিষ্ট কোনো কাজে মন দিতে পারলাম না, অথচ কিছু না করবার কথাও ভাবতে পারলাম না। আমি ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে বল করতে এবং না-করতে লাগলাম। আমার দেরী হয়ে গেল, এবং দেরী না-হয়ে গেল। আসল কথা, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।"

মাঠে হাজির হয়ে ক্যাপ্টেনকে মেইলী হাঁপাতে-হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি কি এসেছেন?

তিনিটা কে?—প্রতিপ্রশ্ন হল।

ঘৃণায় হতাশায় কটমট করে তাকালেন মেইলী। মনে-মনে বিষাক্তভাবে বললেন—জানো না বুদ্ধু, জুলিয়াস সীজার।

প্যাডিংটন টসে জিতে ব্যাটিং নিল। মেইলীর ক্যাপ্টেন হ্যারি গডার্ড বললেন—তোমাকে এখন সরিয়ে রাখি ভিক্টরের কাছ থেকে, নচেৎ সে ঠেঙিয়ে তোমাকে গ্রেড-ক্রিকেট থেকে দূর ক'রে দেবে।

কথাটা ঠিক, কিন্তু—ট্রাম্পার মাঠে নেমে পড়েছেন। ক্রীম-রঙের চমৎকার ফ্লানেলে ঢাকা একটি সুন্দর শরীর প্যাভিলিয়ন থেকে ছন্দোময় পদবিক্ষেপে এগিয়ে এসে উইকেটের সামনে দাঁড়িয়েছে, কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পিচ দেখে নিচ্ছে, আবার পেছিয়েছে, ঝুঁকেছে, গার্ড নিয়েছে, এবং কাঁধে একবার ঝাঁকানি দিয়ে স্টান্স নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে বিনাশের সৃষ্টির জন্য।

কথাটা ক্যাপ্টেন ঠিকই বলেছে, কিন্তু—মেইলীর অন্য চিন্তা:

"এই মহাগুরু ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে শাস্তির ভয় আমার হচ্ছিল না। আমার মন জুড়ে শুধু একটি বাসনা—আমি বল দেব তাঁকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছোকরারা কি হেনরি আরভিং-এর সঙ্গে একই মঞ্চে অভিনয় করতে চায়নি, চায়নি কি কারুসো বা মেলবা'র সঙ্গে গাইতে? নেপোলিয়ানের সঙ্গে লড়তে বা কলম্বাসের সঙ্গে সমুদ্রে ভাসতে কি তাদের ইচ্ছা হয়নি? আমি জয় চাইনি—চেয়েছি আমার হীরোর সঙ্গে সমক্ষেত্রে যেন সাক্ষাৎ হয়।"

পতঙ্গের বহ্নিপিপাসা সহজেই অনুকূল পরিবেশ পায়। মেইলীর অধিনায়ক ভাবলেন ছেলেটিকে ঝুলিয়ে ঝলসানো কেন, আগুনে ছুঁড়ে দেওয়া যাক।

"আমি কি সত্যই সেই প্রথম বলটি দিয়েছিলাম?"—মেইলীর মনে পড়ে না, কারণ মাথায় ঘূর্ণী, চোখে ধোঁয়া, একেবারে মূর্চ্ছার অবস্থা।

"সে বলটা নিশ্চয় ছয়ের কিংবা চারের মার খেয়েছিল, কেননা আমার সমাধি ভাঙল বেড়ার ধার থেকে ফেটে-পড়া প্রচণ্ড উল্লাস-ধ্বনিতে।

"কিন্তু আমি পরের বলটিকে সম্পূর্ণ স্মরণ করতে পারি"—মেইলী বলেছেন। সেটি নিখুঁত লেগব্রেক। হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকে চরকির মতো ছুটল গুঞ্জন তুলে। প্রচণ্ড লেগস্পিনে থরথর করছে। এই বলটি অন্য যে-কোনো ব্যাটসম্যানের দিকে ছাড়তে পারলে, মেইলীর বক্তব্য, তিনি পিছন ফিরে পরমানন্দে সুর ভাঁজতে পারতেন, কারণ মুহূর্তের মধ্যে উইকেট ছিটকে যাওয়ার শব্দ তখন কানে আসা অবধারিত।

"এক্ষেত্রে সে মনোভাব নয়, আমার প্রভু ব্যাট করছেন, সুতরাং চোখ মেলে

দেখতে লাগলুম সব কিছু।"

কী দেখলেন?

"দেখলুম, ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে চিতাবাঘের মতো তিনি অপেক্ষা ক'রে আছেন। চকিতে বলের এক ফুটের মধ্যে তাঁর বাঁ পা এগিয়ে এলো, কাঁধের উপর থেকে দোল খেয়ে নেমে এলো ব্যাট, মাটি থেকে ঠিক ওঠবার মুখে বলটিকে একবার স্পর্শ করল, তার পরেই অফের দিকে বেড়ায় প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দ।

"এইটেই সুন্দরতম মার, যা আমি দেখেছি।"

সমস্ত মাঠ পাগল হয়ে উঠল। সেই বলে বা অন্য কোনো বলে ট্রাম্পারের উইকেট পাবেন, এমন কথা মেইলী ভাবেন নি, কিন্তু যেহেতু তাঁর ধরনের বোলারের সেইটেই সর্বোত্তম বল, মেইলী শুধু আশা করেছিলেন, ট্রাম্পার অন্তত আত্মরক্ষা করে বলটি আটকাবেন, বিশেষত এই ছোকরা কেমন বোলার তা যখন ট্রাম্পার এখনো জানেন না।

বলটির গতিপথের দিকে সকলে চেয়ে রইল সবিস্ময়ে—কেবল তাকালেন না তিনি যিনি মেরেছেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে পিচের উপর থেকে একটি কুটো পরিষ্কার ক'রে ফিরে গেলেন ক্রীজে। তাঁর দেখবার দরকার ছিল না। ট্রাম্পার জানতেন বলটি কোথায় যাচ্ছে।

এই মনস্তত্ত্বের উপন্যাসকথা এইবার শেষ করা উচিত। অনেক চিন্তার পরে মেইলী একটি গুরুদক্ষিণা স্থির করলেন। একটি দুর্বলতা আছে ট্রাম্পারের—তিনি "বসী" বলে এখনো কিছু অস্বস্তি বোধ করেন—এবং মেইলী সেই বলে বলীয়ান। তেমন একটি বল ছাড়া যাক, দেরী না করে, অর্থাৎ ট্রাম্পারের হাতে মৃত্যুবরণের আগে—মেইলী স্থির করলেন।

মেইলীর বলটি হবে এই ধরনের। বলটি লেগব্রেকের মতো, তাতে এমন স্পিন থাকবে যাতে শূন্যে ঘুরতে পারে, এবং যথেষ্ট পরিমাণে বাঁকতে পারে মাটিতে পড়বার পরে। অধিকন্তু তাতে কিছু টপস্পিন দিয়ে দিলে হঠাৎ দ্রুত নেমে পড়বে মাটিতে। একটি চমৎকার লেগব্রেক।

না, বলটি আসলে অফব্রেক।

পরিকল্পনা মতো বলটি দেওয়া হল। এবং সেটি, মেইলী বলেছেন, এমন একটি বল যা আমি স্বপ্নে দিয়ে থাকি।

বলের ফ্লাইট দেখে ট্রাম্পার বিভ্রান্ত হলেন—লাফিয়ে বেরিয়ে পড়লেন উড়িয়ে দিতে—কিন্তু অবিলম্বে বুঝলেন ভুল করেছেন—অফব্রেক বলটি অনেক আগে মাটি ছুঁয়েছে—শেষ মুহূর্তের সংশোধনের চেষ্টায় হাত বাড়িয়ে লম্বা করে ব্যাট চালালেন—অন্তিম প্রয়াসে ঝলসে উঠেও ব্যাট বল ছুঁতে পারল না—লেগস্টাম্পের এক চুলের ব্যবধানে বলটি বেরিয়ে গেল এবং উইকেটকীপার যখন বেল ছিনিয়ে নিলেন তখন ট্রাম্পার ক্রীজের অন্তত দু'গজ বাইরে।

ট্রাম্পার উইকেটে ফিরবার চেষ্টা করেন নি। তিনি বুঝেছিলেন বলটি তাঁকে পরাভূত করেছে, তার মূল্য শোধ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

মেইলীর পাশ দিয়ে চলে যাবার সময়ে ট্রাম্পার হাসলেন, ব্যাটের উল্টোদিকে হাত ঘষলেন, বললেন—বলটা বড্ড ভাল পড়েছিল, আমার পক্ষে।

ট্রাম্পার প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটছেন। সেই মহান মানুষটি ফিরে যাচ্ছেন পরাভূত হয়ে। যুদ্ধজয়ী মেইলী পরাভূত ক্ষত্রিয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন—

"অপসৃয়মাণ সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছি. আমার চোখে কিন্তু কোনো জয়ের আলো ছিল না। একটি সুন্দর পাখীকে আমি মেরে ফেলেছি—হাঁ ঠিক তাই করেছি—আমি অনুভব করছিলুম।"

* * * **রোমান্স থেকে রোমাঞ্চ** * * *

কিন্তু প্রথম পরিচয়ের কোনো রোমান্স থাকা সম্ভব কি ট্রুম্যানের ক্ষেত্রে? আপনারা ট্রুম্যানকে যথেষ্টই জেনেছেন। মুঠো-মুঠো রেকর্ড গুঁড়িয়ে যে-ব্যক্তি প্যান্টের পকেটে পুরেছেন—যিনি ব্যাটসম্যানের শত্রু, আম্পায়ারের বিরক্তি, ও দর্শকের উত্তেজনা—সেই ট্রুম্যান কম্পিত ভীরু বালকের মতো লাজুক চাহনিতে চেয়েছেন কোনো দিন, কেঁপেছেন করস্পর্শে, লোভের ঠোঁটে জিভ বুলিয়েছেন সঙ্গোপনে, একি বিশ্বাস করা যায়? শুধু একবারই তাঁর জীবনে একটু রোমান্সের আভাসের মতো এসেছিল যেন, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের উত্তাপে তা উবে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

ধরা যাক প্রথম লর্ডস দেখে ট্রুম্যানের অনুভূতির কথা :

"প্রথম লন্ডন-দর্শনে কোন্ জিনিসটা আমার মনে বাজল সবচেয়ে? অবশ্যই লর্ডসের প্যাভিলিয়ন এবং ড্রেসিংরুম। বহিরাগতদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট এখানকার ড্রেসিংরুমের ব্যালকনিতে বসে হেডকোয়ার্টারের দৃশ্য যখন চোখে পড়ল—তখন এ বান্দা একেবারে খাঁটি লর্ড। আমার বাঁ-দিকে গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের বারান্দার ছাদে মাথা উঁচু করে আছে 'ফাদার টাইম' ঘড়ি, ডানদিকে বিখ্যাত পানশালা, আর সামনে ক্রিকেটের নার্সারি, পিছনে লন্ডন শহরের অনর্গল ট্রাফিক। সেইখানে বসে, তদ্দণ্ডে আমি স্থির করে ফেললুম, আমার নাম ফ্রেড ট্রুম্যান, আমি বিদায় নেবার আগে এই বিখ্যাত মাঠের ইতিহাসে নিজ নাম লিখে যাবই।"

বিরাট এক বুট-পায়ে বড় ক্রিকেটে ফ্রেডি ট্রুম্যানের পদক্ষেপ। প্রথম খেলা শুরু করার কালে একবছরে যখন ৯ জোড়া জুতো ক্ষয়ে বেরিয়ে গেল, তখন ট্রুম্যানের ক্রিকেট পা থেকে মাথায় উঠে পড়ল। সর্বনাশ! সিজনে ৯ জোড়া জুতো! এ যে সত্যই জুতো! তখন ট্রুম্যান জুতোর ডগায় ইস্পাতের চাকতি লাগিয়ে নব পাদুকার পরিকল্পনা করলেন।' এই হল ট্রুম্যানের ঐতিহাসিক অর্ডারি বুট। এই ইস্পাতে মোড়া, কাঁটায়-কাঁটায় সজারু জুতো পরে, ফাস্ট-বোলিং করার জন্য পা ঘষড়ে, টেনে, মাঠের গায়ে দগদগে ঘা করে দিয়েছেন তিনি—তারপর হাত-পা ছুঁড়েছেন ইতিহাসের গায়ে।

ধরা যাক একেবারে সূচনার দিনগুলির কথা। ট্রুম্যানের প্রধান বাসনা, জোরে বল ছুঁড়ব। বলের লেংথ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, জোর চাই, শুধু জোর। ইয়র্কশায়ারের 'জোর্জোরিতম' বোলার তাঁকে হতে হবে। অফস্পিন বল দেওয়া ছেড়েই দিলেন তার জন্য। ইয়র্কশায়ারের হয়ে খেলতে গেছেন ফেনারে। পারিপার্শ্বিকের নিসর্গবৈচিত্র্যে ফেনার-মাঠ অতুলনীয়। কিন্তু ট্রুম্যান বললেন :

"আমি নিসর্গ-সৌন্দর্য নিয়ে ব্যস্ত হলাম না। পিচ দেখতেই আমার আগ্রহ। ভালো মার্কা তুলতে আমি বদ্ধপরিকর। সকলেই পরে বলল, আমি নাকি ভালো খেলেছি। কিন্তু ৭২ রানে ২ উইকেট এবং ২২ রানে ১ উইকেট কী এমন আহামরি ব্যাপার! ওর জোরে তো কালের ইতিহাসে ট্রুম্যান-নাম ক্ষোদিত হবে না।"

বাবারে! ছোকরা মহাকালের কমে কথা কয় না! শুরু থেকেই সেঞ্চুরি-ক্যালেন্ডার কিনেছে, কিংবা আরও লম্বা পাঁজি? এমন ব্যক্তি, বলাই বাহুল্য, বল ও মুখ দুইই ছোটাবেন টপ-স্পীডে, এবং হাত ও মুখ দু'জায়গা থেকেই তাঁর বাম্‌পার বেরুবে। ট্রুম্যানরা ১৯৫৯-৬০ সালে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ ট্যুরে গিয়ে একটা গানের পার্টি তৈরী করেছিলেন। সদস্য ছিলেন গ্রীনহাউ, পুলার ও ট্রুম্যান। যেসব মধুররসের গান গাইতেন, তার একটা দুটো এমন চড়া-মধুর যে, 'শুনলে লেডি চ্যাটার্লির লাভারের প্রেমিকেরাও চমকে যাবে'—ট্রুম্যান জানিয়েছেন।

তাই বলে শ্রীযুক্ত ট্রুম্যান সর্বসময়ে উদ্ধত নন। বিনয় গুণও তিনি প্র্যাকটিশ করেন। তেমন বিনয়-স্পিনের একটা চেহারা দেখুন। ট্রুম্যান নিজকালের খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি বিশ্ব-একাদশ তৈরী করে তার থেকে বাদ দিয়েছেন একটি নাম—ফ্রেডি ট্রুম্যান!!—

"সেরা যে-ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে আমি বল করেছি সেই লেন হাটন এবং অস্ট্রেলিয়ার আর্থার মোরিস আমার দলের দুই ওপেনার। তারপরেই নামবেন পিটার মে। তারপরে আসবেন আনন্দময় ডেনিস কম্পটন। তারপরে কিথ মিলার—পৃথিবীর সেরা অলরাউন্ডার। অতঃপর ক্লাইড ওয়ালকট এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার বাছাই দলকে ৯০০ রান তুলতে সাহায্য করবেন।

"তেজী গডফ্রে ইভান্স অবশ্যই উইকেটকীপার হবেন এবং জিম লেকার ও রিচি বেনোড ভার নেবেন স্পিন-বিভাগের। তবে ভেজা উইকেটে বেনোডের বদলে আসবেন টনি লক।

"দ্রুত বোলার? নিশ্চয়ই লিন্ডওয়াল ও স্ট্যাথাম।"

আপনারা সকলেই দেখলেন, ট্রুম্যান নামক সুবিনয়ী বালকটি কেমন নিজেকে সরিয়ে দিলেন। এই তো মহত্ত্ব, যা নিজ বাঞ্ছিতার কাছে বয়ে নিয়ে যায় বন্ধুর প্রেমপত্র। সকলে কি আর মুজতবা আলীর সেই বদস্বভাব ছোঁড়াটার মতো, কাটলেট ভাগ করবার সময়ে যে হতভাগা নিজের পাতে বড় কাটলেট রেখে বন্ধুকে দিয়েছিল ছোটটি? তাতে অপর বন্ধু যখন বেজায় চটে গেল, তখন ডিস্ট্রিবিউটার শুধোল, তুই হ'লে কি করতিস?—আমি? আমি নিজের জন্য ছোটটা রেখে বড়টা তোকে দিতাম।—তাই তো পেয়েছিস, তবে মেলা ফ্যাচ-ফ্যাচ করছিস কেন?

ট্রুম্যান সে-রকম নন, কদাপি নন। সম্পদের দিনে তিনি দূরে সরে থাকেন, এগিয়ে আসেন শুধু বিপদে বুক দিতে। তিনি ঐ দলে খেলতে নামবেন, এক-মাত্র যদি...তাঁর কথা মুখেই শোনা যাক—

"ইতিহাসের যে-কোনো দলকে আমার এই দলের পরাভূত করার সামর্থ্য সম্বন্ধে যদি কারো সন্দেহ থাকে, তাহলে অনিচ্ছায় আমাকে এই দলের সঙ্গে

যুক্ত হতে হবে ব্যাপারটাকে সন্দেহমুক্ত করতে।”

ওঁ মধু!

ট্রুম্যানের একটি অনবদ্য রচনা আছে নিজ মেজাজ এবং ফাস্টবোলিংয়ের মেজাজ সম্বন্ধে। লেখাটি ট্রুম্যানকে খুলে ধরেছে গোটাগুটি। কোলিয়ারির কয়লাঠেলা হাতে (তার জন্য ট্রুম্যান লজ্জিত নন) ট্রুম্যান অনেক বল ঠেলেছেন, কিন্তু সেই হাতেই যে কলম ঠেলা যায় এমনভাবে, কে জানত? মোটামুটি লেখাটিকে হাজির করছি। এর মধ্য থেকে ট্রুম্যানের নিজের হাতের লেখা যদি নাও পাওয়া যায়, মনের লেখা পাওয়া যাবে নিঃসংশয়ে। ট্রুম্যান লিখছেন :

যে-সব অস্ট্রেলিয়ান, ওয়েস্ট-ইন্ডিয়ান, সারে-বাসী ইংরেজ বা অন্য কেউ—যারা ক্রিকেটের বিজয়ী ভূখণ্ড ইয়র্কশায়ারের বাইরে জন্মানোর দুর্ভাগ্য অর্জন করেছে—তাদের আমি সত্যসত্যই ঘৃণা করি না।' অন্যপক্ষে আমি, যে-আমি উদারহৃদয় এবং উদারকণ্ঠ, তাদের আশীর্বাদ করি, বেঁটে মোটা ঢ্যাঙা রোগা, তারা যেমনই হোক না কেন।

কেবল...যখন ঐ সব মনিষ্যিগুলি প্যাড বেঁধে, প্যাণ্ট চড়িয়ে, ব্যাট হাতে, আত্মরক্ষার ইচ্ছা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন রক্ত চড়ে যায় মাথায়। তখন—উঃ—যদি পারি ওদের উড়িয়ে গেঁথে দিই স্ক্রিনের উপরে।'

হাঁ, একথা নিশ্চয়ই ঠিক, আমি ব্যাটসম্যানকে ঘৃণা করি। তাদের যে-চেহারাটি আমার একমাত্র ভালো লাগে, তা হল, তাদের পেছনের চেহারা—ছরকুটে-যাওয়া উইকেট ছেড়ে প্যাভিলিয়নমুখো যখন তারা।

যতই'যা হোক, আমি হলুম গিয়ে ফাস্টবোলার—আর আমার বিশ্বাস, রীতি-মতো ভালো ফাস্টবোলার। আমি দাঁড়াবো কোথায় যদি আমি ব্যাটসম্যান-জাতিকে শত্রু বলে বিবেচনা না করি?

সেইজন্যই মনে হয়, সকলে আমাকে আগুনে ট্রুম্যান বলে। আমার মেজাজ যে চড়া, সেকথা স্বীকার করছি।' মেজাজ গরম না হলে ফাস্টবোলার হিসেবে আমি কোনো কাজেই লাগতুম না—কি, ঠিক নয়? ব্যক্তিগত ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার এতে নেই। আমার সামনে যদি ব্যাট ধরে আমার পরম বন্ধুও দাঁড়ায়, তাকে হটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

আরও কথা, আমি শুধু জিতেই খুশি নই, যত বেশি ব্যবধানে সম্ভব জিততে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যত দ্রুত সম্ভব জয় চাই—চাইই—আমার স্বভাব তাই চায়। জিনিসটাকে আমার চোখে দেখুন দিকি : যদি দু'দিনে খেলা শেষ করে দিতে পারি, তাহলে পরের খেলা শুরুর আগে একদিন জিরোতে সময় পাই।' তোফা! তার থেকেও বড় কথা, একশোর মধ্যে যদি নামিয়ে দিতে পারি, তাহলে তাদের মনোবলকে এমনভাবে থেঁতলে দেব যে, পরের বার বাছাধনরা আমার সামনে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ করবে।

শত্রুনাশ—আমার সর্বসময়ের ব্রত।

ইংরেজি বাবু-ক্রিকেটের দিন গেছে—সেই 'হাঁ মশায়', 'না মশায়', 'কি আনন্দ, তিনটি উইকেট পেয়েছি, আমার ব্যাগ ভর্তি'—সে-সব দিন আর নেই। নিয়ম রক্ষা করে যেভাবে হোক জিততে হবে—সাফ কথা।

ব্যাটসম্যান যখন উইকেটের দিকে হেঁটে যায়, আমি তার মন বুঝবার চেষ্টা করি। ব্যাটসম্যান কী ভাবছে? ভাবছে কি: ট্রুম্যান বোলার! ওরে বাপ্‌রে, ও গতবার আমাকে নিয়েছিল! উইকেটে দাঁড়ালে ও কী বল ছাড়বে? লেংথের বল, না ইয়র্কার? না কি কানছোঁয়া বাম্‌পার?

যদি দেখি নার্ভাস-ভাব, সঙ্গে-সঙ্গে তাকে গায়ে-পড়া ফিল্ডার দিয়ে ঘিরিয়ে দিই। তাকে নিতেই হবে—এখনি—যে-পর্যন্ত পারছি না, সময়টা অসহ্য কাটে।

আমি স্টাম্পের উপরই বল ফেলি, কারণ স্টাম্প উড়ে গেলে আম্পায়ারের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয় না। আম্পায়ারও ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচেন। বোল্ড-আউট—বক্সিং-এর নকআউটের মতো—হাতে-হাতে ফল।

বাম্‌পার ছাড়তে শুরু করলেই দর্শক ব্যারাকিং শুরু করে। কেয়ার করি না। ওরা নগদ তিন টাকা দিয়ে টিকেট কেটে ঢুকেছে—চেঁচাবার ওদের ন্যায্য অধিকার। ওরা চেঁচাক আর যাই করুক, আমার কাজ আমি করি।

বাম্‌পার আমার মতে, ফাস্টবোলারদের ন্যায্য অস্ত্র। ভালো উইকেটেও ব্যাটসম্যানকে তা নাড়িয়ে দিতে পারে। দরকার হলেই বাম্‌পার ছাড়ি। আইন মেনে লড়ে যাও--আইনকে টেনে বাড়াও যতখানি পারো--এই আমার নীতি।

তাই বলে আমি খুনে নই। খারাপ উইকেটে আমি বাম্‌পার দিই না। একথা জানি, ও অবস্থায় বাম্‌পার দিলে আমারি মতো একজন খেলোয়াড় আহত হবে।

সকলে যেন দয়া করে স্মরণে রাখেন--ক্রিকেট খেলাটা ব্যাটসম্যানদের মতো করে তৈরী। বোলারদের যত যন্ত্রণা। ধরুন না কেন, ডেলিভারির ব্যাপারে আমাদের এত বেশি জিনিস খেয়াল রাখতে হয় যে, যেন আমরা আম্পায়ারকে খুশি করে মোটর-ড্রাইভিং লাইসেন্স যোগাড় করতে গিয়েছি।

হয়ত আমি কটমট করে একটু বেশিই তাকাই—বল যখন উইকেট ছুঁয়েও ছোঁয় না। কি করব, না করে পারি না। ওয়েস্ট-ইন্ডিজের কোলি স্মিথকে একবার বলের পর বলে হারালাম—কিন্তু বরাত বটে, সে ১৬০ রান করে বেরিয়ে গেল। কোলিকে শুধালাম—'বৎস, পরের খেলা কোথায় তোমার?'—'আয়ার্ল্যান্ডে।' 'তোমার ভাগ্য যেমন সরেস দেখছি, তাতে আয়ার্ল্যান্ড যেতে হেঁটেই সমুদ্র পার হয়ো, স্টিমার লাগবে না।'

লোকে বলে যে, বেশি দূর থেকে ছুটে এসে বল দেবার জন্য আমি সময় নষ্ট করি। কিন্তু আজকাল তো তের পায়ের বেশি দূরে যাই না। আর সেটা যাওয়া দরকার হয়ই, শেষ তিন গজে আমার চরম গতি আনবার জন্য।

বিশ্বাস করুন, দরকার না থাকলে এক ইঞ্চিও বেশি ছুটব না। দিনে হয়ত পঁচিশ ওভার বল দিতে হল আমাকে। কষে দেখুন, আমাকে প্রায় তিন মাইল ছুটতে হল বল দিতে, এবং ছোটা শুরুর জায়গায় পেঁছতে—হাঁটতে হল ঐ তিন মাইলই। ওটা মজা করবার জন্য আমি করি না।

মাঠের বাইরেও আমি নাকি মাঠের শত্রুতা বয়ে নিয়ে যাই। যদি সেটা সত্যই সত্য হয়, তাহলে আমি দোষী। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আমার সোজা কথাবার্তাকে লোকে ভুল বোঝে? ইয়র্কশায়ারে ঐ ধরনের কথা বলতেই আমরা অভ্যস্ত।

আমি মেনে নিচ্ছি অবশ্য, আমি কখনো-কখনো বদমেজাজী, মুখখোলা, দম্ভী বা চোয়াড়ে মানুষ, কিন্তু অধিকাংশ লোকের সঙ্গে আমি অধিকাংশ-ক্ষেত্রে ভালভাবে চালিয়েও নিই।

আমাদের ইয়র্কশায়ারে যদি দু'জন পরস্পর মধু ঢেলে কথা কয় তাহলে তারা পরস্পর মহাশত্রু। আমাদের সেরা বন্ধুর জন্য আমরা সেরা লাঞ্ছনা জমিয়ে রাখি এবং সেটা দেওয়া-নেওয়া করে সুখ পাই।

আপনারা ভাবেন, যখন আমি ইংলণ্ড-দলে জায়গা পেয়েছি তখন বাবু-ইংরেজদের মতো বি-বি-সি উচ্চারণে কথা বলতে চেষ্টা করা আমার উচিত। ঠিক--কিন্তু তা অসম্ভব—অ-স-ম্ভ-ব—আমি দুঃখিত। আমার আচার-আচরণ যে-কোনো লোকের মতোই ভালো, কিন্তু আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ, আমি আমার দেশের উচ্চারণই চালিয়ে যাব—এবং প্রাণ যা চায়, তা খুলেই বলব।

পোজ্ মারছি--ভাবলেই গা ঘিন্ ঘিন্ করে। সেই ছোঁড়ার মতো হবে৷ নাকি —টেস্ট-ক্যাপ যার মাথা ফুঁড়ে একেবারে মগজের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল—সে সইভ্য বাতচিত্ করতে শুরু করেছিল, মাথা ঠাণ্ডা হবার আগেই? সকালে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল--'হের হের, মুষুলধারে বর্ষাতি!'

'তার মানে মুষলধারে বর্ষণ বলতে চাইছ?'—তার রুমমেট জিজ্ঞাসা করল।

"আমি বিশুদ্ধু উশ্চারণই করছি'--ছোকরা গরম হয়ে বলল।

আমি মুখ খারাপ করি? ইয়র্কশায়ারে কয়েক বছর আগে 'মুখ খারাপ বাক্স' টাঙানো হয়েছিল। ভাষার জোর অনুযায়ী ফাইনের পরিমাণ কমত বাড়ত। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না জানি, কিন্তু দিব্যি গেলে বলছি—আমার পয়সা ঐ বাক্সে পড়বার আগে সিজন্ প্রায় কেটে গিয়েছিল।

শুধু একবার মাঠে মুখ ছুটিয়েছিলুম—জেণ্টলম্যান ও 'প্লেয়ার্সে'র' খেলার সময়ে। কলিন স্মিথ 'ফাস্টবোলার ইউনিয়নের নিয়ম ভেঙে ওভারে তিনটি বাম্পার ঠুকে আমার ধড় থেকে মুণ্ডু প্রায় খসিয়ে দিয়েছিল! তার সম্বন্ধে আমার মনোভাব আমি মুখ খুলেই প্রকাশ করেছিলাম। তারপরেই থমকে লজ্জা পেয়েছিলাম, কারণ রেভারেণ্ড ডেভিড শেফার্ড এমন কাছে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করছিলেন যে, প্রতিটি কথা তাঁর কানে যাবেই। আমি বললাম—'রেভারেণ্ড, কথাগুলো বলার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু শা—কথাগুলো ভুল নয়।'

পৃথিবীর সেরা ক্লাব ইয়র্কশায়ার।...এর বাইরে যারা আছে তাদের জন্য আমার করুণা হয়। আমাকে জগতের অনেক বিশেষজ্ঞ পৃথিবীর সেরা বোলারদের অন্যতম বলবার মতো মহানুভবতা দেখিয়েছেন, তা আমি জানি, কিন্তু আমার নিজের পাড়ার আমি 'একটা ছোঁড়া যার অনেক কিছু শেখার আছে' ছাড়া কিছু নেই। যে-পর্যন্ত না আমাকে বাক্সবন্দী করে অন্তত বছর-পঁচিশ ধোয়ামোছা করা হচ্ছে, ততদিন কোনো ইয়র্কশায়ারের অধিবাসী জর্জ হার্স্ট বা উইলফ্রেড রোডসের সঙ্গে আমার নাম একত্রে উচ্চারণ করবে না। আর বিচিত্রতম বস্তু হল, তা করলে সেটা আমার কাছেও মহাপাতক বলে মনে হবে।

ট্রুম্যানের সাচ্চা কথাগুলো তুলে ধরলাম। জাত ফাস্টবোলারের সমস্ত কুল-লক্ষণ আমরা তার লেখা থেকে পেয়ে গেলাম। আদিম-মানবের আত্মকথা যেমন অকৃত্রিম-মানবের চরিতকথা, তেমনি ট্রুম্যানের আত্মকথাও আসল ফাস্টবোলারদের মনের কথা। মনের এমন চেহারা নিয়েই ট্রুম্যান মাঠে অবতীর্ণ। ত্রাসের বিষয়, টেস্টে তাঁর প্রথম চাঁদমারি ছিল ভারতচন্দ্র! নয়া মেডিকেল স্টুডেণ্টরা নাকি লাউয়ে ছুঁচ ফুটিয়ে বাড়িতে ইনজেকসন দেওয়া প্র্যাকটিশ করে। ভারতের সহিষ্ণু গায়ে বল ছুঁড়ে অনেক বোলারই তৈরী হল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। বেডসার, লক, ট্রুম্যান, টোসাক, কত নাম করব? এখন ট্রুম্যান-ইতিকথায় নিবদ্ধ থাকা যাক।

ট্রুম্যান শব্দটা সেই ১৯৫২ সাল থেকেই আমাদের মনে গেঁথে আছে। ভারতীয় দল বড্ড ভরসা কুড়িয়ে সমুদ্রপাড়ি দিয়েছিল। কিছু একটা করে ফেলবে-ফেলবে ভাব। হঠাৎ ভারতবাসী চমকিত হয়ে শুনল—ট্রুম্যান নামক ক্লাইভের এক উত্তরাধিকারী নিজের দেশে (যেহেতু ভারত তখন স্বাধীন) কচি-কচি সিরাজদৌলাকে ধরে ড্যাং-ড্যাং করে মহা-বলে কাটছে। তখন থেকে ট্রুম্যান নামটা আমাদের জানা।

মুরগীর হাড় চিবিয়ে মজ্জাটা পরম সুখে টেনে নিয়ে যেমন আরাম করে কেউ বলে—'আঃ মুরগীটা বেশ কচি ছিল'—ঠিক তেমনিভাবেই শ্রীমান ট্রুম্যান ভোজনান্তে কিছু আহার্যবিবরণ দিয়েছেন। ইতিহাসের প্রয়োজনে আমি কিছু বিস্তৃতভাবে সেই বিবরণকে উপস্থিত করছি:

জুন মাসে (১৯৫২) বড় ধরনের থ্রিল: রেডিওতে শুনলাম, আমি আমার জীবনের প্রথম টেস্ট খেলব হেডিংলিতে, ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট।

অবশ্য নিজ মুখে বলা উচিত নয়, তবু না বলেও পারছি না—এই নির্বাচনে বুদ্ধির ছাপ ছিল, কারণ ফাস্টবোলারদের মধ্যে তখন আমিই ফর্মে আছি। মরশুমের প্রথম তিন ম্যাচে আমি ১১টি উইকেট নিয়েছি।

আমার সহযোগী খেলোয়াড় লেন হাটন অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন। দলে আমিই একমাত্র টেস্টে আনকোরা।...

'ইণ্ডিয়ানওয়ালাদে'র আমি সোজা করে দিয়েছিলাম। আমি যখন শেষপর্যন্ত তাঁদের ছেড়ে দিলাম, তখন তাদের কোঁচকানো চুল একেবারে খাঁড়া দাঁড়িয়ে।...

হেডিংলিতে প্রথম টেস্টের আরম্ভে ইংলণ্ড যখন ফিল্ডিং করতে নামল তখন আকাশ কিছু ঘোলাটে। আমাকে তৎক্ষণাৎ বেডসারের সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু অল্পস্থায়ী প্রথম দফায় আমি পিচ থেকে বিশেষ কিছু আদায় করতে পারলাম না।

প্রথমদিনের প্রধান গৌরব বোম্বাইয়ের ২১ বছরের ছাত্র মঞ্জরেকরের। দলের সর্বকনিষ্ঠ মঞ্জরেকর এদেশে প্রথম টেস্ট খেলছিলেন। রায়, গায়কোয়াড় ও উমরিগর ৪২ রানে পড়ে যাবার পরে হাজারের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে মঞ্জরেকর করলেন ২২২ রান—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের যে-কোনো উইকেটের রেকর্ড। কিন্তু ঠিক ৬টার সময়, চতুর্থ উইকেট জুটি যখন সাড়ে চার ঘণ্টা ব্যাট করেছে, তখন হাজারে ধরা পড়লেন বেডসারের বলে, উইকেটকীপার গডফ্রে ইভান্সের

হাতে। ভারতের রান তখন ২৬৪।

তখনই অকুস্থলে আবির্ভূত হলুম আমি। সারাদিন আমি রগড়েছি যদি পিচ কিছু গরম হয়, স্কিপার আমাকে প্রচুর সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু ঘুঁটি চিত হয়নি। এবার সুযোগ এলো আমার, প্রথমদিনের শেষে প্রয়োজনীয় ক্ষণে মাঠ হয়ে উঠল উর্বরা।'

তিন বলে দুটো উইকেট খেঁচে নিলাম। তার মধ্যে একটা মঞ্জরেকরের। আগেই অবশ্য মঞ্জরেকর তাঁর প্রথম টেস্টসেঞ্চুরি হাতিয়ে নিয়েছেন। তাঁকে স্লিপে একেবারে নীচু থেকে তুলে নিলেন অদ্ভুতভাবে ওয়াটকিন্স। দু'বল পরে গোপীনাথ একটা বল টেনে নিলেন উইকেটে, যাতে বেল পড়ে গেল।' ভারত দিনের শেষে করল ৬—২৭২। দলের ও নিজের অবস্থা সম্বন্ধে মনের ফুর্তি নিয়ে হ্যারোগেটে ফিরলাম আমি।...

১৯৫২ সালের ৭ই জুন, শনিবার, আমার টেস্ট-ক্রিকেট-ক্যালেন্ডারের লাল দিন। টেস্ট-ইতিহাসে ও-ব্যাপারটা এমন মোটা টাইপে লেখা হয়েছে যে, ও-নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করলেও চলবে—ঐ যে ব্যাপারটা : দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের প্রথম চারটে উইকেট পড়ে গিয়েছিল বিনা রানে। শুনেছি, লন্ডনের এক সংবাদ-পত্রের অফিস বিশ্বাসই করতে চায়নি তাদের কাছে নির্ভুল স্কোর পাঠানো হয়েছে। তারা তক্ষুণি তাদের প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করে পাঠাল, এমন ইয়ার্কির মানে কি? কেন সে উল্টোভাবে স্কোর লিখে পাঠিয়েছে? সংবাদপত্রের অফিস ভেবেছিল, ভারত নিশ্চয় ৪ রান করেছে বিনা উইকেটে!

আমার ফুর্তির কারণ, এই উত্তেজনাকর সকালে প্রথম চারটে উইকেটের তিনটেই আমার। মন্ত্রী ও মঞ্জরেকরকে পরপর দু' বলে নিলাম। তখন স্কিপার উইকেটের পিছনে আটজন ফিল্ডারকে টেনে গুটিয়ে আনলেন। আর আমি? আমি কি ইতিহাস সৃষ্টি করব আমার প্রথম টেস্টে হ্যাটট্রিক করে? হায়, আমার স্বপ্ন চূর্ণ করে দিলেন হাজারে।' তবে দিনের শেষে দেখা গেল আমি ২৭ রানে ৪ উইকেট হাতিয়েছি মাত্র ৯ ওভার বল করে।...

ইংলন্ড ভারতকে হারাল ৭ উইকেটে। শূন্যরানে ভারতের প্রথম চার উইকেটের তিনটে আমার শিকার হয়েছিল বলে লেন হাটন বললেন ঐ মারাত্মক বলটি টেস্ট-স্মারকরূপে আমাকে উপহার দেন।...

[দ্বিতীয় টেস্টে] বেডসার ও আমাকে মানকদের বিরুদ্ধে শুরুতে বল করতে দেওয়া হল।' মানকদ যে পৃথিবীর সেরা অলরাউন্ডারদের মধ্যে পড়েন, তার বিষয়ে যদি কেউ প্রমাণ চায়, এই খেলাটিতেই তা মিলবে। সবরকম মারই তাঁর হাত-ধরা। বাঘের মতো হাঁকিয়েই, একই নিঃশ্বাসে পরের বলে আলতো ছুঁয়ে লেটকাট। বোর্ডে কুড়িও ওঠেনি, তখন জেনকিনসের প্রথম ওভারেই লাফিয়ে উঠে বল উড়িয়ে দিলেন স্ক্রিনের উপর দিয়ে। দর্শকের বুক ধক্ করে উঠল, তারপরেই বেজায় উল্লাস। আর জেনকিনসের মুখের ভাব—সে যেন এ পৃথিবীর নয়!

খেলার গোড়ার দিকে ঠিক জায়গায় বল ফেলতে পারছিলাম না, তার গোটা সুবিধে ভিনু আদায় করে নিলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত আমিই তাঁর উইকেট নিয়েছিলাম, সেই আমার তৃপ্তি, যখন ওয়াটকিন্স ফাইনলেগে 'চার পা' তুলে

চিত হয়ে ভিনুর ক্যাচ ধরে নিলেন। আমার বোলিং-এর তৃতীয় দফাতেই আমার হাত খুলেছিল, আর ভারতের বরাতও বদলে গিয়েছিল।' তার আগে ভিনু প্রথম উইকেটে ১০৬ রানের মধ্যে ৭২ রান করেছেন। এই দফে আমি ৫.৪ ওভারে, ৪ রানে, ২ উইকেট নিলাম। দিন শেষ করলাম ৪-৭২। আমি সোজা স্টাম্প ভেঙে দিয়ে দিলাম উমরিগর, রামচাঁদ ও মন্ত্রীর।'

ভারত ২৩৫ রানে আউট হয়ে গেলে, ইংলন্ডের সূচনা-জুটি হাটন ও সিম্পসন প্রথমদিনের শেষপর্যায় কাটিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করলেন। ইংলন্ডের প্রথম পেশাদার অধিনায়ক লেন হাটনের পক্ষে দ্বিতীয় দিনটি অন্তত মহাদিন, যদি একে মহানতম না বলা হয়--কারণ এই দিন তিনি গৌরবের সঙ্গে হেড-কোয়ার্টারের সামনে খেলা দেখিয়েছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় উইকেটে হাটন সেঞ্চুরি জুটিতে অংশ নিলেন (সিম্পসনের সঙ্গে ১০৬, পিটার মে'র সঙ্গে ১৫৬) ; ভিনু মানকদের বাঁ হাতের ধীর চাতুরীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর লড়াই চলল। ভিনু অফে আত্মরক্ষামূলক ফিল্ডিং সাজিয়ে, কাছে ও দূরে দুসারি ফিল্ডার রেখে, অফস্টাম্পের ঠিক বাইরে বল ফেলে যেতে লাগলেন সমস্ত সময়।'

মানকদের ধৈর্য অবিশ্বাস্য। ব্যাটসম্যান কখন ভুল করবে, তার জন্য অপেক্ষা, ঠিকভাবে বলতে গেলে, প্রতীক্ষা করে যেতে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু তাঁর সেই প্রতীক্ষাকালের মধ্যে ব্যাটসম্যানের পক্ষে দুসারি ফিল্ডারকে ভেদ করাও কঠিন। হাঁ একথা আমি মানবই, সেদিন হাটনের সঙ্গে মানকদের ডুয়েল আমার দেখা এ জাতীয় ডুয়েলের মধ্যে সেরা।...

তৃতীয় দিনে আমাদের পক্ষে অবস্থার প্রভূত উন্নতি হল ইভান্সের সেঞ্চুরিতে।' সাড়ে তিরিশ হাজার দর্শক তাঁর ব্যক্তিত্বময় খেলা প্রতি মুহূর্তে আস্বাদন করল। স্ফূর্তিবাজ ইভান্স তখন চরম স্ফূর্তির মেজাজে। আমরা যারা সেই মাতনে মেতে উঠেছিলাম, আমাদের আশা হচ্ছিল লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি হয়ে যাবে। সেঞ্চুরি হতে আর মাত্র দু'রান বাকি---আম্পায়ার ফ্রাঙ্ক চেস্টার ঘড়ি দেখে বেলের উপর হাত চাপা দিলেন। চেস্টার নিজের কাজ ঠিকই করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয়রা ফিল্ডিং সাজানোর ব্যাপারে অত্যন্ত গড়িমসি করেছিল। একটু হাত পা চালালে আরও একটা ওভার খেলা হতে পারত।

উত্তেজনা বাড়াবার জন্য আমি ইনিংস সমাপ্ত করলুম মানকদের বলে সোজা ৬-এর বাড়ি লাগিয়ে। ইংলন্ডের মোট রান হল ৫৩৭। নিশ্চয়ই এই দিনটি মানকদের কাছে বছরের দীর্ঘতম দিন বোধ হয়েছিল---আর সত্যই সেটি বৎসরের দীর্ঘতম দিন---২১শে জুন, ১৯৫২---কিন্তু বিশেষভাবে মানকদের জন্যই তা দীর্ঘতম কারণ ৭৩ ওভার বল করার পরে তাঁকে ভারতের ইনিংস শুরু করতে ব্যাট হাতে নামতে হল---দিনের শেষে অপরাজিত অবস্থায় যখন প্যাভিলিয়নে ফিরলেন তখন সেঞ্চুরি পুরোতে তাঁর মাত্র ১৪ রান বাকি। আর এ কথা কেউ যেন না ভোলেন---তিনি প্রথম ইনিংসে ৭২ রান করেছিলেন।

এই টেস্টের শেষপর্যন্ত মানকদ 'শয়তানী' করলেন। তাঁর জন্যই খেলাটি শেষদিন অবধি গড়াল। শেষদিনে ইংলন্ডের দরকার ৩৭ রান জয়ের জন্য, হাতে উইকেট আছে ৯টি। মানকদের দান এই টেস্টে আকাশছোঁয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে

সাড়ে চার ঘণ্টা ব্যাট করে করেছিলেন ১৮৪। এই রান টেস্টে ভারতীয়দের সর্বোচ্চ রানসংখ্যা। ইংলণ্ড যদিও সহজেই আট উইকেটে জিতল, কিন্তু শেষ অবধি সংগ্রামের প্রেরণা মানকদ স্বদলে সঞ্চারিত করেছিলেন।

আমার পক্ষেও এটি আর একটি স্মরণীয় ম্যাচ। প্রথম দু' টেস্টে আমি উইকেট নিয়েছি ১৫টি। খেলার শেষদিনে স্কিপার আমাকে রাণী এলিজাবেথের (যিনি এখন রাণীমাতা) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মনে পড়ছে, তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কতদিন ক্রিকেট খেলছি? আমি নিজের মনেই ভাবলুম: 'অ্যাঁ—আ।—! ওহে ফ্রেড ট্রুম্যান, তুমি কোথায় এখন? কোলিয়ারী কুলির পোলা, তুমি এখন দাঁড়িয়ে বাত্‌চিত্ করছ ইংলণ্ডের রাণীর সঙ্গে, যেন সেটা তোমার রোজকার ডাল-ভাতের ব্যাপার—বাঃ বাঃ!' বলাবাহুল্য এই ব্যাপারটা আমার ছাতির মাপ ইঞ্চিখানেক বাড়িয়ে দিয়েছিল।...

[তৃতীয় টেস্টের] প্রথম দিন ড্রেসিংরুম থেকে খেলা দেখে কাটল। বৃষ্টি খেলার ঘণ্টা-দুই সময় কেটে নিল এবং মন্দ আলোর জন্য ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে বাধা পড়তে লাগল বারবার। লেন হাটন ইংলণ্ডকে প্রথম পর্যায়ে যথেষ্ট শক্তি দিলেন, যদিও তাঁর অপরাজিত ৮৫ রানের জন্য ব্যাটিংয়ের সাড়ে তিন ঘণ্টা সময়ে তাঁকে পাঁচবার মাঠে যাতায়াত করতে হয়েছিল।...

দিভেচা, যিনি দ্বিতীয় দিনেও খুব ভাল বল করলেন, তিনি কিংবা বৃষ্টি কোনো-কিছুই হাটনের সেঞ্চুরি রুখতে পারল না। দ্বিতীয় দিন শেষ হল ইংলণ্ডের ৭ উইকেটে ২৯২ রানে।...

আমার জন্য বড় উত্তেজনা অপেক্ষা করছিল তৃতীয় দিনে, শনিবার ১৯শে জুলাই। নিশ্চিত এই দিনটি আমার টেস্টদিনগুলির মধ্যে পরমতম তৃপ্তির দিন, তা আমি সন্দেহ না রেখেই বলতে পারি। সেই দিনের মতো জোরে বল আর আমি কখনো করিনি। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা সেই ধরনের গতি একেবারেই পছন্দ করছিল না, বিশেষত বাউন্সারগুলো। সেই দিনের কথা ভাবলে মনে হয়, ব্যাপারটা যেন বড্ড সহজে হয়ে গিয়েছিল। সোজা উইকেটে বল চালিয়েছিলাম: ৩১ রানে ৮ উইকেট। আমি তাদের একেবারে ধুলো করে দিয়েছিলাম।

প্রথম চারটে উইকেট নিলাম ৫ রানে! এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের মধ্যে ভারত ৫৮ রানে আউট। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এই তাদের সর্বনিম্ন রান। ২৮৯ রান পিছনে থেকে তারা ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করল, এবং সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ৮২ রানে সাবাড় হয়ে গেল আবার—ইনিংস ও ২০৭ রানে পরাজয়।...

তিন টেস্টে ২৪টি উইকেট নিয়েছি আমি। এই শেষ ম্যাচ থেকে সুভেনির রূপে পেয়েছি—বল ও জোড়া বেল।...

[ওভালে চতুর্থ ও শেষ টেস্টে] ভারত আবার ফ্যাসাদে পড়ল! খেলাটি শেষপর্যন্ত পরিত্যক্ত হলেও আমাদের নৈতিক জয় হয়েছিল। ইংলণ্ড প্রথম দিনে করল ২ উইকেটে ২৬৪।

দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড ৬ উইকেটে ৩২৬ রানে ডিক্লেয়ার করলে আলেক বেডসার ও আমি ব্যাটসম্যানদের পঁচিশ মিনিটের ঠ্যালা দিলাম। ভারত প্রথম

পাঁচ উইকেট হারাল ৬ রানে, সমস্ত সিরিজ যিনি যুঝেছিলেন সেই বিজয় হাজারে না থাকলে ভারত একেবারে গুঁড়ো হয়ে যেত। দিনের শেষে দাঁড়াল : ১২৮ রান তাদের করতে হবে ফলো-অন ঠেকাতে।

বৃষ্টির জন্য তৃতীয় দিনে যে-মাত্র ৬৫ মিনিট খেলা হতে পেরেছিল, সে সময়টিও ভারতের পক্ষে আপদজনক দাঁড়িয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে একটি অসাধারণ ওভার বল আমি করেছিলাম। মাঠ নরম থাকায় আমি ভালোভাবে পা রাখতে পারছিলাম না, ফলে দৌড়ের দৈর্ঘ্য দিয়েছিলাম কমিয়ে। তাতে আমার 'অভ্যাস' নষ্ট হল এবং ফ্রাঙ্ক চেষ্টার পর-পর তিনবার নো-বল ডাকলেন। পুরো দশ মিনিট লাগল একটি ওভারে! তার মধ্যে ছিল বোল্ড হয়ে ফাদকারের বিদায় ও পরিবর্তে দিবেচার স্থানগ্রহণ, এবং ব্যাটসম্যানের সামনে দিয়ে দর্শকের হেঁটে যাওয়ার জন্য কিছু বিরতি।

খেলাটি পরিত্যক্ত হল শেষ দিনে। সাংবাদিক সম্মেলনে লেন হাটন বললেন, বছর দুয়েকের মধ্যে আমি লিন্ডওয়ালের সারিতে উঠে পড়ব। কিন্তু বর্তমানে, হাটনের মতে, আমি 'কচি ও কাঁচা।'

'কচি ও কাঁচা' যখন ফিরে গেল তার কাজে, তখন তার মনে অন্তত এই তৃপ্তি জেগে আছে যে—সে তার জীবনের প্রথম চারটি টেস্টম্যাচে ২৯টি উইকেট নিয়েছে (গড় ১৩·৩১)। সে তৃপ্ত—শুধু তাই বলেছি বুঝি? আমার মনে হচ্ছিল গোটা পৃথিবীকে আমি এক হাতে চটকাতে পারি।

ট্রুম্যানের প্রথম ভারত-দর্শনের বিবরণ একটু দীর্ঘ হল, তবু দিলাম—হত্যাকারীর জবানবন্দী হিসেবে। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে প্রবাদ আছে, মাথায় হাঁড়ি ভাসিয়ে পুকুরে ডুবে থাকত বাঙালী সন্তানেরা। ট্রুম্যানের হাঙ্গামার সময়ে বাঙালীর সাথী হয়ে বর্গীসুদ্ধ সকল ভারত-সন্তানই অনুরূপভাবে ডুবতে চেয়েছে উইকেটে। টেস্টের শক্তিপুজায় ঝটাঝট বলি সেরে মহাকর্মকার ট্রুম্যান সাহেব দুঃখ করে বলেছেন, তাড়াতাড়ি খেলা শেষ হওয়া আবার সব সময়ে ভাল নয়। একবার তো আমার তিনদিন ছুটিই কাটা গেল। প্যাভিলিয়নে ফিরে টেলিগ্রাম পেলাম এয়ারফোর্সের অফিস থেকে : খেলা শেষ, এখন আর মাঠে পড়ে থাকার দরকার নেই, কাজে জয়েন কর।

রাজকীয় বিমানবাহিনীর কর্মী ফ্রেডি ট্রুম্যান যখন ভারতীয় বাহিনীর উপর বোমাবর্ষণ করছিলেন, তখন তাঁর হাতে কোনো আয়না ছিল না। থাকলে নিজের চেহারাটা একবার দেখতে পেতেন। দেখতেন যে, ইন্টিমিডেশন তাঁর হাতের বলের চেয়ে মুখের চেহারায় কম নয়। তিনি যথার্থই 'সর্বাত্মক' ফাস্ট-বোলার।

'ম্যাদাটে' ভারতীয়রা তো ম্যাদাটে ; ষণ্ডমুণ্ডে ভোজন সমাপন করেন যাঁরা সেই স্বদেশীয় ইংরেজদের চোখে ট্রুম্যান কোন্ মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন, সে-বিষয়ে কৌতূহল থাকতে পারে পাঠকের। সে সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র চিত্র উপস্থিত করে প্রসঙ্গ শেষ করছি। মুখ-আলগা ইভান্সও বলেছেন—ট্রুম্যানের ভাষা পৃথিবীর 'অষ্টম আশ্চর্য।' ইভান্সের চোখে ১৯৫২ সালে প্রথম অবতীর্ণ ট্রুম্যানের চেহারা এই :

"আমি যতদিন বাঁচব, তার মধ্যে কোনোদিন ভুলব না—ইংলণ্ডের পক্ষে টেস্টে ট্রুম্যানের প্রথম নামার ছবিটিকে। সেটা হল ১৯৫২ সালে লীডসে, ভারতের বিরুদ্ধে।...ভারতীয়রা শূন্য রানে চার—ট্রুম্যানের বোলিংয়ে দিশাহারা। এ-জিনিস তারা কদাপি দেখেনি...সত্যি বলতে কি, আমিও না।

"সেই ট্রুম্যান—আনকোরা, অনভিজ্ঞ...আর কী তার ভাবের ঐশ্বর্যসম্ভার! আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি ছবিটা : ট্রুম্যান বল দেবার আগে পিছন ফিরে হাঁটছে আর ভারতীয়রা তার দিকে তাকিয়ে...

"বলটা তার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া মাত্র ঝাঁ-করে বলটা সে ছিনিয়ে নিল, ফিরল, পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল, আর বলটিকে প্রত্যেক পদক্ষেপে—যখন তার বাঁ পা এগিয়েছে তখন ডান দিকের স্থূল পাছায় ঘষে ঝক্‌ঝকে করছে।

"সুচ্ছন্দ, সুপরিমিত গতি। চলবার সময়ে একটু হেলে-দুলে চলে, ধনুকের মতো একটু বাঁকা তার পা, দুই পায়ের ডগে ছোঁয়াছুঁয়ি হয় কিন্তু হাঁটুতে-হাঁটুতে ঠেকে না—ঝিম্‌ধরা ভারতীয় ব্যাটসম্যান তাকিয়ে থাকে।

"অধিকাংশ ফাস্টবোলার যেখানে চুল ছোট করে ছাঁটে, সেখানে ট্রুম্যান চুল রেখেছে বড়-বড়। আঁচড়ানো অবস্থায় ভালই দেখায়। কিন্তু যখন সে ঝট্ করে ঘুরে রান নিতে শুরু করে—লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে...

"ঐদিন তেতে-মেতে ওঠার পরে তাকে ঠিক দেখাচ্ছিল মুখে ফেনাঝরা ঘোড়ার মতো—তার ঝাঁকড়া কালো চুল হিংস্রভাবে ঝুলে পড়েছিল মুখের উপর -সেগুলো দুলছিল আঁকাবাঁকা হয়ে। দেখে মনে হল, আর কিছু না হোক, ফ্রেডির এই চেহারাটাই অসহ্য রকম ভীতিপ্রদ ভারতীয়দের পক্ষে।"

শুধু ভারতীয়দের পক্ষে?

* * * ক্রিকেটের পুরোহিত * * *

আগুনের ভাঁটার মতো চোখ করে ট্রুম্যান আম্পায়ার টেড ওয়াইকসের দিকে তাকালেন—তারপর চটাপট উরু চাপড়ালেন—তার দ্বারা ব্যাপারটা ঠিক কি হয়েছে সে-সম্বন্ধে নিজের ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন—বিচারক ও দর্শক দু'-পক্ষের কাছেই। ট্রুম্যান জানাতে চাইলেন—যে-বলটা উইকেটকীপার ধরেছে ক্যাচরূপে, সেটা গেছে তাঁর উরু থেকে—ব্যাট থেকে নয়।

১৯৬২ সালে ব্রিসবেনে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিন। আম্পায়ার টেড ওয়াইকস ইংলণ্ডের ট্রুম্যানকে কট-বিহাইণ্ড আউট দিয়েছিলেন।

দু'বছর আগে ১৯৬০ সালে ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্টইণ্ডিজের মধ্যে "পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ টেস্টম্যাচ" হয়েছিল। এই খেলাটি ঐ মাঠে তার পরবর্তী টেস্টম্যাচ। অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্টইণ্ডিজের খেলা অভাবনীয় 'টাই'-এ সমাপ্ত হয়েছিল—ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার খেলার পরিণতি মোটামুটি ড্র। সেটা বোধহয় চাঞ্চল্যপিয়াসী ট্রুম্যানের সহ্য হচ্ছিল না। আম্পায়ারকে চোখের আগুনে পুড়িয়ে, দর্শকদের উরু দর্শন করিয়ে, এবং পরদিন প্রভাতে আম্পায়ারের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, ক্রিকেটের 'ক্যারেকটার' ট্রুম্যান খেলার আকর্ষণীয়তা

বাড়াতে যথাসাধ্য করলেন—বাম্‌পার, বীমারাদি তো ছিলই।

খেলার ক্যারেকটার কিন্তু দুর্বিনীত ট্রুম্যানই—অপমানিত আম্পায়ার ডেভ ওয়াইকস্‌ নন। ট্রুম্যানের চোখরাঙানি এবং তড়পানি ভদ্রসীমা লঙ্ঘন না করলে আমরা ঐ খেলায় আম্পায়ারের নামও বোধহয় জানতে পারতাম না। আম্পায়াররা ক্রিকেটের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অথচ অবহেলিত উপস্থিতি। নয়নের মাঝখানে ঠাঁই নিলেও নয়ন তাঁদের দেখে না। তাঁরা হলেন খেলার অ-দৃষ্ট অদৃষ্ট।

দর্শকদের কাছে আম্পায়ারের কার্যত কোনো গুরুত্ব নেই। আম্পায়ারের জন্য কেউ পয়সা খরচ করে খেলা দেখতে যায় না। ক্যাপ্টেনের টস্‌ করা থেকে খেলোয়াড়দের পা মিলিয়ে মাঠে আবির্ভাব পর্যন্ত সবকিছু সাদর অভ্যর্থনা পায়, কিন্তু আম্পায়ার মাঠে প্রবেশ করলে কোনো উত্তেজনা ঘটে না। দর্শকদের কাছে তাঁরা আর কিছু নন—আম্পায়াররা আমাকে ক্ষমা করবেন—মহিমান্বিত গ্রাউণ্ডস্‌ম্যান। মাঠের উপর রোলার ঠেলে নিয়ে যাওয়া, আর উইকেটের বেল পরিয়ে দেওয়া—দর্শকবিচারে এই দুই কাজের মধ্যে কোনো তফাত নেই।

হিন্দু বিয়েবাড়িতে পুরোহিতের ঐ একই অবস্থা। উৎসবের অগ্নিসাক্ষী ও মন্ত্রপাঠ যিনি করাচ্ছেন, তিনি কে, কি রকম দেখতে—তা কি ভাল করে চেয়ে দেখা হয়? তিনি না-এলে চেঁচামেচি, থাকলে খেয়াল নেই। কাজকর্ম মিটবার পরে ভক্তিমতী স্থূলাঙ্গী বাড়ির গৃহিণী গলায় কাপড় দিয়ে হাঁসফাঁস করে তাকে প্রণাম করেন, তিনি যদি অধিকন্তু হৃদয়বতী হন, তাহলে মিছরির জলের সঙ্গে পান্তুয়ার অর্ডার দিয়ে সোরগোল তোলেন, তারপরে জানিয়ে দেন বিগলিত শ্রদ্ধায়—'ঠাকুরমশাই তো আর কিছু খাবেন না!' এদিকে যে-সব ছেলেছোকরারা কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে পরিবেশনের হট্টগোল করেছে, কনেকে ঘুরিয়েছে সাতপাক, পাউডার-ঘষা ঘাড় উঁচু করে বরের ফ্রেন্ডরূপে বিয়ে দেখতে গিয়ে ভালো করে দেখেছে কনের ফ্রেন্ডদের—তাদের কাছে চিরকালই পুরুতব্যাটা পাজি, মেয়েদের মাথায় হাত বুলিয়ে টাকা হাতাবার যম। দয়া করে যদি তাঁরা বিবাহ-সম্পাদক আর্য ব্রাহ্মণটিকে কত ধরে দেওয়া হয়েছে খোঁজ নিতেন! আম্পায়ারের 'মাহিনা' কত খোঁজ নিয়েছেন আপনারা? হে অটোগ্রাফলুব্ধ বালক-বালিকাগণ, কতবার তোমরা ক্রিকেটের পুরোহিতের একটা হস্তাক্ষরের জন্য খাতা খুলেছ?

কেবল একটা সময়ে আম্পায়ার বড্ডই ভালো, যখন দর্শকদের ইচ্ছামতো হাউজ-দ্যাট আবেদনে সাড়া দিয়ে আম্পায়ার ঊর্ধ্ববাহু হন (ব্যাটসম্যান যদি বিপক্ষের হয়) কিংবা তাদের মৌনসম্মতির মর্যাদা রেখে কঠোর গাম্ভীর্যে প্রস্তরীভূত হয়ে থাকেন নৈতিসাধনায়। আম্পায়াররা যদি এই ধরনের কাজ করতে রাজি না হন, তখন—

প্রশ্ন—মশায়, মাঠে কোনো লোক আহত হয়েছে কি?

উত্তর—না, ও-তো আম্পায়ার!

আম্পায়ারের দুঃখ অনেকসময় চরমে পৌঁছয়। মজার গল্প করেছিলেন রাজুদা। তিনি হাওড়ার এক ফুটবল-প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠিত রেফারি। প্রতিযোগিতা খুবই তীব্র। সুতরাং খোলা মাঠের তীব্রতার ধাক্কা প্রহরাহীন

অসহায় রেফারিদের উপর প্রায়ই আছড়ায়। কয়েকটা হামলার পর নিরুপায় রেফারিরা দলবেঁধে গেলেন হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। এই ম্যাজিস্ট্রেট-মহাশয়ের খ্যাতি ছিল ন্যায়বিচারের। কাউকে পরোয়া করেন না। বিনা-টিকিটের রেলযাত্রীদের কান ধরে ওঠবোস করিয়েছিলেন। তিনি খুব সহানুভূতির সঙ্গে রেফারিদের কথা শুনলেন। তারপর বললেন, আমিও মশাই রেফারি ছিলুম। শুনে রেফারিদের উৎসাহ বেড়ে গেল। নিশ্চয় প্রার্থনা পূরণ হবে। আশান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন--'তাহলে পুলিস দিচ্ছেন!'

'পু-লি-স! পুলিস কোথায় মশাই? নটোরিয়াস হাওড়াকে সামলাতে যা পুলিস আছে তাতেই কুলোয় না।'

'অ্যাঁ—তা হলে?'

'বলছিলাম কি, কচুবন দেখে রাখবেন। আগে আমিও যখন রেফারিগিরি করতুম, কচুবন দেখে রাখিতাম।'

নিজের রসিকতায় হাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি। দুঃখের হলেও হাসি সামলাতে পারলেন না রাজুদারা।

শ্রীযুক্ত হাটনও হাসি সামলাতে পারেন নি। ১৯৫২-৫৩ সালে ইংলণ্ডের ওয়েস্টইণ্ডিজ ট্যুর! গোলমালের সীমা নেই। ওয়েস্টইণ্ডিজের 'সেরা আম্পায়ার' গ্রাউণ্ডসম্যান মেঞ্জিসকে অনেক বলে-কয়ে চতুর্থ টেস্টের সময়ে মাঠে দাঁড় করান হয়েছে। চতুর্থ দিন। হোল্ট-ম্যাকওয়াট জুটি ওয়েস্টইণ্ডিজের বিপদ কাটিয়ে তুলছিল। জুটির ৯৯ রানের মাথায় ম্যাকওয়াটকে রান-আউট দিলেন আম্পায়ার মেঞ্জিস। তখন মাঠে পড়তে শুরু করল ঝুড়ি, বোতল, লেবুর খোলা। পিটার মে মাঠের ধার থেকে মাঠের মধ্যে পালিয়ে এলেন। স্থানীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ বলল, খেলা থামাও। হঠাৎ দেখা গেল, তীরবেগে মেঞ্জিস ছুটছেন প্যাভিলিয়নের দিকে। হাটন চেঁচালেন, পাকড়াও ওকে। ওয়াটসন জেট-গতিতে দৌড়ে গিয়ে মেঞ্জিসকে বাগিয়ে ধরলেন। বৃটিশ বীরত্ব মেঞ্জিসকে সাহস দিয়ে মাঠে খাড়া রাখল। তারপর যখন খেলা শেষ—তখন, প্যাভিলিয়নের দিকে মেঞ্জিস যে-দৌড় দিলেন, তা দেখে সাদরে সমাদরে হাটন বলেছেন—ঐ দৌড়টা ম্যাকওয়াটকে ধার দিলে সে রানআউট হত না। এসব কথা 'ক্রিকেটের কুরুক্ষেত্র' রচনায় পাঠক আগেই পড়েছেন।

ক্রিকেটের আম্পায়ারদের বরাতে অবশ্য ফুটবলী ভাগ্য বেশি হয় নি। ফুটবলের ক্ষেত্রে আমি নিজে ১৯৪৮ সালে চীনাদলের অসন্তুষ্ট খেলোয়াড়কে শুয়ে পড়ে রেফারির পায়ের গোছে লাথি লাগাতে দেখেছি। শুনেছি, দক্ষিণ আমেরিকায় দর্শকআসন ও মাঠের মধ্যে পরিখা কাটা থাকে। রেফারি সেখানে রিভলবার-রেঞ্জের বাইরে থাকেন—বন্দুক ও রাইফেল নিয়ে মাঠে প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। আমার নিজের দেখা সবচেয়ে রোমাঞ্চকর রেফারি-ট্রিটমেণ্ট ঘটেছে কয়েক বছর আগে—'স্বাধীন কুস্তির' প্রদর্শনীতে। খেলার নামে অমন ছাল-ছাড়ানো বর্বরতা অল্পই দেখা যায়। যুযুধান দুই ব্যক্তিরই রক্ত ঝরতে লাগল অবিলম্বে। একজন অপরের খামচে চুল ছিঁড়ে নিলে ; অপরজন, যেহেতু তার প্রতিপক্ষ আন্দাজ করে আগেই মাথা কামিয়ে এসেছে, এখন কামড়ে ধরলে তার বুকের মাংস, তারপর দুটো আঙুল ঢুকিয়ে দিলে নাকে। তারা যখন অবিশ্বাস্য

হিংস্রতায় ঝটাপটি জড়াজড়ি করতে লাগল, তখন রেফারি, যিনি প্রাক্তন কুস্তিগীর, দুমদাম ঘুষি লাগাতে লাগলেন দুজনের মুখে। তখন একজন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল উন্মত্তের মতো, ঠিক রক্তঝরা বন্য মহিষের মূর্তি, পাশে ছিল একটি চেয়ার, সেটি তুলে নিয়ে সোজা বসিয়ে দিলে প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথায়। তার মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত ঝরতে লাগল। তারপরে ফিরেই রেফারিকে ধরে, মাথায় তুলে, ছুঁড়ে ফেলে দিল বিশ ফুট তলায় দর্শকদের মাঝখানে।'

মণ্টুর মাস্টারমশাই এসেছেন টিউশনির ইণ্টারভিউ দিতে। মণ্টুর বাবা তাঁকে জামা গেঞ্জি খোলালেন। তারপরে নাকে চশমা লাগিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বললেন—হাঁ চলবে, শরীর ভালো।

শিবরাম চক্রবর্তীর 'মণ্টুর মাস্টার' অবাক হয়ে ভাবলেন—করব তো মাস্টারি, শরীরের ভালমন্দের কি আছে!

খেলার বিচারকেরা যেন ভুলেও তেমন কথা ভাবেন না। দিনকাল ভাল নয়।

আম্পায়ারদের কথায় ফিরে যাই। আম্পায়ারদের সঙ্গে খেলোয়াড়দের নিত্য বিবাদ। ক্রিকেট 'সইভ্য' খেলা বলে মনকষাকষি, বড়জোর চোখ-রাঙারাঙিতে ব্যাপারটার সমাপ্তি হয়—ঘুষোঘুষিতে পৌঁছয় না। কিন্তু আম্পায়াররা খুশি করতে পারেন না কাউকে। পারা সম্ভব নয়। যদি কখনো দেখা যায় সবাই সন্তুষ্ট তাহলে বুঝতে হবে স্বয়ং ভগবান সাদা কোট পরে মাঠে দাঁড়িয়েছেন।' আমার প্রতি বলে উইকেট, এবং আমার হাতে ধরা আছে সেঞ্চুরি-ব্যাট—এই মানবিক দুর্বলতা যতদিন না মানব অতিক্রম করতে পারছে ততদিন সে বিচারে অসন্তুষ্ট থাকবেই। এমন যে ভারতভূমি, গণ্ডগোলের ধারেকাছে যেতে চায় না, যেখানে বিদেশী খেলোয়াড়রা সবসময় অকারণ ডাউটের 'বেনিফিট' ভোগ করে—সেই 'পরভোলানে' ভারতীয় আম্পায়ার সম্বন্ধেই কি কম নিন্দা করেছে বিদেশীরা? তাঁরা মুখ মুচকে বলেছেন—আহা, ভারতে ক্রিকেটের কত উৎসাহ, দর্শকদের মতোই আবেগে অধীর আম্পায়াররা।

১৯৩৭-৩৮ মরশুমে আজমীরে খেলছিলেন বিল এডরিচ, লর্ড টেনিসনের দলের হয়ে। দেখলেন, যখনি কোনো ভারতীয় খেলোয়াড় আউট হন, অমনি দর্শকদের মতোই আম্পায়ারও ভেঙে পড়েন। ভারতীয়দের সন্দেহ না রেখে 'চূড়ান্তভাবে' আউট করতে হচ্ছিল। চোখের জলের সঙ্গে খেলোয়াড়দের বিদায় দিচ্ছিলেন আম্পায়াররা। আর যখন কোনো ইংরেজ আউট? দু'হাত শূন্যে তুলে যে-সব আওয়াজ ছাড়েন তাঁরা, তা একইসঙ্গে আনন্দধ্বনি ও আউটের সংকেত।

লর্ড টেনিসন খেলছিলেন পিটার স্মিথের সঙ্গে। ইনি যদিও কবি-লর্ডের উত্তরাধিকারীরূপে লর্ড, তাহলেও দু'-পুরুষেই ভূমি-লর্ডের মেজাজটি আয়ত্ত করেছেন। পিটার স্মিথ একটি বল এগিয়ে খেললেন। ব্যাটে লেগে বলটি প্যাডে লাগল। ব্যাটে বল লাগার বেশ স্পষ্ট শব্দ। আম্পায়ার কিন্তু দু'ফুট লাফিয়ে আওয়াজ ছাড়ছেন—আউট! লর্ড টেনিসন স্বগতোক্তি করলেন—প্যাভিলিয়ন থেকেও তা শোনা গেল—'ওহ্ ক্রাইস্ট! লোকটা কি একই সঙ্গে কালা এবং কানা?'

নাটকীয় স্বগতোক্তির এটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। পার্শ্বস্থ অভিনেতার পক্ষে অশ্রাব্য অথচ দর্শকদের পক্ষে শ্রাব্য এই স্বগতোক্তি দেখিয়ে দিচ্ছে—এই লর্ড টেনিসন যে কবি-লর্ডের বংশধর, তা তিনি একেবারে ভুলে যান নি।

বিচারবিভাগ থেকে অনুরূপ একটিমাত্র ঘটনার কথা আমার শোনা আছে। সুবিখ্যাত কৌঁসলী বিচারকের সামনে সওয়াল করছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক-জন শুনছিলেন, দ্বিতীয়জন ঢুলছিলেন, তৃতীয়জন শুনলেও কানে শোনেন কম। কৌঁসলী আড়চোখে তাকিয়ে বক্তৃতার একই ঝোঁকে বলে গেলেল—ওয়ান শালা ক্যান নট হিয়ার, দি আদার শালা উইল নট হিয়ার।

ভারতীয় আম্পায়ারিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ কি শুধু সাহেবদের? আমাদের সমান কালো যারা, তারাও করেছে, আমাদের থেকেও কালো যারা তারাও। যেমন পাকিস্তানের জাহাঙ্গীর খান কিংবা ওয়েস্টইন্ডিজের ওয়ালকট। ওয়াল-কট ১৯৪৮-৪৯ ট্যুরের পরে, এদেশের আম্পায়ারিং সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট মন্তব্য করেছিলেন, এবং ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তানের ভারত-সফরের পরে ম্যানেজার জাহাঙ্গীর খান রিপোর্টে বলেছিলেন—ভারতে আম্পায়ারিং-এর মান নিম্ন-স্তরের, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে পক্ষপাতপূর্ণ।

বিতর্কে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। তবে ক্রিকেট-পৃথিবী জানে, অন্য বিষয়ে ওয়েস্টইন্ডিজ ও পাকিস্তানের যদি সুনাম থাকেও, আম্পায়ারিং-এ অন্তত নেই। পাকিস্তানী খেলোয়াড়দের অভিযোগের উত্তরে ভারতীয় খেলোয়াড়রা বলত—১৯৫২-৫৩ সালে পাকিস্তানের ইদ্রিস বেগের সঙ্গে কার তুলনা? ১৯৫৫-৫৬ সালে এই ইদ্রিস বেগের হাতে এম-সি-সি 'এ'-দল যে-কাজির বিচার পেয়েছিল, তাতে ক্রিকেটের বিলেতী ভদ্রতাও চিড় খেয়েছিল। উত্ত্যক্ত সাহেব-ছোকরারা একদিন ইদ্রিসকে ইলোপ করে এনে জলের টবের উপর বসিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্য ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলেছিল। তারা বলে সেটা তাদের রসিকতা, যেটা বাস্তবিক খুবই তরল ও সরল রসিকতা।

আর ওয়েস্টইন্ডিজের আম্পায়ারিং! হায়রে! বেশিদূর যাবার দরকার নেই! ভারতের গত ওয়েস্টইন্ডিজ ট্যুরই ধরা যাক। যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক ভারত হারত, কিন্তু আম্পায়ার অনেক সময়েই সময়ের পূর্বে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাটসম্যানকে প্যাভিলিয়ন-প্রান্ত দেখিয়েছেন। দৃষ্টান্তের দরকার আছে?

প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটে বল না লাগিয়ে সরদেশাই উইকেট-কীপারের হাতে কট। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে উমরিগরও তাই—সোবার্সের বল তাঁর ব্যাটে লাগেনি। আম্পায়ার মাঠে কেবল দিলেন কট-বিহাইন্ড, প্যাভি-লিয়ানে দিলেন অধিকন্তু লেগ-বিফোর। ঐ ইনিংসে দুরানীকে এল-বি দিলেন আম্পায়ার ডেভিস 'বহু চিন্তার পরে।' দ্বিতীয় ইনিংসে সোবার্সের স্টাম্পের বাইরে পড়া লেগব্রেকে লেগবিফোর হলেন মঞ্জরেকর। ঘটনা এই রকম অনেকই ঘটেছিল।

ব্রাডম্যান বলেছেন, ভালো খেলার পক্ষে ভালো আম্পায়ারিং অপরিহার্য। এবং ভালো আম্পায়ারিং হওয়া অসম্ভব খেলোয়াড়দের সহযোগিতা না থাকলে। আম্পায়ারদের সম্বন্ধে ব্রাডম্যানের তাই সুবিনীত ঔদার্য আছে। তিনি প্রায় কিশোরীর মতো মুগ্ধ আম্পায়ারদের আচরণে। বেদনাকরুণ কণ্ঠে বলেছেন,

লোকে আম্পায়ারের ভুলের নিন্দে করে গলা ছেড়ে, কেউ কি কোনোদিন প্রশংসা করেছে তাদের সুকঠিন সংগত বিচারের? ব্যক্তিগতভাবে ব্রাডম্যান বহুবার বিনা আউটে আউট হয়েছেন। আনকোরা নতুন ব্যাট নিয়ে খেলতে নেমেছেন, প্রথম বলেই লেগবিফোর, ব্যাটের কানায় কিন্তু বলের টকটকে লাল দাগ—হাসতে-হাসতে ফিরে এসেছেন। ড্রেসিংরুমে আম্পায়ারদের বিচারবিভ্রাট নিয়ে আলোচনা তিনি পছন্দ করেন না, তা নিয়ে মিলার দুঃখ করেছেন। ডনের সিদ্ধান্ত: আম্পায়ারদের ভুল থেকে শাস্তি ও সুবিধাপ্রাপ্তির হার পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।

ব্রাডম্যানের সঙ্গে ডবলিউ জি গ্রেসের মনোভাবের কিন্তু বিশেষ পার্থক্য। ডন নিয়মের সম্রাট।, গ্রেসের রাজ্যে গ্রেসেরই নিয়ম। গ্রেসের কাছে আম্পায়াররা তুচ্ছ শৃঙ্খলার স্পর্ধাবিশেষ। বিচারবিভাগের সর্বোচ্চ অধিকারকে তিনি স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের ঔদ্ধত্যে ধূলিসাৎ করতে চাইতেন। যবন-নিপাতের সময়ে রামশাস্ত্রীর ন্যায়ের বাড়াবাড়িটা তাঁর ভাল লাগত না। লোকে যখন দশ ক্রোশ দূর থেকে গ্রেসের খেলা দেখতে ছুটে আসে, আম্পায়ারের কারদানি দেখতে নয়, তখন তাঁকে আউট দেওয়া তিনি স্বচ্ছন্দে মেনে নেবেন কেন? প্রয়োজন হলে কেন আম্পায়ারের নাকের সামনে ঘুষি দোলাবেন না, অথবা মধুর সুরে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না—'জানো, হাওয়ার জন্যই বেলটা পড়ে গেছে, বল লেগে নয়।' এসব কথাও পাঠক আগে জেনেছেন।

ইংলিশ-ক্রিকেটের পিতামহ যদিও আম্পায়ারদের সম্বন্ধে অধীর ছিলেন—সাধারণ ইংরেজ-মনোভাব কিন্তু ধৈর্যশীল। ইংরেজ-নীতিবাদ আম্পায়ারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতিকে শেষসীমায় নিয়ে যেতে চায়। তাদের বক্তব্য—যদি ব্যাটসম্যান অনুভব করে সে আউট, আম্পয়ারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না রেখে সে ক্রীজ ছেড়ে চলে যাবে। অস্ট্রেলিয়ার বক্তব্য ভিন্ন। তারা কর্মবিভাগে বিশ্বাসী। আম্পায়ারের কাজ বিচার করা, খেলোয়াড়ের কাজ খেলা। খেলোয়াড় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ছাড়াই মাঠ ছেড়ে চলে যাবে? তাহলে যখন সে আউট হয়নি, তখনো আম্পায়ারের বিপরীত সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও মাঠে থাকতে পারবে কি? এই সব প্রশ্ন তুলেছেন রিচি বেনোড।

ন্যায়পরায়ণ খেলোয়াড় কতখানি অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে তার একটা কৌতুকজনক দৃষ্টান্ত আছে। ১৮৭০, ২৫শে জুলাই ওভালে সারে ও এম-সি-সি-র খেলা। সারের জে সাদার্টন উইকেট ছেড়ে চলে গেলেন নিজের থেকে। তাঁর ধারণা তিনি আউট। তেমন ধারণা কারোরই নয়, আম্পায়ারেরও নয়। কিন্তু সাদার্টন অটল। টানাটানিতেও ফিরলেন না। অগত্যা স্কোর-শীটে লেখা হল—
"J. Southerton, retired, thinking he was caught : 0"

এতখানি অসঙ্গত সহযোগিতা, অথবা ব্রাডম্যান বা মানকদের মতো সঙ্গত সহযোগিতা সকলে করতে চায় না। জনৈক লেখক মানকদের একটি আচরণের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ১৯৫৬ সালে মাদ্রাজে আয়ান জনসনের অস্ট্রেলিয়ান দলের সঙ্গে ভারতের টেস্ট। লিন্ডওয়ালের অগ্নিস্রাবের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। কেবল ভিনু রুখে দাঁড়ালেন। যখন মনে হল তিনি বোলিংকে কড়া কিছু বলবার মতো অবস্থায় এসেছেন, তখন গোটা অস্ট্রেলিয়ান দল হুঙ্কার দিয়ে উঠল—কট-বিহাইন্ড! গর্জনে নত হলেন আম্পায়ার। ভিনু ফিরে চললেন

নীরবে। একেবারে যখন প্যাভিলিয়ানের কাছে পৌঁছেছেন, তখন হাত বুলোতে লাগলেন কনুইয়ে। তিনি আউট হয়েছেন কনুই স্ট্রোকে।

এমন সব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগের কারণ আছে। এই সব ব্যাপার ঘটে বলেই আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে নানান রসিকতার সৃষ্টি হয়। দু' একটা নমুনা দেওয়া যায় এখানি। চমৎকার বল দিলেন বোলার। ব্যাটসম্যান একেবারে উইকেট ঢেকে দাঁড়িয়ে। বল সোজা পায়ে লাগল। উল্লাসে আকাশ ফাটাল বোলার—"হাউজ্ দ্যাট?" আম্পায়ার মহা বিরক্ত হয়ে ব্যাটসম্যানকে ধমকাল—'ওহে ছোকরা, পা সরাও, আউট হয়েছ কি না বুঝব কি করে?'

কিংবা একই ধরনের আর একটি ক্ষেত্র। ব্যাটসম্যান পা দিয়ে না আটকালে সোজা বলটা নির্ঘাত উইকেট ভেঙে দিত। বোলার চেঁচাল--'হাউজ্ দ্যাট?' আম্পায়ার সহানুভূতির সুরে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'সত্যি, পা দিয়ে ঢেকে না রাখলে ওর আউট কে আটকাত?'

আম্পায়ারদের নিয়ে তামাশা আরও গড়ায়। গ্রামের আম্পায়ার আউট দেয় না, কারণ তার বাবার ক্যাপ্টিন, লাঞ্চ পর্যন্ত খেলা ঠেকিয়ে না রাখলে মহা লোকসান। আম্পায়াররা যখন মাঠে থাকে তখন মেয়েরা বুঝতে পারে না—খেলার মাঠে পাদরীর কি কাজ! কিংবা যখন বুঝেছে, একটু রসিয়ে বুঝেছে। আম্পায়ার প্যাভিলিয়নের দিকে হাত নেড়েছেন, হাতের ভাষা পড়ে শরমে রাঙা হয়েছে তরুণী। আম্পায়ারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেছে জনৈক খেলোয়াড়। টুল এনে ক্রীজের উপর পেতে তার উপর চড়ে দাঁড়িয়ে আম্পায়ারকে বলেছে—রইল তোমার এল-বি আইন, এখন কি করবে করো?

দর্শকদৃষ্টিতে আম্পায়ারের বহুমুখী ভূমিকার রূপ একবার জনৈক লেখক নিম্নলিখিতভাবে লিপিবন্ধ করেছিলেন:

(১) প্রহরী, যিনি খেলা আরম্ভ ও পুনরারম্ভের পূর্বে উইকেট পর্যবেক্ষণকারী উৎসাহী ব্যক্তি, অটোগ্রাফশিকারী বিদ্যালয়বালক, এবং উদাসীন পথচারীদের বিতাড়নে নিযুক্ত।

(২) ভ্রাম্যমাণ বস্ত্রাগার কিংবা টুপি ও সোয়েটারের সচল আলনা।

(৩) ট্রাফিক-কন্ট্রোলার। বোলারকে বিশ্রাম দিতে এবং ফিল্ডারদের মাঠের এধারে-ওধারে বেড়াবার সুযোগ দিতে 'ওভারের' সঙ্কেতকারক।

(৪) মৃৎতত্ত্ববিৎ। বৃষ্টির পূর্বে ও পরে পিচের মাটির পরীক্ষাকারক।

(৫) আবহাওয়াতত্ত্ববিৎ। আবহাওয়া বা আলো খেলার উপযোগী কি-না স্থির করার অধিকারী।

(৬) সময়রক্ষক। খেলার শুরু ও শেষের সময়, ব্যাটসম্যানের নামার সময়, ইনিংসশেষে দলের নামার সময়, ইত্যাদির হিসাবরক্ষক।

(৭) যাদুকর। পুরানোর বদলে নতুন বল, খারাপের বদলে ভালো বল, হারানোর বদলে পুরানো বল—ইচ্ছামতো হাজির করতে সমর্থ।

(৮) স্কোরারের নিকট বার্তাপ্রেরণের সঙ্কেতযন্ত্র।

(৯) অন্তর্যামী। ৩৭, ৪০, ৪১ এবং ৫৬ সংখ্যক নিয়মভঙ্গে ইচ্ছুক ব্যাটসম্যান, বোলার ও ফিল্ডারের অন্তর্যামী।

(১০) মহান্যায়াধীশ। এই সর্বোচ্চ ভূমিকায় যে-কোনো ক্রিকেটারকে

নির্বাসন দেবার অধিকারী।

দর্শকের কাছে আম্পায়ারদের এত রূপ! দর্শক যখন বিনা অনুরাগে আম্পায়ারকে দেখে, তখন তার সম্ভাব্য রূপ কি দাঁড়ায়, সেটি অনবদ্য বাস্তব রসিকতা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জনৈক আম্পায়ারই।

ইংলণ্ডের বিল রিভস্ আম্পায়ার-চরিত্ররূপে বিখ্যাত। তীক্ষ্ন বচনে, ঝাঁঝালো রসিকতায় তাঁর অভূত পারদর্শিতা। তাঁর সঙ্গে একটি খেলায় সহযোগী আম্পায়াররূপে আছেন প্যাট হেনড্রেনের ভাই ডেনিস হেনড্রেন। এই হেনড্রেন বিল রিভসের যোগ্য জুড়ি। ডেনিস হেনড্রেন যখন লেগ-আম্পায়াররূপে স্কোয়ারলেগে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন হঠাৎ একবার ব্যাটসম্যান তাঁর দিকে ঘুরেই প্রচন্ড পেটাল। সেই গোলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে শুয়ে-পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, এবং হেনড্রেনও তৎক্ষণাৎ ঝাঁ করে চিত হয়ে পড়লেন মাঠের মধ্যে। ঘটনাচক্রে ঠিক সেই মুহূর্তে রাইফেলের শব্দ শোনা গেল নিকটবর্তী কোনো স্থান থেকে।

বোলারের দিকে আম্পায়ার ছিলেন রিভস। মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ ও গম্ভীর করে তিনি বললেন—দর্শকেরা মাঝে-মাঝে বলত বটে ডেনিসকে তারা গুলি করে মারবে তার বাজে ডিসিসনের জন্যে—কিন্তু কে জানত তারা কথা রাখবে?

এবার দেখা যাক আম্পায়ারেরা দর্শকদের কি চোখে দেখে? উক্ত ডেনিস হেনড্রেনেরই একটি কাহিনী শোনাই।

এক কাউণ্টি খেলায় কড়া রোদের মধ্যে বল করতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে বোলারদের, কিন্তু উইকেট পড়ছে না। ফিল্ডিং করছিল স্থানীয় দল। তাদের খেলায় দর্শক খুশি নয়। এক হেঁড়ে-গলার দর্শক চেঁচাতে লাগল অবিরত—কইহে বোলার-চন্দ্র! আমাদের মাঝকাটি দেখানোর কি হল?

একবার নয়, দুবার নয়, বারবার সেই একই বিকট চীৎকার। আম্পায়ার হেনড্রেন অনেকক্ষণ সহ্য করলেন। কিন্তু থামবার নাম নেই। তখন উত্যক্ত হয়ে, আর একটা বিদ্ঘুটে চেল্লানি শুরু হতেই, হেনড্রেন গম্ভীরভাবে ব্যাটসম্যানের উইকেটের দিকে হেঁটে গেলেন—এবং উইকেটের মাঝকাটি উপড়ে দর্শকটির দিকে তুলে নাড়িয়ে ভাল করে দেখিয়ে দিলেন। চারিদিক হাসিতে ডুবে গেল।

আম্পায়ারের এই ঘৃণাই প্রকাশ পেয়েছিল অন্যভাবে। দর্শকদের চেঁচামেচির পরে জনৈক আম্পায়ার মাঠ ছেড়ে দর্শক-আসনে গিয়ে বসলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল—কি ব্যাপার? তিনি বললেন—তোমাদের চেঁচানিতে বুঝেছি, এখান থেকে সিদ্ধান্ত দেওয়াই ভাল। নির্বোধের জগতে বুদ্ধিমানের পরিশ্রমের কি মূল্য?

দর্শক আম্পায়ারে সম্পর্কটা বাইরের ব্যাপার। কিন্তু খেলোয়াড়ে আম্পায়ারে সম্পর্কের উপরে খেলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আম্পায়াররা খেলার কতখানি তা ডন ব্রাডম্যানের লেখা থেকে উদ্ধৃত করে দেখানো যায়। ডন লিখছেন—

"যে-কোনো খেলার ক্ষেত্রে ভালো বিচারকের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ক্রিকেটে একটিমাত্র সিদ্ধান্ত টেস্টম্যাচের পরিণতি স্থির করে দিতে পারে। ফুটবলে টেনিসে একজন আম্পায়ার বেশকিছু ভুল করতে পারেন, কিন্তু তার দ্বারা

খেলার পরিণতি সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। সেখানে ক্ষতিপূরণের যথেষ্ট সময় থাকতে পারে।

"ক্রিকেটে যদি একজন আম্পায়ার ব্যাটসম্যানকে আউট দেন, সে আউটই হয়ে যায়, ব্যাপারটার শেষ সেখানেই, কোনো দ্বিতীয় সুযোগ নেই।

"এইভাবে আম্পায়াররা ক্রিকেটে প্রধানতম ভূমিকায় আছেন। এক ইঞ্চির হের-ফেরে ঘটে-যাওয়া জিনিস বুঝতে না পেরে তিনি কোনো দলের পক্ষে অসংশোধনীয় ক্ষতি ঘটিয়ে দিতে পারেন।"

কোনো-কোনো সমালোচক ডনের এই কথাটি লুফে নিয়ে বলবেন, ঠিক ঠিক, আম্পায়াররা মুহূর্তে কী ঘটাতে পারেন তার দৃষ্টান্ত স্বয়ং ডনের ক্রিকেট-জীবন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ডন ব্রাডম্যান, অনেকের মতে, অস্ট্রেলিয়ান আম্পায়ার বরউইকের সিদ্ধান্তের সৃষ্টি।

ঘটনা এই। ১৯৪৬-৪৭ মরশুমে ইংলণ্ড এসেছে অস্ট্রেলিয়া-সফরে। ব্রিসবেনে প্রথম টেস্ট। ব্রাডম্যান অনিশ্চিত মন নিয়ে খেলছেন। শরীর ও ফর্ম সম্বন্ধে নিঃসংশয় নন। অস্ট্রেলিয়া শুরু করল। মোরিস ও বার্নস আউট। তারপর ঘটল সবচেয়ে বিতর্কিত ঘটনাটি। ভোস্ ইয়র্কার-জাতীয় একটি বল দিলেন। ব্রাডম্যান সেটিকে স্লিপের থেকে কিছু দূর দিয়ে ঠেলতে চাইলেন। তার পরিবর্তে বলটি ব্যাটের তলা দিয়ে সেকেণ্ড স্লিপে আইকিনের হাতে গেল।

ইংরেজদের ধারণা, ব্রাডম্যান কট হয়েছিলেন। ব্রাডম্যান কিন্তু ক্রীজে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, বলটি মাটিতে ঠেকে ওপরে ওঠে। ইংরেজরা কিছু বিলম্বিত আবেদন জানাল, কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল, ক্যাচটা এতই সোজা যে, আবেদন জানাবার প্রয়োজন নেই। আম্পায়ার বরউইক বিনা দ্বিধায় আবেদন অগ্রাহ্য করে দিলেন।

ব্রাডম্যান ১৮৭ করলেন।

আম্পায়ার বরউইকের কাঁচা মাথা চিবিয়ে ইংরেজরা বলে—ঐ ১৮৭ রানই ব্রাডম্যানকে আবার টেনে আনল ক্রিকেটে, যার ফলে ১৯৪৮ সালে আমাদের ঐ শোচনীয় পরাজয়।

খেলোয়াড়ে আম্পায়ারে বিরোধের তাই শেষ নেই! ক্রিকেট নিয়মাবলী কেন যে ঐ একটা বিরসবদন ব্যক্তিকে এতখানি ক্ষমতা দিয়েছে, সে-বিষয়ে অনেক খেলোয়াড়ই নীরস মনে চিন্তা করে। অমন একটা হৃদয়হীন হস্তে (হাতে হৃদয় থাকে না, সকলেরই জানা আছে) তাদের হস্তলিপি!

আমরা মরব খেলে, উনি করবেন মুড়ুলি—অনেকেরই মনোভাব। তবু নিরেট হায়ার অফিসারকে যেমন সামনে স্যার-স্যার করতে হয়, তেমনি এই লোকটিকেও প্রসন্ন রাখার দরকার আছে। সুশীল আচরণে এর মহত্ত্ব জাগানো প্রয়োজন, যাতে আমি যখন ব্যাটসম্যান তখন এর স্বভাবে দোষদর্শিতা না থাকে, এবং আমি যখন বোলার তখন গুণগ্রাহিতা বৃদ্ধি পায়।

এই ধরনের উপদেশই পেল এক তরুণ ক্রিকেটার পুরানো পেশাদার ক্রিকেটারের কাছ থেকে। হাসিতে বিশ্বজয়, মনে রেখো, আর নম্রতায় সর্পও শান্ত। সুতরাং উইকেটে গিয়েই সুপ্রভাত করবে আম্পায়ারকে।

প্রথম বড় কাউণ্টি-খেলায় নামছে ঐ ছোকরাটি। বুক দুরুদুরু। দেহের মনের

যা অবস্থা, তাতে উইকেটে লড়াই করা শক্ত ফরেন এইড ছাড়া! তাই সে আম্পায়ারের সামনে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করল, হাসল পূর্ণাননে, তারপরে অন্তরঙ্গ হয়ে শুধালো—'স্যার আছেন কেমন?'

'খুব ভাল, খুব ভাল'—আম্পায়ার খুব খুশি—'বেশ আছি। আর মাত্র তিনটি হলেই হয়ে যায়।'

'কি হয়ে যায় স্যার জানতে পারি কি?'—আম্পায়ারের সহৃদয়তায় ভরসা পায় ছোকরা।

'এই—সেঞ্চুরি হয়। মাত্র তিনটি আউট দিলেই এই সিজনে আমার আউট দেওয়ার সেঞ্চুরি হয়ে যায়'—ছোকরাটির দিকে তাকিয়ে ভরসা পায় আম্পায়ার।

আম্পায়ার ও খেলোয়াড়ে মতভেদ যে সকল সময়ে তিক্ত হবেই এমন নয়, কৌতুকজনকও হয়েছে কখনো-কখনো। তেমন একটা কাহিনী—

ইংলণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত বোলার আলেক বেডসারের যমজ ভাইয়ের নাম এরিক বেডসার। দু'জনের চেহারা এমন অবিকল এক যে দীর্ঘদিনের পরিচিতরাও ভুল করে। দু' ভাইই সারে দলে ক্রিকেট খেলেন। একবার এক ক্লাব-ম্যাচে এরিক বেশ কিছুক্ষণ ব্যাট করার পরে আউট হলেন। তিনি প্যাভিলিয়নে ঢুকে যাবার পরে ধীরে-সুস্থে ব্যাট দোলাতে-দোলাতে মাঠে নামলেন আলেক। উইকেটে এসে আলেক ব্যাট ধরে গার্ড নিতে যাচ্ছেন, আম্পায়ারের খেয়াল হল। এ কি ইয়ার্কি? একই লোকের দু'বার ব্যাট করা? আম্পায়ার কড়া শাসানি ছুঁড়ে দিলেন। আলেকের কিন্তু খেয়ালই নেই। তিনি ব্যাট ধরে বল মারবার জন্য প্রস্তুত, তখন আম্পায়ার প্রচণ্ড রেগে দুম্‌দুম্ করে হেঁটে আলেকের সামনে হাজির।

মহাশয়কে আমি জানাতে পারি, একই ইনিংসে দু'বার ব্যাট করার নিয়ম নেই ক্রিকেটে।

কি বলছেন, বুঝতে পারলুম না তো?

ঠিকই বলছি। এখন ভালয়-ভালয় ফিরে গিয়ে অন্য লোককে পাঠিয়ে দিন। খেলার মাঠ রসিকতার জায়গা নয়।

আলেক হতভম্ব।

আম্পায়ার গলা চড়িয়ে বললেন—আপনি এইমাত্র আউট হয়ে গেলেন না?

আলেক বুঝলেন ব্যাপারটা। হেসে বললেন—সে আমি নয়, আমার ভাই।

আম্পায়ারের বিশ্বাস হল না। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করেন কি করে? তাঁকে নিয়ে যে, তামাশা করা হয় নি, তা বোঝাবার জন্য অগত্যা দু' ভাইকে আম্পায়ারের সামনে 'অ্যাটেনশন' হতে হল। এতক্ষণে তিনি বুঝলেন, দুই ব্যক্তি একদম এক চেহারার। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে আউট হয়ে গেল, সেই ফিরে এসে ব্যাট ধরল কি-না সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ দূর হল না।

[আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, আম্পায়ারের সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। যে অনেকক্ষণ ব্যাট করেছে তার চোখ তৈরী হয়ে আছে, সুতরাং ফিরে এলে সেই ভালো ব্যাট করবে। সেইজন্যই ফলো-অনের ক্ষেত্রে অনেক সময় মাঝ-খানকার নটআউট ব্যাটসম্যান দলের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে।]

দেখা যাচ্ছে, আম্পায়ারে খেলোয়াড়ে বিরোধটা চিরন্তন। বিবাদটা বাধে বিশেষ

করে তাদের মধ্যে যাদের আচরণে আছে ব্যক্তিত্বের ঘোষণা।' আম্পায়াররা এতদিন অনেক সহ্য করেছেন, তাঁদের জীবনের বহু সমস্যা আছে, অর্থনৈতিকভাবে তাঁরা সচ্ছল নন, তাঁদের শারীরিক কষ্ট সম্বন্ধেও কেউ অবহিত নন, তদুপরি এই অবজ্ঞার লাঞ্ছনা। আম্পায়ারদের কেউ-কেউ 'ক্যারেকটার' হতে চাইলেন ক্রিকেট-ক্যারেকটারদের মতো। আর সেই চেষ্টায় বাধল সংঘর্ষ।

আম্পায়ারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারেকটার ফ্রাঙ্ক চেস্টার। তিনি শ্রেষ্ঠ আম্পায়ারও বটেন। খুব বড় ক্রিকেটার হতে পারতেন, কিন্তু যুদ্ধের দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ হওয়ায় সে আশা পূর্ণ হল না। ১৯১৪ সালে তিনি উরস্টার্সশায়ারের উঠতি ক্রিকেটার। সকলে নিশ্চিন্ত, চেস্টারও, ক্রিকেটে নাম থাকবে তাঁর। কিন্তু যুদ্ধ বেধে গেল তারপর। ফ্রান্সে গেলেন যুদ্ধের ব্যাপারে। যখন ফিরলেন, একটি হাত বিসর্জন দিয়ে এসেছেন। একহাতে ব্যাট চালানো যায় না। সুতরাং ব্যাটিং গেল। কিন্তু ক্রিকেট যাবে? তিনি আম্পায়ার হলেন। নিজের সমস্ত অচরিতার্থ ক্রিকেট-প্রতিভাকে চেস্টার তখন আম্পায়ারিং-এর মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে তাকে সৃষ্টিমূলক একটা কিছু করে তুললেন।' নিষ্ক্রিয় সিদ্ধান্ত থেকে তাঁর আম্পায়ারিং সক্রিয় ঘোষণা হয়ে দাঁড়াল।

১৯২১ সালে প্রথমশ্রেণীর আম্পায়ার মনোনীত হয়ে ফ্রাঙ্ক চেস্টার যখন এক কাউন্টিম্যাচ খেলাবার জন্য মাঠে ঢুকতে গিয়েছিলেন, দারোয়ান পথ আটকেছিল তাঁর—এমন কচি মুখ আম্পায়ার হয় নাকি, চালাকি? পরে পরিচয় পেয়ে মাথা চুলকে সরে দাঁড়িয়েছিল। সেই-যে সে সরে দাঁড়াল, তারপরে শুধু সেই নয়, ক্রিকেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই সরে দাঁড়াবে সম্ভ্রমে চেস্টারকে দেখে। চেস্টার ঐ প্রথম খেলাতে কয়েকটি নুড়ি কুড়িয়ে নিয়েছিলেন গণনার প্রয়োজনে। চেস্টারের তালুর মধ্যে সেই নুড়িগুলি দীর্ঘ পঁচিশ বছর বাস করে অগণ্য অঙ্কের ঘর্ষণে মসৃণ হয়ে উঠবে, আর সেই উপলখণ্ডগুলি নিয়ে ক্রিকেটের খেলা-বেলায় (কিংবা খেলা-মেলায়) দাঁড়িয়ে থাকবেন ক্রিকেটের ড্যানিয়েল।'

চেস্টারের প্রশংসায় ব্রাডম্যান উচ্ছ্বসিত। তিনি হয়ত তাঁকেও ভুল করতে দেখেছেন কিন্তু কদাচিৎ সে ভ্রান্তি। 'চেস্টার নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। চেস্টার একক, অনন্যসাধারণ।' চেস্টারকে ধাপ্পা দেওয়া যায় না। হেঁকে-ডেকে চেস্টারকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। লীডসে এক টেস্টম্যাচে ভেরিটি জনৈক অস্ট্রেলিয়ানের বিরুদ্ধে ডাক পাড়লেন। চেস্টারের তীক্ষ্ন উত্তর—'নটআউট ভেরিটি, শুধু তাই নয় জঘন্য তোমার আবেদন।'

ব্রাডম্যান বলেন, উদ্ভট আবদার করলে এ রকম ধমকানির দরকার আছে।

চেস্টারের স্তুতিতে নেভিল কার্ডাস লিখেছেন:

"দেখে আনন্দ চেস্টারকে। কখনো-কখনো বিপুল বিদ্রূপে মুড়ে তিনি সিদ্ধান্ত জানান। আমি দেখেছি, তিনি স্নিক-বাউণ্ডারির সংকেত করেছেন এমন ভঙ্গিতে, যাতে রাজকীয় অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে, তা যেন উচ্চকণ্ঠে বলেছে=আইন-অনুযায়ী তোমাকে ৪ রান দিতে আমি বাধ্য, কিন্তু ঐ ব্যাপারটি সম্বন্ধে নিজস্ব মনোভাব পোষণ করবার অধিকার আমার আছে।

"চেস্টারকে দেখেছি—ব্যাটসম্যানকে আউট দিতে গিয়ে সহসা হাত তুলে আকাশকে যেন অঙ্গুলীবিদ্ধ করেছেন, তাতে ক্ষমাহীন অমোঘ সিদ্ধান্তের

নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে। আর আমি দেখেছি, বোলারের উদ্ভট লেগ-বিফোর আবেদন শুনে পিঠ ফিরে দাঁড়িয়েছেন, যে প্রত্যাখ্যানের আঘাতে সেই ব্যক্তি রুচির ও শালীনতার জগতের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।"

চেস্টার থাকলে ব্যাটসম্যান নির্ভয়ে খেলতে পারে, বোলার বল দিতে পারে বিশ্বাসে। চেস্টার থাকলে ব্রাডম্যান বিনা দ্বিধায় লেগস্টাম্পের উপর পড়া বহির্গামী অফব্রেক বলে লেগগ্লান্স করতে পারেন, যেটা অন্যক্ষেত্রে মিডঅনে ড্রাইভ ছাড়া কিছু করতেন না। চেস্টারের মতো আম্পায়ার থাকলে খেলার উজ্জ্বলতা বেড়ে যায় সহস্রগুণে।

এবং চেস্টারের পক্ষেই অভাবনীয় সব সিদ্ধান্ত করা সম্ভব। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলার সময়ে সিনফিল্ডের একটি বল অফ থেকে ঘুরে এসে খুব অস্পষ্টভাবে ব্রাডম্যানের ব্যাটের ভিতর দিকের প্রান্ত স্পর্শ করে প্যাডে ধাক্কা দিয়ে, উইকেটকীপার এমসের হাতে ধরা পড়ল। পা, প্যাড ও ব্যাটের জড়াজড়িতে ব্রাডম্যান কিছুটা টলে পড়লেন এবং এমস স্টাম্পিং-এর জন্য বেল তুলে নিলেন। তৎক্ষণাৎ স্কোয়ারলেগ আম্পায়ারের কাছে স্টাম্পড্ আউটের আবেদন জানান হল। তিনি অগ্রাহ্য করে দিলেন। এমস তখন বোলার-প্রান্তের আম্পায়ার চেস্টারের কাছে আবেদন করলেন। যেন কিছুই হয়নি, যেন সবাই জানে ব্যাপারটা, এমন শান্ত-ভাবে চেস্টার বললেন—কটআউট। তারপর সে-দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ঔদাসীন্যে।

ব্রাডম্যান বলেছেন—"এর থেকে কৌশলী সিদ্ধান্ত আমি আমার ক্রিকেট-জীবনে পাইনি।"

ফ্রাঙ্ক চেস্টার ব্যক্তিত্ববান। যেখানে বিচার আদায় করা হয়—সেখানে বিচারকের ব্যক্তিত্ব দাবিদারদের পক্ষে অসুবিধাজনক। সুতরাং চেস্টার অনেক বিরূপতার সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক সমালোচনা তাঁর বিরুদ্ধে—তাঁর 'হামবড়াই', 'গুরু-মশাইগিরি', 'নাটুকেপনার' সম্বন্ধে। সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষ হয়েছে তাদের সঙ্গে, যারা মাঠের অভিনয়ের সব আলোটুকু নিজেরা শুষে নিতে ব্যস্ত। বার্নস, মিলার, ট্রুম্যানেরা তাঁকে সহ্য করতে অপারগ। মাঠের মধ্যে চেঁচামেচি ও মুখ-ভঙ্গি করে, হাত পা ছুঁড়ে, তাঁরা বিরক্তি জানিয়েছেন, মাঠের বাইরে কলম ধরে স্থায়িত্ব দিয়েছেন অসন্তোষকে। চেস্টার সব-কিছু দেখেছেন, কিন্তু মাঠের ভিতরের ঘটনাকে নিজের আয়ত্তের বাইরে যেতে দেননি। তিনি মাঠে কারো বন্ধু হতে রাজি নন, কারণ শত্রু হতে তাঁর ইচ্ছা নেই। আমি জানি না, এই সমস্ত খেলোয়াড় সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব কি ছিল, তাঁর উচ্চ নৈতিকতা তাঁকে আদর্শভ্রষ্ট হতে দেবে না তাও জানি। নচেৎ নিম্নলিখিত কাহিনীটি তাঁর মনো-ভাবের কত না স্বাভাবিক প্রকাশ হতে পারত!—

বদমেজাজী একজন টেস্ট-ব্যাটসম্যান, আর একজন বিখ্যাত আম্পায়ার। খেলার সময়ে আম্পায়ার খেলোয়াড়টিকে এল-বি দিলেন। ব্যাটসম্যান ফিরে দাঁড়িয়ে বিরক্তিতে ও ক্রোধে কপালের সমস্ত চামড়া কুঁচকে বলল—আমি বলটা মেরে-ছিলাম!

আম্পায়ার সাফ্ জবাব দিলেন—খুব হয়েছে। তুমি আউট।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাগে ব্যাট দোলাতে-দোলাতে ব্যাটসম্যান চলে গেল। আম্পায়ার তাঁর সহযোগী আম্পায়ারের কাছে গিয়ে তাঁর মত শুনতে চাইলেন। সহযোগী বললেন—ও কিন্তু সত্যই বলটা হিট করেছিল। আমি শব্দ শুনতে পেয়েছি। তখন এই আম্পায়ারের মুখে একটা দুষ্ট হাসি ফুটে উঠল।—আমি সত্যিই ভেবেছিলাম ও আউট হয়েছে। কিন্তু—আমি ওর সম্বন্ধে ভুল করতে এতদিন কিভাবে না চেয়েছি!

এ গল্পের আম্পায়ার চেস্টার নন। হতে পারেন না। অপরের ঔদ্ধত্য যেমন তিনি দমন করেন, নিজের মনের অবিচারের চিন্তাকে নির্মূল করার ক্ষমতাও তেমনি তাঁর আছে। ঐ গল্পটি থেকে বিশেষভাবে যা ফুটে উঠেছে তা হল, সহানুভূতিহীনতার বিরুদ্ধে আম্পায়ারদের ক্ষোভ। সেই বেদনার সুর বেজেছে কার্ডাসের একটি রচনায়। ক্রিকেটের অবজ্ঞাত অপরিহার্যদের স্বরূপ ফোটাচ্ছেন এই বিখ্যাত লেখক—

"ক্রিকেট শুরু হয়েছে, উইকেটের দিকে হেঁটে গেছেন আম্পায়ার, অসাধারণ জ্যামিতিজ্ঞানের পরিমিতিবোধ নিয়ে তাঁরা স্টাম্প সাজিয়েছেন। 'খেলা হোক' এই শব্দ সুনির্দিষ্ট মর্যাদার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।

"আম্পায়াররা মূর্তিমান ক্রিকেট-নিয়ম। শ্রেষ্ঠতম ক্রীড়ার মহান নীতির প্রতিচ্ছবি। খেলা তৈরী বা নষ্ট, দুই-ই তাঁরা করতে পারেন। মন্দ আম্পায়ার মানে মন্দ মেজাজের ক্রিকেটার, সুতরাং মন্দ খেলা। অথচ তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মনোযোগ কত সামান্য। তিনি ভুল করলেই মাত্র বুঝি তিনি আছেন। 'জঘন্য সিদ্ধান্ত'—এই কথাটি প্রায়ই ক্রিকেটারদের মুখে-মুখে ফেরে। কিন্তু কদাচিৎ আমরা তাঁর ভালো সিদ্ধান্তের গুণগান করি।

"ক্রিকেটের আম্পায়াররা বাথরুমের গরম জলের যন্ত্রের মতো। সেটা ছাড়া চলে না অথচ খারাপ হয়ে না-গেলে সেটার কথা মনে থাকে না। আসল কথা হল, মাঠের মধ্যে আম্পায়ারই সবচেয়ে দরকারী মানুষ। তিনি খেলা-অর্কেস্ট্রার পরিচালক।...

"খেলার দীর্ঘ সময়। বলের পর বল পড়ে। আম্পায়ারকে খেলার প্রতিটি অংশে তীব্রভাবে মন রাখতে হয়। খেলোয়াড়দের অবসর আছে। নিজেদের দল ব্যাট করার সময়ে কেউ-কেউ রীতিমত ঘুমিয়ে নেয়। বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হলে ক্রিকেটাররা কিছু সময়ের জন্য খেলার কথা ভুলে যেতে পারে। আম্পায়ারের অব্যাহতি নেই। যতক্ষণ না খেলা শেষ হচ্ছে, কিংবা আবহাওয়ার জন্য তা পরিত্যক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর শুধু—দেখে যাও, আর দেখে যাও—খেলা দেখো, পিচ দেখো, গ্রাউণ্ডসম্যানকে দেখো। প্রতিদিন যে-মাপের মনোযোগ তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয়, তা মানুষের সহনশক্তির যে-কোনো সীমার বাইরে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খুঁটিনাটি প্রতিটি ব্যাপারে আম্পায়াররা যে-পরিমাণ মনোযোগ দিয়ে থাকেন, যদি কোনো দেশের প্রতিটি মানুষ নিজ-নিজ কাজে তার অর্ধেকও মন দেয়—তা হলে সে-দেশের উন্নতির সীমা না-জানি কোন্ স্বর্গ স্পর্শ করবে।"

নেভিল কার্ডাসের তাই বিনীত আবেদন—আম্পায়ারদের সর্বপ্রকার সাহায্য করো। জানো নাকি যে, একটা ভুলের জন্য তার চাকরি চলে যেতে পারে? "তার কাজ কি এমনিতে যথেষ্ট কঠিন নয় যে, তোমরা হঠকারিতা করে বা মেজাজ

দেখিয়ে তাকে কঠিনতর করে তুলবে।"

তবু—খেলোয়াড় আম্পায়ারে ঝগড়া থাকবেই এবং আম্পায়ারকে নিয়ে সকলে তামাশা করবেই। আম্পায়ারের গায়ে বল লাগলে দর্শকের কত স্ফূর্তি। বাতাসে তাঁর টুপি উড়ে যাওয়া তো মহোৎসব। কারণ—কারণটা কার্ডাসই ব্যাখ্যা করেছেন —'কোনো মানুষের পক্ষে অভ্রান্ত বিচারের প্রতীককে মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পাপ করতে ও ভুল করতেই তার জন্ম।'

তাই শ্রীযুক্ত কার্ডাসও হেসেছেন আম্পায়ারদের নিয়ে। অনেক দিন আগে, যখন গ্রাম্যখেলায় প্রতি দল নিজেদের আম্পায়ার সরবরাহ করত, তখন একবার দুই প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রামের খেলা। স্টাম্প পুঁতবার ঘণ্টাখানেক আগে একজন বহিরাগত আগন্তুক মাঠের মধ্যে গিয়ে উইকেট পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। সেখানে তিনি একজন একেবারে থুত্থুড়ে বুড়োকে দেখলেন। আসন্ন সমর সম্বন্ধে আগন্তুকের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন সেই জীবন্ত প্রত্নতত্ত্ব।

'আপনাদের দল কি বোলিংয়ে খুব জোরালো?'—আগন্তুকের প্রশ্ন।

'তা মশায়, খুব খারাপ নয়'—বৃদ্ধের উত্তর।

'বেশি উইকেট পায় কে?'—আগন্তুকের জিজ্ঞাসা।

'কেন মশায়, আমিই পাই'—উত্তর।

'হে ঈশ্বর! বলেন কি?'—আগন্তুক বিস্ময়ে কঁকিয়ে উঠলেন—'আপনার এই বয়সে আপনি এখনো বোলার?'

'উঁহু, আমি আম্পায়ার।'

উপায় নেই, আমাদের হাসতেই হবে, কারণ Man in born to sin and error. এবং আম্পায়ারে ক্রিকেটারে বিরোধ থাকবেই।

ওয়ালী হ্যামণ্ড জন্মেছেন। এখনো কথা ফোটেনি মুখে। দুধের বোতলের বোঁটা চুক-চুক চুষছে বাচ্ছা হ্যামণ্ড। ধাত্রী তা সরিয়ে নিল।

ওয়ালী চেঁচাল—তার প্রথম বচন—'হাউজ্ দ্যাট?'

অবিচলিত ধাত্রী বলল—ওভার।

✲ ✲ ✲ ভীমবলশ্রী ✲ ✲ ✲

ক্রিকেটের ধাত্রীর কথা ভাবতে-ভাবতে একদিন পথ হাঁটছি এমন সময়ে প্রায়-ভৌতিক একটা শব্দ শুনতে পেলাম—বোঁস্—এ্‌ই বোঁস্—

ফিরে দেখি পেল্লায় মহিলা—ইলেকশনে দাঁড়াতে পারেন। মহিলাকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ল না, আলাপ তো দূরের কথা। তাছাড়া অমন নাকি গলায় ডাকবার মতো নারী তিনি নন। তাহলে?

পর্বতের আড়াল থেকে নির্ঝরের মতো বেরিয়ে এসে যিনি আমার হাত ধরলেন—পরমাশ্চর্য হয়ে চিনলুম—তিনি আমার জনৈক কলেজীয় বন্ধু, এককালে হৃদ্যতা ছিল খুবই।

বন্ধুবর গাঢ় অনুরাগে আমার হাত ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন। ভালবাসার সেই দুর্বল দৃশ্য দেখে, বুঝতে পারলাম, কালো গগ্‌লসের তলাতেও মহিলার চোখ কুঁচকে গেছে। বন্ধুবর তা সত্ত্বেও অকুতোভয়ে দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফরাসী

কায়দায় ঝুঁকে পড়ে বললেন—এই হল আমার বন্ধু অমুক চন্দ্র অমুক...আর এই হল আমার মিসেস, হেঁ-হেঁ, যাঁহাতে মিশেছি আমি, হেঁ-হেঁ, আমার মিসেসিপি—

প্রচন্ড গর্জনে মাথাটা ঝাঁ করে উঠল। ভূমিকম্প, বোমাবর্ষণ, নিদেন টায়ার-বার্স্ট! না, গর্জন নয়, নেপথ্যভাষণ: ভীমরতি! রসিকতার ধরন দেখো না? তারপর আমার দিকে আধখানা ফিরে, বেঁটে ছাতা এবং প্রবৃদ্ধ বাইসেপস-সমৃদ্ধ দুহাত একটু তুলে মেঘস্বর:

—নো-মোস্-কার!

নিতান্ত বিচলিত হয়ে বিশেষ নতভাবে মহিলাকে নমস্কার করে সরে পড়ব ভাবছি, কারণ বন্ধুবর অতঃপর কি-জাতীয় কথা তুলবেন তা আমার জানা আছে। নিশ্চয় বলবেন—আমি ক্রিকেট লিখি এবং—সেইসব লেখার মধ্যে লেখার দায়ে যেহেতু কিছু নারীঘটিত রসিকতা থাকে, সে ক্ষেত্রে—বাপস্! এই মহিলা আবার রসিকতার ধার ধারেন না। তাছাড়া তখন আমার হাতে ঠেকা দেবার জন্য একটা বই ছাড়া আর কিছু নেই, তাও এনসাইক্লোপিডিয়া জাতীয় বই নয়, অসন্তুষ্ট যাতনায় নিতান্ত জটিল ও ক্ষীণ একটি আধুনিক বাংলা কবিতার বই। পলায়নের আগে মহিলার কাছ থেকে তাঁর অসমান দন্তের কালোছায়া হাসি ও পুনশ্চ একটি নো-মোস্-কার লাভ করেছিলাম।

এই ভীমবলশ্রী ক্রিকেট-বিরূপা আমাকে মনে করিয়ে দিলেন অনুরূপ আকারের জনৈকা ক্রিকেট-প্রেমিকার কথা।

তিনি হলেন ইয়র্কশায়ারের অ্যানী।

বিখ্যাত ইংরেজ ক্রিকেটার বিল এডরিচ লিখেছেন: "সুবিখ্যাত মূর্তি! কোনো মহিলার ওজন নিয়ে প্রকাশ্যে পর্যালোচনা করা রুচিসঙ্গত নয়, কিন্তু লর্ডসে নিজ আসন গ্রহণে অগ্রসর, সম্পূর্ণ কৃষ্ণবসনা, জনতরঙ্গের মধ্যে সমুন্নত পর্বতপ্রমাণ সেই নারীবপুর তুল্য স্তম্ভিতকারী দৃশ্য অল্পই আছে!"

ইয়র্কশায়ারের অ্যানী উক্ত মাঠের নিত্য শোভা। তিনি ধীরগতি খেলার অধীর সমালোচক। তাঁর পছন্দের ক্রম আছে। প্রথম ইয়র্কশায়ার, দ্বিতীয় ইংলন্ড, তৃতীয় মিডলসেক্স। আকারের মহিমায় এবং কন্ঠের গরিমায় তিনি নিজের উপস্থিতিকে সর্বদা মনোযোগের বস্তু করে রাখেন। ক্যাপ্টেন ও খেলোয়াড়দের উদ্দেশ করে তিনি যেসব নির্দেশ নিক্ষেপ করেন, সেগুলো দুশো গজ দূর থেকেও অভ্রান্তভাবে লক্ষ্যভেদ করে। অ্যানী ক্রিকেট বোঝেন। তাঁর নির্দেশাবলী তাই অধিকাংশক্ষেত্রে নির্ভুল এবং সর্বক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক।

অ্যানী কেবল ক্রিকেট বোঝেন তাই নয়, ক্রিকেট খেলেনও, অবশ্য গ্যালারিতে। সেখানে যখন তিনি ব্যাটস'ম্যান' তখন তাঁর ব্যাট হচ্ছে ছাতা—যখন তিনি বোলার তাঁর বল হল পার্শ্ববর্তী বা বর্তিনীর মুন্ড—যখন ফিল্ডার তখন তাঁর নিক্ষিপ্ত বলের লক্ষ্যস্বরূপ তিনটি উইকেট আর কিছু নয়—সামনের বেঞ্চের তিনটি মনুষ্য। অবশ্য এই ধরনের ছাতাভাঙা, ঘাড়-মটকানো, ঝুঁটি-টানা ক্রিকেট উত্তেজিত না হলে অ্যানী খেলেন না। বাকি সময়ে তিনি ক্রিকেটারদের সুখসুবিধার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা চালিয়ে যান। বেনিফিট-ম্যাচের সময়ে ভিক্ষার টুপি হাতে অ্যানী গ্যালারিতে-গ্যালারিতে 'বৈশাখের সদুদ্দেশ্য মেঘ।'

ইয়র্কশায়ারের অ্যানী মাঠে না-থাকলে অদৃশ্য বিপুল শূন্যে মাঠ ভরে থাকে, আর মাঠে থাকলে, বীরযুগের ক্ষত্রনারীর ইদানীং নমুনা পাওয়া যায়।

১৯৪৮ সালে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট। ব্রাডম্যানের বিঘোষিত শেষ সফর। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে করল ৩৫০। ইংলণ্ড করল ২১৫। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ৪৬০ রান করে অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে অসম্ভব ড্র-এর দিকে (কিংবা সহজে সম্ভব পরাজয়ের দিকে) ঠেলে দিল। ৫৯৫ রানের গলায়-দড়ি ইংলণ্ডের উপরে ব্রাডম্যান-নামক বহুভুজ দানব ঝাঁপিয়ে পড়ল লিণ্ডওয়াল—জনস্টন—টোসাক—এই ত্রিভুজকে বিশেষভাবে সক্রিয় করে। মাঠে 'জীবন' হারিয়ে প্যাভিলিয়নের কেদারা-কবরে প্রস্থান করলেন একে-একে হাটন, ওয়াসব্রুক, এডরিচ। বন্যার মুখে উইকেট-কুটোকে চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারলেন না কম্পটন বা ডলেরী। এমন সময়ে এলেন ইয়ার্ডলে। বাইরের ভঙ্গিতে নম্র ও কুণ্ঠিত, আসলে অস্ট্রেলিয়ানদের সম্ভ্রমের পাত্র।

ভালো খেলা দেখতে পাওয়া যাবে এইবার—আসনে নড়েচড়ে ঠেসান দিয়ে বসেন ইয়র্কশায়ারের অ্যানী। ইয়ার্ডলে খেলতে লাগলেন অস্থির ও অনির্দিষ্টভাবে। এগারো রান করলেন এধার-ওধার। টোসাক বল করছেন। বাউণ্ডারির টিকেট-কাটা আলগা বল ভেসে এল টোসাকের হাত থেকে। নিশ্চিত বাউণ্ডারি।

উঁহু—বোল্ড!

সারা মাঠের মাথা তখন নেমে গিয়েছে কাঁধের দুর্বলতায়। বিষণ্ণ কলরবের পুঞ্জিত বাষ্প হঠাৎ ছিঁড়ে গেল তীক্ষ্ন কর্কশ এক শব্দে—ইয়র্কশায়ারের অ্যানীর গলা—

"ঐ বলটাকে চারের বাড়ি যদি মারতে না পারতাম তাহলে নিজের বুকে গুলি চালিয়ে মরে যেতাম।"

"ইন্‌ডোরের মধ্যে প্রবেশোন্মুখ ইয়ার্ডলের মুখ রাঙা হয়ে উঠল।"

পাঠকগণ, এরপরে একটি কথা নিশ্চয় আপনারা স্বীকার করবেন : ভারতীয় ক্রিকেটের চরিত্ররক্ষায় ইয়র্কশায়ারের অ্যানীর অনুরূপ হাওড়ার পঞ্চী, বারুই-পুরের ক্ষেন্তী কিংবা বাগবাজারের ভামুনির দরকার আছে।

* * * 'মজার খেলা ক্রিকেট' * * *

ইয়র্কশায়ারের অ্যানীর কথা যে-রচনায় বলেছি, তার নাম 'ভীমবলশ্রী' দেওয়া ঠিক হয়েছে কিনা বিজ্ঞ পাঠক নির্ধারণ করবেন। আমার জনৈক বিপুলাশ্রী বন্ধুপত্নীর সুরেলা কণ্ঠধ্বনি শুনেই মুগ্ধ হয়ে লিখেছি ভীমবলশ্রী (বস্তুত কথাটা ভীমপলশ্রী, কিন্তু 'ভীম'-এর পরে 'পল' মানায় না তাই 'বল' করেছি), নচেৎ অ্যানীর নামেও রচনাটির নামকরণ করা চলত : অ্যানীহিলেশন।

কোন্ নামটা ঠিক আমি এখনো জানি না, হয়ত দেশ-প্রীতিতেই আমি প্রথম নামটা নির্বাচন করেছি, কিন্তু শেষপর্যন্ত মনে হচ্ছে, ক্রিকেট লেখায় অ্যানীর নামটিই যুক্ত করা উচিত ছিল। আমার বন্ধুর উত্তাল 'মিসেসিপি' ক্রিকেটমাঠে গেছেন এমন কোনো বার্তা সেদিন শুনবার অবকাশ নিইনি।

কি জানি কেন, অ্যানীর সঙ্গে আর একটি নাম আমার মনে একই সঙ্গে উদিত

হয়—একজন বিখ্যাত ক্রিকেটারের নাম—যিনি খেলে এবং খেলা করে অ্যানীকে খুশি করতে সমর্থ ছিলেন। অ্যানীর আদর্শ ক্রিকেটার হবার যোগ্যতা ছিল প্যাটসি হেনড্রেনের। হয়ত বাস্তবে অ্যানী হেনড্রেনকে দারুণ পছন্দ করতেন, কিংবা আদপে পছন্দ করতেন না, প্যাটসির খাটো চেহারার হাজারো দুষ্টুমি অ্যানীর কাছে তৃপ্তিকর হতে পারে, নাও পারে, প্যাটসি সম্বন্ধে অ্যানীর মনোভাব ঠিক কি ছিল তা জানার সুযোগ আমার হয়নি, কিন্তু আমার মনে প্যাটসি ও অ্যানী একসঙ্গে ফুটে ওঠেই—'দি দর্শিকা'র 'দি ক্রিকেটার' রূপে।

প্যাটসি হেনড্রেন ইংলণ্ডের ক্রিকেটমাঠে রঙের রাজা ছিলেন। ডবলিউ জি গ্রেসের পরে আর কোনো ক্রিকেটার বোধহয় এতবেশি গল্পের আশ্রয় নন। তবে গ্রেস ছিলেন গল্পের রাজচরিত্র, আর প্যাটসি প্রজা। গ্রেস ও প্যাটসি একসঙ্গে থাকলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু গ্রেস-হীন প্যাটসির এমনই গ্রেস যে, তিনি ক্রিকেটের রাজতন্ত্রকে প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করে গল্পের প্রজা-প্রতিনিধি হয়ে বসে আছেন। গ্রেস ও প্যাটসির যদি কোনো কাহিনীতে একত্র বর্তমান থাকা সম্ভব হত, তাহলে গ্রেস নিশ্চয় বুড়ো রাজা সেজে বুড়ো প্রজা প্যাটসিকে একাসনে তুলে নিয়ে একসঙ্গে তামাক খেতে-খেতে গল্প করতেন।

নেভিল কার্ডাসের ভাষায়, প্যাটসি ছিলেন লর্ডসের গণতন্ত্রের প্রতিনিধি। প্যাটসি মজার কাহিনীর সৃষ্টি করতেন বলেই সকলের প্রিয় ছিলেন তাই নয়, প্যাটসির ব্যাটিংয়ের মধ্যেই এই প্রীতিকরতার সন্ধান পেয়েছেন কার্ডাস। বড় স্টাইলিশ ব্যাটসম্যান, তাই প্যাটসি জনপ্রিয়? তাও নয়। সকল সাফল্যের মধ্যেও প্যাটসির সভয় বালকত্বই তাঁকে প্রিয় করেছে। 'নিজের অর্জিত মহিমায় তিনি কখনোই বিশ্বাস করতে পারেননি সম্পূর্ণ।' প্যাটসি সোজা ব্যাটকে সামনে পিছনে দুলিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন না। 'মাঝারিয়ানার নির্ভরদণ্ড'রূপী সাধু ঋজু, সোজা ব্যাট প্যাটসির হাতে আঁকাবাঁকা হয়ে নীতি নষ্ট করত, আর তখনই -কার্ডাস অনবদ্যভাবে জানিয়েছেন—ঐ আদিম ভ্রান্তিতে আত্মীয়তা বোধ করত সকলে—আদিম ভ্রান্তিতেই মানুষ আত্মীয়।

কিন্তু এমন কথা কেউ যেন মনে না করেন, প্যাটসি মাঝারি খেলোয়াড় ও বিরাট রসিক ছিলেন। মোটেই নয়, তিনি ক্রিকেটের সর্বকালীন প্রধানদের একজন। ক্রিকেট খেলেছিলেন অন্তত তিরিশ বছর, এবং যে-রেকর্ড রেখে গিয়েছেন তা অতিক্রান্ত হয়েছে অল্প ক্ষেত্রেই।

"৫১টি টেস্টম্যাচে ৮৩ ইনিংস খেলে হেনড্রেন রান করেছিলেন ৩৫২৫, গড় ৪৭·৬৩। তাঁর সর্বোচ্চ টেস্টস্কোর ১৯৩০ সালে পোর্ট অব স্পেনে নট আউট ২০৫। প্রথমশ্রেণীর ম্যাচে তাঁর সেঞ্চুরির সংখ্যা ১৭০, জ্যাক হবসের ১৯৭টি সেঞ্চুরির পরেই এই সংখ্যা, গড় ৫০·৮০—রীতিমত সম্ভ্রমজনক। ১৩০০ ইনিংস খেলে, ১৬৬ বার নটআউট থেকে, ৫৭,৬১০ রান করে, ঐ গড় অর্জিত হয়েছিল। সর্বোচ্চ রান ৩০১ নটআউট। কাউন্টিম্যাচে হেনড্রেন পঁচিশবার এক মরশুমে হাজার রানের বেশি করেছেন, তার মধ্যে বারো বার দু'হাজার রানের বেশি, তিনবার তিন হাজারের বেশি। ওয়েস্টইণ্ডিজ সফরে সর্বাধিক মোট রানের গৌরবও তাঁর। ১৯২৯-৩০ সালে তাঁর সেই স্মরণীয় রেকর্ড-ভাঙা সিরিজে হেনড্রেন ১৮ ইনিংসে করেছিলেন মোট ১৭৭৫ রান, গড় দাঁড়িয়েছিল ১৩৫-

এর উপর।"

এইবার আসুন, বলেই ফেলি, হেনড্রেন ব্যাকরণ মানতেন না কারণ ব্যাকরণকে তিনি অতিক্রম করতেন। ব্যাকরণ মুখস্থ করেও স্টাইল অনায়ত্ত থাকতে পারে। হেনড্রেনের নিজস্ব স্টাইল ছিল। হেনড্রেনের স্ট্রোক অভিধানসিদ্ধ নয়, প্রয়োগ-সিদ্ধ। এসব কথা আর কি অবিশ্বাস করতে পারবেন যদি একবার উপরে-দেওয়া পরিসংখ্যানখানিতে চোখ বুলোন, এবং যদি মনে রাখেন হেনড্রেনের সদ্যোক্ত স্তুতি করেছেন বিরাট ক্রিকেট-সমালোচকেরা।

এত সাফল্য তবু হেনড্রেন বড়ো যন্ত্র নন। তাঁর বিপুল উৎপাদনের প্রতিটি খণ্ডকে কিভাবে প্রথমা জননীর মমতায় ভয়ে লালন করেছেন, তার সার সত্য উদ্ঘাটন করেছেন নেভিল কার্ডাস :

"হেনড্রেন জানেন, এক মরশুমে তিন হাজার রান করার মানে কি। অপরূপ ৭৭ গড় নিয়ে ইংরেজি-ক্রিকেটের অ্যাভারেজের মাথায় বসে থাকার ব্যাপারটাও তাঁর জানা আছে। কিন্তু অধিকার কিংবা আধিপত্য তাঁর হৃদয়কে অসাড় করে দেয়নি, তাঁকে বন্দী করেনি নিয়মের শৃঙ্খলে। সাফল্যকে তিনি কখনোই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিতে পারলেন না। অল্পবয়সী ছেলেরা ব্যাট করতে নেমে গোল্লা এড়াতে সদাই ব্যস্ত থাকে, ভয় পায় যে, বুঝি সে কাজটা পারল না। আজও প্যাটসি সেই ছেলেগুলির মতোই। এইখানেই আছে তাঁর প্রতি সকলের ভালবাসার মূল রহস্য। সাফল্যে তিনি কিছুতে অভ্যস্ত হলেন না। প্যাটসি যেভাবে প্রথম রানটি করে খুশিতে কৃতজ্ঞতায় ভরপুর হয়ে ওঠেন, এমনটি আর কাউকে হতে দেখা গেল না। কিভাবে না সেই রানটি নেবার জন্য তাঁর পাগুলি দুদ্দুড় করে ছোটে! ভয়ে শিউরে থাকেন, বুঝি রানআউট করে দিল। কখনো দেখবে না যে, হেনড্রেন মিডঅফে যেন কিছু নয়, অথচ সুনিশ্চিত পুশ্ করে প্রথম রান নিলেন। ঐ রকম পুশ্ করে অলসভাবে পিচের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে প্রথম রান নেওয়া হবসের ব্যাপার—সেই চরম ঘোষণা : হবস্ শুরু করেছেন। হেনড্রেন—হবসকে, আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি—চোদ্দ বছরের ছেলের মতোই ভয়ে-বিস্ময়ে অর্চনা করেন। কোনোদিন হয়ত দেখা যাবে, ওভালের বাইরে প্যাটসি কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন খেলোয়াড়দের বেরিয়ে আসার অপেক্ষায়—হাতে অটোগ্রাফ খাতা!'

অনবদ্য। একটা মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—সে দাঁড়িয়ে আছে তার চরিত্রটি গায়ে জড়িয়ে। এমনই কার্ডাসের রচনা। আমার এ-লেখা কিন্তু প্যাটসির ক্রিকেট নিয়ে নয়—ক্রিকেট ছাড়া আর একটা কিছু নিয়ে। সেটার নাম—এস্-বি-ডবলিউ।

না, ছাপার ভুল নয়, ওটা এল-বি-ডবলিউ নয়—এস্-বি-ডবলিউ। শব্দটি কার্ডাস-সাহেবেরই সৃষ্টি, প্যাটসির জন্য। তিনি বলেছেন—প্যাটসির হাসি এত বিস্তৃত যে, কখনো-কখনো ছোট মানুষটিকে তা ঢেকে ফেলে। একদিন হয়ত প্যাটসিকে আউট দেওয়া হবে—তিনি হাসি দিয়ে উইকেট আড়াল করেছেন বলে। 'One day he will be given out Smile Before Wicket.' 'স্মাইল বিফোর উইকেট' বাংলা করলে দাঁড়ায়—'আগে-হাসি-উইকেট'। সে ক্ষেত্রে এস-বি-ডবলিউ-এর বদলে বাংলা ডাক হবে প্যাটসি সম্বন্ধে—আ-হা-উ!

প্যাটসির হাসির গল্প সংখ্যায় প্রচুর। প্যাটসি, হাসির গল্পে অংশ নিতে এবং হাসির গল্প বলতে—দুই কাজই ভালো পারতেন। দু'-একটি তুলে ধরছি। নিম্নের গল্পটি প্যাটসি কম্পটনকে বলেছিলেন :

হ্যামণ্ড ও হেনড্রেন যাচ্ছেন ম্যাঞ্চেস্টারে টেস্ট খেলতে। তাড়াহুড়োয় ট্রেনে ওঠার আগে লাঞ্চ সেরে নিতে পারেননি তাঁরা। অগত্যা মধ্যাহ্নভোজনের প্রয়োজনে কিছু স্যাণ্ডউইচ কিনে নিয়েছেন দুজন। তারপর ট্রেনে উঠে একটা কামরা খুঁজে নিয়ে তাঁরা আরাম করে এক কোণে গদীয়ান হয়েছেন। ট্রেন ছাড়ে-ছাড়ে, এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে কামরায় উঠলেন এক পাদরী—উঠে হাঁপাতে-হাঁপাতে প্রায় কোনো দিকে না চেয়ে ধপ্ করে বসে পড়লেন হ্যামণ্ডের ঠিক উল্টোদিকে। অবশ্য কোনো কথাবার্তা হল না তাঁদের মধ্যে। ট্রেন ছেড়ে দিল, দুজন ক্রিকেটার ব্যাগ খুলে স্যাণ্ডউইচের মধ্যাহ্নভোজন সারতে আরম্ভ করলেন।

শেষে স্যাণ্ডউইচটি নির্দিষ্ট গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে হ্যামণ্ড স্যাণ্ডউইচ-মোড়া কাগজটি ডেলা করে পাকিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন। কিন্তু জানলার গরাদে লেগে ফিরে এসে একেবারে পাদরীর কোলে গিয়ে পড়ল। পাদরী কোল থেকে সেটা তুলে গম্ভীর হয়ে বললেন—মহাশয়ের বোধহয় ক্রিকেট-ট্রিকেট খেলা হয় না।

[এখানে দুটি প্রয়োজনীয় টীকা আছে : এক ইংলণ্ডের পাদরীকুল ক্রিকেট-প্রীতির জন্য বিখ্যাত। দুই, যিনি মিস্থ্রোর জন্য তিরস্কৃত হলেন তিনি ক্রিকেট-ইতিহাসে সর্বযুগের একজন সেরা ফিল্ডসম্যান।]

প্যাটসি মজা করতেন সকলকে নিয়ে। নিজেকে নিয়েও। হ্যামণ্ড একবার মাঠে ফিল্ডিং করার সময়ে অনুভব করতে লাগলেন, কি-একটা গণ্ডগোল হচ্ছে, সবাই যেন হাসছে। হল কি? কিন্তু ফিরে তাকালে দেখেন সব ঠিকঠাক, যথারীতি, সবাই গম্ভীর। পিছনে ছিলেন হেনড্রেন। হ্যামণ্ড বুঝলেন, ঐ দুষ্টের শিরোমণি কিছু গণ্ডগোল করছে। একবার বল কুড়োবার সময়ে মাথা নীচু করে হ্যামণ্ড দেখে নিলেন : যখনই তিনি বল ধরলেন, অমনি প্যাটসি ভঙ্গি করে তাঁকে ভেঙালেন, তাতে মুখ টিপে হাসল সবাই। হ্যামণ্ড এবার তৈরি হয়ে রইলেন। পরের বার বল পেয়েই না-ঘুরে পিছন দিকে প্যাটসির গায়ে ঝাঁ করে বল ছুঁড়ে দিলেন। এবার হাসির নয়, কাঁদার পালা হেনড্রেনের।

প্যাটসি ফিল্ডিংয়ের সময়ে নানা ধরনের ফন্দিবাজি করতেন। লেটকাটের বল চকিতে একহাতে তুলে নিয়ে পকেটে পুরে ছোকরা ফিল্ডম্যানকে দেখিয়ে দেন বাউণ্ডারি। সে সকলের অট্টহাসির মধ্যে যখন বেড়ার দিকে ছুটল তখন প্যাটসি বলটি ফিরিয়ে দিলেন বোলারকে।

দর্শকের সঙ্গে বেড়ার ধারে প্যাটসির জমত সবচেয়ে ভাল। কাটা-কাটা কথার জন্য অস্ট্রেলিয়ার দর্শক বিখ্যাত! প্যাটসির সঙ্গে তাদের বিনিময় হোত সমানে-সমানে। ঘা খেয়ে প্যাটসিই হাসতেন সবচেয়ে বেশি। প্যাটসির চেহারা খুব সুন্দর ছিল না। যথার্থ রসিকের মতো নিজের অসুন্দর চেহারাকে তিনি নিজেই তামাশার বিষয় করে তুলতেন। গল্প আছে, অস্ট্রেলিয়ার দর্শক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—ও মশাই, তুমি বুঝি পাতৌদি? প্যাটসি বললেন—আমি হব কেন? ওই যে—। বলে পাতৌদিকে দেখিয়ে দিলেন।

দর্শক তখনি বলল—তাতো বটেই, আমারই ভুল, নবাবপুত্তুর কি তোমার মতো চেহারার হয়?

এমনিভাবে একবার টেস্টের সময়ে অস্ট্রেলিয়ান দর্শক প্যাটসিকে নিয়ে মজা শুরু করল—আচ্ছা তোমাকে দলে এনেছে কেন? প্যাটসিও কৌতুক করে উত্তর দিলেন—কারণ সুন্দর চেহারা ছাড়া ওরা কিছু সঙ্গে আনবে না ঠিক করেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে সিটি দিয়ে একজন চেঁচাল—তোমার বেলায় ব্যতিক্রম হল কেন? সকলের সঙ্গে একইভাবে অট্টহাস্য করলেন হেনড্রেন।

প্যাটসি একটি মজার গল্প বলতে খুব ভালবাসতেন। সেটি এই : অস্ট্রেলিয়া-সফরে এম-সি-সি দল একবার নৌকো করে প্রমোদ-ভ্রমণ করল সমুদ্রে সিডনি থেকে কিলার্নে দ্বীপে। দ্বীপটি সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। সেখানে সবাই যায় মুক্ত আকাশের তলায় পিকনিক করতে। যখন এম-সি-সি সদস্যেরা দ্বীপে নামছেন তখন একটি বালক ক্রিকেটখেলা ছেড়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—আপনারা দলে আছেন ক'জন?—জন বারোর মতো।—তাহলে আপনাদের আমরা ক্রিকেট-খেলায় চ্যালেঞ্জ করলুম—বালক সগর্বে বলল।

'অস্ট্রেলিয়ান-একাদশের' অধিনায়ক যে আগন্তুকদের একেবারে আনাড়ি ধরেছে, তা ভাবে-গতিকে বেশ বোঝা গেল। হেনড্রেনের ব্যাট করার পালা যখন এল, তখন ঐ আমুদে মানুষটি ছেলেগুলির ধারণাকে বজায় রাখতে চাইলেন। প্রথমত তিনি ব্যাট ভুলভাবে ধরলেন—বাঁ হাত রাখলেন হ্যাণ্ডেলের তলায়, ডান হাত ওপরে, তাতে মিত্রভাবাপন্ন উইকেটকীপার তাঁকে ঠিকভাবে ব্যাট ধরার পদ্ধতি দেখিয়ে বলল—এইভাবে আপনি আরও স্বচ্ছন্দে খেলতে পারবেন। যখন প্রথম বলটিকেই হেনড্রেন সমুদ্রে ফেলে দিলেন তখন তাঁর 'কোচ'-এর গর্বের সীমা রইল না।—'কী বলেছিলুম? হুম্, ঠিকভাবে ব্যাট ধরার উপরেই সব নির্ভর করে।'

ইতিমধ্যে বালকদের একজন প্যান্টমুক্ত হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটি উদ্ধার করে এনেছে।

খেলাটি আবার আরম্ভ হয়ে যায়—উইকেটকীপার আবার দেখল, হেনড্রেন সেই আগের মতোই উল্টোহাতে ব্যাট ধরে আছেন। তখন সে বোলারকে থামিয়ে আবার হেনড্রেনকে ব্যাট-ধরার সঠিক পদ্ধতি বিষয়ে উপদেশ দিল। এবার তার স্বদলের খেলোয়াড়রা প্রতিবাদ না জানিয়ে পারল না। কিন্তু নিজ মহত্ত্বে গর্বিত উইকেটকীপার তাদের কথায় কর্ণপাত করল না। অতঃপর হেনড্রেন যখন বলটিকে সমুদ্রগর্ভে এমন দূরে পাঠিয়ে দিলেন যে, পুনরুদ্ধারের কোনো আশাই রইল না, তখন খেলাটির অকালসমাপ্তি ঘটল।

এই পরিস্থিতিতে আগন্তুকদল ক্রিকেটের সঙ্গে পরিচিত কিনা সেই নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান-একাদশের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেল। অধিকাংশের মতে, আগন্তুকরা কেউই আনাড়ি নয়। কিন্তু তাতে উইকেটকীপার ঝলসে উঠল প্রতিবাদে—কি বকছ? শেষ লোকটা যে ব্যাটই ধরতে জানে না! কথাটা প্রহৃত বোলারটির পক্ষে অসহ্য ঠেকল। সে চটে বলল—খুব হয়েছে, ঐ লোকটা এতই আনাড়ি যে, দু'বার বল সমুদ্রে পাঠিয়েছে যা একবার করবার সাধ্যিও তোমাদের কারোর নেই।

ইংরেজরা যখন নৌকায় উঠছে, তখন প্রহৃত 'অস্ট্রেলিয়ান' বোলার এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—'আমার মনে হয়, আপনি বোধ হয় হেনড্রেন।' সেই শুনে তার বন্ধুরা হেসে গড়িয়ে পড়ল।—আরে উনি যদি হেনড্রেন হন—একজন বলল—'তাহলে আমি চার্লি ম্যাককার্টনি।'

হেনড্রেনের দুষ্টুমি কখনো-কখনো শয়তানীতে পৌঁছেচে। তার একটি ক্ষুদ্র কাহিনী দিয়ে প্রসঙ্গশেষ করি :

১৯২৯ সালে এডিলেডে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্কট অবস্থা। আগের তিনটি টেস্ট সে হেরেছে। এই চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে করেছে ৩৩৪, অস্ট্রেলিয়া ৩৬৯। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড করল ৩৮৩। অস্ট্রেলিয়া জিতবে কি ?

ইনিংসের শেষের দিকে একটা অবস্থা এলো যখন দু' উইকেটে ২৩ রান করলে অস্ট্রেলিয়া জিতবে। যখন ১৩ রান বাকি তখন গ্রিমেট আউট হলে ব্ল্যাকি এলেন।

ব্ল্যাকি মোটেই ব্যাটসম্যান নন। ব্ল্যাকি যখন ব্যাট হাতে নিয়ে উইকেটের দিকে যাচ্ছেন হেনড্রেন তাঁর পাশ নিলেন—'ওহে ছোকরা'—হেনড্রেন বেদনায় করুণ —'তোমার অবস্থায় যেন আমাকে পড়তে না হয়'—সহানুভূতিতে তিনি একেবারে বিগলিত।

ব্ল্যাকি থমকে দাঁড়ালেন। সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'সেকি ? কেন ?'

হেনড্রেন ব্ল্যাকির পাশে চলতে চলতে বললেন—'না তেমন কিছু নয়, তবে কি জানো, আমি টেটকে এমন অদ্ভুত বল করতে কোনদিন দেখিনি। আর...জ্যাক হোয়াইট—ডেনজারাস ! পিচের অবস্থা ? নিজেই বুঝবে। তবে ছোকরা, সাহস করে খেলবে কিন্তু, একদম ভয় করবে না,...আমি আর কি করতে পারি বলো।'

'বুড়ো শয়তান ! চুপ মার'—রাগে গোঁ-গোঁ করতে-করতে ব্ল্যাকি উত্তর দিলেন।

বলাবাহুল্য ইংলণ্ড জিতল সেই খেলায় ১২ রানে। ব্ল্যাকি শূন্য রান করেছিলেন। হেনড্রেনের সদুপদেশের জন্য ? হাঁ এবং না। নির্ভেজাল হাঁ বলতে পারতাম, যদি-না এই কাহিনীটা প্রচলিত থাকত।

ব্ল্যাকি যখন ব্যাট করতে যাচ্ছেন ঠিক তখনই ফোন করলেন ব্ল্যাকির অর্ধাঙ্গিনী। প্যাভিলিয়ন থেকে জানানো হল : দুঃখিত, ব্ল্যাকি এইমাত্র ব্যাট করতে বেরিয়ে গেলেন।

'না না, দুঃখিত হবার কারণ নেই'—ব্ল্যাকির বউ উৎসাহ দিয়ে জানালেন—'আমি না হয় একটু ফোন ধরেই থাকব।'

❋ ❋ ❋ চার হৃদয়, এক চোখ ❋ ❋ ❋

তিন দানবের এক চোখের কথা অনেকেই পড়েছেন গ্রীক-পুরাণে। গ্রীক বা ভারতীয় সব পুরাণই নানা অসম্ভবে আক্রান্ত। কিন্তু আমাদের খুব কাছাকাছি আরও একটি সৃষ্টি আছে, গঠনবৈগুণ্যে যা নিতান্ত বিস্ময়কর, তা সকলে হয়ত খেয়াল করে দেখেননি। উক্ত বস্তুটির হৃদয় সংখ্যায় চার, এবং চোখ মাত্র এক। বস্তুটির নাম ক্রিকেট। তবে এখানে আমি সবিনয়ে স্বীকার করছি, আমার মতো

ক্ষীণদৃষ্টির ক্রিকেট-দর্শন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। আমার বিশ্বাস অতঃপর কোনো উচ্চশ্রেণীর দ্রষ্টা আরও বেশি সংখ্যায় ক্রিকেট-দেবতার হৃদয় এবং নয়ন দর্শন করে 'ক্রিকেটীয়দের' ভক্তিপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করবেন।

ক্রিকেটের চোখটি কিন্তু পাথরের। সে চোখ স্কোরারের—খেলোয়াড়ের কীর্তি এবং আম্পায়ারের নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ থেকে পাঁচশো পর্যন্ত অঙ্কপাত যিনি নির্বিকারে করে থাকেন। হৃদয় তাঁর নিশ্চয়ই আছে, তিনিও চঞ্চল হন, উত্তেজনা কিংবা আতঙ্কে তাঁর হাত কাঁপতেও পারে, কিন্তু গণিতে ভুল হয় না। প্রীতি বা বিদ্বেষ রানসংখ্যা বা বোলিং, ফিল্ডিং-এর হিসেবকে ওলট-পালট করতে পারে না।

যাঁরা হস্তলিপি দেখে মানুষের চরিত্র অনুমান করতে পারেন, তাঁদের ক্ষমতার প্রতি আমার ঈর্ষামিশ্রিত সম্ভ্রম আছে। যদি সেই ক্ষমতা থাকত তাহলে একবার স্কোরারের খাতাখানা টেনে নিয়ে তাঁর অঙ্করেখার বিন্যাস থেকে অনুমান করবার চেষ্টা করতাম মনোভাবের প্রকৃতি। অনুরাগের বা অনিচ্ছার ভাষা স্পষ্ট পড়ে নিতাম আপাত নিস্পৃহ সংখ্যাতত্ত্বের ভিতর থেকে। কেননা আমি জানি, পাথরের চোখ বসানো থাকে নরম সজল অনুভূতিশীল একটি রক্তমাংসের আধারে—শুধু তাই নয়, সত্যকার চোখকে হারিয়ে সে আধারের স্পর্শকাতরতা হয়ত বেড়ে গিয়েছে।

পাথরের চোখের কারুণ্যের কথা আপনারা শুনে থাকতে পারেন—সেই উচ্চাঙ্গের রসিকতাটি! ধনী বন্ধুর কাছে এসেছে দরিদ্র বন্ধু, সব দরজায় ধাক্কা খাওয়ার পরে। সে জানে দরিদ্রের দরজা যদি বন্ধ হয়, ধনীর দরজা সেখানে খোলে না—সোনারূপোর বল্টু-আঁটা বড় ভারী সে দরজা। তবু ক্ষুধা আর প্রয়োজন মাথা কোটে সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায়। শেষ চেষ্টা ধনী বন্ধুর কাছে, যদি দেউড়ি খোলে!

দরিদ্র বন্ধুর প্রার্থনা শুনে ধনী বন্ধু কিন্তু উচ্ছল হয়ে উঠল। 'টাকা চাও? নিশ্চয় পাবে, দশ হাজার টাকা দেব, যদি ঠিক ক'রে বলতে পারো। দেখো, কিছুদিন আগে আমার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল'—ধনী বন্ধু বলতে লাগল—'অনেক টাকা খরচ ক'রে আমি একটা পাথরের চোখ তৈরি করেছি। তুমি যদি বলতে পারো কোনটি নকল চোখ, তাহলে দশ হাজার টাকা তোমাকে দেবই দেব। এ-পর্যন্ত কেউ সঠিক বলতে পারেনি। হাঃ হাঃ।' প্রস্তর চক্ষুর গর্ব অট্টহাস্য করে উঠল।

দরিদ্রটি খানিকক্ষণ তাকাল ধনীর কৌতুকপ্রফুল্ল মুখের দিকে, তারপর আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল—'ওইটা পাথরের চোখ।'

সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে চেকবই বার করে দশ হাজার টাকা লিখে দিয়ে বিস্মিতভাবে ধনী শুধোল—'আশ্চর্য, ঠিক বলেছ! কিন্তু কি ক'রে বললে বল তো?'

—'দু'চোখের মধ্যে যেটাতে একটু করুণার আভাস দেখলাম, বুঝলাম, সেটাই পাথরের'—দরিদ্র জানাল।

এই কাহিনী শোনার পর থেকে পাথরের সম্বন্ধে ধারণা আমার বদলেছে। আমার সর্বপ্রকার সহানুভূতি তাঁদের বিষয়ে, যাঁরা দিনের পর দিন স্কোর-

লিখে গিয়েও স্কোরের উপর নিজের হৃদয়ের মুদ্রণ এঁকে দিতে পারেন না।

একবার মাত্র একজন স্কোরার পেরেছিলেন—বিখ্যাত ডবলিউ জি গ্রেসের সময়ে—ডবলিউ জি যেবার চারশো রান করেছিলেন। ঘটনাটি বলা দরকার, কারণ আমার জানা এই একটি ক্ষেত্রেই মানবিক স্বাধীনতাকে উপভোগ করেছেন স্কোরার।

সেটা হল ডবলিউ জি-র সুবিখ্যাত ১৮৭৬ সাল। ক্রিকেটের পামীর মালভূমিতে তখন তাঁর রাজত্ব। ঐ বছর জুলাই মাসে গ্রিমস্‌বি-তে স্থানীয় দ্বাবিংশের সঙ্গে ইউনাইটেড সাউথের খেলা। খেলার আগে গ্রিমস্‌বি-র অধিনায়ক বললেন, ডাঃ গ্রেস যে-দল এনেছেন, তা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। কথাটা না বললেই ভালো করতেন। প্রথমদিনের শেষে আগন্তুক দল করল দু' উইকেটে ২১৭—তার মধ্যে ডাঃ গ্রেস ১৩৬ নটআউট এবং তাঁর ভাই ফ্রেড গ্রেস নটআউট ৩৯। বাইশজন ফিল্ডসম্যান ও মাঠ-ভর্তি বড়ো-বড়ো ঘাসের মধ্যে বল গলিয়ে-গলিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে ডাঃ গ্রেস নটআউট ৩১৪—যার মধ্যে খুচরো রান ১৫৮। ঐ দিনের শেষেই ডাঃ গ্রেস সুখবর পেলেন টেলিগ্রামে—ভালয়-ভালয় তাঁর দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। গ্রেস-পরিবারের নতুন শিশুর কল্যাণে শ্যাম্পেন পানোৎসব হল। তৃতীয় দিনেও ডাঃ গ্রেস অসমাপ্ত ইনিংস শেষ করতে পারলেন না, কারণ ৬৮১ রানে যখন তাঁর দলের শেষ উইকেট পড়ে গেল, তখনো তিনি অপরাজিত। গ্রিমস্‌বির লোকেরা এখনো দিব্যি গেলে একটা কথা বলে থাকে। ডাঃ গ্রেস প্যাভিলিয়ানে ফিরে গিয়ে নিজের স্কোর জানতে চাইলেন—খেলার সময় প্রতি খেলোয়াড়ের স্কোর জানানোর ব্যবস্থা সেই মাঠে ছিল না—স্কোরার জানালেন—ডাঃ গ্রেসের রান ৩৯৯। হেসে উঠে ডাঃ গ্রেস বললেন—ঠিক আছে ওটাকে ৪০০ করে দাও। সহাস্যে অনুমোদন করে স্কোরারও বললেন—তাই হবে। অমন একটা ইনিংস আপনি খেলেছেন এবং একটা সুন্দর শিশুর জন্ম হয়েছে, আপনি একটা রান বেশি পেতে পারেন।

সেইভাবেই নাকি সমস্ত রেকর্ডে ডাঃ গ্রেসের নামের পাশে ৪০০ নটআউট লেখা আছে।

চিত্রগুপ্তের বংশধরের স্বাধীন বিবেচনাশক্তি ও হৃদয়বত্তার এই একতম পরিচয়ে আমি মুগ্ধ। চিত্রগুপ্ত আমারও আদি পুরুষ।

ক্রিকেটের চারটি হৃদয়ের যেটি সবচেয়ে অগভীর অথচ উত্তাল, নিরন্তর বিক্ষুব্ধ কিংবা নিঃশ্বাসরুদ্ধ—সে অংশে থাকি আমি—সেটি হল দর্শকদের গ্যালারি। তার কথা অজস্রভাবে বলেছি নানা স্থানে, বলবও, যখনি সময় পাবো। কাব্য করে বলতে পারা যায় শেষের কবিতার ভাষায়, আমরা হলুম স্বচ্ছধারা ঝরণা, আমাদের উপরই সূর্য-তারার ছায়াপাত। কিন্তু যেখানে ডুবুরি নামালেও তল পাওয়া যাবে না, সেটাই হচ্ছে ক্রিকেটের সবচেয়ে গুরুতর হৃদয়—নির্বাচকদের পরামর্শকেন্দ্র। হৃদয়ের চেয়ে বোধহয় মস্তিষ্কের সংগে এখানকার সম্বন্ধ বেশি। দেশব্যাপী অসংখ্য রত্নরাজির মধ্যে রাজকণ্ঠের মাল্য-রচনার উপযোগী কয়েকটি মাত্র রত্ন এঁদের নির্বাচন করতে হয়। কিংবা যেখানে রাজার বাস বন-

গ্রামে (যেমন আরণ্যক ভারতবর্ষে), সেখানে যৎসামান্য যা আছে, তাকেই পালিশ করে কিভাবে উপস্থিত করা যায়, অস্থির হতে হয় তারি চিন্তায়। নির্বাচকদের অবস্থা শোচনীয়—অগ্র বা পশ্চাৎ, যে-কোন ক্ষেত্রেই নির্বংশের বংশধর হওয়া অবধারিত। নির্বাচকেরা তাই জনসাধারণের অনভিজ্ঞতায় বিরক্ত, সমালোচকদের দায়িত্বহীন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ, এবং অনির্বাচিত খেলোয়াড়দের বিবেচনাবুদ্ধির অভাবে অসন্তুষ্ট। তাঁরা বলেন, দলে যে এগারো জনের বেশি লোকের ঠাঁই হতে পারে না, এ জ্ঞান তোমাদের কবে হবে? তাঁরা বলেন, বিশেষ রাগ করে, প্রতিটি ভোটদাতাই আমাদের চেয়ে অনেক যোগ্য নির্বাচক। ইংরেজ-নির্বাচক ডগলাস ইনসোল বলেছেন—গ্রেট ব্রিটেনে তেমন আত্মনির্বাচিত নির্বাচকের সংখ্যা অন্তত দু'কোটি। ঐ দিব্যদ্রষ্টা দু'কোটি ঋষি যে, 'নির্বাচক নামধেয় বুদ্ধুদের' থেকে ঢের ভাল দল বাছে তাতে সন্দেহ নেই—তবে তাদের তৈরি দু'কোটি দলের একটি কদাপি অন্যটির সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে না। তালিকাগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, ব্যাট ধরতে পারে এমন প্রাপ্তবয়স্ক সব ইংরেজই টেস্টখেলার যোগ্য।

ইনসোল সাহেব চটে গিয়ে একটি চমৎকার লেখা উপহার দিয়েছেন নির্বাচকদের পক্ষ থেকে। তাতে আছে: জনসাধারণের বিচারে নির্বাচক হতে গেলে প্রধান কর্তব্য প্রতিটি সংবাদপত্র পড়া এবং সেখান থেকে জেনে নেওয়া—কাদের প্লেস না দিলেই নয়। ঐ সব কাগজ পড়ে (বেশি নয়, গোটা-বাইশ কাগজ পড়লেই চলবে) অ্যাভারেজের উপর চোখ বুলিয়ে খেলার প্রতি বিভাগের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের নাম লিখে নিয়ে দল তৈরি করলেই সবচেয়ে ভালো ভারসাম্যযুক্ত দল পাওয়া যাবে। যে-দল তৈরি হবে তাতে ৭ জন মাঝখানকার ব্যাটসম্যান ও ৪ জন দ্রুত বোলার খেলবে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান? স্লো বোলার? উইকেটকীপার? দরকার কি? কি দরকার ফিল্ডিংয়ের হিসেব নেওয়া?

ইনসোল সাহেবের মহাক্ষোভ: নির্বাচকেরা কখনো 'জয়ী' হন না। যখন ইংলন্ড জেতে তখন প্রতিপক্ষ দুর্বল যখন হারে তখন নির্বাচকেরা দুর্বল-মস্তিষ্ক। যদি নির্বাচকদের কোনো ঝুঁকি সফল হল—সেটা যে হবে সে তো সকলেরই জানা, আর ব্যর্থ হলে—সেটাও 'সকলের জানা'—নির্বাচকদের ও-মূর্খামি সফল হতেই পারে না। এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণের মতামতের হিসেব নিলে নির্বাচকদের আবশ্যিক গুণাবলী দাঁড়ায়: পুরুতম চামড়া, ঘুষা-কর্ষণের প্রণালীজ্ঞান, ক্ষমতাসক্তি, পক্ষপাতিত্বের দরজা-আঁটা মন। অতগুলি গুণ হয়ত একই খুলির তলায় অধিষ্ঠান করতে পারে না। কিন্তু যদি করে তাহলে সেই ব্যক্তিই হন নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি। বউকে বুঝিয়ে, অফিসকে ঠেকিয়ে, চারমাস প্রতি শনিবার সর্বপ্রকার ক্রিকেট দেখার বাধ্যতামূলক প্রমোদে অতিবাহিত করে, নির্বাচকেরা শুনলেন—মাঠবিহারী একটি মেষশাবকও তাঁদের থেকে বেশি বুদ্ধি ধরেন।

স্বাধীনতা-পূর্বে ভারতীয় নির্বাচকদের ছিল প্রাণান্ত দায়িত্ব—একদিকে রাজন্যবর্গ ও তাঁদের পার্ষদ পরিজনদের রিজার্ভ সিট, অন্যদিকে বাকি আসনের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। ওয়েস্টইন্ডিজের ক্ষেত্রে সাদা-কালোর বাঁটোয়ারার সঙ্গে আবার দ্বীপে-দ্বীপে লড়াই—কোন্ দ্বীপের ক'জন দলে যাবে? সেখানে নির্বা-

চকদের বিশেষ কর্তব্য—মারামারি করে দলের মধ্যে মাতৃদ্বীপের খেলোয়াড় বেশি ঢুকিয়ে দেওয়া। এই সমস্ত ব্যূহের মধ্যে পথ করে যাঁদের এগোতে হয়, সেই নির্বাচকরা যদি বুদ্ধির দ্বারা নিজেদের আবেগহীন করে তুলতে না পারেন, তাহলে তাঁদের জন্য আছে 'দুশ্চিন্ত' দিবস এবং বিনিদ্র রজনী।

নির্বাচকদের কি-না বিবেচনা করতে হয়। মাঠের অবস্থা: মাঠ পাথরে বাঁধানো কি 'মাদুরে' ঢাকা? ভিজে কি শুকনো? ভাঙা কি ভাঙবে ভবিষ্যতে? খেলোয়াড়ের কথা: ব্যাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে, না ব্যাট ছুঁড়ে দেবে খুশি-মতো? বুক পেতে নেবে বোলারের মার, না, মেরে বোলারের বুক ভেঙে দেবে? নেটে যে ছোকরা অদ্ভুত, টেস্টে সে ছোকরা ভূত হয়ে যাবে কি না? বোলারের কথা: স্পিন বেশি ঘুরবে, না সুইংগ বেশি ছুটবে? বল পড়ে লাফাবে, না, গোঁত্তা খেয়ে ঢুঁ মারবে? দর্শকের কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না: অমুক ছোকরাকে ঠাঁই না দিলে মাঠে কতগুলো পটকা ফাটবে এবং কাঁসর-ঘণ্টা-সহ-যোগে পাঁঠাবলির কি ধরনের উদ্যোগ চলবে—চিন্তার শেষ কোথা?

সবচেয়ে বড় চিন্তা—হৃদয়ের চিন্তা—রোজ সকালে যার হাসিমুখ দেখি, দুপুরেও যে গুডমর্নিং করে, সন্ধ্যাকালে পুষ্পগুচ্ছ উপহার দেয় বিনীত মস্তকে—তাকে দলে কোনোক্রমে প্রবেশ করানো যায় কি করে? অন্য নির্বাচক-দেরও তো পুষ্পসরবরাহকারী আছে, আর আছে তিল দোষকে তাল করতে পটু খবরের কাগজ।

প্যাভিলিয়ানের সবচেয়ে সম্মানের আসনের তলায় ডি-ডি-টি দিয়ে ছারপোকা মেরে ফেলা হয়েছে—চিন্তার ছারপোকাগুলো যে অব্যাহতি দেয় না।

তৃতীয় হৃদয়টিকে বাইরে থেকে মনে হতে পারে গুরুতম, কিন্তু তা যে নয়, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। থিয়েটারের গ্রীনরুম থেকে অভিনেতা বেরিয়ে আসে, কিন্তু আসলে সে বেরিয়ে আসে কোথা থেকে? তাই ড্রেসিংরুমকে যেন ক্রিকেটে বেশি মর্যাদা দিয়ে না ফেলি। কোনো আদিমকালে—যখন সর্বাত্মক বার্টার ব্যবস্থা চালু ছিল সমাজে, যখন যে শিকার করত সেই আগুন জ্বালাত, মাংস ঝলসে নিত এবং নিজেকে নিজেই পরিবেশন করে পরিবেশিত খাদ্য নিজেই গ্রহণ করত—তখন হয়ত ক্রিকেটারের শিবিরের মর্যাদা ছিল। কিন্তু এখন?—আপনারা জানেন যে, ডিনার-লাঞ্চ তৈরি হয় না শাজাহান হোটেলের পাকশালায়—মালিক-ম্যানেজার তাকে টাকশালে পূর্বাহ্ণে প্রস্তুত করে রাখেন।

সুতরাং ড্রেসিংরুম আধুনিক ক্রিকেটে আপেক্ষিকভাবে রিক্ত হৃদয়। তবু তো হৃদয়! আমাদের সকলের মনের মধ্যেই একটা কৌতূহলী বালক আছে, যে পাড়ার থিয়েটারের গ্রীনরুমে উঁকি দেবেই বারংবার ধমক সত্ত্বেও। উঁকি দিয়ে দেখে কি? কাজের সুবিধার জন্য আমি 'দৃশ্য'গুলিকে ভাগ করে ফেলেছি:

যথা হাসপাতাল: যেমন বার্নসের বর্ণনা অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে ইংলণ্ডে সাসেক্স কাউণ্টি-গ্রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ানগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ড্রেসিংরুম। রে লিণ্ড-ওয়াল ইনফ্রা-রেড ল্যাম্পের তলায় শায়িত: বিল জনস্টন লম্বমান মর্দন-চৌকিতে; ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় একপাশে ফিরে আছেন রিচি বেনোড, এবং কাত হয়ে কাতরাচ্ছেন একপায়ের উপর নির্ভরশীল কিথ মিলার।

যথা নাট্যশালা : ১৯৫০ সালে ইংলণ্ডে ক্যালিপসো-মুখরিত ওয়েস্টইণ্ডিয়ান ড্রেসিংরুম। কিংবা তারো পূর্বে ১৯৪৮ সালে দল থেকে নিয়মিত বাদ-পড়া অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে ব্যঙ্গকরণ নৃত্যগীত।

যথা পাঠশালা : বডিলাইন-সিরিজের পরে ১৯৩৪ সালে উডফুল ইংলণ্ডে অস্ট্রেলিয়ান দল নিয়ে গিয়েছিলেন। উভফুল বৃত্তিতে স্কুলমাস্টার। তিনি মাষ্টারি বজায় রাখতেন ড্রেসিংরুমেও।

কম্পটন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম অবতরণে সেঞ্চুরি করে ও আউট হয়ে যখন উৎফুল্লভাবে ড্রেসিংরুমে ফিরেছিলেন, তখন অধিনায়ক হ্যামণ্ড ডবল সেঞ্চুরির চেষ্টা না করার জন্য তাঁকে কি রকম শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার বিবরণ আগেই দিয়েছি।

যথা প্রতীক্ষালয় : কখনো প্যাড পরে শবরীর প্রতীক্ষা, যখন ব্রাডম্যান ব্যাট করতে গেছেন পন্সফোর্ডের সঙ্গে। কখনো ছুটন্ত বিমানে প্যারাসুট-সৈনিকের প্রতীক্ষা, যখন ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা নেমেছেন ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে।

প্রতীক্ষার একটি কৌতুকজনক ঘটনার উল্লেখ করি। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ওভাল-টেস্টের আগে ইংলণ্ডের উইকেটকীপার এমস্ অসুস্থ হয়ে পড়লেন সহসা। দ্বিতীয় যোগ্য উইকেটকীপার ইয়র্কশায়ারের আর্থার উড। অধিনায়ক হ্যামণ্ড ফোনের পর ফোন করে নটিংহামে যখন তাঁর সঙ্গে সংযোগ করতে পারলেন তখন রাত আটটা এবং শেষ ট্রেন চলে গেছে।

জলদি এসো, এখনি, একটুও দেরি না করে—হ্যামন্ডের অধীর গলা।

যাবো কি করে, ট্রেন নেই—তা ছাড়া—উড ধাতস্থ হতে সময় নেন।

কোনো কথা নয়, ব্যাগ নিয়ে উঠে পড়ো ট্যাক্সিতে—হ্যামণ্ড সিদ্ধান্ত দিলেন।

পরদিন ওভালে ট্যাক্সি যখন পৌঁছল তখন ভাড়া উঠেছে ৮ পাউণ্ড।

ইংলণ্ড ব্যাট করতে নামল প্রথমেই। অতএব ইংলণ্ডের উইকেটকীপার প্যাভিলিয়নে বসে রইলেন। কতক্ষণ? মাত্র তিন দিন। ঐ তিন দিনে ইংলণ্ড করল ৭ উইকেটে ৯০৩ রান। তার মধ্যে হাটনের টেস্টে ৩৬৪ রানের বিশ্বরেকর্ড।

ঐ তিন দিন প্যাভিলিয়নে বসে সারাক্ষণ গজগজ করলেন আর্থার উড : যখন লেন ছোকরা ব্যাট করতে যাবে ঠিক আছে, তখন তাড়াহুড়া করার কিছু ছিল না। ...ছি ছি...আট পাউণ্ড ট্যাক্সি ভাড়া...

যথা পুত্রের মৃত্যুশয্যা : ধরা যাক ১৮৮২ সালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত টেস্টম্যাচের সময়ে ইংলণ্ডের ড্রেসিংরুম, যে-খেলায় ইংলণ্ড মাত্র ৮৫ রান করলেই জিততে পারবে, এমন অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ান স্পফোর্থ ৭৭ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডকে শেষ করে দিয়েছিলেন এবং দর্শকদের মধ্যে সত্যি-সত্যি একজনের 'পতন, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু' হয়েছিল। ১৯৫২-৫৩ সিরিজে ইডেন-গার্ডেনে হোলকারের সঙ্গে বাংলার রনজি-ট্রফির ফাইন্যাল খেলার কথাও মনে রাখা যায়। ঐ খেলাটির কথা এই গ্রন্থের অন্যত্র পাওয়া যাবে। পাঠক ১৯৬০-৬১ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্টইণ্ডিজের মধ্যে টাই-হওয়া ব্রিসবেন-টেস্টের সময়ে ড্রেসিংরুমের কথাও স্মরণ রাখতে পারেন। এই ধরনের ব্যাধি সৃষ্টি-করা খেলা ক্রিকেটে প্রায়ই হয়, ক্রিকেটের মহিমা এইখানে। ক্রিকেটের হিমবাহ অতি ধীরে নামতে-নামতে গতিবেগ সংগ্রহ করে যখন হিমপ্রপাত হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিপর্যয়

আনে দর্শক ও খেলোয়াড়দের মনঃপ্রকৃতিতে। এইসব 'ক্রিটিক্যাল মোমেণ্টে' কেউ কাঁদে, কেউ হাসে (পাগলের), কেউ লাফায়, কেউ নাচে, বিড়বিড় করে কেউ বকে, কেউ বিজ্‌বিজ্‌ করে জপ করে—পুত্রের মৃত্যুশয্যার পাশে পিতা যেমন করে থাকে।

যথা নিজের মৃত্যুশয্যা : যেমন, ডবলিউ জি গ্রেস ফিরলেন ১৯০৬ সালে ড্রেসিংরুমে প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে। ১৯৩০ সালে হবস্‌ এবং ১৯৪৮ সালে ব্রাডম্যানও বিদায় নিয়ে ফিরেছিলেন। এমনই কত বড়-ছোট অগণ্য খেলোয়াড়ের শেষ প্রত্যাবর্তন ড্রেসিংরুমে। এইকালে কেউ প্রশান্ত, কেউ বিষণ্ণ, কেউ-বা করুণ-গম্ভীর। একজনের বড় বেদনাময় অবসান। আহত হয়ে ড্রেসিং-রুমে ফিরলেন অস্ট্রেলিয়ার সুবিখ্যাত ফাস্টবোলার গ্রেগরী, উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠলেন—আমার শেষ! আমার শেষ!

আর একজন ফিরে গিয়েছিলেন ড্রেসিংরুমের দরজা থেকে। তাঁর নাম আলেক বেডসার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ক্রিকেটের প্রথম পর্যায়ে ইংলণ্ডে একজনই বোলার ছিলেন—এই বেডসার। অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের সুখশয্যায় বেড-সারই বেডসোর। ব্রাডম্যান তাঁকে মরিস টেটের চেয়েও বড় বোলার বলতে চেয়েছেন। সেই বেডসারকে যখন ১৯৫৪-৫৫-এর অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্টদল থেকে বাদ দেওয়ার দরকার হল (হয়ত সঙ্গত প্রয়োজনেই) তখন ইংলণ্ডের প্রথম পেশাদার অধিনায়ক লেন হাটন বেডসারকে ডেকে কোনো কথা বলেননি—কোনো সান্ত্বনা, গতকীর্তির প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, কিছু নয়—শুধু একটি নির্বাচিত খেলোয়াড়দের তালিকা টাঙিয়ে দিয়েছিলেন ড্রেসিংরুমের দরজায়—তাতে বেডসারের নাম ছিল না। বিশাল চেহারার ও ততোধিক বিশাল হৃদয়ের অধিকারী মানুষটি ড্রেসিংরুমে ঢুকতে গিয়ে তালিকাটি পড়লেন, তারপর...

ঐ সিরিজের সূচনায় বেডসার একটি মন্তব্য করেছিলেন, সেটি শুধু তুলে দিচ্ছি :

"উদ্বিগ্ন? না, না, আমার উদ্বেগের কি আছে? আমি চিন্তিত হবো কেন? এই তো সদ্য বারো হাজার পাউন্ড বেনিফিট পেয়েছি, তৃতীয়বার অস্ট্রেলিয়া সফর করছি, সব রকমের রেকর্ড ভেঙেছি। আমি উদ্বিগ্ন? না, না, উদ্বেগের কি আছে? আমি চিন্তিত, না না..."

ব্যক্তিগত কৃতিত্বের অতি উজ্জ্বল কিরণ নিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন ডাঃ গ্রেস। জেণ্টলম্যান বনাম প্লেয়ার্সদের সেই খেলার মধ্যেই পড়ল ডাঃ গ্রেসের ৫৮তম জন্মদিন। নিজের যৌবনদিনের স্মৃতি জাগিয়ে যখন ডাঃ গ্রেস আউট হলেন তখন রান করেছেন ৭৪। প্রবল করতালির মধ্যে, ফিরে আসার পথে ডাঃ গ্রেস বললেন—এই শেষ, আর খেলছি না। তূর্যধ্বনির মধ্যে মহাবীরের নিষ্ক্রমণ!

১৯০৬ সালে ডাঃ গ্রেসের সেই শেষ খেলা হয়েছিল ওভাল-মাঠে। ওভাল বিদায় দিয়েছে ক্রিকেটের আরও দুই শীর্ষপ্রধানকে—ক্রিকেটের দুই নাইট তাঁদের বর্ম এখানেই খুলে রেখেছেন—হবস্‌ ও ব্রাডম্যান।

১৯৩০ সালে হবস্‌ শেষ খেলায় করেছিলেন ৯ রান। ব্রাডম্যান করুণ আত্ম-পরিহাস করে বলেছেন, আমি করেছিলুম তার থেকে মাত্র ৯ রান কম।

সংবাদপত্রে হবসের বিদায়বর্ণনা সাহিত্যের স্তরে উঠেছে। বীরের প্রস্থান-

পথের শেষ চক্রধূলিমাখা সেই ধূসর বর্ণনা :

"সমস্ত গতকালটি ছিল টেস্ট-ক্রিকেটের নাটক।

"যখন হবস্ উইকেটে পেঁছিলেন, তখন বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা তাঁকে অভূত-পূর্ব সংবর্ধনায় ভূষিত করলেন, কারণ টেস্ট-ক্রিকেটে এইটেই তাঁর শেষ ইনিংস।

"তাঁরা সকলে তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়ালেন, অধিনায়কের নির্দেশে মাথার টুপি খুলে সমস্বরে 'জয়' দিলেন। জনতাও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল জয়রবে। অভিনন্দনের ঝড়ো বাতাসে দুলে উঠল চারিদিক। ক্বচিৎ কোনো ক্রিকেটার এমন অভ্যর্থনা পেয়েছেন, যদি সত্যই কখনো কেউ পেয়ে থাকেন।

"সর্বশ্রেষ্ঠ টেস্ট-জীবনের শেষ খেলা এইভাবে সহসা শেষ হবে, তা ছিল অপ্রত্যাশিত। জনতা কিন্তু তাঁর প্যাভিলিয়ানে পেঁছানো পর্যন্ত সর্বসময় মুখর হয়ে রইল জয়ঘোষণায়।

"প্যাভিলিয়ানে ফিরে গেলেন একজন বিষাদাচ্ছন্ন মানুষ।

"ভাবাবেগ, মনে হল ভাবাবেগই তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—যেতে-যেতে হাত থেকে গ্লাভস্ পড়ে গেল, স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষের মতো সেটিকে কুড়িয়ে নেবার জন্য নীচু হলেন, সেই একই আবেশে।

"ওভালের দর্শকেরা—যদিও তারা কিছু আশাহত হয়েছে—প্রীতিভরে তাদের পুরাতন বন্ধুকে বিদায় দিল।

"ছোট উইকেট-গেটটি খুলে গেল, তার মধ্যে প্রবেশ করলেন হবস্—প্রস্থান করলেন চিরতরে টেস্টম্যাচের দৃশ্যপট থেকে।"

যথা নীতি ও ধর্মসভা : চার্চ বা মন্দির :—ড্রেসিংরুম ধর্মসভার রূপ নেয় যখন কর্মকর্তারা ড্রেসিংরুমে ঢুকে উপদেশ বর্ষণ করতে থাকেন : বলটা তোমার এইভাবে খেলা উচিত ছিল এবং এইভাবে খেলা উচিত ছিল না। তোমার এই টেমপারামেণ্ট থাকায় গেছো এবং এই টেমপারামেণ্ট না থাকায় গেছো। খেলোয়াড়েরা দুঃখ করে বলেন—এইসব ধর্মোপদেশ প্রায়ই ধর্মনিরপেক্ষদের কাছ থেকে আসে—কর্মকর্তারা অনেকেই ব্যাটের ওজন বা বলের আকার জানেন না। এ ছাড়া উইকেটের ভ্রান্তবুদ্ধি খেলোয়াড় ড্রেসিংরুমে ফিরে এসে স্বীকারোক্তি করে। কনফেনশনস্-এ পূর্ণ ড্রেসিংরুম তখন চার্চের চরিত্র নেয়।

যথা সত্যকার ড্রেসিংরুম :—ওখানে কিন্তু প্রবেশ-নিষেধ। ওটা নিষিদ্ধ জগৎ। খেলোয়াড়েরা প্রায়ই যে-অবস্থায় থাকেন, যদি নগ্নগাত্র মানুষ দেখতে আপনার সঙ্কোচ থাকে, উঁকি দেবেন না।

ক্রিকেটের চতুর্থ বা শেষ হৃদয়টি সত্যিই অসাধারণ। এইটেই কাব্যিক হৃদয়—অনুমানে কল্পনায় পূর্ণ। এই হৃদয়ে আবার দুই কুঠুরি। এক কুঠুরি পত্র-গর্ভ, অন্য কুঠুরিতে বাণীব্রহ্ম। অথাৎ প্রেসবক্স ও কমেণ্টেটারস্ বক্স। ঐ যুগ্ম হৃদয়টি না থাকলে 'এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর'—ক্রিকেট নিজের সম্বন্ধে সেকথা কোনোদিন বুঝত না।

আমার বহুদিনের ইচ্ছা যদি দর্শকদের গ্যালারি থেকে এক লাফে উঠে পড়তে পারি প্রেসবক্সে। যদি সত্যই অতবড় একটা লাফ দিতে পারতাম, তাহলে অজ্ঞাত রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেত। ঐ বিরাট লাফ দেওয়ার মধ্যে যতখানি শারীরিক

সামর্থ্য, তারো চেয়ে বেশি প্রয়োজন কল্পনাশক্তির। আমি যদি সেই শক্তিতে সমৃদ্ধ হতাম!

প্রেসবক্সকে আমার নমস্কার। কত সময় দর্শকদের গ্যালারিতে বসে ভুল করে ভেবেছি, এটা খেলা। তদনুযায়ী কখনো রেগেছি, কখনো হেসেছি। কিন্তু ওটা 'যে বিবাহের চেয়ে বড়ো'র মতো খেলার চেয়ে বড়ো কিছু ছিল, তা প্রেসবক্স ছাড়া কে জানাত? অত কান্ড চলেছে মাঠে—ঐ সাদা জামা প্যান্ট-পরা ব্যক্তি-গুলির পেটে-পেটে এত! সবুজ মাঠের মধ্যে সাদাটে ফালি জমি—যার নাম পিচ—তার এমন জটিল চরিত্র, বিভক্ত ব্যক্তিত্ব—আমরা কি কোনোদিন ভেবেছি, ভাবতে পেরেছি? প্রেসবক্স আমাদের কিভাবে না ভাবিয়েছে!

আর ঐ যে খেলা চলছে মাঠে, তার যে অত অ্যাঙ্গেল কে জানত বাবা! যেন দুর্লভ মাণিক্যের মতো খেলাখানি, এক মাণিক থেকে হাজার আলোর অর্থ ঠিকরে পড়ে, জহুরী সাংবাদিকরা তা মনের প্লেটে ধরে নিয়ে ছেপে দেন সংবাদ-পত্রে হাজারো ভাবে।

একই বস্তুকে ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্নভাবে দেখা তো দূরের কথা, একই ব্যক্তি একই বস্তুকে সময়ান্তরে কিভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিতে দেখতে পারেন, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান। আপনাদের অবগতির জন্য ব্যাপারটা হাজির করছি:

(১) "ইয়ার্ডলে যেভাবে রানের দ্রুত-গতি কমিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন, তাতে অপরাহ্নের খেলা চাতুর্যের সংগ্রামে পরিণত হল। ইয়ুং এবং লেকারের লেগের দিকে নেতিমূলক বোলিংয়ের সময় ইয়ার্ডলে আত্মরক্ষামূলক ফিল্ডিং সাজিয়ে ব্রাডম্যান ও হ্যাসেটকে শম্বুকগতি গ্রহণে বাধ্য করলেন। খেলাটিকে যদি এইভাবে ইয়ার্ডলে গুটিয়ে না আনতেন, তাহলে তা মন্দ অধি-নায়কত্বের অমার্জনীয় দৃষ্টান্তরূপে বর্তমান থাকত।"

(২) "আত্মরক্ষামূলক ফিল্ডিং সাজানো আধুনিক টেস্ট-ক্রিকেটের দুঃখ-জনক ব্যাধিবিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলার দর্শনীয়তাকে তা ধ্বংস করে এবং অন্যথা-আক্রমণী বোলারকে ক্রীড়ারাজনীতির ব্যক্তিত্বহীন যন্ত্রবিশেষে পরিণত করে তোলে।"

প্রথম মন্তব্য করা হয়েছে ১৯৪৮ সালে ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টে ইয়ার্ডলে কর্তৃক অবলম্বিত পদ্ধতি বিষয়ে। দ্বিতীয় মন্তব্য ঐ সিরিজেরই চতুর্থ টেস্টে ব্রাডম্যানের নীতি সম্বন্ধে। একই লেখকের লেখা।

শীতলভাবে ব্রাডম্যান বলেছেন—লেখক বোধহয় মনে করেছিলেন, তাঁর বর্ণান্তর কারো চোখে পড়বে না।

ছি, স্যার—স্যার ডন—আপনি মতের প্রগতিশীলতাকে বর্ণপরিবর্তন আখ্যা দিলেন?

প্রেসবক্সের চেহারা কেমন? নাকি অসহ্য। ধরা যাক, ১৯৫৩ সালে ইঙ্গ-অস্ট্রেলীয় টেস্টম্যাচের সময় ইংলন্ডের মাঠের প্রেসবক্স। একেবারে শ্বাসরোধী আবহাওয়া। দেড়শোর উপর সাংবাদিক কনুইয়ে কনুই ঠেকিয়ে গাদাগাদি করে বসে। সংবাদ স্কুপ, সংবাদ সাজানো, শিরোনামা, ঘটনার ব্যাখ্যা—ইত্যাদি চিন্তায় তাঁরা অস্থির। ডজন-ডজন টাইপরাইটারের ঘটাঘট একঘেয়ে শব্দ। বহু বিখ্যাত

খেলোয়াড়ের একত্র সমাবেশ—অনেকেই আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়।

ঐ সালের ট্রেণ্টব্রিজ-টেস্টে প্রেসবক্সের 'ঐতিহাসিক' সমাবেশে ক্রিকেটের দু'-জন নাইট আসন গ্রহণ করেছিলেন—একজনের নাম স্যার জ্যাক হবস্, অপর-জনের নাম স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান।

ব্রাডম্যানকে সেবার প্রেসবক্সে দেখতে পেয়ে সাংবাদিকদের মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গিয়েছিল। অম্ল-কষায় মিশ্রিত হাসি। পথে এসো যাদু। একদিন ব্রাড-ম্যানকে যাঁরা কঠিন উপেক্ষায় সাংবাদিকদের পরিহার করতে দেখেছেন, যখন দেখা গেল সাংবাদিকরূপে তিনিই ছুটছেন প্রশ্নমালা ঠোঁটে করে খেলোয়াড় ও অধিনায়কের পিছনে—তখন যদি কারো মুখে বিদ্রূপের হাসি ফোটে, তাকে সংকীর্ণচেতা বলা যাবে না।

১৯৫৩ সালে ব্রাডম্যান অস্ট্রেলিয়া-দলের অন্যতম নির্বাচক ছিলেন। দল নির্বাচনের পরে পদত্যাগ করে সাংবাদিক হলেন। জিনিসটা নিতান্ত অনুচিত হয়েছিল বলেই অনেকের ধারণা। যাদের নিজে বেছেছেন, তাদের প্রকাশ্যে নিন্দা-প্রশংসার অধিকার তাঁর নেই। তাদের সাফল্যের গৌরবের অংশ যেমন তাঁর প্রাপ্য, তেমনি ব্যর্থতার দায়িত্বও কিছু স্বীকার করতে হবে।

অখণ্ডমণ্ডলাকার বলে বঙ্কিমচন্দ্র যাঁকে নমস্কার করেছেন সেই রজত দেবতার কি মহিমা! ব্রাডম্যান যে-টাকা পেয়েছিলেন, ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে তা আবুহোসেনী স্বপ্ন।

সিড বার্নস নাটকীয়ভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন—"কিন্তু ডন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ভিতরের কথা টেনে বার করবার চেষ্টা করতে তোমার কেমন লাগছিল? আচ্ছা ডন, যখন খেলোয়াড় ছিলে, তখন তোমার কি কখনো সাংবাদিকদের মনের মতো মানুষ হতে ইচ্ছা হয়নি, যাতে করে তুমিও ভবিষ্যতে সাংবাদিক-রূপে অন্য খেলোয়াড়কে মনের মানুষরূপে পাবার আশা করতে পারো?"

প্রেসবক্সের কথা কখনোই সমাপ্ত হবে না, হতে পারে না, এই ভুবনের সেরা মানুষটিকে নমস্কার না করলে। তাঁর নাম, বলাই বাহুল্য সকলেরই জানা নাম ক্রিকেট লেখা পড়েন অথচ নেভিল কার্ডাসের নাম জানে না এমন মানুষ বিরল। 'ক্রিকেট-সাহিত্যের ডীন', 'ক্রিকেট-লেখার ট্রাম্পার', 'ক্রিকেট-সাহিত্যের শেক্স-পীয়ার'—কত কথাই বলা হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে। আমরা বলি—নেভিল কার্ডাস ক্রিকেট-খেলার মল্লিনাথ এবং ক্রিকেট-লেখার কালিদাস, একই দেহে। ক্রিকেটে দীর্ঘজীবিত্ব পেতে হলে কার্ডাসকে খুশি করা দরকার। ভায়োলিন-বাদকের সন্তান নেভিল কার্ডাস সংগীতের প্রথমশ্রেণীর সমজদার-লেখক—তিনি বছরের শীতের সন্ধ্যাগুলি কাটিয়েছেন সংগীতে, আর গ্রীষ্মদুপুর ক্রিকেটে। কার্ডাস গানই শুনিয়েছেন ক্রিকেটে। চিন্তার ও ভাবের মনোহর ঐশ্বর্য এনেছেন ক্রিকেট-রচনায় এই বিদগ্ধ সাহিত্যিক। শুধু কানের গান বাজেনি তাঁর লেখায়, চোখের রূপও ফুটেছে সেখানে। সেই জন্যই ব্রেল অক্ষরে ছাপা হয়েছে গানের লেখার মতোই তাঁর ক্রিকেট-রচনা অন্ধদের জন্য। যদি একজন রনজি খেলার মধ্যে সাহিত্যকে এনে থাকেন, তাহলে একজন কার্ডাস সাহিত্যের মধ্যে এনেছেন খেলাকে। খেলোয়াড়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে একটা রসের সত্য আছে একথা কে প্রমাণ করত যদি কার্ডাসের আবির্ভাব না ঘটত? কার্ডাস ক্রিকেট-লেখার

ব্যাপারে 'উন্নীত সাংবাদিক' নন, ক্ষেত্রান্তরিত সাহিত্যিক।

ক্রিকেটের চতুর্থ হৃদয়ের দ্বিতীয় কুঠুরিতে বাস করেন বেতার বাণী-কুমারেরা। তাঁদের বিষয়ে আর কি বলব! তাঁরা এতই সরব যে, আমাদের নীরব করে রাখেন পাঁচ ঘণ্টা। এঁদের সবকিছু 'হাতে গরম।' চোখে দূরবীন এবং কণ্ঠে উন্মাদনা লাগিয়ে রেখে এঁরা জাগিয়ে রাখেন পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের উৎসাহীদের। কার্টুনে দেখেছি—প্রৌঢ় ক্রিকেট-উৎসাহী টিকেট না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন, অগত্যা রেডিওর সামনে বসে। কপালের উপর তখনো কাগজের রৌদ্র-নিবারণ হুড, চোখে দূরবীন, পাশে ফ্লাস্ক, টিফিন-ক্যারিয়ার এবং হাতে স্কোর-কার্ড। উত্তেজিত হয়ে শুনছেন এবং শুনে উত্তেজিত হচ্ছেন। কখনো-বা ছাতা মাথায় দিয়ে বসে আছেন ঘরের মধ্যেই। গৃহিণীর বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছেন দুঃখিতভাবে—'প্রিয়ে, বৃষ্টি! খেলা বন্ধ!' রেডিওর ক্রিকেট-বক্তারা কিভাবে অতিবড় নীরস খেলাকেও জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক করে রাখেন, তার চিত্রমূলক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সুবিখ্যাত পাঞ্চের ব্যঙ্গ-চিত্রকর। একজন বোলারের বল করার এই বিবরণ—বেতার-কথকের কণ্ঠে :

এখন অমুকচন্দ্র ফিরছেন......বল করতে......তিনি ঘুরছেন......তিনি ছুটতে শুরু করেছেন......হাঁ, তিনি ছুটছেন......এই যে......ছুটে......উইকেটের দিকে ...আসছেন......এখন ঠিক......বল ছুঁড়তে......যাচ্ছেন!!!......তিনি......বোলিং করতে......উদ্যত!!!! তিনি বল......দিলেন বলে! ......বল দি-য়ে......দি-লে-ন!!!!!! এবং......ব্যাটসম্যান—খুট্—ডিফেন্সিভ স্ট্রোক—উইকেটকীপার এগিয়ে এসে ব্যাটের তলা থেকে বল কুড়িয়ে নি-লে-ন!

বেতারের অগ্রণী ভূমিকা। ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে, বাংলাভাষায় ক্রিকেটের ধারাবিবরণী শুরু হবার পর থেকে অন্তঃপুরে বিপ্লব এসে গেছে। যেখানে সূর্য ঢোকে না [না, না, মধ্যযুগীয় অবরোধপ্রথার জন্য নয়, আমাদের অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান-সমস্যার প্রতি এই কটাক্ষ] সেখানেও রেডিও ঢোকে, এবং ক্রিকেট শোনা হয়। রেডিওর ক্রিকেট-বক্তারা সুপরিচিত চরিত্র এখন বাংলা-দেশে। তাঁদের কণ্ঠ যখন ভেসে আসে, মনে হয় দেবকণ্ঠ আসছে স্বর্গ থেকে, পারিজাত-কাঠের চেয়ারে ঠেসান দিয়ে তাঁরা খেলা দেখছেন 'ইডেনে।'

এবার শুনুন, সুখ্যাত বেতার-কথক শ্রীঅজয় বসুর বক্তব্য, যাঁর স্নিগ্ধ-গম্ভীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত :

"সাহেব চেনা যে কি দুরূহ ব্যাপার সেদিন বুঝেছিলাম হাড়ে-হাড়ে।

"এমন অভিজ্ঞতা ছেলেবেলাতেও হয়েছে। সাহেবি-দল ক্যালকাটা আর বালি-গঞ্জের সঙ্গে খেলতে-খেলতে কতবার মনে হয়েছে—ওকি! এইমাত্র আউট হলেন যিনি তিনিই আবার ব্যাট বগলে মাঠে নামলেন কোন্ মুখে! মুখ দেখে চেন-বার জো নেই—সবাই লালমুখ। আর গড়নও একরকম, আঁটোসাটো। চলা-ফেরা ভাবভঙ্গি সবই কেমন এক ছাঁচে গড়া।...

"ধারাবিবরণী মানে বর্ষার জলধারার মতো কথা বলে ছড়িয়ে পড়া। গড়-গড় করে রেলগাড়ির মতো গড়িয়ে চলা। হোঁচট খেলে লোকে ছি ছি করবে। খুঁড়িয়ে চললে দুয়ো দেবে। অমন যে আপনার সাতপাকের সহধর্মিণী, তিনি পর্যন্ত

নাক সিঁটকে শোনাতে আসবেন—হুঁঃ! বাংলায় আবার রিলে! শোনো দিকিনি ইংরেজী ভাষ্য, কেমন তর-তর করে বলে যান ওঁরা!

"মনে-মনে তাই অনুচ্চারিত প্রতিজ্ঞা এ'টেছিলাম, আর যাই হোক হোঁচট খাওয়া চলবে না। এবং চলছিলাম বেশ সোজা হয়েই, কিন্তু আবার সেই সাহেবই কেমন সব গুলিয়ে দিলেন। রেডিও-বক্স থেকে প্রায় দেড়শো গজ দূরে বাউ-ন্ডারির ধারে কে যেন বলটা কুড়িয়ে নিতেই খুঁড়িয়ে না-চলে খাড়া চলার আনন্দে তরতর করেই বলে ফেললাম: 'ডিপ ফাইন লেগ থেকে কুড়িয়ে পুলার বলটি ছুঁড়ে দিলেন উইকেটরক্ষক মিলম্যানের হাতে।' অমনি কারা যেন সশব্দে ধমকে উঠলেন—'বাঃ দাদা! দিব্যি গুল ঝাড়ছেন। জলজ্যান্ত অ্যালেনকে কি-না বেবাক পুলার বলে চালিয়ে দিলেন?'

"থতমত খেয়ে দূরবীন-চোখে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি...যা দেখতে পেলাম তাতে হাড় হিম হয়ে যাওয়ারই সামিল। দেখি কি, গ্যালারিতে একজনের কোলে ছোট্ট একটি ট্রানজিসটার-সেট। কি সর্বনেশে সক্রিয় যন্ত্র ওটি। বিনা-নোটিসে নিমেষের মধ্যে পুলার অ্যালেনের গরমিলটা ধরিয়ে দিলে!"

এসব কথা হয়ত সত্য, কিন্তু বেতার-বক্তারা জানেন কি, তাঁরা জনচিত্ত কত-খানি হরণ করে আছেন? সবশেষে সেইটেই জানাচ্ছি সাময়িকপত্রের একটি রসচিত্রের উল্লেখ করে। রেডিও খুলে এক ব্যক্তি—ভারতীয়—বসে। রেডিওতে শোনা গেল—বাংলাদেশে বন্যায় দশহাজার লোকের প্রাণহানি। শ্রোতা নির্বিকার। শোনা গেল—দক্ষিণভারতে দুর্ভিক্ষে দুই লক্ষ লোক পীড়িত। শ্রোতা ব্যাজার। শোনা গেল—জাপানে ভূমিকম্পে নিদারুণ ক্ষতি। শ্রোতা বিরক্ত। শোনা গেল—আণবিক বোমায় সভ্যতার বিলয় আশঙ্কায় শতাধিক বিশ্বমনীষীর সতর্ক-বাণী। শ্রোতা এইবার রীতিমত ক্রুদ্ধ।

হঠাৎ আর্তনাদ করে শ্রোতৃবর মাথা চাপড়ে চেয়ার উল্টে মেঝেয় পড়ে গেলেন। একেবারে মূর্ছিত।

রেডিওতে এইমাত্র শোনা গিয়েছে: পরপর তিনবার গোল্লা করেছেন হাটন!

ক্রিকেটের এই চতুর্থ হৃদয়—হৃদয় গড়ে এবং ভাঙে নিরন্তর।

* * * কম্বিনেশন ক্রিকেট * * *

১৯৬২ সালের ২২শে ডিসেম্বর ইডেন-গার্ডেনে সারা ভারতের নবীন ও প্রবীণ ক্রিকেটাররা সমবেত হয়ে যে-চারদিনব্যাপী প্রদর্শনী খেলায় অংশ নিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি মহৎ প্রতিজ্ঞা ছিল—শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা সর্বাত্মক সংগ্রাম করবই? আমরা আমাদের আনন্দের সঞ্চয়কেও উৎসর্গ করব শত্রুঘ্ন যজ্ঞে।

প্রতিরক্ষা-ভান্ডারের সাহায্যার্থে আয়োজিত এই ক্রিকেটম্যাচে প্রধানমন্ত্রী-একাদশের অধিনায়ক ছিলেন লালা অমরনাথ এবং গভর্নর-একাদশের অধি-নায়ক এস মুস্তাক আলী। পঞ্চাশোর্ধ্বে বনগমন না করে অমরনাথ ও মুস্তাককে যে মাঠে নামতে হয়েছে তার কারণ—যদিও এখন তাঁরা নাম তবু সে নাম অমর—তাঁরা প্রাক্তন কিন্তু স্মৃতিতে চিরন্তন। ক্রিকেট-ইতিহাসের পাতা গায়ে মুড়ে যখন তাঁরা এসে দাঁড়াবেন সামনে—ঐ অমরনাথ-হাজারে-মানকদ-মুস্তাকেরা—

তখন আমরা বর্তমানের মধ্যেই প্রস্থান করব সুবর্ণ অতীতে।

ক্রিকেটের কম্বিনেশন ডে—রোমন্থনে, রসচর্বণায় সুখাবিষ্ট মন।

খেলার আগের দিন এক ক্রিকেট-পাগল বন্ধু হাজির।—'ভাইরে—!' সে চেঁচাল 'আবার হেরিব মুস্তাকেরে—আহারে! অমরনাথে ও মানকড়ে—বাহারে!' বন্ধুবর এমনকি হাজারেকেও (হা-জা-রে-কে-ও!) সুরে বঞ্চিত করল না। কালের কি মহিমা!—'হাজারে হাজারে হাজারে রানের হাজারে বিজয় হাজারে!'

আমার বন্ধুর খ্যাপামি নিয়ে যতই ঠাট্টা করুন, সেদিন কিন্তু অধিকাংশ দর্শক মাঠে হাজির হয়েছিলেন মানকদ-মুস্তাকদের মহিমার ক্ষণ-প্রত্যাবর্তন দেখবার জন্য, মেহরাদের নিরেট অবস্থান সন্দর্শনের জন্য নয়। খেলাটা ছিল প্রদর্শনী খেলা। নবীন প্রবীণ মিলেছে সেখানে। সেখানে প্রবীণ খুলে ধরবে অতীতের কিছু ঐশ্বর্য, নবীন তাতে যোগ করে দেবে বর্তমানের আলো। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, নবীনদের পক্ষ থেকে সে দায়িত্ব পালন করা হয় নি। গভর্নর-একাদশের অধিনায়ক মুস্তাক আলী টসে জিতেও বিপক্ষদের ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন। মুস্তাকের দলে ছিলেন ভিনু মানকদ। মানকদ পুরনো দিনের মতোই হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বল, সে বল বয়োদোষে নামার সময়ে পুরনো চক্রান্ত-কুটিলতা হারিয়েছিল—তবু প্রধানমন্ত্রী-একাদশের পক্ষে যে-মেহরারা নেমেছিলেন, তাঁরা সে বলকে আবার হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার সাহস দেখাননি। মেহরা একটা সেঞ্চুরি করেছেন ; তিনি দীর্ঘ সময় আউট না হয়ে খেলাটিকে টিকেটপূর্ণ পুরো চার দিনের দিকে ঠেলে দিয়েছেন ; এবং তাঁর খেলা দেখে মনে হয়েছে—তিনি নিশ্চয় অজ্ঞাত কোনো টেস্টের ট্রায়াল খেলছেন। আমাদের সমস্ত আনন্দের উপর মেহরা একটা সেঞ্চুরি চাপিয়ে দিয়েছিলেন। বিরক্ত দর্শক তাঁর বিরুদ্ধে লেস্টার কিং-এর কাছ থেকে বাম্‌পারের গণদাবি না তুলে পারেনি।

প্রদর্শনী-খেলার দর্শনীয়তাকে নষ্ট করতে অনেকেই অংশ নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী-একাদশের অপ্রবীণ ব্যাটসম্যানেরা ভুলে গিয়েছিলেন—ভাল বল আটকাব, খারাপ বল ছেড়ে দেব, মারব যখন বাধ্য হব—এটা প্রদর্শনীর দর্শনীর অপমান।

দর্শনীদাতারা তাই ঘুমোতে চেয়েছিলেন। কারো-কারো মনে ইচ্ছা ছিল, ওয়েস্টইণ্ডিয়ান ফাস্টবোলারদের দেখব। যথেষ্টই দেখেছিলেন। প্রায় সারাদিনই বল করতে হয়েছে এ জাতির দুই গতি-শিক্ষক কিং ও ওয়াটসনকে। তাঁরা বেশ পরিশ্রম করেছেন, দু'জনের মধ্যে কিং অধিকতর উৎসাহী, কিন্তু তাঁরা কিছু করতে পারেননি, মাঠের সঙ্গে কত লড়বেন তারা ? এমন মন্থর উইকেটে ফাস্ট-বোলিং হয় না। তাছাড়া প্রদর্শনী-ম্যাচ, বেশি বাম্‌পার দেওয়াও যায় না, তাই বিরক্ত হয়ে তাঁরা নো-বলে বদান্যতার নোবিলিটি দেখালেন। আম্পায়াররা বরং খুশিই তাতে। যেখানে আউট নেই, বেপরোয়া রান নেই, সেখানে একটা কিছু হাঁক-ডাকের সুযোগ তো পাওয়া গেল!

খেলার আকর্ষণবৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠাংশে অবতীর্ণা ছিলেন মিস্‌ থ্রো। মিস্‌ থ্রো বারবার মাঠের বাইরে ছুটে গিয়ে, দর্শকদের গায়ে লুটিয়ে পড়ে, দিনের রানকে ভদ্রসংখ্যার দিকে নিয়ে গেছেন। একবার দেশাইয়ের মিস্‌ থ্রো'তে রানআউট বেঁচে উমরিগর যখন পাঁচ রান পেলেন, তখন পঙ্কজ উমরিগরকে কি একটা

বললেন। অন্তর্যামী জনৈক দর্শকের মতে, পঙ্কজ বলেছিলেন, বাঃ ভাই পলি, বেশ, নিজের রানটা নিজের লোক দিয়ে ভালই বাড়িয়ে নিলে! সেই শুনে, ধরা পড়ে, পরমানন্দে ব্যাট দিয়ে পঙ্কজের পিঠ চাপড়ে দিলেন তাঁর বন্ধু পলি উমরিগর।

মরা খেলার মধ্যে কি আর করে, এইসব আলোচনাই চালাচ্ছিল দর্শকেরা। 'গুজব ছাড়বেন না'—এই আপৎকালীন নির্দেশ সত্ত্বেও এক ব্যক্তি লাঞ্চের পরে গুলবাহার হাজির করলেন। তিনি নাকি দেখে এসেছেন, জনৈক মহিলা সীমান্তের শীতকাতর জওয়ানদের প্রতি সহানুভূতিতে স্বয়ং বসনসংযমে কাঁপতে-কাঁপতে সোয়েটার বুনছেন, এবং তাঁর সামনে একটি পোস্টার: 'সাংবাদিকরা জানুন, এ সোয়েটার জওয়ানদের জন্য।'

প্রথমদিনের শেষে প্রধানমন্ত্রীর একাদশের রান—তিন উইকেটে ২৯৮। মেহেরার ১২৬। নাদকার্নি ৬৬ ও উমরিগর ৪২ রান করে নটআউট। মিনিটে প্রায় এক রান তবু খেলাটি হীনপ্রাণ। ক্রিকেট খেলায় ক্যারেকটার কত বড়, এখানে তার প্রমাণ পাই। প্রথমদিনে 'বিজয় ও শান্তি'—এই যমজের জন্মকামনা করে যারা সমবেত হয়েছিল ইডেন-গার্ডেনে, তারা মাঠ ছেড়ে গেল পরদিনের সুখের কল্পনা মনে তুলে নিয়ে। তারা হয়ত কিছু আনন্দ পেয়েছিল প্রথম দিনে ভিনুর সামনে ভিনুবৎ নাদকার্নির ব্যাট ধরে দাঁড়ানো, ঐ সূচীমুখ নাদকার্নির বিরুদ্ধেই প্রায় অশরীরী কেনীর বোলিং কিংবা উমরিগরের বাড়ানো ব্যাটের পরাক্রম দেখে—কিন্তু তারা পরদিবসের অনেক বড় সম্ভাবনার কল্পনায় আবিষ্ট হয়ে রইল। তারা ভাবল, ভেবে মনের গভীরে শিহরিত হল: আমাদের স্মৃতির রাজারা প্যাভিলিয়ন-চেয়ারে প্যাড পরে ব্যাট-হাতে অপেক্ষারত।

'মিলিয়ে নিও বাবা মিলিয়ে নিও। আমরা কি পেয়েছি আর তোমরা কি পাচ্ছ!'—নাতির কাঁধে হাত দিয়ে সাবধানে নামতে-নামতে প্রায়-অথর্ব বৃদ্ধটি বলতে লাগলেন—'মুস্তাক আলী, অমরনাথ—এরা সব আমাদের।'

নাতি দাদুর কথায় প্রতিবাদ করল না। আর যারা শুনল তারাও প্রতিবাদ করল না। আপত্তি কিছু করা যেত। রবিবার সকালে তরুণদের প্রাণের খেলোয়াড় উমরিগর ও নাদকার্নি ব্যাটিংয়ে যে-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তার গর্ব করতে পারত নাতির দল। তবু কেউ কিছু বলল না। তাদেরো মন ভরে আছে। হারিয়ে যাওয়া একটা সুর যেন হঠাৎ ফিরে এসে তার পরশ লুটিয়ে চলে গেছে। গলা পর্যন্ত সুমিষ্ট স্বাদে ভরে থাকলে যেমন একটা অনির্বচনীয় বিষাদমাখা আনন্দবোধ হয়—তেমনি একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন সুখ।

মাঠ থেকে বেরিয়ে এক পরম বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত বললেন নিতান্ত কবিতায় আক্রান্ত হয়ে: যতক্ষণ মুস্তাক ছিল, ততক্ষণ ঝাউয়ের মাথায় আলো ছিল।

মুস্তাক কত রান করেছেন? মোটেই বেশি নয়। বেশির অহঙ্কার কি তিনি কোনোদিন দেখিয়েছেন? সঞ্চয়ের লোভ কি তাঁর ছিল? তিনি কি বিত্তের চেয়ে বৈভবকে বড় করেন নি? তিনি কি বাঙালীর মুস্তাক আলী নন?

অনেকদিন আগে তোলা একটা ফিল্মের মাস্টারপিস্—আবার দেখানো হল আজ। ফিল্ম কেটে গিয়েছে স্থানে-স্থানে, অনেকটা শেলা, তবু মাস্টারপিস্—

আজকের মুস্তাকের খেলা।

মুস্তাককে যারা দেখেননি তাদের কাছে মুস্তাক একটা বিগত রোমান্স। তাঁকে কেন্দ্র করে যা-কিছু স্মৃতি ও রচনা, সে সবই মুস্তাক তাঁর সামান্য অবস্থিতির মধ্যে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেই প্রথম বলেই রান, চার পা এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভ, অফের বল লেগে ঘোরানো, ফাঁকায় বল তুলে বাউন্ডারি, বোলারের হাত থেকে বল ছাড়া পাবার আগেই ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়া, সেই সর্টরানের ধোঁকাবাজি ও দৌড়ের বদলে গটমট করে হে'টে রান নেওয়া, পার্টনারের চেয়ে বেশি সংখ্যায় স্ট্রাইক নেওয়া, মিস-থ্রো'র রান নিতে অবজ্ঞা, এবং ক্যাচ তুলে দিয়ে আম্পায়ারের সিম্ধান্তের অপেক্ষা না রেখে প্যাভিলিয়নের পথে পা বাড়ানো—সব কিছু। মুস্তাক সবকিছু দেখালেন, সবকিছু জানালেন নিজের সম্বন্ধে। আত্মপ্রত্যয়ে মুগ্ধ করলেন, সাহসে বিস্মিত করলেন, চমৎকৃত করলেন নৈপুণ্যে, নানা ভঙ্গিতে হাসালেন, মাতালেন মাতোয়ারা বাঙালীকে, খেলার শেষ রসটুকু শুষে নিয়ে যখন প্যাভিলিয়নের দিকে ফিরে চললেন, তখন নিজের ভূমিকায় তিনি সেরা অভিনয় করে গেছেন।

এক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মুস্তাক আলী ; তিনি তাঁর শিল্পকে জানেন।

অপূর্ব আনন্দের একটি দিন কেটেছে মাঠে—দ্বিতীয় দিনে। নীল আকাশের নীচে, সূর্যালোকে ধোয়া সবুজ মাঠে, রবিবারের রঙ বিছিয়ে ছিল চারিদিকে। শনিবারের বারবেলার দুর্বিপাক কাটিয়ে রবিবাসরীয় ক্রিকেট আবার নিজরূপ নেবে, এই প্রত্যাশা ছিল হাজারে-হাজারে সমাগত দর্শকদের মনে। ব্যাট হাতে নামলেন প্রধানমন্ত্রী-একাদশের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান উমরিগর ও নাদকার্নি। তাঁরাই যে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের শ্রেষ্ঠ জুটি, তা প্রমাণিত হল অবিলম্বে। রানের তরঙ্গ আছড়ে পড়তে লাগল মাঠের সর্বাঙ্গে। নাদকার্নি সেঞ্চুরি করলেন—অনিবার্য সেঞ্চুরি। উমরিগর সেঞ্চুরি করলেন—না-কি সেঞ্চুরি হয়ে গেল অক্লেশে! চারদিকে উৎসব। বড়দিন আসেনি তবু ২৩শে ডিসেম্বর ক্রিকেটের বড়দিন। প্রধানমন্ত্রী-একাদশের রান তিনশো পেরিয়ে, চারশো পেরিয়ে, অনেকখানি এগিয়ে গেল।

ছন্দপতন হল যখন অমরনাথ নিজে না নেমে ইনিংস ছেড়ে ছিলেন। অমরনাথ বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি ক্রিকেটের একটি জনপ্রিয় নাম। বোধহয় তাঁর খেয়াল ছিল না, অনেক স্কুল আর কলেজের ছেলে এসেছে—যারা তাঁর ব্যাট-ধরা অন্তত একবার দেখে নিতে চায় নিজেদের পরবর্তী জীবনে স্মৃতিকথা বলবার জন্য। অমরনাথ ব্যাট ধরলেন না পরে, পরে বলও করলেন না, শুধু উপস্থিত থাকলেন—থেকে মূল্যবান করলেন নিজের উপস্থিতিকে।

একটি বাচ্ছা ছেলের দুঃখ অন্তত যাবে না। সে তার বাবাকে ধমকে টিকেটের পয়সা আদায় করেছে : সে কি বাপি? টিকিটের পয়সা দেবে না? মানে ডিফেন্স-ফান্ডে চাঁদা দেবে না? বাপি সে কথা শোনার পরে পয়সা না-দেওয়ার দেশদ্রোহিতা দেখাতে সাহস করেন নি। সে ছেলেটি সোয়েটারমোড়া অমরনাথকে মাত্র দেখে সন্তুষ্ট হয়নি, সে খেলা দেখতে চেয়েছিল।

হাজারে কিন্তু খেলেছিলেন। পা বাড়িয়ে বল আটকেছিলেন, কভারড্রাইভ

করেছিলেন এবং যথারীতি মুস্তাকপ্রিয় বাঙালী দর্শক তাঁকে ব্যারাক করেছিল। হাজারে হেসেছিলেন। এ আর নতুন কি? তোমরা সহিষ্ণু সেবার মূল্য দাও না জানি। সর্ট রান নিতে হাজারের অসুবিধা হচ্ছিল। তাঁর উল্টোদিকে ছিলেন টগবগে উমরিগর। হাজারে বলছিলেন—পলি, আমার বয়স হয়েছে, আর দৌড় করিও না।

হাজারের বিরুদ্ধে বোলিংয়ের সময়ে বড়ই ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলেন বোলারেরা! নির্বাচক-সমিতির চেয়ারম্যান বিজয় হাজারে কিসে খুশি হবেন—তাঁকে আউট করলে, কি না-করলে?

অতএব হাজারের বিরুদ্ধে বল করতে শুরু করলেন মুস্তাক আলী।

'কি ভাই, মনে পড়ে, আমি একদিন বোলার ছিলুম?'

'হাঁ, বেশ মনে পড়ে'—মুস্তাকের বলে আউট হয়ে ফিরে যাবার সময় হাজারে স্বীকার করে গেলেন।

ভারতের আর এক অধিনায়ক রামচাঁদ ব্যাট ও বল দুইই করেছিলেন। রামচাঁদের চেহারাটা অন্তত এখনো আছে। তাহলে নিশ্চয় স্বভাবটাও আছে। শূন্যের পটভূমিকাতে যে রামচাঁদ মার্-মার্ করে উঠতেন, তিনি যখন বোর্ডে প্রায় চারশো রান উঠে আছে তখন নিশ্চয় মহামার হয়ে উঠবেন! রামচাঁদ, তুমি প্রদর্শনীর আদর্শ খেলোয়াড়। রামচাঁদ, তুমি টেস্টখেলাকেও প্রদর্শনীখেলা করে তুলতে সানন্দ সামর্থ্যে। সে-ই রামচাঁদ ব্লক করতে চেষ্টা করলেন!! হা রাম! সকলে হতাশ। শেষে কি ব্লক-আউট হবে? তাঁর ব্লক-ডেভেলপমেন্ট চেষ্টার বিরুদ্ধে চীৎকার উঠল—রাম, আরাম হারাম হ্যায়। বিরক্ত রামচাঁদ অকালে নিদ্রা ভেঙে ওভারবাউন্ডারির 'কুম্ভকার্ণিক' চেষ্টায় আউট হয়ে গেলেন।

মেহরা, নাদকার্নি ও উমরিগরের তিন সেঞ্চুরিসহ ৬ উইকেটে ৪২৩ রান করে প্রধানমন্ত্রীর একাদশ ইনিংস ছেড়ে দিল। তখন রাজ্যপালের একাদশ শুরু করল প্রথম ইনিংস। রাজ্যপালের দলের পক্ষে অপরূপ প্রদর্শনী খেলা দেখিয়েছেন মুস্তাক আলী, আগেই বলেছি। আসল প্রতিযোগিতার ব্যাপারে দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গতভাবেই খণ্ডিত বঙ্গের রাজ্যপালিকা পেরে উঠছেন না। প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর মর্যাদানুযায়ী একটু বেশি সংখ্যায় ভালো খেলোয়াড় দেওয়া হয়েছে। বিশেষত বোলার। আবার বোলার বোলার ফাস্টবোলার—গিলক্রিস্ট! সহযোগী ফাস্টবোলার স্টেয়ার্স যদিও উইকেট নিয়েছেন, কিন্তু গিলক্রিস্টের সঙ্গে কার তুলনা? স্ক্রীনের কাছে থেকে সেই দৌড় (গিলক্রিস্ট বলেন, চাও তো স্ক্রীনের পেছন থেকে দৌড় শুরু করতে পারি)—সেই লাফানি, চেঁচানি, ঝাঁপানি—বাপ্‌রে! বল পড়ার আগেই মূর্তি দেখে খেলোয়াড় মূর্চ্ছিত। 'হাউজ-দ্যাট' ডাক নয় তো—হা-রে-রে-রে ডাকাতে ডাক। বল দিলেই গিলক্রিস্টের উইকেট চাই। পিঠে মাইন-বেঁধে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন যেন ফলোথ্রু-র সময়ে। পঙ্কজের সামনে একবার যখন এগিয়ে গিয়ে, ডাক দিয়ে, দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন, তখন কচি মেয়েটা মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁপে উঠে বলল—মাগো মা, ওর নাম গিলক্রিস্ট কেন, গিলে-কুটে ফেলে বলে বুঝি?

কিন্তু গিলক্রিস্টই কিছু গা-গরম ক্রিকেট এনেছিলেন। খেলার মধ্যে টেস্ট-

ম্যাচের তীব্রতা সৃষ্টি করেছিলেন। দেখিয়ে দিয়েছিলেন, এমন স্লো-মাঠেও তিনি ফাস্টবোলিং করতে পারেন। তাঁকে সরিয়ে না-দেওয়া পর্যন্ত খেলার পক্ষে প্রয়োজনীয় আতঙ্ক মাঠে বজায় ছিল। গিলক্রিস্ট গ্রেট বোলার নিঃসন্দেহে, গ্রেট ক্রিকেটার কি-না তাতে অবশ্য সন্দেহ আছে।

দ্বিতীয় দিনের শেষে রাজ্যপালের একাদশ চার উইকেটে ২০০ রান করলেও বেশ বোঝা গেল, বিপদ কাটেনি তাঁদের। ধীর-স্থির খেলে পঙ্কজ রায় অনেকটা সামলেছেন। পঞ্চাশ পেরোবার আগে ঊনপঞ্চাশে আটকে থেকে তাঁকে ঊন-পঞ্চাশী পবন অনেকক্ষণ উপভোগ করতে হয়েছিল। ধীর খেলার জন্য তিনি বিদ্রূপভাজন হয়েছেন। দৈনিক দর্শক চেয়েছে, একদিনে মুস্তাকসুদ্ধ সকলের খেলা দেখে নিতে। সিজন-দর্শকের বাসনা--আজ ধার কাল মুস্তাক। পঙ্কজ সিজন-দর্শকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।

একদিকে আটকে রেখে পঙ্কজ ভালই করেছেন। খেলাটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েনি।

গ্রেট ভিনু নেমেছিলেন শেষের দিকে, এবং তারই মধ্যে দিয়েছেন অন্তত দুটো লেটকাট, দেখলে মুখ ও মন দুইই সরস হয়ে আসে—সে এমনই ক্রিকেটের কাট্—লেট্!

মাঠ ছেড়ে আসার সময়ে মনে আনন্দ-করুণ বিষাদের অনুভূতি : মুস্তাককে দেখলুম মাঠে কতদিন পরে—মুস্তাকও দেখালেন তাঁর মধ্যে ট্রাডিশনের অব-শেষ—সূর্যাস্তের পরেও সূর্যাস্তআভায় রঞ্জিত মেঘপ্রান্ত—কিন্তু মেঘপ্রান্তের রূপালী রেখায় একটি বেদনাময় সত্য—মুস্তাকের মাথার চুল রূপালী। আমি কোনোদিন মুস্তাককে ক্যাপ্টেনরূপে দেখতে চাইনি, আজ দেখতে হল। মুস্তাক রাজা নন, রাজকুমার। বুড়ো বরজলালের ভাঙা গান শুনে সবাই হেসেছিল, সেটা বড় বেজেছিল বৃদ্ধ রাজা প্রতাপ রায়ের বুকে। মুস্তাক কিন্তু আজও, স্বল্পক্ষণ হলেও, তরুণ কণ্ঠে গাইলেন।

কিন্তু এই কি শেষ নয়?

দ্বিতীয় দিনের শেষে ৪ উইকেটে ২০০ রানের রাজ্যপাল-একাদশ আর মাত্র ৪২ রান করে বাকি উইকেটগুলো যখন তৃতীয় দিনে খোয়ালো, তখন প্রমাণিত হল পূর্বদিনে পঙ্কজের ধৈর্যের সার্থকতা। তারপর ব্যাটের চাবুক নিয়ে প্রধানমন্ত্রী-একাদশের রান হল ৫ উইকেটে ২৯৩। মেহেরা ৬৮, কুন্দরাম ৪৮, পোদ্দার ৪৭, হাজারে ২৬, এবং অমরনাথ নটআউট ৬৫।

তৃতীয় দিনকে যদি অমরনাথের নামাঙ্কিত করতে পারতুম, যেমন দ্বিতীয় দিনের নাম, 'যেথা মুস্তাক সেথা খেলা।' এমন ইচ্ছার কারণ ছিল : তাঁর ঐ অধিনায়করূপে কৌতুকের চাতুরী! সকালের দিকে রাজ্যপাল-দলের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করছিলেন ওয়াটসন ও লেস্টার কিং, তখন তাঁদের বিরুদ্ধে গিল-ক্রিস্টকে বল দিতে ডাক দিয়ে মাঠে বড়ো হাসির আয়োজন অমরনাথই করে-ছিলেন। অমরনাথ ও সমবেত দর্শকদের সহাস্য সমর্থনে গিলক্রিস্ট পরপর কয়েকটি বাম্পার ছেড়ে ফাস্টবোলার জাতিকে (তার মধ্যে নিজেও আছেন) প্রশ্ন করলেন—কেমন মজা?

বাম্‌পারে মজা যতটা দর্শকের ততটা খেলোয়াড়ের নয়—কোনোক্রমে গোঁৎ খেয়ে কিং ও ওয়াটসন দেখিয়ে দিলেন।

তৃতীয় দিনে অমরনাথের ব্যাটিংও প্রশংসনীয়। নিশ্চয়ই, রীতিমতো। তাতে পল ও কাটের বাহাদুরী ছিল। একবার ছাড়া চান্স দেননি। রানও যথেষ্ট করেছেন। বেশ বোঝা গেছে, মাঝারি বোলিং খেলবার ক্ষমতা উত্তর-পঞ্চাশেও অমরনাথ বজায় রেখেছেন। কিন্তু সেই ব্যাটিং দেখে একটি কথা মনে না হয়ে পারেনি—এই 'বেশ ভালো' ব্যাটিং দেখবার জন্য আমরা ব্যস্ত ছিলুম না—আমরা অ-ম-র-না-থে-র ব্যাটিং দেখতে চাইছিলুম। একটা পার্সন্যালিটির চেহারা গড়ে ওঠে তার কতকগুলো বিশিষ্ট আচরণের দ্বারা। পার্সন্যালিটি যার গড়ে উঠেছে, তার ক্ষেত্রে তার বুড়ো আঙুলের ছাপের মতো তার সকল প্রকাশের ছাপই অনন্য। ভারতীয় ক্রিকেটে কেন, বিশ্বক্রিকেটে অমরনাথ তেমন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ। তৃতীয় দিনে অমরনাথের ব্যাটিংয়ে কিন্তু অমরনাথের সে পার্স-ন্যালিটির চেহারা দেখতে পাইনি। কোথায় সেই অনিয়মের অট্টহাস, ছন্দোনাশের উর্ধ্বচ্ছন্দ টঙ্কার? তা সম্ভব নয় এই বয়সে? অবশ্যই। তবু ছাঁদ আসবে না কেন? ছাঁদ আনার অসম্ভব চেষ্টায় সম্ভবপর ব্যর্থতায় তো তাঁকে ভূষিত দেখতে পারতুম! যে সাধু সংযমের চেষ্টা অমরনাথ প্রয়োজনের সময়ে করেননি, অবসরের পরে সেই আত্মশোধন? মুস্তাক তো মুস্তাকরূপেই মাঠে বর্তমান ছিলেন। হায়, তৃতীয় দিনটিকে যদি অমরনাথের নামাঙ্কিত করতে পারতুম!

তাহলে অন্তত সেই বালকটি, যে তৃতীয় দিনেও বাপির কাছ থেকে টিকেটের পয়সা আদায় করে মাঠে ঢুকেছে, সে তার বার্ধক্যে একটা মিথ্যে অথচ সত্যি গল্প বলতে পারত: আমি অমরনাথকে ফর্মে খেলতে দেখেছি।

প্রদর্শনীখেলার চতুর্থ বা শেষ দিন মঙ্গলবার বিকেলে সোনালি রোদ পিঠে নিয়ে যারা ইডেন থেকে চৌরঙ্গীর দিকে মন্থর চরণে চলছিল, তারা বাড়ি ফিরতে ব্যস্ত ছিল না মোটেই। আজ বড়দিন। ছুটির দিন। শীতের সুখের দিন। অলস আনন্দে সারাদিন মাঠে কেটেছে। তপ্ত সুখময় ক্রিকেট সেবন করা গেছে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে। টিকিটের লাইনে নাইট ডিউটি দিতে হয়নি। সারাক্ষণ মাঠে বসে 'গেল-গেল' যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। অনেকেই ভালো খেলেছেন। ব্যাটে-বলে সংঘাতের মধুকূজনে ভরে ছিল সারা মাঠ—চমকে এক-জন শিউরে উঠল: সে কি কাল খেলা নেই?

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল-একাদশ হেরেছে, পরিষ্কারভাবেই ১৯২ রানে, কিন্তু সেকথা প্রায় কারো স্মরণ ছিল না। মুখ ভরে ছিল সকলের একটি মুখর কলরবে—দেশাই! দেশাই! এমনকি মুস্তাকও নয়—দেশাই!

খাটো দেশাইয়ের ব্যাটিং দেখে একজন গভীরভাবে বিজ্ঞানচিন্তা করল: ঠিক, ঠিক, অ্যাটম বোমা তো আকারে বড় নয়! একটা গোটা বিস্ময়ের নাম দেশাই। যখন জোর বল করতেন, লোকে ভেবেই পেত না—কোথা থেকে আসে শক্তি? দেশাইয়ের সে 'বল' গেছে। তাঁর বোলিংয়ের উপর ভরসা নেই। গতকাল ফিল্ডিংয়ের সময়ে তাঁর ছেলেমিতে অনেকেই অখুশি। দেশাই ভাবলেন—বটে রে! মহা রেগে দেশাই ফাস্টবোলিংয়ের কাঁধের জোর ব্যাটিংয়ের কব্জিতে

ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে বাউণ্ডারির বন্যা বয়ে গেল। আউট হওয়ার আগে অবধি দেশাইকে ঠেকানো গেল না কিছুতে। যে ফিল্ডিংয়ের আঙুলগুলি অন্যের কণ্ঠনালীতে চেপে বসেছিল কঠিন হিংসায়—দেশাই স্ট্রাইক নিলে সে ফিল্ডিং—পালা পালা পালা—'দেশাই এল দেশে।' মজাদার সে ব্যাপার। দেশাইয়ের সঙ্গীর বেলায় ফিল্ডিং গুটিয়ে আসে, তাই আবার ছড়িয়ে পড়ে দেশাইয়ের ক্ষেত্রে। ফিল্ডিংয়ের ছাতা খুলতে ও বন্ধ হতে লাগল পর্যায়ক্রমে। প্রথম ক্ষেত্রে 'ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।' দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত।'

এইখানে সাবধান হয়ে একটা কথা বলা উচিত। এই 'দেখ্-মার্' ইনিংসেও দেশাইয়ের মারের মান খুবই উঁচুতে ছিল। এইরকম নির্ভুল, নির্বিকার আক্রমণাত্মক ইনিংস ইডেনে অল্পই দেখা গেছে। ভ্রূক্ষেপ না করে দেশাই পিটিয়ে গেছেন, তার মধ্যে কিন্তু অজস্র সংখ্যায় প্রথমশ্রেণীর স্কোয়ারকাট, সুইপ, পুল, ড্রাইভ পাওয়া গেছে। সময়জ্ঞানে অভ্রান্ত, সুতরাং অব্যর্থ সেইসব মার অভ্যস্ত দক্ষতার সৃষ্টি।

দেশাই শেষ দিনে সামান্য সময়ে ১৪টি বাউণ্ডারিসহ ৮৪ রান করেছিলেন।

চতুর্থ দিন সকালে প্রত্যাশামতো অমরনাথ যখন নিজের ৬৫ নটআউট ও দলের ৫ উইকেটে ২৯৩ রানসহ প্রধানমন্ত্রী-একাদশের দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করলেন, এবং ৪৭৪ রানের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিয়ে রাজ্যপাল-একাদশ দ্বিতীয় ইনিংসে দুর্বল শরীরে টলতে-টলতে হাঁটতে শুরু করল—তখনি বোঝা গিয়েছিল ভবিষ্যৎ। রাজ্যপাল-একাদশে আহতদের বদলী হিসেবে কল্যাণ মিত্র ও অম্বর রায়কে ব্যাটিং করতে দেওয়া হয়েছিল—তবু। না বললেও চলবে, এই 'তবু'র কারিগর শ্রীযুক্ত রয় গিলক্রিস্ট। ইঞ্জিনীয়ার—০, বড়ুয়া—৫, কল্যাণ মিত্র—৮,—তিনটি উইকেট গেল ১২ রানের চাটনিসহ গিলক্রিস্টের গর্ভে। এই সময়ে অকুস্থলে আবির্ভূত হলেন অধিনায়ক অমরনাথ।—ওহে গিলক্রিস্ট তুমি যতবড় বোলার, আমি তার থেকেও বড় অধিনায়ক—অমরনাথ জানালেন। —তুমি যাচ্ছেতাই বল করছ, বুড়ো হাজারে তোমার থেকেও বড় বোলার, আমি আবিষ্কার করেছি—অমরনাথের ঘোষণা।—অতএব বৎস, সোয়েটার পরে বেড়ার ধারে সরে পড়ো—অমরনাথের নির্দেশ।

ঠিক এই সময়েই শোনা গেল মাইকে : বেলা তিনটেয় চায়ের সময়ে প্রধান-মন্ত্রী প্রভৃতির স্বাক্ষরিত ব্যাট নীলাম হবে। এবং—চা-পর্যন্ত খেলা চালাবার পক্ষে গিলক্রিস্ট সত্যই ভালো বোলার ছিলেন না।

প্রদর্শনী-ক্রিকেটকে সফল করবার পক্ষে অমরনাথ অনেক কিছু করেছেন। তিনি শ্রেষ্ঠতর দলের অধিনায়ক ছিলেন, সুতরাং খেলার সমাপ্তিকে বিলম্বিত করতে তাঁকে কিছু 'কৌসল' করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো সময়েই তিনি খেলাটিকে আয়ত্তের বাইরে যেতে দেননি। আক্রমণের ধার কমিয়েও চাপ বজায় রেখেছিলেন সর্বসময়।

রাজ্যপাল-একাদশের পক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে মুস্তাকের ক্ষীণায়ু অবস্থান। শুরু হয়েছিল পুরনো রীতিতেই। বাঁ পায়ের প্যাডের উপরে অভ্যস্ত রীতিতে ব্যাট চাপড়ে আরম্ভ করেছিলেন। যে-অমরনাথের বল ব্যাটের সঙ্গে আঠার মতো জুড়ে থাকতে চাইছিল, মুস্তাক চকিতে সরে গিয়ে তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে

দিয়েছিলেন। তবু মুস্তাককে অল্পেই যেতে হল। কারণ—হয়ত মুস্তাক-লিজেণ্ডের কুসংস্কার—মুস্তাক প্রথম বলে রান নিতে পারেননি। প্রথম ফসল ঘরে তুলে তবে মুস্তাকের নবান্ন।

রাজ্যপাল-একাদশের পক্ষে পঙ্কজের সুষ্ঠু ৪২, দেশাইয়ের দুর্দান্ত ৮৪ এবং ওয়াদেকরের অপূর্ব ৭২ সত্ত্বেও মোট রান হয়েছিল ২৮২। ওয়াদেকরের ব্যাটিং সম্বন্ধে কিছু কথা বলা উচিত। বলা উচিত যে, এই তরুণ খেলোয়াড়টি ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটে স্থান করে নিয়েছেন। অজিত ওয়াদেকর বল করতে পারেন, কিন্তু শেষদিনে তাঁর পরিচয় ব্যাটসম্যান হিসেবে। মারতে চান শুধু তাই নয়, মারতে পারেন এমন ব্যাটসম্যান। সব রকম স্ট্রোকে দক্ষতা আছে। বড় কথা, মারের ভঙ্গির সহজ সরলতা। এবং বিস্ময়কর যা, এই বয়সেই প্লেসিংয়ে দক্ষতা। সেটা সম্ভব হয়েছে ফুটওয়ার্কের জন্য। এমন ছন্দোময় তাঁর আক্রমণ যে, তীব্রতা সত্ত্বেও তাকে আপাতদর্শনে তীব্র মনে হয় না।

মাঠে আজ ছিল কার্নিভালের পরিবেশ। গ্যালারি ছেয়ে ছিল আনন্দের রঙে-রঙে। কত বাদ্য, কত খাদ্য। যার যাহা সাধ্য। 'মানবপুত্র' একদিন মানুষের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তিনি করুণা করে নিজ রক্তকে রূপান্তরিত করেছিলেন মদ্যে। মানবপুত্রের শুভ জন্মদিনে তাকেই আলঙ্কারিকভাবে মাঠে বসে (মাঠের বাইরে আলঙ্কারিকতা ঘুচেছিল অবশ্যই) পান করেছিলেন সকলে। কত সাজ আর সজ্জা। লজ্জার কিবা মনোহারী চর্চা। শীতে কেউ শীতাংশুকা, কেউবা অরি-রাগে চীনাংশুকা। শীতের বাৎসরিক বাসন্তী মেলায় সবাই গল্পে-গুজবে মত্ত—এরই মাঝে ক্রিকেটখেলা হয়েছে ও দেশরক্ষা-বন্ড কেনার অনুরোধ জানানো হয়েছে। মাইকে আরও একটি আহ্বান বিঘোষিত হচ্ছিল ক্ষণে-ক্ষণে—একটি নৃত্যনাট্যময় ক্রিকেটের আশ্বাস: চিত্রতারকারা ক্রিকেট খেলবেন আগামী তিরিশে ডিসেম্বর, দেশরক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে। প্রস্তাব সাধু, কিন্তু ঐ সাধু প্রস্তাবের একাংশ নিয়ে অনেকেরই আপত্তি দেখা গেল। চিত্রতারকাদের ক্রিকেটে, জানানো হল, মুস্তাক-অমরনাথ-মানকদ-আদি অংশ নেবেন। ক্রিকেটের কিছু মর্যালিস্টের কাছে সুন্দর মনে হয়নি জিনিসটি। চিত্রতারকারা হয়ত ভালই ক্রিকেট খেলেন, কিন্তু তাঁরা নিশ্চয় তাঁদের ক্রিকেট দিয়েই হাজার-হাজার দর্শককে মাঠে টেনে আনবেন না। তাঁদের সেই অতিরিক্ত 'আবেদন' যাঁদের নেই, যাঁরা শুধু ক্রিকেটাররূপেই পরিচিত, ক্রিকেট যাঁদের কর্ম ও ধর্ম—তাঁদের নিয়োগ করা কেন ক্রিকেটের পরিহাস-দিবসে? ঐসব ক্রিকেটাররা না খেললে মাঠে লোক কম হত? পর্দারসিক বাঙালীর এতবড় অপমান?

এই খেলায় খেলতে অনুরুদ্ধ হয়ে অমরনাথ নাকি বলেছেন: প্রয়োজন হলে দেশের জন্য তিনি দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করতে পারেন। হাঁ, সেক্ষেত্রে রূপকুমার, রূপকুমারীদের সঙ্গে ব্যাট-বাজি বল-নাচ এমন কি কথা?

ক্রিকেটকে একটা মহান খেলারূপে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের প্রশ্ন—মুস্তাক-অমরনাথ ক্রিকেটাররূপে আমাদের মনে যে-ছবি এঁকেছেন, সে ছবিকে নষ্ট করে লাভ কি?

ক্রিকেট, ক্রিকেট থেকেই প্রীতির ও কৌতুকের ব্যঞ্জনায় কতখানি রসময় হতে পারে তারই একটা দৃষ্টান্ত দিই:

এই খেলার তৃতীয় দিন। চায়ের-সময়ে ব্যাটসম্যান অমরনাথ ফিরছেন, তাঁর পাশে অপর দলের অধিনায়ক মুস্তাক আলী। প্যাভিলিয়নের কাছাকাছি এসে মুস্তাক বড়ো হাতে হাততালি দিতে-দিতে দর্শকদের ইঙ্গিত করলেন—'আরে ভাইয়া, তালি বাজাও, তালি বাজাও।' 'কেন? কেন?'—'আরে,বুঝছ না, অনেক রান করে নটআউট ফিরছেন গ্রেট অমরনাথ!' অমরনাথ টুপি খোলেননি। মুস্তাক তাঁর মাথা থেকে ছিনিয়ে টুপি উঠিয়ে নিলেন।—বটে! এমন খেলার পরে টুপি না খুলে প্যাভিলিয়নে ঢুকবে?

দুই বন্ধু হাসতে-হাসতে জড়াজড়ি করে প্যাভিলিয়নের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এই ক্রিকেট—সারা দিনের খেলা—সারা জীবনের।

প্রধানমন্ত্রীর একাদশ ঃ প্রথম ইনিংস—৬ উইঃ ডিঃ ৪২৩ (মেহেরা ১২৬, নাদকার্নি ১০৫, উমরিগর নটআউট ১০০। ওয়াটসন ৫১ রানে ২ উইকেট, কেনী ৪৯ রানে ২ উইকেট)।

রাজ্যপালের একাদশ ঃ প্রথম ইনিংস—২৪২ (পি রায় ৫৫, কেনী ৪৮, মানকদ ৩০, মুস্তাক আলী ২৮। গিলক্রিস্ট ৩৪ রানে ২ উইকেট, ডি এস মুখার্জি ৩৭ রানে ২ উইকেট)।

প্রধানমন্ত্রীর একাদশ ঃ দ্বিতীয় ইনিংস—৫ উইঃ ডিঃ ২৯৩ (মেহেরা ৬৮, অমরনাথ নটআউট ৬৫, কুন্দরাম ৪৮, পোদ্দার ৪৭, হাজারে ২৬। ওয়াদেকর ৩১ রানে ২ উইকেট)।

রাজ্যপালের একাদশ ঃ দ্বিতীয় ইনিংস—২৮২ (ওয়াদেকর ৭২, পি রায় ৪২, অম্বর রায় ২৪, দেশাই ৮৪। গিলক্রিস্ট ১৩ রানে ৩ উইকেট, নাদকার্নি ৬৪ রানে ৩ উইকেট)।

*** * * মুস্তাক আলী, সি কে নাইডু : সাক্ষাতে * * ***

...ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ! কলিকাতাবাসী ক্রিকেট-রসিকগণ! তোমাদের কাছে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না। আমি আমার জীবনের স্মরণীয় সংবর্ধনা পেলাম এখানে। আর একবার ক্রিকেটাররূপে তোমাদের এখানে আসব আগামী বছর। তোমরা আমার জন্য বেনিফিট-ম্যাচ করবে বলছ। তোমরা আমাকে ভালবাস জানি। তোমাদের দান নিতে শেষবারের মতো ক্রিকেটাররূপে দাঁড়াব ইডেন-গার্ডেনে। তোমাদের মনের মতো করে খেলব। কিন্তু তারপরে ব্যাট তুলে রাখব...

প্রদর্শনীখেলার শেষে কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে মুস্তাক গভীর কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে ঐ কথাগুলি বললেন। আশ্চর্য, এই কথাগুলোই শুনেছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে মুস্তাকের মুখে, তবে কলকাতায় নয়, ইন্দোরে।

কয়েক বছর পেছিয়ে যাই। ১৯৫৫ সাল।

স্পষ্ট করে স্মরণ করতে পারছি নভেম্বরের রৌদ্রোজ্জ্বল শীতস্নিগ্ধ প্রভাতটি। ঘুরতে-ঘুরতে গিয়েছি ইন্দোরে। শিপ্রাতটে কালভৈরব মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি শুনে কালিদাসের পুত্রকন্যাদের দর্শন-বাসনার সঙ্গে অর্বাচীন মনে আরো

একটি গোপন ইচ্ছা জাগল—আমার খেলার মাঠের হীরোদের একবার দেখে যাব, যদি সম্ভব হয়। 'লীলা' এবং 'খেলা'র রঙ্গভূমি এই অবন্তীদেশ।

বন্ধুবর গোপাল বলল—"সারভাতে তো রাস্তার ওপারেই থাকে, আমার সঙ্গে খুব দোস্তি, দেখা করবে না কি?"

বললুম—"না।"

চিন্তিত হয়ে গোপাল বলে—"সি এস নাইডু বোধহয় বিলেত থেকে ফেরেনি।"

উদাসীন সুনীত বলে—"ক্ষতি কি?"

কিছু ক্ষুণ্ণ হয়ে গোপাল বলল—"তাহলে মুস্তাক—"

উৎসাহিত হয়ে সুনীল বলে—"সেই কথাই তো বলছি।"

একটু থেমে, চোখ কুঁচকে, দুষ্টুমির হাসি হেসে গোপাল শুধায়—"আর সি কে নাইডু?"

প্রত্যাশায় অস্থির হয়ে বলি—"দেখা হবে তো?"

নভেম্বরের সকাল। মুস্তাক আলীর বৈঠকখানায় বসে। সাহেব গোসলখানায়—চাকর জানিয়ে গেছে। অপেক্ষা করছি। জানি একটু পরেই একটি সহাস্য আতিথ্য পাব। বেশি অপেক্ষা করতে হল না—the actor comes in. মুখে সেই পরিচিত বিস্তৃত হাসি, যা সেঞ্চুরি থেকে শূন্য পর্যন্ত সমান উজ্জ্বল। দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন মুস্তাক, ডান হাত সঁপে দিই, তাতে আন্তরিকতার চাপ লাগে—"দেওয়ালি মবারক।" ঠিক, আজ দেওয়ালি। অতএব আমরাও—"দেওয়ালি মবারক।" চা আসে, আর মিষ্টি। কথা শুরু হয়।

গোপালের সঙ্গে পূর্বপরিচয় আছে। বলে—"আপনি তো অনেকদিন এখানে ছিলেন না।"

—"হাঁ, পাকিস্তানে গিয়েছিলাম, ওখানে অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, তাছাড়া"—একটু লাজুক সুরে—"ওখানেই আমার শ্বশুরবাড়ী, বহুদিন পরে গিয়েছি, সহজে ছাড়তে চাইলে না, দেরী হয়ে গেল।"

অনেক কথাই হল। নানা ক্রিকেটারের কথা। বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটবোর্ডের কথা। মুস্তাক, সুভাষ গুপ্তের বিশেষ প্রশংসা করলেন। বললেন—"রিয়েলি ওয়ার্লড্ ক্লাস।" কঠোরভাবে নিন্দা করলেন বিভিন্ন দেশীয় ক্রিকেটবোর্ডের দলাদলি ও নোংরামির। "যাদের দায়িত্ব ক্রিকেটের মান উন্নয়ন করা, তারা যদি দলগত রাজনীতি আর ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে মেতে থাকে তাহলে ক্রিকেটের অবস্থা কি হবে, তা জানাই আছে সকলের।"

খেলোয়াড়দের আর্থিক দুর্দশার কথা উঠল। মুস্তাক বলতে থাকেন—"না হয় ক্রিকেটের কথা বাদই দিচ্ছি—যে-হকিতে আমাদের বিশ্বজোড়া নাম, তার ক্যাপ্টেন—তার অবস্থার কথা জানেন—"

বেদনায় গলা বুজে আসে। খেলোয়াড়-জাতির মধ্যে সুগভীর আত্মীয়তার অনুভূতি আমাদের স্পর্শ করে।

মুস্তাকের আক্ষেপ শেষ হয়নি—"অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটেও এই বিষ ঢুকেছে। তাদের বর্তমান দুর্দশার কারণও এই দলগত বিদ্বেষ। মিলারের সঙ্গে দেখা হল পাকিস্তানে। সে বলল, পলিটিক্সে বোর্ড আকণ্ঠপূর্ণ। তবে সেখানকার কথা ঢাকা থাকে, এখানে আমরা flash করি।"

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে প্রশ্ন করে গোপাল—"বলুন দেখি, বাংলাদেশে যাচ্ছেন কবে?" মুস্তাক সহজ হয়ে বলেন—"যদি রনজি-ট্রফি খেলতে যেতে হয়"

—"এমনি যাচ্ছেন না?"

—"না। মোহনবাগান অবশ্য ডেকেছে, কিন্তু ছুটি নেই।"

সুনীত একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—"তাহলে কি এবার আপনার খেলা দেখার সৌভাগ্য—"

থামিয়ে দিয়ে আনন্দিত হাস্যে মুস্তাক বলেন—"বাঙালীদের feelings আমি জানি। তারা আমায় ভালবাসে। আমিও কলকাতায় খেলতে যত ভালবাসি, এমন কোথাও নয়। জানেন কি"—মুস্তাক ব্যগ্র গলায় শুধান—"বাংলাদেশেই কার্যত আমার প্রথমশ্রেণীর খেলা শুরু?"

—"তাই নাকি?"

—"হাঁ, সে কতদিন আগে"—স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে আসে মুস্তাকের চোখ—"প্যাণ্ট কোট জোগাড় করেছি ধার করে। ফার্স্ট‌ক্লাস কামরায় ট্রাভল্ করছি—ফার্স্ট-ক্লাস!"—হো-হো করে হেসে ওঠেন—"রস্‌সিসে বিস্তারা বেঁধে নেমে পড়লুম ট্রেনের কামরা থেকে হাওড়া স্টেশনে—"

সহস্র দৃষ্টির উল্লাসধন্য রঙ্গনায়কের ধূলোপড়া পুরানো একখানা ছবি দেখছি আগ্রহভরে—প্রতিষ্ঠার আলোকোজ্জ্বল মঞ্চের ঠিক প্রবেশমুখে একটি ভীরু ছেলে, চোখে লজ্জা, বুকে শঙ্কা, হাতে দড়িবাঁধা বিছানা—

চকিত হয়ে শুনলাম, মুস্তাক বলছেন—"আমি অমর ঘোষকে বলেছি, যদি কোনোদিন আমার বেনিফিট-ম্যাচ করতে চাও, বাংলাদেশে করো।"

"নো মুস্তাক নো গেল—নো মুস্তাক নো গেল"—মনে পড়ে গেল প্যাভিলিয়ানের সামনে হাজার-হাজার পাগল বাঙালীর চীৎকার। ক্রিকেট-রোমান্সের নায়ককে তাদের চাই।

সুনিশ্চিত হাজারে, সুনিপুণ মার্চেন্ট, এমনকি বেপরোয়া অমরনাথ পর্যন্ত নন—বাঙালীর চাই দীর্ঘচ্ছন্দ, চটুলচরণ, লীলাময় মুস্তাক আলী। মুস্তাকের সেই অসামান্য খেলা কি কোনদিন ভুলবার! বলে আকাশছোঁয়া ফ্লাইট—তাও একবার নয়, দু'বার, তিনবার, বারবার—মুস্তাক আলী কি মরেছে? বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লেন ক্রীজ ছেড়ে—এবং—রুদ্ধশ্বাসে দেখছি—বলটি মিস্ করলেন। বোলার তো এই চাইছিল—অসহিষ্ণুতা অনুমান করে বলটা একটু টেনে দিয়েছে। তখন—যা দেখলুম (আর কি কখনো দেখব না?)—সামনে ক্রীজের বাইরে দুই পা, কচি বাঁশের মতো শরীর চকিতে হেলেছে উইকেটের দিকে—মিস্-করা বল বেল ছুঁতে যাবে—তার আগেই মুস্তাকের ব্যাট তাকে আদরে-শাসনে চাপড়ে দিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে কি-একটা হয়ে গেল, রূপের ঝলক তুলে কি-যেন সরে গেল। লেট-কাট। বাউণ্ডারি? হাঁ। বিপদকে সম্পদের ঐশ্বর্যে রূপান্তরিত করার যে প্রতিভা, তাকে বাঙালী ভালবাসে।

আর ভালবাসে মুস্তাকের অবিমৃষ্যকারিতাকে। ক্রীজ ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে যদি বল ফস্‌কালেন, ফিরেও দেখবেন না—ব্যাট একেবারে মাথার উপর তুলে, লম্বা পায়ে প্যাভিলিয়ানের দিকে দৌড়। ইতিমধ্যে উইকেটকীপারও ঠিকমতো বল ধরতে পারেনি, এখন ধীরসুস্থে বল কুড়িয়ে সে স্টাম্পড্ করে। হায়-হায়

করে ওঠে সমস্ত দর্শক। তবু তাদের সর্বাঙ্গে সূক্ষ্ম প্রফুল্লতার একটা রোমাঞ্চ শিউরে যায়—Yea, this is Mustaq Ali, this is cricket! আম্পায়ারের খাড়া হাতের কাছ থেকে খারিজের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করার বান্দা মুস্তাক নয়। মনে পড়ে, ক্রীড়ারসিক বাঙালীর লঘু রোমাণ্টিক মনকে একদিন এই সংবাদটি চঞ্চল করে তুলত—মোহনবাগান পেনালটিতে গোল দেয় না।

মগ্ন হয়ে ভাবছি, সচেতন হলুম সুনীলের প্রশ্নে—"আচ্ছা, আপনি কি খেলার টেকনিক পাল্টেছেন—একটু স্লো খেলছেন নাকি?"

মুস্তাক ধীরে বললেন—"হাঁ। বয়স হয়েছে। তাছাড়া বোর্ড বলে—Mustaq is too fast."

চমকে উঠলুম। ঋতুরাজ মুস্তাক যৌবন হারিয়েছেন! তাই সাবধানী, মন্থর! "Most mature batsman in present-day India"—বেরী সর্বাধিকারীর এই প্রশংসাবাণীতেও সান্ত্বনা পেলাম না। ভালো করে তাকিয়ে দেখি মুস্তাকের কানের কাছে চুলে শুভ্র সংকেত। মুস্তাক শেষ।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। ওধারে এলোমেলো কথা চলছে। বঙ্গের 'পঙ্কজ রবি' সম্বন্ধে বলছেন—"He is good (মুস্তাকের ঠোঁটের ডগায় এই কথাগুলো বাসা বেঁধে আছে), কিন্তু বড় দেরীতে স্ট্রোক করে। আমি ক্যাপ্টেন হলে ওকে চার কি পাঁচের জায়গায় পাঠাতুম, but either he is No. One or no one in the team." বাঙালী ব্যাটস্‌ম্যানদের মধ্যে কার্ত্তিক বসুর প্রশংসা করলেন, দুঃখ করলেন নির্মল চ্যাটার্জির ক্ষমতার অপব্যয়ের জন্য। সুঁটের বোলিং-এর প্রতি স্তুতি জানিয়ে সকৌতুক প্রশ্রয়ের সুরে প্রবীর সেনের উল্লেখ করলেন। ছায়াভরা মনের উপর দিয়ে আরো কিছু কথার চলাচল হয়—পূর্ণ-সচেতন হলাম গোপালের প্রশ্নটা কানে যেতে।—"বলুন তো, আপনার ক্রিকেট-জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাময় খেলা কোন্‌টি?" মুস্তাক আগোছালো হেসে প্রতি-প্রশ্ন করলেন—"কোন্‌টি নয় বলুন? খেলা থেকে উত্তেজনা পেতে এবং দিতে চেয়েছি সর্বক্ষণ।" মুস্তাকের অস্পষ্ট উত্তর এবং সুস্মিত চাউনিতে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রশ্নটা আঁকড়ে রইল সকলে। সুনীল মুখ আগিয়ে এবং নাড়িয়ে কাতরস্বরে অনুরোধ জানাল—"কাইণ্ডলি একটু ভেবে দেখুন।" সুনীতকুমার স্বভাবগাম্ভীর্যে ধীর চালে ধরিয়ে দিল—"আপনার কি মনে হয় না, দু'-এক বছর আগে বাংলা হোলকারের মধ্যে রনজি-ট্রফির ফাইন্যাল খেলাটা খুবই চাঞ্চল্যকর হয়েছিল?" এতক্ষণ আমরা লজ্জার মাথা খেয়ে সমস্ত মনোভাবটা প্রকাশ করতে পেরেছি। বাংলাদেশ কেবল মাঠের বাইরে থেকে হাততালি দিয়ে নয়, মাঠের ভিতরে ব্যাটবল খেলেও মুস্তাককে সবচেয়ে উত্তেজিত করতে পেরেছে—মুস্তাকের মুখ থেকে এই স্বীকৃতির সার্টিফিকেটটা আমাদের চাই।

"ঠিক"—মুস্তাক বাস্তবিক খাড়া হয়ে বললেন—"বলেছেন ঠিক। অমন উত্তেজনাসঙ্কুল খেলা আর আমি মনে করতে পারছি না।" জ্বলজ্বল করে উঠলেন এবার—"সে তো খেলা নয়, মরণের চোয়ালে কয়েক ঘণ্টার অবস্থান।"

খেলাটার কথা আমাদের বেশ মনে পড়ে। স্নায়ুর উপর অমন অত্যাচার কম করেছি। সে বছর অনেকদিন পরে বাংলাদেশ শক্তিশালী। শেষ দিনের খেলা। আমাদের জিতবার সমূহ সম্ভাবনা। প্রথম ইনিংসে সামান্য এগিয়ে থাকলেও

দ্বিতীয় ইনিংসে হোলকারের বিপর্যয় হয়েছে, রানসংখ্যায় বাংলা বেশ এগিয়ে। হোলকারের শেষ খেলোয়াড় যখন ব্যাট হাতে নামল, তখনও খেলা শেষ হতে এক ঘণ্টা সময় বাকি। একে শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে? তৈরি হচ্ছি একটি আনন্দদায়ক উত্তেজনার জন্য—বহুদিনের পর বাংলা রনজি-ট্রফি পাবে—আর কয়েক মুহূর্ত...

হোলকারের শেষ আশা মুস্তাক আগেই আউট হয়ে গেছেন। "সেই প্রথম আমি খেলা শেষ হওয়ার আগে মনে-মনে হার মেনে ক্রীজ ছেড়ে চলে এসেছি" —মুস্তাক পুরানো চাঞ্চল্য নতুন করে বোধ করেন—"প্যাভিলিয়ানে টিকতে পারলাম না, উত্তেজনা সহ্যের বাইরে, বিষাক্ত নখ দিয়ে স্নায়ু-শিরাকে যেন চিরে-চিরে ছিঁড়ছে। আমার স্ত্রী এসেছেন প্রথম কলকাতায় খেলা দেখতে। She was crying, all the time. উড়ে এসেছেন হিজ হাইনেস হোলকার স্পেশাল প্লেনে—ফোন ধরে লোক বসে আছে ইন্দোরে। We have lost—জানিয়ে দিলাম। ফিরে এলাম হোটেলে চরম অবসাদ নিয়ে।"

সঠিক হার তখনো হয়নি, কিন্তু হারতে আর কয় মুহূর্ত লাগবে? মাঠে সমস্ত দর্শক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত...সইতে পারছে না খেলোয়াড়েরা, বুঝি শ্বাসরোধ হয়ে আসে—হাত কাঁপছে, পা টলছে ...ব্যাটসম্যানেরা এখনো বল ঠেকিয়ে যাচ্ছে কি করে...পি সেনের হাত দিয়ে বল গড়িয়ে পড়ছে, তুলতে দেরী হচ্ছে...মাঝে-মাঝে জ্বরাতুরের কম্পিত গলায় ডাক 'হাউজ দ্যাট'...। মাঠে ছুটে এলেন অভিজ্ঞ নাইডু, ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে কানে-কানে কি কথা হল—অসহ্য লাগছে দর্শকদের---এই কি কথাবার্তার সময়...

মুহূর্ত থেকে মিনিট...এক মিনিট...দু মিনিট...পাঁচ...দশ...পনের...কুড়ি... ত্রিশ...চল্লিশ..."এখন তখন করি দিবস গোঙায়লু, দিবস দিবস করি মাসা..."

"ভূমির পরে জানু পাতি, তুলি ধনুঃশর, এক কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদি গড়"—

সকলে উত্তেজনার তীব্র স্পন্দনে মথিত—কেবল একজন শান্ত—আশ্চর্য রকম শান্ত...মুদিত নেত্র...জপ করে যাচ্ছেন ইষ্ট দেবী কালী নাম—"Each man, in his moments of sublimity would catch a fleeting glimps of divinity. This was my moment—like a flash, something occurred to me"—সি কে ব্যাখ্যা করেছেন পরবর্তীকালে।

"সেই ম্যাচ জিতেছিলুম আমরা—অবশেষে। হীরালাল গায়কোয়াদ এবং ধান-ওয়াদেকে সেলাম—তারা অঘটন ঘটিয়েছিল—" স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুস্তাক বললেন। স্মরণেই তাঁর পুরানো উদ্বেগ ফিরে এসেছিল।

সি কে নাইডু বলেছেন—"সেই খেলায় অধিনায়ক ছিলুম বলে আমি গৌরব বোধ করি—which I would even call 'the match of the century'."

অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে, এবার উঠব। মুস্তাক জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় যাবেন?"

"সি কে নাইডুর বাড়ী।"

"নিশ্চয়, You must see him."

আমাদের একজন ফস্ করে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন?"

মুস্তাক গম্ভীর হলেন। ধীরে বললেন—"শিষ্যকে দেখলে গুরুকেও দেখা উচিত। What Mustaq is to-day, is the creation of C. K. Nayudu."

মুখ আরক্ত, গলা থমথমে, ঘরের আবহাওয়া এক মুহূর্তে ভারী হয়ে গেছে। —"দরিদ্র ঘরের ছেলে, মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে দেখতাম সি কে খেলছেন। সে স্বপ্ন দেখার মতো। তাঁকে অনুকরণ করতাম। তারপর তাঁর চোখে পড়লাম। তার-পর—"

সাজানো একটি ঘর—কৌচ, চকচকে টেবিল, ফুলদানি, ঘরভর্তি আসবাব, মুস্তাকের উজ্জ্বল চেহারা, পরিপাটি বেশবাস, ভালো চাকরি, নিশ্চিন্ত সুখী জীবন। আরো তাকিয়ে দেখি, মুস্তাকের মুখে একটা নম্র আলো।

কৃতজ্ঞতা মানুষকে সুন্দর করে।

মনোরমা-গঞ্জের বিশেষ বাড়িটির গেট খুলে ঢুকলাম সন্তর্পণে। দুপুর বারটা। শহরের প্রায় প্রান্তে। একপাশে ঢেউখেলানো সবুজ মাঠ, দূরে নীল পাহাড়ের ইসারা। এপারে ছবির মতো একটি বাড়ি, গাছপালায় শীতল। বাগানের মাঝখানে ফুট-দশ মাথা তুলেছে একটি নারিকেল গাছ, নীচু পাতা মেলে আমাদের চোখের সামনে সবুজ আলোয় ঝিলমিল করে কাঁপছে। চারি-দিক নিস্তব্ধ। সামনের ঘরে একজন বসেছিলেন, কালো পাথরে-কোঁদা শরীর। আমরা উদ্দেশ্য জানালাম। আমাদের বসিয়ে তিনি খবর দিতে গেলেন।

বাগানের সামনের বারান্দায় বসে চুপচাপ। কোথাও চাঞ্চল্য নেই, কেউ জোরে কথাও বলছে না। উজ্জ্বল রোদ, বিস্তৃত মাঠ, সাজানো বাগান, আর আমাদের সম্ভ্রমস্থির মন—সব মিলিয়ে অগাধ শান্তি। যেন সব ঘুমিয়ে আছে—এখানে বিশ্রাম করছে ভারতীয় ক্রিকেটের একটা গোটা যুগের ইতিহাস। অধিনায়ক নাইডু ক্রিকেট থেকে বিদায় নিয়েছেন—তাঁর বাহিনীকে নিয়ে ক্রিকেটের আপস-হীন নেতাজীকে কোনোদিন দেখব না আর রণক্ষেত্রে। ক্রিকেট-বাণপ্রস্থের চল্লিশকে টেনে নিয়ে গেছেন পঞ্চাশে, পঞ্চাশ থেকে ষাটে। এবার চাই বিশ্রাম। সুদীর্ঘ ইনিংস শেষ করে এদেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে উঁচু মাথা ফিরে গেছে প্যাভিলিয়ানের আরাম কেদারায়। Nayudu is sixty, Nayudu will play no more.

অনেকক্ষণ বসে আছি। খবর পেয়েছি তিনি পুজো করছেন, শেষ করে আসবেন।

গোপাল সমঝে দিয়েছে—বড় রাশভারী লোক, মুস্তাকের মতো দিলখোলা নয়। দেখা যখন করতে এসেছি, দু'চার কথা ভদ্রতা করে কয়ে বিদায় দেবে। বিশেষ দুপুর বারটার পর রীতিমত অসময়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মর্যাদামন্থর অথচ স্বচ্ছন্দ চরণে প্রবেশ করল এক দীর্ঘ দেহ। দেখে চমকে উঠলাম—এই কি নাইডু? কী প্রভেদ! খেলার মাঠে বিলেতি পরিচ্ছদঢাকা কর্নেল নাইডুর পরনে এখন ধুতি, গায়ে মটকার পাঞ্জাবি, সৌম্য-স্নিগ্ধ ক্ষৌরিত মুখ, ভ্রুর উপরে, কপালের পাশে, চোখের পাতায়, জলের ছিটে। ঠিক তো, নাইডু পুজো করছিলেন। উঠে দাঁড়ালাম, শুধু ভদ্রতা করে নয় নাইডু দাঁড় করাতে পারেন।

"বসুন বসুন। কোথা থেকে?"

গোপাল বলল—"কলকাতা মানে হাওড়া থেকে।" পরিচয় দিতে শুরু করল।

আমি তখন ভালো করে দেখছি। কী দীর্ঘ আর সুচ্ছন্দ। কালো অথচ সুন্দর। পুরুষের মূর্তি। লম্বাটে দৃঢ় মুখ, কঠিন চিবুক, চাপা ঠোঁট, খাড়া নাক—স্পষ্ট প্রত্যেকটি রেখায় সযত্নে ক্ষোদিত অবয়ব। উঁচু নাকের পাশ থেকে গভীর বিস্তৃত প্রান্তরক্ত দুটি চোখ, প্রান্তের রক্তিমচ্ছটা চোখ ফেরালে গাঢ় হয়ে ওঠে। লাবণ্যময় ব্যক্তিত্বে গম্ভীর ভাস্কর্য।

নাইডু অধিনায়ক, নাইডুর চোখের ইঙ্গিতে যুদ্ধজয় হয়, মিথ্যে নয়। 'জনতার মাঝে অপূর্ব একা।' সম্ভ্রম বোধ করি।

সহজ বিস্ময়ে নাইডু শুধোচ্ছেন—"কলকাতা থেকে? সে তো অনেক দূর! বাংলাদেশ! তা কি মনে করে এখানে?"

সুনীল কি একটা উত্তর দিচ্ছে—নাইডুর দিকে তাকিয়ে আমার নেভিল কার্ডাসের উক্তি মনে পড়ে—In the long run, it (cricket) is the sum-total of the character of the men who take part in it.

নাইডু প্রশ্ন করলেন—"ইন্দোরে কি দেখবেন?"

সুনীল বলে চলে—"ইচ্ছে ছিল বাঘ-গুহা দেখতে যাব, হয়ে উঠল না। এখন এসেছি আপনাকে দেখতে।"

নাইডু হাসলেন—"আমাকে?" তারপর কথা এড়িয়ে বলতে লাগলেন একটু দ্রুত—"জানেন মালবদেশ আবহাওয়ার জন্য বিখ্যাত। জানেন—"

নিজের কথা এড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া খেলা ছেড়ে-দেওয়া ষাট বছরের বৃদ্ধ নাইডুকে দেখবারই বা কি আছে? করতালিতে নগদ বিদায় মিলেছে যাদের, স্থায়ী মূল্যে তাদের অধিকার সামান্য। আলো নিভে আসার সঙ্গে-সঙ্গে খেলাও শেষ, সংবর্ধনাও শেষ। তাই কি নাইডু এড়িয়ে যেতে চাইলেন?

ষাট বছর আগে কট্টারি কনকাইয়া যেদিন জন্মেছিলেন সেদিন কিন্তু অনেকে এসেছিল সঙ্গতভাবেই, দেশী এবং বিলেতি। সেদিন নাগপুরে নাইডুর দলের সঙ্গে বৃটিশ রেজিমেণ্টাল দলের ক্রিকেট খেলা। ছেলে কাঁদল আর শাঁখ বাজল। মিষ্টান্ন ও অর্থ বিতরিত হল নবজাতকের কল্যাণে। বৃটিশ দলের সদস্যেরা কৌতূহলী হয়। যখন জানল, সদ্যোজাতের কল্যাণে অর্থবিতরণ, তখন তারাও টুপি পাতল। তা ভরে গেল পিতামহ নাইডুর অকৃপণ দানে। উৎফুল্ল হয়ে তারা বলল—এ ছেলে সেরা ছেলে হোক খেলার জগতে। সেদিনের শিশু নাইডু ভবিষ্যতের বীজ, তা দেখতে জড়ো হওয়া চলে, কিন্তু আজ?

গতশক্তি অঙ্গাররূপী নাইডু তাই হয়ত নিজের ক্রিকেট-জীবনের কথা বলতে নারাজ। তিনি মালবদেশের প্রাণহরণ আবহাওয়াকে প্রশংসায় ভরিয়ে তুলতে শুরু করলেন।

আমি কিন্তু আরো ভালো করে লক্ষ্য করতে থাকি। চেষ্টা করি দেখতে চোখ-মুখের সেই বিদ্যুদ্দীপ্তি, যা গণ্য বিপক্ষকে বিমূঢ় করেছে বারবার। ব্যর্থ হই।

নাইডু বলে চলেন—"ঔরঙ্গজেবের সমকালীন ঐতিহাসিক মালবের উচ্চ-প্রশংসা করে বলেছেন—'সবেরে বেনারস, দো পহরকো আউধ, ঔর সামমে মালব।' এখানকার জলবায়ুতে আতিশয্যের অত্যাচার নেই। প্রায় সব ঋতু নাতি-

শীতোষ্ণ। তার কারণ পশ্চিমঘাট পর্বত মালবের কাছে ৪০।৫০ মাইল ভেঙেছে। ফলে সমুদ্রের বায়ু গ্রীষ্মকে সহনীয় এবং শীতকে সুখকর করে। একজন কবি বলেছেন"—নাইডু একটু থামলেন—বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর মৃদু গলায় বললেন—"কবির কথাগুলো ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু একথা কি জানেন, জানেন নিশ্চয়, মানেন কি যে, ভারতবর্ষে জন্মানো একটা সৌভাগ্য? আমি বহুদেশ ঘুরেছি, কিন্তু এমন দেশ"—আবার চুপ করলেন, পরে অতি ধীরে, পবিত্র একটি মন্ত্রের মতো দু'বার উচ্চারণ করলেন—"ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!"

অন্যমন হয়ে একেবারে থেমে গেলেন। নিজের করতলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। দীর্ঘ পল্লবদু'টি শান্তরৌদ্র দুই চোখের উপর অপরাহ্ণের ছায়ার মতো নামতে-নামতে অর্ধপথে, যেন মুগ্ধ-মৌনে, স্থির হয়ে রইল।

এতক্ষণে আমি আমার উত্তর খুঁজে পেলুম। নাইডুকে এখনো দেখবার আছে। কেবল নাইডুর ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষেরও নাইডু। খেলা শেষে ভারতবর্ষের মানুষ শেষ হয়ে যায় না।

একটু সচেতন এবং উৎসাহিত হয়ে নাইডু এবার বলেন—"ইন্দোরের আবহাওয়া কিন্তু আমার বড় ভালো লাগে। এখানকার শীতের আমেজ লোককে কাজ করবার প্রেরণা দেয়।"

ছন্দ বজায় রাখতে এবং প্রসঙ্গান্তর আনতে কথার পিঠে বলে উঠি—"আর ভালো খেলোয়াড় সৃষ্টি করে।"

এইবার নাইডু সিধে হয়ে বসেন, পুজোর আমেজ বোধহয় কাটল—"কি বললে, ভালো খেলোয়াড়? কোথায় ভালো? আমরা কি পৃথিবী জিতেছি? পৃথিবীর ক্রিকেটে ভারতের স্থান কোথায়? না না, 'ভালো' কথাটা শুনতে আমার ভালো লাগে না।"

সবিনয়ে সুনীত জিজ্ঞাসা করে—এ অবস্থার কারণ কি, এ অবস্থা দূরই বা হবে কেমন করে?

সি কে বলেন—"সর্বত্র এই একই প্রশ্ন। বোর্ডও আমাকে এই প্রশ্নই করে। কারণ অনেক আছে—এ দেশের প্রকৃতি, যা সহজে আহার জোগায় ও অলস করে। এ দেশের পরাধীনতা ও দারিদ্র্য। কিন্তু তার থেকে বড় কি জানেন, আমাদের আন্তরিকতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, যদি শুধু আন্তরিক আর বিশ্বাসী হও, তাহলেই সমস্ত পৃথিবী তোমার পায়ের তলায় লুটোবে।"

বিবেকানন্দের উল্লেখে সচকিত হই। জীবনবিরোধী ধর্মকে যিনি জীবনধর্ম দিয়ে আঘাত করে দুঃসাহসের সঙ্গে বলেছিলেন, গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা বাঞ্ছনীয়, সেই বিবেকানন্দকে সকল সংগ্রামীর প্রয়োজন। নাইডু পূর্ববৎ বলে চলেন—"আমরা কি খেলোয়াড়! কোনো বিষয়ে আশা নেই, বিশ্বাস নেই, মরবার আগে দশবার মরে আছি—Our match is lost, before that is actually won."

চুপ করে থাকি। সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে একজন মানুষ কথা বলছেন। নিজে সমর্থ হয়েও ব্যর্থতার বেদনা সারাজীবন বহন করতে হয়েছে

তাঁকে। তাতে মন আহত। ক্ষোভে বিস্বাদ কণ্ঠ—"সবচেয়ে দুঃখের কথা, আমাদের স্বাভাবিক নৈপুণ্যের অভাব নেই। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি জোর করে—ভারতীয় খেলোয়াড় ১৫ দিনে যা শিখবে, বৃটিশ খেলোয়াড়ের তা শিখতে কম করে ৪ মাস লাগবে। কিন্তু ১৫ দিন পরেই ভারতীয় খেলোয়াড় বলবে, আমি সব শিখে ফেলেছি, ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়ান হয়ে গেছি, ফলে পতন হতে দেরী হয় না। আর ইংরেজ খেলোয়াড় সারাজীবন অনুশীলন করে যাবে। আমার পিছনে ছোকরা খেলোয়াড়েরা ঘোরে—খেলা শিখতে নয়"—ঘৃণায় আর ক্রোধে নাইডুর চোখ দপ্ করে জ্বলে ওঠে—"টেস্টে চান্স দাও, কবে টেস্টে চান্স পাব?—এই কান্না। কেন তুমি বোর্ডের কাছে ধন্না দেবে—বোর্ড কেন তোমার পিছনে ছুটবে না?"—খান্ খান্ হয়ে ওঠে নাইডুর গলা। একটু আত্মসংবরণ করে বলেন—"আমি এতদিন ধরে সফলতার সোপান-রূপে একটা জিনিস শিখেছি—ধ্যান। ধ্যান চাই, সর্ববিষয়ে ধ্যান।"

গোপাল সমর্থনের সুরে বলে ওঠে—"তা ঠিক। হোলকার-দলকে নিয়ে আপনার নিয়মিত অনুশীলন দেখেছি। তার ফলেই ক্রিকেটে হোলকারের এত নাম।"

নাইডু বাধা দিয়ে বলেন—"তাতে কি হয়েছে? তারা কি যা শিখিয়েছি, তা আয়ত্তে রাখতে পেরেছে? আমরা যত সহজে উন্নতি করি, তত সহজে পড়ে যাই। এ যেন অখণ্ড সত্তাকে দর্শন করে আবার নরক দর্শন করা। ছি ছি। শুধু কথার যুগ এসেছে।" নাইডু তিক্ত কণ্ঠে বলেন—"আমাদের বচনে রাজা জন্মাচ্ছে, বচনে মরছে। অথচ এই ভারতবর্ষ কত ঋষি মহর্ষির জন্মস্থান, যাঁরা শুধু কথার ব্যবসা না করে ধ্যানে আত্মানুশীলনে জীবন কাটিয়ে গেছেন।

"আমার তো মনে হয়, ভারতে দু'ধরনের লোক জন্মায়—বড়-বড় মহাত্মা আর নীচ হীন পাপী।"

একটা বিজ্ঞ মন্তব্য করবার সুযোগ পাই, বলে ফেলি—"আমাদের এখন দরকার মাঝারি লোক—"

নাইডু ঝলসে বলেন—"তা কেন—"

হঠাৎ একটা বিরাট কালো কুকুর ভিতর থেকে তিন লাফে এসে হাজির হয় এবং সটান সামনের দুটো পা সি কে'র কাঁধের উপর তুলে সোহাগ জানাতে শুরু করে। কথার মাঝখানে বাধা পড়তে বিরক্ত এবং ব্যতিব্যস্ত হয়ে সি কে প্রচণ্ড ধমক দিতেই কুকুরটি প্রভুভক্ত কুকুরের মতোই পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে আদর সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়। আর আমার মনে পড়ে, গোপাল বলেছিল, নাইডু যখন খেলা শেখান তখন এমনইভাবে মুস্তাক, গায়কোয়াড়, সারভাতে, সি এস-এর দল তাঁর সামান্যতম আদেশ পালন করতে ছোটাছুটি করে। 'Dog like tenacity and devotion'—কথাগুলোর মধ্যে কোনো অসৌজন্য নেই।

নাইডু ছিন্ন কথা টেনে বলতে লাগলেন—"তা কেন, আমরা কি পাহাড়ের শিখরে উঠতে পারি না? এই ভারতে জন্মানই যে একটা পবিত্রকর্ম। এই দেশেতে জন্মেছি, ঈশ্বর করুন, যেন এই দেশেতে মরতে পারি। ভারত! ভারত! ভারত! কত মহাত্মার পদধূলিতে পুণ্য এই দেশ! ধরুন না কেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁদের কথা জানেন—?"

নাইডু বলতে থাকেন—'এই তো সেদিন, দিন দশ-বার হবে, পবিত্র কাশীধাম থেকে ফিরছি—এলাহাবাদ স্টেশনে চোখে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের একটি জীবনী। সেই থেকে তার মধ্যে ডুবে আছি। কি জীবন! Divine! Divine! A Life Divine!"

নাইডু বললেন—"দাঁড়াও বইটা এনে দেখাচ্ছি, ওঘরে আছে।"

অত্যন্ত উৎসাহভরে আরামকেদারা ছেড়ে উঠতে যাবেন, কোমর ধরে বসে পড়লেন। কি হল—উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করি একসঙ্গে সকলে। মুখে হাসি টেনে নাইডু বলেন—"কিছু নয়, বয়স হওয়ার সঙ্কেত।" তারপর ধীরে উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

ফিরে এলেন অল্প পরে। বললেন—"অপূর্ব বই, অ-পূর্ব !"

নাইডু এবার অন্তরঙ্গ সুরে বললেন—"তোমরা কোথায় থাকো বললে, হাওড়া না? আমি একবার হাওড়া গেছলাম, কি যেন ক্লাবের নামটা—"

গোপাল বলল—"সালকিয়া ফ্রেন্ডস্। আপনি সম্ভবত তাদের প্যাভিলিয়ান উদ্ঘাটন করতে গিয়েছিলেন।"

নাইডু স্বীকৃতির ঘাড় নাড়েন—"হাঁ হাঁ ঠিক। সেদিন কিন্তু বড় মুস্কিলে পড়েছিলাম। গাড়ী খুব লেট ছিল, স্টেশন থেকে সোজা যেতে হয়েছিল সালকিয়া।" হঠাৎ নাইডু ফিরে প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, হাওড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর কত দূর?"

সুনীল আন্দাজ করে বলল—"মাইল ছয়েকের উপর হবে।"

আমি আরো বিশদ করার চেষ্টা করি—"হাওড়া থেকে বেলুড় সাড়ে চার মাইল, বেলুড় থেকে দক্ষিণেশ্বর মাইল আড়াই।"

নাইডু—"এলগিন রোড থেকে?"

সুনীল—"মাইল দশেকের কাছাকাছি।"

নাইডু খানিক চুপ করে রইলেন। একটু ইতস্তত করে আবার শুরু করলেন—"আমি কতদিন থেকে কলকাতা যাচ্ছি, দক্ষিণেশ্বর যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। প্রতিবারই লিলুয়া স্টেশন পেরিয়ে যাওয়ার পর মনে পড়ে, আর প্রতিজ্ঞা করি পরের বার নিশ্চয় যাব। সহসা একবার সুযোগ এল। সেবার অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস-দলের সঙ্গে ইস্ট জোনের খেলা। আমি ইস্ট জোনের ক্যাপ্টেন। মাঠে হঠাৎ কে যেন বললে—আপনি দক্ষিণেশ্বর গেছেন? কথাটা দৈবনির্দেশের মতো শোনাল। বললাম—যাইনি কিন্তু যাব। সেদিন সন্ধ্যায় অস্ট্রেলিয়ান দলের সম্মানে ব্যাঙ্কোয়েট। আমি পঙ্কজকে (পঙ্কজ গুপ্ত) ফোন করলাম—ভীষণ অসুস্থ, ব্যাঙ্কোয়েটে যেতে পারব না। পঙ্কজ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল—সে কি, কী অসুখ? আমি বললাম—একটা কিছু, তা জানবার দরকার নেই। তবে নিশ্চিত থেকো রাত দশটার মধ্যে সেরে যাবে। বলেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সোজা দক্ষিণেশ্বর। ধন্য হলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা করেছেন, সেই জায়গা দেখলাম। ব্যবহার করেছেন, সেই জিনিস দেখলাম। আরাধ্যা কালীকে দেখলাম। তারপর গেলাম বেলুড়। বেলুড়ের এক সাধু আমাকে নিয়ে যত্ন করে সব দেখালেন। তারপর প্রসাদ ও চা খাওয়ালেন। সেদিনের সেই সন্ধ্যা—"

দুপুর একটা বেজে গেছে। বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ। নাইডু কিন্তু কোনো এক-

সন্ধ্যার মধ্যে তলিয়ে গেছেন—অস্পষ্ট সুরে বললেন—"সেই সন্ধ্যা কোনোদিন ভুলব না, ভুলব না। অনুভূতি—অপার্থিব শান্তি।"

অনেক দূরের একটি সন্ধ্যার আবছা শান্তি আমাদের মনের উপর নেমে আসে, আচ্ছন্নের মতো বসে থাকি।

স্মৃতিসুদূর কণ্ঠে নাইডু বলতে থাকেন—"১৯৫৩ সালে যখন নিউইয়র্কে ছিল্যুম, হঠাৎ খবর পেলাম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি উন্মোচিত হবে। সব ফেলে ছুটলাম। একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠানে চমৎকার ভাষণ দিলেন এক স্বামীজী। রামকৃষ্ণ সেখানেও।

"তোমরা বোধ হয় অবাক হচ্ছ, আমি ক্রিকেটের কথা না বলে, এসব কথা বলছি"—নাইডু ঈষৎ কুণ্ঠিত হন।

অবাক হচ্ছি সন্দেহ নেই। যা সহজে মেলে না, এমন অপ্রত্যাশিত আকারে মেলে! ব্যস্ত হয়ে বলি—"না না, আপনি বলুন।"

নাইডু বলে যান—"দেশ-বিদেশে রামকৃষ্ণ-অর্চনা কত বেড়ে গেছে। আমি নিউইয়র্কে একদিন সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে ধূপ জেবলেছি, কোথা থেকে হোটেলের পরিচারিকা—জাতে জার্মান—ছুটে এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল। তার স্বামী রামকৃষ্ণের ভক্ত। আর একটা ঘটনা শোনো। কিন্তু তার আগে চা খেয়ে নাও।"

সকলে না-না করে উঠি। নাইডু স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন—"লজ্জা করছ না তো? যা হোক, আমাকে ধর্মতাত্ত্বিক ভেবো না, আমি ধর্ম-দর্শনের কথা কিছু জানি না, তবে মন্দিরে যাই।"

আমার জানা ছিল। বললাম—"আপনার এক জীবনীকার লিখেছেন, আপনি কালীভক্ত আর নিত্য পূজারী।"

"ঐ যা হোক করি"—কথা চাপা দিয়ে নাইডু বললেন। "কি জানো, আসল বস্তু হচ্ছে বিশ্বাস। আমেরিকার হোটেলে বসে খাচ্ছি। হোটেলওয়ালী পাশে বসে। বয়স হয়েছে। হাতে একটা মোটা-ধরনের বই। কৌতূহল হল, জিজ্ঞাসা করে জানলাম—Faith-এর উপর লেখা। বৃদ্ধার বুকে ক্যানসার হয়েছিল। গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করত, আর বিশ্বাস করত, তাতেই সেরে যাবে। সত্যি সেরে গেল। একথা কি তোমরা বিশ্বাস করবে?"

নাইডু পরিপূর্ণ দুই চোখ মেলে তাকালেন। বিশ্বাস করি আর নাই করি, সেই গভীর জিজ্ঞাসার উত্তর নয় অহঙ্কৃত অস্বীকার। তাঁর জিজ্ঞাসার অন্তর্নিহিত সমাধানকে সেই মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করবার শক্তি ছিল না।

নাইডু বলে চলেন—"অথচ ঐ বিশ্বাস আমাদের ধ্যানের শতাংশের একাংশও নয়। জানো আমাদের আধুনিকদের মনোভাব"—নাইডু একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েন—"আমি প্রতিদিন কালীপূজার পর রক্তচন্দনের ফোঁটা পরি। খেলতে নামবার সময়ও সে চিহ্ন থাকে। বিদেশীরা কৌতূহল প্রকাশ করে—Well C. K. what is it for? আমি গম্ভীরভাবে উত্তর দিই—It is something religious, don't mention it. তারা থেমে যায়।"

তাদের থামিয়ে দিয়েছেন নাইডু। এ নাইডুর উপর কথা চলে না। অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হয়ে পড়েন তিনি। সমস্ত মুখ থমথমে, রক্তময়। নীলশৈলে

আগ্নেয় আভা। দুই চোখ বিস্ফারিত করে উত্তেজনাকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেন। একটা যন্ত্রণাদায়ক নীরবতা নেমে আসে। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলতে শুরু করেন—"আর আমার ভারতীয় বন্ধুরা দয়া করে বলেন—ওটা সি কে'র Superstition", এবার ঠোঁট বাঁকে তাঁর, ঘৃণা আর ব্যঙ্গে চোখ কুঁচকে আসে, নাকের রন্ধ্র স্ফুরিত হয়, তীক্ষ্ন শীতল ধারালো কণ্ঠে কয়েকবার উচ্চারণ করেন—"Superstition ! Superstition !"

যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে। ঘণ্টা-দেড়েকের মতো কেটেছে। পুজোর পর অভুক্ত একষট্টি বছরের মানুষটিকে বসিয়ে রেখেছি। উঁকি-ঝুঁকি হয়েছে কয়েকবার ভিতর থেকে। আমাদেরও ক্ষুধার তাগিদ নেই তা নয়। উঠে পড়ি। নাইডুও উঠে পড়েন—"কিছু মনে কোরো না, অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল মনের মতো বিষয় পেয়েছি বলে। ক্রিকেটের কথা হল না—I have played my game all through life, that is all."

রাস্তায় বেরিয়ে আসি। সমস্ত মন ভরে আছে। খেলোয়াড় হয়েও খেলা শেষে শ্রীযুক্ত কট্টারি কনকাইয়া নাইডু অবশিষ্ট আছেন। খেলার জগতে একটি মাত্র ঋতু—বসন্ত। জীবনে কিন্তু অনেক ঋতু, তার একটির নাম হেমন্ত।

হৈমন্তী মধ্যাহ্নে বাসার পথে পা বাড়ালাম।

"And I'll lie down and
dream of the King of Games
until the morning light."

শয়নসুখে এলিয়ে পড়ে
স্মরণসুখে ভোর,
'খেলার রাজা' স্বপ্নে নামে
ঘনিয়ে আসে ভোর।


নট আউট

উৎসর্গ

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

সেদিনকার কথা নিশ্চয় আপনার মনে নেই, থাকার কথাও নয়, কিন্তু আমার আছে। ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসের কুড়ি তারিখ হবে। হয়তো উনিশ, একুশও হতে পারে। কিন্তু সময়টা ঠিক মনে আছে—সন্ধ্যাবেলা সাড়ে ছ'টা-সাতটা। বছরখানেক ধরে আনন্দবাজারে আমার যাতায়াত। শ্রীযুক্ত মুকুল দত্তের সঙ্গে একটু বেশি পরিচয়। বাঙালী ও ভারতীয় ক্রিকেটারদের কতকগুলি চরিত-চিত্র আনন্দবাজারে ছাপানোর উনিই নিমিত্ত হয়েছিলেন। আপনার নাকি লেখাগুলো ভাল লেগেছিল, মুকুলদা জানিয়েছিলেন। নচেৎ অজ্ঞাত লেখকের বড়ো আকারের অতগুলি রচনা আনন্দবাজারের পাতাজোড়া করে দীর্ঘদিন প্রকাশিত হতে পারত না। আনন্দবাজারে যখন গেছি, মাঝে-মাঝে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও অল্পবিস্তর কথাবার্তা হয়েছে। অপরাজেয় আপনার সৌজন্য—আপনি লেখাগুলি সম্বন্ধে বহু মিষ্টকথা আমাকে বলেছেন। বলছি না কথাগুলো বানিয়ে বলেছিলেন, তবু...তখন অন্তত এটুকু বুঝবার বুদ্ধি আমার ছিল—আপনি নতুন পথের একজন লেখককে প্রয়োজনীয় প্রশংসার প্রোটেকশন দিচ্ছেন।

১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসের যে-সন্ধ্যার কথা বলছিলাম—সেই সন্ধ্যাতে এবং তার আশপাশের কয়েকটি সন্ধ্যা ও সকালে কলকাতা শহরের মুখে দুটি মাত্র উচ্চার্য শব্দ ছিল—ক্রিকেট ও টিকেট। অস্ট্রেলিয়া এসেছে ভারতসফরে গোটা টেস্ট দল নিয়ে বেনোডের অধিনায়কত্বে। অস্ট্রেলিয়া টেস্টে ভারতকে হারিয়েছে দিল্লীতে ও মাদ্রাজে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে, কিন্তু আশ্চর্য আছে তার পরাজয়ে কানপুরে। ভারতের কাছে সেই তার প্রথম পরাজয়। ফলে দারুণ উদ্দীপনা চারিদিকে। জাতীয়-তার কটাহে ক্রিকেট জ্বাল হয়ে এমন প্রগাঢ় পানীয়ে পরিণত যে, চুমুক দিতে পাগল সবাই। কলকাতা শহর একটি টিকেটের জন্য বেঁচে আছে, বা মরতে প্রস্তুত। আমারও একটি টিকেট পেতে ইচ্ছে। কিন্তু পাব কি করে, কে দেবে? যিনি দিতেন, তিনিও হেরে গেছেন দেশজোড়া উৎসাহের কাছে। তখন ভাবলুম, একমাত্র ভরসা মুকুল দত্ত। মুকুলদা জার্নালিস্ট, আমার কল্পনায় সাংবাদিকরা পৃথিবীর যাবতীয় ঘাটির ঘাটিয়াল, সুতরাং মুকুলদা ইচ্ছা করলে কী না করতে পারেন—বড় আশায় ভেবেছি।

আনন্দবাজারে হাজির হয়ে খেলার টেবিলে গুটি-গুটি বসেছি। হাস্য ও কুশল বিনিময় হয়েছে।

'কি খবর?'

'না, তেমন কিছু নয়, এই এলুম।'

'ওঃ! বসুন, চা খাবেন?'

আমার আবির্ভাব সম্বন্ধে মুকুল দত্তের, যাঁকে বড়ো আবেগে মুকুলদা কই, ঔৎসুক্যের অভাব আমাকে আহত করল। 'তেমন কোনো দরকারে আসিনি'—এতো আমার মুখের কথা—ভদ্রলোক কি বুঝছেন না? তিনি কি আমার সম্বন্ধে এটুকুও জেনে নিতে পারেন নি যে, আমার পরিচয়ের পরিধি সীমাবদ্ধ, অথচ আমার এক-খানা টিকেট দরকার!

বসে-বসে চা খাচ্ছি, অত্যন্ত ধীরে, যাতে অবিলম্বে উঠে যাওয়ার সভ্যতা না দেখাতে হয়, আর শুনছি টেলিফোনের অব্যাহত ঝঙ্কার। সে ঝঙ্কার দত্তমহাশয়ের কর্ণে মধুবর্ষণ করছিল না, তা তাঁর ক্লান্ত মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। টেলিফোনের অপরপ্রান্তে একটিই প্রশ্ন, প্রার্থনা, বা দাবি—'টিকেট'—এ প্রান্তের একটিই উত্তর—'দুঃখিত, অপারগ।' ভাবে-গতিকে বুঝলাম, উল্টোপ্রান্তে অনেক সময়ই রীতিমত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পর্যন্ত দত্তমহাশয়ের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কল্যাণ-বিষয়ে জিজ্ঞাসু—অথচ সেই 'বড়র পিরীতি'তেও ইনি 'ক্ষণেকে চাঁদ' দেখছেন না!

এবার ওঠাই ভালো, আমি ভাবলুম। টিকেট কি সকলে পায়? সিট তো সংখ্যায় পঁয়ত্রিশ হাজার, টিকেট চায় বৃদ্ধ ঠাকুর্দা থেকে পুঁচকে নাতনি পর্যন্ত কলকাতার তাবৎ মনুষ্য। এই-যে মুকুল দত্তের বন্ধুগণ, মান্যগণ, সশরীরে এসে হাজির হচ্ছেন—এঁদেরও কি ইনি টিকেট দিতে পারছেন? আর টিকেট যদি নাই-বা পাই—রেডিও কি নেই? রেডিও-ড্রামা কি কম ইনটারেসটিং? 'রাজা কর্ণে দর্শন করেন'—আমি কানে ক্রিকেট দেখে রাজা হয়ে যাব—স্থির করলুম।

মুকুলদা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। বললেন, 'একটু বসুন, সন্তোষবাবুর কাছে একটা কাজ আছে, সেরে আসি।' বসেই রইলুম, কারণ ওঠায় বা বসায় কোনোটিতেই উৎসাহ নেই। বসে-বসে জোচ্চুরির মতলব মাথায় এল, একটা পরামর্শ দেওয়া যাবে ভদ্রলোককে। আনন্দবাজারে সিজন-টিকিটের ছবি ছাপা হয়েছে—একটু ভাল কাগজে যদি ঐ ছবিটি কিছু বেশি সংখ্যায় ছাপার ব্যবস্থা করেন...

মুকুলদা ফিরে এসে বললেন, 'সন্তোষবাবু আপনার খোঁজ করছিলেন।' হঠাৎ সন্তোষবাবুর ডাক? হাওড়ায় কি ইতিমধ্যে কোনো গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যে, একজন জেনুইন হাওড়াবাসীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার? কি জানি।

সন্তোষবাবু, আপনার সামনে চেয়ার টেনে বসলুম, স্পষ্ট মনে পড়ছে, তিন তলার উত্তরদিকের কোণে আপনি বসেন। মুকুল দত্ত বসলেন। আপনি একটা লেখার উপরে দ্রুত নির্দেশ লিখছিলেন, আমাদের আগমনে মুখ তুলে চেয়ে হাসলেন, তারপরে দুরূহ কৌশলে এক হাতে দেশলাই থেকে কাঠি বার করে, এক হাতেই তাকে জ্বালিয়ে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন—'টিকেট পেয়েছেন?'

অত্যন্ত ব্যথিত হলুম আপনার নিষ্ঠুরতায়। মুখে বললুম—'না'—মনে বললুম—'আমি আনন্দবাজারের বার্তা-সম্পাদক নই।'

তারপরে ভদ্রতা করে প্রতিপ্রশ্ন করলুম—'খেলা দেখতে যাচ্ছেন?'

'যদি আপনি না যেতে পারেন, তাহলে আমাদের কারো যাবার অধিকার নেই।'—এই বলে আপনি পুনশ্চ হাসলেন—এবং সে হাসির চেয়ে সুন্দর কিছু জীবনে দেখেছি কি না সন্দেহ।

বিশ্বাস করুন, আপনি সত্যই ঐ কথাটা বলেছিলেন। আরও বিশ্বাস করুন, আপনার সুস্মিত কৌতুক বুঝবার মতো রসবোধ সেই মুহূর্তেও আমার ছিল। তবু কী অসীম কৃতজ্ঞতাবোধ করেছিলুম! তাতে ডুবতে দিয়েছিলুম বাস্তববোধকে পর্যন্ত।

ঈষৎ গম্ভীর হয়ে আপনি বললেন—'একটা টিকেট আপনার জন্য জোগাড় করতে পারা যাবে মনে হয়...'

আমি একেবারে সমাচ্ছন্ন—কী শুনছি!

'কিন্তু—'

কী যন্ত্রণা! আবার কিন্তু—

'একটা উপকার করতে হবে—'

উপকার? মনে-মনে বললুম, ঠিক হ্যায়—তাতেও রাজি। যদি ইনি বলেন, বাজার করে দিন, তাতেও। এ পর্যন্ত ও-কাজটা উত্তমরূপে করে উঠতে না পারলেও করব এঁর জন্য, কিংবা, মর্মে-মর্মে বুঝলাম, কোন্ তাগিদে লোকে নিজের বাড়ির পুকুরের ইলিশ জোগাড় করে শিয়ালদহের বাজার থেকে বড়বাবুর জন্য।

আপনি বললেন—'খেলা চলাকালে সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু-কিছু লিখতে হবে—'

আপনি জানেন না সন্তোষবাবু, মুকুলদাও নন, বিনা স্মেলিং-সল্টে সেদিন সেই-সময় কী প্রচন্ড চেষ্টায় মূর্ছা সামলেছিলুম! মাথাটা ঝাঁ করে উঠেছিল। বুভুক্ষুর কাছে রসগোল্লাকে ঢিলি করে কেউ ছোঁড়ে?—তাও একটি নয়, একাধিক! শুধু টিকেটে নয়, সেই সঙ্গে খেলা সম্বন্ধে লেখার আমন্ত্রণ—শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রে—যেখানে দেশবিখ্যাত সমালোচকেরা লেখেন—যার নাম ক্রিকেট-রিভিউ!—যেসব লেখা আমরা গোগ্রাসে গিলি সকালে, তারপরে সারাদিন করি রোমন্থন বা বমন—কী বলছেন ইনি?

তারপরেই কিন্তু শিউরে উঠলুম।

আপনি সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলেন—'কী হল?'

ব্যাপারটার গোটা তাৎপর্য তখন এক ঝলকে পরিষ্কার হয়ে গেছে।—নাঃ—অসম্ভব!

অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব—ইম্পসিবল্। যে-আমি নিজের ঘরে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পেটে বালিশ গুঁজে, ভাববিকাশ করে থাকি মাত্র প্রেরণার উদয়ে—যে-আমি একটা কথা পাঁচবার কাটি, প্রত্যেক মুহূর্তে অসন্তুষ্ট হই নিজের উপরে, একটা লেখা তৈরী করতে যার জীবনবৃক্ষে বয়সের কুড়ুল পড়ে—সেই আমি সারাদিনের পরে, খেলার শেষে বাড়ি না গিয়ে খবরের কাগজের অফিসে বসে, আর পাঁচজনের সঙ্গে এক টেবিলে ঝুঁকে পড়ে, লিখে যাব চারিদিকে টাইপরাইটারের খট্‌খট ও মনুষ্যকণ্ঠের কলকলের মধ্যে? যে-কোনো জিনিসেরই একটা সীমা আছে.-

মুখভাব থেকে নিশ্চয় মনোভাব বুঝলেন আপনি—'ভয় পাবেন না, অল্প অভ্যাসেই ঠিক হয়ে যাবে—'

'ভয় পাবো না? কী বলছেন? জানেন এক্ষেত্রে আমার প্রতিদিনের জীবন কখন শুরু ও কখন শেষ হবে?'

'?'—

'খেলা শুরু দশটায়। থাকি হাওড়ায়। সেখান থেকে মাঠে আসতে লাগে সওয়া এক ঘণ্টা। তার মানে ন'টার আগে যাত্রা। তৈরী হতে হবে অন্তত আটটা থেকে। মাঠে এসে সারাদিন খেলা দেখব, আসলে খেলা দেখা মাথায় উঠবে, সারাদিন নোট করতে হবে আর অস্থির হতে হবে ভাবনায়—উপন্যাস পড়ে পরীক্ষা দেওয়ার মতো, রস আর সেখানে রস নয়, কষ। শুধু চোখ মেলে দেখে, টিফিন-বাক্স খুলে খেয়ে ও মুখ ছুটিয়ে গাল বা গল্প করে যেখানে খেলার শেষে অবসাদে ভরে থাকে দেহমন, সেখানে মাঠে সমস্তক্ষণ ঘাড় গুঁজে লেখার পরে গা-হাত-পায়ে ব্যথা নিয়ে হাজির হতে হবে পত্রিকা-অফিসে—তারপরে বিনা বিশ্রামে আরও ঘণ্টাকয়েক ধরে জনতোষণী রচনানির্মাণ—তারপরে বাড়ি ফিরব বাস-ট্রাম ঠেঙিয়ে রাত সাড়ে দশটা-এগারোটায়—শীতের রাত—খেয়ে উঠব বারটা নাগাদ—তারপরে বিছানায় লম্বমান হব পরদিবসের জন্য একই প্রকার পরিকল্পনা বালিশের তলায় নিয়ে—!!! কী বলছেন আপনি?'

—আমি কঁকিয়ে উঠি।

অসহ্য মিষ্ট এক ধরনের মৃদু-মৃদু হাসি নিয়ে আপনি তাকিয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত ভূপেশ মজুমদার মহাশয়ও সেখানে হাজির হয়ে চেয়ারে বসেছেন। তাঁর মুখেও একই ধরনের হাসি। কী অসহ্য হাসির উৎপীড়ন!

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—'আপনি যা করতে বলছেন, সে জাতীয় কাজ পূর্বে দু'একবার করিনি তা নয়, কিন্তু সে কখনোই চার ঘণ্টার বেশি সময়ের জন্য নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন ঘণ্টা। হাঁ—পরীক্ষা আমি দিয়েছি, পরীক্ষা-হলের পরিবেশও অনুরূপ, কিন্তু সেখানে পরীক্ষক-সংখ্যা মাত্র কয়েকজন, পরীক্ষার খাতাও অন্য কাউকে দেখানো হয় না, শুধু রেজাল্ট বেরোবার দিনই কিছু ভয়-ভবনা—আর এখানে! লক্ষ-লক্ষ পাঠক পরীক্ষক, রচনাপত্র মোটেই গোপন ব্যাপার নয়, সর্বাধিক বিক্রীত পত্রিকার পৃষ্ঠায় একেবারে খোলা চিঠি।—বাপ্‌রে!'

আপনাদের মুখের হাসি ও চোখের তাগিদ তখনো অব্যাহত—উদ্যত। আমি মরীয়া হয়ে রসিকতার চেষ্টা করি—'জানেন, আপনাদের সাংবাদিক-গোষ্ঠীর একজন আমাকে বলেছেন, আমরা লেখার সময়ে কখনো থামি না, পরবর্তী বাক্যটি উত্তম হবে এই ভরসায় বর্তমান বাক্যটি প্রায় বিনা চিন্তায় দ্রুত লিখে ফেলি—'

'তাইতো বলছি, আপনিও তাই করে ফেলবেন—'

'সেইটি পারব না বলেই তো ভয় পাচ্ছি—লেখা একটা কারুকর্ম—'

'কারুকর্ম, চারুকর্ম—কাজকর্মও বটে। আপনি কাজকর্ম মনে লিখবেন আর...'

আমি সন্দেহে সংশয়ে তাকিয়ে থাকি। আপনার কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস ফুটল—

'দেখুন, আমাদের কাগজের নিশ্চয় একটা প্রেসটিজ আছে। লেখা খারাপ হলে ছাপব কেন? আপনার উপর আস্থা আছে বলেই অনুরোধ করছি—এর পরে আপনার সঙ্গে একেবারে লেখা নিয়ে আলোচনা হবে—'

সুন্দরভাবে কথায় অবসান ঘটিয়ে আপনি জমে-ওঠা কাজে চোখ নামালেন।

ক্রিকেটের দৈনন্দিন বিবরণী রচনা সেই শুরু করেছিলাম। এখনো লিখে চলেছি...

সন্তোষবাবু, আমার এই ক্রিকেট-বইটি আপনাকে উৎসর্গ করছি ঋণশোধের জন্য নয়, ঋণস্বীকারের জন্য।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ শঙ্করীপ্রসাদ বসু

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রমথনাথ বিশী : কিছু কাহিনী বলেছেন ও ব্যবহারে অনুমতি দিয়েছেন।

শ্রীমতী লীলা মজুমদার, শ্রীপঙ্কজ রায় : স্মৃতিকথা বলেছেন।

শ্রীমুকুল দত্ত ; শ্রীমণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় : নানাবিধ পরামর্শ দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন।

পাখীটা নড়েচড়ে জেগে উঠল। তারপর পাখা ঝাপটাতে লাগল। তারপর কথা বলতে শুরু করল—একেবারে বাংলা ভাষায়! কী কাণ্ড! আমি চমকে উঠলুম। মরা পাখী আবার বাঁচে নাকি? কথা বলে নাকি? পাখীটা তো অনেকদিন আগে মরেছে। তবে যেহেতু সে 'ক্রিকেটের মক্কা' লর্ডসে খেলার সময়ে বলের ঘায়ে গত হয়েছে, তাই তাকে লর্ডসের লঙরুমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে প্রদর্শনীবস্তু-রূপে। সে কিভাবে বেঁচে উঠে বাংলায় কথা বলতে পারে? তাহলে নিশ্চয় ব্যাপারটা সত্য নয়, আমি স্থির করলুম, এটা স্বপ্ন। পাখীটা বোধহয় অন্তর্যামী (হতেই পারে; যে মরে বেঁচে ওঠে তার অসাধ্য কি!)—ফিক্ করে হেসে বলল—'ঠিক কথা, তুমি স্বপ্নই দেখছ...'

'বাঁচলুম।' আমি স্বপ্নেই আশ্বস্ত।

'তবে—'

'তবে আবার কি?'—প্রশ্ন করি।

'এটা সত্যও বটে'—পাখী বলল; 'আমি সত্যই মরেছিলুম, কিন্তু ক্রিকেটের হাতে মরেছিলুম বলে আমি একই সঙ্গে অমর।'

পাখীর কথায় আমি রীতিমত বিচলিত...স্বপ্ন...না সত্য...একি গণ্ডগোল...

স্বপ্ন নয়, সত্যই। বালীগঞ্জে ক্যালকাটা ক্রিকেট-ক্লাবের প্যাভিলিয়নের দোতলায় বসে আছি। মধ্যাহ্নপূর্ব হেমন্ত-দিবস। আতপ্ত মধুর। গুঁড়ো কুয়াশায় মাজা আচ্ছন্ন নীলাকাশ। সামনে ছড়িয়ে আছে গাছের পাড়বসানো উজ্জ্বল সবুজ কার্পেট। সুখাবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে আছি অলস চোখ মেলে।

অল্পকিছু আগে যখন প্যাভিলিয়নের দোতলায় উঠেছিলুম, সেখানে যিনি বসেছিলেন তিনি স্বপ্নালু চোখে অনুচ্চকণ্ঠে রাগসঙ্গীতের আলাপ করছিলেন। এই ব্যক্তি বাংলাদেশের ক্রীড়াপ্রিয় জনগণের কাছে গলার স্বরে ও লেখার অক্ষরে, উভয়ত পরিচিত। তাঁর মৃদুগম্ভীর কণ্ঠের সুরের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সুরের মধুর ঐক্য। শ্রীযুক্ত অজয় বসুর পাশে বসে বলেছিলুম, 'কি দুর্ভাগ্য শ্রোতৃবৃন্দের, আপনার মুখের সামনে এখন বেতারযন্ত্রটি বসানো নেই।' প্রসন্ন হাস্যে আমি অভ্যর্থিত হয়েছিলুম।

কিছু সময় কাটল। আরও অনেকে এলেন। টুকরো কথা, ভাঙা গল্প, ক্যালকাটা ক্লাব-কর্তৃপক্ষের স-খাদ্য আপ্যায়নে নিমগ্ন আছি, প্রকৃতির মায়া স্নানান্ত আর্দ্রতার মতো স্নিগ্ধ হয়ে জড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে, এমন সময়ে—আবার সেই 'একি কাণ্ড!'—

—ও কাহারা আসিতেছে? অশ্বশকটে উদ্যানমধ্যে কাহারা প্রবেশ করিতেছে? শকট একটি নহে, অনেকগুলি, ধীরে ধীরে উদ্যানে সত্যই প্রবেশ করিল। অতঃপর অত্যন্ত শ্লথগতিতে সবুজ মখমলের মতো তৃণাস্তীর্ণ মৃত্তিকার বুকে চক্ররেখা আঁকিয়া তাহারা প্যাভিলিয়নের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। শকটগুলি আরোহীপূর্ণ। মধ্যখানে শুধু অশ্বপৃষ্ঠে বীরত্বব্যঞ্জকভাবে একজন উপবিষ্ট। তাহার স্কন্ধে লগুড়?—নহে। বন্দুক?—নহে। উহা ব্যাট—মুদ্গরবৎ স্থাপিত। তাহার পরণে বহুবর্ণ পোষাক, গালে লম্বা জুলপি। শ্মশ্রুগুম্ফে মুখমণ্ডলের বহুলাংশ অবলুপ্ত। সূর্যালোকে দীপ্তগাত্র অশ্বপৃষ্ঠে আসীন

এই তরুণ যোদ্ধার নয়নযুগলে উৎসাহ জ্বলিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হইয়া প্যাভিলিয়নের সম্মুখে অশ্ব ও অশ্বশকটগুলির গতি রুদ্ধ হইল। সেখানে সমবেত শ্বেতগাত্র ললনাকুল ও পুরুষগণ বিচিত্র 'হুয়া হুয়া' ধ্বনিতে আরোহীদের সংবর্ধিত করিল। 'ইয়া ইয়া' ধ্বনিতে উত্তর দিয়া আরোহীরা একে-একে অবতরণ করিতে লাগিল। যৌবনের উত্তেজনায় প্রথমেই অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তরুণ যোদ্ধা 'লম্ফত্যাগ' করিয়া ভূমিতে পড়িল। ক্রমে শকটদ্বার খুলিয়া যাহারা অবতীর্ণ হইল, তাহাদের অধিকাংশই বয়োভারে ন্যুব্জ, সকলেই গুম্ফশ্মশ্রুতে সমাচ্ছন্ন, বিচিত্র বেশধারী ও ব্যাটাস্ত্রসম্বল। ইহারা কাহারা—

এঁরা ক্রিকেট-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের ভিতর থেকে নেমে এসেছেন—সানন্দ কৌতুকে ও কৌতূহলে আমরা লক্ষ্য করছি—শতাব্দীপূর্বের বেশবাসধারী মানুষগুলিকে। এঁদেরই ছবি ক্যালকাটা-ক্লাবের প্যাভিলিয়নে দেখেছি, বাঁধানো রয়েছে, তারিখ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। অথচ এখন বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৬৪।

ক্রিকেটের ঐতিহাসিক নাটকই আমরা দেখছিলাম। নাটকটি গতায়ু বালীগঞ্জ ক্রিকেট-ক্লাবের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে রচিত হয়েছে। প্রযোজনা করেছেন ক্যালকাটা ক্লাব। ক্যালকাটা ক্রিকেট-ক্লাব প্রাচীনতর। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে নাকি প্রতিষ্ঠিত হয়। দাবি করা হয়, বৃটিশসাম্রাজ্যের প্রথম ক্রিকেট ক্লাব এটি। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দীরও পরে ইংরেজদের আর একটি ক্রিকেট-ক্লাবের সূচনা হয় ১৮৬৪ সালে—বালীগঞ্জ ক্রিকেট-ক্লাব। এই দুই ক্লাবের সম্পর্ক কিন্তু বিরোধের। দুই ক্লাবে বিভক্ত হয়ে কলিকাতাবাসী সাহেবগণ ইয়র্কশায়ার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুখভোগ করতে চাইত। তাহলেও দুটোই জনবুলের ক্লাব। তাই যখন ভারত স্বাধীন হবার পরে কলকাতায় ইংরেজদের সংখ্যা ও প্রতাপ হ্রাসের জন্য বালীগঞ্জ ক্রিকেট-ক্লাবের দেহত্যাগের প্রয়োজন উপস্থিত হল, তখন ক্যালকাটা ক্রিকেট-ক্লাব কোল পেতে দিয়ে বলল, তুমি মরবে কেন, আমার মধ্য দিয়ে বাঁচো। বালীগঞ্জ ক্রিকেট-ক্লাব ক্যালকাটা-ক্লাবের কোলে মাথা দিয়েই মরল। ভালো ভাষায়, বালীগঞ্জ অন্তর্নির্বিষ্ট হয়ে গেল ক্যালকাটার মধ্যে। তরুণ ভ্রাতার অকাল বিয়োগে প্রবীণ ভ্রাতার কিছু সম্পত্তিগত সুবিধাও হল—ক্যালকাটা ক্লাব উঠে এল বালীগঞ্জের জমিতে, কারণ ইতিমধ্যে ইডেন-গার্ডেনের স্বত্বাধিকার ক্যালকাটা ছেড়ে দিয়েছে এন-সি-সি-র কাছে।

ক্যালক্যাটা ক্রিকেট-ক্লাব ঔদার্যের সঙ্গে বিগত ভ্রাতার শততম জন্মবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ করেছে। সেই উপলক্ষে আয়োজিত ক্রিকেট খেলা দেখতে আমরা উপস্থিত।

শতবার্ষিকী উৎসবের ক্রিকেট সঙ্গতভাবেই ফিরে যেতে চাইল শতবর্ষপূর্বে। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে যেভাবে ক্রিকেট খেলা হত—তেমনভাবেই খেলতে হবে। সেই-ভাবেই মাঠে প্রবেশ—অশ্বযানে ও অশ্বপৃষ্ঠে। সেই যুগের পোষাক পরিধান। সেই যুগের ক্রীড়ারীতি। ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ের মতোই ঐতিহাসিক ক্রিকেটের অভিনয় পুরাতনী সজ্জায়।

সাড়ে দশটায় মাঠে প্রবেশ। তারপরে টস করতে মাঠে গমন অধিনায়কদের। মাঠে স্টাম্প সংখ্যায় তিনটির বদলে দুটি, উচ্চতাও এখনকার তুলনায় খাটো।

দুটি স্টাম্পের মাথায় একটি মাত্র বেল, কালো রঙে বার্নিশ করা। স্টাম্প দুটির মধ্যে অনেকখানি ফাঁক, যাতে ক্রিকেট-বল তো নিশ্চয়ই, ফুটবলও গলে যেতে পারবে। অধিনায়কেরা টস করে ফিরে গেলেন—ব্যাটসম্যান প্রবেশ করল ব্যাট হাতে। কিন্তু একজন ব্যাটসম্যান কেন? তবে কি একজন ব্যাটসম্যান খেলত তখন একদিক থেকে, যেমন আমরা গলি-ক্লাবে খেলে থাকি? উঁহু, তা নয়—উনি আম্পায়ার, তবে বীরযুগের আম্পায়ার বলে এখনকার পাদরীদের মতো নিরস্ত্র নন—তাঁর হাত থেকে ব্যাটের মুগুর কেড়ে নেওয়া হয়নি। অতঃপর ফিল্ডসম্যান ও ব্যাটসম্যানদের প্রবেশ। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা গেল, তাঁরা সংখ্যায় দু' একজন বেশি এখনকার হিসেবে। ফিল্ডসম্যান অন্ততপক্ষে তের। এই সংখ্যাবৃদ্ধি পুরনো রীতির কারণে, না সকলকে চান্স দেবার জন্য ঘটেছে, কারণটা অস্পষ্ট রইল। ফিল্ডারদের পোষাকের বড়ই বাহার। কমপক্ষে ছ' রকমের টুপি পরেছেন তাঁরা। থ্যাবড়া, চওড়া, চৌকো, লম্বা, গোল—কত রকম। 'উঁচু শোলার হ্যাট, স্ট্র-হ্যাট, ক্রিকেট-ক্যাপ, মাঙ্কি-ক্যাপ, রাশিয়ান বালাক্লাভা'—আর পারছি না, বলে নামকরণে ক্ষান্তি দিলেন জনৈক বিলেত-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। জামার রঙে একই প্রকার বর্ণসমাবেশ। গলায় সকলের টাই। কোমরে লাল নীল রুমাল বাঁধা (বোতামের উপর আস্থা নেই!)। পায়ে সাধারণ 'সু' জুতো। ধরে নেওয়া গেল শতবর্ষপূর্বে এইরকম সাজেই ক্রিকেট খেলা হত। কিন্তু জামা-টুপির যেখানে এত বাহার, সেখানে আধুনিক প্যান্ট কেন? তখন তো চুড়িদার প্যান্ট পরে লোকে ক্রিকেট খেলত, ছবিতে তো তাই দেখা গেছে।—আরে ও-রকম হয়। ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ের সময়ে দেখনি, মধ্যযুগের ইউরোপীয়ান নাইটের বর্ম পরে কর্ণার্জুনের কর্ণ নেমেছে মঞ্চে, এবং কৃষ্ণ সিগারেটের টিনের চাকতির মধ্যে আঙুল গলিয়ে চক্র ঘোরাচ্ছে। সেইজন্যই তো ব্যাট একালের। পুরনো মুগুর-ব্যাট কোথায় মিলবে!

'নিয়মের কথাই ধরুন'—ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞ বললেন—'এই যে চার বলের আন্ডারহ্যান্ড বোলিং হচ্ছে, কাঁধের উপর হাত তোলামাত্র নো-বল দিয়ে দেওয়া হচ্ছে—একশো বছর আগে ও-নিষেধাজ্ঞা কিন্তু ছিল না। ১৮৬৪ সালের জুন মাসেই রাউন্ডহ্যান্ড বোলিং বিধিসম্মত হয়ে গিয়েছিল।'

ইনি আমাদের এডগার উইলসেরের কথা মনে পড়িয়ে দিলেন। ১৮৬২ সালে সারের হয়ে খেলতে নেমে ইনি যেই রাউন্ডআর্ম বোলিং শুরু করলেন, অমনি আম্পায়ার তাঁকে নো-বল ডাকলেন। আর তাতে ক্ষেপে গেলেন উইলসের। তৎক্ষণাৎ খেলা ছেড়ে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে উধাও। তাঁর রোষের অশ্বশক্তিই নাকি রাউন্ডআর্ম বোলিং স্বীকৃতির পথ উন্মুক্ত করেছিল।

ইতিহাসের এত ফুটনোটের মধ্যে প্রবেশ করার ইচ্ছা আমাদের তখন ছিল না। আমরা ডুবে ছিলুম অভিনয়ে, খুশি ছিলুম সেই যুগের কল্পনায়, যখন আন্ডারহ্যান্ডই একমাত্র বোলিং ছিল। আন্ডারহ্যান্ড বোলিং যখন করা হতে লাগল, তখন আমাদের মনে পড়ল শৈশবের ক্রিকেটের কথা, যখন আমাদের কাছে আন্ডারহ্যান্ডই একমাত্র বোলিং-পদ্ধতি। আজ বড়দের খেলাতেও আন্ডার-হ্যান্ড বল, কারণ ক্রিকেটের বাল্যলীলা আমরা দর্শন করছি। কত রঙ্গই হল মাঠে। বল মারতে গিয়ে ডিগবাজি, উৎপাটিত ব্যক্তিকে জড়িয়ে ধরে উর্ধ্বে

উত্তোলন, বোলার আউট দাবি করলে ব্যাটসম্যানের ব্যাট উঁচিয়ে তেড়ে যাওয়া, এমনকি আম্পায়ারকে পর্যন্ত মুষ্টিযোগে শাসিয়ে দেওয়া, ক্যাচ ধরতে টুপি উলটে পাতা, বল পকেটে পুরে সরে পড়া, সর্ট রানের দৌড়ে দুই ব্যাটসম্যানের গুঁতোগুঁতি করে মাঠে চিত হয়ে পড়া, চিত হওয়া ব্যক্তিকে মুখে জলদান করা—কত কি! সে জল তরল বটে, অনলও বটে। ঐ বিশেষ জলের প্রতি সবিশেষ আসক্তি খেলোয়াড়দের। খেলায় একটা-কিছু কাণ্ড হলেই খেলোয়াড়-ভিখারী হ্যাট উল্টে ভিক্ষা মাগতে লাগলেন—একবার পেলেন ব্রাউন রঙের বৃহৎ বোতল, তার স্বত্বাধিকার নিয়ে ভিখারীর সঙ্গে অধিনায়কের সংঘর্ষ হয়ে গেল। লম্বা দাড়িওয়ালা এক ইচ্ছা-খোঁড়া বৃদ্ধ—যাঁর দাড়ি এক সাহেবকে স্মরণ করালো রিপভ্যান উইঙ্কলকে, আমার মনে পড়িয়ে দিল যাত্রার নারদকে—সর্বাধিক হাসির আয়োজন করেছিলেন মাঠে। তাঁর খঞ্জত্ব ছিল হাসির—ক্যুয়োভেডিসের ভিখারীর খঞ্জত্বের মতো তা ভুলে যখন তিনি সোজা হয়ে দৌড়-চ্ছিলেন, তখন তা ছিল আরও হাসির। সকলের শুভেচ্ছায় তিনি হ্যাটট্রিক করলেন। তখন সকল ফিল্ডসম্যান এসে একে-একে তাঁর সঙ্গে বিজয়ার কোলা-কুলি করে গেল, আর তিনি বৃদ্ধ গৃহকর্তার মতো সকলের আলিঙ্গন আশী-র্বাদের সঙ্গে গ্রহণ করতে লাগলেন—উচ্চরোলে ডুবে গেল মাঠ।

কিন্তু খেলাটি কি সত্যই দেখছিলুম, আমরা যারা প্যাভিলিয়নের উপর-তলায় বসেছিলুম? এ তো খেলা নয়, ইতিহাসের সঙ্গে খেলা। এখানে ড্রেসিং-রুম গ্রীনরুমে রূপান্তরিত। সেখান থেকে 'Go as you like' প্রতিযোগিতায় ক্রিকেটারের সাজ পরে কয়েকজন বেরিয়েছে। যে-বৃদ্ধের পাকা দাড়ি ইংরেজকে স্মরণ করাল, রিপভ্যান উইঙ্কলকে, আমার মতো বাঙালীকে যাত্রার নারদ-বুড়োকে—সেই বৃদ্ধের দাড়ি বাঙালী-মনে আর একটি প্রায়-অপরিচিত ছবি জাগিয়ে তুলল। ও বৃদ্ধ আর কেউ নয়—ক্রীসমাস-বুড়ো, ও আমাদের জন্য উপহার এনেছে, আর সেগুলিকে লুকিয়ে রেখেছে—আমরা ইতিহাসের অঙ্কের শিশুর দল সেই উপহারগুলি সন্ধান করছি—যার মধ্যে আছে শুধু সুখ আর শুভেচ্ছা। তারই কামনায় আর কল্পনায় মগ্ন ছিলুম আমরা, ব্যাপৃত ছিলুম অতীত-রোমন্থনে। ক্রিকেটের একটি চোখ পিছন দিকে। যত সুদূর, তত সুন্দর, সেই অতীতের চোখে। আমাদের চারিপাশ দিয়ে ব্যস্ত শহর অটো-মোবাইল-ধারায় প্রবাহিত, তারই তটে সুখে ও সাধে সৃজন-করা একটি কল্পনা-দ্বীপ, আনন্দময় মিথ্যাও যেখানে লীলায় সুন্দর। তারই দিকে আমরা তাকিয়ে আছি—এই মধুর মিথ্যার দিকে—যার আয়ু উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে।

আমরা উঠে দাঁড়ালুম। খেলা শেষ। শেষ খেলোয়াড় আউট। কিন্তু সকলে কি আউট হয়েছে? না, একজন নটআউট—ক্রিকেটের নিয়মে—

তার নাম ক্রিকেট

খেলা-শেষে বাস ধরার জন্য যখন বালীগঞ্জ-মাঠের ধারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, তখন আমার সঙ্গে ছিলেন সর্বজনবন্ধু শ্রীযুক্ত কিষাণ দাশগুপ্ত। ইতস্তত কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময়ে বাতাসে একটা গাছের শুকনো পাতা ঘুরতে-ঘুরতে আমার গায়ে এসে পড়ল। প্রজাপতি গায়ে বসলে যেমন গত-যৌবন বিবাহেচ্ছুদের মনে শিহরণ জাগে, আমারও তেমনি রোমাঞ্চ জাগল ঐ পত্রস্পর্শে। রোমান্সের রেশ তখনো মন থেকে যায়নি। সযত্নে পাতাটি ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আমি বললুম—'দেখুন কিষাণবাবু, এটাকে আপনি সহজেই ইতিহাসকন্যার পত্রদূত বলতে পারেন। বহু খেলার বৃদ্ধ সাক্ষী গাছের জীর্ণ অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ে আমাদের কাছে এসে কিছু নিবেদন করতে চায়—'

শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাতেও না দমে বললুম—'বোধহয় বলতে চায় বালীগঞ্জ-ক্লাবের, তার খেলার, কলকাতার পুরনো ক্রিকেটের কিছু স্মৃতিকথা। কিষাণবাবু, আপনি এই পাতাটি যদি পড়েন—'

'মশায়, ঐ শুকনো পাতা পড়ার চেয়ে অনেক সহজে অনেক বেশি কথা জানতে পারবেন, যদি আপনার হাতের ঐ স্যুভেনিরখানি পড়েন, আর—'

কথা শেষ হবার আগেই একটা বাস এসে পড়ায়, আমার দিকে পুনশ্চ কুটিল নেত্রপাত করে ভদ্রলোক, অত্যন্ত গদ্য-স্বভাব ঐ ভদ্রলোক, লাফিয়ে বাসে উঠে পড়লেন।

ভদ্রলোক আমার মন এমন বিষিয়ে দিলেন যে, হৃদয়ের কাব্যলক্ষ্মী আধুনিক কবিতার ভাষায় গঞ্জনা দিয়ে অন্তর্হিতা হলেন। অগত্যা আমি হাতে-ধরা স্মারক গ্রন্থটিতে মনোযোগ দিতে বাধ্য হলুম।

না, কিষাণবাবু লোক তত মন্দ নন, স্মারকগ্রন্থটি শেষ করার পরে স্বীকার করতে হল। কলকাতার পুরনো ক্রিকেটের আকর্ষক তথ্য আছে তাতে, এবং কিছু উপাদেয় ঘটনা। হবসের কাহিনীটিই ধরা যাক। সামান্য ঘটনা, কিন্তু কি স্নিগ্ধ সকৌতুক।

জ্যাক হবস্, পূর্ণশক্তির কালে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যাটসম্যান—কলকাতায় খেলেছেন। একবার খেলার সময়ে তাঁর বিপক্ষে একটি বল এল মাটিতে দুবার ধাপ খেয়ে। বলটি এত মন্দ যে, হবসের সময়ের গণ্ডগোল হল এবং মিডঅফে সোজা ক্যাচ ধরে নিল ফিল্ডার।

ম্যাচ-শেষে বোলার হবসকে ধরে পড়লেন—'আপনাকে লিখে দিতে হবে।'

'কি লিখতে হবে?'

কাগজ কলম এগিয়ে দিয়ে বোলার বলল—'লিখে দিতে হবে যে, আমি আপনাকে আউট করেছি।'

হবস্ হেসে তাই লিখে দিলেন।

'উহুঁ, আর একটু লিখতে হবে—'

'কি লিখব?'

'লিখে দিন, বলটা খুব ভাল পড়েছিল।'

হবস্ আরও হাসলেন, এবং লিখে দিলেন!!

প্রতিভায় এবং ভদ্রতায় অদ্বিতীয় হবসের কাছ থেকে এই সার্টিফিকেট বিনি

আদায় করেছিলেন, তিনি মজা করার জন্যই করেছিলেন, চাকরির সুবিধের জন্য করেননি, এ আমরা ধরে নিতে পারি। তেমনি মজা অবিরত লেগেই থাকত খেলায়, কারণ 'ক্রিকেট ছিল স্ফূর্তির আর তামাশার খেলা।' দুজন কৌতুক-প্রবণ বালীগঞ্জী ক্রিকেটার একদা প্যাড, ব্যাট, গ্লাভস প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হয়ে ছবি তোলালেন স্কোরবোর্ড পাশে নিয়ে—বোর্ডে লেখা :

৫০১—এক উইকেটে
শ্রীযুক্ত ক—৩০০
শ্রীযুক্ত খ—২০১ নটআউট
[অতিরিক্ত—০]

সে বছর ক্রীসমাস কার্ডরূপে এই ছবিটি ওঁরা বন্ধুদের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

এই উইকেটে ৫০১ সত্য না হোক, একদিনে কিন্তু সত্যই ৬০৭ রান হয়েছিল বালীগঞ্জ-মাঠে। সেটা অনেকদিন আগেকার কথা, ১৯০৭-৮ মরশুমে। জি এইচ এস ফোকস্-একাদশ বালীগঞ্জে খেলতে এসে ৩০২ রান করল সকলে মিলে। তথাপি বালীগঞ্জ জিতল সেই ম্যাচে দু' উইকেটে, একদিনের ৫ ঘণ্টা মেয়াদের মধ্যেই।

বালীগঞ্জের পারিপার্শ্বিক বড় সুন্দর ছিল পুরনো দিনে। সে পরিবেশ এখনো সম্পূর্ণ বদলায়নি। বর্তমান প্যাভিলিয়নের বয়স বেশি নয়। এই ইট-সিমেন্টের প্যাভিলিয়নের চেয়ে অনেক বিখ্যাত বালীগঞ্জের পর্ণ-প্যাভিলিয়ন। সেই কুটীরের সামনে টাঙানো হত রঙিন সামিয়ানা—আর পিছনে ছিল একটি বৃহৎ পুকুর। পুকুরটির জলে কত যে বল সিন্ধ হয়েছে তার সীমা নেই। পুকুর হয়ত শেষপর্যন্ত বল পড়ে পড়েই বুজে যেত, যদি-না কর্তৃপক্ষ হঠাৎ আবিষ্কার করতেন, বলে বোজানোর চেয়ে মাটিতে পুকুর বোজানো কম ব্যয়-সাধ্য।

বল কি শুধু পুকুরে পড়ত? একদা একটি বল মাঠ থেকে রাস্তার দিকে উড়ে গেল। গিয়ে পড়ল একটি ঠিকা-গাড়ির উপরে। কোচম্যান ঢুলতে-ঢুলতে গাড়ি চালাচ্ছিল (মনে রাখা ভাল, সেটা এই মোটর-থিক্‌থিকে যুগ নয়), সে জানতেও পারল না ব্যাপারটা। সাহেবরা কি করে, বলটা উদ্ধারের জন্য মাঠের বাইরের ছাওয়ালদের রিকোয়েস্ট করল। তারা হৈ-হৈ করে ছুটল গাড়ির পিছনে—বলটি উদ্ধার করে আনার পরে তারা সাহেবলোগের কাছে এক টাকা বকশিস নিয়ে তবে ছাড়ল।

এদেশে সাহেবদের তখন যে প্রেস্টিজ, তাতে সত্যই একটা বলের জন্য ঘোড়ার গাড়ির পিছনে ছোটা যায় না। কিন্তু এমনও হয়েছে, ঘোড়ার গাড়ির ভিতরে বসেও যাওয়া যায় না, যদি-না সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী থাকে?

কারণ? আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে উনিশ শতকের চতুর্থ পাদে। ১৮৭৫, ২২শে ডিসেম্বর, বুধবারের স্টেটসম্যানে দেখা যাচ্ছে—বালীগঞ্জ ও ক্যালকাটা ক্রিকেট-ক্লাবের মধ্যে একটি ম্যাচ বরবাদ হয়ে গেছে বালীগঞ্জ-দল হাজির হতে না পারার জন্য। আসতে পারেনি—বাঘের ভয়ে। অ্যাঁ?—হাঁ। সশস্ত্র রক্ষীদল এসে না পড়ায় বালীগঞ্জের পক্ষে ইডেন-উদ্যানে হাজির হওয়া সম্ভব হয়নি। সাহেবরা ভারতবর্ষে যে-কয়েকটি জিনিসকে ভয় করত, তার মধ্যে একটি বাঘ।

বাকিগুলি, সাপ, সান্নিপাতিক জ্বর, জলবসন্ত ও বিপ্লবী।

বালীগঞ্জের একজন হোমরাচোমরা ক্রিকেটার মেদিনীপুরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যাবার পরে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। ঘটনাটির উল্লেখ পাচ্ছি এই স্মারকগ্রন্থে। এই স্মারকনির্ঘটি না দিলেই বোধহয় ভাল হত। যে-সাহেবেরা ক্রিকেট খেলত, মাঠের বাইরে তারা যে ক্রিকেট খেলত না, দুঃখের সঙ্গে তা লেখা আছে ভারতের ইতিহাসে। আমরা সেসব ঘটনা ভুলতে চাই। তাঁদের খেলাটুকু শুধু মনে রাখতে চাই। স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেন নি, হত্যাকারী যখন তার শিশুপুত্রকে চুম্বন করে, সে তখন ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নয়? সুতরাং বালীগঞ্জ ও ক্যালকাটা—এই দুই সাহেব-দলে মধুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথায় চলে আসা যাক।

'গ্রেট রাইভ্যালরি'—এই দুটি দলের মধ্যে ছিল। এক্ষেত্রে দুই গোলাপের যুদ্ধের নকল করে ইংরেজরা খুশি হত। টি সি লঙফিল্ড, যিনি বাংলার ক্রিকেট-অধিনায়ক ছিলেন এবং দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন স্থানীয় ক্রিকেটের সঙ্গে, তিনি ক্যালকাটা-বালীগঞ্জের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে কিছু উপাদেয় স্মৃতিকথা দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, লঙফিল্ড পূর্বে কেন্টের কাউন্টি-খেলোয়াড় ছিলেন। উত্তম অলরাউন্ডার। ক্রিকেটারের শ্বশুরও বটে। টেড ডেক্সটার তাঁর জামাতা। এহেন লঙফিল্ডের আত্মপ্রসঙ্গ কিছু শোনা যাক, কারণ তার মধ্যে তৎকালীন বঙ্গীয় ক্রিকেটের দু'-একটি সাহেবী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে:

"প্রথমদিকে আমি প্রধানত ওপেনিং ও স্টক-বোলার। সুতরাং প্রাণ যত চায় তত ক্রিকেট পেতুম ক্যালকাটার হয়ে খেলতে গিয়ে। স্থানীয় প্রতিনিধি-মূলক খেলাতে অংশগ্রহণের পক্ষেও আমি যোগ্য বিবেচিত হতুম। সেই খেলাগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'ভারতীয় স্কুল', 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুল' এবং 'বৃটিশ স্কুলে'র মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিযোগিতা। বৃটিশ স্কুলের পক্ষে খেলার সময়ে আমি বালীগঞ্জ ক্রিকেট-ক্লাবের অনেক সদস্যের সঙ্গে একত্র খেলার সুযোগ পেয়েছি, যাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন, প্রথমশ্রেণীর উইকেট-কীপার আলেক লেসলী।

আলেক বেডসার, আমি, বা আমাদের অনুরূপ বলের গতি যাঁদের, তাঁরা কখনই উইকেটকীপার দূরে দাঁড়ালে বল করতে পারেন না। আলেক লেসলীর মধ্যে আমি সর্বদা এগিয়ে দাঁড়াবার মতো একজন উইকেটকীপার পেয়েছিলুম, যাঁর নিকটবর্তী গ্লাভসে খপ্‌ করে বল ঢুকে যাওয়ার শব্দ আমার মনে সর্বাধিক উৎসাহ এনে দিত।"

বালীগঞ্জ ও ক্যালকাটার প্রতিদ্বন্দ্বিতার দু' একটি ঘটনা:

"বালীগঞ্জ ও ক্যালকাটার একটি খেলায় ক্যালকাটা অল্প সময়ের মধ্যে বিপাকে পড়ল—চারটে উইকেট পড়ে গেল কুড়ি রানের মধ্যে। দলকে টেনে তোলার দায়িত্ব যেন আমার ঘাড়ে এসে পড়ল, এবং সে দায়িত্ব আমি পালন করলুম ৮০ রান করে, যদিও তা করবার পূর্বে ফার্স্ট-স্লিপে আর একটি ক্যাচ ফেলে দেওয়া হয়; বোলার ছিলেন বালীগঞ্জের তৎকালীন ক্যাপ্টেন টম পার্কার। তিনি নিখুঁত, বিলম্বিত আউট-সুইঙ্গার দিতে পারতেন মাঝারি গতিতে। ক্যাচ ফেলেছিলেন আমার পুরনো কেম্ব্রিজের বন্ধু জর্জ ব্রাউন। জর্জ কেম্ব্রি-

জের পক্ষে এবং পরে জে ডগলাসের নেতৃত্বে এসেক্সের পক্ষে, যথেষ্ট পরিমাণে ক্রিকেট খেলেছিলেন। ঐ কাউন্টি দলে পেরিন তখনো খেলতে থাকা সত্ত্বেও তারা জর্জকে বাদ দেবার কথা ভাবেনি ; বাঁ হাতের উত্তম স্লো-বোলার জর্জ একবার উরস্টার্সশায়ারকে একদিনে দুবার আউট করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। যাই হোক, জর্জ এই-যে মহামূল্যবান ক্যাচটি ছেড়েছিলেন, তা নিতান্ত সহজ ক্যাচ ছিল। অতঃপর স্লিপে, উইকেটকীপারের কাছ থেকে তো নিশ্চয়ই, যে-গজ্‌গজানি শোনা যেতে লাগল, তা আমার কাছে একটু বেশি দীর্ঘস্থায়ী মনে হল; সে গজ্‌গজানি অবশ্য প্রধানত ব্রাউন-বিরোধী। তা হলেও ঐ সকল ভদ্র-মহোদয়গণ আমি যে কত সৌভাগ্যবান তা পুনঃপুনঃ অবহিত করাতে বিস্মৃত হয়নি। অবশেষে যখন ব্যাপারটা আমার মনঃসংযোগ নষ্ট করতে উপক্রম করল, তখন আমি ওভারের মাঝখানে (জর্জ ব্রাউন বল করছিলেন) খেলা থামিয়ে দিয়ে টম পার্কারের কাছে হাজির হয়ে বললুম, 'আপনারা অনুগ্রহ করে কি সংলাপের বিষয়-পরিবর্তন করবেন? আমি জানি যে, আমার ভাগ্য উত্তম, আমি জানি, জর্জের আমাকে ধরা উচিত ছিল, এবং পারলে তিনি ধরতেনও, কিন্তু মিঃ পার্কার, আপনাকেও একটা কথা জানাতে পারি, জর্জ ব্রাউন বর্তমানে আপনার চেয়ে বড় ক্রিকেটার এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবেন। এবং আরও আপনাকে মনে করিয়ে দিই, এসেক্সের কাউন্টি-ক্রিকেটাররূপে জর্জের ইচ্ছে করে ক্যাচ ছাড়া অভ্যাস নেই।' আমি এর পর যখন জর্জের প্রান্তে গেলাম, তখন জর্জ, ব্যাপারটা কি, জিজ্ঞাসা করল। আমি ব্যাপারটা বললাম...। জর্জ বলল, তোমাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ, তুমি আমার ভাগ্য ঘুরিয়ে দিয়েছ—টম পার্কার, আমার বড়সাহেব, এবং আমি আগামী জানুয়ারিতে একটা লিফট্ আশা কর-ছিলাম !!...

"আর এক সময়ে, অনেক পরবর্তী সময়ে নিশ্চয়, যেহেতু আমি তখন ক্যাল-কাটা-দলের ক্যাপ্টেন ও সেইজন্য (!!) দলের এক নম্বর ব্যাটসম্যান—আমি ব্যাট করতে গিয়ে দেখি ডিকি ওয়েলার নতুন বল নাচাচ্ছেন। ডিকি নতুন বলের ভালো বোলার, কিন্তু ক্রিকেটের ব্যাপারে বুদ্ধিশুদ্ধি কম। একটা 'কৌসল' করতে ইচ্ছে হল, যদি লেগে যায়!—ডিকিকে বললুম, দেখ হে, স্টাম্প সোজা করে পোঁতা নেই। তখনকার দিনে মাথায় পেতলের ঢাকনি লাগানো স্টাম্প ব্যবহার করত বালীগঞ্জ। ডিকি বলল, ভেব না, এখনই সোজা করে পুঁতে দিচ্ছি। এই বলে সে বেলগুলো সরিয়ে নতুন বল দিয়ে স্টাম্পের মাথা সজোরে ঠুকতে লাগল। কি ঘটেছে তা যখন বিল স্কটের চোখে পড়ল, তখন তিনি অনেক কিছু বললেন, যা সুনিশ্চিতভাবে মুদ্রণযোগ্য নয়।

পাঠক নিশ্চয় বুঝেছেন, লঙফিল্ড কি 'কৌসল' করেছিলেন। নতুন বলের চক্‌চকানি গেলে ফাস্ট ও সুইংবোলিংয়ের প্রায় দফারফা। শূন্যে বাঁক ও গতি, দুয়েরই সহায়তা করে বলের বার্নিশ। ওপেনিং-ব্যাটসম্যান লঙফিল্ড ওপেনিং বোলার ডিকি ওয়েলারকে দিয়ে বলের বার্নিশ চটাবার ব্যবস্থা করে নিলেন নতুন বলে স্টাম্প ঠুকিয়ে।

সাধু কৌশল নয় নিশ্চয়। দোহাই, এর দ্বারা ক্রিকেট নষ্ট হল, এমন বলার মতো বেরসিকতা নিশ্চয় কেউ দেখাবেন না। আমরা খুশি যে, ক্রিকেটের পিতা-

মহ গ্রেট ডবলিউ জি গ্রেসের আনন্দপূর্ণ দুষ্টামীর কিছু উত্তরাধিকার লঙ-ফিল্ড পেয়েছিলেন। এবং লঙফিল্ডকে ধন্যবাদ আর একটি সংবাদের জন্য... রবীন্দ্রনাথ ক্রিকেট খেলতেন!!

আবার বুঝি বিতর্কে জড়িয়ে পড়লুম, কিংবা শ্রীযুক্ত লঙফিল্ড পড়লেন। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট নিয়ে কম রাগারাগি হয়নি সংবাদপত্রে!

ব্যাপারটা হল, লঙফিল্ড লিখেছেন, ইডেন-গার্ডেনে সমর্থকেরা রবীন্দ্রনাথ বলে ডাকত আর বি ল্যাগডেনকে। এ এল হোসী ছিলেন—আনন্দলাল, এবং তুলসীচাঁদ—টি সি লঙফিল্ড। তিনজনই প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটার। এক যুগে বাংলা-ক্রিকেটের তিন স্তম্ভ।

কিষাণ দাশগুপ্ত মহাশয় যে-স্মারকগ্রন্থটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন, তার মধ্যে একটি জায়গায় আমার চোখ আটকে গেল, এবং একটি চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে—বিশাল দাড়ি, বিশাল চেহারা, ক্রিকেটের আদি পিতা—বাংলাদেশে—

"১৯১৩ সালে 'বৃটিশ স্কুল' ও 'বেঙ্গলী স্কুলের' প্রথম খেলা হয় বালী-গঞ্জেই। দেড়দিনের খেলা। খেলাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় বাৎসরিক ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল পরে। বেঙ্গলী স্কুলের অধিনায়ক ছিলেন সারদারঞ্জন রায়, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ, যিনি বাংলা-ক্রিকেটের ডবলিউ জে গ্রেস—বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য বহু কিছু করেছেন।

"এই দুই 'স্কুলে'র মধ্যে প্রতিযোগিতার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে কয়েক বৎসর পরে 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুল'ও যোগদান করল, ফলে প্রতিযোগিতা ত্রিমুখী দাঁড়াল। খেলাগুলিতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এবং স্বদলের পক্ষে নির্বাচিত হওয়াটা গৌরবের বিষয় ছিল। এই খেলাগুলি কেবল খেলোয়াড়দের কাছেই নয়, দর্শকদের কাছেও ক্রিকেটের আনন্দ ও আকর্ষণবৃদ্ধির প্রভূত সহায়ক হয়েছিল।

সারদারঞ্জন রায়। ছেলেবয়সের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। পি চৌধুরী আমাদের বড় ঠকিয়েছিলেন।

যাঁরাই আমার প্রথম ক্রিকেট বই 'ইডেনে শীতের দুপুর' পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, পি চৌধুরী আমাদের কী ছিলেন! আমাদের সামনে সুস্থ জীবনের আদর্শ তিনি তুলে ধরেছিলেন, সুস্থ খেলার। ক্রিকেটের যা-কিছু ভালো তারই প্রতীক তিনি ছিলেন। তিনি আমাদের কিছু-কিছু ক্রিকেট-বই স্কুলে থাকতেই পড়তে দিতেন। বইগুলোর ভাষা ইংরেজী, ছবিতে ভর্তি, বড়ো অক্ষরে ছাপা। পি চৌধুরী নিশ্চয় আমাদের ক্রিকেটজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এই কাজ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আর একটি গূঢ় অভিপ্রায় ছিল, আজ আমি বুঝতে পারি—তিনি চেয়েছিলেন, আমরা কিছু ইংরেজীও যেন স্বাধীনভাবে পড়তে শিখি। ছেলেরা যেহেতু খেলা ভালবাসে, সুতরাং খেলার বই পড়তে চাইবেই, ইংরেজী ভাষাতে লেখা হলেও, ফলে ক্রিকেট ও ইংরেজী দুইই কিছু শিখে ফেলবে। 'শিশুকে ভালবেসে শিক্ষা দাও, শিক্ষাকে ভালবাসতে দাও তাকে'—এই শিশুশিক্ষা-প্রণালী চৌধুরীকে শিখতে হয়নি বই পড়ে বা টিচার্স ট্রেনিং-এর ক্লাস করে।

বলা বাহুল্য চৌধুরীর সমস্ত ইচ্ছা পূরণের অভিপ্রায় আমাদের ছিল না,

বিশেষত আমার। ইংরেজী ভাষা—বাপ্‌রে! 'বাপ্‌রে' বলতুম না? বলতুম—যা বলতুম, তা কিছুদিন আগেও ইংরেজী সাহিত্যে ড্যাস টেনে বোঝানো হত। শব্দটি অবশ্য বাংলায় অনেকখানি তীব্রতা হারিয়েছে। বলতুম—'ব্লাডি ইংরেজী।' এই 'ব্লাডি ইংরেজী'তে লেখা ক্রিকেট-বইয়ের অধিকাংশ অপঠিত থাকত সন্দেহ নেই। কিন্তু ছবিগুলো যত্ন করে দেখতুম, এবং ছবির তলায় কি লেখা আছে, সেটা পড়তে চেষ্টার অভাব ছিল না। ফলে দাড়িওয়ালা বুড়ো ডবলিউ জি গ্রেসের চেহারা খুবই পরিচিত ছিল।

একদিন বিকালে মাঠে খেলতে নামার আগে চৌধুরী আমাদের ডেকে বললেন, 'আজ একটা ধাঁধার উত্তর দিয়ে তবে খেলতে যাবি। যে ঠিক উত্তর দিতে পারবে, তাকে অ্যাংক্লেট প্রাইজ দেব।' আমরা কৌতূহলে ভেঙে পড়লুম—'কি ধাঁধা? কি ধাঁধা?' চৌধুরী একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে একটা ছবির তলায় হাত চাপা দিয়ে বললেন—'এই ছবিটা কার বলতে হবে। মুখে বোলো না, টুকরো কাগজে লিখে দাও।'

ছবিটা দেখে আমার স্ফূর্তির সীমা রইল না। কল্পনায় অ্যাংক্লেট আমার পায়ে উঠে গেল। কি রকম চার্জ করে ঝণ্টের পা ছরকুটে দেব তাও ঠিক করে ফেললুম। হতচ্ছাড়া সেদিন আমার অ্যাংক্লেটহীন পায়ের গাঁট ফুলিয়ে দিয়েছে।

'নাঃ—তোমরা কেউই পারনি'—চৌধুরী বললেন, সব কয়টা কাগজের টুকরো পড়ার পরে—'ছবিটা ডবলিউ জি গ্রেসের নয়—স্যারের। মানে প্রিন্সিপ্যাল সারদারঞ্জন রায়ের।'

'যাচচলে, কি করে হবে, তা কি করে হবে—' আমরা কলরব করে প্রতিবাদ করলুম—'আমরা যে ডবলিউ জি গ্রেসের ছবি খুব চিনি।'

'হতভাগারা আয়, দেখ'—বলে চৌধুরী আদর করে গোটা পাঁচ ছয় কানকে টেনে নিজের কাছে এনে ম্যাগাজিনের পাতা থেকে হাতটা সরিয়ে নিলেন। ঝুঁকে পড়েই আমরা আবার চেঁচালাম—'ঐ তো লেখা—ডবলিউ জি—'

চৌধুরী আমার কান ধরে বললেন—'লোকে বলে হস্তিমূর্খ! চোখ ছোট বলে হাতী লেখাপড়া করতে পারে না। তোদের তো বাবা ড্যাবডেবে চোখ—তোরা এত মূর্খ হলি কি করে? ভাল করে পড়ে দেখ।'

তখন আমরা দেখলুম, লেখা আছে—'ডবলিউ জি গ্রেস অব বেঙ্গল—সারদা-রঞ্জন রায়।'

সারদারঞ্জন রায় নামটি তখনি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল, এবং তাঁর ছবি। তার ফলে অতঃপর ডবলিউ জি গ্রেস কিংবা সারদারঞ্জন, কারোরই ছবিকে বিশ্বাস করিনি, যতক্ষণ না তলায় ছাপা নাম দেখেছি, দুজনের মুখের চেহারায় এত ঐক্য। সারদারঞ্জনের, ক্রিকেট এবং (সদর্থে) ক্রিকেট-বহির্ভূত জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা চৌধুরীর কাছে শুনেছিলুম, সেসব কথা প্রায় ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে 'স্যারে'র সম্বন্ধে চৌধুরীর বিপুল শ্রদ্ধার চেহারা। চৌধুরী বারবার বলতেন, স্যার অঙ্কে সংস্কৃতে বাঘা পণ্ডিত, তেমনি ক্রিকেটেও। সুতরাং চৌধুরীর 'স্যার' আমাদের কাছে ভীতি, সম্ভ্রম ও রহস্যের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। অঙ্ক ও সংস্কৃতের বাঘা পণ্ডিত যদি ভীতিযোগ্য মনুষ্য না হন—কে হবেন? রবীন্দ্রনাথের মতো আমিও অঙ্ক ভালবাসতুম না, সেই

আমার জীবনের গৌরব, এবং আইনস্টাইনের মতো আমিও সংস্কৃত জানতুম না, সেই আমার পরম মহিমা। অঙ্কের ভয়াবহতা 'মরমে মরমে' বুঝেছিলুম বিয়োগ শিক্ষার কালে, যখন আমার মস্তক থেকে কর্ণ-বিয়োগ করা ছাড়া বিয়োগ শেখানোর আর কোনো পথ ছিল না শিক্ষাদাতাদের। আর সংস্কৃত! কিছু-দিনের মধ্যেই আমাকে 'নর' শব্দের বদলে 'গাধা' শব্দের রূপ করতে বলা হয়েছিল উত্তম পুরুষে।

সারদারঞ্জন রায় অঙ্কের ও সংস্কৃতের বিশাল পণ্ডিত—নিশ্চয় তাহলে তৈমুরলঙ, নাদির শা জাতীয় কিছু, কিন্তু...কিন্তু...তিনি ক্রিকেটের বড় ওস্তাদ কি করে? অমন চমৎকার খাওয়া-দাওয়ার খেলা ক্রিকেট, গুণেনদা যাতে আমাকে নিয়ে যান। রহস্যময় চরিত্র বটে, হুম্—আমি স্থির করলুম। ক্রিকেটের মতো গোয়েন্দা কাহিনীরও আমি ভক্ত পাঠক।

চৌধুরী মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন, 'ক্রিকেট শুধু মজার খেলা নয়, ওর মধ্যে সায়েন্স আছে। আর্টস তো আছেই। অঙ্ক ও সংস্কৃতের পণ্ডিতের যোগ্য খেলা এটা। তবে কথাটা এখন বুঝবি না, পরে বুঝবি, শুধু মনে রাখিস।'

অনেক কথাই মনের তে-কাঠির মধ্য দিয়ে গলে গেছে, কিন্তু ঐ কথাটা সত্যই উইকেটে ধাক্কা দিয়েছিল। তাই যখন স্মারকগ্রন্থটিতে সারদারঞ্জন রায়ের নাম পড়লুম, তখন ভাবলুম, এবার তাঁর সম্বন্ধে আরও কিছু জেনে নেওয়া যাক। সুতরাং হাজির হলুম শ্রীমতী লীলা মজুমদারের বাড়িতে।

লীলা মজুমদার বাংলাসাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁর সহৃদয়তা, সুস্মিত কৌতুক, তাঁর দৃষ্টির কখনো সুদূর মধুরতা কখনো তীক্ষ্ম তির্যকতা—শিশু ও বয়স্ক উভয় সাহিত্যেই তাঁকে গণ্যনাম করে রেখেছে। আমার মতো অপরিচিত একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ নিতে পারে—হয় সাহিত্যসমস্যার আলোচনার জন্য, নয় এদেশে মহিলা সাহিত্যিকদের সংখ্যালঘুতার কারণ অনুসন্ধানের জন্য, কিংবা কোনো সাহিত্য সম্মেলনের সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করার অনুনয় করার জন্য। তাই বলে সাহিত্যিকার কাছে (যিনি আবার বঙ্গমহিলা) ক্রিকেট-সংবাদ প্রত্যাশা?

শ্রীমতী মজুমদার বললেন, 'মনে রাখবেন, আমরাই বাংলাদেশে বাঙালী-ঘরের প্রথম মহিলাদর্শক।

মনে-মনে বললুম, নিশ্চয়, লিখে রাখার মতো তথ্য, বাংলাদেশের প্রাক্তন ক্রিকেট-দর্শক সম্মেলন হলে, আপনিই মহিলাশাখার প্রথম সভানেত্রী। মুখে বললুম, 'সেকথা জানি, এবং সেইজন্যই আপনার কাছে এসেছি।'

সত্যই শ্রীমতী মজুমদারের একটি লেখা কোনো একটি পত্রিকায় আমি পড়েছিলুম, যাতে তিনি তাঁর পরিবারের ক্রিকেটপ্রীতির কথা লিখেছিলেন। তাতে কৈশোরকালে ইডেন-গার্ডেনে ক্রিকেট দেখতে যাওয়ার কথা ছিল, এবং তিনি যে সারদারঞ্জন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী, তাও লেখা ছিল। টেলিফোনে শ্রীমতী মজুমদারের কাছে তাঁর লেখাটির কোনো কপি বা কাটিংস আছে কিনা জানতে চাইলুম। স্বভাবতই নেই। আমার হতাশা বোধহয় ফোনেই বুঝতে পারলেন। বললেন, 'একদিন বিকালের দিকে আসুন, ঐসব গল্প শুনিয়ে দেব।'

'কিন্তু সে গল্প তো আমার ভাষায় লিখতে হবে'—আমি আপত্তির সুরে

তুলি। 'তাতে কি'—অন্য প্রান্তে বিস্ময়।

তাতে কি? ঠিক। তাতে কি, তা তো আপনার জানার কথা নয়। আপনারা লেখিকা, বিধিদত্ত অধিকারে ভূষিতা, আপনারা বুঝবেন কি করে আমাদের অসুবিধা? আপনার ঐ ভাষা কোথায় পাব, যা 'দিনে দুপুরে' নিঝুম রাত্রি ঘনিয়ে তোলে, যা লীলায়িত হয় 'লীলামুগয়া'র চকিত চিকণ লাবণ্যে!

সারদারঞ্জন রায়ের ভাইঝি, সুকুমার রায়ের বোন, সত্যজিত রায়ের পিসি, স্বয়ং লীলা মজুমদার—তাঁর সঙ্গে তাঁর চৌরঙ্গী রোডের বাসভবনে দেখা হতেই তিনি বললেন, 'আমি কার্ত্তিক-গণেশের দিদি, আমি ক্রিকেটবাড়ির মেয়ে।'

'বলাই বাহুল্য, তবু একটু পরিষ্কার করে বলুন।'

'আমার বড় জ্যাঠামশায়ের কথা তো জানেন—সারদারঞ্জন রায়, তিনিই বাঙালীর মাথায় ক্রিকেট ঢোকালেন বলতে গেলে। বড় জ্যাঠামশায় নিজে বড় খেলোয়াড় ছিলেন। মেজ জ্যাঠামশায় তা ছিলেন না, কিন্তু ক্রিকেট বড় ভালবাসতেন—'

'মেজ জ্যাঠামশায়, অর্থাৎ—'

'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। নামটা নিশ্চয় পরিচিত। তিনি খেলোয়াড় না হয়েও ক্রিকেটরসিক ; আর ছোট জ্যাঠামশায় কুলদারঞ্জন রায়—'

কু-ল-দা-র ঞ্জ ন—অজ্ঞাতে অর্ধস্বগতোক্তি করলুম। তারপর বললুম, 'তিনিও কি ক্রিকেটে ইনটারেস্টেড ছিলেন?'

'তার মানে? সবচেয়ে বেশী নেশা তো তাঁরই।'

আনন্দে শিউরে উঠলুম। কুলদারঞ্জন রায় ক্রিকেটে নেশাগ্রস্ত, সেই কুলদারঞ্জন, যিনি রবিনহুড লিখেছেন? মুহূর্তের মধ্যে আমার বাল্যজীবনের সিনেমাদর্শন হয়ে গেল ফ্ল্যাশব্যাকে। রামায়ণ, মহাভারত, রবিনহুড, নেপোলিয়ানের জগতে আমার মুগ্ধ বিচরণ। একচল্লিশবার (কিংবা একশো একচল্লিশবার) পড়েছি যে-বই, যে-বইয়ের দুষ্ট শেরিফের দুর্দশা ঘটানোয় আমার অংশ ছিল, ফ্রায়ার টাকের বাইশমণী ঘুসির পিছনে যুক্ত ছিল আমার মুষ্টি, লিটল জনের লাঠি কিংবা অ্যালান ডেল-এর বীণা কিংবা রবিনের তীর—সব কটি বস্তুর পিছনে আমি কোনো না কোনোভাবে উপস্থিত ছিলুম, এবং নির্দোষ সখ্য ছিল মরিয়মের সঙ্গে—সেই রবিনহুডের মহাকবি কুলদারঞ্জন রায় ক্রিকেটেও ইনটারেস্টেড ছিলেন, কিংবা তার থেকেও বেশি—ক্রিকেট-ম্যাড ছিলেন! হা ভগবান! একি তোমার দয়ার বিধান! জলে স্থলে তুমি অনলে অনিলে—

আমার আস্তিক আবেগে নতুন তরঙ্গ তুলে শ্রীমতী মজুমদার বললেন—'তিনিই তো আমাদের ধরে-ধরে ক্রিকেট-মাঠে নিয়ে যেতেন। বড় জ্যাঠামশায় ব্যাপারটা তত পছন্দ করতেন না। তিনি বড় রাশভারী ছিলেন। তাঁর বাড়ির মেয়েদের তিনি মাঠে আসতে দিতেন না।'

কুলদারঞ্জন রায়কে পেয়ে আমার আকর্ষণকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়ে গেছে—'তাহলে কুলদারঞ্জনই আপনাদের খেলা দেখতে নিয়ে যেতেন?'

'হ্যাঁ, তাই তো বলছি। ওঁর বাড়ি আর আমাদের বাড়ির মধ্যে অনেক ব্যবধান। তিনি হাজির হতেন আমাদের বাড়িতে। তারপর হয় ট্রামে-বাসে নয় ট্যাক্সিতে ইডেন-গার্ডেনে যাত্রা।

'—তা মাঠে শুধু আমরাই মেয়ে-দর্শক। আমাদের বাড়ির কটি মেয়ে। পুরুষ-দর্শকই বা তখন সংখ্যায় বেশি কোথায়? ১৯২০-২১ সালের কথা, তখন ছেলেদের ভিড়ও তো তত দেখিনি। গ্যালারি প্রভৃতির বালাই ছিল না। কিছু মিনি-মাগনা উৎসাহীর ভিড়। কেউ-কেউ ছাতা খুলে সামনে বসত, আর তাতে রাগারাগি হত, তবে এখনকার মত লাঠালাঠিতে পৌঁছত না'—শ্রীমতী মজুমদার হাসলেন।

প্রশ্ন করলুম, 'আপনারা সারদারঞ্জনের সঙ্গে খেলা দেখতে যেতেন না?'

'না, যেতাম কুলদারঞ্জনের সঙ্গেই। তবে আমাদের দেখতে পেলে বড় জ্যাঠা-মশাই এগিয়ে আসতেন। আর সাহেবরা তার জন্য আমাদের খাতির করত। গদীওয়ালা খানকতক চেয়ার বের করে দিত মালীরা। তাতে বসে আমরা খেলা দেখতাম আর লেমনেড খেতাম।'

'লেমনেড' বলার সময়ে ইনি অল্প একটু হাসলেন। তারপর বললেন—'এখানে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। আমাদের মাঠে দেখলে ক্যালকাটা ক্লাবের আধা-বয়সী মোটাপানা বার্কমায়ার-সাহেব হাসিমুখে এগিয়ে আসতেন। বড় জ্যাঠা-মশাইয়ের সাক্ষাতে একবার বার্কমায়ার সাহেব আমাদের দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'Oh good! I shall look after them.' বড় জ্যাঠামশাই গম্ভীর-ভাবে বললেন, 'not with anything strong I hope!'

আমি কি বলতে গেলুম, শ্রীমতী মজুমদার বললেন, 'ক্রিকেট-বাড়ির মেয়ে কথাটি কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। শুধু জ্যাঠামশাইরা নন, আমার বাবাও ক্রিকেটে দারুণ উৎসাহী ছিলেন, এবং আমার পিসিমাও।'

'আপনার পি-সি-মা?'—আমি অবাক—'তার মানে বাঙালী অন্তঃপুরে ক্রিকেটের আকর্ষণ কত যুগ পেছিয়ে গেল!'

আমার বিস্ময় সানন্দে উপভোগ করে শ্রীমতী মজুমদার বললেন—'হাঁ, আমার পিসিমা—কার্ত্তিক-গণেশের মা স্বর্গতা মৃণালিনী দেবীর ক্রিকেটে অপরিসীম উৎসাহ। বলেছি না, ক্রিকেট-বাড়ির মেয়ে আমরা। সারাক্ষণ বাড়িতে ক্রিকেটের আলোচনা। ক্রিকেটের সমস্ত শব্দের সঙ্গে আমাদের আবাল্য পরিচয়। বাড়িতে তখন দুটো দল, একদল টাউন ক্লাবের পক্ষে, অন্যদল স্পোর্টিং ইউনিয়নের। বড়রা টাউন ক্লাবের দিকে, ছোটরা স্পোর্টিং ইউনিয়নের দিকে। তর্কবিতর্কের শেষ থাকত না। পিসিমার ছেলেরা বড় খেলোয়াড় ছিলেন নিশ্চয় জানেন।'

নিশ্চয় জানি। না জানাটা অপরাধ। কার্ত্তিক-গণেশ-বাপী বসুগণ বাংলা-ক্রিকেটকে যে সতেজ রেখেছিলেন দীর্ঘদিন, তা ইতিহাসের সামগ্রী।

শ্রীমতী মজুমদার জের টেনে বললেন, 'আমরা পিসিমার বাড়ি থেকে মার্কাস স্কোয়ারে স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলা দেখতে যেতুম। যাব না? কি উৎসাহ ছিল আমাদের। পিসিমার ছেলেরা খেলবে, তাদের কীর্তি দেখতেই হয়, কিন্তু—'

ঈষৎ ঠোঁট উলটে ক্ষোভের ভঙ্গি করলেন শ্রীমতী মজুমদার—'লাঞ্চের সময়ে আমাদের বাড়ি চলে আসতে হত। কি করব, পিসতুতো ভায়েরা কিছুতে থাকতে দিত না। তাদের বড় ভয়, যদি শেষপর্যন্ত ক্লাব-কর্তৃপক্ষের 'সনির্বন্ধ' অনুরোধ এড়াতে না পেরে তাদের বোনেরা সারি-সারি বসে যায় খাওয়ার টেবিলে। ছি! কি লজ্জা তাহলে।'

খুব হাসলুম খানিক। পরে বললুম, 'আপনার পিসিমা মৃণালিনী বসুর সব কথা শোনা হল না তো?'

দুঃখের ভঙ্গি করলেন শ্রীমতী মজুমদার।—'মৃণালিনী বসুর সব কথা না শুনতে পেয়ে আপনার কি ক্ষতি, যথার্থ ক্ষতি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের।'

'কি রকম, কি রকম?'—কৌতুকজনক কোনো ঘটনার আঁচ পেয়ে আমি উৎসাহী হয়ে উঠি।

'পিসিমার সঙ্গে গাড়িতে করে আমরা খেলা দেখতে যেতুম বালীগঞ্জে—স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলা থাকলে। এখন যে জায়গায় মিলিটারী-ক্যাম্প দেখা যায়, সেইখানে বসে আমরা খেলা দেখতুম। পিসিমা তাঁর ছেলেদের খেলা সম্বন্ধে যেমন উৎসাহী ছিলেন, তেমনি ছিলেন কড়া সমালোচক। ক্যাচ ফেললে, বা ভালো ফিল্ডিং না করতে পারলে, কঠিন মন্তব্য করতেন। দুঃখের বিষয়'—শ্রীমতী মজুমদার একটু থামলেন—'শ্রোতা ছিল শুধু মেয়েরা। নইলে'—হাসলেন এবার—'ভারতীয় ফিল্ডিং এখন পৃথিবীর সেরা।'

প্রচুর হাসির মধ্যেও কিন্তু একটা কথা মনে হল—যে আকারেই হোন না কেন, শ্রীমতী গ্রেস পৃথিবীর সর্বত্র আছেন। বাংলাদেশেও, ক্রিকেট যখন নিতান্ত শৈশবে, তখনও। ক্রিকেট-ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা সকলেই জানেন, গ্রেসদের ক্রিকেটজীবন-গঠনে ডবলিউ জি গ্রেসের মাতার কত বড় ভূমিকা ছিল।

কথাশেষে শ্রীমতী মজুমদার উঠছেন, বললেন, 'ক্রিকেট খেলার কত-না রসের গল্প শুনেছি জ্যাঠামশাইয়ের মুখে।'

আমিও উঠছিলুম, অর্ধপথে স্থগিত হয়ে বললুম—'তার দু একটা—'

শ্রীমতী মজুমদার একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—'কিচ্ছু মনে নেই। তখন কি জানতুম, সেইসব গল্পে অন্য কারো প্রয়োজন হবে—।'

* * * ক্রিকেটের বিরুদ্ধে * * *

রমেন মিত্তির বলল, 'সেণ্টিমেণ্টাল ট্র্যাশ্! কথাশেষে যথারীতি তার ঠোঁট থেকে ধূম্রচক্র নিক্ষিপ্ত এবং ঘূর্ণিত হতে লাগল। সেই চক্রমধ্যে আরও কিছু তীক্ষ্ন চোখে দর্শন করে রমেন মিত্তির ঠোঁট ওলটাল—'যেমন খেলা, তেমনি তার লেখক।'

আমি বিনীতভাবে বললুম—'লেখককে গাল দাও সইবে, হয়ত গালটাও মিথ্যে নয়, কিন্তু তাই বলে খেলাটাকেও—'

'হয়েছে হয়েছে, অধিকন্তু ন্যাকামো!' রমেন মিত্তির নিঃশেষিত সিগারেটকে দেশলাই করে পরের সিগারেট ধরিয়ে বচন ছাড়ল, 'শরীরচর্চার জন্য মানুষ খেলে; আর ফুর্তির জন্য; তার আবার ইতিহাস! সেই ইতিহাসের কাঁথা গায়ে জড়িয়ে ম্যালেরিয়ার কাঁদুনি আর কাঁপুনি—আরে এসো এসো—' রমেন্দ্রনাথ সহসা হর্ষে আকুল। যিনি প্রবেশ করলেন, সেই মহাপুরুষকে দেখেই আমার হৃৎকম্প—মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় একগাল হাসি নিয়ে প্রবেশমান।

'আরে রমেনদা যে, কত যুগ পরে! কবে এলেন?—মণিশঙ্কর তার ভালো-

বাসার রমেনদার গায়ে গড়িয়ে পড়ে।

'এই এসেছি দু' একদিন। আর এসেই বা কি হবে? আসামাত্রই তো যত রাজ্যের প্যানপ্যানানি, ভ্যানভ্যানানি পড়তে হবে'—বলে টেবিলের উপর পড়ে-থাকা আনন্দবাজারের উপর বাঁকা চোখে চাওয়া হল। তাতে এই অধমের 'ঐতিহাসিক ক্রিকেট-নাটক' নামক একটি রচনা মুদ্রিত আছে।

অন গড্ বলছি, লেখাটি আমি রমেন মিত্তিরের মতো শত্রুরের হাতে নিজে তুলে দিইনি। 'কি সব ছাইপাঁশ লিখছিস দেখি' বলে লেখাটি চেয়ে নিয়েছিল। তারপর আমার এই শ্রাদ্ধ। আমি জানতাম, এ-জিনিস ও করবে। বৈজ্ঞানিক মনের গর্বেই ও গেল। তার জন্য বিশ্বসংসারের সমস্ত-কিছু আবেগমূলক ব্যাপারের পেট ফাঁসানোয় ওর অর্জিত অধিকার। একে ক্রিকেট ওর চক্ষুশূল—ভারতের সুস্থ জীবনগঠনের পরিপন্থী এই মধ্যযুগীয় খেলাটি ইয়ংম্যানদের কাজকর্ম থেকে সরিয়ে নিয়ে দুপুরবেলা মাঠে আড্ডা মারতে পাঠিয়ে দেয়—ওর ধারণা ; তদুপরি সেই ক্রিকেটের বর্তমান নয়, অতীত নিয়ে 'ন্যাকরামি!'

রমেন মিত্তির মণিশঙ্করের পিঠে আদরের চাপড় বসিয়ে বলল—'ব্রাদার, তোমার একটি মাত্র দোষ, তুমি সিগারেট খাও না; কোনো কাজের লোকের এই ইম্পিটাস এড়ানো উচিত নয়, বুঝলে ব্রাদার, পর্বতো বহ্নিমান ধুমাৎ—ধুমেই অগ্নির প্রমাণ—তাহলেও তোমার স্যানিটি আছে (আমার দিকে বক্র চাহনি), তুমি এ লেখাটি সম্বন্ধে কি বলবে—নষ্ট নষ্ট্যালজিয়া?'

মণিশঙ্কর একবার লেখাটায় চোখ বুলিয়েই বলল, 'কিরিকেট কেত্তনও বলতে পারেন।'

'হাঃ হাঃ, ভায়ার রসবোধ আছে'—রমেন মিত্তিরের খুশির সীমা নেই—'কেত্তন' কথাটাই ঠিক, কেত্তন করে-করেই তো জাতটা অধঃপাতে গেল।'

রমেন মিত্তির শেষ হয়ে আসা সিগারেট থেকে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে এক বিরাট টানের পরে স্টেটবাসের মতো ধোঁয়ায় আমার মুখ চোখ ভরাল। তারপর আয়েশে নড়েচড়ে বসে আঙুলের সিগারেট আমার মুখের সামনে নাড়িয়ে বলল—'এই যে আমি প্রেরণাকে চিরজ্বলন্ত রাখছি, এর বিষয়ে ক্রীড়া-লেখকের কোনো বক্তব্য নেই?'

মহা রেগে বললুম—'নিশ্চয় আছে—তোমার নিত্য মুখে-আগুন—'

খুব খুশি হয়ে রমেন মণিশঙ্করকে বলল, 'ওরে চটেছে। তবু ভাল শরীরে রাগতাপ আছে, সবটা আবেগে জল হয়ে যায়নি।'

তারপরে সুখটান শেষ করে সিগারেটটি দেখিয়ে মিত্তির বলল—'এর বিষয়ে আমি কি বলি জান?'

মণিশঙ্কর তৎক্ষণাৎ উৎসাহী—'কি রমেনদা?'

কোনো অশুদ্ধ কথা আশঙ্কা করে আমি সঙ্কোচে চুপ করে থাকি।

'এটা আমার পূতাগ্নি;' রমেন মিত্তির সিগারেট সোজা করে তুলে ধরে—'কোন্ সুদূরে অতীতে আম্রকুঞ্জের গহন অন্ধকারে ওষ্ঠপাত্রের উপর এই অগ্নি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তারপর পৃথিবীর হাটে-মাঠে সহস্র-সহস্র মাইল পরিক্রমণ করেও এই অগ্নিকে আমি অনির্বাণ রেখেছি—ভ্রাতঃ!'—আমার দিকে অভি-নয়ের ভঙ্গিতে ফিরে—'তোমার সদা-প্রস্তুত ক্রীড়ালেখনী আমার জীবন-

অলিম্পিকের প্রেরণাগ্নির বাণীবন্দনায় কি উচ্ছ্বসিত হবে না?'

'হবে না কেন, রীতিমত হবে; বেশ খুলে হিস্টরি লিখব'—আমি বিস্মিত কণ্ঠে বলি—'ঘোষেদের আমবাগানে গোঁফ ওঠার আগেই সিগারেট টানতে শিখেছিলে, তারপর থেকে সমানে টেনে চলেছ, আর গুচ্ছের পয়সা গুঁজে চলেছ সিগারেট-কোম্পানীর গর্ভে—আর আর—'

উচ্চহাস্যে আমার কণ্ঠ ডুবে যায়। রমেন মিত্তির ও মণিশঙ্করের খুশির সীমা থাকে না। আমি অসহায়ভাবে বসে থাকি। আজ ছাই মিত্তিরদাও আসছেন না যে, আমাকে কিছু বাঁচাবেন। এই দুই শয়তান আমার ঈশ্বরের গয়াপ্রাপ্তি ঘটাবে, তাতে সন্দেহ রইল না। রমেন মিত্তিরকে আমি ছোটবয়স থেকে চিনি, তার খোঁচায় আর আমার গায়ে ঘা হয় না, কিন্তু কি বিচ্ছু বদমাস এই মণিশঙ্করটা। অথচ মাসকয়েক আগেও আমি কি না মহত্ত্ব দেখিয়েছিলুম ওর কাতরতায়!

কয়েক মাস ঠিক নয়, বছর খানেক আগে এমনি এক রবিবাসরীয় আলোচনাড্ডা বসেছে। তখনো ক্রিকিট সিজন। ফুটবলের হাততালির কাল আসেনি। সকলে হাত ঢুকিয়ে রেখেছে শীতের সকালে র‍্যাপারের তলায়। অন্তত আমরা, আড্ডাধারীরা। শুধু মুখেই 'মারিতং জগৎ'। কালধর্মে ক্রিকেটপ্রসঙ্গ উঠল। জিয়লজিস্ট রমেন মিত্তির তখন বনবাসে। যার যেমন কর্মফল। মন্দস্বভাব বলেই তো অত বুদ্ধি সত্ত্বেও সারাজীবন পাথর কুড়িয়ে বেড়াতে হল খ্যাপার মতো। আমি অনুকূল পরিবেশে ধুরন্ধর কৌঁসলীর কায়দায় ক্রিকেট-পক্ষে সওয়াল শুরু করেছিলুম—মণিশঙ্কর 'ফুঃ' করে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল—'আপনি হারা-মামলার নথির বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন ভূতের মতো। ক্রিকেটের দিন গেছে। এখনো যেটুকু জৌলুস দেখা যাচ্ছে, তা মেম-বুড়ীদের পাউডার-চড়ানো সাজের মতো—কবরে শোবার আগে।' খুরুট রোডের চায়ের আসরে এইসব ব্যাপার নিয়ে মণিশঙ্করের সঙ্গে সেদিন আমার 'মুখের হাতাহাতি' হয়ে গিয়েছিল। যে-আগুন জ্বলেছিল—তাকে কাপের পর কাপ চা ঢেলেও নেভানো যায়নি, চাপা দেওয়া যায়নি সিঙাড়ার ঝুড়ি উপুড় করে দিয়েও। অবশেষে এই মোকর্দমার বিচারপতি, ক্রিকেট-রেকর্ডের মহাস্মার্ত গ্রেট মিত্তিরদা রায় দিয়েছিলেন, 'সময়াভাবে ড্র।'

মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ক্রিকেট খেলে না, তাই আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ভাল মনে নিতে পারেনি। তার বক্তব্য, 'ড্র' মানে 'টাই' নয়। এক্ষেত্রে সময়াভাবে ড্র, মানে প্রমাণাভাবে আসামী খালাস। আমি নাকি নৈতিকভাবে হেরেই গিয়েছিলুম। মিত্তিরদা যদি হোম-সিক্ হয়ে অসময়ে আদালত ভঙ্গ করে চলে না যেতেন, তাহলে মণিশঙ্কর দু-এক ওভার এমন যুক্তির বীমার ছাড়ত যে, আমার বেমার হয়ে যেত; প্রহার ও হার বরাতে জুটে যেত একসঙ্গে।

একথা সত্য, মণিশঙ্করের সঙ্গে যুক্তি-তর্কে আমি পেরে উঠি না। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে, ক্রিকেটের ব্যাপারে, আমি সেদিন যে যোগ্য প্রতিরোধ দিতে পেরেছিলাম, তার কারণ লর্ডস ইন ডেনজার, ক্রিকেট ইন ডেনজার। ক্রিকেটের জেরুজালেম রক্ষায় আমি, আমার মস্তকের নি-কেশ মরুতা সত্ত্বেও, ব্রতী 'বালক'। আমার প্রবল প্রতি-আক্রমণের সামনে সেই একবারের জন্যই মণি-

শঙ্করের বিজয়ী কণ্ঠ থমকে দাঁড়িয়েছিল জিভ তুলে। পরে সক্ষোভে বলেছিল, 'অন্যায় সংগ্রাম করছেন আপনি।'

চমকে শশব্যস্ত হয়ে বলেছিলাম, 'ছি-ছি, কি বলছ? আমি লড়ছি আদর্শের জন্য, সেই আমি করছি অন্যায় সংগ্রাম?'

'সার্টেনলি, আলবৎ, নির্ঘাত'—তিন ভাষায় নির্ঘোষ তুলে মণিশঙ্কর বলল—'আপনি তথ্যগোপন করেছেন। আপনি জানেন, ছেঁড়া ক্রিকেট ছেঁড়া কোথায় যেহেতু তার ময়লা অনেকদিন কাচছেন, কিন্তু আপনি সে-সব অংশ না দেখিয়ে জরিদার আঁচলাটুকুই শুধু তুলে ধরেছেন।'

মণিশঙ্কর গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি আপনার বড়ো-আমির কাছে অ্যাপীল করছি।' তারপর বিগলিত হয়ে নরম গলায় অনুনয় করল—'নিজের কাছে কিছু লুকোনে থাকে না, ভাবের ঘরে চুরি চলে না—আপনারও বড়ো-আমি আছে।' সবশেষে করুণ গলায় আবেদন জানাল—'অজয় বসুর দল রেডিওতে বাংলায় ক্রিকেট বলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, সকলেই আমার ক্রিকেট-বিরোধিতায় মর্মাহত। দাদা, কাইন্ডলি ক্রিকেটের বিরুদ্ধে বিদগ্ধজনের বক্তব্যগুলি সাপ্লাই করুন। সমস্ত তথ্য লোকলোচনে আসার পরেই জনমত গঠন সম্ভব। এ আপনার মতো লোকেরই যোগ্য কাজ। দাদা, স্মরণ রাখবেন, য়্যু হ্যাভ গট্ ইয়োর বড়া-আমি।'

মণিশঙ্কর আমার মাথায় কী একটা আধ্যাত্মিক আমি-তত্ত্ব ঢুকিয়ে দিলে যে, সেদিন রাত্রে ভাল করে ঘুম হল না। সুমতি কুমতিকে নকল করে বড়ো-আমি ছোট-আমি সারারাত মনের মধ্যে কোঁদল করল।

বড়ো-আমি—ক্রিকেটের বিরুদ্ধে পণ্ডিতজন যাহা-যাহা বলিয়াছেন, সেগুলি জানাইলেই ভাল করিবে। ইহাতে সত্যরক্ষা হইবে।

ছোট-আমি—বাহবা! বেড়ে কথা! ঘরের হাঁড়ি হাটে ভাঙব? মাইরি।

বড়-আমি—ঘর বাহির পার্থক্য করিতেছ কেন? জান না, চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর! কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—সব ঠাঁই মোর...

ছোট-আমি—বড়দা, কবিদের আর কি, লিখেই খালাস। আমাদের মত ছা-পোষাদের ঘরে বাইরে একটু তফাত রাখতে হয়। ঘরের অ্যাফেয়ার ঘরে, বাইরের অ্যাফেয়ার বাইরে। ঘরে শেকল তুলে দিয়ে তবে না বারমুখো হই!

বড়-আমি—কিন্তু ইহা কি সত্য নহে—ক্রিকেট ক্রীড়ামাত্র নহে, ইহা একটি মহৎ আচরণ?

ছোট-আমি—নিশ্চয়। শত্রুবধ একটি মহৎ আচরণ। তাইতো ক্রিকেটে মাথা ফাটাতে বাউন্সার-বীমার ছাড়া হয়।

বড়-আমি—ভ্রাতঃ, বিদ্রূপের শক্তি জগতে বড় শক্তি নহে। দৃঢ়ভাবে সত্য ঘোষণা কর। সত্যমেব জয়তে। ক্রিকেটে কে শত্রু, কে মিত্র? যাহারা ক্রিকেটকে বিদ্রূপ করে, তাহাদের সামনে ক্রিকেটের মায়ামুকুর তুলিয়া ধর; নিজ বিকৃত মুখ দেখিয়া বিপক্ষদল লজ্জিত হবে। ভ্রাতঃ...

শেষ পর্যন্ত আমার নিদ্রার মহাশ্মশানের উপর বড়ো-আমি জিতে গেল 'যতো ধর্ম স্ততো জয়'-এর জোরে। তার ফলে প্রভাতেই আমাকে ভাবতে বসতে হল,

ক্রিকেটের বিরুদ্ধ-কথা কোথায়-কোথায় পাওয়া সম্ভব। অনেক ভেবে কুল-কিনারা করতে পারছি না, তখন হঠাৎ বিখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিকের ক্ষুদ্রাকার রসরচনার কথা মনে পড়ে গেল। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী একবার ক্রিকেট নিয়ে অন্যায় রসিকতা করেছিলেন। শ্রীযুক্ত বিশী ক্রিকেটের ক্রি-ও বোঝেন না, শুধু লোক হাসাবার জন্য মহতের অপমান তিনি করেছিলেন। তা সত্ত্বেও বড়ো-আমির তাগিদে সেই রচনাটির জন্য তাঁর দ্বারস্থ হতে হল। তাঁর কাছে এ ব্যাপারে যেতে অনিচ্ছার আরও কারণ, আমি তাঁর অকৃতজ্ঞতার কথা জানতুম। পাঠক, চমকাবেন না, ব্যাপারটা শ্রীযুক্ত বিশীর নিজমুখেই শুনেছিলুম। আপনারা জেনে রাখুন, বঙ্গদেশীয় এই প্রসিদ্ধ লেখক, যিনি অধ্যাপকও বটেন, তাঁর প্রথম চাকরি পেয়েছিলেন ক্রিকেটের জন্যই।

কাহিনীটা তাঁর নিজ মুখেই শোনা যাক। শ্রীযুক্ত বিশী বললেন :

তখন সবে পাস করে বেরিয়েছি। বাংলার অধ্যাপকের চাকরির ইন্টারভিউ পেলুম এক বেসরকারী কলেজে। গুটি-গুটি সেখানে হাজির হয়ে দেখি আমারি মতো কয়েকটি প্রাণী শুষ্কমুখে সন্দিগ্ধমনে উপবিষ্ট। সকলেই সকলকে কুটিল দৃষ্টিতে বিদ্ধ করে ভাবছে, ও-ব্যক্তি নিশ্চয় গভর্নিংবডির পেয়ারের লোক। অবশেষে ডাক পড়লে প্রথমজন থরহরি হয়ে 'জয় হরি' বলে প্রস্থান করলেন পাশের ঘরে। ইণ্টারভিউ-ঘর থেকে ধোলাই হয়ে ফেরামাত্র সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর উপর—'মশাই মশাই, ভাবগতিক কি রকম? কোশ্চেন কি রকম?'

'বলেন কেন'—ভদ্রলোক ব্যাজার—'ফুটবল, শুধু ফুটবল!'

'ফু-ট-ব-ল? ছোঁড়ারা যা খেলে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিছিমিছি সারা হপ্তা বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ আর মনসার পাঁচালী মুখস্থ করলুম।'

সবাই ভাবল, ভদ্রলোককে নিশ্চয় বোর্ডের পছন্দ হয়নি, তাই ফুটবল খেলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আশান্বিত হয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি গেলেন। ফিরলেন আগুন হয়ে। —'বলবেন না মশাই, একি ইণ্টারভিউ? শুধু ক্রিকেট আর ক্রিকেট! ব্রাডম্যান—পন্সফোর্ড—ভোস্—মোষ—সেসব কত কি কথা, জীবনে শুনিনি।'

তৃতীয় প্রার্থী পেলেন হকি, চতুর্থ ভলি, পঞ্চম পিং-পং, ষষ্ঠ কপাটি।

শুনে আমার দাঁত-কপাটি। এলুম কোথায়? কলেজ-কম্পাউণ্ডে গোটা গড়ের মাঠ ঢুকে আছে? পড়াবো তো বাংলাসাহিত্য, তার জন্য ইস্কুলের ছেলেদের মতো খেলার পাতা কণ্ঠস্থ করতে হবে? এমন মেঠো কলেজে আমার মতো মাঠ-বেরসিকের চাকরি হবে না নির্ঘাত। অতঃপর আমার ডাক এল।

ঘরে ঢুকে ঘড়-ঘড় করে চেয়ার টেনে বসলুম। দেখি এক বৃদ্ধ মৃদু-মৃদু হাসছেন। হাসি-হাসি গলায় শুধোলেন—'খেলাধুলোর খবর-টবর রাখা হয়?'

'কি যেন বলেন, খেলার খবর আজকের দিনে বাচ্ছারা—'

'যথার্থই যথার্থই'—বৃদ্ধ বিচলিত—'খেলার খবর আজকের দিনে বাচ্ছারাও যখন রাখে, তখন আপনার মতো ইয়ংম্যান—যথার্থই ও-প্রশ্ন আপনাকে করা ভুল হয়েছে। যথার্থই আপনি খেলা ভালবাসেন।'—বৃদ্ধ নিজগুণে বিগলিত।

প্রশ্ন : 'তা খেলেন-টেলেন নাকি?'

'নিজ মুখে কি আর বলব?'

'বাঃ, চমৎকার! চমৎকার বিনয়! প্রিন্সিপাল, মার্ক করুন, আগের ভদ্রলোকের সঙ্গে এ'র ব্যবহারের পার্থক্য। হেন জানি, তেন জানি করে তিনি গর্ব করে গেলেন, কিন্তু দেখলে মনে হয় জীবনে মাঠে নামেননি।'

প্রশ্ন : 'বলুন তো, ক্রিকেট না ফুটবল, কোন্‌টা আপনার বেশি পছন্দ?'

'ক্রিকেট না ফুটবল? আহা! কাকে ছেড়ে কাকে ধরি!'

'নাইস্! ঈউনিক! কাকে ছেড়ে কাকে ধরি! অপূর্ব বলেছেন! জানেন মিঃ বিশী, আমাদের কলেজে দুটোরই সমান চর্চা। হেঁ-হেঁ, কলেজকে খেলায় অল-রাউণ্ডার বলতে পারেন।'

প্রিন্সিপাল এবার আমাকে তীক্ষ্ম চোখে যাচাই করে পাশের ভদ্রলোককে বললেন, শুনতে পেলুম—'দেখে যা মনে হয়, খুব ট্রিকি সেণ্টার-ফরোয়ার্ড হবে, কি বলেন?' উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বললেন, 'ভাল অফ-স্পিনারও হতে পারে।' সর্বনাশ! জীবনে ব্যাট ধরিনি, বলে পা দিইনি, আমাকে চাকরি দিয়ে মাঠে ছেড়ে দেবার মতলব করছে নাকি?

প্রশ্ন : 'মিঃ বিশী, প্লিজ্, একটা লাস্ট কোশ্চেন করব। বলুন তো আপনার মতো শিক্ষিত ক্রীড়ারসিকের মনে কোন্ ক্রিকেটারের নাম প্রথমেই আসে?'

ভিতরে-ভিতরে আমি উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছি। ভয়ও পেয়ে গেছি। এই খেলা-ক্ষ্যাপাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে বাঁচি। স্থির করলুম এমন একজনের নাম করব, যার ত্রিসীমানায় খেলা থাকার কথা নয়। গম্ভীর হয়ে জোরালো গলায় বললুম—'আমার ক্রিকেটার? মাই ক্রিকেটার ইজ্ লর্ড টেনিসন।'

'ব্রাভো! বাহবা! এগ্-জ্যাক্ট-লি!'—কানে তালা লেগে গেল বিকট শব্দে। সবাই একসঙ্গে টেবিল চাপড়েছে ও চেঁচিয়েছে।—'এই তো অধ্যাপক-ক্রীড়ামোদীর যোগ্য উত্তর—একমাত্র উত্তর। অ্যাঁ, ঠিক কি করে লর্ড টেনিসনের নামটাই আপনার মনে পড়ল! আহা, ইংলণ্ডের রাজকবি লর্ড টেনিসন, আর তাঁর নাতি ক্রিকেটার লর্ড টেনিসন! একই নামে বাঁধা কবি আর ক্রিকেটার। মিঃ বিশী...না না, লজ্জা পাবেন না, আমরা ফ্র্যাঙ্কলি অ্যাডমিট করছি, এ লাইনে অনেকদিন চর্চা না করলে এ নামটা আমাদের মনেও প্রথমে আসত না।...মিঃ বিশী, এখনি উঠবেন না, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা হাতে-হাতেই নিয়ে যান।'

এই ব্যক্তি, যিনি ক্রিকেটের জন্য প্রথম চাকরি পেলেন, তাঁর কাছেই ক্রিকেট-বিরোধী রচনার জন্য আমাকে যেতে হল—পাঠক আমার মর্মযাতনার পরিমাণ বুঝবেন। সুখের বিষয়, অধ্যাপক বিশী রচনাটি হারিয়ে ফেলেছেন (আমার বিশ্বাস, বিবেকদংশনে নষ্ট করে ফেলেছেন)। আমার বিবেকও বিরোধী কোনো রচনার সন্ধান না পেয়ে বেশ পরিচ্ছন্ন ও নিশ্চিন্ত হয়ে আসছে—এমন সময়ে—আবার সেই বড়ো-আমি। আর পারি না ধর্মপুত্রের জ্বালায়! বাবা, আসল ধর্মপুত্র তো কাজ গুছোবার জন্য 'ইতি গজ' করেছিল, তোমার এত কি—যত্তোসব—ইয়ে—

পুরনো কাগজ হাতড়ে লেখাটা বার করলুম। সকলে জানুন—আমি চেঁচিয়ে কনফেস্ করছি—আমি সত্যিই কিছু তথ্যগোপন করেছিলুম। পুরনো খবরের কাগজ উল্টোবার সময়ে একদা মসিয়ে আঁতোয়ান গর্গাঁ নামক জনৈক ফরাসীর

লিখিত একটি ক্রিকেট-কৌতুকীর সন্ধান পাই। সেটা আমার সংগ্রহে থাকলেও এতদিন লোকগোচর করিনি। ১৮৯৬, ১৬ই জুলাই লেখাটি মাদ্রাজের সান্ধ্য দৈনিক 'মাদ্রাজ মেল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোনামা ছিল—*The Famous Cricket Match of 1884, A Frenchman as Critic.* ১৮৮৪-তে কেনিংটন-ওভালে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-ম্যাচের সেই ফরাসী-লিখিত বিদ্রূপাত্মক বিবরণ অগত্যা আমাকে উপস্থিত করতেই হল :

"আমি কথাপ্রসঙ্গে শুনিয়াছি, প্যারিসে ইংরেজদের একটি ক্রিকেট ক্লাব আছে। কথাটা হয়ত সত্য, কিন্তু ফ্রান্সে আমি কদাপি এই বিখ্যাত ইংরেজী খেলাটি অনুষ্ঠিত হইতে দেখি নাই। অদ্য, ইংলণ্ড থাকাকালেই সর্বপ্রথম এই খেলাটি সন্দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করিলাম। মধ্যাহ্নকালে কেনিংটন ওভাল-মাঠে উপস্থিত হইলাম। ইংলণ্ড-প্রধানগণ এবং অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধিগণের সাক্ষাৎ সংগ্রামের সুমহান উপলক্ষেই আমার আগমন। সংগ্রাম-দর্শনের সুযোগ অর্জনের জন্য প্রবেশদ্বারে আমাকে মূল্যদান করিতে হইল, এবং আমি এখন নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, জীবনে আর কখনো এরূপ স্বল্পব্যয়ে এমন অত্যাশ্চর্য দৃশ্য-দর্শনের সুযোগ পাই নাই।

"রৌদ্র-জ্বলন্ত মধ্যাহ্ন। গ্রীষ্ম-সূর্য হইতে পরিত্রাণের জন্য অবিলম্বে আচ্ছাদনের নিম্নে আশ্রয় লইলাম। চারিদিকে সকৌতূহলে তাকাইয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, অহো! খেলা তাহা হইলে মুক্ত মাঠেই হইবে। ইহাতে আমার বিস্ময়ের শেষ রহিল না, কারণ স্বভাবতই আমি ভাবিয়াছিলাম, আজ যখন এত উত্তাপ, তখন প্যাভিলিয়নের মধ্যেই ক্রিকেট-খেলা হইবে। আসন গ্রহণ করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। দর্শকেরা এক বিরাট বৃত্ত রচনা করিয়া বসিয়া আছে। ঐ বৃত্তের মধ্যে একটি সুন্দর সমতল তৃণক্ষেত্র। তাহার উপর কিছু ব্যবধানে মুখোমুখি দুইটি কাষ্ঠের অবরোধ যুদ্ধার্থ নির্মিত। শীঘ্রই ইংরেজগণ ঐ দুই অবরোধ হইতে বিভিন্ন প্রকার দূরত্ব রক্ষা করিয়া মাঠের নানাদিকে বিশৃঙ্খলভাবে ছড়াইয়া পড়িল। আমার আগ্রহ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তারপর দেখিলাম, দুইজন অস্ট্রেলিয়ান দৃঢ়পদে অবরোধ দুইটির দিকে কুচকাওয়াজ করিয়া অগ্রসর হইল। তাহারা প্রত্যেকেই শ্বেত পরিচ্ছদে আবৃত এবং উভয়ের হাতেই একটি করিয়া গুরুভার মুদ্গর, যাহার প্রান্ত-ভাগ বিস্তৃত। তদুপরি তাহারা উভয়েই কঠিন জঙ্ঘাবরণী ও পুরু রবারের হস্তাবরণীর দ্বারা সুরক্ষিত।

"আমি রুদ্ধশ্বাসে অধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। একথা বিশ্বাস করিতে আমার প্রাণ চাহিল না যে, অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধিদ্বয় ঐরূপ ভয়ানক অস্ত্র লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিবে। কিন্তু যদি যুদ্ধ না করিবে তবে তাহাদের ঐ প্রকার বর্ম ও অস্ত্রসজ্জার অর্থই বা কি?

"অস্ট্রেলিয়ানদ্বয় অতি গম্ভীরভাবে দুর্বল অবরোধ দুইটির সম্মুখে ঘাঁটি করিয়া দাঁড়াইল এবং ভাবে মনে হইল, আত্মরক্ষাই তাহাদের উদ্দেশ্য। এতক্ষণে বুঝিলাম, এবং বুঝিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে, তাহাদের নিজেদের মধ্যে সংগ্রামের বাসনা নাই। কিন্তু পুনর্বার সব গুলাইয়া গেল যখন দেখিলাম, জনৈক ইংরাজ-খেলোয়াড় একটি বেশ প্রমাণ-আকারের বল লইয়া অতি হিংস্র-

ভাবে অদ্ভুতরকম তাক করিয়া একজন অস্ট্রেলিয়ানের পায়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। যদিও তখনো বলটিকে পরীক্ষা করার সুযোগ হয় নাই, এবং বলটির মারাত্মক ভয়াবহ রূপ সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না, তথাপি ভয়ে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, এবং তাহা অকারণে নহে, বলটি সত্যই কামানের গোলার তুল্য। অহো! কি আশ্চর্য! দেখ দেখ, সাহসী অস্ট্রেলিয়ান তাহার মুদ্গরের দ্বারা অতি কৌশলে বলটিকে ডানদিকে ঘুরাইয়া উড়াইয়া দিয়াছে এবং বলটি শূন্য হইতে দর্শকদের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। আমি আঁতকাইয়া উঠিলাম, নিশ্চয় দর্শকদের কেহ না কেহ মারা যাইবে। আরও আশ্চর্য, কাহারও কিছুই হইল না। বিস্ময়ের শেষ নাই। তৎক্ষণাৎ ইংরাজ-খেলোয়াড় বলটি হস্তগত করিয়া সর্বশক্তিপ্রয়োগে তাহার স্বপক্ষীয় একজনকে ছুঁড়িয়া মারিল। ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ানদ্বয় দ্রুতবেগে পরস্পর স্থান-বিনিময় করিতেছে। সেইকালে, যাহাকে ছুঁড়িয়া মারা হইল সেই ইংরাজ বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গে বলটিকে ধরিয়া ফেলিয়া হাসিতে-হাসিতে নিকটবর্তী কাঠের অবরোধের উপর অর্পণ করিল, যদিও বলটি যাহাতে অবরোধকে স্পর্শ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখিল। বলটিকে তারপর প্রথম নিক্ষেপকারীর নিকট ফেরত পাঠান হইল এবং বলটি পাইয়াই সে পূর্ববৎ হতভাগ্য অস্ট্রেলিয়ানের পায়ের দিকে ছুঁড়িল, এইবার কিন্তু বীর অস্ট্রেলিয়ানটি বলটি ছুঁইতে পারিল না, ও সেটি পশ্চাতে দণ্ডায়মান ইংরাজ কর্তৃক হস্তগত হইল। সে পূর্ববৎ নিক্ষেপকারীর নিকট বলটি ফেরত পাঠাইল। এইভাবে খেলা চলিতে লাগিল।

"অস্ট্রেলিয়ানদের রণকৌশলের প্রশংসা করিতে আমি বাধ্য। তাহাদের আত্মরক্ষার-পদ্ধতি অদ্ভুত। কিন্তু ইংরাজদের বর্বরতার কথা চিন্তা করিয়া আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। অতঃপর আমি শিখিলাম, অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধিদ্বয় একবার স্থান বদল করিতে পারিলেই এক পয়েন্ট পাইবে। ইহাই রীতি। অকস্মাৎ অন্যতম সাহসী অস্ট্রেলিয়ান বহির্গামী বলে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়া জনৈক ইংরাজের নিকট ভয়ঙ্করভাবে পাঠাইয়া দিল; উক্ত ইংরাজটি বিশেষ সাহসের সঙ্গে একটি অবরোধের একেবারে কাছ ঘেঁষিয়া ঘাপটি মারিয়া বসিয়াছিল। ইংরাজ আঘাত এড়াইতে পারিল বটে—কিন্তু একি! তাহা তো নহে, সে খোলা হাতে বলটি ধরিয়া ফেলিয়াছে! এইবার সারা পৃথিবী যেন শব্দে ফাটিয়া পড়িল; বলটিকে আকাশের দিকে আনন্দে ছুঁড়িয়া দেওয়া হইল। যে অস্ট্রেলিয়ান ঐরূপ জোরের সহিত বলটিকে আঘাত করিয়াছিল সে মাথা নামাইয়া অবরোধ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সাহসী মানুষটি পরাভূত হইয়াছে ভাবিয়া তাহার প্রতি আমার সহানুভূতি জাগিল, কিন্তু আমারই ভ্রান্তি। তাহার বন্ধুগণ তাহাকে করতালিধ্বনিতে অভ্যর্থনা করিয়া, তাহার পিঠ চাপড়াইয়া নানা প্রশংসায় অভিনন্দিত করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল সে যেন বিজয়ী বীর। যাহাই হউক, তাহার শূন্যস্থানে অন্য একজন অস্ট্রেলিয়ান দ্বারা অবিলম্বে পূর্ণ হইল। খেলাটি কোনো প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ছাড়াই দীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিল, যদিও অল্পবিস্তর আঘাত অনেক খেলোয়াড়ই পাইয়াছিল।

"খেলাটিকে শেষপর্যন্ত বর্ণনা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। খেলার ধরন

একই প্রকার। জনসাধারণকে ক্রিকেট খেলার পদ্ধতি শিখাইবার জন্য আমার এই রচনা নহে। কতকগুলি বুদ্ধিমান, মার্জিত এবং উন্নত মানুষ এই ধরনের বিপজ্জনক পরিশ্রমে আনন্দবোধ করিতে পারে, সেই বিষয়ে বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিবার জন্যই আমি লিখিতেছি। কেবল বর্বর দর্শকেরাই এই খেলা হইতে আনন্দ পাইবে। আমার ব্যক্তিগত কথা হইল, যখন আমি নাইমসে ছিলাম, তখন সেখানে ষাঁড়ের লড়াই দেখিতে যাইতে পারি নাই, কারণ যেখানে রক্তপাত হইবার সম্ভাবনা আছে তেমন উপলক্ষকে আমি বীভৎস মনে করি—সে রক্ত পশুদের গাত্র হইতে ঝরিলেও—একই কথা।"

নিন্দের ষোলকলা পূর্ণ হ'ল। বড়ো-আমির মহত্ত্বের ঊর্ধ্ববায়ুতে ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটবার যোগাড়। আজ আমার আত্মঘাতী উল্লাস। ক্রিকেটের বিপক্ষেই বলব আজ, খুলে দেব তার মহিমার মুখোশ, আর সেটার প্রমাণ সংগ্রহ করব একেবারে নিকট স্থান এবং নিকট কাল থেকে।

বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র বছর-খানেক আগে ইডেন-গার্ডেনে রনজি-ট্রফির কোয়ার্টার ফাইন্যালে বাংলা ও হায়দারাবাদের চাঞ্চল্যকর খেলাটির কথা অনেকেরই মনে আছে। বাঙালী দর্শকেরা এই খেলাটির ফলাফলে খুশি, বাংলা শেষপর্যন্ত জিতেছিল ভাগ্যের বহু উত্থান-পতনের শেষে। ঠিক কথা—কিন্তু ক'জন জানে এই উত্তেজনাকর খেলাটির পিছনকার রোমাঞ্চকর মানসিক সংঘাতের কথা। একটা রক্তভীষণ দানবিক হিংসা...কাহিনীটা সংক্ষেপে বলি।

১৯৬৩, ২৩ ফেব্রুয়ারি ইডেন-গার্ডেনে বাংলার সঙ্গে হায়দারাবাদের খেলা শুরু হবার আগেই আসল খেলাটা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল অন্যত্র। কানপুরে জাতীয় প্রতিরক্ষার সাহায্যে প্রদর্শনী-ম্যাচ খেলতে সমবেত হয়েছিলেন সারা ভারতের ক্রিকেটাররা। পূর্বভারত থেকে গিয়েছিলেন পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেট-কোচ লেস্টার কিং এবং পঙ্কজ রায়। পঙ্কজ রায় নামক ক্রিকেটার যে এখনো আছেন, একথা অনেকদিন পরে মনে পড়ল কর্তৃপক্ষের। ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের দরজা তাঁর মুখের উপর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ; পঙ্কজ রায় তাঁর ক্রিকেট-অ্যালবাম এবং টেস্ট-সুভেনির নিয়ে স্মৃতির সুখে আবিষ্ট থাকবেন, কর্তারা তাই চেয়েছিলেন; কিন্তু পঙ্কজ রায় তবু একগুঁয়ে ছেলের মতো মাঠে দাঁড়িয়ে রইলেন—শুধু তাই নয়, রনজি-ট্রফিতে সেঞ্চুরি হাঁকড়াতে লাগলেন উপর্যুপরি। অগত্যা, 'তুমিও এসো পঙ্কজ।'

অনেকদিন পরে সর্বভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে মাঠে নামবার সুযোগ পেয়ে পঙ্কজ নিশ্চয় খুশি হয়েছিলেন, নিশ্চয় তিনি মনে-মনে আশা করেছিলেন, এমন একটা ইনিংস খেলবেন যাকে নিতান্ত মন্দ বলা চলবে না, যেটা দেখিয়ে দেবে, পঙ্কজ রায় এখনো অবসরের ইজিচেয়ারে হেলান দেবার অবস্থায় আসেন-নি, দেখিয়ে দেবে...থাক, পঙ্কজ চিন্তা থামিয়ে চিন্তা করলেন—ক্রিকেটের মতো অস্থির খেলায় আকাশ-কুসুম দ্রুত শুকিয়ে যায়, সাজানো স্টাম্প অকালে ভেঙে যায়, সুতরাং...

কানপুরে খাওয়ার-টেবিলে প্রদর্শনীখেলার জন্য সমাগত ভারতীয় খেলোয়াড়রা উপস্থিত। নানা রঙ্গরসিকতা হচ্ছে। বিশেষ করে সবাই উসকে দিচ্ছে লেস্টার কিংকে। খোলা স্বভাবের মুখখোলা ছোকরা লেস্টার, হিসেব না করেই

বাত্‌চিত করে, তার জন্য তাকে নিয়ে তামাশা করে অনেকে। বোম্বায়ের ফারুক ইঞ্জিনীয়ার তাকে একটু বেশি খোঁচাচ্ছিলেন। একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছিলেন কখনো-কখনো। দু'-একটি ক্ষুদ্র কণ্টক চামড়া ভেদ করে ঢুকছিল।

বাংলার দুই খেলোয়াড় কিং এবং পঙ্কজ যেখানে বসে আছেন—তাঁদের সামনেই বোম্বায়ের ফারুক ইঞ্জিনীয়ার হায়দারাবাদের অধিনায়ক জয়সীমাকে জিজ্ঞসা করলেন, 'ওয়েল জয়সীমা, তোমরা বোম্বাইয়ে খেলতে আসবে তো? আমরা অবশ্য প্রভিন্সের বাইরে খেলতে যেতে অপছন্দ করি না, কিন্তু এখন সিজনের শেষ, অ্যান্ড উই আর টায়ার্ড অব ক্রিকেট—তোমরাই এসো না কেন বোম্বাইয়ে সেমিফাইন্যাল খেলতে!'

কিং চটে গেলেন ফারুকের বিদ্রুপে। বোম্বায়ের সঙ্গে সেমিফাইন্যালের আগে রনজি-ট্রফির কোয়ার্টার-ফাইন্যাল খেলা হবে বাংলা ও হায়দারাবাদের মধ্যে। ফারুক ভাবে বোঝালেন, ও-খেলার ফলাফল জানাই আছে, বাংলার পরাজয় অবধারিত, সুতরাং—ওয়েল জয়সীমা, তোমরা বোম্বায়ে খেলতে আসছ তো?

কথাটা সহ্য হল না কিং-এর, তিক্ত লাগল পঙ্কজের। বোম্বায়ের ছোকরাগুলোর অহঙ্কারের সীমা নেই। মনের রাগ চেপে পঙ্কজ বললেন, আচ্ছা দেখাই যাক কি হয়। কিং বললেন খোলা গলায়, 'তার মানে, তুমি বলছ কি? আমরা কি টিম নই নাকি?'

সে কথায় কোনো কান না দিয়ে চতুর চাপা হাসি হেসে ফারুক পূর্ববৎ জয়সীমার সঙ্গে সেমিফাইন্যালের মাঠ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন—তখন কিং চড়া গলায় বললেন—'দেখ ফারুক, জেনে রেখো, ব্যাপারটা অত সোজা হবে না। আমরাও খেলতে জানি।'

'তো-ম-রা!'—এতক্ষণে ইঞ্জিনীয়ারের যেন খেয়াল হল—'তোমরা হায়দারাবাদকে হারাবে? তোমাদের দলে আছে কি? আর হায়দারাবাদে নেই কে?...জয়সীমা...বেগ...অ্যান্ড গ্রেট গিলক্রিস্ট...'

'কেন আমাদের শ্যামসুন্দর আছে—'

'নামই শুনিনি। নেভার হার্ড অব্‌ হিম।'

'পোদ্দার আছে—'

'হ্যাঁ, ভারতীয় দলে একবার দ্বাদশ-ব্যক্তি ছিল বটে!'

'অম্বর রায় আছে—'

'স্কুলক্রিকেটার।'

'আমরাও আছি—আমি, পঙ্কজ—'

'হ্যাঁ—আ! ঠিক। তুমি কিছু বল দেবে, রায় খানিক আটকাবে, তারপর ঝরঝরে...'

'অত সস্তা নয়, যা ভাবছ—'

হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জন—টেবিলের প্রান্ত থেকে—'সাট আপ! মেরে মাথা ভেঙে দেব তোমাদের—।' সবাই চমকে উঠল। গিলক্রিস্ট বোমার মতো ফেটে পড়েছেন—'দেখে নেব বাংলাকে। শোধ তুলব তোমাদের ওপর। খেলা শেষ হবার আগে যাতে তোমাদের আধখানা দল হাসপাতালে গিয়ে ঢোকে তার ব্যবস্থা করব।'

সকলে হতবাক। পঙ্কজের পাশে ছিলেন তাঁর রুমমেট বিজয় মেহরা।—

'লোকটা বলে কি?'—সবিস্ময়ে পঙ্কজ মেহরাকে শুধোলেন। গিলক্রিস্ট তখনো চেঁচাচ্ছেন—'মেরে ফেলব, মাথা ফাটিয়ে ছেড়ে দেব তোমাদের—'

কিং-এর সহ্য হল না। সজোরে প্রতিবাদ করলেন, 'বাজে বকো না। বাউন্সার আমরাও দিতে জানি। ওটা তোমার একচেটে নয়।'

কে কার কথা শোনে! গিলক্রিস্ট বাংলার উপর খাপ্পা। তাঁর সঙ্গে বাংলার কর্তাদের বিবাদ হয়েছিল। কলকাতার হোটেলেও তাঁর ব্যবহার নিয়ে ঝঞ্ঝাট হয়। বাংলাকে তাই তিনি একবার দেখে নেবেন। হুঙ্কারের পর হুঙ্কার: 'ইডেনের ঐ খেলাটাই ভারতে আমার শেষ খেলা। যাবার আগে দেখিয়ে দিয়ে যাব। বাছাধনরা টের পাবে। বুঝবে কাকে বলে বাউন্সার আর বীমার।'

খাওয়ার টেবিলে বিশ্রী পরিস্থিতি। পঙ্কজ বিশেষ অপমানিত বোধ করলেন। বোম্বায়ের ছেলেগুলোর অসহ্য অহঙ্কার, তার উপর গিলক্রিস্টের বর্বর আস্ফালন। অথচ লোকটা সত্যই মারাত্মক। বুদ্ধিবিবেচনাহীন, ধর্মাধর্মজ্ঞান-হীন, খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির লেশমাত্র নেই। সারা পৃথিবীর সবচেয়ে ধিক্কৃত খেলোয়াড়। লোকটা মাথা ফাটাতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওকে শায়েস্তা করাও দরকার। বাম্পারের প্রতিশোধ হুক, বীমারের উত্তর সেঞ্চুরি। 'একটা কিছু উত্তর দেবই দেখো'—পঙ্কজ তাঁর রুমমেট বিজয় মেহরাকে রাত্রে বললেন। —সেঞ্চুরি করবই, যদি অঘটন না ঘটে, বললেন মনে-মনে।

গিলক্রিস্ট যে বাজে তড়পান না, তার কিছু নমুনা গিলক্রিস্ট কানপুরের খেলার মাঠে অনতিবিলম্বে দিলেন। ঐ খেলায় ছয় বলের বদলে আট বলে ওভার হবে ঠিক হয়েছিল। গিলক্রিস্টের একটি ওভারের প্রথম বলে একজন ফিরে যাবার পরে পঙ্কজ ব্যাট করতে নামলেন। গিলক্রিস্টের সাতটা বল বাকি। প্রদর্শনী খেলা। পঙ্কজের ইচ্ছা, একটা আকর্ষক ইনিংস খেলেন।

গিলক্রিস্ট দৌড়ে আসছেন, পঙ্কজ দেখলেন, সেই পুরনো দৈত্য, এখনো দেবতা নয়, পঙ্কজের বিরুদ্ধে প্রথম বল—বাপ্—একি! বিষাক্ত লাল কেউটের মতো বাউন্সার লাফিয়ে উঠল। একেবারে প্রথম বলেই? প্রদর্শনী খেলায়! তবু পঙ্কজ হাসলেন। খাওয়ার টেবিলের ব্যাপারটা ওর মাথা গরম করে রেখেছে। গোড়াতেই ভয় পাইয়ে তামাশা জিইয়ে রাখতে চায়। পঙ্কজ এবার দ্বিতীয় বলের জন্য প্রস্তুত...গিলক্রিস্ট আবার ছুটে আসেন...একটা কামানের গোলা ছুটে এল সোজা বুকের উপর, মাটিতে না পড়েই—সর্বনাশ! বীমার! বাউন্সারের পরেই? পঙ্কজ তাকালেন অধিনায়ক উমরিগরের দিকে। উমরিগর অন্যমনস্ক থাকায় (!) চোখাচোখি হল না। তৃতীয় বল আবার বীমার—মাথার উপর। চতুর্থ সাধারণ। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাউন্সার ও বীমার। সপ্তম সাধারণ। গিলক্রিস্টের ওভার শেষ হল। অনেকখানি পরিশ্রম করে গিলক্রিস্ট ক্লান্ত। অধিনায়ক উমরিগর তাঁকে সাময়িক বিশ্রাম দিলেন।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠে পঙ্কজ ভাবলেন, এর মধ্যেই খেলতে হবে এবং ভালো খেলতে হবে। পঙ্কজ মোটামুটি বেশ খেললেন। সেঞ্চুরি না হলেও ভদ্রসংখ্যার রান হল। তাঁর ফর্ম দেখে পুরনো বন্ধুবান্ধবেরা খুশি। কিন্তু পঙ্কজের মাথায় চেপে রইল একরাশ চিন্তা। হায়দারাবাদকে হারানো যায় কিভাবে? গিলক্রিস্ট ছেড়ে দেবে না। ফার্নেসের মতো তার মেজাজ। রাত্রে শোয়ার

আগে কিং-এর সঙ্গে তার একদফা প্রায় হাতাহাতি হয়ে গেছে। মাঠের বাইরে দিনের বেলায় সত্যই হাতাহাতি করেছে। কদর্য ব্যাপার, প্রায় পুলিস-কেসে পৌঁছেছিল। গিলক্রিস্ট গিয়েছিলেন পোস্টঅফিসে। সেখানে পাবলিকের সঙ্গে কি একটা নিয়ে তর্ক শুরু হতেই এই মাথাগরম লোকটি মুখের সঙ্গে হাত চালাতে শুরু করেন, তাই নিয়ে শহরে উত্তেজনা...

বাংলার অধিনায়ক পঙ্কজ রায় যখন কানপুর থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন, তখন তাঁর থেকে উদ্বিগ্ন মানুষ আর কেউ ছিল না। চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে হবে, হায়দারাবাদের বিরুদ্ধে ভাল-কিছু করতেই হবে, কিন্তু কিভাবে? গিল-ক্রিস্টের আস্ফালনের খবর কলকাতায় পৌঁছতে দেরি হবে না। আর সেটা যে মোটেই আস্ফালন নয়, কথায় ও কাজে যে গিলক্রিস্টের মারাত্মক মিল আছে, তা কার অজানা? পঙ্কজের বুকের পাশ দিয়ে, মাথার উপর দিয়ে যেগুলো বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই রঙের কাঠির যে-কোনো একটির ছোঁয়াতেই চিরনিদ্রা। গিলক্রিস্টের বিরুদ্ধে অনভিজ্ঞ ছেলেগুলো খেলবে কি করে, যেখানে পোড়-খাওয়া টেস্ট-ক্রিকেটাররা আঁতকে ওঠে আতঙ্কে?

গিলক্রিস্টের মধুর কামনার কথা কলকাতায় এসে পৌঁছল যথাসময়ে। তাঁর কাম-মধুরতার বার্তা শুনে বঙ্গ-যুবকগণের দেহে-মনে শিহরণ জাগল। খেলা শুরুর আগে কতকগুলো ক্রিকেট-বল নিয়ে লোফালুফি করতে-করতে আকর্ণ-বিস্তৃত আনন্দে গিলক্রিস্ট শুধোলেন, 'আচ্ছা বল দিকি, এর মধ্যে কোন্‌টা পঙ্কজ রায়ের মাথা ভাঙতে পারবে?'

টসে জিতেও জয়সীমা বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছেন—গিলক্রিস্টের তাজা আগুনে ওদের সকালবেলাতেই ভেজে নেওয়া যাক। খেলা শুরু করতে নামবে কারা বাংলার পক্ষে—সেই দুই হতভাগ্য কে? পতাকাবাহী হওয়ার ট্রাজিক মহিমা কোন্ দুজন বরণ করবে? পায়ের প্যাড বুকে বেঁধে সম্ভাব্য ওপেনাররা প্রাকটিস শুরু করে। বাতাসের সরোবরে ওপেনার-হংসেরা ডুব দেয় মুহুর্মুহু —ডোবার অনুশীলন। যার ফুটবলেও আসক্তি আছে সেই ক্রিকেটার ভাবল—ছিলুম ভাল, খেলছিলুম বড় বল, বিপদ শুধু ছিল ঠ্যাঙের, এখন ছোট বল খেলতে এসে যে প্রাণ যায়! পিং-পং খেলায় যার পক্ষপাত, সে-ক্রিকেটারের চিন্তা: নেচে-নেচে ছোট বল খেলতুম। সেখানেও ব্যাট ছিল, বল ছিল, গায়ে আঁচড়টি লাগেনি কোনোদিন। এখন বড় ব্যাট বড় বলের লোভে পড়ে কী শাস্তি দেখ! প্যারাসুট সৈন্যের মতো সবাই পাংশুমুখে ঝাঁপ দিতে অধীর—পঙ্কজ বললেন—'আমিই যাই।' কর্তারা গররাজি।

'না, তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি অনেকদিন ওপেন করনি।'

'কিন্তু আমি ফাস্টবোলিং সবচেয়ে বেশি খেলেছি।'

'তাহলেও গোড়ায় নামা রিস্কি। তোমার আউট মানে টিম ধ্বসে যাওয়া।'

'আউট যে-কোন সময়েই হতে পারি। আমিই যাই।'

গিলক্রিস্টের মুখে দাঁড়াতে হবে, দলকে বাঁচাতে হবে, এবং পারলে সেঞ্চুরি করতে হবে—কঠিন প্রতিজ্ঞায় পঙ্কজের পেশী-স্নায়ু-তন্ত্রী স্থির।

সূচনাতেই ভয়াবহ বাউন্সার এল যথারীতি। তখনো চোখ ঠিক হয়নি। বুকের বাঁ পাশ দিয়ে লাফিয়ে-ওঠা বলটা থেকে শরীর বাঁচাতে পঙ্কজ হাতসুদ্ধ ব্যাট

তুলেছিলেন, গ্লাভসে লেগে বলটা একটু লাফিয়ে উঠেছিল, ফাস্টবোলিংয়ে স্লিপ অনেক পেছিয়ে থাকার জন্য বলটা তাদের নাগালের মধ্যে যায়নি (এবং ঐ ক্যাচ নীল হার্ভে ছাড়া ধরা কারো সাধ্যে নেই, একথাও বলা হয়েছে), তবু সেইটেই সামান্য একটু চান্সের মতো ছিল, পঙ্কজের বাকি ইনিংস অনন্য-সাধারণ। ক্রিকেটের অসাধারণ ইনিংস, পারিপার্শ্বিক বিবেচনা করলে। যোগ্য-ভাবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্রকাশ পোদ্দার ('হ্যাঁ, একবার দ্বাদশ ব্যক্তি ছিল বটে'), শ্যামসুন্দর মিত্র ('নেভার হার্ড অফ হিম')। পরে এসে খেলার আকর্ষণীয়তা বাড়িয়েছিলেন চুণী গোস্বামী, ফুটবল-মাঠের নিত্য আকর্ষণ।

পঙ্কজের সেঞ্চুরি-সহ বাংলা গণ্যসংখ্যক রান করল প্রথম ইনিংসে, ৩৮৬। গিলক্রিস্ট কি করলেন? নিশ্চয় উইকেট নিলেন অনেকগুলি (৫-১২৪), কিন্তু স্মরণীয় হয়ে রইল তাঁর বাকি কাজগুলি। সে এক কুৎসিত হিংসার কাহিনী, খেলাকে নরঘাতনে রূপান্তরিত করার কদর্য ইতিহাস। উইকেট আর সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল না—যতক্ষণ ব্যাটসম্যানের শরীরের উইকেট আছে, বিশেষত মাথার খুলির বেল। ঐ বেলকে বল দিয়ে উড়িয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন গিল-ক্রিস্ট—সেক্ষেত্রে একটা লোক (ঠিকভাবে বলতে গেলে, বিশেষ লোকটা) সেঞ্চুরি করে যাবে চোখের সামনে দিয়ে? বল ছুঁড়ে গেছে উন্মাদ দানব—আবেদন জানিয়েছে নারকীয় কণ্ঠে—আবেদন অগ্রাহ্য হলে আম্পায়ার ও খেলোয়াড়দের বাপান্ত করেছে—দর্শকেরা প্রতিবাদ করলে থুতু ছিটিয়ে চেঁচিয়েছে—একটা ছোট ছেলেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—ভেঙে দিয়েছে ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা—দর্শকদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাদের দিকে ফ্লাগপোস্ট উপড়ে নিয়ে বর্শার মতো ছুঁড়ে মেরেছে। ভারতবর্ষ শিক্ষকরূপে গিলক্রিস্টকে আমন্ত্রণ করেছিল, টাকাও দিয়েছিল যথেষ্ট, ভারতীয় ক্রিকেট যোগ্য শিক্ষা পেল।

বাংলার প্রথম ইনিংসের ৩৮৬ রানের যোগ্য উত্তর দিল হায়দারাবাদ। যে দলে আছেন জয়সীমা (৬৫), আব্বাস আলী বেগ (৫৩), তাঁরা ছেড়ে দেবার পাত্র নন। ক্রিকেটের অভাবনীয়তা বজায় রেখে অপরিচিত মহিন্দরকুমার করলেন নটআউট ৭০। হায়দারাবাদের ইনিংসের শেষের দিকে বাংলার পক্ষে খুব একটি সঙ্কটক্ষণ গেল। হায়দারাবাদ বাংলার ইনিংস ছুঁয়ে ফেলে বুঝি—যদি একবার প্রথম ইনিংসের রান পেরোতে পারে, তাহলে বাংলার অব্যর্থ হার। হায়দারা-বাদের ইনিংস শেষ হল ৩৬১ রানে, বাংলার থেকে মাত্র ২৫ রান পেছিয়ে। পঙ্কজ কপালের ঘাম মুছলেন।

বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা সম্ভব হল না পঙ্কজের পক্ষে—ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছেন। সারাদিন স্নায়ু-সংগ্রাম, চড়া রোদে ফিল্ডিং, আর সারা রাত্রির জাগরণ। রাত্রি-জাগরণ? অতি বেদনার ব্যাপার: পঙ্কজ যখন হায়দারাবাদের সঙ্গে লড়ছেন, তখন তাঁর বাড়িতে গুরুতর অসুখ। রাত্রি জেগে শুশ্রূষা করতে হচ্ছে অন্যান্যের সঙ্গে পঙ্কজকেও। বিনিদ্র রাত্রির শেষে দিনের বীভৎস ক্রিকেট।

অসুস্থ পঙ্কজ রায়ের চোখের সামনে ৪২ রানের ভিতরে বাংলা চারটে উইকেট যেন উড়ে গেল পলকের মধ্যে। ঝড়ো হাওয়ার মতো হা-হা-হা করলেন গিল-ক্রিস্ট। গিলক্রিস্টের বলের সামনে থেকে প্রত্যাবর্তনপর বেপথু বালকদের দিকে চেয়ে পঙ্কজ উঠে পড়লেন। ভেবেছিলেন বিশ্রাম নিয়ে পরদিন সকালে নামবেন:

অবস্থা দেখে সন্ধ্যাকে সকাল করে 'নৈশ প্রহরী' এবং দিবসের রক্ষক পঙ্কজ রায় মাঠে নামলেন। কোনোক্রমে বাকি সময় কাটিয়েও দিলেন। তারপর রাত্রির বিশ্রাম? না, সে রাত্রিও কাটল বিনিদ্র—অসুস্থ আত্মীয়ের শুশ্রূষায়।

সকালে ক্রিকেট। আবার ক্রিকেট। চতুর্থ দিন। শরীর যায় যাক, মাঠে লুটিয়ে পড়তে হয় পড়ব, কিন্তু হারবো না বর্বরতার সামনে। পঙ্কজ তোমার শেষ শক্তি সঞ্চয় করো, মনঃসংযোগ করো—আরও—আরও—আরও—জীবনের ইনিংস খেলছ তুমি—তুমি খেলছ প্রতিজ্ঞার ইনিংস—Roy for reliability, ycs, Roy for reliability.

পঙ্কজ তাঁর জীবনের ইনিংস খেলছেন। আঘাতে, আত্মরক্ষায়, সাহসে, সংযমে সুমহান সৃষ্টি। পঙ্কজ আবার সেঞ্চুরি করলেন। গিলক্রিস্টের বন্য হুঙ্কার, অশ্লীল গালিগালাজ, প্রমত্ত বাম্‌পার, এবং সত্য-সত্যই খুন করার চেষ্টা—

এ কথাটা পঙ্কজ নিজে বলেছেন। দর্শকেরা দেখেছিল, একবার গিলক্রিস্ট বহুদূর থেকে দৌড়ে এসে ক্রীজের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে পড়েছিলেন, কিন্তু বল দেননি। দর্শকেরা এইটুকুই দেখেছিল—পঙ্কজ আর একটু বেশি দেখেছিলেন। পঙ্কজ বললেন, 'ব্যাপারটা আমি আঁচ করতে পেরেছিলাম। গিলক্রিস্টের কাছ থেকে কোনো কিছুই তখন আর আশ্চর্যের নয়। যে-খেলায় তার সঙ্গে নেমেছি, তাতে প্রাণের ভয়টাকে কমিয়ে আনতেই হয়। তবু যখন তাকে স্ক্রীনের ধার থেকে দৌড়ে আসতে দেখলাম, তখন কেমন একটা আনক্যানি ভাব জাগল। তারপর যখন সে বল না দিয়ে ক্রীজ পেরিয়েছে, তখনি যেন বুঝলুম তার উদ্দেশ্য—আমাকে একেবারে শেষ করে দিতে চায়। সহসা পুরনো ঘটনা ঝলসে উঠল মনে। ল্যাঙ্কাশায়ার-লীগে একবার যখন সে শেষওভারে আউট করতে পারছিল না একটা সতেরো বছরের ছেলেকে, তখন রাগে অন্ধ হয়ে ক্রীজের মধ্যে ঢুকে পড়ে ১৫ গজ দূর থেকে সোজা বল ছুঁড়ে মেরেছিল বাচ্ছা ছেলেটিকে। অত কাছ থেকে ছুঁড়ে মারায় ছেলেটি এতটুকু নড়তে পারেনি। তার তিনটে পাঁজরা চুরমার হয়ে যায়। পরে এর জন্যে গিলক্রিস্টকে সাসপেন্ড করা হয়। মুহূর্তে মনে হল, আমার ক্ষেত্রেও একই জিনিস ও করতে চায়। পালানোই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। চলন্ত জিনিসকে মারতে পারবে না!'

পঙ্কজ হেসে বললেন, 'পালিয়ে গেলুম লেগ-আম্পায়ারের দিকে। গিলক্রিস্ট শিকার সরে যাওয়ায় গুলি ছুঁড়ল না।'

গিলক্রিস্ট পঙ্কজকে পরেও বল দিয়েছিলেন। ছুঁড়ে বল মারার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় আন্ডারহ্যান্ড বল করে অপমান করার চেষ্টা করেছিলেন। পঙ্কজ মনে-মনে বলেছিলেন, রাউন্ডহ্যান্ড, আন্ডারহ্যান্ড—যে হ্যান্ড শেকই করো না কেন—আমি নড়ছি না।—মনঃসংযোগ আনো পঙ্কজ, মনঃসংযোগ আনো। পঙ্কজ বললেন, 'না, অযথা উইকেট খোয়াবার কোনো বাসনা আমার ছিল না।'

দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে, নিজেকে এবং বাংলাকে রক্ষা করে, স্নান শেষে যখন প্রায়-অশক্ত দেহটাকে টেনে এনে প্যাভিলিয়নের ইজিচেয়ারে লুটিয়ে দিয়েছেন পঙ্কজ রায়—তখনি তিনি প্রথম ঠিকভাবে দেখলেন কারা-কারা এবং কতজন খেলা দেখতে এসেছে। কথাটি নিতান্তই সত্য।

মনঃসংযোগ আনো পঙ্কজ, মনঃসংযোগ আনো। এনেছিলেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে হায়দারাবাদ একেবারে দাঁড়াতে পারেনি। ডি এস মুখার্জির বোলিংয়ে (৪-২৩) একেবারে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। করেছিল মোট ১২১, হেরেছিল ১৮৪ রানে।

কাহিনী শেষ করা মাত্র কর্ণপীড়ন। চমকে দেখলুম বিকট মুখব্যাদান করে আমার ছোট-আমি দাঁড়িয়ে...'হলো তো?' ব্যাদিত মুখ সংবরণ করে, দাঁতে দাঁত পিষে ছোট-আমি বলল—'বাঃ বেশ! ক্রিকেটের গোটা স্ক্যান্ডালটা হাট করে দিলে! বক্সিংয়ের চেয়ে বীভৎস করে তুললে ক্রিকেটকে। এখন দেখা যাবে ভবিষ্যতে কি করে ক্রিকেটের গুণ গাও একই মুখে? তোমার কোন ইয়ে—বড়ো-আমি—তোমাকে বাঁচায় দেখব!'

কান ভয়ানক জ্বলতে লাগল। নিজের পায়ে কুড়ুল মারবার পরে কাটা পা-টা যে আমারই তা বুঝতে পারলুম। অনুতাপে জ্বলছি—এমন সময়ে প্রথম বর্ষার কাদম্বিনী-ধ্বনিবৎ স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ—

'শৃণ্বন্তু, শৃণ্বন্তু, আমি বড়ো-আমি বলিতেছি। কী দুর্ভাগ্য, তুমি গিলক্রিস্টের রক্তাক্ত হিংসাকেই দেখিলে, কিন্তু পঙ্কজের বীরের প্রতিজ্ঞাকে দেখিলে না। ক্রিকেট গিলক্রিস্টদের লইয়া নহে, পঙ্কজদের লইয়া। শৃণ্বন্তু, শৃণ্বন্তু...'

* * * কালো আগুনের ঝলক * * *

গিলক্রিস্ট সজোরে বললেন—হাঁ, বীমার আমি দিই, ইচ্ছে করেই দিই—

বী-মা-র! ইচ্ছে করে? যে বীমার শরীর লক্ষ্য করে ভয়ঙ্কর বেগে বল-ছোঁড়া ছাড়া আর কিছু নয়—সেই বীমার? তার মানে, ইচ্ছে করে মানুষ ঘায়েল করার চেষ্টা খেলার মাঠে???

—আমি ওসব জানি না। দেখাতে পারো, ক্রিকেট-আইনের কোথাও লেখা আছে বীমার দেওয়া যাবে না? কোথাও নেই। আমি অনেক ঘেঁটে দেখেছি—গিলক্রিস্ট নির্ঘোষ তুললেন।

তাই বলে খেলার মাঠে মানুষ খুন করতে চাইবে, আইনে নিষেধ নেই বলে? আইনে নিষেধ থাকবে কি করে? খেলার মাঠে মানুষ মারা উদ্দেশ্য হতে পারে, এ তো কোনো ক্রীড়ানীতি-প্রণেতার মাথায় আসার কথা নয়!

—জানি না, জানি না, অতসব বুঝি না, আইন দেখাও—

ক্রিকেট মানে সদাচার, এ তো জানো—

—বাঃ বাঃ বাহবা! ক্রিকেট মানে সদাচার? তাই বুঝি তোমরা, ক্রিকেটের আইন-প্রণেতাদের দেশের লোকেরা তোমরাই বডিলাইন উদ্ভাবন করেছিলে, এবং...গিলক্রিস্ট মহাসুখে হাসেন...অন্যদিকে বডিলাইন-বিরোধী অস্ট্রেলিয়ার মিলার-লিণ্ডওয়াল বেনামী বডিলাইন চালিয়েছিল ইংলণ্ডে?...

...আর হে ইংরেজ-প্রভুরা, তোমাদের ক্রিকেট-আইন তো অনেক চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারলুম না, কি করব আইনস্টাইন তো নই। ওয়েস্টইণ্ডিয়ানের পক্ষে তোমাদের নীতিধর্ম বোঝা বড় শক্ত। তোমাদের এবং আমাদের ক্রিকেট একই বই থেকে আসেনি। তোমাদের এবং আমাদের পদ্ধতি এক নয়। আমরা

প্রায় সবাই স্ফূর্তিবাজ লোক। মাঠে হয়ত একটু-আধটু মাথাগরম করি, কিন্তু মাঠের বাইরে তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে আমাদের এতটুকু দেরী হয় না। আর তোমরা...

এ-সব কথা কিন্তু একদম বানাচ্ছি না। এ-সবই গিলক্রিস্টের মুখের কথা, ছাপার অক্ষরে আছে, না থাকলে পাঠকের মতোই আমার পক্ষেও সত্য বলে বিশ্বাস করা কঠিন হত—সত্যই কেউ বীমার-নামক বর্বর ব্যাপারটিকে সমর্থন করতে পারে সজোরে সদম্ভে! গিলক্রিস্ট করেছেন। ওয়েস্টইণ্ডিজের অধিনায়ক আলেকজাণ্ডার যখন তাঁকে বীমার দিতে নিষেধ করলেন, তখন গিলক্রিস্টের বক্তব্য—

'হ্যাঁ, বীমার জঘন্য বল, নিশ্চয়ই, বিশেষত তা যখন আ-মা-প্র হাত থেকে মাথা-সমান উঁচু হয়ে ব্যাটসম্যানের দিকে ছুটে যায়। কিন্তু আমি নিয়মের বই তল্লাস করেছি ; তাদের মধ্যে একটিতেও লেখা নেই—ব্যাটসম্যানের দিকে দ্রুত-গতি ফুলটস বল নিষিদ্ধ।'

আবার বলছি, বিশ্বাস করা কঠিন, কোনো খেলোয়াড়ের মুখ থেকে কথাগুলি বেরিয়েছে। এর পক্ষে একমাত্র প্রশংসা সম্ভব—এটি সরল বর্বরতা। যদি একে শয়তানি বলি, এর নাম সহজ শয়তানি।

গিলক্রিস্ট সরলতার, সহজতার পক্ষপাতী। তাই মাটিতে ধাক্কা খাওয়ার জন্য বাম্পার বলে সামান্য যেটুকু জটিলতার সৃষ্টি তাকেও দূর করতে চেয়েছেন সোজা ছুঁড়ে মেরে।

বলাবাহুল্য এহেন জৈব সরলতা ভণ্ডামির শত্রু। গিলক্রিস্ট বিদ্রূপের হাসিতে আকুল...না, তিনি হাসেন নি যখন বার্বাডোজের জর্জ রক একওভারে চারটি বীমার দিয়েছিলেন, কিন্তু—হাঃ হাঃ হাঃ, কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ—ছোকরা বলে কি—হাত ফসকে ঐ চারটি বীমার বেরিয়ে গেছে? হাঃ হাঃ হাঃ, চেপে যাও ভায়া। আমারও ঐ কথা বলার ইচ্ছে হয়েছিল আলেকজাণ্ডারকে, যখন বীমার দেবার জন্য আমাকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিলেন তিনি—কিন্তু...ব্রাদার, বীমার তো হাত ফসকে বেরোয় না!!

ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া? হ্যাঁ। গিলক্রিস্টের ঠোঁটে বিষ ঝরে ভারতের নামে। 'আমার পুরনো শত্রু ভারতীয়রা', গিলক্রিস্ট বলেন। আবার ভারতবর্ষই গিলক্রিস্টের অভ্যুদয়ক্ষেত্র। সূতিকা ও শ্মশান, একই স্থানে, ভারতবর্ষে। সে কথা পরে। এখন মানুষটিকে আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখার চেষ্টা করা যাক।

'দানব'—গিলক্রিস্ট সম্বন্ধে পৃথিবীর মানুষের একটিই সিদ্ধান্ত। ব্যাটসম্যানকে তাঁর মতো ঘৃণা আর কেউ করেননি, প্রতিদানে এত ঘৃণাও বোধহয় কেউ পাননি। হিংসা, নিষ্ঠুরতা, বিক্ষোভ, বীভৎসতা—গিলক্রিস্টের কয়েকবছরের ক্রিকেট-জীবনের বাণী। ক্রিকেটের ইতিহাসে এত ধিকৃত হননি আর কোনো খেলোয়াড়, যাঁকে তিনবার সাসপেণ্ড করা হয়েছে। গিলক্রিস্ট নিজের সঙ্গে শাস্তিপ্রাপ্ত অন্য খেলোয়াড়দের একবন্ধনীর মধ্যে আনতে চেয়েছেন—অমরনাথকে, ওয়ার্ডলেকে, সিসিল পেপারকে। গিলক্রিস্টের এই গায়ে-পড়া আত্মীয়তাকে নিশ্চয় ঐ খেলোয়াড়রা গায়ে জড়িয়ে নেবেন না—গিলক্রিস্টের

গায়ের চামড়া কালো বলে নয়, তাঁর খেলার চামড়া কালো বলে। অমরনাথ প্রভৃতির বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ কতখানি সত্য সে-বিষয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু গিলক্রিস্ট তাঁর অন্যায়কে প্রগল্‌ভ হাস্যে উম্ঘাটিত করেছেন স্বয়ং, অলজ্জ ভাষণে।

গিলক্রিস্ট বলেন, ক্রিকেট তাঁর কর্ম, মর্ম, ধর্ম, সব কিছু। 'Cricket is all I ever had in my head. Cricket is my king, my religion, my ilfe.'

ক্রিকেট তাঁর ধর্ম, ঠিক, তাই ধর্মান্ধতায় তাঁর স্বাভাবিক অধিকার।

রয় গিলক্রিস্ট নামক একটি ওয়েস্টইণ্ডিয়ান বালকের বাল্য-স্মৃতিকথায় প্রত্যাবর্তন করলে দেখব—সে জন্মেছে এমন এক স্থানে, যা ওয়েস্টইণ্ডিজে অপরিচিত স্থান নয়। বিখ্যাত জনৈকের আবির্ভাব-স্থান রূপেই তার খ্যাতি, তবে খ্যাতির ভিত্তি...অমানুষিকতায়। এই রোজহল জায়গাটি পরিচিত 'শ্বেত ডাইনী' অ্যালিস পামারের জন্য। অ্যালিস পামার দাসদের উপর এমন ভয়ঙ্কর অত্যাচার করতেন যে, অবশেষে তারা বিদ্রোহী হয়ে অ্যালিস পামারকে মেরে ফেলে।

যে-ভাবেই হোক, জায়গাটা বিখ্যাত—গিলক্রিস্ট গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। আর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, 'শ্বেত ডাইনীরা" ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর সর্বত্র। জানি না, গিলক্রিস্টের হাতের বলে সেই অবজ্ঞার ও উৎপীড়নের প্রতিবাদ ছিল কি না!

আর পাঁচজন স্ফূর্তিবাজ ছোকরার মতোই গিলক্রিস্টের প্রথমজীবন কেটেছে। গিলক্রিস্টের ডাক-নাম গিলি। তপ্ত সুন্দর দিনে ক্রিকেট খেলা, সন্ধ্যেয় ব্রিজের উপর বসে চটকদার মেয়েদের পিছনে 'উঠতি গুণ্ডার' মতো ঠাট্টা-ফটকিরি করা, রাত্রে কোনো একটি ভালো উইকেট নেওয়ার বা চমৎকার বাউণ্ডারি করার স্বপ্ন জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা—অন্য অনেক ছেলের মতোই গিলির এই প্রথমজীবন। উষ্ণ শ্বাস, ও বর্ণমাধুরী নিয়ে এই দিনগুলি গিলির মনের আকাশে রামধনু হয়ে জেগে থাকে সর্বক্ষণ।

'Those were the milk-and-honey days; the days that always seem so good when you look back on them; days when it was always sunshine and cricket—before Test matches and Test tours throw a shadow over a man and tensed him up'.

গিলি শুরু করেছিলেন অফব্রেকের বোলার-রূপে। ক্রমে দেখলেন, অফব্রেকের ছোবল অপেক্ষা ফাস্টবলের বলশালিতায় তাঁর স্বাভাবিক অধিকার। অথচ গিলির আট স্টোনের মাঝারি চেহারার মধ্যে ঐ দানবীয়তার শারীরিক স্বীকৃতি ছিল না। ফলে অনেকেই সন্দেহ বোধ করেছেন—সত্যই কি এর পক্ষে ফাস্ট-বল দেওয়া সম্ভব? গিলক্রিস্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবশ্য সে সন্দেহ বেশি-ক্ষণ সশরীরে বর্তমান থাকেনি।

একই সন্দেহ আমাদের বামন দেশাইয়ের চেহারা দেখেও। নিজের দিকে তাকিয়ে গিলক্রিস্ট বামন দেশাইয়ের স্তুতি করেছেন—"ছোট্ট এক খণ্ড মানুষ—দেশাই তাঁর নাম—তিনি ৬০ রানে পাঁচটি উইকেট নিলেন (ওয়েস্টইণ্ডিজ—মহারাষ্ট্র খেলা, ১৯৫৯)। মানুষটি বামনাকার হতে পারেন, কিন্তু তাঁর

কলিজা এত বেশি যে, দৈত্যের বুকেও ধরবে না। তার প্রমাণ আমাদের দেখালেন ঐ খাটো মানুষটি, ইংরেজদেরও, যখন ১৯৫৯ সালে তিনি ইংলণ্ড গেলেন। যদিও তিনি মিডিয়াম-পেসের চেয়ে অল্প বেশি জোরে বল করেন, তথাপি তারই মধ্যে দু'-একটা বিশ্রীরকম বাম্পার দিতে পারেন।"

বালক গিলি ক্রমেই পুরুষ হয়ে উঠলেন। আমি পুরুষ হয়ে উঠছি...রক্তে বাজতে লাগল...I was growing up, growing up...

মেয়েদের সঙ্গে খেলাটা এইকালেই তিনি খেলেছিলেন। প্রেমের খেলার কথা বলছি না, ক্রিকেট খেলা।—গিলক্রিস্টের মুরুব্বি মিঃ স্টুয়ার্ট একদিন একটি ক্রিকেট-ম্যাচের ব্যবস্থা করলেন, মেয়েদের সঙ্গে। তবে, মেয়েদের সঙ্গে খেলা বলে, বলে-ব্যাটে ছেলেদেরও বামা হতে হবে। আর...বাঁ-হাতে ব্যাট ও বল ক'রে পুরুষরা...হারল! গিলি বলেছেন, "হাঁ, আমরা হারলুম, ধাড়ি-ধাড়ি সব ছেলেরা, যারা স্থানীয় ক্রিকেট-প্রতিযোগিতার মস্তান খেলোয়াড়। এর বেশি লজ্জার কথা জানতে বাসনা আছে? মিঃ স্টুয়ার্ট অবশ্য পরাজয়ের হাত এড়িয়েছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন আম্পায়ার। এবং একগুচ্ছ বালিকার কাছে আমাদের পরাজয়-কর্মটি সুসম্পন্ন করালেন। একথা ঠিক, সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আম্পায়ার নারীঘটিত উদারতা দেখিয়েছিলেন। তাহলেও মনে রাখবেন, জামাইকার মহিলা-গণ ক্রিকেটে মোটেই অবলা নন। দুলসী নামক পিঙ্গল-নয়না বালিকাটির কথাই ধরা যাক না কেন। সে তো আমাদের ছেলে-দলেই খেলত। চতুর্দশী সে, আহা যেন ছবি! সে ছিল উইকেটকীপার, ক্যাচ ধরত অদ্ভুত। ব্যাট করতে নামত চার নম্বরে। আমরা যখন বাইরে খেলতে যেতুম, দুলসীও সঙ্গিনী হত, যেখানে ১৪।১৫ মাইল কণ্টকর হাঁটুনি—সেখানেও।"

কুমারী দুলসী গিলি-প্রমুখের বীররক্তের তলায় চুল্লীরূপেণ সংস্থিতা ছিলেন সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয়, জামাইকার বাইরে গিলক্রিস্ট মহিলা-দর্শি-কার অধিক অনুরাগ লাভ করেননি। গিলক্রিস্টের কাণ্ড বোধহয় ঐসব ক্ষেত্রে মহিলাদের ষণ্ডযুদ্ধ-প্রীতির উদ্দীপনাকেও অভিভূত করে ফেলেছিল। ইংলণ্ডে লীগ-ক্রিকেটে যখন গিলি ইংরেজনন্দনদের মাথা বুক লক্ষ্য করে কালো হাতে লাল গোলা ছেড়েছেন, তখন, গিলক্রিস্ট বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করে-ছিলেন, মেয়েদের কান্নাকাটির শেষ ছিল না। 'খুনে গিলক্রিস্ট' বলে তারা মহা চেল্লাচেল্লি করত। গিলক্রিস্টের নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল, কুমারী দুলসী কদাপি এমন করতেন না।

জোর বল দিতে-দিতে একদিন গিলক্রিস্ট টেস্ট-ক্রিকেটে ঢুকে পড়লেন। ঢোকার মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে দুটি লোককে সবচেয়ে অপছন্দ করলেন। তাঁদের একজন ইংরেজ—গেরী আলেকজাণ্ডার, অন্যজন ভারতীয়—সোনী রামাধীন। এই দুজনকে গিলক্রিস্ট কোনোদিন ক্ষমা করেননি।

১৯৫৭ সালে ইংলণ্ড-সফরের তোড়জোড় চলেছে ওয়েস্টইণ্ডিজে। পোর্ট অব স্পেনে ট্যুর-ট্রায়াল। উইকেটকীপাররূপে সুনিশ্চিত স্থান ডেপিয়াজার। এক স্কটিশ ক্লাবের সঙ্গে তাঁর কন্ট্রাক্ট হওয়ার কথা। ডেপিয়াজা ব্যাপারটাকে সরিয়ে দিয়েছেন ইংলণ্ড-সফর করবেন বলে।

কিন্তু ট্রায়াল আরম্ভ হওয়ার পরেই, দল ঘোষণার আগেই, ডেপিয়াজা দ্রুত কণ্ট্রাক্ট সই করে ফেললেন। কারণ তাঁর কোনো চান্স ছিল না। থাকতে পারে না, যেখানে জন রীডের মতো উইকেটকীপার রয়েছে। রীডের খেলা দেখার পরে সবাই বুঝল, বাকি উইকেটকীপাররা স্টপার ছাড়া আর কিছু নয়। ডেপিয়াজাও তাই অনুভব করলেন।

একটা গল্প এইখানে বলে নেওয়া যাক ছোট করে। গল্পটা নতুন কিছু নয়। চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে একটা পদের জন্য। প্রার্থীর এম-এ পাস হওয়া চাই-ই। তবে তার সঙ্গে বাড়তি গুণরূপে খেলায় কিংবা অভিনয়ে পারদর্শিতা থাকলে ভাল হয়। মিত্তিরদা ধাঁধা দিলেন: চারজন প্রার্থী এসেছে। একজন শুধু এম-এ পাস। দ্বিতীয় জন এম-এ পাস এবং অভিনয় করতে পারে। তৃতীয় জন এম-এ পাস ও খেলাধুলায় সমর্থ। চতুর্থ জন এম-এ তো নিশ্চয়ই, ফার্স্ট ক্লাস এম-এ, তদুপরি অভিনয়, খেলাধুলা, নাচ, গান, চিত্রাঙ্কন, হেন জিনিস নেই পারে না।—কে চাকরি পাবে?

গল্পের ট্রাডিশন্যাল বন্ধুর মত আমরা, অল্পবয়সীর দল, কলরব করে বলেছিলুম—এ আর এমন কি শক্ত প্রশ্ন, চতুর্থ জনই পাবে। আমাদের মধ্যের একজন বিজ্ঞ গম্ভীরভাবে যোগ করে দিয়েছিলেন—অবশ্য যদি অধিক গুণ দোষের না হয়।

মিত্তিরদা বলেছিলেন—সরল মূর্খ। এদের কেউই পায়নি। পেয়েছিল যে, সে বি-এ ফেল এবং অ্যাপ্লাই করেনি। বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয় বুঝেছেন, সে হয় বড়বাবুর স্ত্রীর ভ্রাতা, কিংবা সাহেবের আয়ার পুত্র, কিংবা...ছি! বলতে-বারণ ব্যক্তি।

উইকেটকীপাররূপে নির্বাচিত হলেন গেরী আলেকজান্ডার, যিনি 'রীডের তুলনায় শিক্ষানবিশী ছাড়া আর কিছু নন।' এমন হবার কারণ, গিলক্রিস্ট জানিয়েছেন—রীড, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ, বার্বাডোজ, বা ব্রিটিশগিয়েনার অধিবাসী নন। এই চারটি বড় দ্বীপের অধিবাসীরাই স্থান পাবার ভোট পান। রীড এসেছিলেন ক্ষুদ্র লীওয়ার্ড দ্বীপ থেকে। তাঁর ব্যাকগ্রাউণ্ডে লোক ছিল না।*

যাকগে, ডেপিয়াজা, রীড বা আলেকজান্ডার—কে প্লেস পেয়েছেন, আমার ভাববার দরকার নেই, মোদ্দা কথা, আমি দলে ঢুকতে পেরেছি—গিলক্রিস্ট চিন্তা করলেন—এইবার একমাত্র কাজ খেলে দেখানো। তা দেখাবই।

ডিউক অব নরফোকের দল তখন ওয়েস্টইণ্ডিজ ভ্রমণ করছে। দলে আছেন ডাকসাইটে সব খেলোয়াড়—রয় মার্শাল, উইলি ওয়াটসন, টম গ্রেভনী, ডগলাস রাইট, টম গ্রীনহাউ, অ্যালান মস, জর্জ ট্রাইব প্রভৃতি। দুটি লোকের দিকে গিলির বিশেষ নজর, সে দুটিকে ভক্ষণ করতে হবে—রয় মার্শাল ও টম গ্রেভনী। মার্শাল, ওয়েস্টইণ্ডিজের খেলোয়াড়, সেরা ওপেনিং ব্যাটসম্যান। গ্রেভনী অতীব আকর্ষণীয় ক্রিকেটার। পিটার মে, কলিন কাউড্রে, টেড ডেক্সটারের সম্বন্ধে

*আমরা এখানে গিলক্রিস্টের দৃষ্টি দিয়েই ব্যাপারটাকে দেখছি। নচেৎ ক্লাইড ওয়ালকট লিখেছেন, গেরী আলেকজান্ডার ট্রায়ালে উপস্থিত যে-কোনো উইকেটকীপারেরর চেয়ে অনেক ভালো ছিলেন।

সম্ভ্রম বোধ করলেও গিলক্রিস্টের কাছে গ্রেভনী—'দি ব্যাটসম্যান'—'যিনি মেসিন নন যে, তার মধ্যে পয়সা ফেলে দিয়ে হ্যান্ডেল ঘোরালে প্রতিবার একই জিনিস বেরিয়ে আসবে।' না, গ্রেভনী সে পদার্থ নন। তিনি পুনরাবৃত্তি ভালবাসেন না। হাসতে-হাসতে উইকেটে এসে দাঁড়ান, ব্যাটের উপর ঝুঁকে পড়েন, কারো বিরুদ্ধে বিদ্বেষ নেই, নেই কোন ব্যস্ততা—তারপরেই, মুড না বদলেই শুরু করে দেন হত্যাকাণ্ড! কিংবা অন্য একদিন, সেদিনও গ্রেভনীর হাসি সমান উজ্জ্বল, অথচ ব্যাট ক্রন্দনোন্মুখী। মানুষটি মেজাজী।—

He smiles at you, and he leans on his bat like a man without a worry or a bad thought for you, and the next minute he is 'murdering' you, playing shots you have never believed could be played so beautifully, so strongly and correctly. Other days Graveneye's eyes might smile and his bat might cry; he is a moody batsman.

এই গ্রেভনীকে চাই গিলক্রিস্টের। আর চাই মার্শালকে। 'কীলার' যদি হতে হয়, হব 'জায়েন্ট কীলার।'

ওপেনিং-ব্যাটসম্যান মার্শাল, ওপেনিং-বোলার গিলক্রিস্ট মুখোমুখি। প্রথম যৌবনের প্রমত্ত বাসনায় অস্থির গিলক্রিস্ট ছুটে আসছেন...আমি নেবই মার্শালকে...এই বলে...না হলে পরের বলে...না হলে পরের ওভারে...

উইকেটকীপাররূপে গ্লাভস বাড়িয়ে আছেন গেরী আলেকজাণ্ডার...কর্তৃ-পক্ষের প্রীতিভাজন...ডেপিয়াজা ও রীডকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়েছেন...

প্রথম বল—হো হো হো—মার্শাল স্নিক করেছেন, উইকেটকীপারের হাতে বল—হো হো হো—ফসকে গেল।

গিলক্রিস্ট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মাঠে মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন। রাখলেন। আলেক-জাণ্ডারের পিতৃপুরুষের সপিণ্ডকরণ ব্যাপারটা মনের ফল্গু নদীর তটে ঘটল। কিন্তু দাঁতে দাঁত পিষে থাকার জন্য মুখ না খুললেও চোখ তো বন্ধ ছিল না। অনুচ্চার্য ভাষাময় দুটি কৃষ্ণ নয়ন—আহা!—

'So if I did not say what I thought about Alexander flooring that one, I am sure I must have shown it in my eyes. And what my eyes showed was not for the cricket field.'

গিলক্রিস্টের জীবনের কুগ্রহ এই আলেকজাণ্ডার। এঁরই অঙ্গুলী-নির্দেশে টেস্ট-ক্রিকেটমঞ্চ থেকে গিলক্রিস্টের বিদায়। সে ইতিহাস এখন নয়। এখন আর একটি কুগ্রহের কথায় আসা যাক। সোনী রামাধীন।

সোনী রামাধীন—ভদ্র, লাজুক, কোমলস্বভাব, রহস্যময় মানুষটি তিনি গিলক্রিস্টের জীবনের অভিশাপ? বিস্ময়কর বটে! অথচ গিলক্রিস্ট তাই মনে করেছেন। রামাধীনকে গিলক্রিস্ট এত বিদ্বেষের চোখে দেখেছেন যে, রামা-ধীনের পতনে মুক্ত কণ্ঠে হর্ষধ্বনি করতে লজ্জাবোধ করেননি। আদিম হিংসার সেই চেহারা দেখে লজ্জাও লজ্জিত।

রামাধীনের অপরাধ? সবচেয়ে বড় অপরাধ তিনি প্রতিভার আদরের সন্তান। অচেতনে তিনি বহন করেছেন ঐশ্বর্য, যেখানে গায়ের রক্ত জল করে, দম বন্ধ করে, খেটে মরেছেন গিলক্রিস্টের দল। প্রতিভার বিরুদ্ধে পরিশ্রমের,

রহস্যের বিরুদ্ধে স্পষ্টতার, ভাগ্যবন্তের বিরুদ্ধে দুর্ভাগ্যের যে-কর্কশ কণ্ঠ-স্বর, তাই শোনা গেছে রামাধীনের বিরুদ্ধে গিলক্রিস্টের মধ্যে।

রামাধীন—ক্রিকেট-পৃথিবীর অঙ্ক-দুলাল, সমালোচকদের লেখনী-বিলাস,—গিলক্রিস্ট রাগে অস্থির। ওয়েস্টইণ্ডিজ ক্রিকেটে ছোকরাটির অন্যায় প্রবেশ—গিলক্রিস্টের ধারণা।

এবং...রামাধীন ভরতীয়। কথাটা কেউ ভুলতে চায়নি। তবে অন্যান্যর সঙ্গে এ ব্যাপারে গিলক্রিস্টের মনোভাবের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

রামাধীনের পিতামহ ভারতীয়, একথাটা যদি ভারতবাসী ভুলতে না চায় তার কারণ বুঝি। আমাদের ধারণা, এদেশ থেকেই বোধিবৃক্ষ সর্বত্র গিয়েছে। কিন্তু ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, এমন কি ওয়েস্টইণ্ডিজের অনেকের মধ্যে সেই ধারণা কেন?—রামাধীন অবিশ্বাস্য বলে। অবিশ্বাস্য সম্পাদনে ভারতের একচ্ছত্র অধিকার।

গিলক্রিস্টের মনে পড়েছে রামাধীন-ভ্যালেণ্টাইন সম্বন্ধে সমালোচকদের স্তুতিকথাগুলি :

রামাধীন-ভ্যালেন্টাইন বল দিয়েছেন ওভারের পর ওভার। বল পড়েছে নিখুঁত লেংথে, একচুল এধার-ওধার হয়নি। নিশ্চয় অদৃশ্য তারে বাঁধা ছিল বলগুলি।... রামাধীনের হাত থেকে বল বেরিয়েছে, মাটিতে পড়ে অফব্রেক হয়েছে কিংবা লেগব্রেক, অথচ একই মুঠি, নিক্ষেপভঙ্গিও একই।...মাথা নামিয়ে সেই বল খেলেছে বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়রা—যেন ওষুধে আচ্ছন্ন রোগীর দল।...রামাধীন পৃথিবীর শ্রেষ্ট ব্যাটিং-প্রতিভাকে যথেচ্ছ নাচিয়ে, নামিয়ে দিয়ে গেছেন। কম্পটন বললেন, রামাধীন বল করার সময়ে আর-কিছু দেখতে পাইনি, শুধু দেখেছি কালো হাত, আর চকিত চিকণ লাল বল।

পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি, কালো রঙ, ছেলেমানুষের মুখ, ফুলহাতা জামা, মাথায় টুপি, ফিটফাট চেহারার রামাধীন একুশ বছর বয়সে ইংলণ্ডে টেস্ট খেলার আগে প্রথমশ্রেণীর খেলা প্রায় খেলেছিলেন কি না সন্দেহ।

১৯৫০ সালে ইংলণ্ডে চতুর্থ টেস্টে রামাধীন-ভ্যালেণ্টাইন জুটি ৬৫ ওভার ধীর প্রভাব বিস্তারের পরে যখন তাঁদের বিরুদ্ধে হাটন ও কম্পটন একটু স্বাভাবিকভাবে খেলতে শুরু করলেন, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলা হয়েছিল—এই প্রথম রামাধীন-ভ্যালেণ্টাইন কিছু হ্রস্ব হয়ে মানবাকার ধারণ করলেন, এখন একজোড়া সুন্দর বোলার, যাঁদের বিরুদ্ধে কষ্টে হলেও খেলা যায়।

হাটন বলেছেন, ভাবালুতাহীন লেন হাটন—রামাধীনের মধ্যে প্রাচ্যের কিছু রহস্য আছে। এমন-কি রামাধীনের সহযোগী ওয়েস্টইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়রা পর্যন্ত এই ছোকরার সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে ভারতের রোপ-ট্রিকসের কথা মনে না করে পারেননি। এবং...হয়তো, ক্রিকেটের নবাগত একটি ছোকরাকে প্রায় বিনা পরীক্ষায় নির্বাচনের পিছনে অদৃশ্য কিছু রহস্য ছিল, প্রাচ্যদেশীয় মনোহর কোনো অলৌকিকতার প্রেরণা!

রামাধীনের রহস্যযুগে তিনি মার খাওয়া মাত্র তা বিরাট নিউজ হয়ে দাঁড়াত, যা হয়নি ওরিলী, গ্রিমেটের ক্ষেত্রেও। ১৯৫০ সেই যাদু-যুগ। হাটন ইচ্ছে করেছিলেন, নিজের ঘরে মিলার, লিণ্ডওয়াল, রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইনের ছবি

টাঙিয়ে রাখবেন তাঁর বহু বিনিদ্র রজনীর যন্ত্রণা-স্মারকরূপে। শেষোক্ত দুটি কুড়ি বছরের ছেলে ইংলণ্ডের ব্যাটিংকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত, কিংবা তারও বেশি, দরিদ্র করে দিয়েছিল।

১৯৫০ সালে চারটি টেস্টে রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইনের উইকেট এবং অ্যাভারেজ দাঁড়াল...অ্যাভারেজও বোধহয় শেষ কথা বলবে না। অনেক বড় বোলারই ভালো অ্যাভারেজ দেখিয়েছেন, উইকেট নিয়েছেন প্রচুর। চোখের সামনেই তো কিছুদিন আগেও সারের যমজ-স্পিনার লক ও লেকার ছিলেন। রামাধীন ভিন্ন বস্তু। তাঁর সহযোগিত্বে উন্নীত ভ্যালেণ্টাইনও। যদি রামাধীন বা ভ্যালেণ্টাইন কোনো বৃষ্টিক্ষত বা ভাঙা উইকেটে অস্বাভাবিক দ্রুত শেষ করে দিতেন বিপক্ষের ইনিংস (যেমন লক বা লেকার করেছেন) তাহলে ভিন্ন কথা হত। না, তা নয়, উভয়ে একাদিক্রমে অজস্র ওভার বল করে গেছেন এবং সমস্ত সময়টা আচ্ছন্ন রেখেছেন ব্যাটসম্যানদের। এইটেই আশ্চর্য। ১৯৫০-এ লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টের একটা পর্যায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে:

"এ পর্যন্ত (চা-পানের অল্প পূর্ব পর্যন্ত) ভ্যালেণ্টাইন দিয়েছেন ৩৯ ওভার এবং রামাধীন ৩৭ ওভার, মোট ৭৬ ওভার বল। তার মধ্যে ৪৪ ওভার মেডেন। ভ্যালেণ্টাইনের ২৩৪টি বলের ১৬টিতে মাত্র রান হয়েছে। রামাধীনের ২২২টি বলেও তাই। যদি রামাধীনের প্রথম তিন ওভার বল বাদ দেওয়া যায়, তাহলে পরবর্তী ৩৪ ওভারে ২৬ ওভার মেডেন, এবং ২০৪টি বলের ৯টিতে রান হয়েছে। রামাধীন নিজস্ব-ভাবে বল করেছিলেন আড়াই ঘণ্টারও উপর। সেই সমস্ত সময়ে মাত্র ৯টি মার মারা হয়েছিল—গড়ে প্রতি ১৮ মিনিটে একটি মার! উইকেট থেকে বোলাররা কোনো সাহায্য পাননি। তাঁদের রেকর্ড: *ভ্যালেণ্টাইন—৪৫-২৮-৪৮-৪; রামাধীন—৪৩-২৭-৬৬-৫।* এমন একটি বোলিং-এর বজ্র বাঁধুনী স্মরণে আসে না।"

এই ধরনের কথা ১৯৫০ সালের শেষ তিনটি টেস্টের প্রায় যে-কোনো সময় সম্বন্ধে বলা চলে। ১৯৩৪-এ গ্রিমেট ও ওরিলীর পরে এই কীর্তি বহিরাগত আর কাদেরও দ্বারা দেখানো সম্ভব হয়নি ইংলণ্ডে। সে বছর ওরিলী নিয়েছিলেন ২৮টি উইকেট, অ্যাভারেজ ২৪, এবং গ্রিমেট ২৫টি উইকেট, অ্যাভারেজ ২৬। ভ্যালেণ্টাইন ১৯৫০-এ নিলেন ৩৩টি উইকেট, অ্যাভারেজ ২০ এবং রামাধীন ২৬টি উইকেট, অ্যাভারেজ ২০। ওরিলীরা খেলেছিলেন পাঁচটি টেস্ট, যাতে সাড়ে সাতটি মাত্র ইনিংস সমাপ্ত হয়েছিল। ১৯৫০-এ ওয়েস্টইণ্ডিজ চারটি টেস্ট খেলে ৮টি ইনিংস শেষ করতে পেরেছিল। সংখ্যাই কথা বলছে।

ইংলণ্ড সফর শেষ করে, ইংলণ্ডকেও শেষ করে, ১৯৫১-৫২ সালে রামাধীন যখন অস্ট্রেলিয়া গেলেন, সকলের মুখে-মুখে ফিরতে লাগল জিজ্ঞাসা—রামাধীন কি পারবেন? না-কি, যেমন প্রবচন আছে, 'তুমি সব লোককে কিছু সময়ের জন্য ভোলাতে পার, কিংবা কিছু লোককে সব সময়ের জন্য, কিন্তু ভোলাতে পার না সব লোককে সব সময়ের জন্য'—তেমনি ঘটবে? রামাধীন কি ভোলাতে পারবেন? কি পরিমাণে? ১৯৫০ সালে ইংলণ্ডে ক্যালিপসো মেতে উঠেছিল রামাধীনের বন্দনায়। ১৯৫১-৫২-তে অস্ট্রেলিয়ায় সে সুর কোন্ কথা বলবে?

সিডনির মাঠে নেট-প্রাকটিসের সময়ে আর্থার মেইলী রামাধীনকে লক্ষ্য করতে

লাগলেন। অমিতব্যয়ী স্পিনাররূপে জগদ্বিখ্যাত ছলনাময় মেইলীও বুঝতে পারলেন না, বহু চেষ্টা করেও, রামাধীনের হাত থেকে কোনটি লেগব্রেক পড়বে, কোনটি অফব্রেক!

জনৈক ক্রীড়া-সাংবাদিককে তাঁর পত্রিকার সম্পাদক অনুরোধ জানিয়েছিলেন, একটি রচনা লিখে দিতে হবে, যার শিরোনামা—'আমি রামাধীনকে মুখোমুখি দেখলাম।' সুযোগ মিলল চমৎকার। বিল ফার্গুসন-টেস্টিমোনিয়াল ম্যাচে ওয়েস্টইন্ডিজের বিরুদ্ধে উক্ত ক্রিকেট-লেখক খেলতে নামলেন। তাঁর মনে মৃদু গর্ব ছিল, তিনি একদা শেফিল্ড শীল্ডে খেলেছেন। খেলা শেষে প্রবন্ধ তিনি ঠিকই লিখেছিলেন। কিন্তু বদলে দিয়েছিলেন শিরোনামা: 'আমার চেয়ে অনেক বড়—তুমি রামাধীন!' এই প্রবন্ধে লেখা হল: "আমি যাঁদের বিরুদ্ধে এ-পর্যন্ত খেলেছি, তাঁদের মধ্যে বোলিং-ভঙ্গি, ফ্লাইট ও ব্রেকের ব্যাপারে গতকালকার রামাধীন সবচেয়ে দুর্বোধ্য। যাঁদের বিরুদ্ধে খেলবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তাঁদের মধ্যে গ্রিমেট, ওরিলী, ডগলাস রাইট এবং রন অক্সেনহ্যামও আছেন।"

ক্রিকেট-লেখকের এমন উচ্ছ্বাসের কারণ, তিনি রামাধীনের মুখোমুখি দাঁড়াবার পরে প্রথম যে-বলটি এসে পড়ল, সেটি তিনি সম্পূর্ণ ফসকালেন—অফ থেকে ঘুরে ব্যাটের মধ্য দিয়ে তা গলে গেল। দ্বিতীয় বলে তিনি খোঁচালেন—ওয়ালকট ক্যাচ ফেলে দিলেন। তৃতীয় বলের ক্যাচ ফেলল স্লিপের ফিল্ডার। পরবর্তী বলটি হঠাৎ লেগের দিক থেকে বাতাসে এমন 'গোঁত্তা খেয়ে পড়ে গেল' যে, মরীয়া হয়ে লেগের ব্যাট চালাতে গিয়ে তিনি কোনরকমে সামলে নিলেন। পরের বলটি ওয়ালকট আবার ফেললেন। তার পরের বলটি সম্পূর্ণ-ভাবে 'অদৃশ্য হয়ে গেল', যদিও যাবার সময়ে টুক করে সরিয়ে দিয়ে গেল অফের বেলটিকে।

মিস্ত্রি-বোলার রামাধীনকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ভাবাবেগের সীমা ছিল না। অপরিণতবয়স্ক এই তরুণটি বড় ভয় পেত সমুদ্র দেখলে। সেখানে যে অনেক হাঙর। কিছুতে তাই সমুদ্রে স্নান করবে না। তাই হাঙর-ভায়ারা যদি মিস্ত্রি-বোলার সম্বন্ধে কিছু আগ্রহ বোধ করে, তাহলে তাদের সাক্ষাতের জন্য যেতে হবে হোটেলের স্নানাগারে—কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখলেন অস্ট্রেলিয়ার লেখকরা। রামাধীন ব্যাট হাতে নিলে স্নেহোচ্ছল কৌতুকে কিথ মিলার 'কোমল' বাম্পার ছুঁড়ে উচ্চহাস্য করলেন, যোগ দিয়েছিলেন সবাই, রামাধীন-সুদ্ধ। যে-রামাধীন ব্যাটিং ব্যাপারটার কিছুই জানতেন না, যাঁকে একদা খেলা চলা-কালে মাঠের মধ্যেই ব্যাট-চালনার ট্রেনিং দিয়েছিলেন ওয়ালকট, সেই রামাধীন কিছুদিনের মধ্যেই 'গ্রেট ব্যাটসম্যান' হয়ে উঠে সহযোগী ওয়ালকটকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলন, 'আরে ঘাবড়াও কেন? আমি ঠিক আছি, তুমি নিজের খেলা খেলে যাও।' ওয়ালকটের অবশ্য পরে বেশি-কিছু বলার মুখ রইল না। কেননা তিনি ৯৮ রানের মাথায় আউট হয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে সকলের হর্ষধ্বনির মধ্যে ১৬ রানে নটআউট ছিলেন রামাধীন। ছেলেটি এতই ছেলেমানুষ যে, খিদে পেলে তার মুখ শুকিয়ে যেত, বল করতে পারত না, তাই তার জন্য গডার্ড প্রাতেই মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন—সে আবার বিলিতি খানা খেতে পারত না, তাই চীনে হোটেলের থেকে খাবার আসত।

আদিখ্যেতা! ন্যাকামো! ঢঙ—সব ঢঙ!—গিলক্রিস্টের ভিতরটা ঘুলিয়ে ওঠে। একজন বোলারকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ির কি আছে?

গিলক্রিস্টের সন্ধানী চোখ রামাধীনের ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলির উপর তীব্র রশ্মি-পাত করে। অনাবৃত করে দেয় বিক্ষত অংশ। অকরুণ কণ্ঠ সুতীক্ষ্ন স্বরে জানায়—১৯৫১-৫২-তে অস্ট্রেলিয়ায় রামাধীনের কিছু প্রগল্‌ভতার এবং তার পরিণতির কথা।

এই মরশুমে প্রথম টেস্টে বল করার সময়ে স্বগতোক্তি করলেন রামাধীন—'আমি তোমায় নিয়ে নিচ্ছি আর্থার (মোরিস), তুমি আমার ব্রেক-এর চরিত্র বুঝতে পার না, আর বড় বেশি ছটফট করো ক্রীজে। লিন্ডসে (হ্যাসেট), তোমাকেও আমি নিয়ে নেব, তোমার খাটো হাত বেশিদূর পেঁছয় না। এবং কিথ মিলার, তুমিও পার পাবে না—আমার বলে তুমি বড্ড এগিয়ে আসো।'

মিস্ট্রি-বোলার রামাধীন এ কথা বলতেই পারেন। ১৯৫০ সাল পিছনে আছে। রহস্যের কুয়াশা এখনো ঘোচেনি। রামাধীন ফুল-হাতা জামার হাতা না গুটিয়ে বল দিলে চমকের সৃষ্টি হয়, হাতা গুটোলেও ধাঁধা যায় না। সকলে বলে, এ-ক্ষেত্রে কালো হাতের ঝলকে ভড়কে দেওয়ার নতুন ফন্দী। অস্ট্রেলিয়ার লোক বাস্তবিক তাই বলেছিল, যখন হাতে টান ধরার জন্য রামাধীনকে প্লাস্টার লাগাতে হয়েছিল, ফলে হাতা গুটিয়ে বল দিতে বাধ্য হয়েছিলেন!

এমন যখন পরিস্থিতি, তখন একুশ বছরের উদ্‌ভ্রান্ত যৌবন প্রবীণ হ্যাসেটের অস্বস্তি দেখে যদি দ্রুত মন্তব্য করে বসে, তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না। রামাধীন বললেন—'হ্যাসেট, তুমি আমার খরগোস।'

সেইদিন থেকে রামাধীনের রহস্য ঘুচল। অস্ট্রেলিয়ার আকাশের চড়া রোদ, ও মাঠের কড়া পিচ অনেকখানি আবরণ মোচন করেছিল, বাকিটা খুলে দিলেন হ্যাসেট। সেঞ্চুরি করে গেলেন রামাধীনের বলে পরপর হ্যাসেট ও মিলার। ওয়েস্টইন্ডিজের ড্রেসিংরুমে এবার ক্যালিপসো গেয়ে উঠল ক্ষমাহীন ব্যঙ্গে—রামাধীনের বিরুদ্ধে।—

Ram call Hasset a rabbit
And the Indian boy he regrct it....

যাতে পরমানন্দে যোগ দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা—

Wc want Ramadhin on thc ball,
And a lot of runs on thc board!

এই সব কথাই গিলক্রিস্ট মনে রেখেছিলেন সযত্নে। কিন্তু তিনি মনে রাখেননি বা রাখতে চাননি যে, হ্যাসেট ও মিলারের আঘাতের মধ্য থেকেই সত্যকার বোলাররূপে বেরিয়ে এসেছিলেন রামাধীন। ক্রিকেটাররূপে একথা তাঁর মনে রাখা উচিত ছিল। ইংলন্ডের ভিজে মাটি, কুয়াশাভরা আকাশ কিংবা প্রথম অবতরণের অচেতন প্রতিভা-বিকাশ নয়—চড়া রোদে, কড়া মাঠে, নির্মম মারের মুখে অবিচলিত দুজন শ্রেষ্ঠ স্পিনবোলারের আবির্ভাব দেখা গেল—একুশ বছরের দুটি ছোকরা—রামাধীন ও ভ্যালেন্টাইন।

তবু রামাধীন একবার ভেঙে পড়েছিলেন, মেলবোর্নে, চতুর্থ টেস্টে। রামা-ধীনের অস্বাভাবিক ত্রুটিহীনতা—প্রতিভার নিজস্ব দান। প্রতিভার ক্ষয় হয়

বিরূপ পরিবেশে। ভ্যালেন্টাইনের মধ্যে রক্ষণশীলতার ধৈর্যের প্রাধান্য ছিল। তাই প্রতিভার উপরে পরিশ্রমকে স্থাপন করতে পেরেছেন শেষ পর্যন্ত।

মেলবোর্ন মাঠের স্মরণীয় চতুর্থ টেস্টের কথা পুনশ্চ স্মরণ করি।

তার আগের টেস্টগুলিতে রাম-ভ্যাল জুটিকে দিয়ে বল করানো হয়েছে অসম্ভব রকম। একদিকে ছিল এঁদের উপরে অধিনায়ক গডার্ডের অপরিসীম আস্থা, অন্যদিকে বোলারের অভাব। এই জুটি বল করেছেও অদ্ভুত। প্রথম টেস্টের শেষ ইনিংসে রামাধীনের, এবং অন্য সময়ে ভ্যালেণ্টাইনের বোলিং সমালোচকদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ওরিলী ও গ্রিমেটকে। ওরিলী-গ্রিমেট জুটির পরে সব চেয়ে দর্শনীয় বোলিং নির্গত হয়েছে রাম-ভ্যাল জুটির হাত থেকে, অস্ট্রেলিয়ার কঠিন জমিতে, অস্ট্রেলিয়ানরাই স্বীকার করেছে। প্রথম দু টেস্টে অস্টেলিয়া জিতেছে। তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্টইণ্ডিজ। চতুর্থ টেস্টের ফলাফলের উপরে নির্ভর করবে—ওয়েস্টইণ্ডিজ শেষপর্যন্ত রবারসংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবে কি না! সেই অতি গুরু চতুর্থ টেস্ট।

চতুর্থ টেস্টের শেষ ষাট মিনিটে ক্রিকেট-ইতিহাসের ঘড়ি দমবন্ধ হয়ে থেমে গিয়েছিল। বেসবলের উত্তেজনায় অভ্যস্ত, ধীরগতি ক্রিকেটের কঠিন সমালোচক জনৈক আমেরিকান এই শেষের ঘন্টাটিতে কতবার পানাগারে ও স্নানাগারে ছুটে গিয়েছিল তার হিসেব ছিল না, এবং সে যে-পরিমাণে সিগারেট টেনেছিল, তার নিকোটিন বিষে এক পাল ইঁদুরকে সহজেই মেরে ফেলা যায়। ছেলেরা ছটফট করে কেঁপেছিল। মেয়েরা ককিয়ে কেঁদেছিল। চতুর্থ টেস্টের শেষ ষাট মিনিট, যে-সময়ে অস্টেলিয়ার শেষ জুটিতে রিং ও জনস্টন ৩৮ রান করেছিলেন।

সর্বকালের একটি শ্রেষ্ঠ খেলারূপে কীর্তিত এই ম্যাচে আরও অনেক কিছু দর্শনীয় ঘটেছিল, যেমন প্রায় একহাতে ওরেলের সেঞ্চুরি। হাতের একটা নরম অংশে চার বার লেগেছিল মিলার-লিন্ডওয়ালের বাম্পার। যন্ত্রণায় নীলতর হয়েছিলেন ওরেল। তবু, একহাতে দাঁড় বেয়ে শেষ বাণিজ্য নিয়ে ফিরেছিলেন। এক হাতে সেঞ্চুরি। তার পাশে দু'হাতে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ব্যাট আঁকড়ে আরও একটি সেঞ্চুরি—সেটি হ্যাসেটের। হ্যাসেটের ক্রিকেট-জীবনের বোধহয় সবচেয়ে মূল্যবান সৃষ্টি। যে সময়ে রামাধীন ভ্যালেন্টাইনের বিরুদ্ধে গোটা দলের পক্ষে দেড়শো করা সম্ভব হয়নি, সেখানে হ্যাসেট একা করলেন শতাধিক। অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ছিল ২৬১ রান, জিতবার জন্য। তবু এসব কিছুই নয় বোধহয়। দেবতার চালচিত্র। দেবতা অন্যত্র—৩৮ রানের অভিমুখীন অশ্বিনীকুমারদ্বয়—রিং ও জনস্টন।

বিকাল চারটে বেজে আটাম। ল্যাংলে আউট হয়ে গেলেন। অস্ট্রেলিয়ার ৯ উইকেটে ২২২। ৩৮ রান বাকি আছে জিতবার জন্য। যাঁর ব্যাটিং সকলকে কৌতুকে উৎফুল্ল করে তোলে* সেই বিল জনস্টন উইকেটের দিকে অগ্রসর,

* বিল জনস্টন সকল অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়ের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ অ্যাভারেজ রান করেও কৌতুকের হাত এড়াতে পারেননি...সে অ্যাভারেজ যখন ১০২ রান, তখনো!! ক্লাইভ ওয়ালকট লিখেছেন : '১৯৫৩ সালে আমার গড় রান হয় ১০০-র উপর, এবং একটা অবস্থা হয়েছিল যখন আমার গড় রান ছিল ৬০০-র উপর! অবশ্য আমি মাত্র

অবিলম্বে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ হয়ে। অস্টেলিয়া হারবেই। কোনো সন্দেহ নেই।

একুশ বছরের রামাধীন ৩৯ ওভার বল দিয়েছেন ইতিপূর্বে যান্ত্রিক নির্ভুলতায়। তার মধ্যে ১৫টি মেডেন। ৯৩ রানে পেয়েছেন ৩টি উইকেট। আর একটি দ্বিতীয় একুশ বছর, ভ্যালেণ্টাইন, তিনিও বল দিয়েছেন ৩০ ওভার, ৯টি মেডেন, ৮৮ রানে ৫ উইকেট। গডার্ড ভ্যালেণ্টাইনকে সরিয়ে দিয়ে ওরেলকে আনলেন।

রামাধীন বল দিয়ে চলেছেন—বল পড়ে গেল হাত থেকে। একুশে বছরের অস্বাভাবিক প্রৌঢ়ত্বও শেষপর্যন্ত সহ্য করতে পারল না। জানুর পিছন দিক হাত দিয়ে ঘষতে-ঘষতে ওভারের শেষে ফিরে গেলেন মিডঅনে। পরের ওভারে গডার্ড আবার ডাকলেন রামাধীনকে। রামাধীন এলেন, কিন্তু বল নিলেন না, চলে গেলেন দূর মাঠে।

তখন গডার্ড ফিরে ডাকলেন তাঁর 'দাস'কে, ভ্যালেণ্টাইনকে, যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—জার্ডিনও লারউডের মধ্যে, অমরনাথও ভীনুর মধ্যে অধিকতর সেবককে পাননি। কপালের ঘাম মুছে, মাটিতে হাত ঘষে, বল তুলে নিলেন ভ্যাল। তখনো বেদনাকাতর মুখে পিছনের পায়ে হাত ঘষছেন রাম।

রিং ও জনস্টন নিভিয়ে দিয়েছিলেন ওয়েস্টইণ্ডিজের প্রদীপ। কিন্তু সকলে বুঝেছিল, রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইন কত বড় বোলার।

অস্ট্রেলিয়ার মাঠে রাম ও ভ্যাল প্রত্যাশামতো অলৌকিক ঘটাতে না পারলে যাঁরা দায়িত্বহীন সমালোচনা করেছেন, তাঁদের মুখের মতো উত্তর দিয়েছেন মিলার ও হুইটিংটন। এঁরা বলেছেন, সমালোচকেরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, রাম ও ভ্যাল ২১ বছরের ছোকরা মাত্র। অপরপক্ষে পৃথিবীর সেরা দুই স্পিনার ওরিলী ও মেইলী রাম-ভ্যালের অদ্ভুত পরিদর্শিতা স্বীকার করেছেন। সমালোচকেরা মনে রাখলে ভাল করতেন, ওরিলী ও মেইলী অনেক বেশি বয়সে টেস্ট খেলেছিলেন। এবং...গ্রিমেট যখন তাঁর প্রথম টেস্ট-ম্যাচে ৮২ রানে ১১টি উইকেট নেন, তখন তাঁর বয়স ৩২।

রামাধীন সম্বন্ধে জন আর্লটের নিম্নের কথাগুলির সত্যতা মেনে নেবার ঔদার্যও বড় বেশি ছিল না গিলক্রিস্টের :

"যখন রামাধীনের লেগব্রেক বুঝতে পারবেন ব্যাটসম্যান, তখনো তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ লেগব্রেক বোলার থাকবেন। তাঁর নিখুঁত লেংথ, স্পিন এবং ফ্লাইটের ঈষৎ পরিবর্তনের জন্য যদি তিনি শুধু অফব্রেক বলও করে যান, তবু তা তাঁর মর্যাদা নষ্ট করবে না।...অন্য লেগব্রেক-গুগলি বোলারের অনায়ত্ত নিখুঁত লেংথ, রামাধীনকে টেস্ট-বোলারের স্বাভাবিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে।...চমৎকার ফিটফাট, খুবই ক্ষুদ্রাকার রামাধীন মিনিটে এক ওভার

একবার আউট হয়েছিলাম তার মধ্যে, সেকথা সত্য। এইভাবে গড় রান ব্যাপারটা অনেক সময় বিভ্রান্তিকর। এর ক্লাসিক দৃষ্টান্ত অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা বোলার বিল জনস্টনের ব্যাটিং। ১৯৫৩-র ইংলণ্ড সফরে তিনি ১০২ অ্যাভারেজ করে সকলের শীর্ষে ছিলেন —অবশ্য এই "সেঞ্চুরি" করতে তাঁর ১৭টি ইনিংস লেগেছিল, এবং তিনি একবার মাত্র আউট হয়েছিলেন। তিনি একাদশ ব্যাটসম্যান ছিলেন।'

বল দেন। তিনটি দ্রুত পদক্ষেপ, হাতের ক্ষিপ্র দোলন, তারপরেই ব্যগ্রচিত্তে পরবর্তী বল নিক্ষেপের প্রস্তুতি। খুবই জেদী আর পরিশ্রমী বোলার, স্পিন, ফ্লাইট ও গতির দ্বারা প্রত্যেক বলেই নূতনত্ব সঞ্চারে প্রয়াসী—ফলে ব্যাটসম্যান মুহূর্তের জন্য স্বস্তিবোধ করে না। বাহ্যত খুবই শান্ত, কিন্তু কূশাগ্র বুদ্ধি, অবিলম্বে ধরে ফেলেন ব্যাটসম্যানের শক্তি ও দুর্বলতা।"

রামাধীনকে কেন্দ্র করে যে-সব গল্প গড়ে উঠেছিল, সেগুলি গড়ে ওঠার ব্যাপারে রামাধীনের বলে উদ্‌ভ্রান্ত ইংরেজ-ব্যাটসম্যানদের প্রভূত অবদান ছিল —তীব্র উল্লাসে সেই গল্পগুচ্ছের পাতা ছিঁড়লেন গিলক্রিস্ট। ১৯৫৭-তে গিলক্রিস্ট প্রথম ইংলণ্ড গেলেন। রামাধীন দলে আছেন। কয়েক বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় প্রত্যাশিত সাফল্য দেখাতে না পারলেও ১৯৫০-এ ইংলণ্ডে তাঁর বিস্ময়কর কীর্তির স্মৃতি রয়েছে পিছনে, আর ওয়েস্টইণ্ডিজেও বোলারের অভাব। সুতরাং রামাধীনের বাদ পড়ার কোনো কথাই ওঠে না।

প্রথম টেস্টে রামাধীন তাঁর পুরনো চেহারা দেখালেন আবার। প্রথম প্রভাতেই তাঁর মন্ত্রশক্তি। তারই প্রয়োগে হয়ত, প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩১ ওভার বল দিয়ে ১৬টি মেডেন-সুদ্ধ মাত্র ৪৯ রানে ৭টি উইকেট নিলেন।

প্রথম ইনিংসে রামাধীনের এই সম্মোহনী সাফল্যকে তীব্র বিরাগের সঙ্গে সহ্য করতে হল গিলক্রিস্টকে। দেখতে হল, যদিও অদ্ভূত কিছু বল ঘোরাতে পারলেন না রামাধীন, তবু রামাধীন-অবসেসনে কিভাবে ভুগল ইংরেজ ব্যাটস-ম্যানেরা। ক্লাইড ওয়ালকট লিখেছেন—"ফ্যা-ন-টা-স-টি-ক!—প্রথম ইনিংসে প্রথম-দিনে লাঞ্চের পরে রামাধীন ১০ রান দিয়ে উইকেট নিয়েছেন—৬!"

গিলক্রিস্ট রামাধীনের প্রতি তাঁর সর্ববিধ বিরূপতা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারেন একটি কারণে—রামাধীনের জন্যই গেরী আলেকজাণ্ডারকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কথাটা পরিষ্কার করেছেন ক্লাইড ওয়ালকট: 'গেরী আলেকজাণ্ডারের বদলে রোহন কানহাইকে উইকেটকীপার করায় কিছু বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তার সহজ কারণ, এই সময়ে আলেকজাণ্ডার রামাধীনকে শতকরা একশ ভাগ 'অধ্যয়নে' সমর্থ ছিলেন না। আর রামাধীন, মনে রাখবেন, আমাদের তূণের পাশুপত অস্ত্র।'

ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হয়ে গেল ১৮৬ রানে। উত্তরে ওয়েস্টইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে করল ৪৭৪। অবধারিত জয় ওয়েস্টইণ্ডিজের, প্রথম টেস্টেই, রামা-ধীনের জন্যই—এবং...পরবর্তী টেস্টগুলিতে ১৯৫০ সালের রামাধীন-সম্মো-হনের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা। টেস্টে নবাগত ফাস্টবোলার রয় গিলক্রিস্ট রামা-ধীনের রহস্যময় ছায়ার মধ্যে ডুবে গিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করল...রামাধীন আবার রেকর্ড করলেন...বন্ধু ভ্যালেণ্টাইনের রেকর্ড ভেঙে দিলেন......

হাঃ হাঃ হাঃ......রেকর্ড বটে! ৯৮ ওভার বল, ১৭৯ রান, ২ উইকেট!! রেকর্ড সত্যই!—গিলি লুটিয়ে পড়েন হাসিতে, খুশিতে।*

---

*পূর্বে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ বল দানের রেকর্ড ছিল ভ্যালেণ্টাইনের—৫৫২টি বল, ১৯৫০-এ ট্রেণ্টব্রিজ-টেস্টে। রামাধীন আলোচ্য খেলায় বল দিলেন ৫৮৮টি।

গিলি কি বলেন তাঁর নিজ মুখেই শোনা যাক :

"দ্বিতীয় ইনিংসে রামাধীনের পক্ষে 'সেই মানুষটি' হয়ে ওঠার প্রয়োজন ছিল, যাকে ইংলণ্ড এত ডরায়। রামাধীন পিটার রিচার্ডসনকে নিলেন, আমি ফিরিয়ে দিলুম ব্রায়ান ক্লোজকে। এরপর সকলে অপেক্ষা করে রইল দুটি মানুষের জন্য, যাঁদের ইংরেজরা বলে, পৃথিবীর সেরা দুই ব্যাটসম্যান—পিটার মে ও কলিন কাউড্রে। 'মানুষ' আহা মানুষ বটে, কাজ করল মানুষের মতোই।

"পিটার মে, আমার নিশ্চিত ধারণা, একটি ব্যাপারে স্থিরনিশ্চয় হলেন—Ramadhin must fail—রামাধীনকে হারাতেই হবে, যদি ইংলণ্ডের পক্ষে সিরিজ জিততে হয়, তাকে পিটিয়ে খেলার বাইরে পাঠাতেই হবে। এখনি সেটা করা দরকার, একেবারে এখনি, কারণ রামাধীন ইতিমধ্যেই বেড়ে উঠে যাদু-বিস্তার করতে শুরু করেছেন। সোমবার সেই লড়াই আরম্ভ হল। জন গডার্ড, যিনি রামাধীনের পূর্ববারের সম্মোহনী সফরের সময়েও অধিনায়ক ছিলেন, স্থির করলেন—রামাধীন অবশ্যই পুনরাবৃত্তি করবেন। মে স্থির করলেন—নহে। মে-ই জিতলেন, কাউড্রেকে সহযোগী নিয়ে। ক্ষুদ্র রামাধীন ৯৮ ওভার বল করলেন—হ্যাঁ, আ-টা-ন-ব্ব-ই-ও-ভা-র (!!)—এবং মাত্র দুটি উইকেট নিলেন এ-ক-শো-ঊ-ন-স-ত্ত-র-রা-নে-র বিনিময়ে। আর ঐ দুটি উইকেটের কোনোটিই মে বা কাউড্রের নয়। লড়াই চলল সোমবার সকাল ১১-৪৫ মিনিট থেকে মঙ্গলবারের বিকেল তিনটে পর্যন্ত। আমি দেখতে পেলুম, রামাধীনের জীবনের বসন্ত দ্রুত পলায়মান, চোখের দ্যুতি ও আঙুলের চাতুরীও। কিন্তু গডার্ড তাকে ছাড়লেন না—রেখে চললেন, চললেন, মনে আশা জাগিয়ে রাখলেন, হয়ত রামাধীন মে-কে বা কাউড্রে-কে, বা দুজনকেই নেবে। অবশেষে এই নৃশংস সংগ্রামের অবসান ঘটালেন—রামাধীন নয় কিন্তু—পিটার মে।—তিনি ইংলণ্ডের ইনিংস ডিক্লেয়ার করলেন ৪—৫৮৩ রানে। মে ২৮৫ নটআউট, কাউড্রে ১৫৪। দুজনে জুটিতে করেছেন চতুর্থ উইকেটে ৪১১। তারও থেকে বড় কথা, রামাধীনকে খুন করে ঠাণ্ডা কবরে শুইয়ে দিয়েছেন। গডার্ড জুয়া খেলেছিলেন, হেরে ভূত হয়ে গেলেন।"

গডার্ডের এই জুয়াখেলা গিলক্রিস্টের কাছে প্রায় জুয়াচুরি। "ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ান কর্তাব্যক্তিরা এই কুসংস্কারের মধ্যে ছিলেন—আর কিছুর দরকার নেই, শুধু রামাধীন পায়ে হেঁটে মাঠের মাঝখানে হাজির হবেন, সঙ্গে থাকবেন ভ্যালেন্টাইন, আর তাহলেই ইংরেজ ব্যাটসম্যানেরা হাতের তাসের মতো পিঠ উল্টে পড়বে। এই ধরনের ধারণা তাঁদের এমন পেয়ে বসেছিল যে, তাঁরা একজন ছাড়া দুজন ফাস্টবোলার দলে নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রথম টেস্টে নেওয়া হয়েছিল আমাকে, আর আমার সহযোগীরূপে ফ্রাঙ্ক ওরেলকে।"

রামাধীন মে-কাউড্রের সঙ্গে সংগ্রামে পরাভূত হওয়ার ফলে, প্রথম ইনিংস শেষে যে-টেস্টে ওয়েস্টইণ্ডিজের জয় অবধারিত মনে হয়েছিল, সেই খেলাতেই যখন শেষের দিকে বিশেষ চেষ্টায় পরাজয় এড়াতে হল তাদের (ওয়েস্টইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ৭২, খেলাশেষে)—তখন পিটার মে তাঁর মহোল্লাসের কাজে শ্রেষ্ঠ অংশীদার লাভ করলেন শত্রুশিবির থেকেই। গিলি বলেছেন : "আর সামান্য কিছু বেশি সময় পেলে ইংলণ্ড জিতে যেত। মে এই

খেলায় জিততে পারলেন না বটে, কিন্তু আরও বড় সংগ্রামে জয়ী তিনি, 'রামাধীন অপরাজেয়', এই রূপকথার তিনি ইতি ঘটিয়েছেন চিরদিনের জন্য। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অনুভব করল, পিটার মে আমাদের বড় উপকার করেছেন রামাধীন-রূপকথাকে ভস্ম করে। হয়ত আমরা ভবিষ্যতে কিছু বেশি সুযোগ পাব।"*

রামাধীনের অনিশ্চিত হাত থেকে বল কেড়ে নিয়ে গিলি পরবর্তী লর্ডস টেস্টে ভয়াবহ গতিতে সে বল ছুঁড়েছিলেন, সাফল্যও পেয়েছিলেন, তবু তাঁর তিক্ত হাসি থামেনি। না, ওয়েস্টইণ্ডিয়ান নির্বাচকদের চৈতন্য হবে না কিছুতে। এই লর্ডস-টেস্টেও তাঁরা মে'র হাতে মৃত রামাধীনের দেহটিকে পুনরায় মাঠে দাড় করালেন, শুধু তাই নয়, ঐ হাতে আর একটি নিষ্প্রাণ হস্তকে বেঁধে দিলেন, ভ্যালেণ্টাইনও স্থান পেলেন। গিলি পরিষ্কার বলেছেন, রামাধীনকে বসিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ভ্যালেন্টাইনের নির্বাচনের ত্রুটি স্বীকার করেছেন পরবর্তীকালে অন্যতম নির্বাচক ওয়ালকট :

"নির্বাচন ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্তের জন্য লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে আমরা বাঁধা পড়েছিলুম বহুলাংশে। এর জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব স্বীকার করি। এই টেস্টের পূর্ববর্তী সাসেক্সের সঙ্গে কাউন্টি-ম্যাচে ভ্যালেন্টাইন অদ্ভুত বল করে মোট ১০টি উইকেট পেলেন, তার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৪ রানে ৬টি উইকেট। এই কারণে দলে আসার দাবি তাঁর বেড়ে গেল। অন্যদিকে আবহবার্তা নির্ভুল হয়নি। উইকেটের চরিত্রও আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি। তার সঙ্গে ছিল পূর্ব ইতিহাস, লর্ডসে গতবারে রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইনের পূর্ণ প্রতাপের স্মৃতি। এই সমস্ত কারণ মিলিয়ে রামাধীনের সঙ্গে ভ্যালেণ্টাইন দলে এলেন। কিন্তু ফল মন্দ হল চরম। ভ্যাল দলে দর্শক হয়ে রইলেন। তার জন্য তাঁর অবশ্য কোনো দোষ নেই। কিন্তু তাঁর পরিবর্তে একজন দ্রুত বোলার নিলে ফলাফল ভিন্ন হতে পারত।"

এই টেস্টে ভ্যালের অ্যাভারেজ—৩—০—২০—০। এবং রামাধীনের—২২-৫—৮৩—১। রামাধীনকে ট্রুম্যান একই ওভারে লঙঅনের উপর দিয়ে তিন-

---

*গিলক্রিস্টের কথায় প্রচণ্ড হিংসা প্রকাশ পেয়েছে সত্য, কিন্তু তার কিছু বাস্তব কারণ ছিল। ওয়েস্টইণ্ডিজের অধিনায়ক জন গডার্ড ফাস্টবোলারদের কিভাবে উপেক্ষা করতেন তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে ওয়ালকট লিখেছেন—'গডার্ডের দুঃখের সূত্রপাত ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট থেকেই (১৯৫১)। এই টেস্টে তিনি এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যার ফলেই হয়ত অস্ট্রেলিয়া জিতে যায়। ২৩৬ রানের ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়া তাদের চতুর্থ ইনিংস শুরু করে। তারপরে আমরা তাদের পাঁচটি উইকেট ফেলে দিলাম ১৪৯ রানে। এই অবস্থায়, আমার মনে হয়, আমাদের পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু গোমেজ ও ওরেল মাত্র পাঁচ ওভার নতুন বল ব্যবহার করার পরে গডার্ড রাম ও ভ্যালকে আনিয়ে শেষপর্যন্ত রেখে দিলেন, যে-সময়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া মাত্র একটি উইকেট হারিয়ে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেল।...গডার্ড এমন একটা কাজ করলেন, যাতে অনেকের চক্ষুস্থির।..তিনি নতুন বল ধুলোয় ঘষে তার পালিশ উঠিয়ে দিলেন যাতে তাঁর স্পিনাররা কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।'

অবশ্য ওয়ালকট একথাও স্বীকার করেছেন, গডার্ডের জায়গায় থাকলে তিনিও হয়ত অনুরূপ করতেন। রাম ও ভ্যালের উপর ঐকান্তিক আস্থার যথেষ্টই কারণ ছিল।

বার ওভারবাউন্ডারিতে পাঠাতে ওয়ালকট পর্যন্ত বলেছেন—'হতভাগ্য রাম!'

এই টেস্ট সম্বন্ধে ওয়ালকটের আক্ষেপোক্তি গিলক্রিস্টের পক্ষেই যাবে। ওয়ালকটের মন্তব্য ইতিহাসের পরিহাসের চেহারা খুলে ধরেছে: "অভাবনীয় বৈপরীত্যে পূর্ণ ক্রিকেটের স্বরূপ। তাহলেও ১৯৫০-এর লর্ডস-টেস্ট ও ১৯৫৭-র লর্ডস-টেস্ট—এই দুই টেস্টের মধ্যে বিরাট পার্থক্যের অনুরূপ অদ্ভুত কাণ্ড ক্রিকেটের বিচিত্র স্বভাবের মধ্যেও ঘটেছে কিনা সন্দেহ। ১৯৫০ সালে আমরা বিজয়লাভ করেছিলুম, তার মূলে রামাধীন ও ভ্যালেন্টাইনের স্পিন-বোলিং। ১৯৫৭ সালে ইংরেজদের সীম-বোলিং আমাদের হারিয়ে দিল ইনিংস ও ৩৬ রানে।"

লর্ডস-টেস্টে শোচনীয় পরাজয় হলেও এর মধ্যে গিলির ব্যক্তিগত তৃপ্তির কিছু ব্যাপার ঘটেছিল। যথা—এক, ওয়েস্টইণ্ডিজের স্পিন-বোলারদের ব্যর্থতা, দুই, দ্রুত বোলারদের সাফল্য। আরও বিশেষভাবে, 'দ্রুত বো-লা-র-টি-র' সাফল্য, যার নাম রয় গিলক্রিস্ট। ইংলণ্ডকে খেলতে হয়েছিল একটিই ইনিংস, তাতে গিলি ৩৬·৩ ওভার বল দিয়ে ১১৫ রানে ৪টি উইকেট পেলেন—দ্বিগুণ পেতেন যদি তাঁর একটু বেশি অভিজ্ঞতা থাকত—গিলি জানিয়েছেন।

গিলি আনন্দে ডগমগ। যে চারজনকে আউট করেছেন, তাঁদের দুজন হলেন পিটার মে ও টম গ্রেভনী: গ্রেভনী—এল-বি-ডবলিউ—ব গিলক্রিস্ট—০; পিটার মে—ক কানহাই—ব গিলক্রিস্ট—০। "মে ও গ্রেভনীকে শূন্যরানে আউট করে বুঝলুম, বড় নাম মানেই দুর্ভেদ্য কিছু নয়, প্রত্যেকেরই দুর্বল স্থান আছে" ---গিলির নম্র অহঙ্কার।

কিন্তু গিলিকে আনন্দে পাগল করেছিল অন্য একটি জিনিস—"একজন বোলারের পক্ষে সত্যই অতি বেগে বল করা সম্ভব...আমি তাই করেছিলুম।"

'A bowler can bowl too fast, and I was doing just that.'

গিলির বলের গতি চমকে দিয়েছিল ট্রুম্যান-স্ট্যাথাম-অভ্যস্ত ইংরেজ-ব্যাটস-ম্যানদেরও। গডফ্রে ইভান্স সাঁ-সাঁ ব্যাট চালিয়ে বহু রান করেছিলেন। প্রথমদিকে গিলির বলে তাঁর ক্যাচ মাটিতে পড়ে যাওয়ায় 'গিলক্রিস্টের চোখ আতঙ্কজনক ভাবে বিস্ফারিত।' গিলক্রিস্ট মহা ক্রোধে অবিলম্বে বীমার ছাড়লেন মাথা লক্ষ্য করে। ব্যাট হাঁকড়ালেন ইভান্স, কিন্তু ছোঁয়া লাগল শুধু, এবং একটি রান হল।

'সর্বনাশ কাণ্ড!' কাউড্রে দেখলেন।—'করছ কি, ও দাদা গডফ্রে? তুমি যদি ঐ লোকটার বলে ওভাবে ব্যাট চালিয়ে শুধু খুচরো রান নিতে থাকো, তাহলে দোহাই, মাত্র একটি রান করো না—উল্টো দিকে গেলেই তোমার উপর জ্বলে-ওঠা রাগ লোকটা আমার উপর ঝাড়বে—বাউন্সারের পর বাউন্সার আসবে, আর কী ভয়ঙ্কর বাউন্সারগুলো!' এবং—স্লিপে ছিলেন ফ্রাঙ্ক ওরেল।—'গডফ্রে, দোহাই, গিলির বলে অমন তাড়ু চালিও না। আমি স্লিপে দাঁড়িয়ে ভয়ে মরে আছি।'

কলিন কাউড্রে, দ্রুত বলে সেরা মারিয়ে, আমার বাউন্সারে ভীত! সেরা ক্রিকেটার ফ্রাঙ্ক ওরেল স্লিপে দাঁড়িয়ে বল দেখে প্রাণভয়ে কাতর!!—এর থেকে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে!!! গিলক্রিস্ট উল্লসিত।

কিন্তু ভাই, আমি বলের জোর কমাতে চেয়েছিলুম, পারলুম কই?—দেখনা বলের গতি কণ্ট্রোল করে বেইলী কেমন অনেক বেশি উইকেট বাগিয়ে নিয়ে গেল—গিলক্রিস্ট একই সঙ্গে গতিগৌরবে লজ্জিত।

কিন্তু উদ্ভাসিত ও উচ্ছ্বসিত তিনি পরবর্তী টেস্ট প্রসঙ্গে :

'অবশেষে রামাধীন-দ্বন্দ্ব ফাটিল!'

"অবশ্য আমিও কোনো উইকেট পাইনি তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৯ ওভার বল ও ১১৮ রান দিয়েও।"

তাতে কি আনন্দ কি কমে যদি অপরদিকে রামাধীন ৩৮ ওভার বল ও ৯৫ রান দিয়েও কোনো উইকেট না পান? নিজের ব্যর্থতায় দুঃখ নয়, সহযোগীর ব্যর্থতায় আনন্দ, গিলির। ইংলণ্ড ৬ উইকেটে করল ৬১৯ রান. রিচার্ডসন ও মে সেঞ্চুরি করলেন, গ্রেভনী ২৫৮ রানের কম করলেন না।

গিলক্রিস্ট আপত্তি করে বলতে পারেন, তিনি সহযোগী খেলোয়াড়ের ব্যর্থতায় যেমন সুখী হন. সাফল্যেও আনন্দ পান না তা নয়। ট্রেণ্ট-ব্রিজের এই টেস্টেই ফ্রাঙ্কি ওরেল, কোনো জিনিসই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয় প্রমাণ করবার জন্য, ইনিংস সূচনা করে শেষ অবধি অপরাজিত থাকেন ১৯১ রান করে। ওরেল-প্রসঙ্গে 'অমিত্রাক্ষরের' গিলক্রিস্টও সমিল ছন্দে কথা বলেছেন :

"পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অপূর্ব বসন্তকালে একদা একটি লোক বর্তমান ছিল, তার নাম ফ্রাঙ্কি ওরেল। তাকে ভালবাসত সকলে। অনেকগুলি নামে তাকে ডাকত। সব ক'টি সুন্দর ও প্রাণপূর্ণ।

"যুগের সুন্দরতম ব্যাটসম্যান—তাকে বলত তারা—কারণ ফ্রাঙ্কি সত্যই তাই ছিল।

"তাকে তারা 'বাবাই' বলে ডাকত—ফ্রাঙ্কি, তরুণদের কাছে ঠিক তাই ছিল। তরুণদের প্রয়োজন ছিল পিতার পালন আর প্রশ্রয়ের। তাকে তারা 'ফ্রাঙ্কি' বলত—তারা জানত নাম ধরে ডাকলে সে কিছু মনে করবে না. একটুও নয়।

"এই বীরপূজকেরা যখন ফ্রাঙ্কির সঙ্গে খেলত. একটা প্রতিজ্ঞা তারা করেছিল। 'কখনই ঐ মানুষটিকে ডুবতে দেব না'—তারা বলেছিল। তারা বলেছিল —'মানুষটিকে'—বলেনি 'খোকাটিকে'—যেমন তারা বলতে অভ্যস্ত ওয়েস্ট-ইণ্ডিজে—কারণ ফ্রাঙ্কি সর্বসময়ে মানুষ, একজন যথার্থ মানুষ। Frankie was always a man, a real man.

"সেইসব দিনে গিলিও, আরও অনেকের মতোই, ওরেল-নামক ওয়েস্টইণ্ডিয়ান অপূর্বতার জন্য তার বুক চিরে বল করে গেছে।

"করেছিল এইজন্য যে, 'খোকাদের' মধ্যে এই একবার, শুধু একবারই, একজন মানুষকে দেখা গিয়েছিল, যে সত্যই ওয়েস্টইণ্ডিয়ান ক্রিকেটে মসলাসংযোগ করতে পারে, যে দিতে পারে লড়াইয়ের ক্ষমতা, ওয়েস্টইণ্ডিয়ান ক্রিকেটের যা ছিল প্রয়োজন...নিতান্ত...নিতান্তই...

"যখন 'কে-কার-ধার-ধারে' খেলোয়াড়ও ব্যাট হাতে নিয়ে ওরেলের অন্যপ্রান্তে হাজির হয়েছে, সে যেন বদলে গেছে সহসা, নতুন কিছু হয়ে উঠেছে, দৃঢ়-কঠিন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, শক্ত মেরুদণ্ড—যা সে কখনো ছিল না—তার সম্ভাবনা দেখায়নি সামান্য পূর্বেও।

"ফ্রাঙ্ক যখন তাঁর ম্যারাথন ইনিংস খেলছিলেন (ট্রেন্ট-ব্রিজ, ১৯৫৭) ইংলণ্ডের সঙ্গে, আমি নিজের চোখে দেখেছি, আউট হয়ে ফিরে এসে ছেলেরা—চামড়ার মতো শক্ত ছেলেরা—কান্নায় ভেঙে পড়েছে, কারণ তারা তাদের হীরোকে ডুবিয়েছে।"

হ্যাঁ, এ রচনা গিলক্রিস্টের।

ট্রেন্ট-ব্রিজের তৃতীয় টেস্ট ড্র হয়েছিল। লীডসে চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ড পুনশ্চ জিতল ইনিংস ও ৫ রানে। গিলি এখানেও খুশি। যেহেতু, ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে ওরেল পেয়েছেন—৭· ৬৭, নিজে পেয়েছেন ২—৭১, আর রামাধীন পেয়েছেন...কিছুই নয়, ১৯ ওভার বল করেও। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৭৯ রান করলেও ওয়েস্টইণ্ডিজ দু' ইনিংসে করেছিল ১৪২ ও ১৮২। এই টেস্টে লোডার বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, ওয়েস্টইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে হ্যাটট্রিক করে। যুদ্ধের পরে টেস্টে প্রথম হ্যাটট্রিক। লোডারের হ্যাটট্রিকের শিকারের মধ্যে গিলি ছিলেন, কিন্তু তিনি আনন্দ গোপন করতে পারেননি—কেননা রামাধীনও ছিলেন!!--

"And just in passing I might say that Gilly was one of the three in succesion ! Nice to see Ramadhin go the same way though !"

অবিশ্বাস্য সরল হিংসা।

শেষ টেস্ট ওভালে শোচনীয়তম পরাজয় ঘটল ওয়েস্টইণ্ডিজের। এক ইনিংস ও ২৩৭ রানে। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৪১২ রানের উত্তরে ওয়েস্টইণ্ডিজ দু' ইনিংসে করল ৮৯ ও ৮৬।

ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে রামাধীন ১০৭ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন (গ্রেভনী ও কাউড্রে শিকারের মধ্যে ছিলেন), তবু গিলক্রিস্টের দংশন এড়াতে পারেননি। অসুস্থতার জন্য গিলি এই ম্যাচে খেলেননি। তিনি লিখেছেন :

"আমাদের প্রবীণ খেলোয়াড়দের কেউ-কেউ ভাবেন যে, উইকেট লেকার ও লকের গায়ের মাপে কাটা হয়েছিল। তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের স্পিনাররা গেলেন কোথায়? রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইন কি লেকার ও লকের তুল্য নন? সোজা উত্তর—তাঁরা লক-লেকারের চেয়ে একশ যোজন পেছিয়ে। রামাধীন আমাদের বসন্ত-কোকিল, ক্যাপ্টেন গডার্ড তাঁর উপরে সমস্ত বাজি ধরেছিলেন 'রিপিট' খেলা আশা করে। মে, কাউড্রে, গ্রেভনী বাজি ধরেছিলেন তাঁকে নিকেশ করতে। ইংরেজরা প্রথম টেস্টের পরে সোনীকে সুদ্ধ ঝেঁটিয়ে মাঠ পরিষ্কার করে ফেলল। সফর শুরু হবার আগে থেকে রামাধীন-জুয়া চলেছে। যখনই তাঁকে বশ করা হল, তখনই আমার ধারণা তাঁকে বসিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ...ওভালে রামাধীন ১০৭ রানে ৪ উইকেট পেলেন...যে পিচে লক ও লেকার মাত্র ১২৫ রানে ১৬টি উইকেট পেয়েছিলেন। রামাধীন সফরের মধ্যে আমাদের যে-কোনো বোলারের চেয়ে একশো ওভারের বেশি বল করেছিলেন, অথচ উইকেট নিয়েছিলেন আমার ও ফ্রাঙ্কের দশটি উইকেটের চেয়ে মাত্র চারটি বেশি। কিন্তু গডার্ড নাছোড়, রামাধীনকে দিয়ে পুরনো কাণ্ড করাবেনই। রামাধীন যতই পিঠচাপড়ানি পেলেন, ততই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, ততই মন্দ বল করলেন।

"ভ্যালেন্টাইন, যে-ব্যক্তি ইংলণ্ডকে ১৯৫০-এ ছত্রকুটে দিয়েছিলেন, তাঁর সে

পুরনো চেহারা একবারও দেখাতে পারেননি। এবং...অনেক ওয়েস্টইণ্ডিয়ানের ধারণা, সেবার রামাধীনের চেয়েও ভ্যালেণ্টাইনের অবদান বেশি ছিল আমাদের সাফল্যে।...রামাধীন লর্ডস-টেস্টে ইভান্সের ক্যাচ ছেড়ে দিলেন। আমার দেখা জঘন্যতম মিস্। ইভান্স একেবারে গোল-গাপ্পা ক্যাচ দিয়েছিলেন। রামাধীন সেটা মাটিতে ফেলার পরে ইভান্স ৮২ করলেন।"

ইংলণ্ডে রামাধীনের 'এসেজ' দেখেই গিলক্রিস্ট প্রশমিত হননি, ঐ ভস্মকে কালস্রোতে বিসর্জন দিতে চান: 'তরুণ গিবস এত দ্রুত শিখে ফেলছে যে, সবাই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভুলে যাবে, রামাধীন নামে একটি খাটো লোক একদিন ছিল।'

কেন এতখানি আক্রোশ? তা কি দুজনের জীবনদর্শনের পার্থক্যের জন্য, যা গিলি আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন?—

"I never got round to seeing his point of view about life and about cricket."

শুধু এইজন্য, জীবন ও ক্রিকেটে দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রভেদের জন্য, এতখানি স্থায়ী বিদ্বেষ সম্ভবপর? একথা সত্য, ফাস্টবোলারের দেশ ওয়েস্টইণ্ডিজে রামাধীন ব্যতিক্রমের মতো (নেভিল কার্ডাসের স্মরণীয় সরলীকরণের কথা মনে পড়বে: ওয়েস্টইণ্ডিজে স্লো-বোলারের অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে), এবং একথাও সত্য, অধিনায়ক গডার্ডের একপেশে ধারণার জন্য ফাস্টবোলাররা উপযুক্ত প্রশ্রয় বা সুযোগ পায়নি (গডার্ডের জীবনদর্শনে সম্ভবত ফাস্টবোলারীয় হিংসার স্থান ছিল না)—তবু একথাও সত্য, রামাধীনের জন্যই ১৯৫০-এ ওয়েস্টইণ্ডিজ সিরিজ জিতেছিল ইংলণ্ডে! একথা উঠবে গিলি জানেন, তাই বারবার বলতে চেয়েছেন—রামাধীনের চেয়ে ঐ ক্ষেত্রে ভ্যালেণ্টাইনের দান কম তো নয়ই, বরং বেশি। তিনি ভ্যালের অনন্যনিষ্ঠা ও রক্ষণশীল দার্ঢ্যের দারুণ প্রশংসা করার পরে (যেন ও বস্তুগুলো রামের নেই!) তুলনায় রামের ফোকটে-পাওয়া ক্ষমতা বা freak-ability-র প্রতি প্রায়ই কটাক্ষ করেছেন। এমন কি অতীব চতুরতার সঙ্গে বিখ্যাত সমালোচকেরা রাম ও ভ্যালের তুলনাপ্রসঙ্গে যে-কথা বলেছেন, সেটিকে উল্টে দিয়েছেন। সমালোচকেরা বলেছিলেন, রামের তুলনায় ভ্যাল উইকেট বেশি পান এইজন্য যে, তাঁরা রামের বাণে জর্জর হয়ে অন্যপ্রান্তে স্বস্তি সন্ধান করেন, এবং তাঁদের সেই আলগা মেজাজের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে নেন ভ্যাল। শ্রীযুক্ত গিলক্রিস্ট এই বক্তব্যে যেখানে 'রাম' আছে, কেটে 'ভ্যাল' বসিয়েছেন এবং ভ্যাল-এর জায়গায় রাম।

তবু গিলির বিদ্বেষের কারণ অন্যত্র আছে বলে মনে হয়। তা কি জাতি-বিদ্বেষ—ওয়েস্টইণ্ডিজের পরভৃতদের বিরুদ্ধে? শ্বেতাঙ্গ আলেকজাণ্ডার, তাম্রাভ রামাধীনের সম্বন্ধে কৃষ্ণাঙ্গ গিলক্রিস্টের বর্ণবিদ্বেষ? হওয়া আশ্চর্য নয়। গিলির লেখায় অনেকবার 'খাঁটি ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ান' কথাটা মিলেছে।

এর সঙ্গে মিলেছে ব্যক্তিগত ঈর্ষা। রামাধীনের অতিসমাদরে গিলি যে নিতান্ত ঈর্ষাতুর ছিলেন, সেকথা গোপন করার প্রয়োজন মনে করেননি:

"'আমাদের খোকামণি, রামাধীন ও ভ্যালেণ্টিন'—বিখ্যাত ক্যালিপশো গানের মূল কথা এই...

"মোদ্দা কথায় এলে দেখা যাবে, সোনী একটি বিরাট সাফল্যময় ইংলণ্ড-সফর করেছিল, এবং ওয়েস্টইণ্ডিজে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একই জাতীয় একটি সিরিজ খেলেছিল। ঐ কালে সে বিস্ময়-বালক। ফোকটে-পাওয়া শক্তিতে সে বলকে দুদিকেই পাঠাতে পারত, ব্যাটসম্যান কোনোভাবে বুঝতে পারত না কিভাবে সে ব্যাপারটা ঘটাচ্ছে। এই অ্যাকশন স্বতঃলব্ধ—ওটা হয়ে যেত—সুতরাং এমন ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানের উপায় কি!

"কিন্তু সাফল্য, ও দিবারাত্র রেডিওতে গীত ঐ সাফল্য-সঙ্গীত সোনীকে ভাবিয়ে তুলল, কিসে সে বল-হাতে এই অপূর্ব চীজে পরিণত হয়েছে তা খুঁজে বার করতে হবে।

"সোনী উত্তর খুঁজে পেয়েছিল। আর তার ঠিক পরেই, 'প্রকৃতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করো না' এই নীতি অনুযায়ী তার সে ঐশ্বর্য হঠাৎ চলে গেল।"

ফাস্টবোলার-'দানব' গিলক্রিস্টও দেখা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে দার্শনিক হয়ে উঠতে পারেন। তবু, এখানেও, রামাধীনের বিরুদ্ধে গিলির রোষের শেষ কারণ এখনো পাইনি—তা নিশ্চয়ই—গিলক্রিস্টকে টেস্ট-ক্রিকেট থেকে অপমানের বোঝাসুদ্ধ তাড়িয়ে দিয়েছিল যে-গোষ্ঠী, তার মধ্যে একজন ছিলেন সোনী রামাধীন। হাঁ, সোনী রামাধীন গিলির ফাঁসির পরোয়ানায় সই করেছিলেন...

সেকথা যথাস্থানে। এখন গিলির একটি শুভবাসনার কথা জানাই—তিনি হানিফ মহম্মদকে আউট করতে চান।

এর মধ্যে নতুন কি আছে? গিলি তো ব্যাটসম্যানের মাত্র একটি রূপে মুগ্ধ—প্যাভিলিয়নের দিকে পলায়নপর ব্যক্তিটির পৃষ্ঠসৌন্দর্যে! সেখানে হানিফের কথা বিশেষ করে ওঠে কেন?

না না, গিলিও ভালবাসতে পারেন। তাঁর চিত্তে প্রীতির অভাব নেই। তিনি হানিফকে পছন্দ করেন, সেইসঙ্গে আরও পাঁচজন ব্যাটসম্যানকে, যে ৬ জনের সঙ্গে 'বোলারের স্বর্গে' তিনি সাক্ষাতে অভিলাষী—হানিফ মহম্মদ, রোহন কানহাই, নীল হার্ভে, গেরী সোবার্স, নর্ম্যান ও'নীল, পিটার মে।

আগে দেখেছি গিলি মেসিন-ক্রিকেটের পক্ষপাতী নন, এখন দেখছি পক্ষপাতীও বটেন। হানিফ মহম্মদ তাঁর কাছে শ্রদ্ধেয় যন্ত্র। পাকিস্তানী ক্রিকেটাররা অনেকেই তাঁর কাছে সাধুবাদ পেয়েছেন। এতে আমরা খুবই খুশি, যেহেতু পাকিস্তানীরা আমাদের পৃথগন্ন ভ্রাতা ছাড়া আর কিছু নন। গিলি বলেন:

'The Pakistanis were top cricketers, and among them Hanif and Fazal were real class players'.

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের ওয়েস্টইণ্ডিজ সফর উপলক্ষেই গিলি ঐকথা বলেছেন। পাকিস্তান সেবার গৌরবময় সফর করেছিল। হেরেছিল, কিন্তু জিতেও ছিল টেস্টে, ওয়েস্টইণ্ডিজের ভূমিতেই। সফরের মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল দুটি নাম—হানিফ ও ফজল। ঐ সফরে ব্রিজটাউনে প্রথম টেস্টে ওয়েস্টইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে ৫৭৯ করে ডিক্লেয়ার করল। তারপরে সেই হাতীর সামনে ১০৬ রানের একটি মশক-ইনিংস প্রসব করল পাকিস্তান।

গিলি ৪—৩২। দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের ধ্বসে যাওয়াটা শুধু সময়ের ব্যাপার। বটে?—

"একটি খাটো ধারালো লোক, হানিফ তাঁর নাম, স্থির করলেন উইকেটে ঝুরি নামাবেন। ফলে দর্শকদের কাছে ক্রিকেট-ইতিহাসের দীর্ঘতম ব্যাদিতবদন ইনিংস উৎপন্ন হল। ব্যাদিত-বদন শুধু—হাঁ-করা মুখে চোয়ালের কব্জা আটকে গিয়েছিল বলো! লোকটি ব্যাট করল ষো-ল-ঘ-ণ্টা-তে-র-মি-নি-ট!!! স্যার লিওনার্ড হাটনের ওভালী ইনিংসের চেয়েও তিন ঘণ্টা বড় একটি ইনিংস। হানিফ মহম্মদের নাম হওয়া উচিত মেসিন-মহম্মদ। তাঁর ভাবগতিক—কেউ যেন তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, একদম নট নড়ন-চড়ন। আমরা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লুম তাঁর উপর। কিন্তু যাই দিই না কেন, তিনি সবই গ্রহণ করলেন, তারপর সেগুলিকে ঠেলে গুঁজে সরিয়ে নাড়িয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলেন মাঠে। চারটি সেঞ্চুরি-জুটিতে তাঁর অংশ ছিল—ইমতিয়াজ, আলি-মুদ্দীন, সয়ীদ আমেদ ও ওয়াজির মহম্মদের সঙ্গে। যখন অবশেষে হানিফ বিদায় নিলেন ডেনিস অ্যাটকিনসনের হাতে—ডেনিস ৬২ ওভার বল করেছেন তার মধ্যে—তখন হানিফ, হাটনের ম্যারাথন স্কোরের মাত্র ২৮ রান পেছিয়ে আছেন। তবে, নিশ্চয়ই হানিফের এই ইনিংস শ্বাসরোধী কিছু নয়, দর্শকের কাছে তো নয়ই—ক্লান্তি, ক্লান্তি, অনন্ত ক্লান্তিকর ইনিংসটি।"

হানিফের উল্টোদিকে আর একটি দীর্ঘ ইনিংস ছিল...তৃপ্তি...তৃপ্তি...তৃপ্তি-কর সেটি। সে ইনিংস সোবার্সের।

কিংসটনের তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্টইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে সোবার্স ব্যাট ও ইতিহাস হাতে নিয়েছিলেন। আগের টেস্টে ওয়েস্টইন্ডিজ জিতেছিল। এই টেস্টে পাকিস্তান খেলা শুরু করে করল ৩২৮। তারপর ওয়েস্টইন্ডিজ আরম্ভ করল। ফজল বোলিং করতে লাগলেন, তাঁর মতো দ্রুতগতি বোলার ৮৫ ওভার বল দিলেন এক ইনিংসে। কারদার আঙুল ভেঙে বিদায় নেবার অগে বাঁ হাতে ধীর বল দিলেন ৩৭ ওভার। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে সোবার্স কী করছিলেন? গিলির নিজ মুখেই শোনা যাক:

"হান্ট ও সোবার্স যে-ইনিংস খেললেন, তা আমার দেখা শ্রেষ্ঠ ইনিংসগুলির কোনটির চেয়ে কম নয়। তাঁদের জুটিতে রান হল ৪৪৬, যেকোনো উইকেটের টেস্টজুটির রেকর্ডের চেয়ে মাত্র ৫ রান কম। জুটি ভাঙল যখন নিতান্ত ক্লান্ত হান্ট রানআউট হয়ে গেলেন। আমার কদাপি মনে হয় না, হান্টকে কেউ বল দিয়ে আউট করতে পারত। সেকথা গ্রেট সোবার্স সম্বন্ধেও সত্য। উইকেট নিখুঁত, সোবার্সও তাই। ধীরে, অভ্রান্তভাবে সোবার্স সেঞ্চুরিতে পেঁছিলেন। তারপর দেড়শো। দুশো শুধু সময়ের ব্যাপার। তারপর আড়াইশো। তারপর তিনশো। হঠাৎ সাবিনা-পার্কের কুড়ি হাজার দর্শক নড়েচড়ে বসে। পরিবেশে বিদ্যুৎ খেলে যায়। বেড়ার ধারে কিংবা স্ট্যান্ডের পিছনদিকে বসা ছোকরার দল প্রতি বলে বাজি ধরতে লাগল। জানি না সোবার্স কি ভেবেছিলেন যখন তাঁর রান ৩৫০-এ পেঁছিল। কিন্তু দর্শকেরা অনুভব করল হাড়ে-হাড়ে। তারপর ৩৬০। সাবিনা-পার্কের দৃশ্য এখন কল্পনাতীত। ৩৬১-তে দর্শকেরা গোঙাচ্ছে, কপালের ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, যদিও সোবার্স অনুত্তেজিত, যেন পাড়ার ম্যাচ।

তারপর হঠাৎ...রেকর্ড ভাঙল—লেন হাটনের রেকর্ড, ইংরেজদের প্রাণের ধন। সোবার্স ৩৬৫ নটআউট। দর্শকেরা পাগল। দশ ঘণ্টা আট মিনিট ধরে তারা দেখেছে তাদের নতুন বীরকে, তারা আর স্থির থাকতে পারল না, উত্তেজনা ফেটে পড়ল উন্মত্ত কোলাহলে, যেন বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল, বা ঐ ধরনের কিছু। জনতা নেমে পড়ল মাঠে, ধেয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বার্বাডোজের লম্বা রোগা চেহারার ছেলেটির উপর, প্রায়-অসম্ভবকে সে সম্ভব করেছে। কেউ যদি বলতে চান, সোবার্স এ কাজ করেছেন দুর্বল আক্রমণের বিরুদ্ধে, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই, স্যার লিওনার্ড যখন তাঁর কাজটা করেছিলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ান বোলিং নিশ্চয় পূর্ণশক্তিসম্পন্ন ছিল না।...পরম বিস্ময়, সর্বোচ্চ রানের এই টেস্ট-রেকর্ড সোবার্সের প্রথম টেস্ট-সেঞ্চুরিও বটে। সোবার্স মাঝামাঝি কিছুতে বিশ্বাস করেন না। No half-measures with Gary!

সোবার্স থামলেন না। পরের টেস্টে পর-পর দু' ইনিংসে সেঞ্চুরি। ফলে তিন ইনিংসে তাঁর রান দাঁড়াল ৫৯৯, একবার নটআউট তার মধ্যে।

সোবার্স—ক্রিকেটের বিস্ময়। সেই বিস্ময়রূপীর যোগ্য বন্দনা করেছেন গিলি। পৃথিবীর সেরা ডান হাতের ব্যাটসম্যান কানহাইয়ের পাশে সেরা বাঁ হাতের ব্যাটসম্যান সোবার্সকে রেখে তুলনা করেছেন। একজন শক্তির প্রতীক, অন্যজন কোমল সুষমার। সোবার্সের শক্তি, কানহাইয়ের শান্তি। সোবার্সের বহু মারেই বলদৃপ্ততা প্রকাশ পায়। সোবার্স যখন হাটনের রেকর্ড ভাঙছিলেন, তখন সকলে অবাক হয়ে ভেবেছে, 'তিনি কি করে এত দীর্ঘ সময় ধরে এত দ্রুত খেলতে পারেন!' সোবার্স হাটনের রেকর্ড ভেঙেছিলেন হাটনের চেয়ে তিন ঘণ্টা সময় কম খেলে। সোবার্সের একটি অনবদ্য মার লেগ-ফ্লিক। লেগে বাউণ্ডারি করতে উদ্যত সোবার্স অনেক সময়ে কব্জির মোচড়ে বলটিকে বিদ্যুৎ-বেগে লেগস্লিপ ও স্কোয়ারলেগের মধ্য দিয়ে চালিয়ে দেন, এত প্রচণ্ড বেগে বল ছোটে যে, থার্ডম্যান বাউণ্ডারিতে ধাক্কা খাওয়ার আগে সেই বলের বিষয়ে কিছু জানতে পারে না। তীব্র দ্যুতিময় রূপে মারটি রসিকের চোখ ঝলসে দেয়:

'No man should be that brilliant.'

'Sobers has all the strokes and even some more that have not been invented!'

সোবার্স ও কানহাই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে গিলি ট্রেভর বেইলীর উক্তি স্মরণ করেন। বেইলী বলেছিলেন, 'ওয়েস্টইণ্ডিয়ানরা বই মিলিয়ে ক্রিকেট খেলে না।' গিলি বলেন, 'ওয়েস্টইণ্ডিয়ানরা যে-বই অনুযায়ী খেলেন, তা এখনো মুদ্রিত হয়নি', আর...'ইংরেজী ব্যাটিংয়ের বই সেকেলে হয়ে গেছে, সেই বই থেকে রান বেরুনো সম্ভব বলে ওয়েস্টইণ্ডিয়ানরা বিশ্বাস করে না।'

সোবার্সের সক্রিয়তার মতোই হানিফের নিষ্ক্রিয় নিরাপত্তা গিলিকে আকৃষ্ট করেছে। হানিফ গিলক্রিস্টের নিয়মিত খাদ্য ছিলেন ঐ সিরিজে—তবু গিলি ভুলতে পারেননি, হানিফের আছে ফার্স্টক্লাস ম্যাচে দীর্ঘতম অবস্থানের রেকর্ড। হানিফের ভাই ওয়াজির মহম্মদকে তাঁর স্ট্রোকের জন্য গিলির বেশি ভাল লাগে। হানিফ যেখানে মেঘ-মাজা আলো, ওয়াজির সেখানে রৌদ্রমদ্য। গিলি এও স্মরণ রাখেন যে, হানিফ মহম্মদেরা তিন ভাই মিলে পৃথিবীর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট-পরিবারের সৃষ্টি করেছেন। ১৯৫৯ সালে, করাচীতে যে-খেলায় হানিফ ৪৯৯ করলেন, সেই খেলায় একই দলে ছিলেন তাঁর দুই ভাই ওয়াজির ও মুস্তাক। এবং দলে না থাকলেও চতুর্থ এক ভাই প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেট খেলেছেন। 'অপূর্ব ক্রিকেট-ভ্রাতৃত্ব!'—গিলি না বলে পারেননি।

তবু হানিফ হলেন হানিফ। "ক্ষুদ্র হানিফ যখন তাঁর মস্ত টুপি মাথায় চড়ান, তখন তাঁকে আরও ক্ষুদ্র দেখায়। কিন্তু খেলার সময়ে তিনি আকারে বেড়ে যান। হানিফ সেই ধরনের মানুষ, যাঁকে উইকেটে দেখলে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু জাগে না। কুট্ কুট্ কুট্—খুট্ খুট্ খুট্—ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্—খাটো লোকটি এত ধৈর্যশীল যে, সন্দেহ হয়, ক্রিকেট সময়-বাঁধা খেলা, একথা তিনি কোনো-দিন শুনেছেন কি-না! তিনি এগিয়ে চলেন, সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে অগ্রসর হন কচ্ছপ-পায়ে, সেসব রেকর্ডে অন্যের হয়তো আগ্রহ হবে না, কিন্তু তাহলেও রেকর্ডের দ্বারা তাঁর সুনাম বেড়ে যায়, সুতরাং সকলে তাঁকে দেখতে যায়, দেখতে যায় যে, স্বয়ং রোদে দাঁড়িয়ে তিনি সময়কে কিভাবে রোদে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন!"

এমন কি ব্রাডম্যানও। তিনি দেখতে যাননি কিন্তু অবশ্যই শুনেছেন। হানিফ প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর ৪৫২ রানের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। কেবল ঠুকঠাক নয়, চমকপ্রদ মারে ও দ্রুত রান করাতেও তিনি পারদর্শী, তা দেখা গেছে ১৯৬৪ অস্ট্রেলিয়া-সফরে—সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি করেছেন—এবং তা ঠেলে গুঁজে কেটে নয়—মেরে—মেরে এবং মেরে।

এই মরশুমেই পাকিস্তান ক্রিকেটারদের এক সংবর্ধনাসভায় 'ক্ষুদে ওস্তাদ' হানিফ মহম্মদের সঙ্গে বড়ো ওস্তাদ ডন ব্রাডম্যানের প্রথম মিলন হল। স্যার ডোনাল্ড অনবদ্য সকৌতুক ভাষণ উপহার দিলেন শ্রোতাদের। বিবরণী এই:

"এডিলেড, ১৭ই ডিসেম্বর। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, স্যার ডোনাল্ড ব্রাড-ম্যান আজ সেই মানুষটির সহিত মিলিত হন, যিনি প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁহার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানসংখ্যার রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন—তিনি হইলেন পাকিস্তানের হানিফ মহম্মদ। এডিলেডে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট-দল কর্তৃক পাকিস্তান-দলকে প্রদত্ত এক সংবর্ধনাসভায় উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে।

" 'যিনি আমার কষ্টদায়ক ৪৫২ রানের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন, আমি সর্বদা তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছি', স্যার ডোনাল্ড বলেন, 'এবং আমার আশা ছিল তিনি দৈর্ঘ্যে হইবেন ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি ও ওজনে ১৫ স্টোন। ভাবিয়া দেখুন, আমি কিরূপ বিচলিত হইলাম, যখন সত্যই তাঁহাকে দেখিলাম'—স্যার ডোনাল্ড হ্রস্বাকার হানিফ মহম্মদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'যিনি দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, ওজনে সাড়ে নয় স্টোন।'

"সংবর্ধনাসভায় স্যার ডোনাল্ড বলেন, তিনি সর্বদা চাহিয়াছেন হানিফ মহম্মদের সহিত মিলিত হইয়া সাক্ষাতে অভিনন্দন জানাইবেন। তিনি স্মরণ করিতে পারেন, হানিফ যখন ১৯৫৮-৫৯-এ করাচীতে ৪৯৯ করিয়া তাঁহার ৪৫২ নটআউট রানের রেকর্ড ভঙ্গ করেন, তখন অভিনন্দনবাণী প্রেরণ করিয়া-ছিলেন।

" 'কিন্তু আমার সপক্ষে আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, ৪৫২ রান করিবার পরে

যখন সবে গরম হইয়া হাত খুলিতেছি, তখন ক্যাপ্টেন ইনিংস শেষ করিয়া দেন, অপরপক্ষে হানিফ দিনের শেষ বল মারিয়া ৫০০ পৌঁছিবার চেষ্টায় রানআউট হইয়া যান'—সমবেত উচ্চ হাস্যের মধ্যে স্যার ডোনাল্ড যোগ করিয়া দেন।" (স্টেটসম্যান—১৯।১২।৬৪)

তবু...হানিফ মহম্মদ নন, অন্য একটি পাকিস্তানী ক্রিকেটার গিলক্রিস্টের সর্বোচ্চ অনুরাগের পাত্র। তিনি ফজল মামুদ, 'ইংলণ্ডকে যিনি তার নিজের বাড়িতে সাবাড় করেছিলেন পাকিস্তানের প্রথম ইংলণ্ড-সফরকালে', এবং 'যিনি তাঁর কালের সবচেয়ে বড় মিডিয়াম-পেস বোলার'—গিলি বলেছেন।

ফজল ফাস্ট-মিডিয়াম বোলাররূপে শুরু করেছিলেন। যত তাঁর গতি কমেছে, বেড়ে গিয়েছে মারাত্মকতা। তিনি বেডসারের মতো লেগ-কাটার দেন, উল্টো-দিকেও কাট করাতে পারেন, যে-ধরনের বহুমুখিতা এই জাতীয় বোলিংয়ে অদ্ভুত ব্যাপার।

ইংলণ্ডের লীগ-ক্রিকেটে খেলতে গিয়ে ছোকরাদের নিয়ে ফজল যথেচ্ছ করেন, পরিপক্কদের নিয়েও, যাঁরা অনেকেই প্রাক্তন নামী টেস্ট-ক্রিকেটার। 'ফজলের বলে খেলতে-খেলতে বহুসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ বেড়ে উঠবে, উঠে যাবে শিখরে, এবং কৃতজ্ঞতাবোধ করবে একজনের কাছে, যিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অশ্বেতাঙ্গ ক্রিকেটার, যাঁর নাম ফজল মামুদ।'

কিন্তু ভারতবর্ষ? উঁহু, ভারতবর্ষ গিলক্রিস্টের শ্রদ্ধা পায়নি। সেটাই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষ গিলির উদয় ও বিলয়ক্ষেত্র—এদেশ যে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিতে অনুলিপ্ত থাকবে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে! গিলক্রিস্টের ভারত-বিবরণের দুটি অধ্যায়ের নাম 'সফরে গণ্ডগোল' এবং 'বিতাড়ন'।

গিলক্রিস্ট ভারতীয় ক্রিকেটারদের বিষয়ে কথা বলার সময়ে একটি শব্দ বারবার উচ্চারণ করেছেন—'শত্রু'। কোনো ভারতীয় ক্রিকেটারের তিনি প্রশংসা করতে পারেননি প্রাণ খুলে। পৃথিবীর একজন সেরা লেগব্রেক বোলার, যিনি একটি টেস্টে প্রায় একাকী গোটা ওয়েস্টইণ্ডিজকে নামিয়ে দিয়েছিলেন, সেই গুপ্তে কিভাবে মার খেয়েছেন, সেই কথাই বড়ো গলায় গিলক্রিস্ট বলেছেন। বোরদে, যে-বোরদে মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্টে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করার পরে দ্বিতীয় ইনিংসে আর একটি সেঞ্চুরি করতে যাচ্ছেন, রান ৯৬-এ উঠেছে, তাঁকে সুযোগ করে দেওয়া তো দূরের কথা, সেই অবস্থাতে তাঁর উপর বাম্পার ছুঁড়েছিলেন গিলক্রিস্ট, ফলে বোরদে শরীর সামলাতে না পেরে হিট-উইকেট হয়ে যান—নির্লজ্জের মতো গিলক্রিস্ট জানিয়েছেন—'আমি তাতে মোটেই অখুশি হইনি'—সেই বোরদেও অল্পমাত্র প্রশংসা পেয়েছেন গিলক্রিস্টের। যদি বোরদের কিছু বেশি প্রশংসা করে থাকেন গিলি, সে তাঁর ব্যাটিংয়ের জন্য নয়, ব্যবহারের জন্য, কেননা বোরদে (উমরিগর, মঞ্জরেকরও) গিলক্রিস্টের সাক্ষাতে ইংরেজিতে ছাড়া কথা বলেননি, যেখানে অপর ভারতীয়রা দুর্বোধ্য মাতৃভাষায় কথা বলতেন। গিলক্রিস্টের ধারণা, তাঁরা তাঁকে গালাগাল করতেন (বলাবাহুল্য ভারতীয়রা গিলক্রিস্টের মতো বোধগম্য ভাষায় গালাগাল করবার সাহস বা সভ্যতা অর্জন করে উঠতে পারেননি)। গিলক্রিস্ট যা-কিছু ভারতীয় দেখেছেন তাকেই বিদ্রূপ

করেছেন বা গাল দিয়েছেন। সফর-শেষে সুখস্মৃতির যে-হিসেব দিয়েছেন, তার মধ্যে ভারতের পক্ষে কিছু নেই—দুঃখস্মৃতির অংশে আছে ভারত। মনে রাখা ভালো, গিলক্রিস্ট এইসব কথা লিখেছেন ক্রিকেট-কোচরূপে ভারতের পয়সা পকেটে পুরে প্রত্যাবর্তনের পরে—অপরপক্ষে অপমানে অনুদ্বিগ্ন ভারত তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ করে এনেছিল এদেশে—যদিও ভারতীয় ক্রিকেটারকে মারার ফন্দীর জন্য তাঁর স্ব-দলের অধিনায়ক একদা শাস্তি দিয়ে তাঁকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। এইজন্য, অন্য কারণ বাদ দিলেও, সারা পৃথিবীর কাছে ভারত অলৌকিকতাপূর্ণ।

গিলক্রিস্ট ভারত-ভ্রমণকথা শেষ করেছেন এই বলে : "কানহাই ও সোবার্সের ব্যাটিং—এত অপূর্ব, অসাধারণ, এত সুন্দর যে, যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। ...বুচার ও সলোমনের শক্ত বাঁধুনির ব্যাটিং, মধ্যপর্যায়ের আক্রমণশক্তিকে নিরাপদ, এমন কি রক্ষণশীল স্থিতিতে পূর্ণ রেখেছিল, ইংলণ্ডের পুরনো ব্যাঙ্কের মতো।...উইকেটকীপার আলেকজাণ্ডারের উইকেটরক্ষার নৈপুণ্যে তাঁকে ওয়েস্টইণ্ডিয়ান উইকেটকীপারদের শীর্ষে রেখেছিল। তিনি এত ভাল হয়ে উঠেছিলেন যে, আমার বা হলের মতো দ্রুত বোলারের ক্ষেত্রেও তাঁর ফার্স্ট-স্লিপ লাগত না। আলেকজাণ্ডার কত, কতবার ফার্স্টস্লিপের জায়গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ডান হাতের উপর ভর করে, ফলে বেশ কয়েকবার মাঠ ত্যাগ করতে হয়েছে রক্তাক্ত হাতের পরিচর্যার জন্য। মনে পড়ে আমার বন্ধু সুবিশাল হলের বোলিংয়ের কথা। মনে পড়ে ভারতের বিখ্যাত জায়গাগুলিতে দুপুরে বা রাত্রে তাঁর সঙ্গে বেড়ানো, সর্বক্ষণ...সর্বক্ষণ...ক্রিকেটের চিন্তা মাথায় নিয়ে...। আর কোলি স্মিথের শেষ টেস্ট, যাতে তিনি কত ভাল করেছিলেন, যে-স্মৃতি... কোলি আর নেই...কখনো মন থেকে মুছবে না।

"আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্যুরের বিষয়ে এই কটি স্মৃতিই আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই, যে-সময়ে আমি বল-হাতে দৈত্য ছিলাম, এবং প্রতিটি উইকেট-প্রাপ্তিকে সুখে উপভোগ করতাম।"

গিলক্রিস্টের দুঃখস্মৃতিও যথেষ্ট। সে প্রসঙ্গে কিছু পরেই আসা যাবে। তার আগে অনুসরণ করে ১৯৫৯ সালের ভারত-ওয়েস্টইণ্ডিজ ক্রিকেটে প্রবেশ করা যাক।

এই সফরে ভাল কিছু করতে গিলি বদ্ধপরিকর ছিলেন। ওরেল, উইকস, ওয়ালকট, তিন ডবলিউ, ওয়েস্টইণ্ডিজ ক্রিকেট থেকে বিদায় নিয়েছেন—তাঁদের শূন্যস্থান পূরণের দায়িত্ব আছে। তাছাড়া অনেকেই কাড়াকাড়ি করছে টেস্ট-ম্যাচের সময়ে উইকেটের কাছাকাছি রোদ পোয়াতে। যদি ভাল কিছু না করতে পারেন, এখানে নাম কাটা তো যাবেই, দেশে ফিরে গেলে দেশবাসী হাতে মাথা কাটবে।

ভারতে রোদ কিন্তু বড় বেশি। গোড়ায় একদিন ভারতের মাঠের ফার্নেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিলি তো মূর্ছিত। কিন্তু—না, পরদিন তবিয়ৎ বহুত আচ্ছা। প্রতিজ্ঞাও জবর—এবার মূর্ছিত করতে হবে ভারতীয়দের, রোদে নয়, জলে নয়, বলে।

সে কী বর্বর বল! গিলক্রিস্ট হা হা করে ওঠেন। ফাদকারের চালাকি কেমন

ঘ্মচিয়ে দিয়েছি! একটা শিশ্মকে ডেকে আনা আমাকে র্মখতে?

গিলক্রিস্টের অশ্লীল হাসির নম্মনা: "কানপ্মরে দ্বিতীয় টেস্টের তিনদিন পরে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়-একাদশের সঙ্গে খেলায় আমি ১৬ রানে ৬ উইকেট নিল্মম।...বিশ্ববিদ্যালয়-দলে একটা ফচকে ছেলে ছিল, যাকে দাত্ত্ম ফাদকারের পরামর্শে ডেকে আনা হয়েছিল, কারণ ইংলিশ লীগ-ক্রিকেটে তাকে আমার বির্মদ্ধে ৫০ রান করতে ফাদকার দেখেছেন! এক্ষেত্রে দাত্ত্ম অবশ্য তাঁর ফচকে বন্ধ্মটির কোনো উপকার করলেন না। ছোকরার গতি হল স্থানীয় হাস-পাতালে, একটি হল-স্পেশাল খাওয়ার পর।"

ফাদকারের 'চালাকিতে' গিলক্রিস্টের রাগ সহজে যাওয়ার কথা নয়। কলকাতা-টেস্টে যখন ফাদকার ৪৩ ওভার বল করে ১৭৩ রান দিয়েও কোনো উইকেট পেলেন না, তখন গিলক্রিস্ট অগত্যা মন্তব্য করলেন—'এর পরে, আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, ফাদকার ভাবলেন, কেন মরতে ইংলন্ডের রচডেলের পেশা-দারী ক্রিকেট ছেড়ে এল্মম, যেমন হাসপাতালশায়ী তাঁর আবিষ্কৃত শিশ্মপ্রতিভা ভাবছিল।'

হল ও গিলক্রিস্ট যে-জাতীয় বল করছিলেন তা যে সকল সভ্যরীতির বহি-র্ভূত ব্যাপার, তা সদানম্র, ভদ্রতার চিরাদর্শ বিজয় হাজারের কথা থেকেই বোঝা যায়। হাজারে তাঁর আত্মকথায় বলেছেন:

"এই ম্যাচে (বরোদা—ওয়েস্টইন্ডিজ) হল ও গিলক্রিস্ট উভয়ের সম্ম্মখীন আমি হয়েছিল্মম। এই দ্মজন ফাস্টবোলারের নৈপ্মণ্যের কথা মনে রেখেও আমি স্মনিশ্চিতভাবে অন্মভব করেছিল্মম—এঁদের বোলিং-পদ্ধতি ক্রিকেটের আদর্শের বিরোধী। তাঁরা অবশ্যই ব্যাটসম্যানের 'দিকে' বল করতেন। তাঁদের বীমারগ্মলি অত্যন্ত মারাত্মক। বরোদায় কমপক্ষে আমাদের দলের পাঁচজন খেলোয়াড় আহত হয়েছিল। পরের সপ্তাহে গ্মজরাটের সঙ্গে আমাদের খেলার কথা—একসময়ে মনে হয়েছিল, আমরা বোধহয় টিম নিয়ে হাজির হতে পারব না। আমি শ্মনেছি, অল্পবয়সীদের নিয়ে তৈরী বিশ্ববিদ্যালয়-দলের বির্মদ্ধেও একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। স্বর্গত ডাঃ সি স্মব্বারায়নের মতো বিবেচনা-শীল সমালোচকও এই অন্যায় কৌশলের বির্মদ্ধে তীক্ষ্ম প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। মিলার ও লিন্ডওয়ালের দ্রুততম বোলিংয়ের সময়ে আমি তাঁদের বির্মদ্ধে খেলেছি। তাঁরা সত্যই বেশ-কিছ্ম সংখ্যায় বাম্পার দিতেন, কিন্তু তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য কখনই ব্যাটসম্যানের শরীর ছিল না। ভারত তখন এমন গর্তে পড়ে যে, প্রতিবাদ করার অবস্থা তার ছিল না, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, অন্য কোনো দেশে এ কান্ড ঘটলে তুফান উঠত, বডি-লাইন বিক্ষোভের মতোই ব্যাপার হত। এই সফরের পরে গিলক্রিস্ট আর কোনো সফর করেন নি বলে ইংলন্ড ও অস্ট্রেলিয়া হল-গিলক্রিস্ট জ্মটিকে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ দেখার স্মযোগ পায়নি।'

হাজারের চরিত্র যিনি জানেন, তাঁর কাছে হল-গিলক্রিস্টের বোলিংয়ের বীভৎসতার বিষয়ে আর কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই।

হাজারে ডাঃ স্মব্বারায়নের যে-সমালোচনার উল্লেখ করেছেন, তার উপর গিলক্রিস্টের মন্তব্য আছে। ডাঃ স্মব্বারায়ন হাজারের মতোই বলেছিলেন,

লিন্ডওয়াল কম ফাস্ট নন, কিন্তু তাঁরা 'terror-tactics' নেননি। পাঠক মনে রাখবেন, তাহলেও তাঁদের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ করেছেন লেন হাটন। এবং এর থেকেই বোঝা যাবে, হল-গিলির বল কতখানি নারকীয়। যাই হোক, ডাঃ সুব্বারায়নের মন্তব্য বোধহয় গিলক্রিস্টের বেপরোয়া হিংসাকে কিছুটা ধাক্কা দিয়েছিল, এবং ভারতীয় দর্শকদের ক্ষোভকে প্রকাশের শক্তি দিয়েছিল। গিলি সুব্বারায়নের প্রতিবাদের সঙ্গত উত্তর খুঁজে না পেয়ে বিদ্রূপ করা ছাড়া আর কিছু করতে পারেননি। গিলি বলেন, 'ভারতীয়রা হারছিল, আমরা জিতছিলাম, সুতরাং তারা এমন কথা তো বলবেই। মিলার-লিন্ডওয়ালও তো ইংলন্ডে অত্যধিক বাউন্সার দেবার জন্য নিন্দিত হন।'

ঠিক। তবে তাঁদের ছিল বাউন্সার, বীমার নয়। এবং...অফস্টাম্পের উপর বাউন্সার। আর...লেগের দিকে অত্যধিক লোক দাঁড় করানো হয়নি।...আর—

একটি ঘটনা জানাই। লিন্ডওয়াল স্বীকার করেছেন, তিনি বীমার দিয়েছেন ইচ্ছে করে, বেইলীর উপর, যে-বেইলী ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন মাটি আঁকড়ে পড়ে থেকেছেন।

লিন্ডওয়াল বীমার দিয়েছেন, সংখ্যায়...এ-ক টি! আর তার জন্য লিন্ডওয়াল ক্ষমাপ্রার্থনাও করেছেন।

ভারতীয় ক্রীড়ামোদীরা, বিশেষত ক্রিকেটাররা অন্তত একটি ব্যাপারে গিলক্রিস্টের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন—তিনি ভারতীয় ক্রিকেটের উপর থেকে গ্লানির পাথরখানা সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তিনি ও হল ১৯৫৯ সালে যে-জাতীয় বল করেছিলেন, তাতে ভারতীয়রা যে-খেলা খেলেছিল, তার থেকে ভাল খেলা আর কেউই খেলতে পারত না, কি ইংরেজ কি অস্ট্রেলিয়ানরা। এইবারের ভারতীয় ব্যাটিং-ব্যর্থতা নিয়ে বহু নিন্দা বর্ষিত হয়েছে—গিলক্রিস্ট তার স্খালন করেছেন।

গিলক্রিস্টের এই বক্তব্যের অনুরূপ কথা আমি আমার পূর্বের বহু রচনায় বলেছি। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছি, যেমন টাইসন-স্ট্যাথামের সামনে অস্ট্রেলিয়া দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়েছিল, ঠিক তেমনি হল-গিলক্রিস্টের সামনে ভারতীয়রা। কখনো-কখনো এমন ভয়াবহ শক্তির অভ্যুত্থান সম্ভব, যার বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে প্রতিরোধ আনা সম্ভব হয় না। তা যদি হত, চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সভ্যতার দেশে সমুদ্রঝড়ে ঘরবাড়ি উড়ে যেত না। হল গিলক্রিস্ট ভয়াবহ রাত্রির প্রলয়ঝড়।

গিলক্রিস্ট-বোলিংয়ের এই আত্মজীবনী:

"১৯৫৯ সালের এই ভারতীয় সফর আমার কাছে দুঃখজনক, ততোধিক শোচনীয় ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কাছে। উইসডেন তাঁদের সমস্যাকে এইভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করেছে—'গিলক্রিস্ট ও হলের মধ্য দিয়ে ওয়েস্টইন্ডিজ দুজন ভয়ঙ্কর ওপেনিং বোলার পেয়েছে, যা মার্টিনডেল ও কনস্টানটাইনের সময়কে স্মরণ করিয়ে দেয়।' ডিকি রত্নাকর নামক ভারতীয় লেখক বলেন, আমার বলের গতি বিদ্যুৎবৎ, হলের বল আরও দ্রুত হয় উইকেটে পড়ে। জুটি বটে! ভারতীয়রা নিজেদের সমালোচকদের হাতে গা-মতন ধাতানি খেয়েছিলেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, প্যাভিলিয়নে প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা মোটেই বেশি দুঃখিত হন-

নি। তাঁরা স্নায়ুপীড়িত হয়েছিলেন বললে অল্প বলা হয়। কিন্তু একটা কথা বলি : এই সফরে আমি ও হল যে-রীতিতে বল করেছিলুম, তার বিরুদ্ধে অন্য কোনো ব্যাটসম্যান বেশি-কিছু ভাল করতে পারতেন না, বর্তমান ইংরেজ ও অস্ট্রেলিয়ান শীর্ষ-ব্যাটসম্যানেরা পর্যন্ত নন। সুতরাং ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত রূঢ় হওয়া উচিত নয়।...স্বদেশে কিছু অমায়িক মধ্য-গতি বোলিংয়ের সম্মুখীন হবার পরে তাঁদের সাধ্যে ছিল না আমাদের প্রদত্ত গোলা-গুলির সম্মুখীন হওয়া, তাঁদের সে টেকনিকই জানা ছিল না, যেহেতু ভারতের দ্রুত বোলাররা আমাদের তুলনায় নিতান্ত মন্দগতি, তাঁদের বিরুদ্ধে খেলে আমাদের খেলতে যাওয়া মানে মলয় পবন উপভোগ করার পরে কালবৈশাখীর পাল্লায় পড়া। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দম ফেলবার সুযোগই হয়নি। যখন আমি বা হল নেই, তখন আছেন জাসউইক টেলর—অধিকাংশ দ্রুত বোলারের মতোই গতিশীল। এরিক অ্যাটকিনসনও গতিতে কম যান না।...এমন কি গেরী সোবার্সও ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দেখা বোলারদের চেয়ে দ্রুততর। সুতরাং তাঁরা যদি কিছু আশঙ্কিত হন, তাঁদের দোষ দিতে পারি না। এমন একটা দ্রুত বোলিংসংঘ নির্মাণ করেছিলুম, যার মুখোমুখি দাঁড়াতে আমার নিজেরই ঘৃণা বই আর কিছু হোত না। আমরা যথার্থ কি-ধরনের দ্রুত বল করছিলুম, তার কিছু ধারণা পেলুম যখন হলের বোলিংয়ের সময়ে আলেকজাণ্ডার আমাকে লেগস্লিপে দাঁড় করিয়ে দিলেন। একটা বল ঢুকে এল, সেটি থমাতে হাত বাড়াচ্ছি—বল বেরিয়ে গিয়ে বাউণ্ডারির বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে চোখের পলকে আমারি কাছে ফিরে এল, এবং সেটাকে নীচু হয়ে কুড়িয়ে নেওয়া ছাড়া আমাকে আর কিছু করতে হল না! যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়! সোজা চলে গেলুম কভারে, সেখানে যে ফিল্ডিং করছিল তাকে বললুম, ওহে, জায়গা বদল করো—আমার দায়িত্ব ওদের আউট করা, পুরানো দোস্ত্ হলের দ্বারা চূর্ণ হওয়া নয়। আমি স্থান বদল করতে পারি কি-না আলেকজাণ্ডারকে জিজ্ঞাসাও করিনি—আমি নির্ঘাত চলে গিয়েছিলুম! আমরা এমনই দ্রুতগতি ছিলুম। মনে হয় না, দুজনে এমন গতি আর ফিরে পাব। যদি ফিরে পাই, বাজি রেখে বলতে পারি, ভারতীয়রা মনেপ্রাণে প্রার্থনা করবে, সে গতি যেন তাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হয়!"

এই বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা ঠিক খেলল কেমন?

প্রথম টেস্টের আগে পুনায় সামরিক দলের সঙ্গে খেলায় সেনসেসন্। সেনগুপ্ত নামক ১৭ বছরের ছোকরা সেঞ্চুরি করে বসলেন। গিলি বললেন, প্রথম খেলায় তাঁরা যথেষ্ট গরম হয়নি, যা হয়েছিলেন পরবর্তী বরোদার সঙ্গে খেলায়। এই খেলায় তাঁদের উত্তাপের পরিমাণ সম্বন্ধে বিজয় হাজারের মন্তব্য আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। গিলক্রিস্ট নিজেও বলেন, এই খেলায় 'সব দিকে গোলাবর্ষণ করেছিলুম।' ফলে উইকেট পেয়ে গেলেন ৪—৩১। তার পরেই হলের উদয়। 'সত্যকার এক ঝটিকাপ্রবাহে' তিনি ভেঙে উড়িয়ে দিলেন বরোদাকে। এই খেলার জোরেই প্রথম টেস্টে হলের স্থানলাভ। বোলিংয়ে হলকে সঙ্গী পেয়ে গিলির সুখের সীমা রইল না। 'ম্যাচের সময়ে আমরা পরস্পর পরামর্শ করি। একজন সুবিধা করতে না পারলে অন্যজন উৎসাহ দেয়, দু' একটা ফন্দীও বাতলে দেয়। অনেক সময়ে আমি ও হল বল দেবার আগেই কোনো-কোনো ভারতীয় ব্যাটস-

ম্যানকে আউট করে দিয়েছিলুম। আহা, হল আমার প্রাণের বন্ধু। আমরা এক ঘরে থাকতুম, একসঙ্গে বেড়াতুম। ঐ সফরে এমন কিছু-কিছু লোক ছিল, যাদের কক্ষবাসী হতে আমি কদাপি রাজি হতুম না—কিন্তু ওয়েস্ হল—আহা হল—'

বরোদার সঙ্গে ওয়েস্টইণ্ডিজের জেতা-খেলা সময়ের অভাবে ড্র হল। মহারাষ্ট্রের সঙ্গে খেলাও তাই। এই খেলায় গিলি ৪—৪৮ উইকেট নিলেও নাদকার্নি ৯৫ রান করে পরাজয় ঠেকালেন। পরের খেলা ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে। সেখানে ঠেকালেন এ হল আপ্তে ৫৪ ও ৭০ করে। এই খেলায় হোল্ট তাঁর 'স্থগিত' সেঞ্চুরি সম্পন্ন করলেন, কারণ 'অবিবেচক' অধিনায়ক আলেকজাণ্ডার বরোদার সঙ্গে খেলায় হোল্টের ৯৪ নটআউটের মাথায় ডিক্লেয়ার করেন, যেমন একইভাবে ডিক্লেয়ার করেছিলেন তার আগের খেলায় বুচারের ৯৫ রানের মাথায়। সোবার্স 'ক্রিকেটক্লাবের' সঙ্গে খেলায় ৯৩ করলেন এবং রঞ্জনে নামক সুইঙ্গবোলার ওয়েস্টইণ্ডিয়ানদের সম্ভ্রম পেলেন। ওয়েস্টইণ্ডিয়ানরা দেখলেন, রঞ্জনে ভারতীয় দ্রুত বোলারদের মধ্যে সর্বোত্তম। সুতরাং তাঁকে সরিয়ে রাখার জন্য 'কৌসল' করলেন। রঞ্জনে যে কিছুই নন, এমনভাবে তাঁকে ঠেঙাতে চেষ্টা করলেন। অন্যদিকে কিছুই নয় এমন বোলারকে মহামর্যাদা দিয়ে আঁকুপাঁকু করতে লাগলেন। ফলে ভারতীয় নির্বাচকদের নির্বুদ্ধিতায় রঞ্জনে উপযুক্ত স্বীকৃতি পেলেন না, অথচ জায়গা পেতে লাগলেন 'ভাবী ট্রুম্যানের' দল যাঁরা টেস্টে সোবার্স-কানহাইয়ের আহার্যে পরিণত হলেন।

ক্রিকেটে এহেন দলগত চাতুরী চলিত আছে। গিলক্রিস্টের অধিকন্তু দাবি, তাঁর ব্যক্তিগত বুদ্ধি অল্প নয়। 'হুঁ হুঁ বাবা! আমার বুদ্ধি কত!'—গিলি জানিয়েছেন। তাঁর এহেন বুদ্ধির জোরে এই সফরে জাসউইক টেলরের জায়গা করে দিয়েছিলেন। টেলর ভালো বোলার; তারো বেশি, পেয়ারের লোক। তাকে সফরকারী দলে ঢোকাতে হবে, সুতরাং, সফরের ঠিক পূর্বে ওয়েস্টইণ্ডিজে যখন পাকিস্তানের সঙ্গে শেষ টেস্ট খেলা হচ্ছে, তখন মাত্র ৭ ওভার বল করার পরে গিলির পায়ের গোছে জীবনে প্রথম মোচড় লাগল (!), সুতরাং গিলি বল দিলেন না, দিলেন টেলর, বেশ ভালভাবে, ৫—১০৯, ফলে দলে জায়গা মিলে গেল।

হায়, গিলি যদি জানতেন তখন, পায়ে ইচ্ছাকৃত মোচড়ের গল্পটা তাঁর একচেটে নয়। সে কথা আসবে।

নিজের বুদ্ধির আরও প্রমাণ গিলি দিয়েছেন। ইডেনের পিচে নাকি বেশি ঘাস রাখা হয়েছিল বলের গতি কমাতে। তা দেখেই 'বুদ্ধিমান' গিলি বলের গতি কমিয়ে, বলে কায়দা বাড়িয়ে, ভারতীয়দের নিকেশ করে দিলেন। কিংবা মাদ্রাজে চতুর্থ টেস্টে 'মাথা খাটিয়েই' তো তিনি মানকদকে আউট করেছিলেন। 'লোকে আমাকে শুধু বোমার ব্যাপারী বলে, আমি সব সময়ে শুধু তাই নই, হামি কুছু-কুছু ব্রেনভি খাটাই'—গিলক্রিস্ট বিনয়ে বলেছেন।—মানকদ ব্যাট করছিলেন। তিনি আমার প্রথম বল, একটি ইয়র্কারকে লেটকাট করে স্লিপ ও গালির মধ্য দিয়ে বাউণ্ডারি করলেন। তখন আমি মানকদকে একটি কদর্য চাউনি ঝাড়লুম, আর আড়চোখে দেখে নিলুম মানকদ স্লিপের ফিল্ডারদের সঙ্গে কথা বলছেন আর ফিক্-ফিক্ হাসছেন। বুঝলুম, মানকদ আমাকে 'পড়তে'

চাইছেন—'পড়াশোনার' পরে যে উত্তর পেয়েছেন তা হচ্ছে ছয় অক্ষরের একটি একটি শব্দ—বা-আ-ম্-পা-আ-র্। আমিও আমার বাইশগজী দৌড় শুরু করলুম—তাঁর দিকে যতই ছুটে আসতে লাগলুম, দেখলুম, মানকদ ক্রমেই সরছেন- সরে যাচ্ছেন লেগস্লিপের দিকে—নিজেকে বাঁচাতে—বাম্পারটা যে আসছে তিনি নিশ্চিত!...আর এই সমস্ত সময়টা ধরে আমি ক্রমেই ঐ তিনটি সুন্দর জিনিস...তিনটি স্টাম্পের রূপ ভালভাবে দেখতে পেতে লাগলুম, সে-গুলিকে আড়াল করবার মতো কোনো শরীর সামনে নেই বলে। সুতরাং আমি হাতের বোমাটি সোজা ছুঁড়ে দিলুম, আর স্টাম্প ছটকে পড়ল স্লিপের দিকে... মানকদের শেষ সেখানেই...এবং তাঁর মনোবিকলনের!'

গিলির নিজের অ্যাত্তো বুদ্ধি! তাই বুদ্ধিহীনদের তিনি করুণা না করে পারেননি। ওই তো ফ্রেডি ট্রুম্যান, সবচেয়ে বেশি টেস্ট-উইকেটের রেকর্ড-মাল্য গলায় ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছে, ছোকরা বল অবশ্য মন্দ করে না, তবে বুদ্ধি বড় কম। —দ্রুত বোলাররূপে ট্রুম্যানের বহু সদ্গুণ আছে। তবে একটি রীতিগত দোষও আছে...পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের বার্তা উনি পূর্বেই প্রেরণ করেন। ট্রুম্যানের গর্জনশীল আগমন ও প্রকাশ্য শক্তির অভিব্যক্তি দেখিয়ে দেয়, কখন বৃহৎ সুন্দর বাউন্সারটির অভ্যুদয় হচ্ছে। আর ব্যাটসম্যান যদি বুঝতে পারল বাউ-ন্সার আসছে তাহলে তার হঠাৎ-বিপদের ভয়াবহতাই তো নষ্ট হয়ে গেল।'

পুরনো কথায় ফেরা যাক। বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্ট। বোম্বাই—তার মানে ব্রাবোর্ন-স্টেডিয়াম—এই একটি জিনিস ভারতীয় পুরাকীর্তির মতোই বহিরা-গতদের বিস্মিত করেছে। বলা উচিত স্তম্ভিত করেছে। গিলিকে পর্যন্ত!—'বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম—সে কী ব্যা—পার্! ক্রিকেট-দুনিয়ায় একটা দেখবার মতো জায়গা বটে! নেই কি সেখানে? গোটা হোটেল, সুইমিং-পুল, স্কোয়াশ ও টেনিসকোর্ট, যে-কোনো আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত কর্মচারীবাহিনী, এক-কথায় এটি ক্রিকেট-মাঠের হলিউড।'

ভারতের অধিনায়কত্ব নিয়ে গন্ডগোল হল, নির্বাচিত অধিনায়ক গোলাম আমেদ সরে দাঁড়ানোয় উমরিগর অধিনায়ক হয়ে এলেন, টসে হারলেন, তাহলেও ওয়েস্টইন্ডিজ প্রথম ইনিংসে ২২৭ রানের বেশি করতে পারল না। ভারত উত্তরে —হায় ভারত!—প্রথম চার উইকেট গেল হলের ঝড়ে ৪০ রানে। গিলি তখন গরম হচ্ছেন। গিলি জানিয়েছেন, তাঁর পালে বাতাস ভরতে একটু দেরি লাগে। বন্ধু হলের কান্ড দেখে গিলি ভয় পেয়ে গেলেন, বুঝি তাঁর পাল ফোলার আগেই ভারত সাবাড় হয়ে যায়। উমরিগর, রামচাঁদ কিছু ঠেকাতে তাঁর সুযোগ এল। উমরিগর, হার্দিকর, গুলাম গার্ড ও গুপ্তের উইকেট ছিটকে বেরিয়ে গেল গিলির বলে। ভারতীয়দের বিদায় নেবার ঢঙ দেখে মনে হল গিলির—'তারা বড় ব্যস্ত, এখনি ট্রেন ধরতে হবে।'

হল ও গিলক্রিস্ট দুজনে ৭টি উইকেট নিলেন, তাতে গিলি যত না খুশি, আরও স্ফূর্তি রামাধীনের বরাতে কিছু জুটল না বলে। আর তো গডার্ড নেই। রাম ৯ ওভারের বেশি বল পেলেন না। পরে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হবে।

ওয়েস্টইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনাও ভাল হয়নি। শেষপর্যন্ত মন্দ কিছু ঘটতে পারত যদি না সোবার্স আবির্ভূত হতেন। সোবার্স অপরাজিত

১৪২. বুচার—৬৪।

সোবার্স ও বুচার গুপ্তে-রোগকে যেভাবে নির্মূল করেছেন, তাতে গিলি হাসিতে অস্থির। অসুস্থতার জন্য দুজন ব্যাটসম্যানকেই রানার নিতে হয়েছিল। যদি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকত তারা—তাহলে!! গিলি সবিস্ময়ে ভাবেন—সেক্ষেত্রে ভারতীয়রা কি দেখত? উইকেটে চারজন ব্যাটসম্যান দেখে তাদের তো মনে হয়েছিল আট হাতে বুঝি ব্যাটিং হচ্ছে!

ওয়েস্টইণ্ডিজ ৩৯৯ রানে এগিয়ে রইল, ৫৭৫ মিনিট সময় হাতে নিয়ে। এরপর, আমরা জানি, এই টেস্ট ড্র হয় পঙ্কজ রায়ের বীরত্বের জন্য, যিনি ওয়েস্টইণ্ডিয়ান বোলারদের সর্ববিধ বীভৎস অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করে সুদীর্ঘ সময়ে ৯০ রান করেছিলেন।

সাপের পক্ষে সর্পবিষের জ্বালা বোঝা সম্ভব নয়, সুতরাং পঙ্কজ প্রভৃতির ব্যাটিং প্রসঙ্গে কৌতুকরসের অবতারণা করতে গিলির বাধেনি: "পঙ্কজ রায় ও রামচাঁদ কাগজেপত্রে ভালো খেলেছিলেন, বিশেষত পঙ্কজ, যিনি সেই গরমে আঁকড়ে ছিলেন সাত ঘণ্টা চব্বিশ মিনিট, ৯০ রানের জন্য। কিন্তু আমার মনে হয়, হতভাগ্য পঙ্কজ এই ইনিংসটির দুঃস্বপ্ন এখনো রাত্রে দেখেন। তিনি একেবারে জানতেন না, বল কোন্ দিক দিয়ে তাঁর উপর আসবে। তিনি জানতেন না, কোন্ দিকে তিনি পালাবেন—কিভাবে আমাদের বোলিং থেকে বাঁচবেন। খোঁচার পর খোঁচা স্লিপের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, শুধু সেগুলি ধরা পড়ল না। ধরা না পড়তে আমার ধারণা, পঙ্কজ নিতান্ত দুঃখিত হয়েছিলেন, এবং...তাঁর বুক একেবারে ভেঙে গেল যখন সোবার্সের বলে আলেকজাণ্ডার একটি 'ক্যাচ' ধরলেন ঝাঁপিয়ে পড়ে—আম্পায়ার বললেন, না রায়, তুমি খেলো। আমি নিশ্চিত, রায় চলে যেতে পারলে এতটুকু অসুখী হতেন না। আর আমি তাঁকে দোষও দিই না। ঐ 'ক্যাচটি' ধরতে গিয়ে আলেকজাণ্ডারের কাঁধে চোট লাগল, তাঁর স্থানে উইকেটরক্ষা করতে লাগলেন কানহাই। সুতরাং আমরা তখনো রায়ের দর্শন থেকে মুক্তি পেলুম না, মাঝখান থেকে আমাদের সেরা স্টাম্পারকে হারালুম। রায় বোমাবর্ষণের মধ্যে মাটিতে মুখ গুঁজে, সরে পালিয়ে গিয়ে, এধার-ওধার-সেধার করে চালিয়ে যেতে লাগলেন...। যেভাবে তিনি নৃত্যাদি করছিলেন, তাতে অপর ব্যাটসম্যানেরা আমাদের বদন দেখতে খুব ইচ্ছা বোধ করেনি। কিন্তু তবু তারা টিকে রইল...টিকিয়ে টিকিয়ে,...দৃশ্যরূপে সেই অবস্থান খুব সুন্দর এমন কথা বলি না।

"ভারতীয়রা সত্যই তপ্ত কড়ায়। আমার বোলিংয়ের মধ্যে আমি যথেষ্টসংখ্যক বাউন্সার ছিটিয়ে দিয়েছিলুম, বীমারও দু'চারটি দিয়েছি, শুভভাগ্যের জন্য। ওয়েস হল, বল এবং ভারতীয়দের নিয়ে অসাধারণ সব ব্যাপার ঘটাচ্ছিলেন। খাঁটি ভারতীয় রবারের পুতুল, এই ব্যাটসম্যানেরা, যেভাবে তারা নৃত্য করেছে। হার্দিকার ও রামচাঁদের, দুই নটআউট ব্যাটসম্যানের দীর্ঘ স্বস্তির নিশ্বাস শোনা গিয়েছিল, যখন আম্পায়ার খেলাশেষের সঙ্কেত করেছিলেন। অবশেষে ভারত প্রথম টেস্টে টিকে রইল, কিন্তু মনে হয় না, তারা জানত, কিভাবে টিকেছে।"

হল-গিলি নিজেদের কাণ্ডে যতখানি আমোদ বোধ করেছিলেন, তাঁদের অধি-

নায়ক আলেকজাণ্ডার তা করেননি। ফলে পায়ের পেশীতে টান ধরার পূর্বোক্ত গিলি-'কৌশল' তিনি গিলক্রিস্টের উপরই প্রয়োগ করলেন।

গিলিকে কেন্দ্র করে ওয়েস্টইণ্ডিজ শিবিরে মানসিক সংঘাত ক্রমেই তীব্রতর হয়েছে। আলেকজাণ্ডার-রামাধীনের দলকে গিলির দল পছন্দ করছিলেন না—আলেকজাণ্ডারও অপরপক্ষে তাই। আলেকজাণ্ডার গডার্ড নন—শক্ত মানুষ। তাঁর চোয়াল ও মুঠি, দুইই কঠিন। খেলার ব্যাপারেও একই কাঠিন্য। যেখান থেকে শুরু করেছেন, এগিয়েছেন বহু দূর, উন্নীত হয়েছেন পৃথিবীর অন্যতম সেরা উইকেটকীপার-ব্যাটসম্যানে। যে-গিলি তাঁকে এত রোষদৃষ্টিতে দেখেন, সর্বসময়ে মনে রাখেন—চাষের মাঠ থেকে আসা গিলির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়-ফেরত গেরীর চির পার্থক্য—তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে 'but hc had... bags and bags of guts.' গেরী আলেকজাণ্ডারের সেই 'গাট্‌সের' সঙ্গে রয় গিলক্রিস্টের গোঁয়ার্তুমির সংঘর্ষ বেধে গেল।

দ্বিতীয় টেস্টের ঠিক পূর্বে ওয়েস্টইণ্ডিয়ানরা আলেকজাণ্ডারের পরিচালনায় ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করছে। গিলি ছিলেন বেসিল বুচারের পাশে। বুচার লোকটি কেমনতর। ব্যাটিংয়ের সময়ে রান নিতে দিব্যি দৌড়ায়, কিন্তু ফিল্ডিংয়ের দৌড়ে উৎসাহ নেই। আলেকজাণ্ডার তাঁর দিকে বল ছুঁড়লে প্রতিবার পায়ে ঠেকা দিয়ে বল ধরতে লাগলেন, হাত বাড়াবার নাম নেই। তাই দেখে বিরক্ত গিলি একবার আলেকজাণ্ডার যখন তাঁর দিকে জোরে বল ছুঁড়লেন, সেটিকে ধরে ধাঁ করে ছুঁড়ে দিলেন বুচারের দিকে, উদ্দেশ্য, তাকে খাড়া করে দেওয়া, খেলার সময়ে যাতে সে গিলক্রিস্টের বলে ক্যাচ না ফসকায়। কিন্তু গিলির বলে বুচার হাত নামাবার কোনো সুযোগ পেলেন না, এত জোরে এল, হাঁটুতে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল, আর বুচার যন্ত্রণায় ও রাগে ক্ষেপচুরিয়াস। কাঁদুনে বালকটিকে ঠাণ্ডা করতে গিলি ধমকে চেঁচালেন—'ওহে, তুমি তো ঠ্যাং দিয়ে ক্যাচ ধরবে না—হাতে ধরবে। তাই তোমাকে ঠ্যাং বাঁচাবার কিছু কায়দা শেখালুম।' এই কথা বলেই গিলি চলে গেলেন অন্য দলে, যেখানে সোবার্স আছেন। আলেকজাণ্ডার গিলিকে ফিরতে আদেশ দিলেন, তাঁকে বুচারের পাশে দাঁড়িয়েই প্র্যাকটিস করতে হবে। গিলি কথা না শুনে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন।

এই জাতীয় ঘটনা পরে আরোও ঘটবে। যেমন, একদিন প্যাভিলিয়নে সকলে বসে। হল ও গিলির মধ্যে খানিক ব্যবধান। হঠাৎ গিলিবাবুর মাথায় কিছু সরস কথার উদয় হল। সেই কথাটি তখনি তাঁর প্রাণের ইয়ার হলচন্দ্রকে না শোনালে নয়। সুতরাং গিলি সকলের মাথার উপর দিয়ে চিৎকার করে রসিকতাটি বাতাসে ভাসাতে লাগলেন, উত্ত্যক্ত হয়ে আলেকজাণ্ডার প্রথমে কড়া চোখে তাকালেন, তাতেও কোনো ফল না হওয়ায় ধমক দিলেন, 'এত চেঁচিও না।' শুনে গিলি খাপ্পা। প্যাভিলিয়নে চেঁচাব না তো কোথায় চেঁচাব? সারাদিন মাঠে যে-ধরনের ক্রিকেট খেলি, তাতে হাসি-তামাশার চিহ্ন নেই। কিন্তু মজা তো চাই। পেটের গ্যাস কোথায় বার করব—প্যাভিলিয়নেই তো! গিলি গজ্‌রে ওঠেন—'কি! আমরা কি স্কুলের ছাত্র যে, বকুনি খাব!'

'তারও অধম'—আলেকজাণ্ডার শুধু ভাবলেন, তাই নয়, কাজেও দেখালেন। গিলিকে জানানো হল, 'তুমি পরের টেস্টে খেলছ না। লোকে জিজ্ঞাসা করলে

বলবে, পায়ের পেশীতে টান ধরেছে।’

কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে গিলক্রিস্ট না খেললেও ভারতের ২০৩ রানে হারতে অসুবিধা হল না। প্রথম ইনিংসে গুপ্তের অসাধারণ বোলিংয়ে (৯—১০২) ওয়েস্টইণ্ডিজ নেমে গেল ২২২ রানে। ভারতের অবস্থা ততোধিক শোচনীয়। তার প্রথম ইনিংসে হল ৬—৫০, টেলর ২—৩৮, সোবার্স ২—৬২। ওয়েস্টইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে সোবার্স স্থির করলেন, মে-কাউড্রে রামাধীনের ক্ষেত্রে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এখানেও তাই করা উচিত গুপ্তের ক্ষেত্রে। সোবার্স রানআউট হলেন ১৯৮ রান করার পরে। সলোমনও রানআউট ৮৬। অতঃপর ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে রায় ও কন্ট্রাকটার প্রথম উইকেটে ৯৯ করা সত্ত্বেও ভারতের পতন রোধ করা সম্ভব হল না। হল (৬—৭৬) ও টেলর (৩—৬৮) ভারতকে বলে কাটলেন কুচি-কুচি করে।

এর পরেই পূর্বকথিত ইউনিভার্সিটির ম্যাচ। ‘সরকারী পেশী সংকোচন’ কাল অতিবাহিত হবার পরে গিলি মাঠে অবতরণ করে বালকদের উপর বাম্পার-বীমারাদি নিক্ষেপ করে প্রথম ইনিংসে নিলেন ৬—১৬, এবং দ্বিতীয় ইনিংসে বর্ডারিগস্ ৭—৯০। হাণ্টের সেঞ্চুরি, সোবার্স নটআউট ১৬১। ওয়েস্টইণ্ডিজের জয় বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় টেস্ট কলকাতায়। ভারতের বিশ্রামাধীন অধিনায়ক গোলাম আমেদ ফিরে এলেন, টসে হারলেন, প্রথম ব্যাটিং করে ওয়েস্টইণ্ডিজ করল ৫—৬১৪, যার মধ্যে কানহাইয়ের অপরূপ ২৫৮। কানহাইয়ের সেই অসাধারণ ইনিংসের বর্ণনা আমি করেছি আমার ‘রমণীয় ক্রিকেট’ বইয়ের মধ্যে। এই খেলায় আরও কয়েকটি সেঞ্চুরি হয়েছিল, বুচারের ও সোবার্সের। বুচার ও কানহাই ১৮০ মিনিটে ২১৭ রান করেছিলেন, এবং এই রান-বন্যাকালে ভারতীয় বোলার-বালকগণ কি করেছিলেন তা সংখ্যাযোগে জানাতে বড় আমোদ পেয়েছেন গিলক্রিস্ট : ফাদকার ৪৩-১৭৩-০; সুরেন্দ্রনাথ ৪৬-১৬৮-২; গুপ্তে ৩৯-১১৯-১; গোলাম আমেদ ১৬·১-৫২-১; উমরিগর ১৬-৬২-১; ঘোরপাদে ২-২২-০।

তারপর ভারতের অপূর্ব ব্যাটিং। গিলি প্রথম ইনিংসে ৩—১৮, দ্বিতীয়ে ৬—২৭। হল ৩—৯১ ও ৩—৫৫। প্রথম ইনিংসে উমরিগরের নটআউট ৪৪ ও দ্বিতীয় ইনিংসে মঞ্জরেকারের নটআউট ৫৮-ই একমাত্র উল্লেখযোগ্য কিছু। ভারতের পর্বতাকার পরাজয়—ইনিংস ও ৩৩৬ রানে।

এর পরে আসামের জোড়হাটে ওয়েস্টইণ্ডিজের ইনিংসে জিততে অসুবিধা হয়নি (হল প্রথম ইনিংসে ৭—৫৪, অ্যাটকিনসন দ্বিতীয় ইনিংসে ৬—১০)। বাঙ্গালোরে একই ইতিহাস। গিলি প্রথম ইনিংসে ৪—৬৫, অ্যাটকিনসন ৫—৩৮; গিলি দ্বিতীয়ে ৬—৫২। এই বাঙ্গালোরেই আলেকজাণ্ডার সহাস্যে গিলিকে ব্যাটিং ওপেন করতে বলেছিলেন। মহাপ্রাণ গিলক্রিস্ট সে সম্মান সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

মাদ্রাজ-টেস্ট ‘সাদা টুপির টেস্ট।’ সকলকেই রোদ থেকে মাথা বাঁচাতে সাদা টুপি পরতে হয়েছিল। এই খেলাতেও ওয়েস্টইণ্ডিজ জিতল ২৯৫ রানে। ফলে রাবার করায়ত্ত হল তাদের। হল-গিলি এখানেও যথারীতি প্রচণ্ড।

মাদ্রাজের এই চতুর্থ টেস্ট খ্যাতিলাভ করেছে একটি বিশেষ কারণে। এই

খেলাই ভারতের অধিনায়ক হবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি উমরিগরকে চিরদিনের জন্য অধিনায়ক-আসন থেকে দূরে রাখে। উমরিগর কিছু আত্মমর্যাদা দেখিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবহারে। ঘটনাটা পাকিয়ে ওঠে তরুণ সেনগুপ্তকে কেন্দ্র করে। ঘটনা এই : নির্বাচিত অধিনায়ক গোলাম আমেদ প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নেন 'উপযুক্ত সময়ে।' পলি উমরিগরের উপর দায়িত্ব এসে পড়ে। খেলার দিন সকালে উমরিগর অধিনায়ক হয়েই দাবি করলেন, ব্যাটসম্যান সেনগুপ্তকে নিতে হবে, আর বোলার জাসু প্যাটেলকে করতে হবে দ্বাদশ ব্যক্তি, নচেৎ তিনি পদত্যাগ করবেন। কিন্তু বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীরতিলাল প্যাটেল জাসু প্যাটেলকে দলে ঢোকাতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং তিনি উমরিগরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে মানকদকে অধিনায়ক করলেন। মানকদও একই দাবি তুললেন। অগত্যা সেনগুপ্তকে দলভুক্ত করতে হল, যদিও সে দাবি পূর্বে পূরণ করলে উমরিগরকে পদত্যাগ করতে হত না। মানকদ অধিনায়ক হয়ে দলের মুদ্রাভাগ্য অপরিবর্তিত রাখলেন, হারলেন, ওয়েস্টইণ্ডিজ করল ৫০০, কানহাই ৯৯ রানআউট, বুচার ১৪২। তারপর ভারত শুরু করল। বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্বের কেন্দ্রপুরুষ সেনগুপ্ত ইনিংস সূচনা করতে নামলেন।

বেচারা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে হতভাগ্য সেঞ্চুরিকার। ভারতীয় অধিনায়ক আসন থেকে উমরিগরের চিরবিদায়ের (উমরিগর পরে দু' একবার অধিনায়ক হয়েছেন, কিন্তু তা হয়েছিলেন নির্বাচিত অধিনায়ক খেলতে না পারলে) অনিচ্ছুক কারণ—সেনগুপ্ত—কি রকম খেললেন তিনি?—

"দর্শকেরা হতভাগ্য সেনগুপ্তের খেলা দেখে ভাবল, এঁর জন্যই নির্বাচক ও উমরিগরের মধ্যে এত লড়াই! আমরা অবশ্য সেনগুপ্তকে নিয়ে মোটেই চিন্তিত ছিলুম না। সামরিক দলের পক্ষে সেঞ্চুরি করার সময়ে সামরিক বালকটির খেলার কায়দা দেখে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলুম—ভাবনার কিছু নেই। আমাদের ভুল হয়নি। ছোকরাটি শুধু ব্যাট ঝুলিয়ে রেখে আমার ও হলের বলে ছোঁয়াতে লাগলেন।...ব্যাপারটা ভারতীয় বালকটির পক্ষে বড়ই দুঃখদায়ক। দৃশ্যটা এতই মন্দ হয়ে উঠল যে আমি তার উদ্দেশ্যে হাঁকলুম —'টিক্ টিক্ টিক্—কি হে, তোমার হাতে ওটা কি, ব্যাট না মাছ ধরার ছিপ?' তার দুঃখের অবসান হল, যখন সোবার্স তাকে কট করলেন এক রানে!"

দিল্লীর পঞ্চম টেস্ট কিন্তু ড্র হল, সময়ের অভাবে। আবার ভারতের অধিনায়ক পরিবর্তন, কেননা মানকদও সেনগুপ্তের ব্যাপারে আত্মমর্যাদা দেখিয়েছিলেন। অধিকারীর মধ্যে ভারত তার চতুর্থ অধিনায়ক পেল, এবং অধিকারী ভারতের ভাগ্য কিছুটা ফেরালেন টসে জিতে। এই প্রথম ভারত কিছুটা রান করল, বোরদের সেঞ্চুরিসুদ্ধ প্রথম ইনিংসে ৪১৫। কিন্তু ওয়েস্টইণ্ডিজ আরও অনেক কিছু করল—মানকদের (৫৫—১৬৭—০) ও গুপ্তের (৬৬—১৪৪—০) বলের উপরে—যদিও খাটো দেশাই (৪—১৬৯) কিছুটা চমকে দিয়েছিলেন বলে ও বাম্পারে ওয়েস্টইণ্ডিয়ানদের—ওয়েস্টইণ্ডিজ : ৮—৬৪৪—সেঞ্চুরি হোল্ট, কোলি স্মিথ ও সলোমনের, হাণ্টের ৯২। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে করল (বোরদের ৯৬ সুদ্ধ) ২৭৫, কিন্তু ভারতের শেষ উইকেট যখন পড়ল, তখন ওয়েস্টইণ্ডিজের হাতে এগারোটি উইকেট, জিতবার জন্য করতে হবে মাত্র ৪৭

রান, সময় বাকি নেই এক মিনিটও।

ভারত সিরিজে হারল। চরম হার। ট্রুম্যানের হাতে যেমন হেরেছিল। এবার হল-গিলির হাতে। বোলিং অ্যাভারেজে গিলি সর্বোপরি। গিলি পৃথিবীর শীর্ষ বিন্দুতে অধিষ্ঠিত। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্যুর করছেন। ভারতের টেস্টপর্যায় সমাপ্ত। সামনে পাকিস্তান-সফর। গলায় এখন দুলছে জয়মাল্য।

সে মালা টেনে ছিঁড়ে নিলেন আলেকজান্ডার। কঠিন গলায় বললেন...

সিলেকসন-কমিটির সভা বসেছিল। সদস্য ছিলেন—জ্যাক হোল্ট, সোনী রামাধীন, অধিনায়ক গেরী আলেকজান্ডার ও ম্যানেজার বার্ট গ্যাসকিন। সভা শেষ করে এসে আলেকজান্ডার বললেন...'গিলক্রিস্ট, তুমি পাকিস্তানে যাবে না। পরের প্লেনে তুমি দেশে ফিরে যাবে। গুড আফটারনুন।'

তারপর?—পূর্বকথায় ফিরে যাই:

ভারতে ওয়েস্টইন্ডিজের শেষ ম্যাচ। অমৃতসরে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে। উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক স্মরণজিৎ সিং। ইনি আলেকজান্ডারের কেমব্রিজের বন্ধু। অ্যাঁ—আলেকজান্ডারের বন্ধু?—বটে! গিলির কানে আরও সংবাদ এল, স্মরণজিৎ সিং গিলির সঙ্গে মাঠে মোলাকাত করতে চান। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা কী যা—তা! গাটস্ নেই। আমাকেই সেক্ষেত্রে শিক্ষা দিতে হচ্ছে বর্বর বোলারটিকে—স্মরণজিতের মনোভাব। আর...দাঁতে দাঁত পিষে গিলক্রিস্ট ভাবেন...যদি সত্যই স্মরণজিৎ আমার দাঁত ভাঙতে পারেন, তাহলে তাঁর কেমব্রিজী সখা, আমাদের কর্তাসাহেব আলেকজান্ডার মোটেই অখুশি না। বেশ...

স্মরণজিৎ উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক হয়ে গিলির দাঁত ভাঙার বাঞ্ছিত সুযোগের সম্মুখীন হলেন। বেশ ঘটা করেই তিনি শুরু করেছিলেন। স্বয়ং মাইকযোগে জানালেন, 'মিস্টার স্মরণজিৎ সিং, দি মেম্বার অব দি এম-সি-সি।' কিন্তু তাতে খুব সুবিধা হল না, গিলক্রিস্টের প্রথম বলেই বোল্ড। লজ্জা লজ্জা, কি বিশ্রী! দ্বিতীয় ইনিংসে ভালো কিছু করতেই হবে, করলেনও অনেক ভালো, যখন তাঁর দল ওয়েস্টইন্ডিজের প্রথম ইনিংসের ২৫৪ রানের পিছনে থেকে যাত্রা শুরু করল দ্বিতীয় ইনিংসে, তখন স্মরণজিৎ করলেন ১৫ রান, আর তাতেই আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর। তারপর কি ঘটল গিলির মুখে শোনা যাক:

"এখন যদি কোনো লোক—অল্পবয়সী ছোকরা বলাই ভাল—প্রাণ বার করে বল করছে দ্রুতবেগে, যেখানে ছায়ার নীচে উত্তাপ ৯০ থেকে ১০০ ডিগ্রি (ভারতে ক্রিকেটমাঠে ছায়া নেই নিশ্চয়)—তার মধ্যে—সে ছোকরা স্বভাবতই গরম হয়ে ওঠে এবং নানা বিষয়ে তার মাথা ঠিক থাকে না। এক্ষেত্রে কেউ খাঁটি ঋষি না হলে, আমি ঋষি নই, তার ধৈর্যচ্যুতি হবেই, যদি কেউ বেলাইনের কোনো কথা বলে। কেমব্রিজ ও ওয়ারউইকশায়ারের ভূতপূর্ব সদস্য এবং এম-সি-সি-র বর্তমান সদস্য শ্রীল শ্রীস্মরণজিৎ সিং এক্ষেত্রে তাই বলেছিলেন।

"তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পূর্বের শেষ ওভার। পাগড়ি প্রভৃতি সমন্বিত মিঃ সিং চা পর্যন্ত খেলে যাবেন এমন চালে ছিলেন। আর আমি তাঁকে বৈকালী বিশ্রাম দেবার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করছিলাম। আমি একটি বাম্পার দিলাম, মিঃ সিং ডুব দিলেন। তাঁকে বিশেষ ক্রুদ্ধ দেখা গেল। যাই হোক, বাম্পার

ভালবাসে এমন ব্যাটসম্যান তো এ পর্যন্ত দেখলাম না।

"পরের বলটি ঠিক লেংথে দিলাম। সেটিকে সত্যই মারতে পারলেন মিঃ সিং—বলটি সোজা চলে গেল বাউণ্ডারিতে। কোনো ফাস্টবোলার জ্বলন্ত রোদের তলায় দাঁড়িয়ে গোটা সকাল খাটবার পরে এ-ধরনের জিনিস পছন্দ করতে পারে না। এবং...আমি নিশ্চয়ই অধিকতর আমোদ বোধ করিনি, যখন মিঃ সিং হেঁটে এগিয়ে এসে, ড্রাগন চলে যাবার পরে সেণ্ট জর্জের যে ভঙ্গি সেইভাবে, আমাকে বললেন, 'কেমন? পছন্দ হয়? তোফা! কি বলো?'

"এইটাই যথেষ্ট। কি করতে যাচ্ছি আমি জানতাম—করলাম তাই। আমি বীমারকুলের শিরোমণি শয়তানটিকে ছাড়লাম—আমার জীবনের দ্রুততম বলটিকে। এখন, আমি যেমন মিঃ সিংয়ের চার ও বচনকে অপছন্দ করেছিলুম, তেমনি তিনি অপছন্দ করলেন আমার বীমারকে। আমাদের অধিনায়কও তাই। কিন্তু ব্যাপারটিকে আমি ছোট বলে ধরিনি।...পরের অতি দ্রুত বলটিকে তিনি স্নিক করলেন। বল গেল শর্ট-লেগে। আলেকজাণ্ডার সেখানে ফিল্ডিং করছিলেন, এবং...আলেকজাণ্ডার ফেলে দিলেন! ইচ্ছে করে ফেলেছেন বলছি না, জানি তা ফেলেননি, কিন্তু সেইসময়ে আমার কাছে তাই মনে হয়েছিল—তখন যেন সারা পৃথিবী আমার শত্রু। আমার মনে আর-কিছু ছিল না—পাগলের মতো লড়ছি তখন। সুতরাং আমি আরও দুটি বীমার ছাড়লুম, যা সিং-মহাশয়ের দাড়ি ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

"ঐ 'সুন্দরীম্বয়ে'র সম্বন্ধে মিঃ সিং-এর ধারণা সম্বন্ধে কারো ভুল ধারণা থাকার কথা নয়, আমাদের অধিনায়ক আলেকজাণ্ডারের ধারণা সম্বন্ধেও। তিনি শান্ত শীতল কণ্ঠে আমাকে বললেন, এই ম্যাচে আমার অংশগ্রহণ এখানেই শেষ, এবং আমার পরিবর্তে খেলার জন্য একজন বদলী খেলোয়াড়ের অনুরোধ জানানো হয়েছে, সে অনুরোধ স্বীকার করেছে উত্তরাঞ্চল। তারা স্বীকৃত হবে, তা বাজি ফেলে বলা চলে! ভারতীয়রা আমার বিদায়ে কখনই দুঃখিত হবে না।

"আমি আলেকজাণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে আর বল করতে না দিন, খেলার শেষপর্যন্ত কি মাঠে থাকতে দেবেন না? আলেকজাণ্ডার বললেন, তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন, সুতরাং ব্যাপারটার ইতি। ব্যাপারটাকে আমি মেনে নিলাম, মনে হয় মিঃ সিং যেভাবে বীমারগুলো নিয়েছিলেন, তার থেকে একটু ভালোভাবে আমাকে বাদ দিয়েই খেলা চলল। খেলা শেষ হবার পরে আরও বড় বোমা ফাটল—ক্রিকেটের ইতিহাসের বৃহত্তম বোমার একটি।"

'বৃহত্তম বোমাটি' কি তা আগেই বলা হয়েছে—গিলক্রিস্টের বিতাড়ন।

তবু গিলক্রিস্টও বলতে পারেননি, আলেকজাণ্ডার অন্যায় করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, দুটি যুক্তিযুক্ত কারণে তাঁর প্রতি শাস্তিবিধান করা হয়, এক, তিনি মেজাজ খারাপ করেছিলেন; দুই, তিনি বীমার দিয়ে 'নিয়ম' ভেঙেছিলেন।

গিলক্রিস্ট দোষ স্বীকার করেছেন : 'I take the blame, it was my fault, and I am sorry now'. 'কিন্তু এ সবেরই মূলে জয়লিপ্সা—খেলা জিতব, প্রতিটি খেলা, এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা। মানুষ কি বদলায় রাতারাতি? বলুন আপনারা?'—গিলি প্রশ্ন করেছেন।

প্রথম টেস্টেই হল, গিলি ও টেলরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আলেকজাণ্ডার

—'বীমার দিও না, ওটা অন্যায়'—তখন গিলির বিবেক কোনো অন্যায় দেখেনি, কারণ বীমার-নিষেধ তো কোথাও লেখা নেই, আর তা যদি না থাকে, জয়ের জন্য সব কিছু করাই ন্যায়—তখন ছিল গিলির ধারণা। বন্যস্বভাব গিলি ঐ ধারণা নিয়েই টেস্টের পর টেস্টে বল করে গেছেন। আলেকজাণ্ডার তাঁকে সতর্ক কম করেননি। একটি টেস্টে বসিয়ে পর্যন্ত দিয়েছেন। তবু বশ মানেননি গিলি। বরং অধিনায়কের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু যখন অবশেষে চরম দণ্ড নামল, তখন প্রচণ্ড আঘাতে হঠাৎ শিউরে উঠে গিলি দেখলেন, মানুষকে একসময়ে থামতেই হয়। গিলি এবার ক্রুদ্ধ হলেন না, লজ্জিত হলেন। ভাবলেন, আমি ওয়েস্টইণ্ডিয়ান ক্রিকেটের মাথা নামিয়ে দিলুম। দণ্ডাদেশ শুনে গিলি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। সেখানেই রইলেন। হাণ্ট, কানহাই, হল প্রভৃতির মনে হল, শাস্তিটা বড় কঠিন হয়েছে, গিলক্রিস্ট যেখানে এতকিছু করেছেন দলের জন্য। তাঁরা গেলেন আলেকজাণ্ডারের কাছে আর্জি জানাতে। তাঁরা ক্ষমা চাইলেন গিলির হয়ে। হাণ্ট ছিলেন মুখপাত্র। তিনি আপ্রাণ করলেন। কিন্তু অটল রইলেন আলেকজাণ্ডার। আজ গিলক্রিস্ট স্বীকার করেন, দৃঢ় থেকে আলেকজাণ্ডার ঠিক করেছিলেন। অধিনায়ক হওয়া মুখের কথা নয়। শৃঙ্খলারক্ষার জন্য তাঁকে কঠোর হতেই হয়। 'আমি আমার প্রাপ্যই পেয়েছিলুম, বুঝতে পারছি আজ'—গিলি বলেছেন—'এখন আমার নিজের বড়ো আরামের বাড়ি মাঞ্চেস্টারে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমি গৃহস্বামী, ল্যাঙ্কাশায়ার লীগের আমি পেশাদার—এখন ঐ সব বন্য মুহূর্তের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।'

কিন্তু সেদিন, যখন আদিম হিংসা ছিল সর্বাঙ্গে, সেদিন গিলি নিশ্চয় আলেকজাণ্ডার-প্রদত্ত দণ্ডাদেশের যৌক্তিকতা স্বীকার করেননি, তবু রোষে যে অন্ধ হননি, তার কারণ হঠাৎ আঘাতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সমস্ত মন ডুবে গিয়েছিল গভীর বেদনায় ও অবুঝ অভিমানে—"আপনারা বিশ্বাস করুন, কী দারুণ পীড়াবোধ করেছিলুম আমি তখন, দুঃখের অন্ধকারে ডুবে রইল মন...আমি একলা ঘরে নিজের জিনিস গুছিয়ে নিচ্ছি...অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে যাচ্ছি, যখন জীবনের সেরা সফরের শেষে বিজয়ীর বেশে দেশে ফেরার কথা আমার! টেস্টে সেরা বোলিং-অ্যাভারেজ আমার, সকল খেলার বোলিং-অ্যাভারেজেও আমি সর্বোচ্চে...তবু আমি দলের 'নষ্ট ছেলে'। আমার হৃদয়জ্বালার জন্য কি আপনারা আমাকে দোষ দিতে পারেন, যখন আমি কি করব সেই চিন্তায় দিশাহারা, যখন ভগ্নহৃদয়ে শুধু ভেবেছি, হায়, এখন অন্য বন্ধুরা পাকিস্তান ট্যুরের জন্য বাক্স বাঁধছে।...তাই হোক, গিলি বাড়ি ফিরে যাক, তার বন্ধুরা যাক অন্য পথে...তাদের শুভেচ্ছা জানাবার সুযোগও আমার হল না। আমাদের ভারতীয় ম্যানেজার কারমাঠা একলা আমাকে গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে প্লেনে তুলে দিলেন..."

বেদনাহত, অপমানিত, ধিক্কৃত, শাস্তিপ্রাপ্ত গিলক্রিস্ট ফিরে গেলেন ইংলণ্ডে। সেখানে তাঁর প্রণয়িনীর আসার কথা জামাইকা থেকে। প্রণয়িনী এসেছিলেন, তাঁরা ঘর বেঁধেছিলেন, নিশ্চয় শ্রীমতী গিলক্রিস্ট শ্রীযুক্তকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, কিন্তু শান্ত রাখতে পারেননি, তার প্রমাণ পরবর্তী ইতিহাস।

গিলক্রিস্ট সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার-লীগের মিডলটন ক্লাবে পেশাদার হলেন। এই ক্লাব তাঁর বিতাড়নের ব্যাপারে মাথা ঘামাল না। এ'দের সদস্যেরা নববিবাহিত গিলির সংসারের প্রয়োজনীয় সুখের ব্যবস্থাদি করতে সচেষ্ট ছিলেন। গিলি ঋণশোধও করেছিলেন। ক্রমটন ক্লাবের সঙ্গে প্রথম খেলায় বোর্ডে ৩০ রান উঠে গেলেও উইকেট পাননি, তাঁর বিরুদ্ধে বাজি ধরা হয়েছে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকার—সেই ইনিংসেই আর মাত্র ৮ রানের মধ্যে তিনি ১০টি উইকেট নিয়ে নিলেন!! কল্পনা করতে কল্পনাও দ্বিধাগ্রস্ত হবে। গিলি ঐ মরশুমে ১৩৭টি উইকেট পান, তার মধ্যে ৯৭টি বোল্ড এবং পাঁ-চ-টি হ্যাটট্রিক। চার বলে চারটি উইকেটও ছিল তার মধ্যে। গিলক্রিস্টের জন্যই বহু বছর পরে মিডলটন চ্যাম্পিয়ান হল।

গিলক্রিস্ট কিভাবে উইকেট নিয়েছিলেন? ব্যাটসম্যান অধিকাংশ সময়ে লেগ-আম্পায়ারের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল আর তিনি ফাঁকা স্টাম্পে বল লাগিয়েছিলেন কি না—এ বিষয়ে কিছু লেখেননি। গিলক্রিস্ট যাদের আগেই মেরে রেখেছিলেন, তাদের পরে ফর্মালি মারলেন উইকেটে দাঁড়িয়ে।

সুতরাং পরের বছর গোলমাল শুরু হল। ওল্ডহ্যাম ক্লাবের এক ছোকরা গিলির বিরুদ্ধে একশো করার দুঃসাহস দেখালেন। গিলির ধারণা, তিনি তার আগে একশোবার আউট হয়ে গিয়েছিলেন। এই ব্যক্তি পরে এক খেলায় গিলির বলে হুক করতে গিয়ে আউট হলে (নিশ্চয় আঘাত ব্যাপারটা আউটের মধ্যে ছিল) দর্শকেরা মহা রেগে গেল। বিশেষত মেয়েরা। গিলির দুঃখ, আমায় যখন প্রথমবার লোকটি ঠেঙিয়েছিল, তখন তোমাদের আমোদ, আর যখন আমার সুযোগ এল তখন তোমাদের মনে আমোদের অভাব কেন?

মরশুমের শেষ খেলায় গোলমালের চূড়ান্ত। ওল্ডহ্যামের সঙ্গে খেলা। গিলক্রিস্টের দেড়শো উইকেট হতে এখনো ৮টি বাকি। এই খেলায় সেইগুলি চাইই। তিনটি পেলেন। তারপরে একটি বাচ্চা ছেলে রুখে দাঁড়াল। এক ওভারে পর-পর তার গায়ে বল লাগালেন (পঙ্কজ কি এই ঘটনাটির কথাই আমাকে বলেছিলেন?)--শেষকালে ছেলেটি লুটিয়ে পড়ল মাটির উপরে--তখন হৈ-চৈ বেধে গেল চারিদিকে, সবাই ক্ষিপ্ত, ছেলের বাবা ছুটে গেলেন 'খুনীর' দিকে... বিপক্ষের অধিনায়ক তাঁর দলকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন মাঠের বাইরে।

সেইখানেই 'সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগের' সঙ্গে গিলির সম্পর্কের শেষ।

এরপরে আর এক 'ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে' যোগদান—ব্যাকাপ ক্লাবে। এখানেও ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্কে গিলি সুখী। প্রথম বছরে ১২৬টি উইকেট। তাঁর জন্যই ক্লাব চ্যাম্পিয়ান। কিন্তু পরের বছর ভালো অফার পেয়ে চলে গেলেন নর্থ স্ট্যাটফোর্ডশায়ার লীগের 'গ্রেট চেল' ক্লাবে। এখানকার ক্রিকেটের বিষয়ে গিলি কিছু জানতেন না। কিন্তু যখন শুনলেন, রামাধীন এই লীগে খেলেন, তখন পরিষ্কার বললেন, 'সোনী যা পারে, আমিও তা পারব।'

পারলেন—আরও কিছু—এবং শুনলেন অনেক কিছু--জাত তুলে গালাগাল পর্যন্ত...

স্টোন ক্লাবের সঙ্গে মারাত্মক খেলাটি। আম্পায়ারদের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেল গিলির। বোলিং-প্রান্তের আম্পায়ারের সঙ্গে লেগ-আম্পায়ারও তাঁর নো-বল ডেকেছিলেন। নিজ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলে গিলি ধীরনীতি

নিলেন। প্রতিটি বল করতে অতঃপর দীর্ঘসময় লাগতে লাগল। অফিসের 'কলম ধর্মঘটের' মতো 'বলম্ ধর্মঘট।' আম্পায়ার রেগে গেলেন। একজন বললেন, 'গিলি, তাড়া করো।' গিলি উত্তরে গলা ফাটালেন—'অত চেল্লিও না।' এইভাবে খেলার শেষ অবধি চলল। আম্পায়ার যত ক্রুদ্ধ, গিলিও তাই। অবশেষে খেলার শেষ বল যখন হাতে নিলেন, তখন চার রান হলেই স্টোন ক্লাবের জয় হয়ে যায়—সে রান হল বাউন্ডারির সাহায্যে।

আগুনের মতো মন নিয়ে গিলি প্যাভিলিয়ন সিঁড়িতে উঠছেন, তখন স্টোন-এর একজন সমর্থক তাঁর সামনে লাফিয়ে পড়ে নৃত্যগীতসহ পরিচিত রব তুলল আনন্দে—'ওহে কালা নিগার—।' গিলক্রিস্টের মাথায় রক্ত উঠে গেল—রাগে অন্ধ তিনি—ঝাঁপিয়ে পড়লেন—তারপর—

লীগ কমিটি গিলক্রিস্টের খেলা নিষিদ্ধ করে দিল অতঃপর।

গিলক্রিস্ট ডুবে আছেন হতাশায়, হঠাৎ আলোর ঝলকানি। সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের শীতরাত্রে আতপ্ত বসন্তবায়ু বয়ে গেল যেন। গিলক্রিস্ট আমন্ত্রণ পেলেন ওয়েস্টইন্ডিয়ান ক্রিকেটবোর্ডের সেক্রেটারীর কাছ থেকে—গিলক্রিস্ট কি টেস্ট-ট্রায়ালে যোগদান করবেন? ১৯৬২ সালে গিলির 'পুরনো শত্রু ভারতীয়রা' আসছে ওয়েস্টইন্ডিজে। এখানেই শেষ নয়, বোর্ডের সেক্রেটারীর আরও জিজ্ঞাসা -গিলি কি দরকার হলে ইংলন্ড-সফরে রাজি?

গিলির তখন চাকরি নেই, হাতে পয়সাও প্রায় নেই, তবু পরের বোট তিনি ধরবেনই। তার পত্নী তাঁকে উৎসাহ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, নিজে রয়ে গেলেন ইংলন্ডে দুটি বাচ্ছা নিয়ে...আরও একটির আগমন হয়েছে শরীরে, তবু সেকথা স্বামীকে জানিয়ে বিব্রত করলেন না...কাঁদলেন না...গিলক্রিস্ট কান্নাকণ্ঠে বলেছেন, এমনই হয় ওয়েস্টইন্ডিজের মেয়েরা...

গিলক্রিস্ট কিন্তু জায়গা পেলেন না টেস্ট-দলে। ইতিমধ্যে লীগ-ক্রিকেট থেকে তাঁর নির্বাসনের কথা পেঁাছে গেছে ওয়েস্টইন্ডিজে। পুরনো একটা অশুভ ছায়া তাঁকে অনুসরণ করে ফিরছে। গিলি বুঝলেন, তাঁকে নেওয়া হবে না। বুক ভেঙে গেল তাঁর। ফলে বলে ধার এল না। অন্যত্র ট্রায়াল খেলতে যখন ছোকরারা চলে গেল, তখন তিনি বৃটিশ গিয়েনাতেই পড়ে রইলেন...ভগ্ন মন, শূন্য পকেট...ইংলন্ডে ফিরে যাবার পয়সা নেই, ফেলে আসা স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা, বোর্ডের নিষ্ঠুরতায় ক্ষোভ, যারা একটা উৎসুক মনকে লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছে এতদূরে...

গিলি ভেঙে পড়েছিলেন। তবু তাঁর সেই ভাঙা চেহারা দেখতে দেননি বিরোধীদের। স্থানীয় একটি টুর্নামেন্টের সময়ে প্রতিদিন তিনি নতুন স্যুট পরে মাঠে যেতেন, আর বার্ট গ্যাসকিন, তাঁর ভারত থেকে বিতাড়নের অন্যতম হোতা—তিনি সেই দেখে অবাক হয়ে তাকাতেন—লোকটার এত স্যুট জোটে কোথা থেকে! তিনি বোধহয় চাইতেন, গিলক্রিস্ট খালি পায়ে, লেংটি পরে ঘুরবে! সবচেয়ে মজার জিনিস, যখনি গ্যাসকিন গিলির কাছ দিয়ে হেঁটে গেছেন, তখনি মাঠের ছোঁড়ারা চেঁচিয়েছে—'গিলি! ঐ যে তোমার বন্ধু যায়!'

কিন্তু নতুন কোটের বোতাম এঁটে কি ভাঙা বুক সত্যই ঢাকা যায়? গিল-

ক্রিস্ট কি পেরেছেন? গিলির জন্য এইখানে আমি বেদনাবোধ না করে পারছি না। একথা সত্য, আমি স্পষ্টভাবে তাঁর জীবননীতির বিরোধী। কোন্ মানুষ নয়? গিলির ক্রিকেট—ক্রিকেট নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি স্বাধীনচিত্ততার বিরোধী নই। আমি জানি মুক্ত স্বভাবের প্রকাশে কিছু উগ্রতা এসে যায়ই। তাতে ভুল বোঝারও সম্ভাবনা থাকে। সেসব ক্ষেত্রে আমার পরিপূর্ণ সহানুভূতি আছে প্রাণহীন নিয়মের শিকার যাঁরা—তাঁদের প্রতি। অমার্জিত সিড বার্নসের চরিত্রচিত্রণ আমি করেছি একদা প্রীতি ও আবেগের সঙ্গে, আমার 'বল পড়ে ব্যাট নড়ে' গ্রন্থের মধ্যে। কিন্তু গিলি কি সিডের মতো 'অমার্জিত'?—না, তিনি বন্য, বলা উচিত বর্বর। তবু জানি না কেন, এই ধর্মাধর্মবোধহীন লোকটির প্রতি এক বিচিত্র আকর্ষণ বোধ করেছি বারবার। তাঁর দীর্ঘ চরিত্রচিত্র আঁকার কারণ তাই। একি আমাদের মনোগহনের দস্যুপ্রীতি!

কিন্তু গিলক্রিস্টেরও একটা নিজস্ব জগৎ আছে—আছে ব্যক্তিগত মন। তাঁর ইচ্ছা, অনিচ্ছা কামনা বাসনা—তাঁর ঐকান্তিকতায়—তিনি আমাদের নাড়া দেনই। যেমন, গিলি যখন বলেন, আমি নিশ্চয়ই বাউন্সার বা বীমার দেব, কিন্তু আমি চাই আমার বলে ওভার-বাউন্ডারি হোক—যদি কেউ সত্যই পারে। 'আমি চাই ভালো ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে বল করতে, যারা আমার নীতিতেই খেলতে চায়। তারা যত ভাল, আমিও তত ভাল হয়ে উঠি, তত উদগ্র, তত ক্ষুরধার।' গিলক্রিস্ট চান 'বোলারের স্বর্গে' ৬ জন ব্যাটসম্যানকে—হানিফ প্রমুখ যে ৬ জনের নাম আগে জানিয়েছি—এই ব্যাটসম্যানেরা গিলির যে-কোনো আচরণকে বিনা অভিযোগে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। সুতরাং গিলি এঁদের পছন্দ করেন। এঁদের নাম পর্যন্ত অন্য বোলারদের কাছে দুঃস্বপ্নবৎ বোধ হতে পারে, কিন্তু গিলির কাছে এঁরা 'মধুর মধুর স্বপ্ন—আর মহান প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিশ্রুতি।'

কথাটা মিথ্যে নয়। পঙ্কজ রায়ের উক্তি মনে পড়ছে। রনজি-ট্রফিতে পঙ্কজের সঙ্গে গিলির ভয়াবহ সংঘাতের কাহিনী পূর্বে বলেছি। কিভাবে গিলির হিংস্র বলের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত পঙ্কজ জিতেছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ পাঠকদের জানিয়েছি। ও কাহিনী আমি পঙ্কজের নিজ মুখেই শুনেছিলুম। সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে পড়ছে। পঙ্কজ রায়ের কুমারটুলীর বাড়িতে বসে আছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাইরে ভাদ্রমাসের বৃষ্টিতে আকুল পৃথিবী। বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। ক্ষণে-ক্ষণে বজ্রপাত। দোতলার বারান্দায় বসে আছি আমরা। রোমাঞ্চিত হয়ে শুনছি ভয়ঙ্কর হিংসার কাহিনী। উত্তেজিত ও আতঙ্কিত মুহূর্তে-মুহূর্তে।

পঙ্কজ কাহিনী শেষ করলেন। বাংলার জয় হল শেষ পর্যন্ত। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। এতক্ষণ দম বন্ধ করে শুনছিলুম। পঙ্কজ একটু থামলেন। তারপর বললেন—'কাহিনীটা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি।'

আমি নতুন করে জ্বলে উঠলুম রাগে—গা রি-রি করতে লাগল ঘৃণায়। বুঝলুম, পঙ্কজবাবু গিলক্রিস্টের আরও কিছু নোংরামির কথা বলবেন, চায়ের টেবিল বা খাওয়ার টেবিলের আরও কিছু অসভ্যতার কথা। কিংবা প্যাভিলিয়নে ড্রেসিংরুমে অধিকতর অনাচারের কাহিনী।

পঙ্কজ রায় বিস্ফারিত চোখে বললেন...শিউরে উঠলুম ভয়ে। পিছন থেকে

কে যেন গলা চেপে ধরেছে কঠিন হাতে—'

শুনতে-শুনতে ভয়ানক ভয়ে আমারও দম বন্ধ।—'সর্বনাশ!'

'সত্যই সর্বনাশ। কারণ...কোনোক্রমে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি...আর কেউ নয়... গিলক্রিস্ট! পিছন থেকে আমাকে ধরেছে—তার শক্ত কব্জি ঠিক আমার টুঁটির তলায়—আর একটু চাপ দিলেই...সারা গা হিম...'

পঙ্কজ রায়ের কথা শুনে আমার গাও হিম, অবস্থা বর্ণনাতীত। মুখ দিয়ে অব্যক্ত কিছু শব্দ বেরুল শুধু।

'প্রাণভয়ে এক ঝটকায় নিজেকে কোনোরকমে ছাড়িয়ে নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেলুম। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি...হ্যা-হ্যা করে হাসছে দানবটা! খেলার মাঠে পারেনি, এখানেই সেই কাজটা শেষ করতে চায় নাকি?'

'এখানে, মানে কোথায়?'—রুদ্ধশ্বাস প্রশ্ন।

'নিউমার্কেটে—দিবালোকে।...গিলক্রিস্টের মুখোমুখি আমি। হাতে কী একটা ছিল, শক্ত করে ধরলুম...'

'তারপর তারপর...'—ধক্‌ধকে গলায় জিজ্ঞাসা করি।

'কিন্তু—উঁহু—মারার চেহারা তো নয়! ব্যাটা হাসছে অমায়িক'—পঙ্কজ বললেন—'ব্যাটা হেসে ঢলে গড়িয়ে পড়ল। হাসি থামলে বলল, 'আরে রায়, ভয় পেলে নাকি? একি খেলার মাঠ? না না, ভয় নেই...পেছিয়ে যেও না... তোমাকে মেরে ফেলব না...এস হ্যাণ্ডসেক করি।' তারপর এগিয়ে এসে হাতে প্রচুর ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আছ কেমন?'

'ভালই'—পঙ্কজ বললেন—'কি খবর?'

দেশে ফেরার আগে মার্কেটিং করতে এসেছি। কেনাকাটা হয়েছে কিন্তু হোটেল ফেরার ট্যাক্সি পাচ্ছি না।'

'ট্যাক্সি পাচ্ছ না? বেশ, তাহলে এস আমার গাড়িতেই পেঁাছে দিই'—পঙ্কজ ভদ্রতা করলেন।

পঙ্কজের গাড়ি থেকে নামবার সময়ে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গিলক্রিস্ট বললেন, 'থ্যাংক য়্যু রয়। আর...স্যরি। মাঠের কথা মাঠের বাইরে মনে রেখো না। মাঠে বিপক্ষ ব্যাটসম্যান দেখলে সত্যি আমার জ্ঞান থাকে না। উল্টোদিকে আমার ছেলে থাকলেও তাকে খুন করে ফেলতে পারি—হ্যা-হ্যা-হ্যা...এগেন থ্যাঙ্ক য়্যু মিঃ রয়। আজই তোমাদের কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি।'

'তারপর? আরও কিছু'—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করি।

তির্যক হাস্যে পঙ্কজ রায় বললেন, 'অল্প কিছু।'

'যথা—'

দেশে ফেরার পথে কলকাতা থেকে যখন বোম্বায়ে গেছেন গিলক্রিস্ট প্রমুখ চারজন ওয়েস্টইণ্ডিয়ান ফাস্টবোলার—সেখানে সাংবাদিক ডিকি রত্নাকর তাঁদের প্রশ্ন করলেন—উত্তরে তাঁরা বললেন—

'ইয়েস মিঃ রত্নাকর, কোনো সন্দেহ নেই, পঙ্কজ রায়ই ভারতে আমাদের বল সবচেয়ে ভালভাবে খেলতে পেরেছেন—হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, একেবারেই নেই—' চারজন একসঙ্গে একবাক্যে জানালেন।

পঙ্কজ রায়ের কথা থেকে বুঝতে পারছি—গিলক্রিস্টের সরল হিংসাও শ্রদ্ধা-

পূর্ণ হতে পারে যথার্থ সাহসের সামনে। চ্যালেঞ্জের সামনে। ইংলণ্ডের এক বিখ্যাত ব্যাটসম্যানের মুখোমুখি হতে অনেকদিনের ইচ্ছা গিলক্রিস্টের। সুযোগ পান না। একবার একটা ছোট ম্যাচের সময়ে সেই সুযোগ এল। উক্ত বিরাট ব্যাটসম্যান হোটেলে গিলির পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ব্রাদার, তোমাকে কাল কিছু শিক্ষা দেব মাঠে।' শুনে গিলির স্নায়ুতন্ত্রী প্রখর। চ্যালেঞ্জ এসেছে। শিক্ষা...আমাকে দেবে...আমিও তো দিতে পারি। অসহ্য আবেগে কাটল রাত্রি। ..খন প্রভাত হয়, খেলা শুরু হয়। দুঃখের বিষয়, পরদিন বৃষ্টিতে ডুবে গেল খেলা। কে কাকে শিক্ষা দেবে, তা নিরূপিত হল না। গিলি বৃষ্টিধোয়া প্রভাতে দাঁড়িয়ে ভাবেন—ফাস্টবোলারের এই জীবন- আহবানের সামনে উন্মত্ততা—যন্ত্রণা উল্লাস—স্বেদ—সাধ—

কেন আমি ফাস্টবোলার? যেহেতু আমি 'ক্রুদ্ধ ও ক্ষুধার্ত।' আর 'অতি-ব্যস্ত।' ফাস্টবোলার সম্বন্ধে গিলি বলেন–

'He is angry and he is hungry. Most of all he is hungry. Then he is angry. And all the time he is in a hurry'.

এই ক্ষুধা, ক্রোধ আর ঝটিকা যাদের জীবনসঙ্গী, তাদের জীবন কখনো শান্তি ও সুখের হয় না—তারা শুধু ব্যাটসম্যানকে ঘৃণা করে না, ঘৃণিতও হয় তাদের দ্বারা।

ফাস্টবোলারদের আর একটি বেদনার কথা গিলি বলেছেন—ফাস্টবোলারের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথা কেউ মনে রাখে না। তারাও একদিন অল্পবয়স্ক থাকে, দলে ঢুকতে চায়, তার জন্য তাদের উইকেট পাওয়া দরকার, সেই উইকেট পেতে চেষ্টা করতে হয়, যে-চেষ্টাতে রোষ-হিংসা গর্জন ও দংশন স্বভাবতই মিশে থাকে। এ সবই তারা করে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, প্রত্যেক মানুষের যাতে ন্যায্য অধিকার আছে–এই অধিকার কেন আমাদের ক্ষেত্রে স্বীকার করা হবে না–কেন?—গিলি অবুঝ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন—

"যখন আমি তরুণ ছিলাম, ক্রিকেটে নিতান্ত অল্পবয়স্ক একজন, আমি আমার জানা একটি পদ্ধতিতেই বল করতুম—প্রাণপণ জোরে। অনেকে ছিলেন তখন, যাঁরা মনে করতেন, আমি ন্যায় কাজ করছি না এমন দারুণ জোর বল করে, যেহেতু অপরপ্রান্তের ব্যাটসম্যানেরা অল্পবয়সী। আমাকে বেশ কড়া করে জানানো হয়েছিল—এ রকম করা চলবে না। আমিও যে অল্পবয়স্ক ছিলাম, সেটা বিবেচনায় আনা হয়নি।

"আমি সহাস্যে, সুবিচার করার ইচ্ছাসহ প্রশ্ন করেছিলুম—ব্যাটসম্যানের মতো বোলাররূপে আমিও যখন কাঁচা, এবং দুজনেই যখন নিজেদের মতো করে খেলাটি খেলবার চেষ্টা করছি, তখন আমাদের মধ্যে বিচারে তফাত করা হচ্ছে কেন? আমাকে তখন বলা হয়েছিল, তুমি আর ওরা এক নয়। তুমি বিরাট ফাস্টবোলার, আর ওরা সাধারণ খেলোয়াড়।

"এই কথায় আমি পীড়িত হই। আমিও যেমন বড় হয়ে উঠি, তেমনি বড় হয়ে ওঠে ব্যাটসম্যানের দল, যাদের বিরুদ্ধে আগে বল দিয়েছি, এবং দর্শকেরা, যারা ব্যারাক করে। এবং...পৃথিবীও বেড়ে ওঠে, যেখানে আমি বল করি। যখন কোনো ছোকরা আমার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে, তখন সেই ছোকরার প্রশংসায়

সারা পৃথিবী মেতে ওঠে, আমার ভাগ্যে কিছুই জোটে না। তারা কত সুখী হয়ে বলে, 'গিলক্রিস্ট মার খেয়ে খুন হয়ে গেছে—কী মজা!' আর কিছু তাদের মনে থাকে না। তারা লক্ষ্য করে না, গিলিও বলেছে--'সাবাস'।"

ফাস্টবোলারের কণ্ঠ থেকে 'সাবাস' শব্দ বেরুতে পারে, একথা কারো বিশ্বাস হয় না। সকল দর্শক যেন মাঠে নেমে ব্যাটসম্যানের পিছনে ভিড় করে থাকে ফাস্টবোলারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। তারা কি সত্যই বিশ্বাস করবে, যদি গিলি বলেন, তিনি তাঁর বলে ছক্কা মারলে আনন্দ পান---'অদ্ভুত থ্রিল বোধ করেন'—যখন বল উড়ে গেল অনেক উঁচুতে, ভাসতে-ভাসতে গিয়ে পড়ল বহু-দূরে...? ছক্কা-মার একটা চ্যালেঞ্জ, সমান শক্তির ও বুদ্ধির দুটি মানুষের মধ্যে—গিলি বলেন। অথচ গিলি দুঃখবোধ না করে পারেন না--বিপক্ষেরা মাঠে তাঁর সঙ্গে কথা কয় না, পাছে মুখোমুখি হতে হয় তাই অন্য পথে ঘুরে যায়, প্যাভিলিয়নেও কথা বন্ধ, দর্শক মাঠে কুৎসিত গাল দেয়, ভ্যাঙায়, চেঁচায়—কেন? আমি কি দোষ করেছি?—স্বাভাবিক ফাস্টবোলাররূপে আমি শুধু বল করে গেছি, যেমন শিল্পী ছবি আঁকে, গায়ক গান গায়...

গিলিকে যারা দৈত্য বলে, তারা তাঁর ভিতরের স্বাভাবিক মানুষটিকে ভুলে যায়। গিলি বোলার, ঠিক তেমনি ব্যাটিংও ভালবাসেন। গিলি, ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি, নিদেন হাফ সেঞ্চুরির স্বপ্ন দেখেন, যেমন সব ক্রিকেটার দেখেন। গিলি রসিকতা করতেও ছাড়েন না এ-ব্যাপারে। ফাস্টবোলারের বিরুদ্ধে ব্যাটিং মোটেই সুখের নয়। গিলি দলের বিপদের সময়ে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং পর্যন্ত করতে প্রস্তুত। 'আমি বল করতে দলে জন্মেছি, সুতরাং ব্যাট কাঁধ থেকে নামাবো না কোনমতে'—বোলারদের এই ক্রীড়াদর্শন গিলির মনঃপূত নয়। তবে সাধারণভাবে তিনি কোলি স্মিথকে আদর্শ করতে ভালবাসেন। কোলি স্মিথকে তাঁর 'মিকি-মাউস'-সুলভ মজাদারির জন্য মাইটি মাউস (mighty mouse) বলা হত। তিনি বলকে মারতেন না, ঠেঙাতেন। ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে এই আনন্দময় গুণ্ডামিই গিলির অভিপ্রেত। গিলির কানে পৃথিবীর সেরা শব্দসঙ্গীত দুটি, প্রথম, তাঁর দ্রুত বলে উইকেট ছিটকে যাওয়ার শব্দ, দ্বিতীয়, তাঁর মুক্ত ব্যাটের ঘায়ে বলের উড়ে যাওয়ার শব্দ।

গিলির বন্ধু হল ইদানীং বেশ ভালো ব্যাট করছেন। করবেনই তো। হলের বিরুদ্ধে তো কোনো হল নেই! 'আচ্ছা হলকে কেউ বাম্পার দেয় না কেন?' —গিলির সরস প্রশ্ন।

আমরা শুনেছি, এই একই প্রশ্ন করা হয়েছিল নিকিতা ক্রুশ্চেভকে সোভিয়েট-কংগ্রেসে। সেই বিখ্যাত কংগ্রেস, যেখানে ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের কুকীর্তির দীর্ঘ তালিকা পেশ করেছিলেন। স্ট্যালিন অবশ্য তখন গতায়ু। বক্তৃতান্তে ক্রুশ্চেভ বেরিয়ে আসছেন, সকলে তাঁকে ঘিরে আছে, এমন সময়ে তাঁর হাতে একটি বেনামা চিরকুট পৌঁছল। তাতে লেখা আছে—'আপনিও তো স্ট্যালিনের পাশেই ছিলেন, তাঁর ঐসব কীর্তির সময়ে, প্রতিবাদ করেননি কেন?' ক্রুশ্চেভ চিরকুটটি চেঁচিয়ে পড়লেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—এ চিরকুট কে পাঠিয়েছে? চারিদিক নিস্তব্ধ, কোনো উত্তর নেই।

তখন টিপিক্যাল ক্রুশ্চেভ-মার্কা হাসিতে ক্রুশ্চেভের মুখ ভরে গেল; এক

চোখ কুঁচকে দুষ্ট কটাক্ষে শুধু বললেন—'এ্যা—ই জন্যই।'

না, আরও একটি কারণে লোকে হলকে বাম্পার দেয় না। গিলিই সে কথা অন্যত্র জানিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে ভুলে গিয়েছেন। ফাস্টবোলার ছাড়া বাম্পার দেওয়া সম্ভব নয়, অথচ ক্রিকেটের অলিখিত অনুশাসনে ফাস্টবোলারের বিরুদ্ধে ফাস্টবোলারের বাম্পার নিষিদ্ধ। বাঘের মাংস বাঘে খায় না।

একটি কাহিনী বন্ধুমুখে শুনেছি, নিজে পড়িনি, তবু এই প্রসঙ্গে নিবেদন করছি। কাহিনীটি নাকি সুঁটে ব্যানার্জি লিখেছেন।—

সুঁটে প্রথম পেণ্টাঙ্গুলারে খেলতে নেমেছেন হিন্দুদের হয়ে। তিনি ফাস্টবোলার, ব্যাট করতে গেছেন সবশেষে। খেলা হচ্ছে মুসলিম দলের সঙ্গে। মুসলিম দলের অধিনায়ক ওয়াজির আলী। দলে আছেন বিখ্যাত ফাস্টবোলার মহম্মদ নিসার, যাঁর তুল্য দ্রুত বোলার ভারতে হয়নি। সুঁটে ব্যানার্জিকে আউট করতে ব্যস্ততা অনুভব করলেন ওয়াজির আলী। নিসারকে বললেন, বাম্পার দাও। নিসার শুনলেন, তারপর যথারীতি বল দিলেন—বাম্পার নয় কিন্তু। কিছু পরে ওয়াজির আবার অনুরোধ করলেন। নিসার শুনেও পূর্ববৎ বল করলেন। একেবারে শেষের ব্যাটসম্যান, যিনি স্বয়ং ফাস্টবোলার, তাঁকে বাম্পার দেওয়ার অন্যায় করতে পারলেন না। তারও পরে যখন পুনশ্চ অনুরোধ করলেন ক্যাপ্টেন, তখন তাঁকে বল ফিরিয়ে দিয়ে নিসার বললেন—'পারব না। নিসার কারো শত্রু নয়।'

ঈর্ষা-বিদ্বেষের প্রকাশে গিলি কদাপি পরাঙ্মুখ নন। ট্রুম্যানকে তাঁর বিশেষ অপছন্দ। গাল দিয়ে বলেছেন, 'শো-বয়।' গিলির ঈর্ষা—তিনি 'শো-বয়' হতে পারেননি চেষ্টা করেও, যার জন্য ট্রুম্যানের আকর্ষণীয়তাও তাঁর নেই ক্রিকেট-মাঠে। "আমি ক্রিকেটের শো-বয় হতে চেষ্টা করেছি ফ্রেডি ট্রুম্যানের মতো। এক সময়ে আমি 'ফায়ারি ফ্রেডি' জাতীয় একটা ফ্যান্সি নাম জোগাড় করার চেষ্টা করেছিলুম, যথেষ্ট চেষ্টা, কিন্তু আমি পারিনি, আমি মজা ও ক্রিকেট একত্র মেশাতে পারিনি। ক্রিকেট আমার পক্ষে নিতান্ত সিরিয়াস ব্যাপার।"

একটা বেনিফিট ম্যাচের অধিনায়ক গিলিকে অনুরোধ করলেন, বোলিং কিছু আলগা করো যাতে বেনিফিসিয়ারী গোটা পঞ্চাশেক রান করতে পারে। গিলি বললেন, 'তাহলে আমাকে সরিয়ে নাও। আমি ও-ধরনের ক্রিকেট খেলি না। আমি বিনা দামে কাউকে কিছু দিই না।' গিলির বক্তব্য, এই জাতীয় অভিনয় প্রয়োজনে চমৎকার করতে পারেন ট্রুম্যান।

গিলি বিদ্রুপের সঙ্গে বলেন, কিন্তু কখনো-কখনো এই অভিনয়-ব্যাপারটা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। সকলের কাছে ফ্রেডি এমন একটা চেহারা নিয়ে হাজির, যাতে মনে হয়, তিনি সর্বক্ষণ চোখ রাঙিয়ে আছেন, দিব্যি গালছেন, আম্পায়ার ও খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে মুখখারাপ করছেন, সব সময়ই তিনি অগ্নিময়। যখন তিনি সত্যই তা নন, তখনও দর্শক তাঁর যে-কোনো চলাফেরা ও মুখভাবের ঐ একই অর্থ করে। ওয়েস্টইণ্ডিজে ফ্রেডিকে নিয়ে এইজন্য গোলমালের অন্ত ছিল না।

টাইপ অভিনয়ের যে-বিপদের কথা গিলি বলেছেন, তার বিষয়ে একটি সকরুণ কাহিনী আমার মনে পড়ছে। বাংলাদেশের এক বিখ্যাত কৌতুক-অভিনেতার

একমাত্র পুত্র মারা যায়। গভীর দুঃখে, পুত্রবিয়োগে যে দুঃখ হয়, তিনি মনের জ্বালা জুড়োতে গিয়েছেন এক ধর্মমন্দিরে। সেখানে পরিচিত ব্যক্তির কাছে যখন তিনি বেদনাভার মোচন করছেন—শ্রোতা ভদ্রলোক হেসে ফেললেন, কৌতুক-অভিনেতার মুখ যে, অনিবার্য হাসি জাগায়! তারপরেই অবশ্য মর্মান্তিক লজ্জা পেলেন তিনি।

আত্মখণ্ডন জীবনের সাধারণ রীতি। গিলক্রিস্ট, লিখিত আইনে বীমার নিষিদ্ধ নেই বলে বীমারে অন্যায় দেখেন না, তিনিই ট্রুম্যানকে দোষী করেছেন ক্রিকেটের অলিখিত অনুশাসন লঙ্ঘনের জন্য!—

"ক্রিকেটের একটি অলিখিত অনুশাসন আছে, ফাস্টবোলার কদাপি প্রান্ত-বর্তী ব্যাটসম্যানকে বাউন্সার দেবে না। আর কদাপি, কদাপি, কদাপি বাউন্সার দেবে না সমজাতীয় ফাস্টবোলারকে। কিন্তু ফ্রেডি সেই কাজটি করলেন, অন্য কোথাও নয়, লর্ডসে, যেখানে ক্রিকেট-চরিত্রই বড় কথা। আমি ছিলুম ঐ বাম্-পারের 'গ্রাহক'। দশম ব্যাটসম্যানরূপে নেমে আমি ফ্রেডিকে দুবার বাউন্ডারিতে পাঠাতে ফ্রেডি তাঁর পরিচিত চাউনি ছুঁড়ে মেরে বাউন্সার ছাড়লেন।

"একটা জিনিস আমি জানতুম : ফ্রেডি আমাকে যা করলেন, ঠিক তাই আমি করতে পারি তাঁর সম্বন্ধে, এবং আরও কিছু। আমি জানতুম, ফ্রেডি দ্রুতগতি, আমিও একইপ্রকার দ্রুত, অধিকন্তু অনেক বেশি বিপজ্জনক। সেকথা আমি জানতুম, কিন্তু ফ্রেডি জানতেন না, যে-পর্যন্ত না তিনি ব্যাট করতে নেমে-ছিলেন দর্শকের হাততালি পিছনে নিয়ে। তখন আমি একটি মনোরম বাম্পার ত্যাগ করলুম; সেটি ফ্রেডির শিরাবরণীকে চুম্বন করে চলে গেল। ফ্রেডি, টুপির নিম্নবর্তী মুখমণ্ডল থেকে একটি খাঁটি পুরাতন ঈক্ষণ উপহার দিলেন। বোধহয় বাম্পারের গ্রাহকের ভূমিকাটা তাঁর ভাল লাগল না।"

ট্রুম্যানের প্রতি রাগের জন্য বা যে-কারণেই হোক, গিলক্রিস্ট যে 'ক্রিকেটের অলিখিত অনুশাসন', লর্ডসের 'ক্রিকেট-চরিত্র' প্রভৃতি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, এটাই আনন্দের সংবাদ!

গিলির কিছু ন্যায্য পক্ষপাত আছে জনি ওয়ার্ডলের প্রতি। ট্রুম্যান তাঁর সমস্ত মেজাজ সত্ত্বেও 'ক্রিকেটের বদ বালক' হননি, যা হয়েছেন ওয়ার্ডলে, গিলির মতোই। ১৯৫৯ সালে ইয়র্কশায়ার ওয়ার্ডলের মতো পৃথিবী-বিখ্যাত ন্যাটা ধীর বোলারকে (যিনি ২৮ বার ইংলন্ডের পক্ষে অবতীর্ণ) বরখাস্ত করে। ফলে অস্ট্রেলিয়া-সফরের জন্য নির্বাচিত হয়েও খেলোয়াড়রূপে ওয়ার্ড-লের অস্ট্রেলিয়া যাওয়া হয়নি, যদিও বিতর্কিত মানুষটি গিয়েছিলেন সাংবাদিক-রূপে।

গিলির আর একজন ভালবাসার পাত্র অস্ট্রেলিয়ার সিসিল পেপার। 'তিনি এমন এক ধরনের লোক, যাঁকে আমি সর্বময় স্বদলে পেতে চাই। পেশাদার ক্রিকেটার ও অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররূপে তিনি জানেন, জয় বস্তুটা অর্থপূর্ণ—এবং সেজন্য তিনি জয়ের জন্য খেলেন—আমার মতোই।'

রয় গিলক্রিস্ট ও সিসিল পেপার দুজনেই মেজাজের জন্য বিখ্যাত এবং গণ্ড-গোল পাকাবার জন্য। আম্পায়ারদের সঙ্গে এই দুজনের প্রীতির সম্পর্ক নেই। গিলি আনন্দের সঙ্গে একটি পেপার-কাহিনী উপহার দিয়েছেন :

একটি খেলায় সবই চমৎকার চলেছে। সিসিল একটি অপরূপকে ঠেলে দিলেন, যেটি গিয়ে ব্যাটসম্যানের প্যাডের উপরে সজোরে ধাক্কা দিল। তিনি এল-বি চাইলেন, কোমরে হাত দিয়ে আম্পায়ারের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে।

'নট আউট, মিঃ পেপার!'—আম্পায়ার বললেন।

'নট...কি?'—পেপারের কুণ্ঠিত জিজ্ঞাসা।

'নট আ-উ-ট, মিঃ পেপার। বলটি লেগস্ট্যাম্প পেরিয়ে বেরিয়ে যেত।'

পেপার একেবারে ধীরস্থির। 'অবশ্যই', পেপার স্বীকার করলেন, 'অবশ্যই বলটি লেগস্ট্যাম্পে লাগত না', পেপারের মুখে স্বর্গীয় হাসি, 'এবং বলটি নিশ্চয়ই অফস্টাম্পেও লাগত না।'

'তারপর পেপার গর্জে উঠলেন—'বলটি লাগত মিডল-স্টাম্পে।'

সিসিল ও গিলির আরও একটি বড় মিল—দুজনকেই সফর-সমাপ্তির পূর্বে দলত্যাগ করতে হয়...ভারত থেকেই...

'And may be I can understand Cec—if I don't always agree! —because we have one more thing in common. Cec once finished a Commonwealth tour of India long before the fixtures had been completed and came straight back to England. And to Gilli that sounds a mighty familiar story, man.'

এখনো বোধহয় ঠিক মানুষটির কাছে হাজির হতে পারিনি। গিলি তা বোঝেন—তাঁকে বোঝা কত শক্ত! তিনি তাই তাঁর মধ্যে ভ্রমণের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত গাইড-বই পাবলিকের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। জানিয়েছেন, অপছন্দের কথা ও পছন্দের কথা। অনেক জিনিসই তিনি ভালবাসেন না। যেমন তাসের বা ক্রিকেটের জোচ্চোরদের, কিংবা কিছু মিশ্ররক্তের লোককে, যারা নিজেদের খাঁটি শ্বেতাঙ্গ বলে চালাতে চায়। কাঁদুনে ব্যাটসম্যান একেবারে অসহ্য, কিংবা ভালবাসার কাঁদুনি, পুরনো স্কুল-বন্ধুদের কাছ থেকে, কিংবা সবচেয়ে জঘন্য, কেউ যখন কোনো একটা ফেভার দেখানোর বিনিময়ে মাথা কিনে নিতে চায় চিরদিনের জন্য—'এ রকম ক্ষেত্রে আমি ঐ লোকের দেওয়া জামাকাপড় খশলে ফেলে দিয়ে ল্যাংটা হয়ে বাড়ি ফিরব, তবু মুরুব্বির পিঠচাপড়ানি সহ্য করব না।' গিলক্রিস্ট হুলের বোলিংয়ে স্লিপে ফিল্ডিং করা পছন্দ করবেন না, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, নিজে খুন হওয়া 'খুনী'র কবে ভাল লাগে? কিন্তু তিনি ব্রেকফাস্ট বা নতুন বল অপছন্দ করবেন, এ বড় বিস্ময়ের কথা। আমাদের তো বিশ্বাস, তিনি অতীব ক্ষুধার্ত সর্বসময়, শারীরিকভাবেও, সুতরাং সারারাত খিদেয় কাটাবার পরে সকালে ডবল ব্রেকফাস্টের দরকার হয়।...তবু গিলি লিখেছেন, ব্রেকফাস্ট তাঁর অপছন্দ। তাকি আসলে 'ব্রেকফাস্ট' শব্দটিকে, যার মধ্যে 'ফাস্ট'কে 'ব্রেক' করার কথা আছে! যাই হোক, ব্যাপারটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচির মধ্যে পড়ে, কিন্তু নতুন বলের প্রতি বিরাগের কারণ কী থাকতে পারে? ব্যাপারটা এতই বিচিত্র যে, গিলি কারণ না জানিয়ে পারেননি: তিনি হলেন সর্বসময়ের ফাস্টবোলার; সাফল্যের জন্য তাঁর নতুন বলের পালিশ দরকার হয় না; এমন কি প্রথমপর্যায়ে তিনি ভালো বল করতেও পারেন না;

এই সময়ে তাঁর সঙ্গী বোলার দিব্যি উইকেট পেয়ে যান। 'প্রথমে কিছুটা সময় যায় আমার গরম হতে। সেই সময়ের মধ্যে নতুন বল পুরনো হবার দিকে। তারপরে যখন তেতে উঠি...'

গিলি বলেন, আমি টেলিফোন করা ভালবাসি না। তাতে দোষ নেই, যেহেতু স্ত্রীকে নিয়মিত প্রেমপত্র লেখায় তাঁর আসক্তি আছে। গিলি ঘনরঙের দামী পোষাক পরতে বা কালো টাই ঝোলাতে চান। ভালো গাড়ি, যা ব্রেকডাউন হয় না, কিংবা ভালো গ্যারেজ, ব্রেকডাউন হলে চোখের পলকে যা গাড়ি সারিয়ে দেয়—এ সবও তাঁর প্রীতির বস্তু। জাজ্ গান, মনোহর রাত্রে বহির্গমন, বীয়ার, আরও প্রিয় হুইস্কি, তবে পা যেন না টলে, বড় আকারের বাইবেলী সিনেমা—গিলির অন্যান্য পছন্দের বিষয়। এসব জিনিসের প্রতি প্রীতি নতুন কিছু নয়—

নতুন কিছু নয় আর একটি জিনিস, বরং অত্যন্ত পুরাতন, গিলির জীবনেতিহাসে বলা যায় চিরন্তনী—তিনি বল করতে চান। হাসি, গান, প্রাণের বন্ধুজন...আর রৌদ্রালোকে বোলিং বোলিং বোলিং...যে-কোনো দিক থেকে, যে-কোনো সময়ে...

সারাদিন আমাকে বল করতে দাও, আমি তাই চাই। আমাকে খেলা থেকে সরিয়ে নিও না। সরিয়ে নিও না আমার চিরশত্রু ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে। সরিয়ে নিও না আমাকে আমার জন্মগত ঘৃণার অধিকার থেকে, হিংসা থেকে... আমার জীবনের সত্যতম প্রকাশ যেখানে...

আঃ—আমি শ্বাস টেনে নিচ্ছি মাঠে...আমার ফুসফুস ফুলে উঠছে বিশুদ্ধ বাতাসে...একটা বাড়তি শ্বাস বাড়তি জোর এনে দিয়েছে আমার মধ্যে...এ জোর যে ভিতরে ছিল আগে বুঝতে পারিনি, সমস্ত দেহমন সহসা স্পন্দিত হয়ে উঠেছে সেই নতুন শক্তির চেতনায়, আমি গমকে-গমকে জেগে উঠছি—সেই রসে ও রোষে বল করছি...আর মনে হচ্ছে...এ পৃথিবী মহান...বাঁচার পক্ষে আর আমি, এই পৃথিবীর শক্তির ঈশ্বর...

গিলক্রিস্টকে এবার হয়তো কিছু বুঝেছি।

* * * ক্রিকেট অন্য আকাশে * * *

ভারতকে লোকে বলে ক্ষুদ্র দুনিয়া। অথচ ভারতবর্ষে এখন ক্রিকেটের মহাপ্লাবন, তবু দুনিয়ার বৃহৎ অংশে ক্রিকেট সম্বন্ধে অনুচিত অনাগ্রহ। এ সম্বন্ধে কিছুদিন থেকেই চিন্তিত আছি। ফরাসীরা ক্রিকেটের রসিক নয়, কিছু আগেই পাঠক জেনেছেন। জার্মানরাও তাই। রাশিয়া তো স্পষ্টভাবে বিরোধী (যদিও শোনা যায়, শোধনবাদের প্রকোপে নাকি রাশিয়ায় ক্রিকেটচর্চা শুরু হয়ে গেছে) বাকি থাকে আমেরিকা, পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে। আমেরিকানদের দাবিমতো আমেরিকাকে মুক্ত দুনিয়া ধরে নিয়ে ক্রিকেটের স্রষ্টা ও পোষ্টা ইংরেজজাতির উদ্দেশ্যে একদা এক আবেদন প্রচার করেছিলুম। আমি সামান্য

বাঙালী লেখক, আমার আবেদনে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই, তবু ক্রিকেটের ভাবী বিপদে আমার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হয়নি। আমি লিখেছিলুম, হে ইংরেজগণ! যেভাবে হোক, যত দ্রুত পারো মার্কিনজাতিকে ক্রিকেট-নেশা ধরিয়ে দাও।

আমার ব্যাকুল আবেদনের বিশেষ কারণ উপস্থিত হয়েছিল, বা এখনো আছে। বিজ্ঞানের রকেট উন্নতিতে আমাদের ভৌগোলিক সীমা সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে সন্নিকট হচ্ছে চৌগোলিক ('চন্দ্র-গৌলিক'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) সীমা। আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুই জাতি শূন্যে স্পুটনিক ফোটাতে পেরেছে বলে তারাই প্রথমে চাঁদ পাবে। চাঁদ পাবার ব্যস্ততার জন্য আণবিক বোমা ফাটানো পর্যন্ত বন্ধ রেখেছে তারা। কিন্তু রাশিয়া চাঁদে গেলে কখনই ধনতন্ত্রের ডাণ্ডাগুলি ক্রিকেটকে নিয়ে যাবে না; নিয়ে যাবে মার্কসের 'ক্যাপি-টাল', ক্যাপিটালের প্রতিষেধক হিসাবে। সে-ক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা আমেরিকা। ইংরাজগণ, জগতের বিশ্বকর্মাপূজায় তোমরা চাঁদিয়াল স্পুটনিক ওড়াতে পারনি। এখন যদি মার্কিন-ভাগনেকে বুঝিয়ে তাদের চন্দ্রমুখী স্পুটনিকে ক্রিকেট-গীয়ার ও এম-সি-সি নিয়মাবলী ঢুকিয়ে দিতে না পার, তাহলে ভবিষ্যতে চন্দ্র যখন আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুই অর্ধচন্দ্রে বিভক্ত হয়ে যাবে তখন উভয়ার্ধেই ক্রিকেট পাবে অর্ধচন্দ্র।

অথচ চাঁদে যদি ক্রিকেট না যায়, সেটা পৃথিবীর ক্রিকেট-রসিকদের পক্ষে অপরিসীম দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে—বিশেষত ক্রিকেট-সাহিত্যের পক্ষে। ইডেনে শীতের দুপুর বা লর্ডসে গ্রীষ্মের অপরাহ্নের কাব্য নিতান্ত তুচ্ছ 'রোহিণীতে' নিশিপূর্ণিমার তুলনায়। কল্পনানেত্রে দেখুন আপনারা, ঐতিহাসিক লর্ডস বা ঐতিহাসিক ইডেন-গার্ডেনের সামান্য সৌন্দর্যের পাশে, সৌন্দর্যের অক্ষয় উৎস চাঁদের পৌরাণিক রোহিণী-স্টেডিয়ামের ক্রীড়াচ্ছবি—সেখানে খেলা হয় নিত্য চন্দ্রালোকে, কলঙ্কবৃক্ষ থেকে ডাল ভেঙে ব্যাট তৈরী করা হয়, বল হয় কোন এক রক্তিম তারকা এবং খেলোয়াড় হলেন কিরণ-বসন স্বর্গীয় চরিত্রগুলি—সে খেলা দেখছেন—আপনি!!!

তালতলা, বেলতলা বা নাকতলা, যেখানেই আপনার আড্ডাস্থল হোক, বাঁশ-বেড়ে, উলুবেড়ে বা রায়বেড়ে, যেখানেই আপনি বসবাস করুন, আপনার ক্লাইভ স্ট্রীটের আকাশে যদি পাঁশুটে চাঁদ পর্যন্ত না ওঠে, তবু আপনি চাঁদনি ক্রিকেটের একজন মুগ্ধ দর্শক—

অসম্ভব। সত্যই অসম্ভব হবে যদি-না ইংরেজ তাদের বেয়াড়া ভাগনে আমে-রিকানদের ক্রিকেট ধরাতে পারে।

অন্যতম চন্দ্রাহত বাঙালী-রূপে আমি চাঁদনি ক্রিকেটের জয়গান করছি না। ইংরেজ ক্রিকেট-লেখকরাই চাঁদনি ক্রিকেটের কথা জানিয়ে গেছেন। শুধু চাঁদনি ক্রিকেট নয়—তুষার-ক্রিকেট পর্যন্ত। ইউরোপের দ্বীপান্তরবাসী ইংরেজদের উপর প্রকৃতির মারের সীমা নেই। তাদের শীত দীর্ঘ, বিষাক্ত এবং মৃত্যুঘন্টা-ধ্বনিত। জানুয়ারির মৃত্যুনিশীথে ইংলণ্ডে চাঁদ ওঠে না, উঠলেও কেউ দেখে না, দেখলেও তা নিয়ে ভাবাবিষ্ট হবার বাসনা কারও থাকে না। ১৮৭৯, জানুয়ারি মাসের তেমন এক রাত্রি কিন্তু বিস্ময়করভাবে কাব্যচর্চিত হয়েছে—কারণ, সেই-

রাত্রে উইণ্ডসর-পার্কের তুষারঢালা রূপালী স্বপ্নের উদ্যানে ক্রিকেটখেলা হয়েছিল। 'সেই ৮ই জানুয়ারির পূর্ণিমা-নিশীথে চাঁদ উঠেছিল পূর্ণ প্রভায়', একজন লিখেছেন, 'নির্মেঘ, নির্মল অম্লানদ্যুতিতে ভাস্বর চন্দ্র—সন্ধ্যা থেকে রাত্রি পর্যন্ত।' শ্রীযুক্ত এ এ টমসন এই কাব্যিক বর্ণনার উপর সানন্দ কৌতুকে মন্তব্য করেছেন—"এই প্রথম বোধহয় 'শীতচন্দ্রের সুদীর্ঘ মহিমার' বিষয়ে গদ্যে কবিতা লেখা হল।" এবং আমরা সকলেই জানি, এর মূলে আছে ক্রিকেট।

এহেন ক্রিকেটও মার্কিনরা খেলে না। সারা পৃথিবীতে যেখানে ইংরেজ গেছে, ইংরেজী গেছে, সেখানেই ক্রিকেট গেছে। ব্যতিক্রম আমেরিকা। মার্কিন-শরীরে জার্মান, ইতালিয়ান, ফরাসী, স্প্যানিশ—সব রক্ত থাকলেও ইংরেজী রক্তের ভোট অনেক বেশি, অথচ ক্রিকেট-ব্যাপারে মার্কিন-শিরাধমনীতে বহমান ফরাসী-জার্মান রক্ত ইংরেজ রক্তকে ডানকার্ক করে দিলে। ক্রিকেটকে আমেরিকানরা কখনই নিল না গভীরভাবে। ক্রিকেটের কথা উঠলেই অর্বাচীন হাসিতে হো-হো করে সে বলে, বুড়ো মামাদের ভীমরতি! বেসবল পেটাপেটি না করে, রাগবির মারামারি ছেড়ে দিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুতোবাঁধা পুতুলের মতো নড়াচড়া করছে ক্রিকেটে! আরও বলে, সমারসেট মমের গল্পে পড়নি মামাদের কেতাবী আচরণের কথা?—যেখানে সাতদিন অন্তর ডাক যায় এমন কলোনির ধ্যধ্যাড়া গোবিন্দপুরে বসেও বুড়্যা ইংরেজ কেমন করে রোজ 'প্রাতোঃকালে' খবরের কাগজ পড়ে? মামা এক সপ্তাহ পরে পুরো গত সপ্তাহের কাগজ পায় বটে, কিন্তু হাতে পেয়েও সাতদিনের কাগজ একসঙ্গে পড়ে ফেলে না; মামা সোমবারের কাগজ সোমবারেই পড়ে, মঙ্গলবারের কাগজ মঙ্গলবারেই—তবে আগের সোমবারের, আগের মঙ্গলবারের, এই যা। একশো মাইলের মধ্যে কোনো সাদা চামড়া নেই তবু মামা খেতে বসবে পুরো খাওয়ার পোষাক পরে—প্রতি-দিন, প্রতি রাত।

মার্কিনের চাই গতি। অটোমোবাইলের স্পীডোমিটারের শেষ দাগের উপর গতির কাঁটা মাথা খুঁড়বে, তবে না তাদের দিল খুশ্! তারা সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত দৌড়য়, তারপর ঘুমের পিল খেয়ে খানিক ঝিমোয়, তারপর চমকে উঠে ড্রেসিংগাউন পরেই আবার ছুটতে শুরু করে—এরা যে ক্রিকেটের ধীরলয়ের মার্গসঙ্গীতকে ঠোঁটের শিসে গলির সুর ভেঁজে উড়িয়ে দেবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

অথচ উপায় নাহিরে নাই। চাঁদে ক্রিকেট পাঠাতে গেলে আমেরিকান এইড্ চাইই গণতন্ত্রী দুনিয়ার। 'বিশ শতকী মার্কিনের ক্রিকেট-অনীহা যেখানে অনস্বীকার্যভাবে সোচ্চার' সেখানে—।

ইংরেজরা মার্কিনীকে ক্রিকেট ধরাতে চেষ্টা করেনি তা নয়। এ ব্যাপার কোনো-কোনো মহাপ্রাণ ইংরেজের সাধনা ক্রিকেট-ইতিহাসে রেকর্ডিত হবার যোগ্য। একটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারি নমুনারূপে। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন সাহিত্যিক এ এ টমসন। অতীব উপাদেয় কাহিনী।—

"আপনারা সকলেই স্যার অবেরী স্মিথের নাম স্মরণ করতে পারেন নিশ্চয়; দীর্ঘচ্ছন্দ সুপুরুষ এই ইংরেজ ভদ্রলোক ফিল্মে যোগদান করেন, ও শেষের দিকে হলিউডের মুকুটহীন রাজা হয়ে ওঠেন"—টমসন-সাহেব শুরু করেছেন।

স্যার অবেরী হলিউডের ফিল্মে 'প্রাচীন ইংরেজ ভদ্রলোকে'র আদর্শ নমুনারূপে গৃহীত হয়েছিলেন। হলিউডের বহু গণ্ডগোলের মধ্যে এই সঠিক নির্বাচনটি তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। "কিন্তু একথা খুব অল্প লোকই জানেন যে, স্যার অবেরী স্মিথ একদা সি এ স্মিথ নামে কেম্ব্রিজ, সাসেক্স ও ইংলণ্ডের ক্রিকেটার ছিলেন, যিনি সাউথ আফ্রিকায় প্রথম সফরকারী দলের অধিনায়ক!" মিঃ টমসন জানিয়েছেন—সি এ স্মিথ তাঁর আভিজাত্য অনুযায়ী ধীরলয়ের বোলার ছিলেন, এবং 'প্রাচীন ইংরেজ ভদ্রলোকে'র অবশ্য কর্তব্যরূপে বিদেশে ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। হলি-উডের ফিল্ম-কলোনির মধ্যে তিনি একটি নিজস্ব ক্রিকেট-দল পোষণ করতেন। এবং লর্ড হক বা লর্ড হ্যারিস, যাঁরা ক্রিকেট-কেতার মহালর্ড, তাঁদের তুল্য কঠোরতার সঙ্গেই স্যার অবেরী তাঁর নিজস্ব ক্রিকেটদলের আচারআচরণ নিয়ন্ত্রণ করতেন। এটিকেটের এতটুকু নড়চড় না হয়, ক্রিকেট নিয়মাবলীর প্রতিটি ধারা যাতে সুব্যাখ্যার সঙ্গে গৃহীত ও পালিত হয়—সেদিকে তাঁর কড়া নজর ছিল।

রীতিরক্ষায় স্যার অবেরীর দৃষ্টি যেমন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছিল. তেমনি হ্রাস পেয়েছিল সাধারণ দৃষ্টিশক্তি। ফলে একদিন তিনি খেলার সময়ে একটি মহাদোষ করলেন, যে দোষ করলে অন্যকে কখনো ক্ষমা করেননি—স্যার অবেরী স্লিপে একটি ক্যাচ ফসকালেন। তৎক্ষণাৎ তিনি খেলা থামিয়ে নিজ বাটলারের উদ্দেশ্যে সঙ্কেত করলেন। বাটলার পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে মাঠ পেরিয়ে তাঁর সামনে উপনীত হল, এবং নত হয়ে অভিবাদন করল।

'আমার চশমা আনো'—স্যার অবেরীর আদেশ ঘোষিত হল।

ধীরপদে বাটলার ফিরে গেল এবং একই ধীরতায় প্রত্যাবর্তন করে স্যার অবেরীর সামনে রৌপ্যপাত্রটি তুলে ধরল। পাত্রের উপরে খাপে-ভরা চশমা। স্যার অবেরী খাপ খুলে চশমা নিলেন, পরলেন, এবং আম্পায়ারকে পুনরায় খেলা শুরুর আবেদনসূচক আদেশ দিলেন। বোলার বল দিল, ব্যাটসম্যান আবার খোঁচালো, বল স্যার অবেরীর হাতে ছুটে গেল, কিন্তু...পুনশ্চ ছিটকে বেরিয়ে গেল। শ্বাসরুদ্ধ চতুর্দিক। অবশেষে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে সমুচ্চ অভিযোগ গর্জিত হল—'ভো! ভগবন্!'—স্যার অবেরী আর্তনাদ করলেন—'মূর্খটা আমার পড়ার চশমা এনেছে!'

একদা স্যার অবেরীর দলের সঙ্গে আমেরিকায় আগত একটি বৃটিশ ক্রুজারের নাবিকদলের ম্যাচ হওয়ার স্থির হয়েছে। টমসন-সাহেবের এক পরিচিত ব্যক্তির খেলার কথা ছিল স্যার অবেরীর দলে। দুঃখের বিষয়, খেলা আরম্ভের আগে পা ফসকে পড়ে গিয়ে ঐ ব্যক্তির পায়ের গোছে এমন মোচড় লাগল যে, খেলা অসম্ভব। এখন কী উপায়! স্যার অবেরীকে এই দুর্ঘটনার কথা বলতে সাহস হল না, তাঁর যা মেজাজ। একমাত্র উপায়, আহত ব্যক্তি ভাবলেন, যেভাবে হোক একজন বিকল্প খেলোয়াড় যোগাড় করা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি জনৈকা বান্ধবীর অঙ্গে ভর করে (পা মচকানোর জন্যই নিশ্চয়!) হলিউডের সর্বদিকে এমন একজনের সন্ধান করে ফিরতে লাগলেন, যিনি 'ক্রিকেট নামক ইংরেজী খেলাটিকে' জানেন। ব্যর্থ সন্ধানের শেষে যে একটিমাত্র ব্যক্তিকে রাজি করাতে পারলেন,

তিনি হলেন অ্যাডভেঞ্চার বইয়ের সাহসী অভিনেতা উইলিয়ম বয়েড।

অভিনেতাটির অবশ্য ক্রিকেট-নিয়মকানুন সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও ছিল না। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলা হল—'আরে, খেলাটা নিতান্ত সোজা; অনেকটা বেসবলের মতোই, বরং বেসবলের চেয়ে অনেক কম জটিল।' অনেক চেষ্টায় তাঁকে ক্রিকেটের জন্য ফ্লানেল চড়াতে রাজি করা গেল। সৌভাগ্যবশত স্যার অবেরী টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন; তাই আহত ব্যক্তির অনুপস্থিতি কিংবা তাঁর বিকল্পের হাজিরা কারোররই চোখে পড়েনি।

আহত ব্যক্তি ছিলেন বোলার। ব্যাটিংয়ে তাঁর স্থান নবম। নবম ব্যাটসম্যান-রূপে নবাগত মার্কিন অভিনেতাটি যখন মাঠে নেমে উইকেটের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন, তখন ছ' ফুট তিন ইঞ্চি আকারের সেই ব্যক্তি এক দৃশ্য সৃষ্টি করলেন বটে।

ক্রীজে গিয়ে দাঁড়িয়েই তিনি পুলিশের ব্যাটনের মত ব্যাট ঘোরাতে লাগলেন। আম্পায়ার নম্রভাবে প্রশ্ন করলেন—'কি চাই, সেণ্টার?'

'ছোঁড়া শুরু হোক'—অভিনেতার হুঙ্কার।

প্রথম বলটি ফসকালো। দ্বিতীয়টিও তাই। তৃতীয় বলটি লেগে সুন্দর ধীর-গতি ফুলটস। সে বল পাওয়ামাত্র লঙ-অনের দিকে আকাশছোঁয়া মার—বল উড়ে গেল মাঠের বাইরে—বোধহয় বিভারলি পাহাড়ের উপরে—না, বোধহয় প্রশান্ত মহাসাগরে!!

অকস্মাৎ সকল ইংরেজ খেলোয়াড় আঁতকে উঠে দেখে—ব্যাটসম্যান একেবারে উন্মত্ত। শব্দমাত্র উচ্চারণ না করে তিনি পাগলের মতো ছুটে গেলেন পয়েন্টের দিকে, পয়েন্ট থেকে কভারে, কভার থেকে মিডঅফে, মিডঅফ থেকে স্তম্ভিত আম্পায়ারকে বেষ্টন করে মিডঅনে, মিডঅন থেকে স্কোয়ার লেগে, এবং সেখানে ক্ষণমাত্র না থেমে তীরের মত নিজ উইকেটে।

সকলের দমবন্ধ। চক্ষুস্থির। মুখ ব্যাদিত। প্রত্যেকটি খাঁটি ইংরাজ প্রায় মূর্ছিত। ক্রিকেট-মাঠে ইয়াঙ্কি তার বেসবল দৌড় সমাপ্ত করল।

স্যার অবেরী শুধু বলতে পারলেন—'আমি ডিক্লেয়ার করলুম'—একমাত্র যা বলবার শক্তি তিনি রেখেছিলেন।

এই ঘটনা থেকে পাঠক নিশ্চয় বুঝবেন, ক্রিকেটের সঙ্গে মার্কিনজাতির সহাবস্থান কেন অসম্ভব। নিয়মের টাই ঝোলানো এই খেলাটির ভিতরে অসংবরণীয় মার্কিন-শরীরকে প্রবেশ করানোর মতো দুরূহ কাজ পৃথিবীতে আর নেই। তদুপরি অভিজাত ইংরেজের ক্রিকেট-ভাষা নিয়ে মার্কিনের উগ্র অশালীন ব্যঙ্গ:

"আমাদের দেশে কোনো-কোনো ব্যক্তি ভাবেন ক্রিকেট এক ধরনের ফড়িং—ক্রিকেট শব্দের আভিধানিক অর্থ যা। লর্ডসের বা অন্য মাঠের সুন্দর ছাঁটা ঘাসের উপরে ক্রিকেটাররা ফড়িং-এর মতোই লম্ফ-ঝম্ফ করে, তবে ফড়িং-এর চেয়ে তাদের লম্ফ-ঝম্ফে অনেক বেশি শৃঙ্খলা আছে এবং ভাবেগতিকে তা বিশেষ গম্ভীর।"

হে ক্রিকেট দুনিয়া! জেগে ওঠো—পাষণ্ড মার্কিনদের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ করে দাও! অ্যাঁ! সুমহান ক্রিকেট হল ফড়িং-নাচ! অভিধান থেকে

'ক্রিকেট' শব্দের ঐ অর্থ যদি করো, তাহলে আমরাও তোমাদের 'বেসবলের' শব্দার্থ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে যদি বলি, বেসবল মানে ঘৃণ্য জঘন্য বল, সেটা কেমন দাঁড়ায়? কতখানি ভয়াবহ ঐ খেলা তা বেসবোলারদের সাজ-পোষাকেই মালুম। প্রাচীন নাইটদের মতো আপাদমস্তক বর্মে ঢেকে যখন তারা মাঠে নামে, তখন উদ্দেশ্য যুদ্ধ কি খেলা, বলা শক্ত। আমরা অবশ্য বেসবলের বিরুদ্ধে ঐ ধরনের কথা মোটেই বলব না, আমরা ক্রিকেট-ভক্ত, আমাদের জাত আলাদা, মনোভাব গোপন করার খুব অভ্যাস আছে, আমাদের কঠোরতম ভাষা—'এটা ক্রিকেট নয়' (যেমন, এটা মানুষ নয়)—কিন্তু ক্রিকেট-ঘাটে মাথা না-মুড়োলে কি বেসবল সম্বন্ধে ঐ কথাগুলি ন্যায়ত বলতে পারতাম না?

মার্কিন ভদ্রলোক অতঃপর ক্রিকেট-দর্শকদের নিয়ে পড়েছেন: 'ক্রিকেট দেখতে কোনই হাঙ্গামা নেই। শুধু দরকার একটি ইজিচেয়ার, একটি পাইপ বা দুটি পশমবোনার কাঁটা এবং সপ্তাহখানেকের অফিস পলায়ন।'

পুনশ্চ খেলার প্রতি বিদ্রূপ:

খেলাটা অবশ্য বিশেষ ঝঞ্ঝাটের। তাতে সাদা প্যান্ট-সার্ট, কাঁটাওয়ালা জুতো, উইকেট, ব্যাট ও চামড়ামোড়া বল লাগে। উইকেট আবার দুসারি। তিনটে করে কাঠের খোঁটাকে মাটিতে গেঁথে একদিকের উইকেট তৈরী হয়, তার মাথায় থাকে দু' টুকরো কাঠ, যার নাম বেল। ৬৬ ফুট দূরে মুখোমুখি গাঁথা থাকে আর একসার উইকেট। একদিকের উইকেটের কাছ থেকে বল ছুঁড়ে বোলার অন্য-দিকের উইকেট ছরকুটে দেবার চেষ্টা করে। বোলারের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে ব্যাটসম্যান। দুই উইকেটের মধ্যে ঘোড়দৌড় করে রান হয়।

'অধিকাংশ বোলার বলকে ধাপায়। বলকে ঘুরপাক খাইয়ে বা মাঠের খোঁদলের সুযোগ নিয়ে তাকে লাফ খাইয়ে বোলাররা ব্যাটসম্যানকে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়াতে সচেষ্ট। ব্যাটসম্যানের পক্ষে আত্মরক্ষা করার সবচেয়ে সদুপায় হল, বোলারদের দিকে ব্যাটের চওড়া দিকটি দেখিয়ে স্থিরভাবে ব্যাট ধরে থাকা। সেক্ষেত্রে ব্যাট ও উইকেটের মধ্যে ব্যবধান থাকে চুলখানেক। এরই নাম উইকেটে পাথরগাঁথা। কৃতী প্রস্তরশিল্পীরা একনাগাড়ে উইকেটে তিনদিন চারদিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে।...ব্যাটারের বাঁ পাশ ঘেঁষে খুব কাছে যে-ফিল্ডার দাঁড়ায় তাকে 'সিলি মিডঅন' বলে, ডানদিকে ঘেঁষে দাঁড়ালে বলে 'সিলি মিডঅফ', কেন বলে তার চিন্তায় নিরেট গবেষকের ঘিলু পর্যন্ত ঘুলিয়ে যায়।'

ক্রিকেট সম্বন্ধে আরও একটি মার্কিনী ব্যঙ্গরচনা উপহার দিচ্ছি। লেখাটি ক্রিকেটামোদীদের উপভোগ করতে কোনই বাধা হবে না, কেননা মহৎ ব্যক্তিরা নিজেদের কার্টুন নিজেরাই সবচেয়ে তারিফ করেন।

জনৈক আমেরিকান সাহিত্যিক, যিনি এই রচনাটির স্রষ্টা, তিনি জীবনে একবার মাত্র ক্রিকেট খেলেছেন, খেলাশেষে লম্বা হয়ে নমস্কার করেছেন এই 'বন্য বর্বর রক্তাক্ত ক্রীড়ানামক কাণ্ডটিকে।' ইংলণ্ডে 'লেখক-সঙ্ঘ' ও 'পুস্তক-ব্যূহ' এই দুই দলের খেলায় এঁকে 'লেখক সংঘের' পক্ষে অবতীর্ণ হতে বলা হয়। কার যেন মাথায় আইডিয়া এসেছিল, যদি বেসবল-পরিচিত কোনো মার্কিন ভদ্রলোককে ক্রিকেট-মাঠে নামিয়ে, পরে তাঁর কাছ থেকে অভিজ্ঞতার কথা লিখে নেওয়া যায়, মজা মন্দ হয় না। মার্কিন-ভদ্রলোক সরলপ্রাণে মাঠে

নেমে পড়েন অন্যের উৎসাহে। তারপর কী ঘটল তাঁর মুখেই শোনা যাক। আমি বাদসাদ দিয়ে হাজির করছি :

"ব্যাপারটি লঘুভাবে নিয়ে আমি খুবই ভুল করেছিলুম। ভেবেছিলুম, ছোঁড়া বলকে লাঠিপেটা করা যার কিছু অভ্যাস আছে, যে উঁচু জিনিস লুফতে বা মাঠে খাটাখাটুনি করতে পারে, তার পক্ষে এই সহজ খেলাটা ম্যানেজ করে নেওয়া আদপে শক্ত হবে না। বাপ্‌রে—যদি ঘুণাক্ষরে জানতুম দুটি দল মারাত্মক শত্রু এবং তথাকথিত খেলাটির মধ্যে এতখানি বিপদ আছে, তাহলে আমি (ক) কদাপি এই গুণ্ডামির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতুম না, কিংবা (খ) বুল-ফাইটারদের মতো সারারাত্রি প্রার্থনায় কাটাতুম, যারা বুঝতে পারে আগামী প্রভাত তাঁদের জীবনের শেষ প্রভাত।

"অনিবার্য সর্বনাশ সম্বন্ধে আমি প্রথম সচেতন হলুম যখন আমাদের দল গোড়াতেই ফিল্ডিং করতে নামল। আমি আবিষ্কার করলুম যে, আমাকে গ্লাভস পরতে দেওয়া হবে না, অথচ হাঁকড়ানো বল আমাকে পাকড়াতে হবে খোলা আঙুলে। তারপর আমাকে একটা জায়গায় দাঁড় করানো হল—দিব্যি গেলে বলছি তার নাম সিলি মিডঅন—যেটা ব্যাটসম্যানের ছয় ফুটের মধ্যে কিন্তু আমাকে শিরস্ত্রাণ বা বুকে বর্ম, কিছুই পরতে দেওয়া হল না।

"সিলি মিডঅনে ফিল্ডিং করবার সময়ে, অহো, আমার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কালীন একটি চমৎকার অপরাহ্নের কথা মনে পড়ে গেল, যখন পাশ দিয়ে একে-বারে গা-ঘেঁষে এক-ঝাঁক গুলি ছুটে গিয়েছিল। একটি গুলি-বল আমার পায়ের গোছে ধাক্কা খেয়ে চোখের পলকে বাউন্ডারি। গোছে পরে প্লাস্টার করতে হয়েছিল। উঁচু থেকে সাঁ করে নেমে-আসা বলকে বাগাবার চেষ্টায় একটা আঙুল এমন জখম হল যে, টাইপরাইটারের উপর নৃত্য করবার ক্ষমতা তার বেশ কিছু-দিন থাকেনি। নীচু হয়ে থাকার জন্যে পিঠে ব্যথা ধরে গেল এবং যদি তারই টানে, বার্ধক্যের জন্য নয়, মাথা না নাড়াতুম তাহলে একটি বল আমার মাথার ঘিলু একেবারে চলকে দিত। 'কেমন লাগছে?'—ক্যাপ্টেন শুধালেন মধুকণ্ঠে, 'খুব মজার খেলা, কি বলেন?'

"ওভার-চেঞ্জ হলে আমাকে যে-জায়গাটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হল, সেটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান, কিন্তু খানিক পরে দেখি, বাউন্ডারি বাঁচাবার জন্য দৌড়তে-দৌড়তে আমার জিভ বেরিয়ে ঝুলে পড়েছে।

"সেই তো সবে শুরু। বিকেলের দিকে আমার ব্যাট করার পালা এল। কখনো ক্রিকেট ব্যাট ধরিনি বলে মাঠে ফায়ারিং-লাইনের সামনে দাঁড়াবার আগে আমাকে একটু প্রাকটিশ করতে দেওয়া হল। আমার থেঁতলানো পায়ের উপরে প্যাড চড়িয়ে, হাতে একটা থ্যাবড়া ব্যাট ধরিয়ে দিয়ে, আমাকে নেটে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, 'দেখে খেলবে!' একটি বোলারও জোগান দেওয়া হল। সে ব্যক্তি দৌড়ে ধেয়ে এসে হঠাৎ লাফ মেরে বলটিকে মাটিতে এমন ঠুকে দিলে যে, বলটি ঝাঁ করে উপরে উঠে আমাকে এমন এক স্থান আঘাত করল...ইয়ে...

"ফার্স্টএড ও আধঘণ্টার বিশ্রামের দ্বারা আমি যে-শক্তি সংগ্রহ করলুম তাতে হেঁটে ক্রীজে পৌঁছানো সম্ভব হল।

"গোলাবর্ষণের মধ্যে আমার সংক্ষিপ্ত কুর্মাবস্থানকালে আমি যে ছয় রান

সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলুম তা বিশুদ্ধ আত্মরক্ষাব্যপদেশে, অধিকতর আঘাত থেকে পরিত্রাণচেষ্টায়। পরে শুনলাম, আমি নাকি কয়েকটি অদ্ভুত ভালো হুক করেছি। আসলে মাথা বাঁচাতে আমি বলটিকে দ্রুত সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলুম। প্রথম মারের পর কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—'ছোটো!'—যেটা ইয়ার্কি ছাড়া আর কিছু নয়, দৌড়বার অবস্থায় ছিলুম না সকলেই জানে, তবু চেষ্টা করলুম, ফলে শিরায় টান ধরল।

"এই অতিবিচিত্র অ্যাংলো-স্যাক্সন আঘাতে সংঘাতে কতক্ষণ লিপ্ত থাকতে পারতুম জানি না, হয়ত বেশ খানিকক্ষণই পারতুম কারণ মানুষেব বাঁচার তাগিদ প্রবল—আত্মরক্ষা করে যেতামই প্রাণপণে—যদি না একজন লম্বাপানা ল্যাকপেকে বোলারকে আমদানী করা হোত। পুরনো ভয়ঙ্করটির চেয়ে এঁর ধরনধারণই আলাদা। এঁকে নরম চতুর বলা চলে। ইনি উপরদিকে একটি সুমধুর বস্তু উড়িয়ে দিলেন, মায়ের হাতের মোয়ার মতো সেটি ঝুলতে-ঝুলতে অর্ধবৃত্তাকারে আমার কাছে আসতে লাগল—আমার শরীরসম্বন্ধীয় কোনো দুরভিসন্ধি তাতে ছিল না। সেটি টুক্ করে আমার পায়ের কাছে খসে পড়বে আর আমি সেটিকে একদম সাবাড় করব। আমেরিকান ধাঁচে হাত-খুলে লম্বা ব্যাটে প্রেমসে বলটি ওড়াবো—ছ-এর জন্য—আট...দশ...বার যা হয়—বাউন্ডারি-প্রান্ত আলো-করা অবজ্ঞাপরায়ণ দর্শকদের কিছু শিক্ষা দিয়ে দেব।

"দুঃখের বিষয় আমি লক্ষ্য করিনি, বস্তুটি বোঁ-বোঁ-ও-ও করে ঘুরছে। যে মার বলটিকে টেমসের পরপারে পাঠাতে পারত তা প্রথমত আমার কনুয়ের একটি তন্ত্রী ছিঁড়ল, এবং তার দ্বারা বলটি ক্রুদ্ধ মৌমাছির মতো গন্‌গন্ করতে করতে আকাশে উঠে পড়ল, তারপর নামতে লাগল জনৈক ফিল্ডারের প্রতীক্ষার অঞ্জলির উপরে—ক্রিকেটের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ সেইখানেই।

"কিন্তু কর্মফল তখনই শেষ হল না। সেদিন সন্ধ্যায় ইটনে বক্তৃতা দেবাব কথা। বসে বক্তৃতা করতে হল কারণ দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। পরদিন দেখি নখ থেকে কুঁচকি পর্যন্ত মদীয় শ্রীচরণের সর্বত্র কালসিটে। শুয়েও শান্তি নেই কারণ শুতেই পারি না। অবশ্য আমার এমন কিছু হয়নি যা ছয় মাসের বিশ্রাম, মাসাজ, প্লাস্টার-বন্ধন, ইনফ্রা-রেড রশ্মিপ্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা সারতে না পারে যদিও আমার একটা আঙুল এখনো ঘাড় বেঁকিয়ে আছে, তাকে টেনে টাইপ-মেশিনের উপর আনতে পারিনি।

"ক্রিকেট খুব মজাদার ব্যাপার? হুম্।"

হুম্—এহেন আমেরিকানকে বা আমেরিকানদের ক্রিকেট শেখাতে হবে, এমন কলসীর কানা খেয়ে? ঈশ্বরপুরুষদের যা সাধ্যে তা সাধারণের অসাধ্যেই। তবে একটি আশার কথা হল, ওয়ারেন হেস্টিংসের সংখ্যা যদিও অধিক কিন্তু কোটিকে গুটিক এডমণ্ড বার্ক তো আছেন। ক্রিকেটকে ভালবাসে এমন আমেরিকান আছেন, যিনি ক্রিকেটকে নিছক খেলারূপে দেখেন না, দেখেন উপভোগময় জীবনচ্ছবিরূপে। বুঝতে পারছি, যে-সব আমেরিকান, অশান্ত জীবনের ঘূর্ণি থেকে মুক্তি পেতে হাভানা দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্রতটে নারকেল গাছের আলোছায়ার উপর উপুড় হয়ে পড়ে, কিংবা জাপানী গেইশা-গৃহের স্তব্ধ চিত্রশালার স্বপ্নজীবনে ডুব দেয়—তাদেরই একটি মন ক্রিকেটকে ভাল-

বেসেছে, তার অলস-বিলাসের বিলম্বিত সুরের মোহে। সেই মন প্রশ্ন করেছে—ওগো আমার ভাই-বন্ধুরা, ক্রিকেটকে তোমরা যেমন মনে করো তেমনি যদি উদ্ভট হোত, তাহলে ধরাপৃষ্ঠে এতদিন টিকে রইল কি করে? শুধু তাই নয় এখনো কি করে লক্ষ-লক্ষ লোকের মনে আনন্দ-মাদকতা আনছে? ক্রিকেট যদি এত দুর্বোধ্য, তিনি প্রশ্ন করেছেন, তা'হলে পৃথিবীর ছাপ্পান্ন কোটি মানুষ তাকে বুঝছে কিভাবে?

এই হৃদয়বান আমেরিকানের মতে, মার্কিনদের পক্ষে ক্রিকেট বোঝার প্রধান বাধা—শুরুতেই ফস্টিনস্টি করার ইচ্ছা। তিনি তাই গোড়াতেই বলে দিয়েছেন, ক্রিকেট সম্বন্ধে তাঁর দেশবাসী বিদ্রূপ করে যে-সব কথা লিখেছে সেগুলি মোটামুটি সত্য। এই খেলায় 'গুগলি' বলে সত্যই একটা ব্যাপার আছে এবং মাঠের বিভিন্ন অবস্থানকে 'সিলি', 'গালি', 'ফরোয়ার্ড-সর্টলেগ', 'ডিপ স্কোয়ার-লেগ', ইত্যাদি বলা হয়। এই খেলায় একবচনের 'ইনিং' হল ইনিংস এবং যথার্থই খেলাটা কখনো-কখনো স্লো-মোশন ছবির মতো দেখায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারা সত্যই এ-সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, একজন ফিল্ডার মাঠে যতখানি শক্তি ব্যয় করে, তার থেকে গড়ে বেশি শক্তি ব্যয় হয় তার মাঠে গাড়ি করে পৌঁছতে। একথা মিথ্যে নয় যে, খেলোয়াড়, দর্শক সবাই হঠাৎ ৪-১৫ মিনিটের সময়ে সব থামিয়ে চা খায়। আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করার রীতি এখানে নেই, উত্তেজনাপ্রকাশের সর্বোচ্চ উপায় হাততালি। সমস্ত ব্যাপারটা দীর্ঘস্থায়ী রণকৌশলের সঙ্গে যুক্ত বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, টেস্টম্যাচের ক্ষেত্রে মাসের পর মাস, বিনা ফলাফলে খেলা চলতে পারে। এমন প্রকৃতিনির্ভর খেলাও আর নেই। বৃষ্টিতে খেলা স্থগিত থাকবে অথচ সে-খেলা ভবিষ্যতে হবে না। এখানে খেলা বন্ধ করে দেওয়া না-দেওয়া ক্যাপ্টেনের খুশির ব্যাপার। প্রয়োজনমতো চালিয়ে যাওয়া কিংবা লাগসই বন্ধ করে দেওয়ার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।—To declare or not to declare is always the question in cricket. [যেটা বাউল সুরে দাঁড়ায়: ছাড়িব কি ছাড়িব না—ওরে মন! ক্রিকেট এই-যে মহা প্রশ্ন-ধন।]

তা'হলেও ক্রিকেট একটি অপূর্ব খেলা—এই মার্কিন লেখকের মতে। এই খেলার মন্দ রূপের চেহারা তিনি জানেন, যার দলীয় রূপ—ভারত-পাকিস্তানের ১২টি ড্র টেস্ট এবং ব্যক্তিগত রূপ—ওয়েস্টইণ্ডিজের বিরুদ্ধে হানিফ মহম্মদের ত্রিশতাধিক, সাড়ে তিন দিনে। কিন্তু উল্টোদিকে আছে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার শ্বাসরোধী টেস্টম্যাচ কিংবা ব্রাডম্যানের একদিনে তিনশো চার। টেস্টম্যাচেই ক্রিকেটের কলাকৌশলের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, সন্দেহ নেই, তবু এই খেলার কথা ভাবতে গেলেই গতিক্লান্ত মার্কিন লেখকের মনে আসে ইংলণ্ডের অপরূপা গ্রামপ্রকৃতির ছবি—যার কোলে জন্ম নিয়েছে ক্রিকেট, খেলা করেছে প্রান্তরের সবুজে, যার সাথী ছিল গ্রামের রাখালেরা, গুরু ছিলেন গির্জার পাদরী। সে এক ভিন্ন দিনের ভিন্ন যুগের স্মৃতি—যখন সত্যই মানুষের সময় ছিল খেলা করার—খেলা করার! ক্রিকেট এমনভাবে ইংরেজ মনে আসন নিয়েছে যে, ক্রিকেট-রসিকের কাছে ইংরেজজাতি দুই ভাগে বিভক্ত—ক্রিকেট-প্রিয় ও ক্রিকেট-বিরুদ্ধ। নবীন আমেরিকার একটি মন পুরনো ইংলণ্ডের দুর্গ-চালের শেষ সীমায়,

মেষচারণপ্রান্তরে, সুপ্রাচীন ওক গাছের ছায়াবুলানো ক্রিকেটের স্বপ্নরসে ডুবে যেতে চায়, যথার্থ ক্রিকেট দেখতে চলে যেতে চায় নগরের বাঁধানো পথ ছেড়ে—

"...হয়ত আপনি স্থির করলেন, শনিবারের বিকেলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন ম্যাঞ্চেস্টার থেকে...যেতে-যেতে আধা শহরে পৌঁছলেন, কয়েকটি দোকান পেরোলেন, একটি পেট্রল-স্টেশনও। এক বৃদ্ধ তাঁর কুকুর নিয়ে হাঁটছিলেন। পাইপসুদ্ধ হাত তুলে তিনি আপনাকে দেখিয়ে দিলেন ক্রিকেট-মাঠ কোন্ দিকে। তিনিও একই স্থানের যাত্রী।

"খুব জানাশোনা পরিবেশে ক্রিকেট-মাঠটি; তার চার-পাশে একটা রাস্তা; মাঠটি বেড়ায় ঘেরা। এধারে ওধারে ঝোপ-ঝাড়, বড়-বড় গাছসুদ্ধ প্রান্তর, একটি চার্চ এবং মাঠের পাশে পানশালা। কত যে পানশালা আছে ইংলন্ডে ক্রিকেট-মাঠের ধারে! পুরনো লোহার গেট খোলা পড়ে আছে, ডাকছে যেন, ঢুকবার সময়ে মধুর অনুভূতি জাগল—টিকিট-চাওয়া হাতটি বাড়ানো নেই। হঠাৎ একটা ভিন্ন জগতে প্রবেশ।

'শান্ত, ভারি শান্ত, আর কী অপরূপ সুন্দর। গাছের উপরে একটা পাখী অবিরত ডেকে যাচ্ছে, বড়-বড় নিশ্বাস টেনে কাঁপছে একটা কুকুর। মাঠের মধ্যে বাচ্ছা ছেলে ঢুকে পড়েছে, তার বাড়ীর লোক তাকে ধরে ফেরাচ্ছে। সাইকেল থেকে নেমে পড়ল কে একজন, একটু উঁকি দেবার জন্য। সবুজ ঘাসের উপর রোদের ঝলমলানি, আর তার উপরে শুভ্র পোষাকে স্বপ্নাচ্ছন্ন কয়েকটি মানুষ। খেলাটি খানিক এগিয়ে গেছে ইতিমধ্যে, কিন্তু বিশেষ দর্শনীয় কিছু ঘটেনি বলে—যেটা ঘটার কোনো সম্ভাবনাও নেই—ও-ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামায় না। দর্শক আসছে, যাচ্ছে—বেকার লোকই শুধু শুরু থেকে শেষপর্যন্ত খেলা দেখে।

"মাঠের এক কোণে সুন্দর ক্লাব-ঘর। তার কাছে স্কোরবোর্ড। দলের নাম লেখা নেই স্কোরবোর্ডে। তবে স্থানীয় দল ফিল্ডিং করছে। মাঠের ধারে দাঁড়ানো ফিল্ডারটিকে বিপক্ষ দলের নাম আপনি জিজ্ঞাসা করলেন। সে নিজের জায়গা ছেড়ে আপনার কাছে এল—এলে কোনও ক্ষতি নেই—বিনীতভাবে বলল, ঠিক বলতে পারছি না কোন্ দলের সঙ্গে খেলছি...তবে বলেন তো জেনে বলে দিই।—থাক দরকার নেই—যদি ঐ প্রশ্নে খেলোয়াড়টিরই কোনো প্রয়োজন না থাকে, আপনারও থাকবে না। না, জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই—আপনি বললেন।

"এতক্ষণে আপনি কিছু ক্রিকেট বুঝতে আরম্ভ করেছেন।

"যে-ছোকরার সঙ্গে আপনার কথা হল, তার বয়স আঠারো-উনিশের মধ্যে। অর্ধেক খেলোয়াড়ের বয়স তাই, বাকি অর্ধেক চল্লিশের উপরে। তিরিশের দল বড় ক্রিকেট খেলতে ইয়র্কশায়ারে চলে গেছে। আপনার সদ্যপরিচিত খেলোয়াড়টির খেলায় আপনি একটু মন দিলেন: সে চমৎকার দৌড় দিয়ে একটি বল থামাল, একটি ক্যাচ ফসকালো; ক্যাপ্টেন তাকে অবশেষে বল দিতে ডাকলেন। সে দ্রুত দুটো উইকেট ফেলে দিলে, ইনিংস শেষ হয়ে গেল। বেশ বোলিং—আপনি নিজের মনে বললেন।

"আপনার ছোকরাটি ব্যাট করতে নেমেছে এবার। তিন নম্বর সে। প্রথম

বলটি আটকাল, দ্বিতীয় বলটি অফ থেকে লেগে ঘোরাল কিন্তু রান নেওয়া সম্ভব হল না, পরের বলটি তীব্রভাবে কাট করল গালি ও থার্ডম্যানের মধ্য দিয়ে। সে রান করতে লাগল, আপনি নিজের মনে বললেন...বেশ ব্যাটিং...সে অন্যদিকে গিয়েছিল, আবার ঘুরে এসেছে। এবার প্রচণ্ডভাবে বাউণ্ডারি করল। তার ফলে বেশিরকম আত্মবিশ্বাস এসে গেল তার। পরের মারাত্মক ঘোরা বলটিকেও ঘোরাতে গেল, ফসকালো, উইকেট ভেঙে গেল এবার। অগত্যা সে হাসল। তারপর চলে গেল।

"সুন্দর বোলিং—আপনি ধীরে বললেন। যদিও স্থানীয় দলের বিপক্ষ-বোলিংকে আপনি প্রশংসা করলেন তবু আপনি ভাবলেন, গ্রামের লোকেরা কিছু মনে করবে না। সত্যই তারা কিছু মনে করে না।"

আমার আর কিছুই বলার নেই এই লেখার পরে। ক্রিকেটের স্বাদ, সুখ, জীবনদর্শন, মার্কিন-ভদ্রলোক এমনভাবে তুলে ধরেছেন যাতে ইংরেজও ঈর্ষান্বিত হতে পারে। এমন মার্কিনরা যতদিন আছেন ততদিন পৃথিবীতে শান্তি আছে। এখন কাজ হচ্ছে, এই ধরনের মার্কিনের সংখ্যা বাড়ানো। এর জন্য ডবলিউ জি গ্রেসের নামে এম-সি-সি একটা 'গ্রেস ফাউণ্ডেশন' স্থাপন করতে পারে, যার বৃত্তি নিয়ে মার্কিন ছাত্র-ছাত্রীরা ইংলণ্ডে এসে ক্রিকেট-জীবন-যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাবে। যত দ্রুত এই কাজ করা যায় ততই ভাল, নচেৎ চান্দ্র ক্রিকেটের ইতি। চাঁদের জাতীয় ক্রীড়া সেক্ষেত্রে বেসবল হয়ে যাবে এবং সে-খেলা হবে সহাবস্থানে রেড-স্কোয়ারে।

সত্যই ভরসা পাচ্ছি না, ক্রিকেট, কালচারের মতই বিস্তারে ধীরগতি। ক্রিকেট পাবার আগেই মার্কিন চাঁদ পেয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় উপায়—মঙ্গলগ্রহ। ব্রিটিশজাতি যদি থাকে ক্রিকেটও থাকবে। বহির্বিশ্বে ক্রিকেটরক্ষার জন্য ইংরেজ মঙ্গলগ্রহের দিকে স্পুত্নিক ফুৎকৃত করবেই। মঙ্গলগ্রহের ক্রিকেট কেমন হবে? উত্তরের জন্য আপনারা আশা করি এইচ জি ওয়েলসকে প্ল্যানচেটে আহ্বান করবেন।

* * * গল্পের খেলা * * *

ক্রিকেটের মহিমার কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই আমার মনে জাগে, ক্রিকেট খেলা খেলাকে অতিক্রম করে প্রবেশ করেছে জীবনক্ষেত্রে। 'ক্রিকেট একটা আচরণ'—এই প্রচলিত বচনের পুনরুক্তিতে এক্ষেত্রে অভিলাষী নই। বর্তমানে ক্রিকেট, একথা স্বীকার্য, ইংরেজ-নির্ধারিত উক্ত আড়ষ্ট 'আচরণ'-এর বন্ধনীকে ভেঙে সাধারণের ছত্রে আহার্য গ্রহণ করছে; ক্রিকেট নানাজাতির নানা জীবনের অভি-ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের নব-নব প্রকাশকে দর্শন করছে; তা বহন করছে জীবনেরই ক্রীড়ানাম, আর সেখানেই ক্রীড়ারূপে ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠত্ব। ক্রিকেট সৃষ্টি করছে গল্প, সৃষ্টি করছে চরিত্র। শুধু ইংরেজ নয়, অস্ট্রেলিয়ান, ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ান, পাকিস্তানী—সব দেশই নিজ প্রকৃতিকে ব্যক্ত করছে ক্রিকেটের মধ্যে। এমন কি সাউথ আফ্রিকানরা পর্যন্ত—তাদের আক্রোশের প্রতিজ্ঞা তাদের ক্রিকেটেও জীবন্ত।

এত গল্প ও চরিত্র ক্রিকেট কি করে সৃষ্টি করতে পারে তাও আমি ভেবে দেখেছি। এই একটি খেলার মধ্যে মানুষের সর্বাত্মক আত্মপ্রকাশের সুযোগ আছে। মানুষ, ক্রিকেটের মধ্যে দলের মানুষ এবং ব্যক্তিমানুষ। কখনো সে সম্পদে পূর্ণচিত্ত, পর মুহূর্তে বিপদে হতবুদ্ধি। কখনো তার একার ব্যাট বন্যার সামনে বাঁধ, কিংবা তার একার বল বাঁধের মধ্যে ফাটল। উল্টোপক্ষে ব্যাট-বলের বিশাল একক বীরত্বও দলগত অসামর্থ্যের কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। ক্রিকেটার, প্যাভিলিয়ানে একা প্যাড পরে প্রতীক্ষা করে—মাঠে দুজনে ছুটো-ছুটি করে রান করে—ফিল্ডিং করতে নামে এগারো জনের সঙ্গে। সমস্ত দিন হয়ত দুর্ভাগ্যে কাটে, তারপর দিনান্তের সাফল্য ব্যর্থতাকে দগ্ধ করে সমগ্র ক্রীড়াক্ষেত্রকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। এমনও ঘটে, অপূর্ব বোলিং সত্ত্বেও বোলারকে 'প্রশংসনীয় বোলিংয়ের' হাততালিটুকু নিয়ে বিনা উইকেটে প্রত্যা-বর্তন করতে হয়। দুঃখের দিনে ব্যাটসম্যানকে মাথার টুপি উইকেটে পড়ায় বিদায় নিতে হয়; সুখের দিনে উইকেটে বল লাগলেও বেল যথাস্থানে থাকে, ব্যাটসম্যান ডবল সেঞ্চুরি করে বেরিয়ে যায়। ফলো-অন-করা দল খেলায় জিতেছে, এমন দেখা গেছে, এবং ডিক্লেয়ার করার দোষে জেতা-খেলাকে খোয়াতে হয়েছে, এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

এই যে-সব কথা বললুম, এসবই পাঠকের জানা আছে। কেবল একটি জিনিস তাঁরা বোধহয় অনেক সময়ে খেয়াল করে দেখেন না : ক্রিকেট-খেলার নিয়মাবলী গল্পকাহিনী বা চরিত্রের সৃষ্টি তো করেই, অধিকন্তু এই খেলার সঙ্গে দীর্ঘ-স্থায়ী সফরব্যবস্থা যুক্ত থাকায় খেলা-উত্তর কাহিনীর সৃষ্টি হয় বেশি। মাসের পর মাস দেশে বা বিদেশে যেখানে একদল লোককে একসঙ্গে কাটাতে হয়, অজস্র অপরিচিত পরিবেশ ও মানুষের সম্মুখীন হতে হয়, সেখানে প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতিও সমপরিমাণ। এমনকি যেসব দর্শক দীর্ঘসময় একত্র হয়ে বসে খেলা দেখেন, তাঁরাও 'চরিত্র' হয়ে ওঠেন। আর 'চরিত্র' মানেই গল্পের চরিত্র।

তাই শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র সিংহ যখন তাঁদের পত্রিকায় ক্রিকেটের গল্প শোনাতে বলেছিলেন, তখন আমি যদিও ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম, পরে বুঝেছিলুম, তা অকারণে। তিনি 'ক্রিকেট খেলাটা বেশ গল্পে ভরা' বলে ক্রিকেটের অসম্মান করতে চাননি। আমি অবশ্য তখন রাগ করে বলেছিলুম, 'সে কি মশাই, আপনার কথার ভাবে মনে হয় যেন ক্রিকেট খেলাটা গালগল্পের ব্যাপার, আর আমরা তার কথক ঠাকুর—সেইসব গল্প ফলিয়ে বলি।' বলতে-বলতে আমার রাগ আরও বেড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আঘাত করবার জন্য তাঁর প্রিয় ফুটবল তুলিয়ে বলেছিলুম, 'আপনার ফুটবল খেলাটায় গল্প কম কিসে? ফুটবলের হাজার গল্প আপনি স্বয়ং আমাদের শোনাননি? যেমন, প্রসাদ সিংহের সঙ্গে একহাঁটু কাদা ভেঙে নিজের দলের খেলা ছেড়ে শত্রুদলের খেলা দেখতে যাওয়া, তাদের পয়েন্ট খাওয়ার জন্য!—মোহিত হয়ে এইসব গল্প শোনার সময়ে আমি কি কখনো বলেছি, ফুটবলটা গল্পের খেলা? বলতে পারি কখনো—যখন নিত্যি শুনি, মহা-পুরুষ ছাড়া কারো পক্ষেই ফুটবলমাঠ থেকে চারটে হাত-পা বজায় রেখে ঘরে ফেরা একেবারেই অসম্ভব!'

আমি বুঝতে পেরেছি পরে, আমার সে রাগ অন্যায়। ক্রিকেটকে গল্পেভরা

খেলা বলে সিংহমহাশয় ক্রিকেটের গুণগানই করেছেন। ফুটবলের সত্যই গল্প হয় না। ফুটবলের যেসব 'গল্প' শুনি, তা আসলে টুকরো কথা মাত্র। তা দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই শুধু এদেশে কেন, অন্য দেশেও ফুটবলের মতো সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা নিয়েও উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। ফুটবল মুহূর্তের উপর বাঁচে। গল্প মুহূর্তকে ধন্য করে, কিন্তু তাকে দাঁড়াতে হয় কালের উপরে —খণ্ড বা বৃহৎ কালে। সে ভূমিকা গল্পকে ক্রিকেটই দিতে পারে।

তাই আমি যখন চটে গিয়ে গিরীনবাবুর ক্রিকেট-বিরোধী মনোভাবের প্রতিবাদে জনৈক দর্শকের সমতুল কুসংস্কারের উল্লেখ করেছিলুম, তখন বুঝতে পারিনি, ঐ দর্শকটি তাঁর ক্রিকেট-বিতৃষ্ণার মধ্য দিকে ক্রিকেটের একটি চরিত্র হয়ে উঠেছেন।

ঐ ভদ্রলোক একদা টেস্টের একটি সিজন-টিকেট উপরি পেয়েছিলেন। বউয়ের সাড়ি, ছেলের ঘড়ি বা নিজের ট্যাঁকের কড়ির পরিবর্তে ক্রিকেট-টিকেট নিয়ে তিনি যথেষ্ট স্যাক্রিফাইস করেছিলেন নিজের ইনকামের—ঐ ইনকামট্যাক্স অফিসারটি। খেলা দেখে দিনান্তে তিনি মহা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'ছ্যাঃ ছ্যাঃ —এই আপনাদের ক্রিকেট! এ-জিনিস পাঁচ ঘণ্টা বসে দেখার চেয়ে রেডিয়োতে শুনলে (বেতার-বক্তারা পুলকিত হোন), কিংবা খবরের কাগজে পড়লে (উৎফুল্ল হোন ক্রিকেট-লেখকেরা) অনেক বেশি আরাম পাওয়া যায়। তাঁর কথা শুনে টিকেট-প্রত্যাশী এক ব্যক্তি হাত বাড়িয়েছিলেন আশান্বিত হয়ে—ভদ্রলোক তা দেখে সযত্নে টিকেটটি ভিতর-পকেটে জাত করে বললেন—'তাহলেও মাঠে সুখ আছে মশাই। দিব্যি 'এ'-মার্কা থিয়েটার দেখতে পাই। মর্নিং শো, ম্যাটিনি দুই-ই এক টিকেটে।'

অবশ্য সেবার রাগ করলেও গিরীনবাবুকে অনিবার্য জেনে কিছু ক্রিকেটের গল্প শোনানোর চেষ্টা করতে হয়েছিল। প্রথম যেটা মনে পড়েছিল, সেটি খেলার নয়, আধ্যাত্মিক গল্প—অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ববি সিম্পসনের সদ্যকীর্তি টেস্টে ত্রিশতাধিক রানের সূত্রে যা মনে জেগেছিল। সকলেরই জানা আছে, সিম্পসন-সাহেব ১৯৬৪-র ইঙ্গ-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্টে তিনদিন মাঠস্থ থেকে তিনশো এগারো রান করেছিলেন; অস্ট্রেলিয়া আট উইকেটে ৬৫৮ রান করে ডিক্লেয়ার করেছিল; ইংলণ্ড তার উত্তরে 'মামার বাড়ি পেয়েছ' বলে (যদিও ইংলণ্ড সত্যই অস্ট্রেলিয়ার মামার বাড়ি) ৬১১ রান করে বসল প্রথম ইনিংসে। তারপরে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ রান করতে না করতে খেলার শেষ দিন পুইয়ে গেল—বি-ফলে (ওগো মা—)।

এই কাণ্ডের পরে যে-আধ্যাত্মিক গল্পটা বলেছিলাম:

একদিন মহর্ষি নারদ ভগবান্ বিষ্ণুকে বললেন, 'প্রভু, তোমার মায়ার রূপ দেখব।' বিষ্ণু বললেন, 'তাই নাকি, বেশ-বেশ। এখন চল, একটা কাজ সেরে আসা যাক।' বিষ্ণু ও নারদ কাজে বেরিয়ে পড়লেন। চলতে-চলতে তাঁরা এক মরুভূমিতে হাজির। মরুভূমি মানেই বালি, সূর্যের তাপ আর তৃষ্ণা। নারায়ণ তৃষ্ণার্ত হয়ে নারদকে বললেন, 'প্রাণ যে যায়, একটু জল খাওয়াও নারদ।' প্রভুর কষ্টে নারদ ছটফট করে উঠলেন, পাগলের মতো ছুটলেন লোকালয়ের সন্ধানে। লোকালয়ে পৌঁছে প্রথম যে-বাড়ি পেলেন তার দ্বারে করাঘাত করে

চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন। দরজা খোলে না। আবার চিৎকার। তবু খোলে না। বার-বার ডাকাডাকি ও কড়া-নাড়ানাড়ির পর খুলল অবশেষে এবং—আহা মরি মরি! কী রূপ! অপরূপ! যুবতী সুন্দরী—দরজায় দাঁড়িয়ে!! নারদের চোখের সামনে হাজার বিদ্যুৎ একসঙ্গে ঝলসে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ। নারদ খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন, বসলেন, সুন্দরীর করকমলের জল-পাত্র নিয়ে নিজের মুখে তুললেন, এবং, আর উঠলেন না—বিষ্ণুর তৃষ্ণার কথা মন থেকে হারিয়ে গেল একেবারে। নারদ আরও এগিয়ে গেলেন—ঐ সুন্দরীকে আত্মপাত্রে পাত্রস্থ করে ফেললেন পর্যন্ত; শ্বশুরের প্রপার্টি পেলেন; ছানা-পোনা হল; প্ল্যাঙ্কো, ট্যাঙ্কো, জমিজমা, মোকর্দমা, গয়না, বায়নায় পরমসুখে নাকানি-চোবানি খেতে লাগলেন।

কিন্তু সব সুখেরই শেষ আছে। একদিন দেশে প্রচণ্ড বন্যা এল। সব ভেসে গেল বন্যার তোড়ে। নারদের ঘরবাড়ি ডুবে গেল। গিন্নীর হাত ধরে, ছেলে-পুলের কোনোটাকে কাঁধে, কোনোটাকে বুকে, কোনোটাকে ট্যাঁকে নিয়ে নারদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু হায়, বন্যার মাতাল ঢেউ আছড়ে পড়ে নারদের ছেলেপুলেগুলোকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল—প্রাণেশ্বরীকেও—তখন উন্মত্ত নারদ স্বয়ং ডুব দিতে যাচ্ছেন মর্মান্তিক দুঃখে—কাঁধে টোকা পড়ল, দেখেন --মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে মিটি-মিটি হাসছেন শ্রীভগবান্।

পাঠক-পাঠিকাকে বলে দিতে হবে না, নারদ বিষ্ণুমায়ায় লাট খাচ্ছিলেন।

বলছিলুম কি, হঠাৎ মনে হয়েছিল, সিম্পসনের খেলাটাও ঐ মায়াব্যাপারের অন্তর্গত। সিম্পসন সবই পেলেন—রেকর্ডের পর রেকর্ড—তার কতকগুলো গুঁড়োলেন, কতকগুলো বানালেন—তাঁর জন্যই অস্ট্রেলিয়া 'ছাইভস্ম' (অর্থাৎ অ্যাসেজ) ধরে রাখতে পারল—কিন্তু ক্রিকেট খেলাটা, যে-খেলার ভগবান্ সিম্পসনের কাছে তৃষ্ণার্ত হয়ে জলপান করতে চেয়েছিলেন এবং সফরের পূর্বে যে-তৃষ্ণার জল এনে দেবার প্রতিশ্রুতি সিম্পসন দিয়েছিলেম, সেই ক্রিকেট-ভগবান্ কতটুকু জল পেয়েছেন? তার বদলে সিম্পসন রেকর্ড-সুন্দরীর সঙ্গে লীলাখেলা করেছেন, দিনে-দিনে সেঞ্চুরি-নন্দনেরা জন্মেছে—কিন্তু—

পাঠক, যদি আধ্যাত্মিক গল্পটা রীতিমত মেলাতে না পারি, নিজগুণে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনারা অবশ্যই আমার বক্তব্য বুঝতে পেরেছেন।

এই মায়া-গল্পের পাশে একটি আগ-মার্কা সত্য গল্প এসে গিয়েছিল। একদা আর একজন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার টেস্টে তিনশোর উপর রান করেছিলেন—তবে তিন দিনে নয়, একদিনে—লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি, চা-এর আগে ডবল সেঞ্চুরি, খেলা ভাঙার আগে ট্রিপ্‌ল্ সেঞ্চুরি। ভদ্রলোকের নাম ডন ব্রাডম্যান। তাঁকে নিয়ে আধ-পৃষ্ঠার একটি অতি ক্ষুদ্র অথচ অতীব রোমাঞ্চকর উপন্যাস লিখেছেন ক্রিকেট-সাহিত্যের বেদব্যাস নেভিল কার্ডাস, ক্রিকেটের বাৎসরিক মহাভারত উইসডেনের শতবার্ষিকী সংখ্যায় গত বৎসর। উপন্যাসটি এই—

"ব্রাডম্যানের কাণ্ডে কল্পনাও স্তম্ভিত হয়ে যায়। ছেলেদের অ্যাডভেঞ্চার বইয়ের কোনো লেখকের পক্ষেও তাঁর নায়ককে দিয়ে ধারাবাহিক ব্রাডম্যানী-কীর্তি করানো সম্ভব নয়। ১৯২৭ থেকে ১৯৪৮-এর মধ্যে তিনি ২৮,০৬৭ রান করেছেন (অথচ তাঁর প্রতিভার মধ্যাহ্নে আঁধার এনেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ).

—যার গড় ৯৫·১৪—অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের শেষ গড় রানের যা প্রায় দ্বিগুণ। ৩৩৮-টি ইনিংসে তিনি ১১৭-টি সেঞ্চুরি করেছেন, তার মধ্যে ৪৩ বার নটআউট—প্রতি তিন ইনিংসে একটি সেঞ্চুরি। টেস্টম্যাচে করেছেন ৬৯৯৬ রান, গড় ৯৯·৯৪। ইংলণ্ডে ৩০শে এপ্রিল থেকে ৩১শে মে'র মধ্যে ১০০০ রান করেছেন। ১৬ বার এক মরশুমে হাজার রান করেছেন। ইংলণ্ডে প্রথম সফরে টেস্টে করেছেন ৯৭৪ রান। একদিনে তিনশোর উপরে টেস্ট-রান আছে তাঁর (৩০৯)। ১৯৩৮-এ ইংলণ্ডে ১৩টি সেঞ্চুরি তিনি করেছেন। পরপর ৬ ইনিংসে ৬টি সেঞ্চুরির রেকর্ডও তাঁরই। এক ওভারে ৩০ রান পর্যন্ত তুলেছেন। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে পর-পর দু' ইনিংসে সেঞ্চুরির রেকর্ডটাও বাদ যায়নি।"

এ-জিনিস ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ, যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুন—কারো পক্ষেই করা সম্ভব নয়—একমাত্র পারেন বাংলা ধর্মমঙ্গলের লাউসেন, ধর্মঠাকুরের কৃপায় পূবের সূর্য পশ্চিমে ওঠানো যাঁর পক্ষে কিছুই কঠিন কাজ নয়—কিন্তু অপরপক্ষে ডন ব্রাডম্যানকে নিজের চেষ্টার উপরই মূলত নির্ভর করতে হয়েছিল, যদিও জন্মসিদ্ধ প্রতিভা তাঁর ছিল নিশ্চয়ই। ঐ শিশু-উপন্যাস-হারানো কাণ্ডগুলি কোন্ চরিত্রের মানুষ করতে পারেন, তাও পেয়ে যাই কার্ডাসের লেখা থেকেই। কাহিনীর পটভূমিকা—অস্ট্রেলিয়ার ১৯৩৬-৩৭ মরশুমের ইঙ্গ-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ। কার্ডাস লিখেছেন :

"এডিলেডে, নভেম্বরের এক রাত্রিতে, যে-রাত্রির কথা কোনোদিন ভুলব না, ব্রাডম্যান রাবার-জয়ের জন্য তাঁর পরিকল্পনার কথা আমাকে বললেন। তিনি আশা করেন, ওরিলী লেগস্টাম্পে মাপা বল ফেলে হ্যামণ্ডকে বেঁধে রাখবেন। সারা সন্ধ্যা তিনি ক্রিকেটের আলোচনা করে গেলেন—সেদিন শুধু আমরা দুজনেই ছিলাম তাঁর বাড়িতে। এগারোটার সময়ে তিনি বললেন, এবার উঠতে হবে, কারণ তাঁর হাসপাতালে যাবার কথা আছে। হাসপাতালটি আমার হোটেলের পথেই পড়ে বলে আমি তাঁর সঙ্গে গাড়িতে চললুম, এডিলেডের পথে সেই রাত্রিতে—অপরূপ সুন্দর রাত্রিটি ছিল। হাসপাতালের সিঁড়ি বেয়ে তিনি দ্রুত উঠে গেলেন, আমি গাড়িতে অপেক্ষা করতে লাগলুম। অল্প পরে তিনি ফিরে এলেন। গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং ধরে বললেন, 'অভাগাটা বোধহয় টিকবে না।' পরদিন সকালে ব্রাডম্যানের শিশুর মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হল।

অমানুষিক? জানি না। তবে জানি ব্রাডম্যান অত্যন্ত সন্তানবৎসল। তথাপি অমানুষিক? নিশ্চয়—যে অমানুষিকতা প্রত্যেক বড় চরিত্রে থাকে—যার দ্বারা শক্তিমান মানুষগুলি ব্যক্তিগত বেদনার কণ্ঠরোধ করে কর্তব্য করে যান। এখানে কর্তব্য—খেলার!

সিম্পসনের বারোআওয়ারী (মানে বারো ঘণ্টার) ত্রিশতাধিক রান, শ্লথ খেলার বাদশাদের পাশে দ্রুত খেলার দিগ্বিজয়ীদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে —বিশেষত যিনি রাজচক্রবর্তী, তাঁর কথা। তাঁর নাম জি এল জেসপ। জেসপ ধীরগতির ভিক্টোরীয় যুগের মানুষ ছিলেন। সেকালে স্পীডের লোভে পড়েনি মানুষ। তখন মেপে ও-মর্যাদার আরামকেদারা জাঁকিয়ে বসে থাকত সাহেবগণ।

তাদের এত সময় ছিল যে, একতলার বাসিন্দে দিস্তে-দিস্তে কাগজে চিঠি লিখত উপরতলার প্রিয়জনের উদ্দেশে (হ্যালো-হ্যালো-টেলিফোন চিঠিলেখার রোমান্সের গলায় এখন তারের দড়ি পরিয়ে দিয়েছে) ; মেয়েরা সেদেশে তখন গোটা তাঁবু গায়ে জড়িয়ে ঘুরে বেড়াত (টপ্‌লেসের যুগে এখন মেয়েদের সবটাই মানবী, কিছুই কল্পনা নয়) ; এবং রাজনীতিকেরা মাথার পরচুলা অটুট রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করত আইনসভায় (এখন যেখানে বিধানসভায় কয়েক মিনিট পরেই বক্তার আসল চুল উপড়ে নেওয়া হয়)—সেই যুগের মানুষ ছিলেন জি এল জেসপ। সেই যুগে তিনি রানের সাইক্লোন এনেছিলেন। আর একালে, যারা জীবনের মহাঝড়ের মধ্যে বাস করছে, তারা খেলার মাঠে উইকেটের মাস্তুলকে প্রাণভয়ে আঁকড়ে আছে। কী বিচিত্র এই দ্যাশ, কহ সেলুকস্ ?—আলেকজাণ্ডার এখন ইংলণ্ডে হাজির হলে নিশ্চয় বলতেন।

জি এল জেসপের খেলা অলৌকিক পুরাণ-কথার মতো। তাঁর রানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে পারেনি। ব্যাটের স্টিয়ারিং হাতে নিলেই ঘণ্টায় ৮০-র ঘরে রানের কাঁটা থরথর করত। মাতামাতির দিনে সব ঘড়ি চূর্ণ করে, অবিশ্বাসকে বধ করে, তার শবদেহের উপরে যে-রণনৃত্য (বা রান-নৃত্য) দেখাতেন, তার কিছু বিবরণ ছাপার অক্ষরে লিখিত না থাকলে সেগুলিকে হাজির করতে সাহস বোধ করতুম না।

বাড়াবাড়ি করে ফেলছি ? জেসপের এক অনুরাগীর রচনা থেকে কতকগুলো তথ্য তুলে ধরি :

"রেকর্ড বই থেকে পাওয়া যায়, এ পর্যন্ত (১৯৬২) এক ঘণ্টায় বা তারও কম সময়ে সেঞ্চুরি করা হয়েছে মাত্র ৪৯টি ক্ষেত্রে। বিশ্বাস করবেন কি, তার মধ্যে একা জেসপ ঐ অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন এগারোবার! অর্থাৎ সারা পৃথিবীর সকল ক্রিকেটার মিলে মোট যা করেছেন, তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ করেছেন একা জেপস!"

আরও শুনুন : "জেসপ দুবার ১৫ মিনিট ব্যাট করে ৫০ রান করেছেন, এবং দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ড তাঁরই—তা তিনি করেছিলেন ১৯০৭ সালে জেন্টলম্যান অব সাউথের পক্ষে। এ খেলায় তিনি ৬৩ মিনিটে ১৯১ রান করেন।"

দ্রুততম ডবল সেঞ্চুরির গৌরবও জেসপের। তিনি পাঁচটি ডবল সেঞ্চুরি করেন। তার সময় ও রানের হিসেব এই :

১২০	মিঃ	২৮৬	রান	গ্লস্টার্সশায়ার	বনাম	সাসেক্স	১৯০৩
১৩০	"	২৩৪	"	গ্লস্টার্সশায়ার	বনাম	সমারসেট	১৯০৫
১৩৫	"	২৩৩	"	অবশিষ্ট ইংলণ্ড	বনাম	ইয়র্কশায়ার	১৯০১
১৪০	"	২০৬	"	গ্লস্টার্সশায়ার	বনাম	নটিংহ্যাম	১৯০৪
১৭৫	"	২৪০	"	গ্লস্টার্সশায়ার	বনাম	সাসেক্স	১৯০৭

জেসপের রেকর্ড দেখে মনে হয়, তিনি বুঝি এলোপাথাড়ি ঠ্যাঙাড়ে ছিলেন। মধুকণ্ঠে জেসপ-ভক্ত শুনিয়েছেন—ধন্য, ধন্য সেই এলোপাথাড়ানি, যা বছরের পর বছর ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া যায়, যার ফলে প্রথমশ্রেণীর খেলায় ৫৩টি সেঞ্চুরিসমেত ২৬,৬৯৮ রান হয়—যার শেষ অ্যাভারেজ দাঁড়ায় ৩২·৬৩।

জেসপ কোনো পরিস্থিতিতেই যে নিজের খেলার জাত বদলাননি, তা বুঝেছে

পারব যখন স্মরণ করব—তাঁর ২১ বছরের ক্রীড়াজীবনে তিনি ঘণ্টায় গড়ে ৮০ রান করে গেছেন (কল্পনাতীত ব্যাপার), এই ২১ বছরে একবার ভিন্ন কখনো তিন ঘণ্টার বেশি উইকেটে ছিলেন না (সে কি?—হ্যাঁ। মনে রাখবেন তিনি পাঁচটি ডবল সেঞ্চুরি করেছেন), এবং মাত্র ১৪টি ক্ষেত্রে দু ঘণ্টা বা ততোধিক সময় উইকেটে ছিলেন—আশা করি, তাঁর ৫৩টি সেঞ্চুরির কথা পাঠক ভোলেননি।

জেসপের বিখ্যাত ইনিংসটির কথা মনে করিয়ে দিই: ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর ১০৪ রান। জয়ের জন্য ইংলণ্ডের যখন দরকার ছিল ২৬৩ রান, তখন মাত্র ৪৮ রানে প্রথম ৫টি উইকেট পড়ে গেল। অবধারিত পরাজয়ের মুখে জেসপ এলেন। জেসপ কি কুঁকড়ে গেলেন ভয়ে? বটে! জ্যাকসনের সঙ্গে একত্রে ঝড়ের বেগে রান করলেন ১০৯। তারপরে জ্যাকসন আউট হলে হার্স্টের সঙ্গে রান হল ১০ মিনিটে ৩০। সব জড়িয়ে তাঁর খেলার সময়ে দলের ১৩৯ রানের মধ্যে জেসপ করেছিলেন ১০৪ রান—৭৫ মিনিটে। ইংলণ্ড ঐ চমকপ্রদ খেলায় জেসপের জন্য জিতেছিল এক উইকেটে।

'জেসপ' নামটি—কী না আনন্দ আর উত্তেজনার সৃষ্টি করত দর্শকের মনে! 'জেসপ আসছেন—দর্শকের প্রাণের খেলোয়াড়'—এরই এক অনবদ্য বর্ণনা পাচ্ছি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর রচনায়:

"এবার জেসপ—জে-স-প...

"কথাগুলো অদ্ভুত প্রত্যাশার ও আনন্দের শিহরণ তুলত। সে-জিনিস আমিও বোধ করেছি সর্ব সময়—শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত—আর দর্শকের সারিগুলি তাতে তরঙ্গিত—গ্রীষ্মদিনে শস্যক্ষেত্রের উপরে হঠাৎ বাতাস বয়ে গেলে যেমন হয়। মাঠের চতুর্দিকের সেই কম্পন সাদা চোখেই ধরা পড়ত, যেন ইলেকট্রিক শক্-এর ছোঁয়ায় চমকে শিউরে উঠেছে সকলে। তারপরেই দেখা গেল বীরের চেহারা প্যাভিলিয়ন থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে—আর সারা মাঠ ভরে গেল অভিনন্দনের অট্টরবে।

"তিনি আসছেন—আসছেন—করতালি চলতে লাগল।

"সদস্যদের রেশমী টুপিগুলির মাঝখান দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে এল একটি হালকা নীল রঙের কাউন্টি ক্যাপ—আমি সব সময়ে জেসপকে তাঁর ঐ কেমব্রিজের টুপিটি পরতে দেখেছি। অনেকদিন ব্যবহার করে টুপিটি বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবু জেসপ তাকে ছাড়েননি। প্রশস্ত বলিষ্ঠ আকার, বিশাল বক্ষ, কাঁধের অতিবিস্তৃতির জন্য তাঁকে দৈর্ঘ্যের তুলনায় কিছু খাটো দেখায়—দ্রুতবেগে উইকেটের দিকে গতিশীল—কঠিনতম প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় প্রতিটি পদক্ষেপ, যা ঘোষণা করছে যেন—'কাজটা সেরে নিতে হবে, হ্যাঁ, এখনি।—কিন্তু চারদিকে এত চেঁচামেচি কিসের? কী ছেলেমানুষি!'

"ফিল্ডাররা পিছু হটতে লাগল। বিপক্ষ-অধিনায়ক হাত নাড়িয়ে তাঁর দলবলকে বাউণ্ডারির সীমানায় পাঠাতে লাগলেন—দূর ছাই, বাউণ্ডারিটা এত কাছে কেন?—ভাবতে লাগলেন।

"গার্ড নিয়েছেন। মাঠের চারদিকে দ্রুত দৃষ্টিক্ষেপ। তারপরে পাথরের মূর্তি। সর্বত্র শ্বাসরুদ্ধ নীরবতা।

"তিনি ব্যাটের উপর অত্যন্ত ঝ‍ুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর হুমড়ি-খাওয়া ভঙ্গি দেখে তামাশা করে কচ্ছপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—কিন্তু আসলে তা বাঘের মতো কুঁকড়ে থাকা—শিকারের উপরে লাফ দেবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তের অবস্থা।

"তারপরে সেই মুহূর্তটি। বল দেখা গেল। ঝলসে উঠল ব্যাট, এবং—"

নাঃ, লেখাটা বড্ডই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। একটু হেসে নেওয়া যাক। অবশ্য আপনারা যদি পারেন। কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন তাঁরা কিন্তু পারেননি। বলছিলাম কি মিচেলের কথা।

টম মিচেল নামকরা ইংরেজ-ক্রিকেটার। এম-সি-সি দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া গেছেন ১৯৩২-৩৩ মরশুমে। অস্ট্রেলিয়া দেশটা এত বড় যে, এক শহর থেকে অন্য শহরে ট্রেনে যাওয়া মানে পৃথিবীর এপার-ওপার করা। আর তা করতে হয় ইংরেজ ক্রিকেট-পার্টিকে বারবার। এমনই এক দীর্ঘ ট্রেনভ্রমণের সময়ে দেখা গেল, টম মিচেল ট্রেনের কামরার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন—যেন যথাসর্বস্ব গিয়েছে তাঁর—তেমনি মুখের ভঙ্গি। সবাই জিজ্ঞাসা করে, 'টম হল কি, কী হারালে, খুব দামী কিছু নাকি?' মিচেল উত্তর দেন না, অথচ খুঁজে ফেরেন, বৎসহারা গাভীর মতো ব্যাকুল সন্ধান। ভাবগতিক দেখে অন্যেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে আবার শুধায়, কি হারিয়েছে বল না টম? তবু মিচেল নির্বাক। মুখ বুজে থাকেন আর খুঁজে বেড়ান। তখন সবাই জোর করে ধরে বসল, 'বলতেই হবে তোমাকে, কি খুঁজছ?' অগত্যা মিচেল মুখ খুললেন—হাসলেন—একমুখ বীভৎস দন্তহীন হাসি। মুখ ব্যাদান করে বললেন, 'এই দেখ, কি খুঁজছি!'

যারা মজা করবাব জন্য মিচেলের দাঁত লুকিয়েছিল, তারা ঐ হাসিতে বিশ্বরূপ দেখে আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি দাঁত ফেরত দিয়ে দিল। হ্যামন্ড বললেন, 'ব্যাদড়া অস্ট্রেলিয়ান দর্শকেরা যদি ঐ হাসি একবার দেখতে পায়, সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

বৈদান্তিকতার আরও গল্প আছে। মিডলসেক্সের উইকেট-কীপার জন প্রাইসের ব্যাপার ধরা যাক। ১৯৪৭ সালে মিডলসেক্স ও ইয়র্কশায়ারের মধ্যে কাউন্টি-ম্যাচ দারুণ জমে উঠেছে। ইয়র্কশায়ার পতনের মুখে—কিন্তু তার শেষের দুই ব্যাটসম্যান জাত ইয়র্কশায়ারীয় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। মিডলসেক্সের পক্ষে বল দিচ্ছেন জিম সিমস্; উইকেট-কীপাররূপে পিছনে দাঁড়িয়ে জন প্রাইস। সিমসের একটা গুডলেংথের বলে পিছু হটে ব্যাট পাতল ব্যাটসম্যান—বলটা বাঁক নিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল, এবং সে বল ধরেই হাঁক পাড়লেন প্রাইস—হাউ—য্যা—অ্যা—ট্‌ট্‌ট্‌!!! আর সে কি ডাক রে বাপ্! স্বয়ং প্রাইসের ডাক। প্রাইসের বউ বলেন, স্বপ্নের ঘোরে ঐ ডাক প্রাইস ডাকতে জানলার সার্সি চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ডাক শুনে, বুকের করোনারি সামলে, আম্পায়ার থরথরিয়ে হাত উপরে তুললেন, দেখে মনে হল, খোদার মেহেরবানি চাইছেন। সেই ডাকেই জয় হয়ে গেল মিডলসেক্সের। প্রাইসকে অভিনন্দন জানাতে ছুটে এলেন বিল এডরিচ। প্রাইসের পিঠ চাপড়ে এডরিচ বললেন, 'বাহবা, চমৎকার ক্যাচ ধরেছ ফ্রেন্ড।'

উত্তরে গোঁ-গোঁ গর্জনে চাপা 'হাউ ইজ দ্যাট?' এডরিচ চমকে দেখেন, ডাকের তোড়ে ছিটকে-যাওয়া প্রাইসের বাঁধানো দাঁতের উপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

দাঁত ছেড়ে এবার একটু উপরে উঠুন—মাথায় বা মাথার টুপিতে। ক্রিকেটারদের কাছে টুপির বিশেষ মর্যাদা আছে। কাউণ্টি-টুপিকে সম্মানের শিরোপা বলে শিরোধার্য করে ক্রিকেটাররা। এদেশে পুরোহিতের নামাবলী তুল্য বিলেতে কাউণ্টি ক্যাপের আধ্যাত্মিক মূল্যে স্বীকৃত হয়।

সাধারণভাবে ব্যাটসম্যান ও ফিল্ডাররা টুপি পরে মাঠে থাকেন, বোলাররা বল দেবার সময়ে টুপি খুলে ফেলেন। ঐ সময়ে মাথায় টুপি রাখা অসুবিধাকর।

কিন্তু বোলার ক্ল্যারী গ্রিমেট বল দেবার সময়েও টুপি খুলতেন না। টুপি ঠিক রেখে মাথা গলিয়ে সোয়েটার খোলার কায়দা তিনি রপ্ত করেছিলেন।

কেন? একটা ঘরোয়া গল্প শুনুন। আমার এক বন্ধু একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেন। তিনি কৃতবিদ্য, জীবনে প্রতিষ্ঠিত। আজকাল এই বয়সে বিয়ে হলে, লোকে রেজিস্ট্রি-অফিসে হাজির হয়। নেহাত যদি হিন্দু-পদ্ধতিকে ধন্য করেন তাঁরা—টোপর প্রভৃতির কুসংস্কারকে তাঁরা ঘৃণায় বর্জন করেন। আমার এই বন্ধুটি দেশ-বিদেশ ঘুরে এসেও বিয়ের ব্যাপারে বাপ-মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলেন, পাত্রীর ফটো দেখেই রাজি, এবং বিয়ের সময়ে সমস্ত রকম শাস্ত্রাচার, স্ত্রী-আচারের প্রতি অনুরাগ দেখালেন, বেশ আনন্দ ও যত্ন করে টোপর পরেছিলেন মাথায়—মাথা থেকে একদম খোলেননি। এ-রকম শাস্ত্রাসক্ত, ধর্মপরায়ণ, শিক্ষিত আধুনিক জামাই পেয়ে কন্যাপক্ষের আহ্লাদের সীমা ছিল না।

বন্ধু বললেন, 'হুম, বিয়ের সময়ে টোপর খুলবে? মাথার মাঝখানে টোপর ছাড়া আর কিছু ছিল নাকি? সম্প্রদানের আগে তাই ঐ সোলার টুপি কোনোভাবে নড়চড় হতে দিই নি, পাছে আমার ইনি (বন্ধুর ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল), আঁতকে উঠে পিঁড়ি ছেড়ে চলে যান। আজকাল তো সেদিন নেই যে, লগ্নে বিয়ে না হলে মেয়ে চিরকালের জন্য আইবুড়ি রয়ে গেল। পাড়াতো দাদারা তো শিভাল্রি দেখাবার জন্য রেডি হয়ে আছে।'

এই কথা বলে, মাথার মসৃণ তালুতে সস্নেহে হাত বুলোতে-বুলোতে বন্ধুবর সপ্রেমে পত্নীর দিকে তাকালেন, তিনি 'মরণ' বলে উঠে গেলেন।

গ্রিমেটের ছিল সেই ভয়—যদি তাঁর মাথাজোড়া টাক দেখে দর্শকেরা বুড়ো বরকে বিদায় দেবার জন্য চিৎকার শুরু করে! গ্রিমেট তাই কাউণ্টি-টোপর মাথা থেকে সরতে দেননি।

ব্যাপারটা হাসির —সবটা নয় কিন্তু। অনেকখানি অংশ করুণ। পৃথিবীর সেরা ধীর-বোলারকে অনেক দুঃখের পথ মাড়িয়ে টেস্ট-ক্রিকেটে ঢুকতে হয়েছে। যে-ব্রাডম্যান গ্রিমেটকে 'পৃথিবীর সেরা' আখ্যা দিয়েছেন—তিনিই তাঁর বড় দুঃখের হেতু হয়েছিলেন। 'মেইলী যেখানে কোটিপতির মতো বল ওড়াতেন, সেখানে গ্রিমেট কৃপণের মতো টিপে-টিপে বল ছাড়তেন'—এর পিছনেও একই দুঃখের পটভূমিকা।

এক কথায়, গ্রিমেট পৃথিবীর ক্রিকেটে অবহেলিত সর্বোচ্চ প্রতিভা। শৈশবে পিতৃহীন বালকের মতো তাঁর বরাতে অবজ্ঞা জুটেছে শুধু। অন্তত প্রথমদিকে।

এমনকি পরেও। গ্রিমেট অস্ট্রেলিয়ার মানুষ নন, নিউজিল্যাণ্ড তাঁর স্বদেশ। সেখানে তাঁকে পাত্তা দেওয়া হয়নি। তাঁর যখন কুড়ি বছর বয়স, তখন অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিল নিউজিল্যাণ্ডে—দুর্বল নিউজিল্যাণ্ড দলেও তাঁর স্থান হয়নি। ২২ বছর বয়সে গ্রিমেট চলে এলেন অস্ট্রেলিয়ায়। অস্ট্রেলিয়ায় 'ফার্স্ট' সিডনি ক্লাবে' ঢুকতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। অন্য একটি ক্লাবের তিন নম্বর দলে তাঁর স্থান হল। তিন বছর পরে মেলবোর্নে গিয়ে ভিক্টোরিয়া-একাদশে জায়গা পেলেন। কিন্তু যে-সাত বছর ভিক্টোরিয়া দলে রইলেন, সেই সময়ে তাঁকে ১০০ ওভার বলও করতে দেওয়া হল না—পরে সে-দল থেকে বিদায় পেলেন 'প্রথম শ্রেণীর খেলার অনুপযুক্ত' এই অখ্যাতিসহ। অবশেষে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে যখন পাকাপাকিভাবে প্রথমশ্রেণীর দলে স্থান পেলেন, তখন তাঁর বয়স ৩২—'যে-বয়সে অধিকাংশ খেলোয়াড় পরিপক্ক প্রবীণ হয়ে খেলার শেষপর্যায়ে অবস্থান করে।'

সকলেই বুঝবেন এবার, বল দেওয়ার ব্যাপারে গ্রিমেটকে কেন সাবধানী কৃপণ হতে হয়েছিল, কেন তিনি প্রথমাবধি-সমাদৃত মেইলীর তুল্য কোটিপতির বদান্যতা দেখাতে পারেননি। মেইলীর স্পিনের পরিমাণ জগদ্বিখ্যাত—যতক্ষণ বলের বাম-দক্ষিণে সঞ্চারিণী লীলাগতি বজায় আছে ততক্ষণ, মেইলী জানতেন, যে অস্থানেই সে বল লুটিয়ে পড়ুক না কেন, ব্যাটসম্যান লোভে উদ্‌ভ্রান্ত হবেই। মেইলী তাই লেংথের পরোয়া করতেন না। নিখুঁত শিষ্ট সৌন্দর্যের চেয়ে তিনি অনিখুঁত উগ্র লাস্যের লোভী শিল্পী ছিলেন। সে সাহস দেখাবার সাহস ছিল না গ্রিমেটের, থাকতে পারেও না তাঁর, যাঁকে সর্বক্ষণ বাস্তুসমস্যায় পীড়িত হতে হয়েছে। গ্রিমেটকে সতর্ক ও শীর্ণ থাকতে হয়েছে—অফিসারের প্রীতিদৃষ্টিতে বঞ্চিত পরিশ্রমী দক্ষ কেরানীর মতো তাঁকে যন্ত্রতুল্য কাজ করে যেতে হয়েছে—তিনি জানতেন, একটু নড়চড় হলেই চার্জসিট—কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মাখামাখির ফিতেয় বাঁধা নেই তাঁর পার্সোনাল ফাইল।

ডাকাতে শাশুড়ীর সামনে সন্ত্রস্ত বধূর মতো গ্রিমেটের পদক্ষেপ এত পরিমাপিত ছিল যে, তাঁর নো-বল হোত না কখনো। একবার নিউজিল্যাণ্ডের এক আম্পায়ার তাঁর বিরুদ্ধে নো-বল ডাকলেন—বল দেবার সময়ে তাঁর পা লাইন পেরিয়ে গেছে, এই অপরাধে। আম্পায়ারের কথা শুনে গ্রিমেট প্রায় মূর্ছিত। কথা বলবার সামর্থ্য ফিরে পেয়ে তিনি যে-কথা বলেছিলেন, ক্রিকেট-সাহিত্যে তা ক্লাসিক হয়ে আছে—

"আম্পায়ার-মহাশয়, আপনি আমাকে নো-বল ডাকিয়া একেবারে ওয়ার্লড্ রেকর্ড করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনার ভয় নাই, আর কোনো আম্পায়ার আপনার এই রেকর্ড স্পর্শও করিতে পারিবে না।"

এই বিদ্রূপের অধিকার গ্রিমেট যে-অখণ্ড সাধনার দ্বারা অর্জন করেছিলেন, তার পিছনে ছিল ঐ বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতা এবং পুনশ্চ বিতাড়িত হওয়ার আতঙ্ক। রে রবিনসন গ্রিমেটের ক্রিকেট-জীবনের কারুণ্য খুব অল্প কথায় প্রকাশ করেছেন : "গ্রিমেটকে মেইলীর তুলনায় বল দেওয়ার ব্যাপারে হিসেবী হতে হয়েছিল, কারণ তাঁর ভয় ছিল, তামাশাপরায়ণ দর্শকেরা যে-কোনো সময়ে 'বুড়ো থুত্থুড়ো'—এই হৃদয়হীন ডাক তুলতে পারে। বছরের পর

বছর অনিশ্চিত মনে তিনি গ্রস্ত হয়ে থেকেছেন, সেইটেই বুঝি তাঁর শেষ টেস্ট-বছর হয়—নতুন কোনো ছোকরা বুঝি তাঁর জায়গা কেড়ে নিতে এগিয়ে এল! তাঁর দলের খেলোয়াড়রা তাঁকে খোঁচাতেন : প্রতি জন্মদিনে অন্য লোকের বয়স বেড়ে যায় এক বছর, গ্রিমেটের ক্ষেত্রে তা এক বছর কমে যায়।...মাথার টাক বড় হয়ে যাওয়ার পর থেকে মাথায় টুপি বজায় রেখে সোয়েটার খোলার অদ্ভুত কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছিলেন।"

তবু 'বার্ধক্যে'র অভিশাপ গ্রিমেটকে তাড়া করে ফিরেছিলই। তিনি টুপিতে টাক ঢেকে রেখেছিলেন, ঠিক, তাঁর হাতের বলেও উইকেটভেদী তীক্ষ্নতা ছিল, মিথ্যে নয়—তবু—। গ্রিমেটের টুপির ভিতরে কেশশূন্যতা দেখতে রঞ্জনদৃষ্টি প্রেরণ করেছিলেন কর্তৃপক্ষ, এবং যে-নতুন ছেলেটির আগমনের ভয় তিনি বছরের পর বছর করে এসেছেন—সে অবশেষে এসে হাজির হল ফ্লিটউড-স্মিথ নাম নিয়ে।

১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডগামী অস্ট্রেলিয়ান দলে গ্রিমেটের স্থান জুটল না। গ্রিমেট নাকি আর যথেষ্ট ভাল নন—সেই গ্রিমেট, ১৯৩০ সালে ইংলণ্ড-সফরে যাঁর ভূমিকার গুরুত্বের কথা বোঝাতে গিয়ে অধিনায়ক উডফুল বলেছিলেন, "যদি ব্রাডম্যান বসে যায়, তাহলেও সকলে মিলে আমরা একটা ভদ্রগোছের রান জোগাড় করতে পারব, কিন্তু গ্রিমেটকে হারালে?—দলের আশাভরসায় দাঁড়ি।" ১৯৩৪-এ পরবর্তী ইংলণ্ড-সফরেও (যখন তাঁর বয়স ৪১) গ্রিমেট পেছিয়ে রইলেন না—অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের মোট সংগ্রহ ৭১টি উইকেটের মধ্যে অধিকার করলেন ওরিলি ও গ্রিমেট একত্রে ৫৩টি—গ্রিমেটের—২৫টি।

গ্রিমেট যে ১৯৩৮-এর সফরে অস্ট্রেলিয়া-দলে স্থান পাবেন না তা আগেই বোঝা গিয়েছিল, কর্তৃপক্ষের নতুন প্রতিভার গুণ এবং পুরনো প্রভিতার ত্রুটি আবিষ্কারে উদ্দীপনা দেখে। নির্বাচনী খেলাগুলিতে গ্রিমেটকে অনেক কম বল করতে দেওয়া হয়েছিল, এবং তাও 'অসুবিধাজনক প্রান্ত' থেকে। চুয়াল্লিশ বছরের প্রবীণ ক্রিকেটারকে তাঁর অভ্যস্ত স্থান থেকে সরিয়ে এনে শিলপে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা করা হতে লাগল—তিনি ফাস্টবোলিংয়ের ব্যাট-খোঁচানো রক্ত-বিদ্যুৎগুলিকে মুঠোয় টেনে নিতে পারেন কিনা—অথচ গ্রিমেট, সকলেই জানত—কোনো কালেই শিলপের ফিল্ডার নন। এইসব দুঃখজনক তথ্য তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট লেখক রে রবিনসন।

গ্রিমেটের প্রতি অন্যায়ের প্রতিফল পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। লোকে বলে, ব্রিটিশ ক্রিকেটাররা নাকি গ্রিমেটকে বাদ দেওয়ার মূল মালিক ব্রাডম্যানকে দু' হাত তুলে অভিনন্দন জানিয়েছিল। তারপর সেই হাত নামিয়ে যখন তারা ব্যাট ধরল, তখন একা ওরিলির সাধ্য হয়নি ১৯৩৮ ওভাল-টেস্টে ইংলণ্ডের ৭ উইকেটে ৯০৩ রান আটকাতে।

ক্রিকেট-ইতিহাস অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল সেই সময়ে। গ্রিমেট, তাঁকে বাদ দেওয়ার 'অন্যায়ের তলায় আণ্ডারলাইন করে', অস্ট্রেলিয়ার পরের মরশুমে বোলিংয়ের সেরা গড়-ফল অর্জন করলেন, এবং 'তার পরের মরশুমে, ৪৭ বছর বয়সে, তিনি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে নতুন রেকর্ড যোজনা করলেন—এক অস্ট্রেলিয়ান সিজনে সর্বাধিক সংখ্যক উইকেট (৯টি ম্যাচে ৭৩টি) অধিকার করে।'

গ্রিমেট-প্রসঙ্গ শেষ করি একটি ক্লাসিক গল্প দিয়ে। আয়রনির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত তাতে।

১৯৩৮-এর ইংলণ্ড সফরশেষে ব্রাডম্যান দেশে ফিরেছেন। প্রত্যাবর্তনের পরেই তিনি গ্রিমেটের টেস্টিমোনিয়াল ম্যাচে অংশ নিতে স্বীকৃত হলেন। ম্যাচের টাকা গ্রিমেট পাবেন। ব্রাডম্যান যখন অংশ নিচ্ছেন তখন খেলার সাফল্য অবধারিত।

ব্রাডম্যান ব্যাট করতে নামলেন। পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যান। তাঁর বিরুদ্ধে বল হাতে নিলেন গ্রিমেট। পৃথিবীর সেরা স্লো-লেগব্রেক বোলার। কিন্তু এখনো পৃথিবীর সেরা আছেন কি-না সে-বিষয়ে সন্দেহ জেগেছে অনেকের মনে, বিশেষত ব্রাডম্যানের। তাঁর ধারণা, গ্রিমেট আর যথেষ্ট বল ঘোরাতে পারছেন না। ডনের সেই ধারণার জন্য গ্রিমেটের ইংলণ্ড যাওয়া হয়নি এবার।

ব্রাডম্যানকে ব্যাট হাতে নামতে দেখে গ্রিমেটের সমস্ত মন রাগে জ্বলতে লাগল : এই লোকটিই শনি। এর জন্যই আমার ইংলণ্ড যাওয়া হয়নি। গ্রিমেট তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও প্রতিজ্ঞাকে বিস্তারিত করে যে-বল ছুঁড়লেন, তা অদ্ভুত ব্রেক করে ব্রাডম্যানকে আউট করে দিল অচিরে।

ব্রাডম্যান ফিরে যাচ্ছেন, গ্রিমেট আনন্দে উচ্ছ্বসিত। গালভরা হাসি নিয়ে অন্য ব্যাটসম্যানকে বললেন—'দেখ হে, ডন বলে, আমি নাকি বল ঘোরাতে পারি না—এখন কি হল।'

অন্য ব্যাটসম্যান গম্ভীর হয়ে বললেন—'তা ঠিক, তুমি বল এবং ভাগ্য দুইই ঘোরাতে পেরেছ যথেষ্টভাবে...'

'বলছ তো, ঠিক বলছ!'—গ্রিমেট খুশিতে হাসিতে প্রায় ভেঙে পড়েন।

'মূর্খ!'—অপর ব্যাটসম্যানের কণ্ঠ এখন তীব্র ও শাণিত—'তোমার ঐ অপূর্ব বলটি তোমার পকেটের কুড়ি হাজার টাকা হালকা করে দিল—ডন আউট হয়ে গেছে শুনলে দুপুরে আর কেউ মাঠে ঢুকবে না।'

ক্রিকেটের গল্প কি এখানেই শেষ? জীবনের গল্প হয়ে উঠেছে কত সময়। তেমন জীবনের গল্প শ্রদ্ধাস্পদ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেকদিন আগে বলে গেছেন, আমি তার ক্রিকেটীয় দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৯৩২-৩৩-এ লারউড যখন অস্ট্রেলিয়ান বীরপুরুষদের ক্রিকেট-রঙ্গস্থলে ধরে-ধরে সাবাড় করছিলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার পুরুষ দর্শকজন, ভীরু হলে, 'মুদিল নয়ন', সাহসী হলে, 'খুলিল নয়ন—রক্তরোষে।' সাহসীদের চোখ খুলেছিল, মুখ ছুটেছিল, হাত চলেছিল—প্রায়। অপরপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা লারউডকে অপছন্দ করেনি।—মেয়েদের বিচ্ছিরিকে বড্-ডো মি-ষ্টি লাগে। না, আমি সে গল্পও করছি না। আমি পরবর্তী আর এক লারউডের কথা ভাবছি—যাঁর নাম টাইসন। জার্ডিনের ভক্ত লেন হাটন ১৯৫৪ সালে অস্ট্রেলিয়া-সফরে টাইসনকে পেয়ে মহা খুশি। 'টাইসন-স্ট্যাথাম-অস্ত্রে মিলার-লিণ্ডওয়ালের অত্যাচারের শোধ তুলব এবার।' বডিলাইন আইনে নিষিদ্ধ, সে দুঃখ সামলে হাটন টাইসনের স্টাম্প-লাইন টাইফুনের মুখে উড়িয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়ানদের। টাইসন সিনেমার প্রাগৈতিহাসিক বিভীষিকার মতো সভ্যসমাজে আবির্ভূত হয়ে, হা-হা ধ্বনি

তুলে সব-কিছু লণ্ডভণ্ড করছিলেন—তাই দেখে অস্ট্রেলিয়ান বীরের দল যখন 'পালাই পালাই—ওরে বাপ্'—তখন টাইসনকে ভালবেসে ফেললেন এক সুন্দরী অস্ট্রেলিয়ান তরুণী।

এবার ছোট্ট একটা অন্য গল্প শুনুন :

এক তরুণী তাঁর বান্ধবীকে বললেন সনিশ্বাসে—ভাই, আমার একটা আদর্শ ছিল।

বান্ধবী—তাই নাকি? তারপর? সে আদর্শের গতি কি হল?

তরুণী---তাকে বিয়ে করে ফেললুম।

টাইসনকে বিয়ে করে ফেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান তরুণীটি। টাইসন অচির-কালে টেস্ট-ক্রিকেট থেকে হারিয়ে গেলেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিশয় আপত্তিকর একটা বক্তব্য যেন মনে পড়ছে —স্ত্রী-মাকড়সা নৃত্যগীতপরায়ণ পুরুষ-মাকড়সাকে অত্যন্ত আদর করে, সুড়-সুড়ি দিয়ে—উদরস্থ, না কী-যেন করে ফেলল!

* * * ক্রিকেটে উপেক্ষিত * * *

ক্রিকেটের চরিত্রের কথা উঠতে আমার একটি অন্যায়ের কথা মনে পড়ে আমাকে অনুতপ্ত করে তুলেছে, যদিও অন্যায় অনিচ্ছাকৃত। ক্রিকেটে যারা উপেক্ষিত, আমার লেখনী তাদের উপেক্ষা করেছে, যদিও লেখক-হিসাবে অনালোকিত স্থানে আলোকসম্পাতের দায়িত্ব আমার ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি সে দায়িত্ব যথাযথ পালন করে উঠতে পারিনি।

এই অন্যায়ের জন্য মর্মপীড়িত হয়ে আমি একদা একটি নাতিবৃহৎ রচনা ক্রিকেটে উপেক্ষিতদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলুম। একটু সমবেদনা ও সহিষ্ণুতার অভাবে বিশ্বশান্তি পর্যন্ত কিভাবে বিঘ্নিত হয়, সে বিষয়ে রাষ্ট্র-নেতাদের ভাষণ ও সংবাদপত্রের মন্তব্য আমাদের অসাড় কর্ণে নিয়মিত বর্ষিত হয়—আমি চেয়েছিলুম, তাঁদের সেই প্রেমবাণীকে খেলার মাঠে প্রবাহিত করতে। আমি চেয়েছিলুম, দর্শকদের সতর্ক করে দিতে, তাঁদের আচরণের সম্ভাবিত ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে। ভারতের পুণ্যতীর্থে টেস্টম্যাচরূপ পুণ্যমহোৎসব-কালে দর্শকেরা প্রায়শ যে-বিদ্রূপের করতালিবাদন করেন, তাতে তাঁরা খেয়াল করেন না, অনেক হতভাগ্যের মৃত্যুঘণ্টা ধ্বনিত হয়। দর্শকেরা বিচারশীল ও বিজ্ঞ। তাঁরা সমবেতভাবে সত্য বই মিথ্যা বলেন না। কিন্তু সেই সত্যকথন বহু সময় শোকযাত্রার 'রাম নাম সত্য হ্যায়' ধ্বনিতে পর্যবসিত হয়।—এই সমস্ত কথাই আমি দর্শকদের ঐ রচনায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম।

জীবনে উপেক্ষিতের সীমাসংখ্যা নেই। ক্রিকেটেও। আমি তাদের মধ্যে এক-জনকেই বেছে নিয়েছিলুম। সেই একজন—

আরও কিছুদিন আগে রচিত আমার আর একটি রচনার কথা মনে পড়ছে। 'ক্রিকেট, সুন্দর ক্রিকেট' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট সেই রচনাটির নাম 'ক্রিকেটের চার হৃদয়, এক চোখ।' আমি ক্রিকেটকে বহু কোণ থেকে দেখতে চেয়ে তার এক 'চক্ষু'-রূপ স্কোরার, এবং চার 'হৃদয়'রূপ যথাক্রমে দর্শকের গ্যালারি, নির্বাচক-

দের পরামর্শকেন্দ্র, খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুম এবং প্রেসবক্স-কমেনটেটরস্ বক্স-এর কথা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছিলুম। সর্বদিক যথাসম্ভব চোখে ও মনে রাখতে সচেষ্ট থেকেও কিন্তু ক্রিকেটের প্রধানতম অথচ উপেক্ষিত চরিত্রটি আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল—আম্পায়ার। আমাকে স্বীকার করতে হয়েছিল, 'নয়নের মাঝখানে' ঠাঁই নেওয়ার জন্যই তাঁদের ভাল করে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরে আর একটি রচনায় ক্রিকেটের পুরোহিত-দর্পণ রচনা করে দোষ স্খালনে প্রয়াস পেয়েছি।

কিন্তু উপেক্ষিত আরও আছে।

মনে পড়ছে, প্রথম বড় ক্রিকেট-ম্যাচ দেখতে গিয়ে আমার অবাক উক্তির কথা—'বাঃ, বাঃ, কি মজা! বেয়ারারা কি সুন্দর সেজে এসেছে!'—তখন আমার ক্রিকেট-পথের মহাজন শ্রীযুক্ত গুণেনদা একটি নিগূঢ় হাস্য করেছিলেন। সে হাসির অর্থ সেদিন বুঝতে পারিনি। আজকে ক্রিকেটের 'দ্বাদশ-ব্যক্তি'র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সেই হাসিটাই কিন্তু বেশি করে মনে পড়ছে। ক্রিকেট সম্বন্ধে আমার বালকোচিত অনভিজ্ঞতায় দাদা নিশ্চয় সেদিন হাসেননি, কারণ তিনি আমাকে 'বল পড়ে ব্যাট নড়ে' এই পাঠ দিতেই মাঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সেদিনের হাসি ছিল, আজ বুঝতে পারছি, নিতান্ত অনুকম্পার—আমার প্রতি নয়—আমার প্রশ্নেব লক্ষ্য ঐ সুসজ্জিত বারিকরঙ্ক-অনুগামী 'দ্বাদশ-ব্যক্তি'-নামধেয় ব্যক্তিদ্বয়েব প্রতি। রাজার নিত্যসঙ্গিনী হয়েও যে-যুবতী পত্রলেখারা রাজজীবনে উপেক্ষিত হয়ে থাকে, তাদের মতোই ক্রিকেটের সঙ্গে জুড়ে থেকেও ক্রিকেটে যারা উপেক্ষিত সেই যৌবনব ত অথচ বঞ্চিত দ্ব।দশ-ব্যক্তিদের নিয়ে আমার এই রচনা।

দ্বাদশ-ব্যক্তিরা ক্রিকেটে উপেক্ষিত, সত্যই। নচেৎ মিত্তিরদার মতো সদাপ্রসন্ন 'ক্রিকেট-কোবিদও' দ্বাদশ-ব্যক্তির নামে প্রসন্নতা ত্যাগ করবেন কেন? দোষের মধ্যে বাড়ির এক চায়ের আসরে আমি প্রশ্ন করেছিলুম—'মিত্তিরদা, আপনি কখনো দ্বাদশ-ব্যক্তি হয়েছেন?'

'থাম, বাজে বকিসনি'—মিত্তিরদা মুহূর্তে অগ্নিময়।

আমরা বিস্ময়ে বাষ্পবৎ। হঠাৎ রাগের কি হল? মিত্তিরদা অনেকদিন ক্রিকেট খেলেছেন। ক্রিকেট খেললেও তিনি ক্রিকেটের এত বড় প্রতিভা নন যে, শুরু থেকেই একাদশ বৃহস্পতির অন্তর্গত। নিশ্চয় কোনো না কোনোদিন তাঁকে দ্বাদশ ব্যক্তি হতে হয়েছে, সে ক্ষেত্রে—এই সরল প্রশ্নে—

'জানিস, আমাকে প্যাণ্ট খুলিয়ে ছেড়েছিল?' মিত্তিরদার অগ্নিকণ্ঠে ঈষৎ আর্দ্রতা।

দাবানল বাড়বাগ্নিতে রূপান্তরিত হতেই আমরা চেপে ধরলুম।—'বলুন না মিত্তিরদা, হয়েছিল কি?'

নিতান্ত ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে মিত্তিরদা বললেন—'আরে ভাই, সেবার প্লেস পাব একেবারে ঠিক। ছোটলাটের সামনে খেলা হবে। আয়োজন চূড়ান্ত। ফুলে-পাতায় মাঠ এমন সাজিয়েছে যেন বিয়েবাড়ি। প্যাভিলিয়ন তো ফুলশয্যা। সিল্কের শার্ট প্যাণ্ট চড়িয়ে গেছি। ধার করে তৈরি করিয়েছি। নেট প্রাকটিস ক'রে-ক'রে নড়া ব্যথা। নির্ঘাত টু-ডাউন নামব। স্ট্রোক-প্লেয়ার বলে আমার খাতির—'

মিত্তিরদা থামলেন। তারপরে গনগনে গলায় বললেন—'প্লেস পেয়ে গেল প্রেসিডেন্টের শালা।'

আমরা নিশ্চয় ভুল শুনেছিলুম, নিশ্চয় ওটা মিনিস্টারের শালা হবে। মিত্তিরদা বাধা দিয়ে বিষাদশান্ত সুরে ইতিহাসজ্ঞান দিলেন—'না, ভারত তখনো স্বাধীন হয়নি। তখনকার নেপো-নীতি সম্বন্ধে বলা হোত, বড়বাবুর শালা, প্রেসিডেন্টের শালা—

'—শুধু তাই নয়'—মিত্তিরদা বলে চললেন—'ক্যাপ্টেন এসে আমার পিঠ চাপড়ে বলল, মিত্তিরকে আজ যে খুব ওয়েল ড্রেসড দেখছি।

'যথালাভ' বলে প্রশংসাটুকু হজম করলুম।

'ক্যাপ্টেন বলল, তোমাকে কনফিডেন্সে নিয়ে বলছি, তালুকদারটার মতো আনস্পোর্টসম্যান আর হয় না। ওকে টুয়েলভথ্ ম্যান করব বলেছিলুম—হোতও তাই, যদি না প্রেসিডেন্ট আজ ইনটারফেয়ার করে ওকে টিমে ঢুকিয়ে দিতেন—রাগে তালুকদার যাচ্ছেতাই ময়লা জামাপ্যান্ট পরে এসেছে। ওই পোশাকে ওকে খেলানো যায় না।

'আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে বললুম, নিশ্চয়, আমি তো তৈরিই আছি।

'ক্যাপ্টেন বলল, সে তো নিশ্চয়ই, সে তো জানিই। তুমি যে সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান, তা আমরা কে না জানি? তাই তো তোমাকে রিকোয়েস্ট করতে সাহস পাচ্ছি। তালুকদার তোমারই সাইজের। কাইন্ডলি যদি তুমি তোমার প্যান্ট শার্ট ধার দাও তালুকদারকে। দিস ইজ ক্রিকেট, অ্যান্ড এ স্পোর্টসম্যান লাইক য়্যু—

'অতএব আমার মতো খাঁটি স্পোর্টসম্যানকে নতুন সিল্কের জামাপ্যান্ট খুলে দিতে হল তালুকদারকে, এবং পরতে হল তালুকদার নামক ভেজাল স্পোর্টস-ম্যানের দুর্গন্ধ, ঘেমো ময়লা পোশাক। তারপর খেলার সময়ে আমার ধারে-কেনা জামা প্যান্ট পরে মাঠের উপর ডাইভ দিয়ে, গড়াগড়ি খেয়ে, তালুকদারের বল ধরার কায়দা কত—

'শুধু তাই নয়, ফটো তোলার সময়ে আমাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে ঠেলে দিলে আমার পোশাক নোংরা বলে। দিতেই পারে, আমি যে টুয়েলভথ্ ম্যান!'

এই হল ক্রিকেটের দ্বাদশ-ব্যক্তি। ডজন পুরোতে দ্বাদশ-ব্যক্তিকে নেওয়া হয়, নচেৎ ক্রিকেট একাদশের খেলা। ক্রিকেট নিয়মাবলীতে বলা আছে:

"যদি কোনো খেলোয়াড় খেলা চলাকালে আঘাত কিংবা অসুস্থতার জন্য অসমর্থ হয়ে পড়ে, তা হলে বদলী খেলোয়াড় ফিল্ডিং করার কিংবা উইকেটের মধ্যে দৌড় দেবার অধিকার পায়। উপরিউক্ত কারণ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ অধিনায়কের সম্মতি ভিন্ন বদলী খেলোয়াড় আমদানি করা যাবে না। কোনো 'বদলী' ব্যাট বা বল করতে পারবে না। (উইকেট-কীপিং করতে পারবে বিপক্ষ অধিনায়ক আপত্তি না করলে।) প্রতিপক্ষ অধিনায়ক বদলী খেলো-য়াড়ের কোনো বিশেষ স্থানে ফিল্ডিং-এ আপত্তি করে তাকে স্থান পরিবর্তনে বাধ্য করতে পারবে।"

বদলী খেলোয়াড়ের অধিকার সম্বন্ধে নিয়মাবলীতে যা পাওয়া যাচ্ছে তাকে

'অধিকার' না বলাই উচিত। ওটা ভৃত্যের অধিকার। ক্রিকেটের এই সম্মানিত সেবকরা প্রাণপণে নিজেদের কর্তব্য করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিনিময়ে কি পান? ধরা যাক, দুপুর পর্যন্ত সারাক্ষণ প্যাভিলিয়নে ছত্রছায়ে দ্বাদশ-ব্যক্তি আসীন। এমন সময়ে কোনো মহাত্মা ফিল্ডারের মধ্যাহ্ন-ভোজনমন্থর শ্রীচরণের পেশীসঙ্কোচন ঘটল—সুতরাং তখনই, আবছা আলোর আশ্রয় থেকে কটকটে রোদে মাঠের মধ্যে ছুটতে হল দ্বাদশ-ব্যক্তিকে। আর ঠিক তখনি দ্বিপ্রহরের আকাশ থেকে একটি বলরূপী উল্কা খসে পড়ল নবাগতের সামনে। ধাঁধানো চোখের সামনে দিয়ে সেই সর্বনাশটি যখন মাটিতে খসে পড়ল—যখন নিজের সমস্ত পেশী প্রসারিত করেও তাকে শূন্যে ধারণ করা গেল না—তখন সারা মাঠ হায়-হায় করছে এবং বিদগ্ধ ক্রিকেটরসিক বাঁধানো দাঁতে ক্রিকেট-শাস্ত্র বহির্ভূত একাধিক শব্দ চর্বণ করে বলছেন—স্টেঞ্জ! হাউ ফানি!! ভালো ফিল্ডিং করতে পারলেই তো টুয়েলভথ্‌ম্যান করা হয়!!!

কিংবা ধরুন আহত ব্যাটসম্যান হাসপাতালে যাবার মতো যথেষ্ট আহত হননি, তিনি এখনো ব্যাট দিয়ে ভালই ঠেঙাতে পারেন, কিন্তু পা দিয়ে ভাল দৌড়াতে পারেন না—তখন তিনি ডাক দিলেন বদলী দ্বাদশ-ব্যক্তিকে—সে ব্যক্তি উইকেটের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে ব্যাটসম্যানের জন্য রান কুড়িয়ে আনবে। সেই রান কাড়াকাড়ির মধ্যে যদি একটু ভুল হয়ে যায়—যদি তার ফলে রানআউট হয়ে যায় ব্যাটসম্যান—তাহলে—ট্রে—টা—র! দ্বাদশ ব্যক্তি তাহলে—গৃহশত্রু বিভীষণ।

ভেবে দেখুন পাঠক, ভুল ডাক দিয়ে রানআউট যে-কোনো একজন ব্যাটসম্যান অন্য ব্যাটসম্যানকে করে দিতে পারে। হামেশাই তা ঘটছে ক্রিকেটে। আপনারা রাগ করলেও সেটাকে ক্রিকেটের স্বাভাবিক দুর্ঘটনা বলে ধরে নিয়েছেন। আর যদি কম্পটনের মতো রোমান্টিক ব্যাটসম্যান অন্যকে আউট করে দেন, তা হলে কম্পটনের অপরাধী লজ্জা নিয়ে আপনারা কী না স্নেহ বোধ করেন। কিন্তু ঐ ব্যাপারটি যদি বদলী খেলোয়াড়ের দ্বারা হয়, আপনারা তাকে কখনোই ক্ষমা করতে চান না।

—'আমি একটি অপরাধী ছেলেকে প্যাভিলিয়নে বসে কাঁদতে দেখেছি'—আমাকে বলেছিলেন একজন প্রবীণ অধিনায়ক—'না না, দর্শকরা গালাগালি দিয়েছে সেই অপমানে নয়, ছেলেটির ভুলের জন্যই কার্যত তার দল হেরে গেল —সেই দুঃখে। দর্শকেরা মনে না-রাখলে কি হবে—ছেলেটি দলেরই খেলোয়াড় ছিল।'

সত্যই, এই কথাটাই কেউ মনে রাখতে চায় না যে, দ্বাদশ-খেলোয়াড় দলেরই খেলোয়াড়। আর সেই কথাটা মনে থাকে না বলে দ্বাদশ-ব্যক্তি সম্বন্ধে দর্শকদের মনে সাধারণভাবে অবজ্ঞা এবং ত্রুটির ক্ষেত্রে সুতীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। সে যদি শক্ত ক্যাচ ধরে তা হলে—ও আর কি, তোমার ভালো ফিল্ডিং-এর জন্যই তো একাদশ-বহির্ভূত হয়েও মাঠে নামার দুর্লভ সম্মান পেয়েছ (এবং যে-স্কোর-বুক প্রতিটি কীর্তির পাশে কর্তার নাম লিখে রাখে, সেও অকরুণ হয়ে ক্যাচ ধরার ক্ষেত্রে বদলী ব্যক্তির নামোল্লেখ পর্যন্ত করে না)—আর যদি ফেলে দেয় —সে যেন শত্রুশিবির থেকে এসে বিশ্বাসঘাতকতা করে গেল।

দ্বাদশ ব্যক্তি সম্বন্ধে এই মনোভাব দর্শকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। খেলো-

প্লাড়েরা পর্যন্ত এদের ভাল চোখে দেখে না। অনেকেরই মনোভাব—আরও পাঁচজন উঠতি খেলোয়াড়ের মধ্যে এই ছোকরাকেই যে দ্বাদশ-ব্যক্তিরূপে বাছা হয়েছে তার কারণ এর ব্যাকগ্রাউণ্ডে লোক আছে। নচেৎ অন্য ছোকরাদেরও মাঠ চেনার দরকার কম ছিল না। যে-সিনিয়র খেলোয়াড় রিটায়ারমেণ্টের মুখে, সে ভাবে, এই ছেলেটার জন্যই আমার এক্সটেনসন হবে না, আর যে-জুনিয়র বাদ পড়ার পথে, সে ভাবে, এই জুড়ে-বসা ছোঁড়াটাই আমার চান্স খেল।

খেলা চলাকালে দ্বাদশ-ব্যক্তির অবস্থা :

তাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। ক্রিকেটের এই বাধ্য বাহনটি জিন চড়িয়ে রেডি থাকবেন—কখন ছুটতে হয়। নিজ দলের ব্যাটিং বা ফিল্ডিং—কোনো সময়েই তার অব্যাহতি নেই। সারাক্ষণ জামা জুতো পরে তটস্থ। যখন নিজ দল ফিল্ডিং করছে তখন তো 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার', কারণ এগারো জন খেলোয়াড় বিনা অসুস্থতায় মাঠে বিরাজ করতে পারে না, কিন্তু যখন নিজ দল ব্যাটিং করছে তখনো অ্যাটেনশন্। নিজ দলের ফিল্ডিং করার সময়ে দ্বাদশ-ব্যক্তি মাঠে নামলে তবু কিছু মর্যাদা পায়, কারণ সাধারণভাবে সে ফিল্ডিং-এ পারদর্শী এবং বোলার ও উইকেটকীপার ছাড়া সকলেই এক জাতীয় ফিল্ডার, কিন্তু যদি নিজ দল ব্যাটিং করে? তখন দ্বাদশ-ব্যক্তি মাঠে নামলে তার পিঠে 'বদলী' ছাপটা বড় অক্ষরে মারা থাকে। তখন সে হয় অন্যের হয়ে 'রান চুরি' করছে, নয়তো অন্যের জন্য ব্যাট বহন করছে মাঠের মধ্যে। যাঁরা ব্যাট করেন তাঁরা নবাব-নন্দন। তাঁদের ফেবারিট ফাটা ব্যাট থাকে, যা ব্যবহার না করলে তাঁরা সেঞ্চুরি করতে পারেন না। এবং প্রায়শ সেঞ্চুরি হবার আগে তাঁদের ফাটা ব্যাট আর একটু ফাটে, আর তাঁরা প্যাভিলিয়নের দিকে সেই ছিন্ন পতাকা তুলে ধরেন। তখন ব্যাটের ফার্স্টএডের সরঞ্জাম নিয়ে মাঠে ছুটতে হয় দ্বাদশ-ব্যক্তিকে। ব্যাট আরও একটু ফাটলে দ্বাদশ-ব্যক্তিকে উক্ত ব্যাটসম্যান-মহাশয়ের ব্যাগ হাতড়ে গুটি-পাঁচেক ব্যাট যোগাড় করে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে হবে মাঠে—তিনি বেছে নেবেন তাঁর যোগ্য অস্ত্র। এইসব ভৃত্যকার্য সাধারণ ভৃত্যেরা করবার অধিকারী নয়। খেলা চলাকালে সেই যজ্ঞস্থলীতে শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ; আর তালিকাভুক্ত ছাড়া সকলেই ক্রিকেটে শূদ্র। এই ভারবাহীর ভূমিকা ছাড়া দ্বাদশ-ব্যক্তির আর একটি ভূমিকা আছে—পানিপাঁড়ের। খেলোয়াড়গণ যখন রৌদ্রতপ্ত হয়ে তৃষ্ণাবোধ করেন তখন দ্বাদশ-ব্যক্তিগণ মাঠে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকের তৃষ্ণা-প্রকৃতি অনুযায়ী পানীয়ের ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয়, যদি ব্যাটসম্যান অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে উইকেটের কাছেই ভূমিশয্যা গ্রহণ করেন, পানাধারের নিকটবর্তী হতে অসমর্থ হন, তা হলে পানপাত্র হস্তে এই সেবককে ব্যাটসম্যানের সমীপস্থ হতে হয়। এবং ব্যাটসম্যান যখন কুলকুচাকালে সূক্ষ্ম-শীকরের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবেন, তখন তাঁর পার্শ্বলগ্ন হয়ে সহাস্যে বাক্যালাপ করতে হবে দ্বাদশ-ব্যক্তিকে।

দ্বাদশ-ব্যক্তি যখন প্যাভিলিয়নে তখন অবিরত ফরমায়েশ। এমনকি অধিনায়কের আদেশাধিক অনুরোধে তাকে খেলোয়াড়দের কাছে ঘুরে-ঘুরে অটোগ্রাফখাতা পর্যন্ত সই করিয়ে আনতে হয়।

দ্বাদশ-ব্যক্তি নামক যন্ত্রটিকে ব্যবহার করে কেমন করে জয়রস নিষ্কাশন করা

যায় তার দৃষ্টান্ত চয়ন করতে পারি ডবলিউ জি গ্রেসের কাহিনী থেকে।

একদা গ্রেস-পরিবারেরর সঙ্গে স্থানীয় রবিনসন পরিবারের বাৎসরিক পারিবারিক ম্যাচ। রবিনসনেরা আত্মীয় ছাড়া দলে কাউকে স্থান দেয় না, গ্রেসদের অতটা বাঁধাবাঁধি নেই—বাইরেরও দু-একজন খেলে।

ডবলিউ জি'র বড় ভাই ডাঃ হেনরী গ্রেসের এখন বয়স হয়েছে। শরীর আগেকার মতো সমর্থ নয়, ফিল্ডিং করতে পারেন না ভালভাবে। ক্যাচ ফসকায়, রান দেন বড় বেশি। এই দিন ডাঃ হেনরী গ্রেস ব্যাট করলেন বেশ ভালই, তারপরেই জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে রোগী দেখতে চলে গেলেন অন্যত্র। তখন পাড়ার এক চটপটে ছোকরা তাঁর হয়ে ফিল্ডিং করতে লাগল। সে ফিল্ডিংও করল অদ্ভুত। কত যে রান বাঁচাল এবং ক্যাচ ধরল! খেলার একেবারে শেষের দিকে ডাঃ হেনরী গ্রেস ফিরে এলেন রোগীকে দেখে। খেলায় গ্রেসরা জিতলেন, এবং সেই জয়ের পিছনে মস্ত দান ছিল ডাঃ হেনরীর বদলী ছোকরাটির।

বলাই বাহুল্য, পাঠক বুঝেছেন, ডাঃ হেনরী গ্রেস যে-টেলিগ্রাম পেয়ে রোগী দেখতে গিয়েছিলেন, সে টেলিগ্রামের প্রাপক এবং প্রেরক অভিন্ন এবং কাল্পনিক রোগীর উদ্দেশে ডাঃ হেনরীর প্রস্থানই তাঁর দলের জয়ের কারণ।

এই কাহিনীকে গ্রেস-পরিবারের 'যৌথ চালাকির' অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বলা হয়েছে। গ্রেসরা তাঁদের চতুর বুদ্ধির প্রশংসা পেয়েছেন—কিন্তু সেই যে চটপটে বদলী ছেলেটি—তার নাম কেউ মনে রেখেছে?

এই উপেক্ষিত দ্বাদশ-ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কিছুদিন আগে এক ব্যক্তি বিবৃতি প্রচার করেছিলেন সংবাদপত্রে। বিবৃতিটি কৌতুকে ও কারুণ্যে অতীব উপাদেয়। সংবাদপত্রের বিবরণ উদ্ধৃত করছি :

"নিউ সাউথ ওয়েলস দলের রে ফ্লকটন অস্ট্রেলিয়ার 'খাঁটি দ্বাদশ খেলোয়াড়' রূপে সুপরিচিত। কারণ তিনি দলের হইয়া ১৯৬১-৬২ সালের সকল খেলাতেই দ্বাদশ-ব্যক্তি হিসাবে-স্থানলাভ করেন।

"ফ্লকটন দ্বাদশ-খেলোয়াড়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে দার্শনিক মনোভাব লইয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'ত্রয়োদশ ব্যক্তি হওয়ার অপেক্ষা দ্বাদশ-ব্যক্তি হওয়া অনেক উত্তম।' ফ্লকটন আশা করেন, আগামী মরশুমে তিনি দলভুক্ত হইবেন। তিনি মনে করেন, দ্বাদশ-ব্যক্তির কার্যাবলী সাধারণ ধারণা অপেক্ষা অনেক আকর্ষণীয়। দ্বাদশ-ব্যক্তি কেবল নির্ধারিত সময়ে মাঠে পানীয় সরবরাহ করে এই ধারণা ভুল।

"এই জল দিবার মতো সামান্য ব্যাপারেও বহু জটিলতা আছে। যেমন কেউ-কেউ মাত্র 'সাদা জল' পছন্দ করেন, কেউ-বা তাহার সহিত লেবুর রসের পক্ষপাতী, আবার কেউ বরফজল ও লেবু পাইলে খুশি।

"আবার সব মাঠের এক নিয়ম নয়। সিডনিতে প্রয়োজনীয় বস্তুর তালিকা লইয়া পানশালায় উপস্থিত হইলেই সব মিলিয়া যায়। সেগুলি লইয়া ঝুড়িতে সাজাইয়া আপনি গম্ভীরভাবে মাঠে যাইতে পারেন। মেলবোর্নে একজন অভ্যর্থনাকারী ব্যক্তি আপনার অর্ডার-অনুযায়ী মালপত্র সরবরাহ করিয়া দিবে। এডিলেডেও একই নিয়ম, তবে পানীয় যাহাতে এক ফোঁটাও নষ্ট না হয় সে-

দিকে কড়া নজর রাখা হয়। পার্থে এক 'নারকীয়' নিয়ম প্রচলিত। অর্ডার-অনুযায়ী মালপত্র উভয় দলের দ্বাদশ-ব্যক্তিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। মনে হয়, যাহাতে উত্তেজক কোনো পানীয় মিশাইয়া দেওয়া না হয় তাহার প্রতি নজর রাখিবার জন্যই দুইবার পরীক্ষার রীতি প্রচলিত। এবং অধিনায়ক কোনো-রূপ উদ্দেশ্যমূলক নির্দেশ যাহাতে পাঠাইতে না পারে তাহার বিরুদ্ধেও সতর্কতা অবলম্বন করার সুবিধা হয়।

"ফ্লকটন বলেন, দ্বাদশ-ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হইতেছে, দলের যে-খেলোয়াড়রা ত্রুটিপূর্ণ খেলার জন্য মর্মাহত তাহাদের সান্ত্বনা দেওয়া। ব্যাপারটি সকলেরই ভালভাবে জানা আছে। যখন কেউ বোকার মতো পরিষ্কার লেগবিফোর হইয়া ফিরিয়া আসে, তখন তাহাকে বলিতে হইবে—'আম্পায়ার চোখে দেখতে পায় না—একেবারে অন্ধ।' আবার যখন কেউ সোজা ক্যাচ ফেলিয়া দেয় তখন দ্বাদশ-ব্যক্তিকে বলিতে হইবে—'আরে মন খারাপ ক'রো না। আমি ভেবেই পাচ্ছি না, তুমি চোখের উপর সূর্যকে নিয়ে বলের অত কাছাকাছি গেলে কি করে'—যদিও সেদিন মেঘলা ছিল, অথবা বৃষ্টি পড়িতেছিল।"

এইখানেই এই লেখা শেষ করে দেওয়া উচিত। দ্বাদশ-ব্যক্তির দায়দায়িত্ব, তথাপি অসম্মানের বিষয়টি করুণ পরিহাসে মুড়ে সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন 'আদর্শ দ্বাদশ-ব্যক্তি' রে ফ্লকটন। কেবল একটি বিষয় তিনি বলেননি—প্যাভিলিয়নে বসে 'আমি পারতাম'—এই অবরুদ্ধ যন্ত্রণার কথাটা। ব্যাটসম্যান পরাভূত হচ্ছে, বোলার ব্যর্থ, ফিল্ডসম্যানের ত্রুটির শেষ নেই—প্রতিটি ক্ষেত্রে অধীর বাসনা আছড়ে পড়ছে একটি তরুণ বুকে—আমি পারি, আমি পারি। যন্ত্রণাটা এত তীব্র, কারণ তাকে দূরে নয়, দ্বারে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, পাত্র হাতে দিয়ে বলা হয়েছে—একে দেখ, ঘ্রাণ নাও, কিন্তু পান ক'রো না। সে মাঠে গিয়ে খেলার মধ্যে বল ছোঁয় কিন্তু বল দিতে পারে না, ব্যাট বয়ে নিয়ে যায় কিন্তু ব্যাট করতে পারে না, সে দৌড়ে রান নেয় কিন্তু রান তার নামে যোগ হয় না—সারাক্ষণ তার মনে বাজে—আমি পারতাম।

দ্বাদশ-ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনাটা খুব জমে উঠেছিল। বাড়ির চায়ের আসরে তখন সাইক্লোন। চাপড়ানিতে টেবিল তক্তপোশের প্রাণ ত্রাহি-ত্রাহি। দ্বাদশ-ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক উপমা যোগ করতে লাগলেন। কেউ বললেন, ওরা যেন ইংলণ্ডের মেজ রাজকুমার; কেউ বললেন, পেণ্ডিং-লিস্টে ঝুলে থাকা বেকার; এমনি নানা কথা। অনেকে আবার দ্বাদশ-ব্যক্তিকে নিয়ে কৌতুক করাটাকে অপছন্দ করলেন: ওটা চমৎকার শিক্ষানবিশীর কাল—ওটা সৌভাগ্যসূচনা। একজন হঠাৎ কমলাকান্ত শর্মার নকলে অহিফেনসুরে ঘোষণা করলেন—এ জগৎ দ্বাদশ-ব্যক্তিতে পূর্ণ—যেদিক তাকাও—। এই ঘোরালো তর্কের অগ্নিতে ইতিমধ্যে সমস্ত তেলেভাজা ও সিঙ্গাড়া নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। অবিলম্বে আরও কিছুর প্রয়োজন। কিন্তু আনতে যায় কে? ঠিক এইসময়ে দু হাতে দুটো বাজারের বড় থলি ঝুলিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে প্রবেশ করল আমার ছোট ভাই। ভিতরে ঢুকে যাবার আগে অল্প দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা শুনে নিল, তারপর বলল—

থাক, ব্যস্ত হবার দরকার নেই, আমিই যাচ্ছি, সংসারের স্বাদশ-ব্যক্তি তৈরী আছে।

* * * শেক্সপীয়ার-নিউটন সংবাদ—ক্রিকেটে * * *

বিজ্ঞানপ্রিয় রমেন মিত্তিরের সঙ্গে রণে আমি-যে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছিলুম, একথা পাঠকেরা পূর্বেই জেনেছেন। যে-কলাকে রমেন্দ্রনাথ কদলী বলে বিদ্রূপ করে, আমি সেই কলাতেই কৈবল্যপ্রাপ্তির অভিলাষী। সুতরাং খেলাতেও কলা-বিলাসই চাইব, তাতে সন্দেহ নেই। অপরদিকে রমেন মিত্তির খেলাতেও বিজ্ঞানের পক্ষপাতী। তার পিতৃদেব তার বাল্যে সেই-যে 'মেকানো' নামক নাট-বল্টু-মার্কা একটা ব্রিজ-তৈরীর খেলনা বিদেশ থেকে এনে হাতে ধরিয়ে দিয়ে-ছিলেন, তাতেই সর্বনাশটা ঘটল—তার সর্বনাশ, ততোধিক আমার। তার সর্ব-নাশ এই জন্য যে, আমার মতে, বিজ্ঞানের মস্তক-যন্ত্রে তেলকালিই শুধু আছে, ঘৃতের নিতান্ত অভাব, অপরদিকে আমার সেই অভিযোগে ঘৃণা প্রদর্শন করে সে আমার মস্তকরূপ ঘৃতভাণ্ডটির উপর অমার্কসীয় হাতুড়ি প্রয়োগ করে তাকে দিনের পর দিন ফাটিয়েছে। তাতে আমার যে-কোনো শুভ আবেগ বিধ্বস্ত হয়েছে। হয়ত আমি ক্রিকেট ছেড়ে ফুটবলের আলোচনা ধরেছি দায়ে পড়ে, বলতে চেয়েছি নগ্নপদ ভারতীয় ফুটবলারদের পদচাতুরীর কথা, উল্লেখ করেছি, ভারতীয়দের পায়ের যাদুকাঠিতে উদ্‌ভ্রান্ত বিদেশী খেলোয়াড়দের মুগ্ধ বচনের কথা—মিত্তির তৎক্ষণাৎ সিগারেটের গ্যাস ছেড়ে বলেছে—তোমার নগন-চরণা ভারতীয়রা কখানি গোল খেয়েছিলেন, সে কি মনে পড়ে? অগত্যা আমাকে চুপ করে যেতে হয়েছিল, কারণ আমি জানতাম, এ তর্কে জয়লাভ করা সত্যই কঠিন। সত্যই ভারতীয় অ-বুট পায়ের যাদু ইউরোপীয়দের সবুট চরণকে বারংবার চকিত চমক দেখিয়েও শেষপর্যন্ত থেমে যেত গোলের হিসেবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয়রাই হারত। রমেন মিত্তিরের বক্তব্য, ওসব হাড়গিলে ল্যাংটো পায়ের চালাকি ছেড়ে (কখনো-কখনো মিত্তির বলত, 'ক্ষপণক শ্রীচরণ'; মিত্তির, বিস্ময়ের কথা, সংস্কৃতের চর্চা করেছিল, জার্মান ভাষার সঙ্গে) বুট পরো, ষাঁড়ের ডালনা খাও, ধাক্কাধাক্কি করো, খেলো। 'সায়েন্টিফিক হতে হবে' —মিত্তিরের এক কথা, কি খেলায়, কি জীবনে। 'অনাহারের ডেলিকেসিতে সৌন্দর্য নেই, বিজ্ঞানবুদ্ধিহীন হিলিমিলিতে লাবণ্য নেই'—তার বচন।

সেদিন আমার পুরনো স্কুলে বসে থাকার সময়ে বুঝলুম—মিত্তিরেরই যুগ চলেছে এখন। সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সবই আছে এখানে। পরীক্ষার ফলাফল, এবং ছাত্রের ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ক্লাস নাইন থেকে ছেলেদের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি করা হয়। কোন্‌টি ছেলের পছন্দ, সে বিষয়ে প্রশ্নাদি চলেছে।

—কলা না বিজ্ঞান—কী নেবে?

ছেলেটা বুক ফুলিয়ে উত্তর দিল—বিজ্ঞান বা কারিগরী। কলা কদাপি নয়। বাণিজ্যও চলেতে পারে।

ছেলেটা ক্লাস এইট থেকে উঠেছে, তবে অঙ্কে ফেল, পেয়েছে ১৩। তবু সে

নির্ঘাত বিজ্ঞান নেবে—সেও তাই চায়, তার বাবাও তাই চায়, গুষ্টিসুদ্ধর একই ইচ্ছে। বিজ্ঞান পড়ে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।

এই ছেলেটা যদি সত্যই বিজ্ঞান ম্যানেজ করতে পারে, তাহলে একটা ভালো চাকরি জোগাড় করবেই, তারপরে কালো বা সাদা বাজার থেকে টেস্ট-টিকিটও তার জুটবে, তারপর সে মাঠে গিয়ে কি চাইবে—কলা না বিজ্ঞান?

ক্রিকেটেরও চিরদিনের একটা প্রশ্ন—কলা না বিজ্ঞান! প্রশ্নটা আবার তুলেছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-প্রেমিক প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট মেঞ্জিস্। ক্রিকেট-ভারতী উইসডেনের শতবার্ষিকী সংখ্যায় তিনি লিখেছেন:

"কল্পনাশক্তিহীন নির্বাচক ছাড়া আর কারো কাছে রানসংখ্যার আকার কখনো বড় হয় না। সংখ্যার চেয়ে মানুষ বড়। আকারের চেয়ে বড় প্রকার। ইংলণ্ডে ভিক্টর ট্রাম্পারের ব্যাটিং-অ্যাভারেজ ছিল ৩৪·৫৭ (১৮৯৯), ৪৮·৪৯ (১৯০২), ৩৬·৫৪ (১৯০৫), ৩৩·৩৭ (১৯০৯)। ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্টম্যাচে তাঁর গড় রান ৩২·৭৯। তা সত্ত্বেও যাঁরা তাঁকে খেলতে দেখেছেন, তাঁরা আজও, এই দীর্ঘ ব্যবধানেও, বিনা আবেগে তাঁর কথা বলতে পারেন না —সে আবেগ তাঁর খেলার শিল্পসুষমার উদ্দেশ্যে নমস্কার ছাড়া আব কিছু নয়।"

স্যার রবার্ট, ক্রিকেট কলা না বিজ্ঞান, এই প্রশ্ন তুলেছেন, বলার চেয়ে বলা উচিত, এই প্রশ্নের অসন্দিগ্ধ উত্তর তিনি দিয়েছেন—ক্রিকেট বিজ্ঞান নয়, ক্রিকেট শিল্প। তাঁর চমৎকার রচনার আরও কিছু অংশ উদ্ধৃত করি:

"ক্রিকেট সম্বন্ধে একটা বড় কথা হল—এ-খেলা যতখানি বিজ্ঞান তার থেকেও বেশি শিল্প। যে বিজ্ঞান-নির্ভর ব্যাটসম্যান নিখুঁত মারে নির্দিষ্ট স্থানে বল পাঠান, তিনি দলের পক্ষে খুবই বড় সম্পদ। তিনি দলকে খেলা জিতিয়ে দেন। রেকর্ড-পাহাড়ের চূড়ায় তাঁর আসন। কিন্তু যদি-না তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে কলাকে যুক্ত করেন, যদি-না নৈপুণ্যের সঙ্গে হৃদয়বত্তাকে মেশান, তা-হলে তাঁর গৌরব ম্লান হয়ে যাবে অল্প দিনেই।

"মহান শিল্পী বাঁধা-পথে হাঁটেন না। কী একটা পেয়ে বসে তাঁকে। তাঁকে নতুন কিছু করতেই হবে, অপ্রত্যাশিতের অর্চনাই তাঁর ব্রত। অবশ্য সৃষ্টির যন্ত্রতত্ত্ব তিনি নিশ্চয় জানেন, কিন্তু যন্ত্র হবে তাঁর দাস, প্রভু নয়।

"যদি ট্রাম্পারের গড় রান এখনকার স্বাচ্ছল্যের মাপে মধ্যবিত্ত বলে মনে হয়—তা হয়েছিল তাঁর শিল্পী-স্বভাবের জন্যই। একই বলকে প্রতিবার একই ভাবে মারব? আরে ছি! কী ক্লান্তিকর! সুতরাং ট্রাম্পার নতুন-নতুন জায়গায়, যেখানে যায় না সেখানে, বল পাঠাতেন—সেইটাই তাঁর স্ফূর্তি।"

এই স্ফূর্তির সন্তানদের ক্ষমা করে না নীতিনিষ্ঠরা। নাচতে গেলেই পা পিছলে যায়, সুতরাং নেচো না। জলে মানুষ ডোবে, সুতরাং সাঁতার কেটো না। দৌড়লে হোঁচট খায়—সুতরাং আস্তে হাঁটো। হেসো না, হেসো না—হাসলেই হৃদ্‌রোগ।

আমার মনে পড়ছে—মুস্তাক খেলতে নামলেই এক ভারত-প্রেমিক চোখ বুজতেন। ঐ ঝড়ের মাতন তাঁর সহ্য হত না—তিনি জানতেন ঝড় হঠাৎ আসে এবং চলে যায়, তার থেকে জড়ের জীবন অনেক স্বস্তিকর। মুস্তাক দলকে

ডোবাতে এসেছে—আগুন ভালবাসে এমন দামাল ছেলে—এখনই পুড়ে মরবে —ওকে দরকার নেই—আমার কোল জোড়া করে থাকুক ন্যাদা ভোঁদার দল।

এই ভদ্রলোক তাঁর পার্শ্ববর্তী উৎসাহী ছোকরাটিকে বোঝালেন, মুস্তাকের খেলা মোটেই সায়েণ্টিফিক নয়, তাঁর অ্যাভারেজ ভালো নয়, তাঁর টেকনিকে দোষ আছে, এবং সে অসময়ে বেপরোয়া। কথা হচ্ছিল কলকাতায় গতবারকার ভারত এম-সি-সি টেস্টম্যাচের সময়ে। ছেলেটি শুনল, বুঝল এবং মানল। ব্যাট করতে নামলেন জয়সীমা, কুন্দরামের সঙ্গে। শুরুতেই বাউণ্ডারি। ভদ্রলোক শিউরে উঠলেন। আবার বাউণ্ডারি। ভদ্রলোক বিপর্যস্ত। আরও কয়েকটি বাউণ্ডারি হবার পর ভদ্রলোকের রাগ করবার ক্ষমতা পর্যন্ত চলে গেল—শুধু দুই চোখে নীল নীরব ঘৃণা ফুটে রইল।

এদিকে ছেলেটির অবস্থা ততোধিক শোচনীয়। এক একটা বাউণ্ডারি হয়, সে টগবগিয়ে ওঠে। তার পরেই পাশের ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে যায়। মুখ কাঁচুমাচু করে ক্ষমা চেয়ে নেয়। আবার বাউণ্ডারি হয়—ভুলে লাফায়—মনে পড়ে গেলেই বেদনার্ত হয়ে বসে পড়ে। ক্লাইম্যাক্স হল জয়সীমা ওভারবাউণ্ডারি করলে। বল যখন সত্যই ব্যাটের মার খেয়ে উড়তে-উড়তে উঁচু দিয়ে বেড়ার বাইরে চলে গেল—তখন ছেলেটি, ভদ্রলোককে হাত জোড় করে বলল—'স্যার, আর একটিবার অ্যালাউ করুন'—তারপরেই দুহাত তুলে নৃত্য করতে লাগল গ্যালারিতে।

যে-মারে ওভারবাউণ্ডারি হয়, তাতে সায়েন্স নিশ্চয় আছে, কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রিত করছে আর্টস—ওপন্ করতে নেমে ওভারবাউণ্ডারি করাব ইচ্ছায় মধ্যেই্ আছে আর্টস, কারণ ও ইচ্ছা সায়েণ্টিফিক নয়।

বিজ্ঞানে চড়ে চাঁদে যেতে হবে আর পাঁচ জনকে, কিন্তু কবিরা অনেকদিন আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। তাঁদের ডাকেই তো চাঁদে যাওয়ার ইচ্ছা জাগল মানুষের। শুধু কি তাই—শিল্পী দা ভিঞ্চি নাকি উড়বার যন্ত্রের নকশা পর্যন্ত তৈরী করে দিয়ে গেছেন। এবং—

হিন্দু কলেজের শিষ্ট ছাত্র ভূদেব বললেন, নিউটন বড় শেক্সপীয়রের থেকে। শুনে সেরা ছাত্র মধুসূদন গর্জন করে প্রতিবাদ করলেন—কখনই নয়, শেক্স-পীয়র অনেক বড় নিউটনের চেয়ে। তারপরে অঙ্কের ক্লাসে একটা অঙ্ক যখন কোনো ছাত্রই করতে পারল না, যখন 'ভাবী নিউটনের দল' নীরব হয়ে বসে রইল, তখন 'ভাবী শেক্সপীয়র' উঠে গিয়ে অঙ্কটি কষে দিয়ে সগর্বে জানাল—শেক্সপীয়র ইচ্ছে করলেই নিউটন হতে পারেন।

মধুসূদনের জীবনীকার এই তথ্য আমাদের দিয়েছেন। মধুসূদন সেই উন-বিংশ শতাব্দীর মনের সন্তান, যা লেগগ্লান্স আবিষ্কার করেছিল, লেটকাট ভালবাসত, ওভারবাউণ্ডারি ওড়াত, আঁকাবাঁকা মারের আবেশে এলোমেলো হয়ে থাকত সর্বক্ষণ।

আর এই বিংশ শতাব্দী—সকলেই বলেন, বিজ্ঞানের যুগ। ক্রিকেটেও।

উনবিংশ শতাব্দীর এক কবি আর এক কবির কথা লিখেছিলেন, যিনি রাজার কাছ থেকে পয়সা-কড়ির বদলে রাজকণ্ঠের মালা চেয়ে নিয়েছিলেন পুরস্কার-রূপে। কিন্তু 'মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো'—তার খোঁজ তিনি রাখেননি।

আর পড়ো-পড়ো নয়—শিল্পী-খেলোয়াড়দের মাথার উপরে বাড়ি পড়ে গেছে। দেউলিয়া রাজকণ্ঠের বিনা-ফুলের মালা পরে গ্যালারিতে বসে তাঁরা শুকনো মুখে টেস্টখেলা দেখেন—টেস্ট খেলে সায়েন্টিফিক ব্যাটসম্যানেরা।

কবিদের মমি করে বাঁচিয়ে রাখার সমস্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা এখন সম্পূর্ণ।

এখানে রমেন মিত্তির সম্বন্ধে কিছু সুবিচার করতে আমার ক্রিকেট আমাকে প্রণোদিত করছে। উনি মুখে যতই সায়েন্স করুন, খেলার সময়ে আর্টসের ভক্ত। হ্যাঁ, একথা পাঠকদের জানাতে পারি, মিত্তির-মহাশয় এখন চেপে গেলেও কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে বেশ ভালো ক্রিকেট খেলতেন। তাঁর খেলায় রক্ষণশীলতা কিছুমাত্র ছিল না, অথচ সুপটু শরীর ও প্রভূত দৃষ্টিশক্তির জোরে তিনি প্রচুর রান করতেন। নয়নরঞ্জন খেলোয়াড়রূপে তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু যদি বলতে গেছি—'তোমার খেলায় আর্ট আছে', মিত্তির তৎক্ষণাৎ বলেছেন—'বলো, সায়েন্স আছে—নেহাৎ তা যদি মুখে আটকে যায়, বলো স্টাইল আছে—সায়েন্স স্টাইলবিরোধী নয়।'

যাই হোক মিত্তিরপ্রসঙ্গ এখন ত্যাগ করা যেতে পারে, যেহেতু তিনি ছুটি ফুরিয়ে আসায় কলকাতা ছেড়ে গেলেন, এবং যাওয়ার আগে জানিয়ে গেলেন, দু' বছরেব মধ্যে আব ছুটি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, এখন ইমার্জেন্সী। আমি মনে-মনে এই প্রথম চীনাদের ধন্যবাদ না দিয়ে পারলুম না, যারা ইমার্জেন্সী-সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। মন যখন কিছু নিশ্চিন্ত হল—তখন ১৯৬৪ সালের কলকাতা টেস্টের দিকে চিন্তার মোড় ফিরল—যে টেস্টম্যাচে, অল্প আগেই বলেছি, জয়সীমা-কুন্দরাম বেহিসেবী ব্যাটিংয়ের দ্বারা জনৈক ভারত-প্রেমিক দর্শকের কাছে ঘৃণাস্পদ হয়েছিলেন।

অতঃপর সেই কলকাতার টেস্ট-কাহিনী।

* * * ভারত-ইংলণ্ড টেস্ট ম্যাচ * * *

১৯৬৪

বোধন গান

[শেষপর্যন্ত কমলাকান্ত শর্মাকেও ক্রিকেট-দর্শন করতে হল, এমনই যুগধর্ম। বৃদ্ধ শর্মাজীকে (হিন্দী এখন রাষ্ট্রভাষা, যা বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন) প্রসন্ন গোয়ালিনী দুগ্ধের বিনিময়ে একটি টেস্ট-সিজন টিকিটের জন্য তাগিদে-তাগিদে উত্ত্যক্ত করে তোলেন। অনুরোধ ক্রমে উৎপীড়নে উপনীত হওয়ায় বৃদ্ধ উপায়ান্তরহীন হয়ে অধিক ডোজে আফিমের শরণাপন্ন হন। তারপরে কি ঘটল তা স্বয়ং শ্রীকমলাকান্তের শ্রীমুখেই শোনা যাক—"ক্রিকেট-টেস্ট ম্যাচের টিকিট সংগ্রহে অসমর্থ কমলাকান্ত, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধবৃত্তান্ত জানিবার উদ্দেশ্যে যেমন সঞ্জয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, কমলাকান্ত তেমনি রেডিও-র (পাঠক লক্ষ্য করুন, কমলাকান্ত আফিমের কথাটা কেমন চেপে গেলেন) স্মরণ গ্রহণ করিল। রেডিও ও কমলাকান্তের মধ্যে এ-বিষয়ে যে-সংলাপ হইয়াছিল, তাহার সামান্য নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত হইল। কৌতূহলীগণ সম্যক জানিতে হইলে ডাকটিকিটযুক্ত পত্র লিখুন। পত্রের উত্তর না পাইলেও জানিবেন, ডাকটিকিটের

সদ্‌ব্যবহার হইয়াছে।"

প্রসন্ন গোয়ালিনী সিজন-টিকিটের পরিবর্তে এই ক্রিকেট-গীতা শ্রবণ করে নিষ্কাম কর্মে কতখানি উদ্দীপনা লাভ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ থাকলেও মহিলার যুদ্ধে উদ্দীপনা যে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই; দুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রে আক্রমণের লক্ষ্য বৃদ্ধ কমলাকান্তই। যাই হোক, আনন্দবাজার-কর্তৃপক্ষ অতিকষ্টে ঐ ক্রিকেট-গীতাটি সংগ্রহ করে (ডাকটিকিট বা অহিফেন, কার দ্বারা আমার জানা নেই) পত্রস্থ করেন। আমি সেটি পুনশ্চ চয়ন করে এনে টেস্ট-কথার সূচনায় গীতাপাঠের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, যাতে ক্রিকেট-কুরুক্ষেত্র-ধর্মক্ষেত্র দর্শনে সমর্থ বা অসমর্থ সকলের ভবিষ্যতে ক্রিকেট-লোকে সদ্‌গতি হয়।—লেখক]

শ্রীশ্রীক্রিকেট গীতা

কমলাকান্ত উবাচ

ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বর্গোদ্যানে সমবেতা
যুযুৎসবঃ
মামকা ইংরেজাশ্চৈব কিমকুর্বত
রেডিও।

রেডিও উবাচ

সুবিখ্যাতে স্বর্গোদ্যানে গ্যালারী
পরিবেষ্টিতে।
মোদন্তি ক্রিকেটবীরাঃ পাণ্ডবাঃ
সংগ্রামে যথা॥
নাদকর্ণী সুকৌশলী বলম্‌ দদাতি
চতুরম্‌।
জয়সীমা সুদুর্জয়ঃ পতৌদি
অধিনায়কঃ॥
দুরানী বোরদে সুর্তি দেশাই
চন্দ্রশেখরঃ
কুন্দরামো মঞ্জরেকার হনুমন্তো
মহাবীরঃ॥
অন্য পক্ষে উইলসনঃ কাউড্রে চ
পারফিটশ্চৈব বোলাসঃ।
ইত্যাকারাঃ মহাবীরাঃ
স্মিথোঽধিনায়কঃ॥
ব্যাটহস্তাবীরাঃ সর্বে মাপন্তি
ফিল্ড দৈর্ঘ্যং
শিষ্টাচারো মিষ্ট হাসি
আম্পায়ারদ্বয়মধ্যে॥

কমলাকান্ত উবাচ

ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বর্গোদ্যানে, কিনা ইডেনউদ্যানে, মদীয় ও ইংরাজ-বাহিনী সমবেত হইয়া কি করিল, হে রেডিও তাহা বিবৃত করো।

রেডিও উবাচ

গ্যালারি পরিবেষ্টিত সুবিখ্যাত স্বর্গোদ্যানে কিনা ইডেনউদ্যানে, পাণ্ডবগণ সংগ্রামে যেমন আনন্দ পায় তেমনি ক্রিকেটবীরগণ আনন্দ লাভ করিতেছে। সুকৌশলী নাদকর্ণী চতুরতাপূর্ণ বল দিতেছে। (ইহাদের) অধিনায়ক পতৌদি (আর দলে আছে) সুদুর্জয় জয়সীমা। দুরানী, বোরদে, সুর্তি, দেশাই, চন্দ্রশেখর, কুন্দরাম, মঞ্জরেকার, মহাবীর হনুমন্ত (প্রভৃতিও এই দলে আছে)। অন্য পক্ষে উইলসন, কাউড্রে, পারফিট, বোলাস এবং অধিনায়ক স্মিথ। মহাবীরগণ ব্যাটহস্তে ফিল্ডের দৈর্ঘ্য মাপিতেছে, আম্পায়ারদ্বয়ের মধ্যে শিষ্টাচার ও মিষ্ট হাসি (বিনিময় হইতেছে)।

কমলাকান্ত উবাচ

কথয় রেডিওগুণী কিং কুর্বন্তি
দর্শকাঃ।
বহুকীর্তি সমন্বিতাঃ কলিকাতায়া
দর্শকাঃ॥

কমলাকান্ত উবাচ

হে রেডিও-গুণী, দর্শকগণ কি করিতেছেন? কলিকাতার দর্শকগণ বহুকীর্তি সমন্বিত।

রেডিও উবাচ

নারঙ্গী বিস্কুটশ্চৈব চপঃ কাটলেট-
স্তথা।
খাদন্তি দর্শকাঃ সর্বে করতালি
সমন্বিতা॥
পতিতে উইকেটে কভু ধপধপায়ন্তে
গ্যালারী।
চটপটায়ন্তি হস্তাশ্ছুড়ন্তি
কমলালেবু॥
উপদেশং কমলাখোসাং নিক্ষিপন্তি
মাঠ মধ্যে।
শিবিরে অগ্নিদানঞ্চ কেহ কেহ
প্রচেষ্ট তে॥
ইতিমধ্যে কশ্চিৎ বীর ররাণ
সব্যাট হস্তঃ।
সহসা দর্শক মধ্যে মহাহুল্লোড়
জায়তে॥
পারফিটেন ঘাতং বলং যদা লুলুফে
দেশাই।
তদা যোহভবৎ কান্ড বর্ণনে
কোহপি ন সক্ষমঃ॥*

রেডিও উবাচ

করতালি দিতে-দিতে দর্শকগণ কমলালেবু, বিস্কুট তথা চপ কাটলেট ভক্ষণ করিতেছে। কখনো উইকেটপাত হইলে গ্যালারিতে ধপ-ধপ শব্দ করিতেছে, চটপট শব্দে করতালি দিতেছে, এবং কমলালেবু ছুড়িতেছে। মাঠের মধ্যে উপদেশ ও কমলালেবু নিক্ষেপ করিতেছে, কেহ কেহ শিবিরে অগ্নিদান করিতেছে। ইতিমধ্যে ব্যাটহস্ত কোন বীর রান করিলে দর্শকগণের মধ্যে মহা হুল্লোড় উঠিতেছে। পারফিটের প্রহৃত বল দেশাই লুফিলে এমন কান্ড ঘটিল যাহা কাহারো পক্ষে বর্ণনা করা সাধ্য নহে।

পূর্বকথন

অনতিপ্রাচীন ইতিহাস।

এম-সি-সি তাদের পতাকা নামিয়ে ইংলন্ডগামী হাওয়াই-জাহাজে চড়ে বসেছিল ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে। সেবার ডেক্সটারের এম-সি-সি একেবারে হেরে গিয়েছিল ভারতের কাছে। পাঁচটি টেস্টের দুটিতে পরাজয় এবং বাকি তিনটি ড্র। ইংলন্ডের কাছ থেকে প্রথম রাবার পেয়েছিল ভারত, ততোধিক পেয়েছিল সম্মান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। ভারতীয় ক্রিকেটের সাবালকত্ব সেদিন বহুকণ্ঠে ঘোষিত হয়, এবং নিন্দিত হয় ইংরেজী ক্রিকেটের বার্ধক্য—বিশেষত ইংরেজ-লেখকদের দ্বারা। 'আমরা গোটা দল পাঠাতে পারিনি'—এই অচল যুক্তিতে তাঁরা অনেকেই আস্থা হারিয়েছিলেন। সুস্থবুদ্ধি ইংরেজ-সমালোচক মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন, ভাঙা বা গোটা, যে-কোনো ইংলন্ড-দলের পক্ষেই ভারত যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই কথাটি সমসাময়িক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার ও অধিনায়ক রিচি বেনোডও দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানালেন:

"ডেক্সটার এম-সি-সি দল নিয়ে গিয়েছিলেন ভারত ও পাকিস্তানে। দূরে থেকে আমার মনে হয়েছে, তিনি অদ্ভুত কাজ করেছেন। ভারত ও পাকি-

* ভগবান পাণিনি ও কমলাকান্তের ব্যাকরণে কিছু-কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। যুগধর্ম ইহার কারণ। ভগবান পাণিনি এযুগে জন্মগ্রহণ করিলে প্রায় কমলাকান্তের মতোই লিখিতেন।

স্তানের ট্যুর সকল ট্যুরের মধ্যে কঠিনতম। অবশ্য অস্ট্রেলিয়া এখনো-পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে সংক্ষিপ্ত সফরই করেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে শীঘ্রই এইসব দেশে পুরো-মাত্রার সফর করতে হবে, তখন আমাদের খেলোয়াড়দের কিছু বেশি মাত্রায় জীবন্ত হতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। ডেক্সটারকে একটা 'দ্বিতীয় দল' মাত্র দেওয়া হয়েছিল; সে-দল ভারতের দ্বারা পরাভূত হয়, যদিও হারিয়ে দেয় পাকিস্তানকে।

"ডেক্সটারের হাতে যথার্থ সামর্থ্যসম্পন্ন বোলার অল্পই ছিল। গত কয়েক বছর ধরে ইংলন্ডের আক্রমণের মেরুদণ্ড বলে স্বীকৃত ট্রুম্যান ও স্ট্যাথাম সফরে যেতে অস্বীকার করেন। ডেক্সটারকে তার বদলে নাইট, হোয়াইট ও ব্রাউনকে দেওয়া হয় নতুন বল চালাতে। এমনকি নর্দাম্পটনের তরুণ ফাস্টবোলার লার্টারকে পর্যন্ত নেওয়া হয়নি (বিশেষ উত্তম উদ্দেশ্যেই বুঝতে পারছি)। ফলে স্পিনার লক ও অ্যালেনের উপর আক্রমণভার বহনের ঝক্কি পড়ল।

"ফাস্টবোলিংয়ের বদলে স্পিনবোলিং ভারতীয় ব্যাটসম্যানের বিশেষ পছন্দের বস্তু। তাঁরা ভাবলেন, তাঁদের সকলের শুভজন্মদিন একসঙ্গে হাজির। এর দু'বছর আগে ভারতে টেস্ট-সিরিজ জিততে অস্ট্রেলিয়া দলের প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল, যদিও ডেভিডসন, মেফিক, রোর্ক, লিন্ডওয়াল, ম্যাকে, ক্লাইন ও আমাকে নিয়ে সে-দলে ছিল পরিপূর্ণ টেস্ট-পর্যায়ের আক্রমণশক্তি। সুতরাং আমার পক্ষে বোঝা শক্ত, ইংরেজ-নির্বাচকেরা কি করে ভাবতে পারলেন যে, ডেক্সটার নতুন, অপরীক্ষিত বোলারদের নিয়ে কাজটা করে ফেলবেন! তবে যদি ঐ সফরকে উঠতি দ্রুতবেগীদের অনুশীলন ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে —পরবর্তী অস্ট্রেলিয়া-সফরের জন্য দ্রুত-জুটি আবিষ্কারের কাজে—সে বহুত আচ্ছা—কিন্তু সেক্ষেত্রে ডেক্সটারকে দোষী করা 'আচ্ছা'-ব্যাপার হবে কি, যেখানে এমন কি এম-সি-সি-র গোটা দল বিপাকে পড়তে পারে?" (রিচি বেনোড—'এ টেল অব টু টেস্টস্'।)

অন্যায় সমালোচনায় ডেক্সটার নিশ্চয় আহতবোধ করেছিলেন। তিন বছর পরে ১৯৬৩-৬৪ সালে যখন আবার ভারত-সফরের সময় এল, তখন তিনি 'পাত্র' হতে রাজি হলেন না—নিন্দার বা প্রশংসার। অর্থাৎ ডেক্সটার ভারত-সফরে গর-রাজি হলেন। বললেন, আমি এখন রাজনীতি ও চাকরি—উভয়ে জড়িত থাকব। ডেক্সটার অবশ্য মিথ্যে বলেননি। তিনি সত্যই রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন, রক্ষণশীল দলের পক্ষে। ডেক্সটারের ভারতীয় অনুরাগীরা, ডেক্সটার লিবার্যাল দলে যোগ দিলেই বেশি খুশি হত। ডেক্সটারের খেলায় তারা নিশ্চয় রক্ষণশীল আভিজাত্য দেখেছিল, কিন্তু ততোধিক দেখেছিল উদারনৈতিক মহত্ত্ব। ডেক্সটার ভিন্নমত হয়ে বিলেতী রাজনীতির রক্তহীন উদারনৈতিকতা অপেক্ষা রক্ষণশীল দার্ঢ্যকেই বরণ করলেন। যাই হোক, টেড ডেক্সটার যখন রাজি হলেন না, তখন দৃষ্টি গিয়ে পড়ল কলিন কাউড্রের উপর। কাউড্রে ব্যক্তিত্বে ও আচরণে স্থায়ী সহ-অধিনায়ক। তিনি দৃঢ়পদে সিংহাসনের পাশে হাজির হতে পারেন, সিংহাসনের পাশে তাঁকে সুন্দর মানিয়ে যায়, কিন্তু সিংহাসন অধিকার তিনি করতে পারেন না। ভারতের ব্যাপারে অবশ্য কাউড্রের প্রবীণতাকে মর্যাদা দেবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হল, কিন্তু হায়, কাউড্রের হাতে প্লাস্টার করা।

অগত্যা দৃষ্টি পড়ল মাইক স্মিথের উপরে। কাউণ্টিতে প্রচুর রান করেন, যাকে বলা যায় গলগলিয়ে রান, কিন্তু দর্শকরা বোর্ডে তাঁর রানসংখ্যা দেখে নিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করেন। তার বেশি মর্যাদা তাঁকে দেওয়া হয় না। মাইক স্মিথ টেস্টে জায়গা পান, আবার তাঁকে সরিয়েও দেওয়া হয়। অনতিউজ্জ্বল উত্তম সংসারী লোক তিনি। চশমা-পরা বিচক্ষণ ব্যক্তি। কাঁচের মধ্য দিয়ে জগৎকে দেখেন। যদিও খুব কম দেখেন না। তাঁকেই অধিনায়ক নির্বাচন করা হল।

ফল এই : শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ডেক্সটার দলে নেই, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কাউড্রে আহত, ফাস্টবোলার স্ট্যাথামের পড়তি ফর্ম, অবশিষ্ট ট্রুম্যান, যদিও অপরাহ্নে তবু তাঁর হাতের জোর বা গায়ের জোরের অভাব পুরিয়ে দিতে পারেন মুখের ও মনের জোরে, তিনিও কিন্তু তাঁর শেষ শক্তি জমিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত করলেন অস্ট্রেলিয়ানদের শেষ কামড় দেবার জন্য। তিনি বুঝেছিলেন, ভারতের মাটিতে (এবং নীতিতে) সজোরে বল-প্রয়োগের সমর্থন নেই। যদি দ্রুত বলে উপদ্রুত করে তুলতে না পারলুম, ট্রুম্যান ভাবলেন, তাহলে শুধু ভারতের সিনারি দেখবার ইচ্ছে নেই আমার। ট্রুম্যান ভাবতে পারেন, একদিন 'ভারত-ত্রাস' উপাধি পেয়েছিলুম আমি, আজ নখদন্তহীন হয়ে তাদের সামনে লম্ফ-ঝম্ফ দিয়ে 'ভারত-হাস' হতে পারব না। সুতরাং 'জন্মভূমি, স্বর্গাদপি গরীয়সী', যেখানে ধোঁয়া-কুয়াশার ধাক্কা খেয়ে এখনো আমার বল শূন্যে চমকে ওঠে—ট্রুম্যানের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।

মাইক স্মিথের এম-সি-সি অন্তত একটি প্রতিজ্ঞা নিয়ে ভারতে উপস্থিত হয়েছিল—আমরা না-হারতে চেষ্টা করব। ডেক্সটার জিততে চেষ্টা করেছিলেন; ফলে জয় তিনি পেতে পারতেন, কিংবা পরাজয়—পরাজয়ই পেলেন। মাইক স্মিথ না-হারতে চেষ্টিত হলেন। তিনি সফল হলেন। মাদ্রাজে প্রথম টেস্ট ড্র হল, বোম্বায়ে দ্বিতীয় টেস্টও তাই। তৃতীয় টেস্ট কলকাতায়। সকলে আশা করল, দুই দলের তৃতীয় মিলনে কলকাতা-টেস্ট হয়ত ফলবতী হবে।

ভারতপক্ষে সুখস্মৃতিসহ শুরু হয়েছিল মাদ্রাজ-টেস্ট। দু' বছর আগে এখানেই এম-সি-সিকে হারিয়ে ভারতের বিজয়োৎসব সম্পন্ন হয়েছে। সেবার ছিল শেষ টেস্ট, এবার প্রথম। সেবারবার শেষের চেহারা এবার শুরুতেই দেখার প্রত্যাশা নিয়ে হাজার-হাজার দর্শক হাজির হল কর্পোরেশন-স্টেডিয়ামে। প্রথমদিনের শেষে সেইসকল দেশপ্রেমী দর্শকেরা গৃহমুখী হল সানন্দে, একটি সুন্দর সার্থকতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে। ভারত প্রথমদিনের শেষে করেছে দু' উইকেটে ২৭৭ রান; তার মধ্যে বি কে কুন্দরাম অপরাজিত আছেন ১৭০ রান করে, সরদেশাই পরাভবের পূর্বে সংগ্রহ করেছেন ৬৫, মঞ্জরেকরের রান মাত্র ২০ কিন্তু তিনি কুন্দরামের মতোই নটআউট।

প্রথম টেস্টের প্রথমদিনটিকে লুঠে নিয়েছিলেন কুন্দরাম। ললাট এবং ক্রিকেট যে সমার্থক, কুন্দরামের এই খেলা তার প্রমাণ। কুন্দরাম প্রথমে দলে ছিলেন না, কিংবা দলের পিছনে ছিলেন অতিরিক্ত উইকেট-কীপাররূপে। নির্বাচিত উইকেট-কীপার ইঞ্জিনীয়ারের আঙুলে আঘাত লাগল ম্যাচের আগে; তাঁর আঙুল ফুলল, কিন্তু কলাগাছ হলেন কুন্দরাম। নূতন উইকেট-কীপার কুন্দ-রাম ভারতের পক্ষে ইনিংস শুরু করতে মাঠে নামলেন, (পাতৌদি টসে জিতে-

ছিলেন), দিনশেষে মাঠ থেকে ফিরলেন—পরদিন আবার শুরু করার অধিকার নিয়ে।

কুন্দরামের এই একটি ইনিংস তাঁর এবং ফারুক ইঞ্জিনীয়ারের কাছে সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য নিয়ে হাজির হয়েছিল। কুন্দরামের এই ইনিংসের ফলেই পাঁচটি টেস্ট থেকে বাদ হয়ে গিয়েছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। কুন্দরামের মধ্যে ভারত এমন একজন উইকেট-কীপার পেল, যাঁর মধ্যে উইকেট-রক্ষায় নৈপুণ্যের যদি কিছু ন্যূনতা থাকে, অন্যক্ষেত্রে সম্পন্নতা আছে—তিনি ভারতের ওপেনিং সমস্যার অনেকখানি সুরাহা করেছিলেন—শুধু তাই নয়, আক্রমণশীল ওপেনার-রূপে দলের ব্যাটিংয়ে দিলেন উদ্দীপ্ত চারিত্র। কুন্দরাম তাঁর প্রথমদিনের ব্যাটিংয়ের দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন, যাতে যদি ফারুক ইঞ্জিনীয়ারকে দলে স্থান দিতে হয়, 'ব্যাটসম্যান' কুন্দরামকে বজায় রেখেই তা করতে হবে।

ভেরীধ্বনি করে সেনাপতির মতোই কুন্দরামের প্রবেশ। প্রথমদিনে তাঁর ঐ ১৭০ রান কেবল পরিমাণের দিক থেকে বৃহৎ নয়, সময়ের হিসাবে রীতিমত 'দ্রুত'ও বটে। 'দ্রুত'—৩৩৯ মিনিটে ১৭০ রান? নিশ্চয় নয়, অসামান্য কিছু নয় রেকর্ডত, কিন্তু অসাধারণ যে ভারতীয় উইকেট! ধীরতায়, সহিষ্ণুতায়, প্রাণহীনতায় তা খাঁটি ভারতীয় মৃত্তিকা। সে মাটিতে বল পড়ে ঠাণ্ডা মেরে যায়, ফলে মার খেলেও ধুঁকতে-ধুঁকতে ছোটে। এই বেগ-ভীত পিচে কুন্দরাম ভরপুর ছিলেন অসচ্চরিত্র কামনার মাদকতায়। স্খলন-পতনের মধ্য দিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন; অন্তত চার বার বিদায়যোগ্য অপরাধ তিনি করেছিলেন; কিন্তু বিমুগ্ধ ইংরাজ খেলোয়াড়গণ এই মহাভারতীয় অন্যায়কে অব্যাহতি দিয়েছিলেন 'তেজীয়সাং ন দোষায়' বলে। কিংবা বলা উচিত, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা অন্যায় সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেমন, কুন্দরামের যখন ৭৫ রান, তখন লার্টারের শর্টপিচকে এমন হুক করলেন, যাকে ডিপ-ফাইন লেগের মতো দূরাবস্থানে থেকেও বোলাস হাতে ধরে রাখতে পারলেন না। এমনকি সেই উত্তপ্ত বস্তুটিতে হাত বাড়াবার দুঃসাহসের জন্য যন্ত্রণায় হাত নাড়তে-নাড়তে তাঁকে মাঠ ত্যাগ করতে হল তখনি।

অধিনায়ক পাতৌদি শূন্য রান করা সত্ত্বেও একটি ব্যাপারে ভারতকে ধন্য করেছিলেন—টসে জিতেছিলেন। ইংলণ্ডের অধিনায়ক মাইক স্মিথ পাতৌদির নামে ৫০ রান লিখে দিতে নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিলেন, যদি পাতৌদি তাঁর সঙ্গে টসের ভাগ্য বদল করতে রাজি হতেন। প্রায় দুদিন মাঠ চাষ করার পরে মাইক স্মিথের শুধু কাঁদতে বাকি ছিল, যখন দেখলেন, তাঁদের পরিশ্রমে ভারতেব রানের গোলা ভরে উঠেছে। দ্বিতীয় দিন চায়ের সময়ে পাতৌদি যখন ভারতেব ইনিংস ছেড়ে ছিলেন, ভারত তখন সাত উইকেটে ৪৫৭ রান করেছে—তার মধ্যে মধ্যে কুন্দরাম ডবল সেঞ্চুরি করতে পারেননি, কিন্তু অনেকগুলি রেকর্ডসহ করেছেন ১৯২ রান*, মঞ্জরেকরও সেঞ্চুরি করতে ছাড়েননি (১০৮), জয়-

---

* কুন্দরামের রেকর্ড : (১) প্রথম ভারতীয় উইকেটকীপার, যিনি টেস্টে সেঞ্চুরি করলেন; (২) সরদেশাইয়ের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় উইকেটে ১৪৩ রানের রেকর্ড; পূর্বের রেকর্ড ছিল জয়সীমা-মঞ্জরেকরের ১৩১ রান, ১৯৬০-৬১ সিরিজে

সীমা অর্ধশত পেরিয়েছিলেন (৫১), যাঁর চঞ্চল অর্ধশত মঞ্জরেকরের বৃন্দ শত রানের তুলনায় যথেষ্ট মনোহারী। শুধু তাই নয়, ব্যাটিং-ক্লান্ত ভারত অনেকগুলি চান্স ছেড়ে দিয়েও ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের দুটি উইকেট নিয়ে নিয়েছিল দ্বিতীয় দিনের খেলা-শেষের পূর্বে। ইংলণ্ড তার উত্তম ফিল্ডিং, টিটমাসের উৎকৃষ্ট বোলিং (৫০-১৪-১১৬-৫) সত্ত্বেও দ্বিতীয় দিনের শেষে ফলো-অন ভাবনার কৃষ্ণচ্ছায়ার মধ্য দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেল।

কিন্তু ইংলণ্ড-দলে ব্যারিংটন নামক একজন খেলোয়াড় ছিলেন। বাঁধিয়ে রাখার চরিত্র। বাইরের ভাবভঙ্গির সঙ্গে আসল কাজের এত তফাত কদাচিৎ দেখা যায়। লোকটি বড় আমুদে, দর্শক তাই দেখে। মাঠে দাঁড়িয়ে তিনি গ্যালারিতে খেলেন। দর্শকরাও যে, খেলা-ব্যাপারটার অন্তর্গত, তা তাঁর আচরণে বোঝা যায়। তিনি যে কাঠের বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে নেই, বেঞ্চের উপরে যে, কিছু প্রাণসম্পন্ন জীব বসে আছে, তা ব্যারিংটন স্বীকার করেন বলে দর্শকেরা তাঁকে ভালবাসে। দর্শক নিশ্চয় টাকা জোগাবার গৃহস্বামী, তবু তাঁরা 'স্বামিন্ !'—এই সম্বোধনেরও প্রত্যাশী। তাঁরা খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সখ্য ও ললিতকলায় নৈপুণ্য আশা করেন। ব্যারিংটন অঙ্গভঙ্গি ও রঙ্গে দর্শকের সে বাসনার সম্মান দান করেন। প্রথম টেস্টের দুদিনের মধ্যে দর্শক তার কিছু পরিচয় পেয়েছে। প্রথমদিন মাঠে ঘুড়ি উড়ে এসেছিল। সেই 'ভো—ও—ও—কাটা' ঘুড়িটি ধরতে মাঠে ঢুকে-পড়া নগরিয়া ছাওয়ালদের সঙ্গে ব্যারিংটনও মাঠে ছুটেছিলেন, এবং এই আন্তর্জাতিক ছাওয়াল অন্য ছাওয়ালদের হারিয়ে, সেই ঘুড়িটি ধরে, মাঠের ঠাকুরমা আম্পায়ারের কাছে জমা রেখেছিলেন। আর একবার তিনি বলের ঘুড়িও ধরেছিলেন। সেটা দ্বিতীয় দিনের ব্যাপার। চায়ের আধঘণ্টা আগে জয়সীমা ইংলণ্ডের বোলিংকে পরমানন্দে কাটাছেঁড়া করে মাংস খাচ্ছেন, চল্লিশ পেরিয়েছেন, এখন ৪২, তাড়াতাড়ি পঞ্চাশে পৌঁছানো দরকার, কখন পাতৌদি ডিক্লেয়ার করে দেন ঠিক নেই। জয়সীমা মর্টিমোরের বলকে মিড-উইকেটের উপর দিয়ে শূন্যে চালিয়ে দিলেন—ওড়া-পথে তাড়াতাড়ি লক্ষ্যে পৌঁছতে। বল উড়তেই দর্শকেরা হো-হো করে দাঁড়িয়ে উঠল—'মেঘদূত'কে দর্শনের জন্য গ্রামবনিতার সস্পৃহ কৌতূহল নিয়ে। কিন্তু ওকি—কী সর্বনাশ! ভাসন্ত বলটি যে ভারাতুর হয়ে নেমে আসছে—আর তাকে ধারণ করতে ছুটছেন ভোলা (এখন দিব্যি চালাক) রানেশ্বর ব্যারিংটন। অ্যাঁঃ—বলটি ধরে ফেললে—কী অন্যায়!—আরে না না, ধরেছে বটে, তবে লাইনের বাইরে থেকে। আউট নয়, আউট নয়! হাঃ! হাঃ!—অট্টহাস্য করে সবাই বসে পড়ল, আর বলটিকে রাগে দুঃখে মাটিতে আছড়ে ফেলে কাঁদতে বসলেন ব্যারিংটন।

তারপরে ব্যারিংটন সারাদিন কাঁদালেন দর্শকদের। প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিন। দর্শকের কাছে নিরম্বু একাদশী। তাদের সারাদিন চোখ চেয়ে দেখতে হল সাধক ব্যারিংটনের তপঃক্লিষ্ট কৃচ্ছ্রসাধনা। ব্যারিংটন দেখালেন, মুখের হাসি ও খেলার হাসি, এক জিনিস নয়। দর্শকের হাসি-কাড়া সেই খেলা খেলতে-

বোম্বাইয়ে; (৩) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতপক্ষে সর্বোচ্চ রান; পূর্বের সর্বোচ্চ মঞ্জরেকরের ১৮৯, ১৯৬০-৬১ সিরিজে দিল্লীতে।

খেলতে, দর্শকের রাগারাগি দেখে, ব্যারিংটন হেসে ফেলেছিলেন। লঘুচিত্ত দর্শক বলল, তোমার ঐ হাসি বাঁধানো দাঁতের, ও-হাসি থামাও। সমালোচকেরা হয়ত অতখানি রূঢ় হতে পারলেন না। কিন্তু তাঁরাও অনুভব করলেন ব্যারিংটনের হাস্যোজ্জ্বল দাঁতের তলায় যে চোয়াল, তা কঠিন—রীতিমত কঠিন।

তৃতীয় দিনের তিন চতুর্থাংশ সময় ব্যারিংটন মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর রান ৬৪, নটআউট। পূর্বদিন যে-বোলাস ইনিংস সূচনা করেছিলেন তিনিও পরের দিনের প্রায় সমাপ্তি পর্যন্ত বজায় থেকে ৮৮ রান করলেন। ইংলন্ড সারাদিনে, ৩৩০ মিনিটে, করল ১৭২ রান, যার মাত্র দু রান কম করেছিলেন একা কুন্দরাম, ভারতের পক্ষে, প্রথম দিনে। ব্যারিংটন ও বোলাস চোখে ঠুলি, কানে তুলো এবং ব্যাটে কুলো বেঁধে সারাদিন খেলে গেলেন।

সমালোচকেরা মুগ্ধভাবে বলেছেন, ব্যারিংটন অপূর্ব না-খেলেছিলেন, মহান দায়িত্বে। তিনি এবং বোলাস, এম-সি-সি-কে নিয়ে লাইফবোটে ভাসছিলেন; কয়েক বোতল জল সম্বল, অথচ তট বহুদূর। তৃষ্ণায় আকণ্ঠ হয়েও (দর্শকদের ও ফিল্ডারদের আকণ্ঠতৃষ্ণ করে) তাঁরা একবারে এক ঢোকের বেশি জল খাননি, অধিকাংশ সময়ে শুধু ঢোক গিলেছেন।

বোলাস ও ব্যারিংটন যখন ব্যারিকেড রচনা করে ভারতীয় আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন সে বেষ্টনীভঙ্গে অসমর্থ নাদকার্নি যথালাভ বলে মেডেন সংগ্রহ করে যাচ্ছিলেন। নাদকার্নির সে সংগ্রহ, এখানে সগৌরবে উল্লেখযোগ্য, ইতিহাসে অনন্য। 'অসম্ভব! অবিশ্বাস্য!—সকলে চলতে বাধ্য হল, যখন দেখা গেল, নাদকার্নি ক্রমান্বয়ে ২১ ওভার (!!!) মেডেন পেলেন। লাঞ্চের আগে নাদকার্নি পর-পর তিন ওভার মেডেন দিয়েছিলেন—লাঞ্চের পরে একাদিক্রমে ১৮ ওভার বিনা রানে বোলিং। সারাদিনে তাঁর বোলিং হিসাব—২৯—২৬—৩—০। তার মানে নাদকার্নি যে তিন ওভারে রান দিয়েছিলেন, তখন প্রতি ওভারে এক রানের বেশি দেননি।

নাদকার্নির এই পর-পর ২১ ওভার মেডেন বিশ্বরেকর্ড। পূর্ব রেকর্ড ছিল সমারসেটের এইচ· হ্যাজেলের; তিনি গ্লস্টার্সশায়ারের বিরুদ্ধে ১৯৪৯ সালে একটানা ১৮ ওভার মেডেন দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, হ্যাজেলের রেকর্ড কাউন্টি-খেলায়, নাদকার্নির টেস্টে।

নাদকার্নির কৃতিত্ব অসামান্য। ইংলন্ড যত শ্লথভাবেই হোক ১৭২ রান করেছে। কিন্তু সে সমস্ত রানই কার্যত অপর প্রান্ত থেকে হয়েছে, যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক প্রান্তে নাদকার্নি বল করে গেছেন।

নাদকার্নির বোলিং সম্বন্ধে বলা হয়, এক ইঞ্চির হেরফের হয় না তাতে। এইদিন 'ইঞ্চি' শব্দ বদলে দিতে হবে। এইদিন তাঁর লেংথে এক 'চুলের'ও তফাত হয়নি। নাদকার্নির পেণ্ডুলামরূপী বোলিং-হস্তটিকে স্বর্গীয় সুইজারল্যাণ্ডের সবচেয়ে বৃদ্ধ আর দক্ষ কারিগর নিশ্চয় নির্মাণ করেছেন।

নাদকার্নি-সহ ভারতীয় বোলাররা ইংলণ্ডের ব্যাটিংয়ে কি জাতীয় পক্ষাঘাত এনেছিলেন, তাঁর নমুনা উদ্ধৃত করছি :

"সাধারণ দর্শক-আসন থেকে উত্থিত ড্রাম, বিউগল ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে—দর্শকদের সরব আপত্তির ভিতর দিয়ে—ব্যারিংটন ও বোলাস আবেগহীন,

সুবিবেচনাযুক্ত সোজা ব্যাটের সাহায্যে পথ করে চললেন লাঞ্চের পরবর্তী সময়ে। সতর্ক দর্শনে ও শুধু ব্যাটের সম্মুখব্যাদানে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকলেন, ফলে শম দম তিতিক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ নিষ্ক্রিয়তার চেহারা দেখা গেল। বোরদে, নাদকার্নি, কৃপাল সিং, নিজেদের মধ্যে ন'টি মেডেন ওভার ভাগাভাগি করে নিলেন। লাঞ্চের আগের দু' ওভারও মেডেন গিয়েছিল। এই একঘেয়েমি ভঙ্গ হল, যখন বোলাস বোরদেকে মিড-উইকেটে ঘুরিয়ে এক রান নিলেন।"

এ—ক রান, এগারো ওভার পরে! ভর দুপুরে! যখন হুড়মুড় করে রান হয়! এটা কি ক্রিকেট! উইকেটে কি ভাঙন ছিল? বলে কি পাক ধরেছিল? ইংলন্ড কি শেষ ইনিংস খেলছিল পঞ্চম দিনের শেষে? নহে। তাহলে এই নিশ্ছিদ্র নৈরানতার (আমার আধুনিক বাংলা পাঠক ক্ষমা করুন) কারণ কি? কেন নাদকার্নি-বোরদের দুপুরে ছোঁড়া বলকে 'ভরদুপুরে ভূতে মারে ঢেলা' বলে ভয় পেয়েছিলেন বোলাস ও ব্যারিংটন?

কারণ ছিল। ইংলন্ডের ঘরে চারটি রোগা ছেলে। স্টুয়ার্ট, পার্কস্, নাইট ও টিটমাসের গা-ম্যাজম্যাজ, সর্দি-সর্দি ভাব। তাই কাতর দুই কেরানীবাবার মতো বোলাস ও ব্যারিংটন মাঠে ব্যাটের কলম পিষে গেছেন সাহেবদের (ভারতীয়রা এখানে সাহেব, ইতি 'উলট পুরাণ') লাথি ঝাঁটা খেয়েও, এমন কিছু আত্মমর্যাদা দেখাতে চাননি, যাতে বরখাস্ত করে দিতে পারে। তাঁরা চেয়েছিলেন, ঠুকঠাক করে কোনোক্রমে দিনটি কাটিয়ে দেওয়া যাক, যাতে ক্রমে রান বেড়ে ফলো-অনের সম্ভাবনা দূর হয়, এবং, প্যাভিলিয়নে অসুস্থ বাছারা সামলে ওঠে, বিশেষত পরদিন যখন বিশ্রাম দিবস। বোলাস-ব্যারিংটন তাঁদের সেই খুঁটে-খুঁটে রান খেয়ে কোনোক্রমে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় সফল হয়েছিলেন।

বোলাস-ব্যারিংটনের দীনতায় যখন ইংলন্ড ফলো-অনের হীনতা থেকে অব্যাহতি পেল, যখন ড্র-এর উপকূল চোখের সামনে দেখা গেল, তখন বিশ্রাম দিবসের নৈশআহার-শেষে ইংরেজ-খেলোয়াড়রা কিছু রসালাপ করলেন। মাদ্রাজ ক্রিকেট-অ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত ভোজসভায় ভোজনান্ত ভাষণে ইংলন্ডের মাইক স্মিথ ভারতে ক্রিকেট-উৎসাহে আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের এখানে সমস্যা পঞ্চাশ হাজার লোককে কি করে পঁয়ত্রিশ হাজারী স্টেডিয়ামে ঢোকানো যায়, কিন্তু সুখের বিষয় আমাদের দেশে সে সমস্যাই নেই। আমাদের অনেক খেলাতেই এই ভোজসভায় সমবেত ব্যক্তিদের সংখ্যার লোক হাজির হয়।' মাদ্রাজী দর্শকদের ক্রীড়াবোধ ও ক্রীড়াউৎসাহের প্রশংসা করে, তাদের আচরণে কেবল একটি ক্ষেত্রে বিস্ময়ের কারণ ঘটেছে বলে শ্রীযুক্ত স্মিথ জানালেন।—'মঞ্জরেকর যখন সেঞ্চুরি করলেন, তখন কৃপাল সিংকে মালা পরানো হল কেন—যাঁর রান তখন শূন্য!'

এই রসিকতার দ্বারা, আমাদের স্বীকার করতে হবে, ইংলণ্ডের অধিনায়ক ভারতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের অভাব দেখিয়েছেন। ভারতীয় মেয়েরা কোনো গুরুজনকে প্রণাম করতে গেলে, সেখানে উপস্থিত সকল বয়োজ্যেষ্ঠকেই টানা প্রণাম করে যায়। অল্প পূর্বে প্রণামপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অনেক সময়ে এই রীতির জন্য রিপিট প্রণাম পান। সুতরাং যদি ভক্তি ও ভালবাসায় সেঞ্চুরিকার

মঞ্জরেকারকে মালা পরানো হয়, তাঁর সঙ্গী কৃপাল সিংকে পরানো হবে না, তা হয় না, কারণ ভক্তি স্বভাবে নারী, পুরুষের ভক্তি হলেও।

তাছাড়া এর সঙ্গে আরও একটু কথা আছে। সেঞ্চুরি করেও মঞ্জরেকর মালা না পেতে পারেন, কিন্তু কৃপাল সিং পেতে বাধ্য। মালাগুলো আসলে কৃপাল সিং-এর জন্যই এসেছিল। খেলাটা হচ্ছিল মাদ্রাজে, আর, কৃপাল সিং স্থানীয় বীর। উৎসাহীরা কৃপাল সিং-এর সঙ্গেই 'স্বয়ম্বর'।

ভোজসভায় মাইক স্মিথের ভাষণের উত্তর দিতে গিয়ে ভারতের অধিনায়ক পাতৌদি সহাস্যে সাবধান করে দিলেন তাঁকে।—ভারতীয় বরমাল্যের উপর বেশি আস্থা রাখবেন না যেন। পূর্বে একদা ব্যারিংটন সেঞ্চুরি করে মালা পেয়েছিলেন। প্রথম সেঞ্চুরিতে তিনি 'বর', ভারতীয় দর্শকের কাছে, কিন্তু যখন ঐ সেঞ্চুরির উপর আর একটি সেঞ্চুরি চাপালেন, তখন হয়ে গেলেন 'বর্বর' —ডবল সেঞ্চুরিতে দুটো তো দূরের কথা, একটা মালাও জুটল না তাঁর।

এই সমস্ত হাস্য-পরিহাস যখন চলছিল, তখন সকলেই মনে-মনে অনুভব করেছিলেন, খেলাটি মরে গেছে ভিতরে-ভিতরে। তবু চতুর্থ দিনে ক্রিকেটের অনিশ্চয়তা মাঠে অবতীর্ণ হয়ে খেলাটিকে কিছুটা জীবন্ত রাখল। ইংলন্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হল ৩১৭ রানে। ৮০ রানে ব্যারিংটন আউট হবার পরে বোরদে ও দুরানীর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য দেখাবার মতো কেউ ছিল না ইংলন্ড দলে। মাঠে কিছুটা ধূলিময় রহস্য এসেছে; বোরদে ও দুরানী তারই সুযোগে নানা ভাবনায় ছিন্নমতি করে তুললেন ইংরেজ-ক্রিকেটারদের। বিশেষত বোরদে—তাঁর আঁচড়ানো চুলে, ওড়ানো বলে, চঞ্চল দংশনে ছিলেন অনবদ্য। তাঁর হাতে লেখা সাংকেতিক প্রশ্নগুলির কোনো উত্তর জানা ছিল না ইংরেজদের। ৬৭·৪—৩০—৮৮—৫— উত্তম অ্যাভারেজ—কিন্তু এর থেকে অনেক ভালো বল করেছিলেন বোরদে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতও কাতর হল। টিটমাস মর্টিমোর বেগ দিলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের। রান-আউটের গাড়িচাপাও পড়লেন দুজন খেলোয়াড়। দিনশেষে ভারতের হল ৬ উইকেটে ১১৬ রান।

তার মানে, একদিন সময় বাকি আছে, চার উইকেট হাতে নিয়ে ভারত এগিয়ে আছে ২৫৬ রানে। ভারত দ্রুত পড়ে যাক, বা দান ছেড়ে দিক, শেষ দিনের স্পিন-ধরা উইকেটে ইংলন্ডকে ফেলে মারতে সে পারবে।

শেষ দিন ৯ উইকেটে ১৫২ রান করে ডিক্লেয়ার করল ভারত। ২৯৩ রানে এগিয়ে সে, সময় বাকি ২৭০ মিনিট। ইংলন্ড কি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে?

চ্যালেঞ্জ গ্রহণের শক্তি ইংলন্ডের ছিল না। মাইক স্মিথ দ্রুতগতিতে শুরু করে-ছিলেন, কিন্তু তাঁর বিদায়ের পরে অগতির গতিতে খেলা চলে যখন শেষ হল, তখন ইংলন্ড করেছে পাঁচ উইকেটে ২৪১।

ভারত ও ইংলন্ডের প্রথম টেস্ট অমীমাংসিত।

পাতৌদি আবার চ্যালেঞ্জ করলেন ইংলন্ডকে। সর্বশেষের সে কথায় শেষে আসা যাবে, তার পূর্বেকার অকার্ষণীয় যে খেলা—

বোম্বাইয়ে দ্বিতীয় টেস্টের প্রাক্কালে সংবাদপত্রে বড়োআকারের শিরোনামায় ইংলন্ডের ব্যাধিমন্দির-কথা প্রাধান্য পেল। অসুস্থতার জন্য জন এডরিচ, মর্টি-

মোর, শার্প—বাতিল তালিকায়—কিন্তু সর্বনাশা অনুপস্থিতি ব্যারিংটনের। ব্যারিংটন, ভারতে যিনি এবারকার প্রথম টেস্ট বাঁচিয়েছেন ইংলণ্ডের পক্ষে, যিনি ভারতের বাইরে একই ধরনের দেশসেবা করেছেন অনেকবার, যাঁকে ব্যাট হাতে মাঠে নামতে দেখলে নাকি অধিনায়কের চেয়ারে বসার আরাম বেড়ে যায়—সেই ব্যারিংটন আমেদাবাদে খেলার সময়ে আঙুল ভেঙে অনাকাঙ্ক্ষিত বিশ্রামের অবসর নিয়েছেন। ফল দাঁড়াল, ইংলণ্ডদলে মাত্র এক ডজন গোরা-যোদ্ধা অবশিষ্ট আছে—ভারতীয় সিপাহীদের বিরুদ্ধে।

তবে এটা ক্রিকেট, ব্যাটে বলে অনুরাগের লড়াই; তাই যখন খেলার সময়ে ইংলণ্ডের ঐ দ্বাদশ জনও অটুট রইল না, তখন ভারতীয় অধিনায়ক পাতৌদি কৃপাল সিং-কে ধার দিলেন ইংলণ্ডকে। কৃপাল সিং দারুণ ফিল্ডিং করলেন ইংলণ্ডের পক্ষে। পিতামহ ভীষ্ম নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দিয়েছিলেন। ভীষ্ম-মহত্ত্বের একটি আলোকরেখা পাতৌদির শিরশ্চুম্বন করল—সকলে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল।

দুই অধিনায়ক ২১শে জানুয়ারি, ১৯৬৪, প্রভাতকালে টস করতে মধ্যমাঠে এগিয়ে গেলেন, চোখে দূরবীন লাগিয়ে সাংবাদিকরা লক্ষ্য করতে লাগলেন মুদ্রা-ভাগ্য। আঙুলে টোকা খেয়ে স্ফূর্তিসে ঘুরপাক খেতে-খেতে মুদ্রাটি উপরে উঠল, তারপর নেমে এল নীচে; মাইক স্মিথ সেটিকে নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিলেন তারপর যখন সোজা হলেন—

ব্যথিত স্নেহে জনৈক লেখক বলেছেন—'আহা! যদি কোনো শিল্পী থাকত মাইক স্মিথের মুখের রেখা এঁকে নেবার জন্য—'

টসে পরাভূত মাইক স্মিথকে দলবল নিয়ে ফিল্ডিং করবার জন্য আবার নামতে হল মাঠে। তাঁর সামনে পড়ে আছে ব্রাবোর্ন-স্টেডিয়ামের বোবা পিচ, ভারতীয় দলে আছে মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ব্যাটসম্যান, এবং অসুস্থতার জন্য স্বদলে বিনা প্রয়োজনে চারজন ফাস্ট-মিডিয়াম ও মিডিয়াম-ফাস্ট বোলার—তার মানে—

টসে হারার মুহূর্তে তার গোটা মানেটা ব্যাখ্যাসহ লেখা হয়ে গিয়েছিল মাইক স্মিথের মুখে।

কিন্তু হে ক্রিকেট—! পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা! নইলে লাঞ্চের আগে, ব্রাবোর্নের শিষ্ট সুশীল পিচে ভারতের চারটে উইকেট পড়ে গেল ৫৮ রানে!—মেহরা—৯, কুন্দরাম—২৯, সরদেশাই—১২, মঞ্জরেকর—০। লাঞ্চের পরে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গেল আরও দুটো উইকেট—পাতৌদি—১০, এবং জয়সীমা—২৩। ৬ উইকেটে ভারতের ৯৯ রান।

কিন্তু—আবার সেই ক্রিকেট। ৬ উইকেটে ৯৯ রান দিনের শেষে দাঁড়াল ৬ উইকেটে ২২৫, একটি গৌরবময় রেকর্ডসহ। দুরানী অপরাজিত—৭৩, বোরদে অপরাজিত—৫৮। উভয়ের এই দিনের যৌথ রান—১২৬, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সপ্তম উইকেটের নতুন রেকর্ড; পূর্বতন রেকর্ড ছিল ১৯৫১-৫২তে নিগেল হাওয়ার্ডের এম-সি-সির বিরুদ্ধে মাদ্রাজে উমরিগর-গোপীনাথের জুটিতে ৯৯ রান। বোরদে-দুরানীর এই পার্টনারশিপ পরদিন ভঙ্গ হবে ১৫৩ রান করার পরে; সেই ১৫৩ রান যে-কোনো দেশের বিরুদ্ধে সপ্তম উইকেটের ভারতীয় রেকর্ডের সমান। ১৯৫৩ সালে ওয়েস্টইণ্ডিজের পোর্ট অব স্পেনে মানকদ ও

আগে সপ্তম উইকেটে সমসংখ্যক রান করেছিলেন।

দ্বিতীয় টেস্টের এই প্রথমদিনে ব্রাবোর্ন-স্টেডিয়ামের ক্রিকেট-রসিক দর্শকেরা যথার্থ-কিছু ক্রিকেট দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। রোগদুর্বল ও 'টসাহত' ইংলণ্ডের বোলিং থেকে রাশীকৃত দেশীয় কৃতিত্ব আদায়ের সুখদর্শনে সৌভাগ্যবশত তাঁরা বঞ্চিত হয়েছিলেন। একথা সত্য, ভারত তার সুযোগ অনেকটা হারিয়েছিল। একটা সময় এসেছিল, যখন ধস্ নামার আতঙ্কে অভিভূত থাকতে হয়েছিল ভারতীয় দর্শকদের—কিন্তু সেখানেই তাঁরা যথার্থ ক্রিকেট পেয়েছিলেন—সেই আস্বাদ্য আতঙ্ক, যা প্রতিটি মুহূর্তকে চোখে ও মনে আঠার মতো আটকে রাখে—এবং তাঁরা দেখেছিলেন সেই শঙ্কার মধ্যে শঙ্কাহরণ সাহসকে, যা মেঘপ্রান্তকে বর্ণরঞ্জিত ক'রে পিছনকার আলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত করে দেয়।

বোরদে এবং দুরানী, সূচনায় যথেষ্ট সংশয়াচ্ছন্ন, সুযোগদানে ও গ্রহণে সম উৎসাহী, অস্থির, অনিশ্চয়। ক্রমে প্রত্যয়ের জন্ম, তারও পরে নিশ্চয়তার নির্ঘোষ। ধীরে, দেখেশুনে, মেরে, ভুল মেরে, খেলা চলেছিল প্রথম পর্যায়ে। তারপরে ধীরতা গেল, বীরতা এল, রানের গতি বাড়তে লাগল, দুজনেই পঞ্চাশের মুখোমুখি হয়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগলেন, কে আধখানা সেঞ্চুরি আগে খাবেন, আগে বোরদে খেলেন, তারপরে দুরানী—তা হলেও তাঁরা থামলেন না—

মাইক স্মিথ কোন্ গভীর নৈরাশ্য নিয়ে টসে হেরে প্যাভিলিয়নে ফিরেছিলেন বলেছি। মধ্যাহ্নে যখন আহারাদি করতে শিবিরে ফিরছেন, তখন তাঁর মুখে কী গভীর তৃপ্তি! আবার সন্ধ্যায় যখন ফিরছেন কী অসীম ক্লান্তি তাঁর পদক্ষেপে! একটু আগে হতাশায় ও নিরুপায়ে তিনি কিছু অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। খেলা শেষ হতে যখন মাত্র সতের মিনিট বাকি, তখন ২০২ রানের মাথায় নতুন বল তুলে দিয়েছিলেন প্রাইসের হাতে। স্বাভাবিক ছিল, মাত্র সতের মিনিট অপেক্ষা করা, যাতে রাত্রির শিশির এবং নিজের ফাস্টবোলারদের নিদ্রালব্ধ এনার্জির সাহায্য পেয়ে যান—কিন্তু মাইক স্মিথ একান্তভাবে চাইলেন, এই দুই চক্ষুশূল উৎপাটিত হোক, যারা নৈরাশ্যের মধ্যে হঠাৎ-প্রাপ্ত ইংলণ্ডের আশাকে নৈরাশ্যের মধ্যে আবার ঠেলে দিয়েছে।

মাইক স্মিথের মরীয়া চাল ব্যর্থ হল। বোরদে-দুরানী অবিচ্ছিন্ন রইলেন।

তবু স্বীকার করতেই হবে, বোম্বাই-টেস্টের প্রথমদিন সব জড়িয়ে ইংলণ্ডেরই। তাঁরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। বোলিং-ফিল্ডিংয়ে তাঁদের ছিল যৌথ সাধনা। কোনো বিধ্বস্ত সৈন্যদলের অবশিষ্ট মনুষ্যেরা যে-আশ্চর্য শক্তি দেখায়, সেই শক্তিই এইদিন ইংলণ্ড-দলে দেখা গেছে। বোলারদের মধ্যে বিশেষ সফল একজনকে বেছে নেওয়া সম্ভব নয়—তাঁদের ছিল সমবেত সাফল্য। খুব কম ক্ষেত্রেই স্কোর-বই বোলারদের আপেক্ষিক কৃতিত্বকে প্রকাশ করে; এই দিন বহুলাংশে করেছে, তা স্বীকার্য : নাইট—১৪—২—৩৬—২; লার্টার—১৯—২—৩৫—০; জোন্স—৯—০—৩১—০; প্রাইস—১৪—২—৪৯—২; টিটমাস—২৯—১৩—৪১—২; উইলসন—১৩—৫—২২—০।

বোরদে এবং দুরানী যে-খেলাকে প্রথমদিন ভারতের পক্ষে রক্ষা করেছিলেন, দ্বিতীয় দিনে তাকে তাঁরাই হাত ঘুরিয়ে দান করলেন ভারতকে। দ্বিতীয়

দিনের শেষে খেলার উপরে ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল, তার জন্য কৃতিত্ব দুই বোলার—দুরানী ও বোরদের—সঙ্গে চন্দ্রশেখরও ছিলেন।

ইংলণ্ড প্রথমদিনের প্রথমার্ধে ভারত-শিবিরে যে ত্রাস এনেছিল, বোরদে-দুরানী দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সে ত্রাস-নাশ করেছিলেন, একথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় দিনে ভারতের স্বাভাবিক বিলয় ঘটল ৩০০ রানে। অবশ্য শেষ দুটি উইকেট এক ঝটকায় গ্রহণ করে লার্টার কিছু চমকের আনন্দ দিয়েছিলেন। এইদিন তিনি মাত্র তিনটি বল করার সুযোগ পান—প্রথম বলে ভারতের নবম উইকেট, এবং তৃতীয় বলে দশম উইকেট। এইদিন লার্টারের অ্যাভারেজ এই-রকম—·৩—১—০—২।

ইংলণ্ড শুরু করেছিল স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। দ্রুত বলের অভিপ্রায় নিয়ে নতুন বল হাতে ধরেছিলেন ভারতের রাজিন্দর পাল ও জয়সীমা। তাঁদের হাতে-ধরা সেই বলের উজ্জ্বলতা যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ ইংলণ্ডের ব্যাটিংও ছিল উজ্জ্বল। তারপরেই যখন বলের রূপে ক্ষয় ধরল, ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠল ইংলণ্ডের ইনিংস। দুরানী, বোরদে ও চন্দ্রশেখর বলের চরকিতে মাথা ঘুরিয়ে দিলেন এম-সি-সি'র খেলোয়াড়দের। তাঁদের বোলিংয়ের প্রকৃতি এই :

"স্পিন-বোলিং তার অগণ্য চারিত্র এবং চতুরতা নিয়ে খেলাটির উপর ভারতের মুঠিকে দৃঢ় করে বসাতে সাহায্য করেছে। এই মাঠে এই ধরনের জিনিস কদাচিৎ দেখা গেছে, যেখানে বলের চেহারায় ব্যাটসম্যান হতবাক্ এবং বোলার উল্লসিত।

"যুদ্ধোত্তরকালে ইংরেজ-ব্যাটসম্যানেরা এইপ্রকার বিভ্রান্তি অল্প ক্ষেত্রেই বোধ করেছেন, যা আজ ব্রাবোর্ন-স্টেডিয়ামের উইকেটে দুরানী, বোরদে ও চন্দ্র-শেখরের সামনে তাঁদের করতে হয়েছে। প্রত্যেকেই অদ্ভুত বল করেছেন; বোরদকে যদিও বিনা উইকেটে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, তবু তিনি দুরানীর যোগ্য সহযোগী ছিলেন, যে-দুরানীর সূক্ষ্ম চাতুরীর কোনো উত্তরই বোধহয় ইংরেজ খেলোয়াড়দের জানা ছিল না।"

সতের বৎসর বয়স্ক মাদ্রাজের চন্দ্রশেখর লেগব্রেক-গুগলি বোলাররূপে দলে নবাগত। তারুণ্যপ্রীতি প্রশংসনীয়, তবু ব্রাবোর্ন-স্টেডিয়ামের পিচের সঙ্গে পরিচিত অভিজ্ঞ লেগব্রেক-বোলার বালু গুপ্তেকে না নেওয়ার জন্য গুঞ্জন উঠেছিল অনেক মহলে, তা গর্জনে রূপান্তরিত হতে পারত যদি-না তরুণ চন্দ্রশেখর সুস্পষ্টভাবে তাঁর দ্রুতগতি লেগব্রেক-গুগলির ছোবলে প্রাণহরণ করতে পারতেন কয়েক জনের—কিন্তু তিনি পেরেছিলেন।

বালু গুপ্তের বদলে চন্দ্রশেখরের নির্বাচন অকারণে নয়। ধীর লেগব্রেক বোলার-রূপে বালু গুপ্তের ভূমিকা পূর্ব থেকেই গ্রহণ করে আছেন বোরদে ও দুরানী; সেখানে একই জাতীয় বোলারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে ফল কি? চন্দ্র-শেখরের লেগব্রেকে গতির পরিমাণ যথেষ্ট। যখন মন্থর পিচে বলে পাক ধরে না, কিংবা অল্প ধরে, তখন এই জাতীয় বোলিং রীতিমত কার্যকর হয়। শুধু তাই নয়, পিচ থেকে কব্জির জোরে গতি আনার সামর্থ্য থাকায় এই ধরনের বোলার গেঁড়ে-বসা ব্যাটসম্যানকেও সহসা-দংশনে বিব্রত করতে পারে। তাই চন্দ্রশেখরকে যখন ভারতীয় নির্বাচকগণ দলে আনলেন, তখন ভারত-পক্ষে শ্রেষ্ঠ বৈচিত্র্যযুক্ত লেগব্রেক-বোলিংয়ের আয়োজন তাঁরা করেছিলেন, স্বীকার

করতে হবে। বোরদের ছিল উ'চু থেকে পড়া ধীরগতির অনিশ্চিত-স্বভাব লেগ-ব্রেক, গুগলির দ্বারা যার বিভ্রান্তির পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; দুরানীর বাঁ হাতের ঈষৎ-গতিযুক্ত, সীমিত-ফ্লাইট লেগব্রেক, যাতে ফ্লাইটের আকারের সংযম বিচার-মূঢ়তার সৃষ্টি করে, এবং বলের বাঁকের হিসাব নির্ধারিত থাকায় ব্যাটসম্যানের পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা শক্ত হয়; তৃতীয় ব্যক্তি চন্দ্রশেখরের ফ্লাইট নেই, ব্রেক আছে, এবং সর্বোপরি আছে গতির তীব্রতা, যা অমনোযোগের মধ্যে তো নিশ্চয়ই, ক্ষেত্রবিশেষে মনঃসংযমের মধ্যেও ছিদ্র করতে সমর্থ।

এই দিন তিনজন লেগব্রেক বোলারের অ্যাভারেজ: দুরানী—২৩—১০—৩০—২, বোরদে—২০—৭—৩৮—০, চন্দ্রশেখর—২০—৭—৪৪—৩।

তিনটে চেহারাই একরকম, শুধু বোরদের উইকেট-স্থানে শূন্য—সহজেই সেখানে 'দুই' বা 'তিন' বসতে পারত।

চন্দ্রশেখর পরদিন আর একটি উইকেট পাবার পরে তাঁর অ্যাভারেজ দাঁড়াবে—৪০—১৬—৬৭—৪। নবাগতের পক্ষে প্রথম পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করার মত কৃতিত্ব।

তৃতীয় দিন ভারতের লেগব্রেকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত অফব্রেক ব্যাটিং আনলেন ইংলন্ডের অফব্রেক বোলার টিটমাস। শেষ চারটি উইকেটে আরও প্রায় একশো রান করল ইংলন্ড। তাদের ইনিংস শেষ হল ২৩৩ রানে।

ভারতীয় উইকেটে খাটো চেহারার টিটমাস ক্রমেই প্রয়োজনীয় চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তাঁর নিপুণ বুদ্ধি বা বোলিং ভারতের ব্যাটের গলায় দড়ি পরিয়েছে, তাঁর ব্যাটিংও ভারতীয় বলকে নিয়ন্ত্রিত করেছে অনেকাংশে। যথার্থ অল-রাউন্ডারের ভূমিকায় টিটমাস এম-সি-সি'র প্রথম ইনিংসে ৮৪ রান করে নট-আউট ছিলেন (বোরদের রানের সমান) এবং সপ্তম উইকেটে প্রাইসের সঙ্গে ৬৮ রান করেছিলেন, যা বোরদে-দুরানীর ১৫৩ রানের অর্ধেকেরও কম, কিন্তু মূল্যে এতটুকু কম নয়। দুরানী ও বোরদে প্রতিযোগিতা করে রান করেছিলেন, কারণ দুজনেই ব্যাটসম্যানরূপে দলে স্থান পেতে পারেন, কিন্তু ব্যাটহাতে প্রাইসের কোনো উচ্চাভিলাষ ছিল না। তবে প্রতিজ্ঞা ছিল। তারই প্রতিশ্রুতিতে টিটমাস প্রাইসকে পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে ইংলন্ডের পক্ষে রান সংগ্রহ করে গেছেন, এমন-কি তাঁর পাখার তলায় বিশ্রামে ও বয়সে বৃদ্ধি পেয়ে প্রাইস দলের তৃতীয় গণ্যসংখ্যক রান করেছিলেন, ৩২।

তবু তৃতীয় দিনের শেষে ইংলন্ডের আকাশে মেঘ যথেষ্ট। ভারত দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে এক উইকেটে করেছে ৯১। নয় উইকেট হাতে নিয়ে ১৫৮ রান এগিয়ে। সময় বাকি দুদিন। চতুর্থ ইনিংস খেলতে হবে ইংলন্ডকে। ভারত চাপ দেবার মত অবস্থায় পৌঁছেচে।

বড়ো আকারে প্রশ্ন উঠেছিল—পাতৌদি চতুর্থ দিনে কখন ডিক্লেয়ার করবেন! নিশ্চয়ই চায়ের সময়ে, তার পরে কদাপি নয়। তার মধ্যে ভারতের সাড়ে তিনশো রানে এগিয়ে থাকার কথা।

দুঃখের বিষয়, ক্রিকেট ব্যাপারটা হিসেবমতো চলে না। ভারত চা-পর্যন্ত টিকবে তো?—চতুর্থ দিন একসময়ে এই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছিল। সে প্রশ্ন উঠতেই পারে, যদি অন্যতম প্রধান ব্যাটসম্যানরূপে দলভুক্ত, দলের অধিনায়ক

অধিনায়কত্ব ছাড়া আর-কিছু দানে অসমর্থ হন। পাতৌদি চমকপ্রদ ব্যর্থতা দেখালেন। তাঁর চার ইনিংসের রান: ০—১৮, ১০—০, অর্থাৎ গড়—৭।

অপরপক্ষে ইংলণ্ড দলে ছিলেন ক্রমবৃদ্ধিপ্রাপ্ত টিটমাস, প্রাইস। ইংলণ্ডের বোলিংয়ের মধ্যে তাঁরা তৎপরতা ও তাৎপর্য, দুইই এনেছেন।

ভারতের তিননম্বর খেলোয়াড় সরদেশাই ভালো খেলেছিলেন। তাঁর নিভৃত সাধনায় ব্যাঘাত ঘটানোর সাধ্য ছিল না ইংলণ্ডের বোলারদের। সুতরাং করুণা-পরবশ হয়ে তিনি ৬৬ রানে রান-আউট হলেন। মেহরা দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে ৩৫ রান করেছিলেন। আর কুন্দরাম (১৬), বোরদে (৭), দুরানী (৩) ভুলেই গিয়েছিলেন তাঁদের পূর্বকীর্তির কথা। বাঁচালেন জয়সীমা (৬৬) ও মঞ্জরেকর (৪৩ নটআউট)।

জয়সীমা মঞ্জরেকর যখন ভারতকে বাঁচাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা বাকি সব-কিছু ভুলেছিলেন—ভারতীয় দলের জয়ের সম্ভাবনা, ইংলণ্ডের অসহায়তা, কিছুই তাঁদের মনে ছিল না—এমন একটা সময় গেছে যখন তাঁরা ২১ ওভারে ২৯ রান করেছেন।

চায়ের পরে আরও একঘণ্টা সময় কাটল, ভারত ৩১৭ রান এগিয়ে, সময় বাকি ৩৫০ মিনিট—পাতৌদি ব্যাটিং করতে না পারুন, নবাবী অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারেন না—ডিক্লেয়ার করলেন, ৮ উইকেটে ২৪৯ রানের মাথায়। যে-ইংলণ্ড পূর্ব টেস্টে ২৭০ মিনিটে ২৯৩ রানের পিছনে ধাওয়া করার ঝুঁকি নেয়নি, তাকে পাতৌদি এবার আরও লোভ দেখালেন—৩৫০ মিনিটে ৩১৭ রান করো। ইংলণ্ড কি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে?

না, সে সাহস ইংলণ্ডের ছিল না। সাহস না করার পক্ষে পেশাদারী যুক্তি তৈরী ছিল—অনেকেই অসুস্থ ও আহত থাকায় উপযুক্ত খেলোয়াড়দের দিয়ে দল তৈরি করা যায়নি। কেউ-কেউ সে যুক্তি তুলেছিলেন। এমন-কি কোনো-কোনো ইংরেজ-সাংবাদিক কাতরকণ্ঠে অশালীন অভিযোগ পর্যন্ত করেছিলেন—ইংলণ্ডের ভাঙা অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট সহানুভূতি নেই ভারতীয় সংবাদপত্রে, এবং সেটা থাকাও নাকি প্রত্যাশিত নয়! ইংরেজি সাংবাদিকতার খুব নিম্ন মানের ও নিম্ন রুচির পরিচায়ক এই জাতীয় সংবাদের সম্বন্ধে বেশি মনোযোগ না দিলেও চলবে, কিন্তু নিশ্চয় প্রশ্ন করার অধিকার আছে দর্শকের—ইংলণ্ড দলে এগারোটি খেলোয়াড়-নামক চরিত্র তো ছিল; তাঁরা যখন টেস্ট-ক্রিকেটার রূপে মাঠে নেমেছেন, তখন ক্রিকেটের প্রতি তো তাঁদের একটা দায়িত্ব আছে।

সে কথা থাক। ইংলণ্ড দিনশেষে করল তিন উইকেটে ২০৬। আবার ড্র। সামনে কলকাতার তৃতীয় টেস্ট। সে-টেস্টে কলিন কাউড্রে খেলবেন। এবং সে টেস্টেও পাতৌদি অধিনায়ক থাকবেন ভারতের, কারণ পরবর্তী তিন টেস্টের জন্য পাতৌদিই অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

ইডেন উদ্যানে তৃতীয় টেস্ট

২৯, ৩০ জানুয়ারি, ১, ২, ৩, ফেব্রুয়ারি—১৯৬৪

প্রথম দিন : শীতের সন্ধ্যায় চন্দ্রোদয়

'মুদ্রারাক্ষস!' দাঁতে দাঁত পিষে মাইক স্মিথ বললেন পাতৌদিকে, বুধবার সকালে—১৯৬৪ সালের ২৯ জানুয়ারি সেদিন।

ম্লেচ্ছমুখে দেবভাষা শুনে পাতৌদি চমকে গেলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল বোম্বাইয়ের দর্শকদের অনুরূপ দেবভাষায় রোষগর্জন—'উত্তরমীমাংসা চাই।' এ কি হল! ভারতবর্ষ কি বিংশ শতাব্দীর উপর ঢেরা কেটে দিয়ে পেছিয়ে গেছে হিন্দুযুগে? নইলে সংস্কৃতে বাক্যালাপ কেন? পাতৌদি সবিস্ময়ে ভাবলেন।

পাঠকরাও বোধহয় ইতিমধ্যে সন্ত্রস্ত হয়ে ভাবছেন, ব্যাপার কি? কিছু নয়—পাতৌদি তৃতীয় টেস্টেও টসে জিতেছিলেন। মাইক স্মিথ পর-পর তিনবার টসে হেরে রাগ সামলাতে পারেন নি। তাঁর সংস্কার এমন ঘুলিয়ে উঠেছিল যে, তিনি নিজের অজান্তে আদি ভাষায় ফিরে গিয়েছিলেন। সকলেরই জানা আছে, মাইক স্মিথ সাহেব হতে পারেন, এবং পাতৌদি নিগার হতে পারেন, কিন্তু দুজনেই মূলে আর্য।

যে রোষ মাইক স্মিথের কণ্ঠে আর্যভাষা এনেছিল, বোম্বাই-দর্শকদের মুখে সেই রোষই নির্গত হয়েছিল 'উত্তরমীমাংসা চাই' রবে। তাঁরা বলেছিলেন, মাদ্রাজে পূর্বমীমাংসা হয়নি, বোম্বাইয়ে মীমাংসা হল না বর্তমানে, কলকাতায় যেন উত্তরমীমাংসা হয়।

মাইক স্মিথ এবং ইংরেজগণ ভারতীয় মুদ্রার লজ্জাশীলতা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হলেন। 'যে মুখই দেখতে চাই উল্টে পড়ো কেন, অথচ তোমাদের সোজা মুখের জ্যোতিতে আমাদের ঘর আলো হয়ে ছিল দুশো বছর ধরে'—ভারতীয় মুদ্রা সম্বন্ধে এম-সি-সি সদস্যেরা ভাবলেন। মাইক স্মিথ যখন দলবল নিয়ে মাঠে নামলেন, তখন ইংলণ্ড পর-পর সাতটি টেস্টে টসে হেরেছে—পূর্ব সিরিজে ডেক্সটার হেরেছেন শেষের চার টেস্টে, এই সিরিজে মাইক স্মিথ প্রথম তিন টেস্টে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ফিল্ডিং-পক্ষের অধিনায়ক মাইক স্মিথের দিকে কারও চোখ নেই, ইডেন-উদ্যানের শীতপ্রভাতের আশি হাজার চোখ মাত্র একজনকেই সন্ধান করছে—হ্যাঁ, ঐ তো তিনি—আহা কি নয়নলোভন আকার—দুই গালে হাস্য ও মাংসের পুঁটুলি, কাঁধে পেশী ও প্রতিজ্ঞার বোঝা, পেটে মেদের ও মতলবের ঝোড়া—ঐ তো শ্রীযুক্ত কলিন কাউড্রে—তৃতীয় টেস্টের প্রতীচ্য-তারকা, প্রাচ্যের গগনে দিবালোকে উদিত।

কাউড্রে শুরু থেকে দলের সঙ্গে আসেন নি, সে তাঁর সৌভাগ্য। তৃতীয় টেস্টে দলে বলাধান করবার জন্য উড়ে আসায় যে-পাবলিসিটি পেয়েছেন, তা নির্ধারিত পরিকল্পনার লেজে বাঁধা হয়ে এলে পেতেন না। তৃতীয় টেস্টে অভ্যুদিত কাউড্রে তৃতীয় পাণ্ডবের গৌরব পেয়ে গেলেন।

তৃতীয় টেস্টে ইংলণ্ড-দলে ভারসাম্য ফিরে এসেছে। ফাস্টবোলারের সংখ্যা একজন কমেছে। প্রাইস, লার্টার, নাইট—এই তিনজন সুইং-বোলারের মধ্যে

নাইট আবার অলরাউণ্ডার। ইডেন-গার্ডেনের প্রভাতী শিশিরার্দ্রতার জন্য তিন-জন সুইংগ বোলার প্রয়োজনও বটে। স্পিন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত টিটমাস ও উইলসন—ভারতে দুজনেরই অব্যাহত উন্নতি, এবং তাঁদের সাহায্যার্থে আছেন পারফিট ও পার্কস। বোলাস ও বিঙ্কস ইনিংস-সূচনার ব্যাটিংয়ে বাড়াবাড়ি না করে উপযোগী। সুবিধার বিষয়, বিঙ্কস কুন্দরামের মতোই ওপেনার-উইকেটকীপার। বাকি ব্যাটসম্যানদের মধ্যেও প্রচুর যোগ্যতা—রানসিন্ধ মাইক স্মিথ, রীতিনিপুণ পার্কস, সর্বোপরি সর্ববিষয়ে বিশালাকার কাউড্রে। পার-ফিট-নাইট-টিটমাস—তিনজনের নামকে জুড়লে 'ট'-বর্গের আধিক্য দেখা যায়, খেলাতেও টাইটনেস্ যথেষ্ট। সুতরাং ইংলণ্ড, ফিল্ডিং করতে নামলেও এবার কাঁপতে-কাঁপতে নামেনি।

ব্যাট করতে নামার সময়ে ভারতও কেঁপেছিল এমন কেউ বলবে না, কিংবা যদি কিছু কাঁপুনি থাকে তা নিতান্তই শারীরিক, যেহেতু কলকাতায় শীত পড়েছে জবর, কিন্তু মানসিক নয়। ভারতীয় দলে পরিবর্তন হয়েছে কিছু—ভালমন্দ ঘটার মতো পরিবর্তন নয়—তবে কলকাতার প্রীতিভাজন একজন দলে এসেছেন—রমাকান্ত দেশাই; এবং সুর্তি, যাঁর সম্বন্ধে কিছু শোনা গেছে, দেখে নেওয়া যাক এবার—তিনিও এসেছেন। চন্দ্রশেখর দলে আছেন, সবাই খুশি, হয়ত ছেলেটি অল্পবয়সের সাফল্যে বড়দের ব্যাপারে মাথা (বা বল) গলাতে পারবে, এবং সবাই মোটেই অখুশি নয় মেহরার বিদায়ে—মুস্তাকভক্ত কলকাতা ঐ নট-নড়ন-চড়ন পাথরটিকে একেবারে পছন্দ করে না। দুঃসাহসী রসিকেরা ঐ সংগে মেহরার কাঁধে মঞ্জরেকরকে চড়িয়ে দিতে উৎসাহী ছিল, তবে মঞ্জরেকর মাঝে-মাঝে বিপদভঞ্জন মধুসূদন হন, এই সতর্কবাণীতে তাঁরা রস-লোভ কিছু গুটোলেন।

কিন্তু সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ল যখন দেখা গেল, প্রথম উইকেটে ব্যাট-হাতে নামছেন কুন্দরাম ও জয়সীমা—ভারতপক্ষে শ্রেষ্ঠ আক্রমণশীল ওপেনিং জুটি—তাঁরা খেলতে নামছেন ঐতিহাসিক ইডেন-উদ্যানে—দুটি ড্র-এর পটভূমিকায়, যে-দুটি টেস্টে পাল্লা ভারতের দিকে ঝুঁকেছিল—তাঁরা নামছেন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের টেস্টগুলি জয়ের প্রতিজ্ঞায়। অন্তত সবাই সেই প্রতিজ্ঞা আরোপ করল তাঁদের উপরে।

সকাল দশটা পনের মিনিটে হাইকোর্টের দিক থেকে নাইট বল শুরু করলেন ময়দানপ্রান্তীয় জয়সীমার বিরুদ্ধে। মাঠে কুয়াশার লেশমাত্র নেই, কিছু সিগারেটের কুয়াশা আছে অবশ্য। টেস্টের প্রথম ওভারে বোলারকে সম্মান প্রদর্শন বিধেয় বলে নাইট মেডেন পেলেন।

ময়দান থেকে প্রাইস কুন্দরামের দিকে দৌড় শুরু করতেই সকলের মনে প্রথম টেস্টে কুন্দরামের ১৯২ রানের প্রফুল্ল স্মৃতি জেগে উঠল—সে স্মৃতি বর্তমানের সৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল যখন প্রাইসকে তৃতীয় বলে হুক করে বাউণ্ডারি করলেন কুন্দরাম। ভারতের রানের খাতায় প্রথম অঙ্কপাত হল 'চার' ফেলে।

'সো-চ্চার' কুন্দরামের ব্যাট পরের বলেই আবার থাবা বাড়াল, কিন্তু প্রাইসের ইনসুইংগের বাড়তি বাঁক 'আবার খাবো' সন্দেশটিকে হঠাৎ-ঝটিকায় সরিয়ে

নিল—দর্শক আতঙ্কে আ-আ-আ করে উঠল : ছি-ছি-ছি সকালেই এত কি খিদে বাপু! এখনো তো দশটা বলও মাঠে পড়েনি!

ঠিক এইসময়ে উত্তর থেকে বাতাস বয়ে এল সন্‌সন্ করে। শীতের শুকনো হাওয়া দেহ স্পর্শ করে, হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে, হু হু করে ঘুরে গেল মাঠের চারিদিকে। শীত-অকাতর অলজ্জিত তন্বী-তনুও তাতে শিহরিত, পুলকিত ও সজ্জিত হল অনিচ্ছায়—শীত ও স্ত্রী-শালীনতার সম্প্রীতি সম্বন্ধে অনেকের মনে শুভচিন্তা উদিত হল—ঠিক তখনি প্রাইসের বলে পুনশ্চ কুন্দরামের ব্যাট শূন্যমার্গ মথিত করে ঘুরে গেল। সবাই বিষণ্ণ হয়ে কুন্দরামকে সংযমশিক্ষা দিতে লাগল কলরব করে।

কুন্দরাম অতঃপর কিছু কুণ্ডলীকৃত হলে—বিস্তারিত হলেন জয়সীমা। দশটা বেজে তেতাল্লিশ—এখনো আধঘণ্টা সময় কাটেনি—নাইটের বলে গ্লান্স করে বাউণ্ডারি করলেন; পরের বলে মিডঅফে ড্রাইভ করে বাউণ্ডারি, পরের বলে পুনশ্চ বাউণ্ডারি ব্যাকফুটে, কোমর হেলিয়ে, মিডঅনের উপর দিয়ে তুলে। জয়সীমা অশুভ তের থেকে এক ঝোঁকে উঠে গেলেন বাঙালী দর্শকের কাছে করতালিযোগ্য কোয়ার্টার সেঞ্চুরিতে।

রান উঠতে লাগল তরতর করে। জয়সীমা হাত খুলেছেন, তাঁর মুক্তহস্তের দানে জয়ানন্দের হিল্লোল বইছে মাঠে। কুন্দরামও থেকে-থেকে চড়ে উঠছেন, কখনো ব্যাটে বলে মিলন হচ্ছে, কখনো চোর-পুলিস খেলা—বল পালাচ্ছে ব্যাটেব কাছ থেকে 'আমি তো তোমারে চাহিনি কখনো' বলে—তবু কুন্দরাম যে, কুন্দশুভ্র নারীলাবণ্যের বদলে অয়স্কান্ত বীর্য দেখাচ্ছেন, সেটাই প্রশংসার, সবাই বলছে—এমন সময়ে দশটা পঞ্চাশ মিনিটের সময়ে হাইকোর্টের দিক থেকে নাইটের বদলে এলেন লার্টার, যে-লার্টার একটি সুদীর্ঘ ব্যাপার। পৌনে সাত ফুট মনুষ্য। শুধু ভারতে কেন, পৃথিবীর অন্যত্রও এঁরা সংখ্যাগুরু নন।

লার্টারের প্রথম বলই বাম্‌পার। 'কী বর্বরতা!' শিউরে উঠল দর্শক। 'এ কী —এ কি বাম্‌পারতা অকারণে!'—রসিক গাইলেন। যিনি বিশেষজ্ঞ তিনি কৌতুক-বোধ করলেন। 'আরে দোষ দাও কেন? অত উঁচু থেকে বল ফেলে, ওর স্বাভাবিক বলই তো বাম্‌পার। ওঁকে চেষ্টা করে বাম্‌পার সামলাতে হয়'—বিশেষজ্ঞ বললেন।

লার্টার যত উঁচুই বল তুলুন—তারও উপরে উঠবার তেজ আছে জয়সীমার। লার্টারের প্রথম ওভারের তৃতীয় বলে জয়সীমা মিডঅফে ড্রাইভ করে বাউণ্ডারি করলেন। জয়সীমা ২৯, কুন্দরাম ১৩, ভারতের ৪২।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে দৌড় দিচ্ছে ভারতের রান—৪৫ মিনিটে ৪৭—এমন সময়ে জয়সীমা অফের বাইরের লোভে ধরা পড়লেন প্রাইসের বলে—কট বিঙ্কস। জয়-সীমা ৩৩, কুন্দরাম ১৪, ভারত ১—৪৭।

জয়সীমার বিদায়ে যে-ক্ষোভের গর্জন উঠল, তা ভারতের ক্ষতির জন্য নয় সম্পূর্ণত, মূলত আনন্দের বিদায়ের জন্যই।

জয়সীমা যাচ্ছেন—নামছেন সরদেশাই। প্যাভিলিয়ন গেট থেকে মাথা একটু হেলিয়ে, কাউন্টি-ক্যাপ ঠিক করতে-করতে, এবং পরে হাতে ব্যাট ঘষতে-ঘষতে উইকেটের দিকে অগ্রসর যে-শালপ্রাংশু মহাকায়কে দেখতে অভ্যস্ত আমরা—আমাদের সেই গর্বানন্দময় দর্শনের উপর একটি ক্ষুদ্র, প্রায় অপরিচিত মূর্তি

নেমে পড়েছে—উমরিগর নন—সরদেশাই। ভারতীয় ক্রিকেটে গত দশকের প্রধানতম ব্যক্তিত্বের স্থান গ্রহণ করলেন দৃঢ়চিত্ত, মাঝারি আকারের একটি মানুষ। উমরিগরের মতো পৌরুষ-প্রচণ্ড নন, কিন্তু পরিচ্ছন্ন, নিপুণ, স্থিরবুদ্ধি পুরুষ, প্রয়োজনীয় কর্তব্যে অপরাঙ্মুখ।

মাঠে আলোর সঙ্গে ছায়ার লুকোচুরি চলেছে, ছায়ারই প্রাধান্য ক্রমে। ইংলণ্ডের সুইংগ-বোলাররা তার সুযোগে বলের গা-আড়াল-দেওয়া চৌর্যরীতিতে প্রতারণা করছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের। এহেন এক বর্ণহীন আচ্ছন্ন পটভূমিকায় বাদ্যহীনভাবে বিদায় নিলেন কুন্দরাম, প্রাইসের বলে—উইকেটকীপারের হাতে কট। সকালের প্রথম দুটি উইকেটই প্রাইসগ্রস্ত।

মঞ্জরেকর নেমে পড়েছেন। অত্যন্ত ধীরে উইকেটের দিকে অগ্রসর। দর্শকের মনও গতি হারিয়েছে। সকলে প্রস্তুত কোনো একটি সর্বনাশের কিংবা ক্লান্তিকর জাতিগঠনপ্রয়াস দর্শনের জন্য। এখন সকলে স্বেচ্ছায় ব্রাইট ক্রিকেটের দাবিহারানো জাতীয়তাবাদী নাগরিক।

এগারোটা তিরিশ মিনিটের সময়ে প্রাইসকে বিশ্রাম দিলেন স্মিথ। কার্যকর বোলারকে বিশ্রাম দিয়ে পরবর্তী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রাখতে হয়। সে জায়গায় টিটমাস এলেন। অন্যদিকে অর্থাৎ হাইকোর্টের দিকে বজায় রইলেন লার্টার, উত্তরবাতাসে ইনসুইংগারে যদি হঠাৎ ভাঙন ধরে, সেই আশায়। ইংলণ্ডের আক্রমণে এখন দুরীতি—সুইংগ ও স্পিন। দ্রুতগতি বলে যদি রানে দ্রুতগতি আসে, অন্য প্রান্তে মাপা-লেংথের স্পিন ব্যাটসম্যানকে বেঁধে রাখবে।

টিটমাসের আচরণে দৃঢ়তার চেহারা স্পষ্ট। খাটো চেহারা, ওলটানো ঘন চুল, 'পাঁচ ছ' পায়ের দৌড়, হিসেবী বল, অত্যন্ত সুষম ভঙ্গি। টিটমাস বল দিয়ে ফিরবার সময়ে প্রতিবার জামার হাতা ঠিক করেন। ফিটফাট মানুষের ঠিকঠাক বল, তার নাম টিটমাস।

রানের গতি একেবারে পড়ে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে দুটো উইকেট গেছে, তার উপর খেলছেন সরদেশাই ও মঞ্জরেকর, অতএব ভারতের অল্পে সঞ্চয়ের কাল এলো। ঠেলে গুঁজে কেটে রান। মঞ্জরেকার সেই বয়সে পৌঁছে গেছেন যখন বিপ্লব অপেক্ষা বিবর্তনই আদর্শরূপে গ্রাহ্য, এবং কার্যকালে বিবর্তনও নয় গতানুগতিকতাই আশ্রেয়। কিন্তু তরুণ সরদেশাই?

পৌনে বারটা নাগাদ, যখন ভারতের রান ২—৭২, সরদেশাই ৭, মঞ্জরেকর ৮. তখন স্টেডিয়ামের ব্যারাকিংয়ে দলদ্রোহিতা দেখা গেল। স্টেডিয়াম অসুখী হয়ে বলল, তোমাদের পাঁচ কামরার টেস্টগাড়ি, তাই বলে আমাদের কামরায় তোমরা শুধু ঘুমোবে?

ইংলণ্ডের ফিল্ডিং এখন চমকপ্রদ। বাধ্যতামূলক শরীরচর্চার সুফল তাদের চলাফেরায়। অপরদিকে শরীরসাধনায় বীতস্পৃহ ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা পরিষ্কার দেখালেন, ব্যাটিং মানে ফিল্ডিং নয়, অন্তত মঞ্জরেকরের ভাবে-ভঙ্গিতে তাই মনে হল। তিনি দীর্ঘ সময় টিটমাসের সঙ্গে নিষ্ফলা চিঠি-চালাচালি চালিয়ে গেলেন। সেইসময়ে তাঁর কাছ থেকে শর্ট-রান আদায় করতে প্রাণান্ত হল সরদেশাইয়ের। মঞ্জরেকর দু' একটা ড্রাইভ করলেন না তা নয়, কিন্তু গ্লান্স করলেন বেশি। গ্লান্স-কাজটা সবদিক বজায় রেখে করা যায়। ঐ মারে পা বেশি

ঘোরে না, ব্যাট বেশি নড়ে না, এবং স্কোরবোর্ডও ওঠানামা অল্পই করে, কারণ ডিপ ফাইনলেগে লোক থাকেই। মঞ্জরেকরের গ্লান্স করার সুযোগ বেশি করে দিতে লাগলেন নাইট, যিনি এগারোটার সময়ে হাইকোর্টপ্রান্তে লার্টারের স্থানে এসে প্রধানত ইনসুইংগ বল করছিলেন।

এই অবস্থার মধ্যে, যখন মঞ্জরেকর হাত-পা কম টলিয়ে লেগ-গ্লান্সাসক্ত—তখন কেন, কোন্ গ্লান্সে চঞ্চল হয়ে কি জানি, তিনি হঠাৎ টিটমাসকে লেট-কাটে মনস্থ করলেন, বাউন্ডারি হল, সেখানেই না থেমে টিটমাসকে পরের বলে অর্থাৎ ওভারের শেষ বলে পুনশ্চ পা বাড়িয়ে একেবারে কভার-বাউন্ডারিতে তাড়না করলেন। কী অদ্ভুত! তাই দেখে সরদেশাই মহা উত্তেজিত। এতক্ষণ তিনি মঞ্জরেকরের প্রেরণায় পদপ্রসার করে ব্লক করছিলেন—সে এমন প্রসার যে, ব্রিজ-ছাড়াই গঙ্গাপার হওয়া যায়—সে সরদেশাই মঞ্জরেকরের বিপরীত ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে পরের ওভারের প্রথম বলে প্রাইসকে কভারেই বাউন্ডারি-দর্শন করালেন।

বিশ্বাস করতে দর্শকের কষ্ট হল। পর-পর তিনটি বাউন্ডারি, যাতে ভারতের রান উঠে গেল ২—৯১! তখন সকলে সরদেশাইকে আদর করে শুভনাম 'দিলীপ' বলে ডাকল, বলল, 'ব্রাদার তোমার ব্যাট-চর্বণায় ভুরভুরে দিলীপের জর্দা-গন্ধ আনো।' মঞ্জরেকরকে বলল, 'এই তো দাদা চমৎকার। তুমি সাবধান, ধীর, অথচ ইচ্ছেমত বীর হয়ে পড়ো, দেখতে পাই। তুমি সত্যই আত্মস্থ, ক্ষুদ্র-রান-পরাঙ্মুখ, দীর্ঘ অবস্থানের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ—তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তবে দাদা, এই যে মেরে একবার আমোদ দিলে, একে যেন একেবারে ভুলে যেও না। দাদা, তুমি যদিও সারাদুপুর ক্রীজে কাটাও, যদিও তুমি ভারতীয় ক্রিকেটের 'মেদুর' মধ্যাহ্ন—তবু তুমি মাঝে-মাঝে আলোক দেবার চেষ্টা করো না কেন—কি গো দাদা?'

লাঞ্চের আগে ভারতের দলগত রান একশো পেরোল। নৈরাশ্য অনেকটা দূরীভূত। দুটো উইকেট গেলেও রানের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়। ইংলন্ড যে-সুযোগের সৃষ্টি করেছিল, তা তাদের হস্তচ্যুত হয়েছে অনেকখানি। একটা তৃপ্ত-তৃপ্ত ভাব চারিদিকে। সেই আমেজে, মধ্যাহ্নভোজের সময়ে যখন খেলোয়াড়রা প্যাভিলিয়নপথে, তখন এক বৃদ্ধ দর্শক দ্রুত নিজের খাওয়ার ডেকচি খুলতে-খুলতে বললেন, 'আমাদের কিন্তু উচিত মঞ্জরেকরের অনশন ডিম্যান্ড করা। পেটে খেলে বাছাধনকে নড়তে হবে না মাঠে নেমে।'

সেই বৃদ্ধই খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে লাঞ্চের পরে বললেন, 'তোমরা তো বুড়োদের কথা শোনো না, এখন বোঝো।'

বোঝবার অবস্থা কারো নয় তখন। সবাই কাঁদো-কাঁদো। মঞ্জরেকর আউট—লাঞ্চের পরেই—এবারও গ্রহীতা প্রাইস। কট এন্ড বোল্ড প্রাইস—২৫। ভারতের ৩—১০৩। সুর্তির আগমন। বিনা অহঙ্কারে তৎক্ষণাৎ ফুর্তিহীন বিদায়—একই ওভারে—বোল্ড—০। ভারত ৪—১০৩। প্রাইস—প্রাইসলেস, ইংলন্ডের কাছে; পরপর চারটি উইকেট। ভারতের এন্টারপ্রাইসকে নাশ করেছেন তিনি। এখন তাকে লেজের শক্তিসন্ধান করতে হবে।

বোরদের আগমন। কলকাতা বোরদেকে হাততালি না দিয়ে পারে না। কেন-

সুন্দর বোরদে তার কাছে ক্রীড়াসুন্দর। বোরদে তুমি কি পারবে!

আহা বোরদে—বো—র—দে—তুমি নইলে এ জিনিস কে পারবে? একটা বেজে কুড়ি মিনিট—টিটমাসকে কভারে বাউন্ডারিতে পাঠালেন সানন্দে। সেই সুখ-শ্বাসে স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম বিউগল বাজল। পরের বল—আবার বাউন্ডারি—লেগে পুল করে। পরের বল—আবার বাউন্ডারি—সুইপ করে। পরের বল—আবার বাউন্ডারি—মিড-অনে ড্রাইভ।

চারটে বাউন্ডারি, এক ওভারে। 'ক-বি-তা স্যার!' মুহূর্তে খেলা জেগে উঠল মৃতসঞ্জীবনীতে। বোরদে—১৭, সরদেশাই—৩০, ভারত ৪—১২০।

টিটমাস চমৎকার বল করছিলেন। ফ্লাইট ও লেংথের উপর আধিপত্যসহ অধিকারী পুরুষের মতো হস্তসংকেতে নিরস্ত রাখছিলেন ভারতীয়দের। বোরদে বড় কঠিনভাবে টিটমাস-ট্রিটমেণ্ট করলেন। তাঁকে তখনি সরানো হল না—পাছে মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা ধরা পড়ে, তাঁকে আরও দু' একটি মার খাওয়ার 'সৌভাগ্য' দেওয়া হল, কিন্তু অল্প পরেই তাঁর স্থানভুক্ত হলেন লার্টার।

ইতিমধ্যে প্রাইসের জায়গায় ময়দানপ্রান্তে এসেছেন উইলসন। ময়দানপ্রান্ত থেকে ভারতের সর্বনাশ করে প্রাইস ময়দান-ব উপাধি পেয়েছিলেন—তিনি সরে যেতে কিছু স্বস্তি পেয়েছে সকলে, কিছু প্রসন্নতা নিয়ে ল্যাকপেকে ন্যাটা উইলসনের বল লক্ষ্য করছে। বাঁ হাতের টানা স্পিনে ব্যাটসম্যানের আবেগ রোধ করবার মত ক্ষমতা আছে তাঁর বোঝা গেল। তিনি এবং লার্টার স্পিন ও পেস-এর যুগ্ম আক্রমণের রীতিরক্ষা করতে লাগলেন।

বোরদেও টিকলেন না। উইলসনের বলে উইকেটকীপারের হাতে কট। ভারত—৫—১৫০। এক ওভারে ১৬ রান করার পরে মোট মাত্র ২১ রানে বোরদের বিদায়!

ভারতের দুর্দশা বোরদের বিদায়েই থামল না। বার মিনিট পরে সরদেশাই গেলেন লার্টারের বলে, উইকেটকীপার বিঙ্কসের হাতে, কট। ভারত—৬—১৫৮। সরদেশাই—৫৪। অর্থাৎ গোপনে-গোপনে সরদেশাই একটা হাফসেঞ্চুরি গুছিয়ে নিয়েছিলেন,—ভাগ্যের আনুকূল্যে ও ধৈর্যের পুরস্কারে। তাঁর নামে যে-সব বাউন্ডারি লেখা আছে, তার সবগুলি তিনি করেননি, কয়েকটি হয়ে গেছে। তাঁর লেখায় ভুল যথেষ্ট হয়েছিল, আউট হতে-হতে বেঁচে গিয়েছেন। তাঁর রিপু-করা ইনিংসটির শেষের দিকে মনে হচ্ছিল, এ আর টিকবে না—মনে হচ্ছিল, তিনি আউট হতে বদ্ধপরিকর। তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হল না।

সরদেশাইকে আউট করলেন যে-লার্টার, তিনি অনেক উঁচু থেকে শুষ্ক বায়ুতে ফুসফুস ফুলিয়ে যে-সব বস্তু নিক্ষেপ করেছেন, সেগুলি কিন্তু বজ্রতুল্য হয়নি। লক্ষণীয় তাঁর দৈর্ঘ্য—কিন্তু সেই অনুপাতে শরীরের বাঁধুনি নেই। বল দেবার ঝোঁকে তাঁর লম্বা পা এলোমেলো হয়ে ক্রীজের মধ্যে ঢুকে পড়ে দাগ কাটছিল। আম্পায়ার ভয় পেলেন—পাছে অপরপ্রান্ত থেকে কেউ তাঁর 'পদচিহ্ন ধ্যান' করে সেখানেই বল ফেলে। আম্পায়ার লার্টারকে নিজের পা সামলাতে নির্দেশ দিলেন।

বোরদে আউট হয়ে যেতে ভারতের তরুণ অধিনায়ক পাতৌদি নেমেছিলেন অতি মৃদু করতালির মধ্যে। পাতৌদির মতো আকর্ষণীয় খেলোয়াড়কে কল-

কাতার মতো চাঞ্চল্যবিলাসী স্থানে এত অল্প সংবর্ধনা পেতে হল, সেটাই বিস্ময়ের। চশমা ও দায়িত্বে অস্থির পাতৌদি ধীরে-সুস্থে খেলতে লাগলেন। নিজের এবং দলের ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি এতই বিব্রত ছিলেন যে, তাঁর একটি কভার-ড্রাইভ প্রথমবার ইংরেজ-ফিল্ডার ভাল করে ধরতে না পারা সত্ত্বেও তিনি শর্টরান নিলেন না, যেহেতু চোট খাওয়া বাঘ আরও ভয়ঙ্কর—দ্বিতীয় চেষ্টায় ধরার পরে যদি ফিল্ডার রান-আউট করে দেয়!

কুড়ি মিনিট পরে এক রান করে পাতৌদি শূন্যহারা হলেন। তাতে যে হাত-তালি পড়ল—মাঠের বাইরে থেকে নাকি মনে হয়েছিল সেঞ্চুরির সংবর্ধনা। অধিনায়কের উপর দেশের ভরসা বটে! আর ভরসা থাকবে কি করে—বিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে পাতৌদি যে-জাতীয় শূন্যপুরাণ রচনা করে চলেছিলেন! পাতৌদির পূর্ববর্তী চার ইনিংসের হিসাব—০—১৮, ১০—০, অ্যাভারেজ—৭।

সরদেশাই যাওয়ার পরে দুরানী এসেছিলেন। দুজনে খানিকক্ষণ তীব্রভাবে রান না করলেন। পাতৌদি, খেলার মাঝখানে সোয়েটার চড়িয়ে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধিতে সচেষ্ট ছিলেন। তৎসহ ওভারের ফাঁকে-ফাঁকে কাল্পনিক আয়নায় মাঠেই প্রয়োজনীয় অনুশীলন কর্মটি সারলেন। তবু হায়—দুটো উনপঞ্চাশ মিনিটে উইলসনের বল অফে কাট করতে গিয়ে উইকেটকীপার বিঙ্কসের কর-তলগত হয়ে পড়লেন। ভারত—৭—১৬৯। পাতৌদি—২। তাঁর অ্যাভারেজ অল্প-কিছু নামল—ছিল—৭, হল—৬।

নাদকার্নি এবার। আশাহীন চোখে তাকিয়ে ভারতীয় দর্শক। নাদকার্নির বিপত্তারণ ভূমিকা পর্যন্ত সে বিস্মৃত। কয়েক মিনিটের মধ্যে দুরানীর বিদায়—প্রাইসের বলে উইকেটকীপার বিঙ্কসের হাতে, রান—৮। ভারত—৯—১৬৯। দেশাই এলেন সর্বাধিক হাততালি ঝরিয়ে। এতক্ষণ বড়-বড় খেলোয়াড়ের জন্য অশ্রু ঝরিয়েছি, এখন হাসি ঝরুক তোমার জন্য, যদি তুমি তোমার ক্ষণস্থায়িত্বে আনতে পাবো কোনো চিরসৌন্দর্য—হে দেশাই!

দেশাই যে-স্নেহকৌতুকের হাততালি পেয়েছিলেন, তা সত্যকার শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রাপ্য ছিল আর একজনের, যিনি দুরানীকে করতলগত করে রেকর্ড করে ফেলেছিলেন—সেই জিম বিঙ্কসের। তিনি-যে রেকর্ড করে ফেলেছেন, রেকর্ড-বই কাছে না থাকায় দর্শকের পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব হয়নি, তাছাড়া হিসেব নেবার মতো মুড তাদের ছিল না।

দুরানীকে গ্রহণ করার পরে বিঙ্কস উইকেটের পিছনে মোট পাঁচটি ক্যাচ ধরলেন। এটি ইংরেজী টেস্ট-ক্রিকেটের রেকর্ড—কোনো ইংরেজ-উইকেটকীপার এক ইনিংসে ইতিপূর্বে পাঁচটি ক্যাচ ধরতে পারেননি। বিশ্বরেকর্ড অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার ওয়ালী গ্রাউটের। তিনি ১৯৫৭-৫৮-তে জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে এক ইনিংসে ৬টি ক্যাচ ধরেন। তাছাড়া রেকর্ড-হিসেবীরা জানিয়েছেন, এই গ্রাউটই দুবার এক ইনিংসে পাঁচটি করে ক্যাচ ধরেছেন, যে-কাজ অস্ট্রেলিয়ার জি আর ল্যাংলেও করেছেন দুবার, এবং ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের ফ্রাঙ্ক আলেকজাণ্ডার একবার।

দুরানীকে আউট করার দ্বারা ইংলণ্ডের প্রাইস এই ইনিংসে পাঁচটি উইকেট নিয়ে নিয়েছেন। তিনি দু দিকেই সুইং করিয়েছিলেন, ইনসুইংগই বেশি,

প্রবল শীতবায়ুর সুযোগ নিয়ে সুইংগে হঠাৎ-বাঁক তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, এবং দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর নামে ও কাজে যথেষ্ট মিল আছে।

অরণিকাষ্ঠরূপে যে-দেশাইয়ের সংবর্ধনা জানিয়েছিল সকলে, তিনি কিন্তু দাবানল আনতে সমর্থ হলেন না। দু' একটি স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপের পরে, ঘণ্টাখানেক মাঠে থেকে, এগারো রান করে, টিটমাসের বলে এল-বি হয়ে বিদায় নিলেন। ভারত—৯—১৯০। এখন দামী গরমকোটের সবকটা বোতাম বন্ধ করে, কিংবা চাদর কান পর্যন্ত তুলে দিয়েও শীত ঠেকাতে পারছে না কেউ। সদ্য রাশিয়া-ফেরত এক ব্যক্তি দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন 'লেনিনগ্রাডেও এত শীত নয়।'

সতের বছরের কিশোর চন্দ্রশেখর অগত্যা-হাসির হাততালির মধ্যে মাঠে নেমে প্রবীণের মত চারিদিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কুমার কিশোর উত্তীয় তাহার নাম—কোন্ বজ্রসেনের ভূমিকা তুমি নেবে বাবা!

তরুণ লেগব্রেক-গুগলি বোলার চন্দ্রশেখর টিটমাসের বলে গোড়াতেই এক গুগলি স্ট্রোক করলেন। ব্যাট চালানো দেখে মনে হয়েছিল বলটা যাবে লেগের দিকে, গেল অফে। শ্রীমানকে কিন্তু উইকেটে থেকে লীলা করতে দেওয়ার কোনো ইচ্ছা অধিনায়ক মাইক স্মিথের ছিল না। ভারত যাতে ২০০ রান না করতে পারে, সে বিষয়ে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। উইলসনকে সরিয়ে তিনি লার্টারকে আনলেন—লার্টার চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, এবং—দ্বিতীয় বল বাম্পার—! চন্দ্রশেখরের উইকেট এবং চন্দ্রশেখর নামক মনুষ্য—উভয়কেই চাই—এই ভাব। চন্দ্রশেখর কিন্তু লার্টারকে অদ্ভুত পরিহার করতে লাগলেন, এমনকি কখনো-কখনো সম্মুখীন পর্যন্ত হলেন।

ভারতের রান সত্যই দুশো হল! চন্দ্রশেখর টিটমাসকে লেগে ঘুরিয়ে নিজস্ব প্রথম ২ রান করতেই ভারতের দুশো পুরোল। আরও বিস্ময়কর, অধিনায়ক মাইক স্মিথ 'চন্দ্র'গ্রহণ অভিপ্রায়ে নতুন বল নিলেন, ও টিটমাসের জায়গায় নাইট এলেন। তিনি চন্দ্রশেখরের পিছনে সাত জন খেলোয়াড় দাঁড় করিয়ে স্নিক বা খিঁচ সংগ্রহ অভিলাষ করলেও তাঁর প্রথম ওভার নিরুপদ্রবে কাটল, এবং নাইট সেই মেডেন-লাভে যে করতালি পেলেন, তা তিনি পাননি জয়সীমার বিরুদ্ধে মেডেন আদায় করেও। অপরপক্ষে চন্দ্রশেখরের লার্টারের প্রতি অধিক পক্ষপাত। তাঁকে বাউন্ডারিতে পাঠালে লার্টার ফিউরিয়াস হয়ে বাম্পার ছাড়লেন কয়েকটি। চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময়ে চন্দ্রশেখর নাইটের বলে গ্লান্স করে যে-বাউন্ডারি করলেন, তার চেহারা দেখে তাঁর নবঅর্জিত ব্যাটিং-সামর্থ্য সম্বন্ধে কারোরই কোনো সন্দেহ রইল না।

খেলা শেষের ঠিক দশমিনিট আগে চন্দ্রশেখর আবার লেগে বাউন্ডারি করলেন। ইতিমধ্যে বোলিং-চেঞ্জ পর্যন্ত হয়েছিল। হাইকোর্ট-প্রান্তে প্রাইস এসেছিলেন। তাঁকে যখন চন্দ্রশেখর বাউন্ডারিতে পাঠালেন, তখন শীতের সেই আচ্ছন্ন সন্ধ্যার পটভূমিকায় মনে হল, হঠাৎ চন্দ্রোদয় হয়েছে। এবং আমি প্রথম দিনের লেখার শিরোনামা স্থির করে ফেললুম, 'শীতের সন্ধ্যায় চন্দ্রোদয়।'

এই শিরোনামায় বিচার অপেক্ষা আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে সন্দেহ নেই। উচিত ছিল ইংলন্ডের বোলিং-সাফল্য সম্বন্ধে শীর্ষনাম দেওয়া, যথা 'প্রাইসলেস বোলিং' বা এই জাতীয় কিছু, কিংবা ভারতের ব্যাটিং-ব্যর্থতা বিষয়ক কোনো

নাম, কিংবা অন্তত নাদকার্নিকে তুলে আনা উচিত ছিল উপরে, যিনি দিন-শেষে ৩৩ রান করে নটআউট ছিলেন, যাঁর জন্য ভারত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে শেষ উইকেটে ৪০ রান করতে পেরেছে, যা দিনের তৃতীয় শ্রেষ্ঠ জুটি-রান—তবু এক্ষেত্রে নাদকার্নিকে বিশেষ করে স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ করিনি, যেহেতু তিনি বিপদে নিত্যস্মরণীয়—আমি চন্দ্রশেখরকেই বেছে নিয়েছিলুম, এবং তার কারণও আছে।

দেশাই আউট হওয়ার পরে চন্দ্রশেখর যখন উইকেটের দিকে আসছিলেন, তখন নাদকার্নি তাঁর সর্মভিব্যাহারে অচিরকালে মাঠত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। দর্শকের হাসির হাততালি গায়ে মেখে চন্দ্রশেখর উইকেটে দাঁড়িয়ে যে দু' একটা ব্যাট চালালেন শুরুতে, তাতে বোঝা গেল, কিশোর বালকটির কাছে ব্যাটিং অজ্ঞাত শিল্প—গ্রীক ভাষার মতোই অজানিত মহান ব্যাপার।

সেই চন্দ্রশেখর, আমরা সে ইতিহাস কিছুটা জেনে এসেছি, চারটে পঞ্চাশ মিনিটের সময়ে যখন মাঠ ত্যাগ করলেন, তখন খেলার সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল বলেই তিনি মাঠত্যাগ করেছিলেন, নচেৎ তাঁকে আউট করা যায়নি। তিনি ১৫ রানে অপরাজিত।

চন্দ্রশেখর যে একঘণ্টা মাঠে কাটিয়েছেন তার মধ্যেই তিনি গোটা ব্যাটিং ব্যাপারটি শিখে নিয়েছিলেন। তিনি-যে-কোনো সময়ে আউট হতে পারতেন, কে না জানে। কিন্তু তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, দলের প্রয়োজনে কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়া যায়: নিত্য প্রশংসিত অপ্রস্তুত ব্যাটসম্যানদের পক্ষে কথাটি স্মরণযোগ্য।

বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য মনসুর আলী পাতৌদির পক্ষে। মনে সুর-তোলা মনসুরের কোনো-কোনো খেলার রোমন্থনে অনেক কাল দর্শক কাটিয়েছে, তিনি ভারতীয় দলের সবচেয়ে নিরাপদ খেলোয়াড়, যেহেতু স্থায়ী অধিনায়ক—তিনি এবার কিছু খেলুন। গোটা ও ভাঙা চশমা পরে, দলজোড়া করে কতদিন থাকবেন—সকলের প্রশ্ন। পাতৌদির প্রতি দর্শকের সহানুভূতির অন্ত ছিল না। অনেকক্ষণ পরে তিনি শূন্যের মধ্যে একের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন, তাতে কল্পান্তশেষে কল্পারম্ভ কল্পনা করে সকলে উত্তেজিত হয়েছিল, কিন্তু হায়, তিনি রানের ব্যাপারে অদ্বৈত থেকে দ্বৈত পর্যন্ত এগোলেন, তারপরেই সমাপ্তি —বহু দেবতাকে পুজাদান না করে ধর্মরক্ষা করলেন মনসুর আলী।

মনসুর আলী পাতৌদি, টাইগার পাতৌদি, বাপ্‌কো বেটা পাতৌদি—এবার একটা অদ্ভুত সঙ্গীতময় ইনিংস খেলে ফেলুন দিকি—আমরা আপনার মঙ্গল-গান করে বাঁচি—বোলার চন্দ্রশেখরের ব্যাটিং-স্তুতি করার সময়ে এই কথাটা আমাদের মনে ছিল।

ভারত—প্রথম ইনিংস: জয়সীমা ক বিঙ্কস ব প্রাইস—৩৩; কুন্দরাম ক বিঙ্কস ব প্রাইস—২৩; সরদেশাই— ক বিঙ্কস ব লার্টার—৫৪; মঞ্জরেকর ক ও ব প্রাইস—২৫; রুসি সুর্তি ব প্রাইস—০; বোরদে ক কাউড্রে ব উইলসন—২১; পাতৌদি ক বিঙ্কস ব উইলসন—২; দুরানী ক বিঙ্কস ব প্রাইস—৮; নাদকার্নি নটআউট—৩৩; দেশাই এল বি ডবলিউ টিটমাস—১১; চন্দ্রশেখর নটআউট—

১৫; অতিরিক্ত—৫। মোট (৯ উইঃ)—২৩০। বোলিং—নাইট—১১-৪-৩৮-০; প্রাইস—২০-৩-৬৩-৫; লার্টার—১৮-৪-৬১-১; টিটমাস—১৫-৪-৪৬-১; উইল-সন—১৬-১০-১৭-২।

দ্বিতীয় দিন: 'এম সি সি'-র 'এম সি সি'

ভারত প্রথম ইনিংসে শেষ পর্যন্ত ২৫১ রান করতে পারল। নাদকার্নি ও চন্দ্রশেখর শেষ উইকেটে ৫১ রানের রেকর্ড করলেন।

বাপ-মা-মরা ছেলেকে যেমন শরৎচন্দ্রের গল্পের বড়ো দাদা পরম স্নেহে বাঁচিয়ে রাখে, চন্দ্রশেখরকে নাদকার্নি তেমনিভাবে দ্বিতীয় দিন সকালে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। তারই মধ্যে নিজের রান বাড়িয়ে নিয়ে গেছেন তেতাল্লিশে।

এই দিন সকালের একটা প্রশ্ন ছিল, ভারতের শেষ উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ড ভাঙবে কি? তা ভাঙল। নাদকার্নি দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময়ে প্রাইসের বলে যে-অপূর্ব স্কোয়ারকাট করলেন, তাতে রান ও গান দুইই বেজে উঠল। পরের বলে নাদকার্নি আবার হুক করে বাউন্ডারি করলেন। এই বাউন্ডারির দ্বারাই ১৯৫৬ সালে লর্ডসে মোদী-সিন্ধের শেষ উইকেটে ৪৩ রানের রেকর্ড ভাঙল। এই জাতীয় বাউন্ডারি নাদকার্নি আরও নিশ্চয় করতেন, যদি না চন্দ্রশেখর নাইটের বলে কাউড্রের হাতে কট হয়ে যেতেন।

প্রাতঃক্রিয়ায় ইংলন্ড মোটামুটি তৃপ্তি বোধ করল। শেষ উইকেটে ভারত এই-দিন এগারো রানের বেশি যোগ করতে পারেনি। তাছাড়া মাঠে যদি কিছু প্রভাতী সজীবতা থাকে তা নষ্ট হয়েছে। ইনিংস শেষ ও সূচনার রোলারও পাওয়া যাবে।

ইংলন্ড সন্তুষ্টচিত্তে ব্যাটিং করতে নামল পৌনে এগারোটার সময়ে। বোলাস ও বিন্ডকস—দুই ওপেনার। দেশাই ও সুর্তি—দুই ওপেনার, বোলিংয়ে।

খেলার শুরুতের গন্ডগোল। বেড়ার ধারে জনতা ও পুলিশে তুমুল লড়াই। অন্ধকূপ হত্যার ঐতিহাসিকত্বে সন্দেহ আছে, কিন্তু কোনো সন্দেহ ছিল না প্রকাশ্য দিবালোকে তার ইডেনী সংস্করণে। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় এবং নিজেদের চেষ্টায় নির্দিষ্ট আসনের অনেক বেশি সংখ্যায় লোক ঢুকেছে মাঠে। তারা দম-বন্ধ হবার উপক্রম। ফলে মাঠের নানাদিকে হাত-পা ছড়াতে ইচ্ছুক। পুলিশের তাতে আপত্তি। এবং দুই ইচ্ছার বৈপরীত্যে সংঘর্ষ। আম্পায়ার শান্তিমিশন নিয়ে মাঠের ধারে হাজির হলেন। খেলা স্থগিত রইল খানিক।

খেলা শুরু হল ময়দান থেকে বোলাসের বিরুদ্ধে সুর্তির বাম হাতের সুইঙ্গ বল দিয়ে। সে বলে গতি দেখা গেল না, সুইঙ্গও শুকিয়ে গেছে শিশির শুকানোর সঙ্গে—তাতে আউট হতে পারে নিশ্চয় ব্যাটসম্যান, যদি ইচ্ছা করে। ব্যাটসম্যানদের তেমন সদিচ্ছা দেখা গেল না।

দেশাইয়ের বলেও বিপদের চেহারা অনুপস্থিত। ইংলন্ডের ব্যাটিংয়ের চেহারাতেও তাই। ১১-৪৪ মিনিটের সময়ে বোলাস প্রথম বাউন্ডারি করলেন দেশাইয়ের বলে, কভারে, তার দ্বারা ইংলন্ডের রান হল ৩৬, এক ঘণ্টায়।

গতিজীবনের শূন্যতা ভারতীয় পাতৌদি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বুঝে ফেললেন, সুতরাং বারোটার আগেই দুরানী ও বোরদেকে দিয়ে দ্বি-প্রান্ত স্পিন আক্রমণ আরম্ভ করালেন।

পাতৌদি, যিনি চমৎকার ফিল্ডিং করে রান বাঁচিয়ে নিজের না-করা রান করছিলেন, তিনি যে স্পিন-আক্রমণ আরম্ভ করে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল অবিলম্বে। বোলিং শুরু করার দশ মিনিটের মধ্যে দুরানীর বলে মিড-উইকেটে দেশাইয়ের হাতে ধরা পড়লেন বিঙ্কস। বিঙ্কস ১৩ রানের বেশি করতে পারেননি, কিন্তু তিনি পাঁচটা ক্যাচ ধরে উল্লেখ্য ব্যক্তি —সুতরাং বিদায়ে কিছু সংবর্ধনা পেলেন।

অধিনায়ক মাইক স্মিথ অধিনায়কের প্রাপ্য করতালির সামান্য অংশমাত্র লাভ করে (কারণ তিনি দলের আকর্ষণকেন্দ্র নন, দুর্ভাগ্য) মাঠে নেমে বোরদের বিরুদ্ধে আঁকুপাঁকু করতে লাগলেন। বারবার তাঁর পায়ে বল লাগল, চুল নাড়িয়ে ঘন-ঘন আবেদন জানালেন বোরদে, মাইক স্মিথ চশমা-ঢাকা করুণ চোখে আম্পায়ারের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করে খেলাতে লাগলেন।

বারোটা পাঁচের সময়ে দুরানীকে বোলাস অফে কাট করে সুন্দর বাউণ্ডারি করায় তাঁব ব্যক্তিগত রান ২৮ হল, এবং ইংলণ্ডের ৪৫। এর পরেই দুরানীকে সরিয়ে চন্দ্রশেখরকে আনলেন পাতৌদি, দুরানীর বলের ধার নষ্ট হওয়ার জন্য নয়—পরিবর্তনে যদি সুফল হয়—লাঞ্চের আগে আর একটি উইকেট খুবই প্রয়োজন। দুরানীর জায়গায় চন্দ্রশেখর এসে প্রথম ওভার মেডেন পেলেন। অপর দিকে বোলাসের উপর আক্রমণের চাপ বাড়াতে দেশাইকে সিলি-মিড অনে একেবারে ব্যাটের মুখে টেনে এনে গুঁজে দেওয়া হল। কিন্তু ইংলণ্ডের আর কোনো উইকেট পড়ল না। মধ্যাহ্নভোজের সময়ে রান দাঁড়াল এক উইকেটে সাতচল্লিশ।

লাঞ্চের পরেও কিছুক্ষণ বোরদে-চন্দ্রশেখর জুটিকে রাখলেন পাতৌদি। তখন হাওয়ার মাতামাতি মাঠে। ব্যাটসম্যানের জামার মধ্যে বাতাস ঢুকে নৌকার পাল। ধুলোর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর, রমণীয়। তখন বোরদে তাঁর স্পিনের নর্মজাল বিস্তার করে চললেন অব্যাহত আবেগে। বোরদের লেগস্পিনের বিরুদ্ধে শ্রীচরণভরসা করা ছাড়া উপায় রইল না মাইক স্মিথের। স্টাম্পের বাইরে-পড়া লেগব্রেক উইকেটের সম্মুখবর্তী চরণকে স্পর্শ করলেও লেগ-বিফোর হবে না, এই নিয়মের উপরে মাইক স্মিথের অতিরিক্ত আস্থা দেখিয়ে দিল তাঁর অস্বস্তির চেহারা।

কিছু পরেই কিন্তু চন্দ্রশেখরকে সরিয়ে নিলেন পাতৌদি। নাদকার্নি এলেন, অফব্রেক বোলার। লেগব্রেক যেখানে ইচ্ছে করে মারা হচ্ছে না, সেখানে এবার যাতে ইচ্ছে করলেও মারতে না পারো, তার ব্যবস্থা করা যাক—পাতৌদি সিদ্ধান্ত করলেন। পাতৌদি নাদকার্নিকে এম-সি-সির উপরে চাপিয়ে দিলেন।

সে সিদ্ধান্তে ইংলণ্ড অসুখী নয়। তাদের দ্রুত রান করবার ইচ্ছে নেই। তারা জার্মানদের মত রাজ্যলোভী নয় যে, হিংসেয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। তারা বনেদী সাম্রাজ্যবাদী। অনেক টুকরো-যুদ্ধ দিয়ে তারা জমি বাড়িয়েছে। সেই নীতিতেই, এক-একটি রানের প্রবাল কীটের সম্মিলনে তারা প্রবালদ্বীপ

গঠনে সচেষ্ট হল।

বোরদে কিন্তু অব্যাহত আছেন। লোভের বল তিনি ছ্‌ড়ে যাচ্ছেনই। দেড়টার সময়ে তাঁকে চাঁটি মেরে খ্‌চরো রান করলেন মাইক স্মিথ, এবং ঠিক পরের বলেই বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে বোলাস স্টাম্পড্‌-আউট থেকে বাঁচলেন। দ্‌' ঘণ্টায় ইংলণ্ডের রান হল ৬৭। স্‌ন্দর প্‌তুলখেলার মতো ক্রিকেট খেলা চলল, যার নাম ব্যাটে-বলে ড্‌য়েল। অবশেষে উত্যক্ত স্মিথ কিছ্‌ পরেই বোরদেকে লেগে তুলে বাউন্ডারিতে পাঠালেন এবং অধৈর্যের শাস্তি গ্রহণ করলেন অবিলম্বে, বোরদের বলে স্লিপে জয়সীমার হাতে ধরা পড়ে। ইংলণ্ড ২—৭৪, মাইক স্মিথ—১৯।

কাউড্রে নামলেন। বিরাট সংবর্ধনা। ক্রিকেট-ইতিহাসের কয়েকটি প্‌ষ্ঠা উড়তে লাগল তালির বাতাসে।

কাউড্রে বিশ্বক্রিকেটের চরিত্র। রানের পরিমাণের জন্য নয়, রানের প্রকৃতির জন্যই তিনি চিরবন্দিত। তাঁর এমন কিছ্‌ ইনিংস আছে, যা অনেক বহ্‌দর্শীর কাছে তাঁদের দেখা শ্রেষ্ঠ ইনিংস।

কাউড্রে সম্বন্ধে ভারতবর্ষে আকর্ষণের কিছ্‌ 'ভৌম' কারণ ছিল। ভারতেই কাউড্রের জন্ম। তিনি ভারতস্থ জনৈক চা-করের সন্তান। ক্রিকেট-প্রীতি তাঁর বংশরক্তে। তাঁর ক্রিকেট-উন্মাদ পিতা প্‌ত্রের এমন নাম দিয়েছিলেন, যাতে নাম ডাকলেই তাঁর তীর্থস্মরণ হয়। সে নাম—এম সি সি—মাইকেল কলিন কাউড্রে।

কাউড্রে কত বড় খেলোয়াড় তার আলোচনায় সবাই ম্‌খর। তাঁর মধ্যে আছে হ্যামণ্ডের ছায়া—তাঁর সামনের পায়ের ড্রাইভে ক্রিকেটের উন্নত মহিমার দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়—প্রশস্তির শেষ ছিল না। একটি চমৎকার কাউড্রে-কাহিনী কেউ-কেউ জেনে ফেলেছিল। কাউড্রে যখন স্ক্‌লে পড়েন, তখন প্‌থিবীর সেরা মিডিয়াম-পেস বোলার মরিস টেট এলেন স্ক্‌লেব ক্রিকেট-কোচ হয়ে। এসেই কাউড্রের প্রেমে পতিত। সে প্রেমের এমনই প্রকোপ যে, আম্পায়ারিং করবার সময়েও অস্থির টেট। এক ক্লাব-ম্যাচের লাঞ্চের সময়ে আম্পায়ার টেট কাউড্রের বিপক্ষের জনৈক বোলারের কাছে কাউড্রের প্রশংসার তুবড়ি ছোটালেন। কাউড্রে খেলতে নামার পরেই সেই বোলার বল দিয়েই আকাশ-ফাটা ডাক ছাড়ল কাউড্রের বির্‌দ্ধে—দেখা গেল, কাউড্রের পা একেবারে উইকেট ঢেকে। আম্পায়ার মরিস টেট নির্বিকার। পরে বিচলিত বোলারকে সান্ত্বনা দেবার জন্য স্‌ধাস্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—'লাঞ্চের সময়ে তোমাকে বলেছিল্‌ম না যে, এর হাতে এমন ড্রাইভ দেখবে যা স্বয়ং ব্রাডম্যানের চেয়ে এক চ্‌ল কম নয়—আহা, বলো দিকি, সে-রকম ড্রাইভ দেখাবার মতো ধাতস্থ হয়েছে ছেলেটি কি?'

অনেক গল্পেরই নায়ক কাউড্রে। তার মধ্যে, ঠিক গল্প নয়, একটি ইতিহাস-খণ্ড ভারতীয় দর্শকদের কাছে বিষাম্‌তমধ্‌র লেগেছিল: তা হল, ১৯৫৯ সালে ভারতের বির্‌দ্ধে টেস্টম্যাচে কাউড্রে যে ১৬০ করেছিলেন, তা তাঁর অজস্র সেঞ্চ্‌রির মধ্যেও প্রথম থাকের রচনা—স্বয়ং কাউড্রে বলেছেন। সকলে উদ্‌গ্রীব, ভারতে এসে কাউড্রে তাঁর মাতৃভ্‌মির অঙ্গে কি ধরনের কালাপাহাড়ী আক্রমণ চালান, তাই দেখার জন্য।

কলকাতায় পা দিয়েই কাউড্রে নিউজ স্‌ষ্টি করলেন। নেট-প্রাকটিসের সময়ে

'জীবন' নামধেয় অঙ্গমর্দকের হাতে দু' দু'বার বোল্ড। অভিভূত কাউড্রে জীবনের হাতে নোট গুঁজে দিয়ে লজ্জা ও আনন্দ দুইই প্রকাশ করলেন।—'অ্যাঁ—তাহলে কাউড্রে ওয়েস্টইণ্ডিজের খেলায় আহত হবার পরে এখনো ধাতস্থ হননি!'—কণ্ঠে-কণ্ঠে রটি গেল এই বার্তা।

ভারিক্কি চেহারার ভব্যসভ্য কাউড্রে প্রায় দেড়টার সময়ে যখন মাঠে নামলেন, তখন তাঁর দীর্ঘ ইনিংস দেখতে চাই, কি চাই না, এই দ্বিধায় দোলায়িত দর্শককুল। কাউড্রে দু'-একটা বল ব্যাকফুটে ব্লক করলেন। বোঝা গেল, তাঁর পিছানো ব্যাটেও ঝাঁঝ আছে।

ইতিমধ্যে নাদকার্নিকে সরিয়ে দুরানীকে আনা হয়েছে হাইকোর্ট প্রান্তে। পাতৌদি আবার আক্রমণ শুরু করতে চাইলেন। নাদকার্নির নেতি থেকে তাই দুরানীর ইতিতে প্রত্যাবর্তন। দংশনশীল বোরদে তো আছেনই অপরপ্রান্তে।

ভারতপক্ষে আক্রমণাত্মক মনোভাব সত্ত্বেও বিপক্ষে চেষ্টার অভাবটাই প্রকট হল। দুরানী একেবারে ব্যাটের মুখে দু'জনকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, কিন্তু উত্তেজিত হবার লক্ষণ কেউ দেখলেন না—কি বোলাস, কি কাউড্রে। বোলাস, বোলারের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাট করতে লাগলেন এবং কাউড্রের আত্মবিশ্বাস হরণ করে বল করে চললেন বোরদে। এই পরিস্থিতিতে বোরদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য কাউড্রে প্যাডের প্রাচীরের আড়ালে বসে রইলেন।

দুটোর পরেই জল এল, এবং জলপানের পরেই দুরানীর হাতেই বোলাস-যন্ত্রণার মধুর অবসান ঘটল। বোলাস কট এণ্ড বোল্ড দুরানী—৩৯। অসাধারণ ক্যাচ ধরেছিলেন দুরানী। ইংলণ্ড—৩—৭৭। মাঠে আবার উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সূচনাপর্বে ইংলণ্ডের অবস্থা ভারতের প্রথম ইনিংসের মতোই।

পার্কস্ নামলেন। প্রথম বলেই বাউণ্ডারি করে স্ট্রোক-প্লেয়ার রূপে তাঁর সুখ্যাতির মর্যাদা রাখলেন। কিন্তু তারপরেই দুরানীকে লেগে ঘোরাতে গিয়ে সম্পূর্ণ ফসকালেন। পরের ওভারে বোরদে নিজের বলে পার্কসের ক্যাচ ধরতে ডিগবাজি খেয়েও পারলেন না—পারলে ক্রিকেটের স্মরণীয় ক্যাচের একটি হত।

এতক্ষণ কিন্তু কাউড্রে ডানাকাটা পাহাড়ের মতো ইডেনের উপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দুটো কুড়ি মিনিটের সময়ে দুরানীর বলে ১ রান নিয়ে কাউড্রে যখন রানের খাতায় প্রথম অংকপাত করলেন—তার পূর্বে চাল্লিশ মিনিট সময় কেটে গেছে।

চ—ল্লি—শ মিনিট লাগল এক রান করতে কাউড্রের!! তার অর্থ, আঘাতের পরে অবতীর্ণ কাউড্রে ইডেন-গার্ডেনে চাল্লিশ হাজার লোকের সামনে বিনা নেটে নেটপ্রাকটিস করছিলেন?

পাতৌদি আবার বোলিংচেঞ্জ করলেন। দুটো পঁচিশ মিনিটের সময়ে চন্দ্রশেখর এলেন—বোরদের জায়গায় নয় কিন্তু—দুরানীর জায়গায়। লাঞ্চের কিছু পূর্ব থেকে বোরদে একটানা বল করে চলেছেন—আর সে কী আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে। পার্কসকে তিনি বারবার পরাভূত করলেন। তার মুখামৃতে পবিত্রীকৃত সেইসব দৈব'বলে'র সামনে পার্কসের মতো লঘুচরণ, ত্বরিতহস্ত ব্যক্তিরও কিছু করবার ছিল না।

দুরানীর বদলে চন্দ্রশেখরকে আনা হয়েছিল ব্যাটসম্যানের ধীর দ্বিবেচনার

উপর গতিময় বক্রতার আঘাত করার জন্য—কিন্তু অবিলম্বে কোনো ফল হল না, কারণ পার্কস ও কাউড্রে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির ব্রত নিয়েছিলেন। দুটো চল্লিশ মিনিটের পরে কাউড্রে আবার বিপুল করতালি পেলেন। তিনি দু' রান করেছেন। এখন ৬০ মিনিটে তাঁর মোট রান ৩। তিনি চন্দ্রশেখরের মতোই যেন সরলতা থেকে শুরু করেছেন। অজ্ঞান থেকে তাঁর গতি জ্ঞানের দিকে, ধীরপদে।

দুটো ছেচল্লিশ মিনিটের সময়ে, দীর্ঘ গৌরবময় বোলিংয়ের পরে, বিশ্রাম পেলেন বোরদে। তাঁর স্থানে এলেন সুর্তি। কিছু পরে ইংলণ্ডের ১০০ রান হল ২০০ মিনিটে। চায়ের আগে চন্দ্রশেখরের জায়গায় নাদকার্নিকে আরোপ করা হল, এবং ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের নিষ্ক্রিয়তাকে বিদ্রূপ করে নাদকার্নি অস্বাভাবিক রকম ফ্লাইট দিতে লাগলেন বলে।

সাড়ে তিনটে নাগাদ, প্রায় দু ঘণ্টা খেলার পরেও যখন কাউড্রে নিজস্ব দশ রানে উপবিষ্ট রইলেন, তখন বাধ্য হয়ে দর্শকেরা সমস্বরে ধ্বনি তুলল—না তুলে পারল না—'কাউড্রে—যাহ রে!' সেই শুনে কাউড্রের সুগোল মুখমণ্ডল সুবর্তুল হাসিতে ভরে গেল।

কাউড্রে হয়ত আপন মনে বললেন, আরে তোমরা হলে বিজাতি ভারতীয়, তোমরা তো ব্যারাক করবেই, কিন্তু আমার স্বজাতির দর্শকই কি ছেড়েছে? কাউড্রের বোধ হয় ইচ্ছা হল, তাঁর আত্মজীবনীমূলক ক্রিকেট-গ্রন্থটির অংশ-বিশেষ মাইকযোগে পাঠ করে শোনান। অতীব সাধুতার সঙ্গে শ্রীকাউড্রে লিখেছেন—

In the M.C.C. vs. Indian's match (1952) I madc 9 in an hour and a half, and was barrackcd by 20,000 spectators on thc Saturday afternoon. Looking back on it now, I suppose I was defcated by the occasion. Gulam Ahmed certainly bowled very accurately, but I was unsure of myself and was obsessed by the need to play correctly. I was afraid of making silly mistakes and set myself to wait for the bad ball, which did not come. I was eventually run out trying to give the strike to Tom Graveney who was playing beautifully, and the crowd were delighted to see my back."

সরলার্থ—শ্রীযুক্ত কাউড্রে ১৯৫২ সালে এম সি সি-র হয়ে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে দেড় ঘণ্টায় ৯ রান করেছিলেন। তাঁর সেই খেলা শনিবার অপরাহ্ণের ২০,০০০ দর্শককে এমনই পীড়িত করে যে, তারা ব্যারাক করতে বাধ্য হয়। গোলাম আমেদ অবশ্য খুব ভাল বল করেছিলেন, তা হলেও, কাউড্রের মতে, ঘটনার গুরুত্বে অভিভূত হয়ে তিনি ত্রুটিহীন খেলার চেষ্টাতেই এই ধরনের ব্যাটিং-বন্ধ্যাত্ব দেখিয়েছিলেন, ফলে যখন তিনি রান-আউট হয়ে গেলেন, তখন দর্শকেরা তাঁর পিঠের চেহারা দেখে সবিশেষ খুশি হল।

কাউড্রের আত্মকথা থেকে যদি একটা দুটো কথা বদলে দেওয়া যায়, যদি গোলাম আমেদ সরিয়ে তার জায়গায় বোরদে বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কলকাতা-টেস্টে নিজের খেলা সম্বন্ধে কাউড্রের আত্মকথা পুনশ্চ পেয়ে যাই। শুধু তফাত এই, সেটা ছিল ১৯৫২, এখন ১৯৬৪। সেদিন কাউড্রে প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে নবাগত, একটাও টেস্ট খেলেননি। আর এখন এক যুগ পরে,

কাউড্রে ৬৭টি টেস্টের কষিত কাঞ্চন।

কাউড্রে অবশ্য স্বদেশীয় দর্শকের তুলনায় ভারতীয় দর্শককে কিছু বেশি অসহিষ্ণু দেখেছিলেন। ১৯৫২ সালে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে দেড়ঘণ্টায় ৯ রান করায় ইংরেজ-দর্শক ব্যারাক করেছিল, কিন্তু ১৯৬৪ সালে ভারতীয় দর্শক দেড় ঘণ্টায় তার প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক রান দেখেও, দুঃখের বিষয় অখুশি ছিল।

দর্শকের ব্যারাকে কি না জানি না, কাউড্রে চারটের কাছাকাছি সময়ে কিছু সচল হলেন। এবং এই সময়ে তাঁর কয়েকটি মার ক্রিকেটের গৌরব ঘোষণা করল। তিনটে চুয়াল্লিশ মিনিটে পা বাড়িয়ে দুরানীর বলে টোকা দিয়ে মিডউইকেটে হিসেব করে যে বাউন্ডারি করলেন, তা সত্যই অপূর্বদর্শন, এবং অল্প পরে নাদকার্নির একটা বল ফসকাবার পরে, ঠিক পরের বলে একই জাতীয় বাউন্ডারি বেরিয়ে এল তাঁর ব্যাট থেকে। কাউড্রের এই একাদশীভঙ্গ কিন্তু দ্বাদশীর পারণভোজের রূপ নিল না, কারণ আবার তিনি ঝিমিয়ে গেলেন এবং সেই সময়ে পুনরাগত বোরদের সকল লোভের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে লাগল তাঁর জন-বুলী দার্ঢ্যে ধাক্কা খেয়ে। দর্শকেরা আর সইতে পারল না, আবার তারা চিৎকার শুরু করল কাউড্রে-পরিকল্পনার চেহারা দেখে। দেখা গেল কাউড্রে স্থির করেছেন, প্রথমে মাঠ-ব্যায়ামে মেদ ঝরাবেন, সেইকালে ক্রমে-ক্রমে চোখের সঙ্গে ব্যাটের নার্ভগত সংযোগ স্থাপিত হবে, তারপরে ধীরে-সুস্থে সংগৃহীত রানের দ্বারা 'কাউড্রে এখনো ফর্ম ফিরে পাননি'—এই অপবাদ দূর হবে—তবে না মারধর!

ঠিক এই সময়ে ক্রিকেটদাস কাউড্রে একটি বৈষ্ণব কবিতার পাত্র হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন—

> দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে ক্রমে গোল্লা ঘুচায়লু
> দু' এক করিয়া বাড়ে রান।
> রগড়ি রগড়ি ধীরে পঁচিশ হইল রে
> চলিশে দিনহি অবসান॥

কবিতায় একটু ভুল আছে, কাউড্রে দিনাবসানে চল্লিশের উপরে আরও এক রান বেশি করেছিলেন।

কাউড্রের প্রতি নিশ্চয়ই সকলের সহানুভূতি ছিল। তিনি আঘাতের পরে ক্রিকেটে পুনর্বাসন চাইছেন। তবু দলরূপী এম-সি-সি এবং ব্যক্তিরূপী এম-সি-সি'র কাছে আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিলই। ক্রিকেট আপনারা সৃষ্টি করেছেন বলে তাকে ধ্বংসের দায়িত্বও কি আপনাদেরই নিতে হবে? এম-সি-সি-র কাছ থেকে ক্রিকেটের নিয়মাবলী আমরা পেয়েছি; তারও থেকে বড়ো জিনিস পেয়েছি —অলিখিত অনুশাসন—'ক্রিকেট একটা জীবনরীতি।' সেই জীবনরীতি কি *সন্ত্রস্ত, সতর্ক আচরণ মাত্র? শুধু প্যান্টের ভাঁজ ও বচনের মাধুরী বজায় রাখতেই কি তার সর্বশক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে? ক্রিকেট-নামক খেলাটিকে সংহার করা কি 'ইজ ক্রিকেট?' যেখানে ভারতীয় দল ধ্বসে পড়েছে ২৪১ রানে, মাঠের পিচে অদ্ভুত কিছু হৃদয়দৌর্বল্য নেই, সেখানে কাউড্রের মতো খেলোয়াড়ের ৪০ মিনিট শূন্যে সন্তরণ, ও ১৭০ মিনিটে ৪১ রান? এবং দলগতভাবে ইংলন্ডের প্রায় ৩০০ মিনিটে ১৪৯ রান? এটা কি ক্রিকেট?*

এম-সি-সির প্রস্তাবিত অধিনায়ক ও বর্তমান সহাধিনায়ক শ্রীযুক্ত কলিন কাউড্রেকে তাঁর নিজের কিছু পূর্বকথা ও কাজ স্মরণ করাবার প্রয়োজন হয়েছিল। শ্রীযুক্ত কাউড্রে, নিশ্চয় আপনার মনে পড়ে, ১৯৫৯ সালে ইংলণ্ডে ভারত যখন পাঁচটি টেস্টেই হেরে যায়, তখন আপনি করুণা করে ভারতের জন্য টেস্টের দিনসংখ্যা কমাতে বলেছিলেন, কারণ একপেশে খেলায় কোনো মজা নেই। আপনিই ঐ সিরিজে ওল্ড-ট্রাফোর্ডে চতুর্থ টেস্টে অধিনায়করূপে ভারতকে ফলো-অন্ করান নি। তাতে আপনার খেলোয়াড়ী মনোভাবের অভাব সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করা হলে আপনি বলেছিলেন—'কি করব, শনিবারের দর্শকেরা ফলো-অনের পরে ভারতের মাটি-কামড়ানো খেলা দেখে কি সুখ পেত?' সেদিন তাদের সুখী করার জন্যই ভারতকে ফলো-অন না করিয়ে স্বদলের ব্যাটিং-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আপনি করেছিলেন। জনগণের সুখাভিলাষী হে সুমহান শ্রীকাউড্রে! আপনাকে প্রশ্ন করি, আজ হয়ত শনিবার নয়, বৃহস্পতিবার,. কিন্তু তবু, স্কুল-কলেজ-অফিস কামাই করে, খরচান্ত হয়ে, অর্ধ লক্ষ দর্শক খেলা দেখতে এসেছে—খেলার উপরে জড়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে আপনারা কি দিয়েছেন সেই ভারতীয় দর্শকদের? জানি, ক্রিকেট আজ এম-সি-সির বহির্বাণিজ্যে দাঁড়িয়ে গেছে;' জানি, আপনারা গরিব ভারতের বহু লক্ষ টাকা—কণ্ট্রাক্ট-রূপ প্রোটেকশনের অন্তরালে বাণিজ্য করে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরের কাউণ্টিদের বাঁচাচ্ছেন; তাই বলে কি সেই ভারতীয়দের প্রতি আপনাদের কোনো দায়িত্ব নেই? হে গুরুবচনসিংহ শ্রীকাউড্রে, আপনি কি বলেন?

দ্বিতীয় দিনের খেলায় আকর্ষণীয়তা না থাকলেও দিনের শেষে ভারতের আকাশে মেঘখণ্ড দেখা গেল। সাত উইকেট হাতে নিয়ে ইংলণ্ড মাত্র ৯২ রান পেছিয়ে রইল প্রথম ইনিংসে। যদি কাউড্রের শরীরের আকারের মতোই ব্যাটের আকার বেড়ে যায় আগামীকাল, তাহলে যে-টুকরো মেঘকে আকাশপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে, তা সমস্ত ভারতীয় আকাশকে মেঘময় করে ফেলবে সন্দেহ নেই—দিনান্ত চিন্তা দর্শকদের।

•

ভারত—প্রথম ইনিংস: নাদকার্নি নটআউট—৪৩; চন্দ্রশেখর ক কাউড্রে ব নাইট—১৬; অতিরিক্ত—৫। মোট—২৪১।

বোলিং (সম্পূর্ণ ইনিংসের)—নাইট—১৩·২—৫—৩৯—১; প্রাইস—২৩—৪—৭৩—৫; লার্টার—১৮—৪—৬১—১; টিটমাস—১৫—৪—৪৬—১; উইলসন—১৬—১০—১৭—২।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস: বোলাস ক ও ব দুরানী—৩৯; বিন্কস ক দেশাই ব দুরানী—১৩; স্মিথ ক জয়সীমা ব বোরদে—১৯; কাউড্রে নটআউট—৪১; পার্কস্ নটআউট—২৯; অতিরিক্ত—৮। মোট ৩ উইকেটে—১৪৯।

বোলিং—দেশাই—৭-০-২৪-০; সুর্তি—৬-২-৮-০; জয়সীমা—৩-১-৩-০; দুরানী—১৫-৫-৩৬-২; বোরদে—২৮-১৩-৩৫-১; চন্দ্রশেখর—১১-৩-১৮-০; নাদকার্নি—১৮-৩-১১-১৭-০।

তৃতীয় দিন : 'এক টুকরো ইংলন্ড'

আকাশের মেঘ বেড়েছিল। সত্যই মেঘে আকাশ ঢেকেছিল। বিশ্রাম-দিবসের পরবর্তী, খেলার তৃতীয় দিন সকালে মেঘের কৃষ্ণচ্ছায়া ইডেনের সবুজ দ্বীপের উপর আতঙ্ক বিস্তার করে রইল।

আমি কিন্তু এখানে আলঙ্কারিক ভাষায় কথা বলছি না। ইংলন্ডের হাতে ভারতের দুর্দশার ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করে উপরের অনুচ্ছেদটি লিখিত হয়নি। সত্যিকারের মেঘ, সত্যিকারের জল, যা তৃতীয় দিনের অর্ধাংশকে ভিজিয়ে নষ্ট করে দিল।

সকালে অল্প বৃষ্টি ঝরেছিল। তবে খেলা বন্ধ হবার পরিমাণে নয়। তবু বৃষ্টি-মেঘের নতুন পরিবেশে বিচিত্র প্রত্যাশায় উন্মুখ সকলে। খেলা শুরু হয়ে গেল। উঁচু গ্যালারী থেকে মনে হল, ছায়াময় পটভূমিকায় শ্বেতবস্ত্রাবৃত কয়েকটি গতিশীল মানুষ যেন বিচ্ছিন্ন সুদূর কোনো দ্বীপের নন্দন চরিত্র। বাস্তবে অবাস্তবে চেতনা একাকার। হাইকোর্টের দিক থেকে বল দিতে লাগলেন ভারতের একমাত্র গতি-যন্ত্র দেশাই। কিন্তু দেশাইয়ের 'অশ্বশক্তি' অনেক হ্রাস পেয়েছে। আর...আঁধারে চোখ জেবলে খেলতে অভ্যস্ত ইংরেজ ক্রিকেটাররা।

কাউড্রের অন্তত যে বল দেখতে কোনই অসুবিধে হচ্ছে না, তা তিনি মারের বহরে দেখিয়ে দিলেন। খেলা শুরুর দশ মিনিটের মধ্যে কাউড্রে দুরানীকে অফে কাট করে চার রান পেলেন, এবং পরের বলেই লেগে পুল করে এক অসাধারণ বাউন্ডারি করলেন—সেটি ছিল তিন দিনের মধ্যে সেরা মার। কাউড্রে উনপঞ্চাশে পৌঁছে গেলেন। কাউড্রের খেলা দেখে, ঠান্ডার জন্যও বটে, পাতৌদি ওভারের ফাঁকে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে লাগলেন ; পরে হাজির হলেন আম্পায়ারের কাছে, আম্পায়ার-মারফত বার্তা পৌঁছল প্যাভিলিয়নে। মাইক স্মিথ এলেন। দুই অধিনায়কে পরামর্শ হল কিন্তু খেলা বন্ধ হল না।

ইতিমধ্যে বোলারদের পা রাখার জায়গায় কাষ্ঠচূর্ণ ছড়ানো হয়েছে। সবাই ভরসা করছে, উইকেটের কোনো ক্ষতি হবে না, কারণ সেখানে পূর্ব থেকেই 'বজ্রচূর্ণ' দেওয়া আছে।

সাড়ে দশটার পরে কিছু আলোকোদয়। অল্প পরেই নাদকার্নি বল শুরু করে প্রথম ওভারে পঞ্চম বলে এল-বি করে দিলেন পার্কসকে। খেলার স্পার্ক্-সের জন্য পার্কস্ বিখ্যাত। এক্ষেত্রে কিন্তু তিরিশ রানের অগ্নিহীন একটি ইনিংসে তিনি সন্তুষ্ট থাকলেন। ইংলন্ড ৪—১৫৮।

পুরো কুড়ি মিনিট উনপঞ্চাশে কাটিয়ে পৌনে এগারোটার সময়ে দেশাইয়ের বলে কাট করে এক রান নিয়ে কাউড্রে অর্ধশতে পৌঁছলেন।

পারফিট এসেছেন পার্কসের জায়গায়। গত সিরিজে কলকাতা-টেস্টে এই পার-ফিট ব্যাট ধরে কড় জবালিয়েছিলেন। আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন। দুটি সোয়েটারের দ্বারা নাদকার্নি আকাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যের অধিকারী। আম্পায়ারের পিঠে ঝোলানো ঝাড়নে বল মুছে নাদকার্নি বল ফেলতে লাগলেন ধীরে-ধীরে। ঠিক তখনি দুঃখের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। পুঁটু নেই! পুঁটু কই! এই মাঠের সুযোগ নেবার মতো সেই একটাই বোলার ছিল আমাদের।

এন চৌধুরীর বোলিংয়ের স্মৃতি শীতের বাতাসের সঙ্গে আমাদের দংশন করতে লাগল। মনে পড়ল, এমনি এক স্বল্পালোকিত দিনে লেসলি এমসকে এই মাঠে কিভাবে ব্যতিব্যস্ত করেছিলেন পুটু চৌধুরী, কিভাবে এমনি দিনে ওরেলের মতো প্রতিভাকেও পরাভূত হতে হয়েছিল তাঁর সেই তীব্রগতি অফ-কাটারে।

নাটকীয় ভঙ্গিতে এক সুসজ্জিত দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে, বাঁ হাত কোনাকুনি বুকে রেখে, ডান হাত উপরে তুলে, বুক চিতিয়ে বিশাল আক্ষেপোক্তি করলেন, ওহ্ পুণ্টু, হুঅ্যার য়্যু আর? ইণ্ডিয়া ইজ ইন নীড্ অব দী—ঈ—ঈ!!!

পুটুর স্বপ্ন থাক। বাস্তবে যে দুজন সুইংগবোলার দলভুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুর্তি অসুস্থ। একমাত্র দেশাই। তিনিই বারবার পরাভূত করলেন পারফিটকে, যদিও পারফিটের ভাগ্যকে পরাভূত করতে পারলেন না, এবং দেশাই ও নাদকার্নি কেউই পরাভূত করতে পারলেন না কাউড্রের নৈপুণ্যকে। কাউড্রের মধ্যে প্রতিভার সহজতার চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সাড়ে এগারোটার সময়ে খেলা বন্ধ হল অনুপযুক্ত পরিবেশের জন্য। পাতৌদি আবেদন জানিয়েছিলেন।

এই পরিবেশে খেলাবন্ধ করা আম্পায়ারের পক্ষে যুক্তযুক্ত কিনা সেই আলোচনায় সরব হল বহুজন। শ্রীযুক্ত বেরী সর্বাধিকারীর বক্তব্য:

"ক্ষণে-ক্ষণে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বোলার বল গ্রিপ করতে পারছেন না। বোলারদের রান-আপ পিচ্ছিল। অসুবিধা ফিল্ডিং সাইডে। কম আলো বা বৃষ্টির বিরুদ্ধে আপীল ব্যাটসম্যান বা ফিল্ডিংক্যাপ্টেন, দু পক্ষই করতে পারেন। আপীল করেছিলেন পাতৌদি। আম্পায়ার নগেন্দ্র ও এস রায় শেষ পর্যন্ত সাড়ে এগারোটা নাগাদ আবেদন গ্রাহ্য করেন।

"পাতৌদির আপীল ও সে আপীল মঞ্জুর করা সম্বন্ধে একাধিক মন্তব্য শুনেছি। ঠিক এই অবস্থায় ইংলণ্ডে খেলা হয় ঠিক, বহুবার তা দেখেছি। কিন্তু ইংলণ্ডের মাঠ এবং গঙ্গার পাশে পলিমাটির এই ইডেন গার্ডেনের মধ্যে বহু প্রভেদ। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে বোলারের রান-আপ এখানে পিচ্ছিল হয়, সারা মাঠও তাই। ইংলণ্ডের সঙ্গে ইডেন-গার্ডেনের এমতাবস্থায় খেলার তাই তুলনা চলে না। সবের বড় কথা, এই ইংলণ্ড-ইণ্ডিয়া টেস্ট-খেলার বিশেষ কয়েকটি নিয়ম স্থির হয়েছে, যার একটিতে মাঠের ফিটনেস সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার সমস্ত ক্ষমতা আম্পায়ারদের হাতেই দেওয়া হয়েছে।"

খেলায় জলাঞ্জলি পড়ল যখন, যখন অগত্যা চারিদিক নিরীক্ষণে মনোযোগ দিচ্ছি, তখন এক সুহৃদ্ স্মরণ করিয়ে দিলেন কয়েকবছর আগেকার কথা, যখন এমনি এক বৃষ্টিস্নাত ইডেন-গার্ডেনকে দেখে কৌতুকের স্ফূর্তিতে লিখেছিলুম, 'ইডেন না লর্ডস্?' আমার এই সদ্য ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বন্ধু পুনশ্চ বললেন—সংশয় রাখার প্রয়োজন নেই—এটা লর্ডসই। বড় আনন্দ হল আমার। নিজের জন্য নয়, কাউড্রের জন্য, তিনি তাঁর স্বদেশখণ্ডকে পেলেন বহু সহস্র মাইল দূরবর্তী গ্রীষ্মপ্রধান কলকাতায়। ক্যান্টারবেরীর শীতল সবুজ থেকে অনেক দূরে বাঙ্গালোরের আতপ্ত সূর্যালোকের তলে যে-কাউড্রে [illegible] ছিলেন, তাঁর প্রতি আজ [illegible] করার চেষ্টা করেছে।

কাউড্রে তাঁর হোমকে পেয়েছেন ভারতেই। ভারতীয় ক্রিকেটাররাও সৌভাগ্যবান। তাঁরা আজ, 'ইংলণ্ড ডাকে না' বলে যে-বিলাতী প্রকৃতিকে অনেকদিন পান নি, তাকেই লাভ করলেন ভারতের বুকে। ক্রিকেটারদের প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে প্রকৃতিদেবী যে-কাজ করলেন, তার ফলভোগ কিন্তু করলুম আমরা—দর্শকের দল। বৃষ্টি অল্প হলেও তাকে সামলাবার মত পুরু ছিল না চটের চন্দ্রাতপ। বৃষ্টিচূর্ণে অর্ধসিক্ত পোষাকের অন্তরালে প্রাণ কেঁপে উঠতে লাগল ক্ষণে-ক্ষণে হিমেল হাওয়ায়। তবু একটা কিছু নতুনের উত্তেজনায় চঞ্চল পারি-পার্শ্বিক। মেঘ, বৃষ্টি, কালো আকাশ, বিবর্ণ পটে আঁকা গাছ, মাঠ, গ্যালারি, দূরের মানুষ। স্কোরবোর্ডে টকটকে লাল প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর চোখ। আচ্ছন্ন মাঠে মানুষের খেলা।

খেলা সকলে চাইছিল। সূর্যহারা অকাল সন্ধ্যায় দীপ্তশক্তির আঘাত ও প্রতি-রোধ—সকলে চাইছিল।

খেলা কিন্তু বন্ধ রইল দীর্ঘসময়। লোকে দাঁড়াল, বসল, নেমে গেল, আবার উঠে এল প্রত্যাশায়। চায়ের আসর, তাসের আসর, গল্পের আসর। বাড়ির খাবার, স্টলের খাবার, বন্ধুর খাবার। মুখের পান, ট্রানজিস্টারের গান। কথা কাটাকাটি, চটাচটি, বাঁশ পেটাপেটি। ছোকরাদের মাথায় ঘন চুলের ছাতা, মাঝবয়সীদের মাথায় খবরের কাগজের ছাতা, মহিলাদের মাথায় রামধনু-ছাতা। এমন কি সেবারের মতই অনভ্যস্ত ঘোমটাঢাকা বধূশ্রী পর্যন্ত। তারই মধ্যে আম্পায়ারের প্রহরে-প্রহরে আগমন ও মূর্চ্ছিত খেলাটিকে এক-এক প্রহরের আয়ুদান।

অবশেষে, দুটো ছেচল্লিশ মিনিটের সময়ে, অনেক দুঃখ-দুর্ভাগ্যের শেষে, শয়ান পিচের বুক-পিঠ চাপড়ে, টিপে, দুই বিশেষজ্ঞ স্থির করলেন—এবার শ্রীপিচ খেলার ভার আবার নিতে পারবেন, যদিও স্বাস্থ্য তাঁর এখনো যথেষ্ট ডেলিকেট, বুকে পিঠে সর্দির প্যাচ একেবারে যায়নি। এইকালে লাজুক সূর্যের মুখও দেখা গেল, আর নরম আলোয় পরম বিস্ময় নিয়ে জেগে উঠল ইডেন-গার্ডেন।

১৫০ মিনিট বন্ধ থাকার পরে খেলা শুরু হল পারফিট ও দেশাইকে মুখো-মুখি নিয়ে। প্রথম বলেই ধড়পড় করে উঠল সবাই—সোজা ক্যাচ মিড অফে—অভ্রান্ত হাত বাড়িয়ে পাতৌদি। ওঃ—হোঃ—সে ক্যাচ ফেলে দিলেন গুরুমূল্য অধিনায়ক। পারফিটের রান মাত্র চার।

কিন্তু অধিনায়কের ত্রুটির স্খালন করলেন দেশাই পনের মিনিটের মধ্যে, নিজের বলে নীচু দুরূহ ক্যাচ ধরে। ইংলণ্ড—৫—১৭৫। উইলসন নামলেন।

অনেকক্ষণ আড়মোড়া ভাঙার পরে কাউড্রে হঠাৎ স্থির করলেন, এবার বিছানা ছেড়ে ওঠা দরকার। ফলে সাড়ে তিনটের কাছাকাছি সময়ে তিনি দুরানীকে যে কয়েকটি মার দিলেন, তার একমাত্র নাম হতে পারে কাউড্রে-মার। কাউড্রে—৭৮।

আমেজী ঠাণ্ডায় প্যাভিলিয়ন ছেড়ে আসা পছন্দ হয়নি উইলসনের। তিনি চন্দ্রশেখরের বলে একটু ছটফট করে এগিয়েছিলেন, ত্বরিতে স্টাম্পড্ করে দিলেন কুন্দরাম। ইংলণ্ড—৬—১৯৩। সময় তিনটে পঁয়ত্রিশ।

নবাগত নাইটকে নিয়ে চন্দ্রশেখরের মার্জার-মূষিক লীলা চললেও নাইট তেড়ে-ফুঁড়ে উঠে দু' চার রান করায় কিছু পরে ইংলণ্ডের দুশো রান হল। তারপরে

নাইটও বিদায় নিলেন চন্দ্রশেখরকে ফাঁকি দিয়ে নাদকার্নির বলে, মঞ্জরেকরের হাতে কট। ইংলণ্ড—৭—২১৪।

টিটমাসের অবতরণ। তাঁর 'মাস' খাবলে খাবার জন্য মুখ বাড়িয়ে ঘিরে রইল সাতটি লোভী শৃগাল। টিটমাসের ক্ষেত্রে স্লিপ-সিলি-গালির মালা, সে মালা বাউণ্ডারির দড়িতে শুকুতে লাগল যখন কাউড্রে ক্রীজে।

দুশো রান পেরোলেও পাতৌদি কিন্তু নতুন বল নেননি। কাউড্রে-টিটমাসকে যখন বিচ্ছিন্ন করা যাচ্ছে না, তখন সওয়া চারটে নাগাদ দ্বিতীয় দিনের বীর বোরদেকে ডাক দেওয়া হল। বোরদে-কাউড্রে ডুয়েল চলল বেশ কিছুক্ষণ, বহু মেডেনে সম্মানিত হলেন বোরদে, কিন্তু কাউড্রেকে ফেরাতে পারলেন না, এবং টিটমাসও স্প্রিংয়ের পুতুলের মত নড়েচড়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মাঠের উপরে। দিন শেষে ইংলণ্ড করল ৭ উইকেটে ২৩৫। কাউড্রে অপরাজিত—৯০। টিটমাস অপরাজিত—১২।

খেলার তৃতীয় দিনে, ভারতের পক্ষে আনন্দদায়ক না হলেও আতঙ্কজনক কিছু ঘটেনি। পরিবেশের সুযোগ ভারত পেয়েছিল। কিন্তু তা নেবার মত উপযুক্ত বোলার না থাকায় ভারতেরই অধিনায়ক পাতৌদি খেলাবন্ধের আবেদন জানিয়েছিলেন। বৃষ্টি ও ভারী বাতাসকে ব্যবহার করতে পারে, এমন প্রথম-শ্রেণীর অফব্রেক বা সুইঙ্গ বোলার ভারতে নেই। বামে 'বলরূপী কার্ত্তিকেয়' অর্থাৎ লেগব্রেকই ভারতের ভরসা। লেগব্রেক, যা পাদপ্রণামে উৎসুক, ভারতীয় স্বভাবসঙ্গত বল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই পরিবেশের সর্বোপযোগী বল তা নয়। তা হলেও, ভারতীয় বোলাররা এখনো স্বদলের রানসংখ্যা পেরোতে দেয়নি ইংলণ্ডকে। অপরদিকে উৎসাহের অভাবে বা দুর্বলতার কারণে ইংলণ্ড আজকেও অস্বাভাবিক মন্থরগতিতে খেলেছে। আজকে তার মোট রান মাত্র ৮৬, ১৮০ মিনিটে। চার উইকেট খুইয়ে ঐ রান সে করেছে। বিস্ময়ের কথা অত সামান্য রান হয়েছে, যখন একদিকের উইকেট অটুট ছিল, কাউড্রের কারণে। অবিচলিত কাউড্রে তৃতীয় দিনেও ১৮০ মিনিটে ৪৯ রানের বেশি করতে পারেন নি।

না পারলেও, একথা স্বীকার করতেই হবে, তাঁর আজকের খেলা তাঁর, এম-সি-সিত্ব কিছুটা দেখিয়েছে। দ্বিতীয় পাণ্ডবের মতো কাঁধে করে তিনি ইংলণ্ডকে বহন করেছেন। কাউড্রের চোখে কোনো দোষ গত পরশুও ছিল না, কিছু আড়ষ্টতা ছিল হাতে। সেটাও গেছে আজ, ফলে তিনি চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্ট তাঁর সম্ভাব্য ভূমিকা সম্বন্ধে ভারতপ্রেমিকদের মনে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করেছেন। এখন তিনি ইডেনের অথরিটি। দুদিন দুই ঋতুতে (শীতে ও বর্ষায়) মাঠবাস করেছেন। তাঁর খেলায় চান্স তো দূরের কথা, চান্সের ভূতও কেউ দেখেনি। তিনি এমন সহজে চওড়া ব্যাটে বলকে নিয়েছেন যে, ঈর্ষায় অসহ্য লেগেছে। ভারতের বুকের উপরে পাথর হয়ে চেপে বসে তিনি নির্মম যন্ত্রের মতো শোষণ করেছেন—এই কাউড্রে স্বীকার করেছেন—তিনি হাজারের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন—সর্বনাশ!

কাউড্রে ছাড়া আর কোনো ইংরেজ ব্যাটসম্যানের খেলা উল্লেখযোগ্য হয়নি। অমন যে 'মার্মারে' (মার্‌মারে) কবিতা জাগানো জিম্‌ পার্কস্‌—তিনিও তাঁর দীর্ঘ অবস্থানে কোনো আনন্দ দিতে পারেন নি। পারফিট-উইলসন-নাইট—

যাতায়াত করেছেন মাত্র, রয়েছেন টিকেন্দ্র টিটমাস। রসিক দর্শক বলেছেন—ওহে বোলারগণ! অ্যান্টি-টিটমাস বলের ইনজেকশন দাও।

একটি উত্তেজনাময় অথচ ব্যর্থ দিনের শেষে রাত্রিতে কলম নিয়ে ভেবেছি—আমাদের আরও কিছু পাওয়া উচিত ছিল। কেন ম্লান আলোয় শ্রেষ্ঠ ব্যূহ-রক্ষার খেলাই মাত্র কাউড্রের হাত থেকে পাব, কেন মত্ত বিক্রম নয়—কেন জিম পার্কস্‌কে অসহায়ভাবে আউট হয়ে যেতে দেখব, কেন তাঁর সেই খেলা দেখব না, যা দেখে ক্রিকেটরসিক কবির মনে লীলার খেলা শুরু করে দিয়েছিলেন স্মৃতি-সুন্দরী—

Parks takes ten off two successive balls
from Wright,
A cut to the rhododendrons and
a hook for six.
And memory begins suddenly
to play its trics :
I see his father batting as
if here, he might.

ভারত—প্রথম ইনিংস—২৪১

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস : কাউড্রে নটআউট—৯০; পার্কস এল বি ডবলিউ ব নাদকার্নি—৩০; পাররফিট ক ও ব দেশাই—৪; উইলসন স্টাম্পড কুন্দরাম ব চন্দ্রশেখর—১; নাইট ক মঞ্জরেকর ব নাদকার্নি—১৩; টিটমাস নটআউট—১২; অতিরিক্ত—১৪। মোট ৭ উইকেটে—২৩৫।

বোলিং (এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হিসাব)—দেশাই—১৭-৩-৩৯-১; সুর্তি—৬-২-৮-০; জয়সীমা—৩-১-৩-০; দুরাণী—২২-৭-৫৯-২; বোরদে—৩১-১৪-৪০-১; চন্দ্রশেখর—২১-৫-৩৬-১; নাদকার্নি—৩৭-২১-৩৬-২।

চতুর্থ দিন: 'রবিবাসরীয় ক্রিকেট'

রবিবার অর্থাৎ চতুর্থ দিন সকালে যখন মাঠমুখী আমি, তখন সমস্ত মনে গভীর ক্রিকেট-চিন্তা: খেলাটি কি একেবারে মরে গিয়েছে, না এখনো জীবন্ত আছে কিছু? যদি মরে গিয়ে থাকে দায়িত্ব কার? যদি জীবন্ত থাকে, তা কি 'ক্রিকেট অনিশ্চয়' নামক প্রবচনটির উপর নির্ভর করে? খেলার বাকি আছে দুদিন।

খেলাটি যদি মৃত্যুমুখী হয়ে থাকে, তাহলে দায়িত্ব নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের। যেখানে একদিনের অল্প কিছু বেশি সময়ের মধ্যে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ (ইংরেজ বোলাররা অবশ্য দায়িত্ব পালন করেছিলেন), সেখানে পরবর্তী ৪৬৩ মিনিটে সমবেতভাবে ইংলণ্ড করল ২৩৫ রান। এবং কাউড্রে করলেন ৩৪৪ মিনিটে ৯০!! সন্দেহ নেই, ক্রিকেটকে অনশনে অপুষ্টিতে মৃত্যুমুখে এগিয়ে দেবার নিষ্ঠুরতা ইংলণ্ডই দেখিয়েছে। তার সর্বাধিক দায়িত্ব কাউড্রের—যিনি মুমূর্ষুর দেহে রক্তসঞ্চালনের জন্য আগত, যিনি ক্রিকেটে প্রথম থাকের মারিয়ে খেলোয়াড়!

সবাই জানে, মার তাঁর আত্মবস্তু বলেই তিনি মারাত্মক।

তবু কাউড্রে কেন ঐ অদ্ভুত অলস ইনিংসটি খেললেন, যখন খেলার পরিস্থিতি অনুযায়ী আক্রমণই একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু ছিল, যখন হাতে ছিল গোটা দ্বিতীয় ইনিংস। তা কি নিজ স্বার্থের জন্য, কিংবা দলগত স্বার্থে—অথবা উভয়েরই প্রয়োজনে?

'নিজ স্বার্থ' কথাটা কদর্য। মর্যাদার পুনরুদ্ধারের জন্যই তিনি সেঞ্চুরি-প্রার্থী—তার জন্য ইংলণ্ডের সম্ভাব্য জয়লাভ পর্যন্ত তিনি বলি দিতে প্রস্তুত—একথা ভাবতে অনিচ্ছাবোধ করাই ভদ্রতার লক্ষণ। তাহলে দ্বিতীয় কথাটাই কি ঠিক—কাউড্রে ইংলণ্ডের স্বার্থে মাঠে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন? যদি একথা সত্য হয়, সেক্ষেত্রে ইংলণ্ড-ক্রিকেটদল সম্বন্ধে কোনোপ্রকার শ্রদ্ধা রাখা কঠিন হবে—তাহলে খেলোয়াড়রা আহত থাকার জন্যই প্রথম দু' টেস্টে ইংলণ্ডের দুর্দশা, এ কথাটা একেবারে মিথ্যা হয়ে যাবে।

সম্ভবত ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় স্বার্থেই কাউড্রে ঐ খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কারণ উভয়ের হাতেই প্লাস্টার করা ছিল এতদিন, সবে খুলেছে, তাই আড়ষ্ট শরীর। পরের টেস্টে লড়াই করার আগে এই টেস্টে চালু হয়ে নেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শেষ প্রশ্ন, খেলাটি কি একেবারে সত্যই মরেছে? বোধহয় নয়। উত্তম বৈদ্য নাড়ি ধরলে প্রাণ-ভোমরার গুঞ্জনটি কোথায় বাজছে ঠিক ধরে ফেলবেন। সেই উত্তম বৈদ্য কে হবেন? কাউড্রে কি?

হ্যাঁ, কাউড্রে এখনো সেই ভূমিকা নিতে পারেন—চতুর্থ দিনেও। তিনি নব্বুয়ে আছেন, সেঞ্চুরিটা করুন, সেটা তাঁর কষ্টের ন্যায্য পাওনা—তার পরে বাকি তিন উইকেটের সাহায্যে একটু পাগলামি করুন না কেন—গতির নেশায় খ্যাপামি—ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়লে ক্ষতি কি? সেক্ষেত্রে লাঞ্চের মধ্যে ইংলণ্ড আরও অন্তত দেড়শো রান বাড়িয়ে নিতে পারবে। এবং যদি শেষ হয়ে যায় ইনিংস তাদের—তবু ভারতের থেকে এগিয়ে থাকবে প্রায় দেড়শো রানে। সে কী অদ্ভুত কাণ্ড হবে—কাউড্রে দ্বিশতাধিক, এবং ভারত-গেল-গেল উত্তেজনা। যদি থাকল, অদ্ভুত তার আত্মরক্ষা, যদি গেল—অন্তত মীমাংসাটা তো পাওয়া গেল!

ছি! আমার দেশহিতৈষী বিবেক আপত্তি করল। লজ্জা হয় না, শুধু ভারতের ক্ষতির চিন্তা? কাউড্রে কী এমন খেলোয়াড় যে, তিনি আউট হতে পারবেন না! এ রকম পরাজয়ী মনোভাব থাকলে কোনোদিন কেউ জয়ী হতে পারে? সুতরাং—সকালেই কাউড্রে আউট—আমার দ্বিতীয় মন বলল। সকালেই ধ্বংস—তিনজন ইংরেজের প্রাণহানি তাতে, বিখ্যাত পর্বতারোহী কাউড্রে-সুদ্ধ। ইংলণ্ড ভারতের প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যা (আর ৬ রান মাত্র বাকি) পেরোল, কি পেরোল না—সবচেয়ে ভাল হয় 'টাই' হলে—তারপর ভারত সারাদিন উড়িয়ে পুড়িয়ে মারল ইংলণ্ডের বোলিংকে—এবং মারতে-মারতে, আউট হতে-হতে, দিন-শেষে যখন সত্যই আউট হয়ে গেল, তখন ইংলণ্ডের সঙ্গে পৌনে তিনশো রানের ব্যবধান—ইংলণ্ডের হাতে ৩৩০ মিনিট সময়—শেষদিনে ইংলণ্ড খুব যুঝল—খেলাটিকে প্রায় শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল, কিন্তু—আমার স্বপ্নাচ্ছন্ন

চোখের সামনে ভারতের সম্ভাব্য বোলিংয়ের ছবি ভেসে উঠল—

...অপূর্ব বল বোরদের—বোরদে-মায়ার দীর্ঘবিস্তার, বিচিত্র ছলনার তলে অভ্রান্ত অস্ত্রক্ষেপ। ভারতীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এখন বোরদে। বোরদে, দুরানী ও চন্দ্রশেখর—তিনজনে ক্রমান্বয়ে লেগব্রেক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। পরম আকর্ষণীয় একটি চিত্র : নাচ-ভাঙা ছন্দে বোরদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন বল, চক্রধরা বলের রূপে মুগ্ধ হয়ে বিষের কথা ভুলছে ব্যাটসম্যান ; এগিছে আসছেন ব্যক্তিত্বময় পদক্ষেপে দুরানী, বাইরে শান্ত ভিতরে বক্র বলযোগে আদেশ করছেন মর্যাদার সঙ্গে ; তরুণ চন্দ্রশেখর তরুণ কেউটের মতই অধীর, নিরন্তর দংশন-লুব্ধ...

আমার নিখাদ কল্পনা আরও এগিয়ে চলল—ইংলণ্ড দিনান্তের পূর্বেই আউট, ২২৫ রানে—আমরা আনন্দে ও আতঙ্কে লাফানো হৃৎপিণ্ডকে দুহাতে সজোরে চেপে ধরে বসে আছি—বিজয়-মারটি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাত ছেড়ে দিলুম, ছাড়া পেয়েই হৃৎপিণ্ড উল্লম্ফমান, তার সঙ্গে তাল দিয়ে আমরাও লম্ফঝম্ফ দিচ্ছি...

সুন্দর মধুর স্বপ্ন, রবিবারের সকালে। শনিবারের ম্লানতা কেটে গিয়ে রবি-বারের সুখী সূর্য রূপবিকাশ করেছে। বেলা দশটায় কলকাতা-শহর গাড়ির ফেনা নিয়ে উপচে উঠেছে ইডেন-গার্ডেনের উপর—আমি ভাবছি ক্রিকেটের কথা, সবাই ভাবছে ক্রিকেটের কথা—ক্রিকেট! ক্রিকেট! ক্রিকেট!

নিজের আসনের কাছাকাছি গিয়ে দেখি, ছোঁড়াগুলো বৃদ্ধকে আবার জ্বালাচ্ছে। আমুদে বৃদ্ধটি কয়েকদিন সকলকে বড় আনন্দ দিয়েছেন। তাঁর উৎফুল্ল উপস্থিতি-ভিন্ন এ ক'দিনের অসম্ভব শ্লথ ক্রিকেট সুসহ হত না। অল্প বয়সীদের সঙ্গেই তাঁর বেশি ভাব। তাই বলে ঠাকুরদার বয়সী লোককে নস্যির ডিবে হাতে গুঁজে দেবে! আর গলা জড়িয়ে কানে-কানে গুঞ্জন? বৃদ্ধের সঙ্গে ছেলেগুলির কোনই আত্মীয়তা নেই, তা বুঝকে দেরি হয়নি। তবু এই অশোভন গায়ে পড়াপড়ি! প্রবীণরা যদি নিজের মান নিজে না রাখেন!—এই জন্যই তো ছেলেপুলেদের সামলানো যায় না—আমার বিরক্তির সীমা রইল না।

ছেলেগুলো কিন্তু বৃদ্ধকে ঘিরে গুজগুজ করেই চলেছে।—'দাদু মনে থাকে যেন।' দাদুও ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ হ্যাঁ—'

খেলা শুরু হয়ে গেল যথাসময়ে। ময়দান থেকে নাদকার্নি কাউড্রের বিরুদ্ধে প্রথম ওভার মেডেন পেলেন। অন্যপ্রান্তে দেশাই। নব্বুয়ের তারের উপরে সার্কাস-তরুণীর মতো ব্যাট ধরে ব্যালান্স রাখছেন কাউড্রে। ভারত নতুন বল নিতে পারছে না, এমন দুর্দশা তার। সুর্তি হাসপাতালে। দেশাই ও জয়সীমার উপরে নতুনের উজ্জ্বলতা বিধানের ভরসা করা যায় না। পুরনো বলে সাড়ে দশটায় দেশাইয়ের খোকা-নাচানি বাম্পার হুক করে টিটমাস ৪ রান পেলেন। ইংলণ্ড এখন ৭ উইকেটে ২৪২। ভারতের রান পেরিয়ে তার প্রথম মনস্তাত্ত্বিক প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। ঐ ওভারে দেশাইয়ের শেষ বল কাট করে বাউণ্ডারিযোগে কাউড্রে ৯৫-তে পৌঁছলেন, যদিও সেকেণ্ড স্লিপ থাকলে হয়ত ঐ মারের জন্য কাউড্রেকে প্যাভিলিয়নে পৌঁছতে হোত। দেশাইয়ের পরের পরের ওভারে কাউড্রে পুনশ্চ অফে বাউণ্ডারি করে ৯৯-এ পদস্খলন-প্রস্তরে উঠলেন। এবং পরের বল কাট করে ১ রান—হাততালি—কাউড্রের সেঞ্চুরি—অবশেষে—দশটা বেজে

৩৬ মিনিট গতে—পুরো ৩৬০ মিনিট অর্থাৎ ৬ ঘণ্টা খেলার পরে। এইটি টেস্টে কাউড্রের চতুর্দশ সেঞ্চুরি-সন্তান।

পনের মিনিট পরে ভারতীয় অধিনায়ক পাতৌদির তরুণ নবাব আম্পায়ারের ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁর পকেটস্থ বস্তুটি প্রার্থনা করলেন। নতুন বল। নব বলে বলীয়ান হতে চায় ভারত।

চাইলেই কি হওয়া যায়? খর্ব প্রবীণ দেশাইয়ের কতটুকু সামর্থ্য অবশিষ্ট আছে? যাই হোক, নতুন কিছু ঘটছে, তারই প্রথাগত উত্তেজনা।

দেশাই বল হাতে নিয়ে, দুবার হাতের হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে শরীর-মোটরে স্টার্ট দিলেন, তার পরে স্ক্রীনের দিকে মুখ করে পায়ে-পায়ে যাত্রা শুরু হল—

সড়্ সড়্ সড়্—হ্যাঁ-অ্যা-চ্চো—হ্যাঁ-অ্যা-চ্চো—

বাপ্‌রে! কি বিটকেল শব্দ! একি হাঁচি, না বজ্রপাত, ভূমিকম্প, আণবিক বিস্ফোরণ!!! একটা নয়, তিন-তিনটে হাঁচি।

তারপরেই একসঙ্গে সমবেত আওয়াজ—'জীবন! জীবন! জীবন!'

প্রাণপণে নস্যি টেনেছেন বৃদ্ধ; মুখ টকটকে লাল, নাক চোখ সজল—আর ছেলেগুলো পরমোৎসাহে 'জীবন, জীবন' করছে।

এতক্ষণে ষড়যন্ত্রের রূপটি স্পষ্ট হল। বৃদ্ধের সঙ্গে ছোঁড়াগুলোর মাখামাখির কারণও বোঝা গেল। নিশ্চয় বৃদ্ধের কোনো হাঁচি ও উইকেট, গতকাল একসঙ্গে পড়েছিল। সেই তুকটি ছেলেরা করতে চেয়েছে। যদি হাঁচি না আসে, তার জন্য নস্যের ব্যবস্থা। ভারতের স্বার্থের প্রয়োজনে বৃদ্ধ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজি হয়েছেন। এঁরা সুপরিচিত রসিকতাটি উল্টে ব্যবহার করতে চান—

প্রশ্ন—আচ্ছা, মন্ত্রের দ্বারা কি একটা ভেড়াকে মেরে ফেলা যায়?

উত্তর—নিশ্চয় যায়। তবে বিষ দিলে আর সন্দেহ থাকে না।

এদের বক্তব্য, এর উল্টোটাও সত্য। বলের দ্বারা কাউড্রেকে আউট করা যায়, তবে তুক করলে সন্দেহ থাকে না।

তাছাড়া ছেলেগুলো অদ্ভুত রসিক। বাঙালীর ছেলে তো। হাঁচলে 'জীবন জীবন' বলতে হয়। এখানে তারা তাই বলল, কিন্তু তার অর্থ দাঁড়ালো কাউড্রের কাছে—'মরণ মরণ'—কারণ 'জীবন' নামক জনৈক ব্যক্তির হাতে কাউড্রে নেটে দুবার বোল্ড হয়েছেন।

পাঠক অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন না; আমিও পাকে না পড়লে করি না। কিন্তু এক্ষেত্রে তুকতাকের কি অব্যর্থ ফল দেখলুম!—

হাঁচির বলে বলীয়ান দেশাই ছুটে আসছেন—এলেন—এসে পড়লেন—বলসুদ্ধ হাত উঁচুতে উঠল—এবং বল ছুঁড়ে দি-লে-ন—প্রথম বল—

একি! কাউড্রে আউট! মিড অফে বহু দূর থেকে ছুটে এসে অসম্ভব ক্যাচ ধরে নিয়েছেন পাতৌদি, এক হাতে, শেষ মুহূর্তে পা হড়কে যাওয়া সত্ত্বেও—

দেশাইয়ের সমস্ত গৌরবকে তুচ্ছ করে আমার চতুর্দিকে যুবকেরা নাচতে লাগল—'দাদুর হাঁচি! দাদুর হাঁচি!' একজন সুর ধরল—

দাদুর মোদের তিনটে হাঁচি—আহা হুই হুই, আহা হুই হুই, এক হাঁচিতে কাউড্রে গেল, বাকি রইল দুই!—আহা হুই হুই, আহা হুই হুই।

অহো আশ্চর্য! পাঠকদের পুনশ্চ অনুরোধ করি, যুগের অবিশ্বাসে ধরা

দেবেন না, অলৌকিকতায় আস্থা রাখুন! নচেৎ—

দেশাইয়ের পরের ওভার। পুনঃ পুনঃ নিতম্বঘর্ষণে রক্তিমোজ্জ্বল বল। তৃতীয় বলে টিটমাসের বিরুদ্ধে হা-হা ধ্বনি। অগ্রাহ্য। পরের বলে—বোল্ড! এবং পরের বলে শেষ খেলোয়াড় ভ্যাবাচ্যাকা লম্বু লার্টারের ক্যাচ! ইংলন্ড শেষ। ২৬৭ রান। সময় এগারোটা বেজে তিন মিনিট। ভারতের অপেক্ষা ইংলন্ড মাত্র ২৬ রানে এগিয়ে।

দেশাইয়ের কলকাতা, কলকাতার দেশাই। বিদায়কালেও তরুণ নায়ক। নতুন বল নিতে দেরী করে তাঁকে যে অপমান করা হয়েছিল, তা গা থেকে ঝেড়ে ফেলে উল্লাসমুখর অর্ধলক্ষ দর্শকের সংবর্ধনার মধ্যে দেশাই মাঠ ত্যাগ করলেন।

দশ মিনিট পরে দুজন পাদরি, এগারোটি 'জনবৃষ', এবং তৎপশ্চাৎ দুটি ভারতীয় বৎস, মাঠে অবতীর্ণ ক্রমান্বয়ে।

হাইকোর্টের দিক থেকে জয়সীমা প্রথমাঘাত নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন জন প্রাইসের সম্মুখে, যিনি ইনসুইংগ ও আউটসুইংগ, উভয়ের উপযোগী ফিল্ডিং সাজিয়ে (তিনটি স্লিপ এবং লেগ-স্লিপ) ছুটতে শুরু করলেন পূর্ব-দ্বিপ্রহরে। তাঁর পঞ্চম বলে জয়সীমা ১ রান নিয়ে অন্যপ্রান্তে গেলে শেষ বলে কুন্দরাম যে-ব্যাট চালালেন, সে জিনিস ইংলন্ডের একাদশ-ব্যাটসম্যান লার্টারও করতে ইচ্ছা করতেন কিনা সন্দেহ। কুন্দরামের সেই ব্যাট-চালনা ভারতীয় ক্রিকেটের সূচনাপর্বের নূতন জীবনদর্শনের চেহারা দেখিয়ে দিল—প্রথম থেকেই 'লুটি তো ভান্ডার।' তবে ভারতীয় দর্শকরা ভাবল—একি সাহস, না শিশুর অগ্নিক্রীড়া!

না, সাহসই, যথার্থ সাহস, বাজিকরের হাতের অগ্নিচক্র, অন্তত তাই দেখালেন জয়সীমা নাইটের প্রথম ওভার বলে, নিজের দ্বিতীয় ওভার খেলায়। নাইটের দ্বিতীয় বলে কোমর নামিয়ে একটু পিছনে হেলে একস্ট্রাকভারে বাউন্ডারি। চতুর্থ বলে আবার। পঞ্চম বলেও। ক্রিকেটের এত বড় মহাভোজ বহুদিন পায়নি কলকাতার মানুষ।

জয়সীমা এগিয়ে চললেন মহাবেগে। অপরপ্রান্তে কুন্দরাম অবশ্য এতখানি স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল ছিলেন না। তিনি প্রাইসের বলে বিশেষ অস্বস্তিতে ছিলেন এবং নাইট দ্বিতীয় ওভারের তৃতীয় বলটিকে তাঁর পায়ে লাগাবার পরে, এল-বি-র আবেদনসহ আম্পায়ারের সামনে আদিবাসীদের রণনৃত্য করেছিলেন, তবু তিনিও অসংবরণীয় আবেগে অস্থির ছিলেন, ফলে তাঁর হাতে কখনো বিদ্যুৎবিকাশ, কখনো শূন্যমন্থন।

প্রথম পঁচিশ মিনিটে ঘড়িকে হারিয়ে রান ছুটল—২৫ মিনিটে ২৮ রান,—যে খেলা ইণ্ডিয়ান ও ওয়েস্টইণ্ডিয়ানে প্রভেদের চেহারা ঘুচিয়ে ছিল।

জয়সীমা প্রাইসকে কিছু বিবেচনার মর্যাদা দিলেও সেটার পরিমাণ 'কিছু-মাত্র'ই ছিল। এগারোটা পঁয়তাল্লিশে, যে-প্রাইস কাঁধের জামায় বল ঘষে বল ছোড়েন, তাঁর প্রথম বলেই মিড-উইকেটে বাউন্ডারি করলেন। তৃতীয় বলে বাম্‌পায়ে ডুব দিতে গিয়ে ভূমিশায়ী হলেন, এবং ষষ্ঠ বলে মিড-অনে লিফ্‌ট্‌ করে তিন রান সংগ্রহ করলেন। ভারতের রান ৩৬, জয়সীমা ২৬, কুন্দরাম ৯।

প্রাইসের প্রাইস কিছু কমিয়ে পরের ওভারেই জয়সীমা নাইটের মুখোমুখি। প্রথম বলে সোজা ড্রাইভ, বাউন্ডারি—৪ রান। পরের বলে আবার একই স্ট্রেট ড্রাইভ—বাউন্ডারি—৮ রান। পরের বলেই লেগে ঘুরিয়ে দু' রান—১০। চতুর্থ বল ব্লক করলেন, জনতার নৈরাশ্য। পঞ্চম বল আটকালেন। এবার সন্দিগ্ধ জনতার সমর্থন—নিশ্চয় বল ভাল পড়ছে। ষষ্ঠ বলে মিড-অনে বাউন্ডারি—১৪। নাইটের বর্ম খুলে পড়ল। প্রকাশ্য দিবালোকে ক্রিকেট-জীবনের মন্দতম নাইট কাটালেন নাইট।

জয়সীমা ৪০, কুন্দরাম ৯, ভারতের ৫০। ৩৭ মিনিটে ৫০ রান। জয়সীমার ৩৭ মিনিটে ৪০। ভারত-বাড়িতে ক্রিকেটের মহোৎসব।

কিছু আগে, ইংলন্ডের ইনিংসের শেষের দিকে জয়সীমা যখন নতুন বল নিয়ে বোলিং শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর মহাকৃতিত্বে সকলে চমৎকৃত হয়েছিল। টেস্ট-ক্রিকেটে কে জানে এটা হয়ত রেকর্ড—ওপেনিং-বোলার ও ওপেনিং-ব্যাটসম্যান একই ব্যক্তি! কিন্তু দুটো যে একসঙ্গে সম্ভব নয়, জয়সীমার বালক-স্বভাব বোলিং তা দেখিয়ে দিল। সকলে খুব হাসাহাসি করল তা নিয়ে। জয়সীমা লজ্জাবোধ করেছিলেন। সেইসময় জয়সীমা নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—তিনি দেখাবেন তিনি অলরাউন্ডার নন। তিনি ব্যাটসম্যান—দলে এসেছেন ওপেনিং-ব্যাটসম্যানরূপে। এবং তিনি দেখালেন। অনেকদিন আগেকার একজন খেলোয়াড়—যাঁর নাম মুস্তাক আলী—তাঁর পরে তো সাহস জিনিসটা ভারতীয় ইনিংসের আদিপর্ব থেকে মুছে গেছে। সত্যই, মুস্তাকের লকলকে চাবুকের শব্দ, শক্তি ও জ্বালা কোথায় পাওয়া যাবে? কিন্তু আজ পাকানো তীক্ষ্ন চেহারার জয়সীমা পিছিয়ে ছিলেন না। কুন্দরামের সহযোগিতায় তিনি ব্যাটের দ্বারা ঘড়ি ও বল, উভয়কে একসঙ্গে পেটাতে লাগলেন—মসৃণতর বলটি ছুটল দ্রুততর গতিতে, এবং জয়সীমা শেষের দিকে কিছু ধীরতা অবলম্বন করায় লাঞ্চের আগে ৬০ মিনিটে তাঁর ব্যক্তিগত রান ৪৯ হল, যদিও দলগত রান ঘড়ির কাঁটাকে তখনো পশ্চাদ্বর্তী করে আছে—৬০ মিনিটে ভারতের ৬৭।

ভীষণ রঙ্গে রানতরঙ্গে মন্থন করে জয়সীমা যে-খেলা খেলছিলেন, সে খেলা আমরা স্বপ্নে আমাদের হীরোদের খেলতে দেখি। এই খেলা দেখে বিশ্বাস হয়—ক্রিকেটে 'এত হাসি আছে, এত গান আছে।' রানের রথে চড়ে যখন তিনি ব্যাটের কশা হাঁকাচ্ছিলেন, তখন তাঁরই সঙ্গে বীরযুগে ফিরে গিয়েছিলুম আমরা।

বেপরোয়া সূচনার এই খান্ডবদাহন যখন দেখছিলুম, তখন হঠাৎ ব্রাডম্যানের একটা কথা মনে পড়ল। তিনি অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার সিড বার্নসকে বলেছিলেন, 'দেখ সিড, কয়েকটা সুন্দর মার-সহ অল্পে আউট আমি চাই না আমার ওপেনারদের কাছ থেকে; আমি চাই, আমার ওপেনাররা বাঁচুক বেশিক্ষণ।' ব্রাডম্যানের মনোভাব বোধগম্য। শিশু ইনিংসকে সময়ের বেড়া ঘিরিয়ে রক্ষা করে তুলতে হয়। অতঃপর বীজ বনস্পতি হলে তার মোটা গুঁড়িতে বিপক্ষ বোলাররা যতই ঢুঁ মারুক, ক্ষতির আশঙ্কা কম। কিন্তু ভারতীয় দর্শকরূপে ব্রাডম্যানের কথায় সায় দিতে আমাদের অসুবিধা এই, ওপেনারেই তো আমাদের দল ভর্তি। প্রায় সকলেই কালহরণে কৌশলবান। প্রথমোক্তর অস্ট্রেলিয়ানরা

পেটানিতে প্রস্তুত, সেখানে আমাদের ব্যাটসম্যানরা রোদে পিঠ দিয়ে বলের পিঠে খান। সুতরাং জয়সীমারা যদি অস্ট্রেলীয়-ধরনের মধ্য-পর্যায়ের যুদ্ধ-পর্বকে আদিপর্বে দিতে পারেন, তাহলে ক্রিকেটের রীতি ভুলে আমরা তাঁদের অবশ্য অভ্যর্থনা জানাব।

শুধু জয়সীমার উত্তেজনাসংকুল সাফল্যই ভারতীয় দর্শকের মনোহরণ করেনি, ঐ নিজ সাফল্যকে তাঁর স্বয়ং উপভোগ করার তৃপ্তিও দর্শকদের প্রভাবিত করেছিল। নিজের মারে জয়সীমা দর্শকের মতই খুশি। সামনের দিকে প্রচুর সংখ্যায় ড্রাইভ করে তিনি ক্রিকেটের সম্মুখ-গতির সৌন্দর্যকে উদ্ঘাটিত করেছিলেন, যদিও স্বীকার্য, সম্মুখ-ড্রাইভের ঐশ্বর্যমহিমা তাঁর মারে ছিল না। সে রাজকীয়তা তাঁর মধ্যে নেই—এত আত্মসুখময় খেলোয়াড়ের মধ্যে তা পাওয়া যায় না—তিনি তাঁর দৈর্ঘ্যকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করে, কখনো-কখনো এমনকি দু'পায়ের ডগার উপরে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে, যেভাবে কিছু-উঠতি বলেতে প্রতি-ঘাত করেছেন—তার মধ্যে দর্শক দেখেছে যৌবনের ঔদ্ধত্য, কিন্তু অভিজাতের অবজ্ঞা নয়।

জয়সীমা যে-জাতীয় খেলা খেলেছেন, তাতে আউট হওয়া সম্ভব যে-কোনো মুহূর্তে। ক্ষতি কি তাতে—তাতে অন্যায় কোথায়?—প্রশ্ন করেছেন গরীয়ান্. ব্যাটসম্যান ও অধিনায়ক টেড ডেক্সটার—

"হাত খুলে ড্রাইভ করতে গিয়ে যদি কেউ বোল্ড হয়ে যায়, সেটা বড়ই ভ্রূকুটির বস্তু হয়ে ওঠে, যদিও, সে যদি পিছু হঠে ঠেকা দিতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যেত, সেটা সামান্যই দোষের হোত। প্রথমক্ষেত্রে বোল্ড হওয়াটা সবিশেষ অন্যায়, বিবেচনাহীন উত্তেজনার নিদর্শন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, নিশ্চয় বলটা এমন ভাল ছিল, যা বিশেষ সাবধানী আত্মরক্ষাকেও ভেদ করতে সমর্থ।"

জয়সীমার এই পর্যায়ের ব্যাটিং সম্বন্ধে একটা কথা বলতে হয়—হিসেব করে দেখলুম, তাঁর অধিকাংশ রানের মার ড্রাইভে। তিনি উপযুক্ত পরিমাণে কাট করতে পারেন না। এইজন্য, মনে হয়, যথার্থ ফাস্টবোলিংয়ে তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হবে। ওপেনিং ব্যাটসম্যানরূপে তীব্র গতিশীল বলে গোড়াতেই ড্রাইভ করার সুযোগ তিনি বেশি পাবেন না। সেক্ষেত্রে, অনভ্যস্ত হাতে তিনি যে-সব কাট করার চেষ্টা করবেন, তা বাড়ানো ব্যাটে বাইরের বল ছোঁয়ার মত আত্মঘাতী ব্যাপার হবে না তো?

লাঞ্চে জয়সীমা কি খেয়েছিলেন জানি না, তাঁকে কোন্ উপদেশামৃত পান করানো হয়েছিল, তাও আমাদের অজ্ঞাত, কিংবা বন্যার সময়ে সাপ-বাঘের সঙ্গে একগাছে রাত কাটিয়ে পরে সেইকথা মনে হলে মানুষ যেমন শিউরে ওঠে, তাঁর তেমনি মনোভাব হয়েছিল কিনা বলতে পারব না, কিন্তু চোখের সামনে অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের চেহারা দেখলুম বটে! লাঞ্চের আগে যিনি দুহাতে ছড়িয়েছিলেন, যাঁর বদান্য বর্ষণের তলায় তৃষিত, ক্ষুধিত আমরা, আতুর অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়ে-ছিলুম—সেই জয়সীমাই লাঞ্চের পরে উনপঞ্চাশে দাঁড়িয়ে রইলেন পুরো ৩৪-মিনিট, একটি নয়া পয়সার ভিখারী হয়ে।

একটা একত্রিশ মিনিটের সময়ে অনেক চেষ্টায় যত্নে (বোলিং-উদ্যত টিটমাসকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে তুক করে) জয়সীমা টিটমাসের বলে যখন এক রান

নিয়ে নিজস্ব পঞ্চাশ পূর্ণ করলেন, তার আগেই তাঁর জন্মসঙ্গী কুন্দরাম বিদায় নিয়েছেন ২৭ রান করে। কুন্দরামের যাওয়াটা বিস্ময়কর নয়, সর্বসময়েই তিনি বিপজ্জনকভাবে বর্তমান ছিলেন। বহুবার তিনি আমাদের হৃৎপিণ্ড চটকেছেন হঠাৎ বিপদ বাধিয়ে। একটা কুড়ি মিনিটের সময়ে উইলসন এক 'নররাক্ষসের' ডাক দিয়ে তাঁর 'বিরুদ্ধে এল বি-র আবেদন গ্রাহ্য করিয়ে নিলেন। তাঁর জায়গায় এলেন পূর্ববৎ সরদেশাই।

লাঞ্চের পরে ইংলণ্ডের অধিনায়ক ব্যয়বহুল সুইংবোলিং সরিয়ে দুদিকেই স্পিনার নিয়োগ করলেন। ফলে ভারতপক্ষে রান-মান্দ্য দেখা গেল। টিটমাস বেশ-কিছু মেডেন পেলেন। একটা এমন অবস্থা এল, দর্শক জয়সীমাকে পর্যন্ত ব্যারাক করতে প্রলুব্ধ হল, যে-লোভকে অনেক কষ্টে, জয়সীমার লাঞ্চপূর্ব কীর্তির সবেগ-স্মরণে, তবে চাপা দিতে পারল সে। দুটোর পরে জয়সীমা আবার একটু সচল হয়ে টিটমাস-উইলসনকে কখনো শূন্যপথে, কখনো ভূমিপথে তাড়না করে চায়ের আগে ৮৬ রানে পৌঁছলেন। লাঞ্চের পরে ১২০ মিনিটে জয়সীমা করলেন ৩৭ রান। চায়ের ঠিক আগে একটি চান্সও দিয়েছিলেন। পারফিটের বলে থার্ডম্যানের হাতে তিনি যে-ক্যাচ দিয়েছিলেন, তা ফিল্ডার হাতে পেয়েও ফেলে দিয়েছিল। সেই তাঁর প্রথম চান্স।

সরদেশাইয়ের চা-পূর্ব রান ৩৩। তিনি গোপনে-গোপনে এগিয়েছিলেন। তাঁর অলক্ষিত গতির মধ্যেও দু'একবার পদশব্দ শোনা গিয়েছিল, যেমন যখন তিনি দুটো সাতচল্লিশে উইলসনকে এক ওভারে তিনটে বাউণ্ডারি করেন।

চায়ের পরে জয়সীমাকে সেঞ্চুরিতে পেল। ৮৪ রানের মাথায় পারফিটের বলে সোজা চান্স দিয়েও বেঁচে যাওয়ায় সেঞ্চুরিতে তাঁর বিধিদত্ত অধিকার জন্মেছিল। টিটমাসাদিকে অনেকগুলি মেডেন উৎসর্গ করার পরে সাড়ে তিনটে নাগাদ তিনি নব্বুয়ের ঘরে উঠেছিলেন। তাঁর যখন ৯২ রান, তখন সরদেশাই জনতার গঞ্জনায় বিদায় নিয়েছিলেন (৩৬), ধীরে-সুস্থে মঞ্জরেকর এসেছিলেন, মঞ্জরেকরের প্রভাব বিকীর্ণ হবার আগেই জয়সীমা মরীয়া হয়ে টিটমাসকে একবার শূন্যপথে মাঠ পার করেছিলেন (যার জন্য ৯০-এর মাথায় কাউড্রের বিপরীত ব্যবহার সম্বন্ধে সমালোচনায় মুখর হয়েছিল জয়সীমা-ভক্ত দর্শক), তারপরে জয়সীমা—বিধাতা ও মঞ্জরেকরের পরামর্শে ৯৮-এর মাথায় ঝুললেন বাইশ মিনিট, তলায় মেডেনপ্রসু ইংলণ্ড, তাঁর চোখে কুটো পড়ল, কুটো পরিষ্কার হবার পরে, মঞ্জরেকর তাঁকে বোঝালেন, দেখ হে, পাবলিকের ইচ্ছার চেয়ে নিজের সেঞ্চুরিটা ইমপর্টাণ্ট, ওটাকে হতে দাও, করবার চেষ্টা করো না, সেই কথা শুনেই জয়সীমার পায়ে টান ধরল, ইংরেজদের পদসেবা তিনি গ্রহণ করলেন, ট্যাবলেট খেলেন জলসহযোগে, দর্শকেরা এখন তাঁকে ব্যারাক করবে কি, নিজের নাড়ি নিজের হাতে ধরে বসে আছে—অবশেষে চারটে বেজে সাতাশ মিনিটে পারফিটকে লেগে বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে জয়সীমা যখন সেঞ্চুরি করলেন, তখন সত্তরের কোঠর এক বৃদ্ধ বৃদ্ধত্বের অধিকারে, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—'বাব্‌বাঃ, দশ মাস না কাটলে কিছু হয় না।'

এর পরেই মধুর দৃশ্য। পূর্ব গোধূলিতে সেঞ্চুরি সমাপন করে জয়সীমা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন—দেখা গেল অপূর্ব কাণ্ড: হুদো-হুদো পুরুষমানুষ

মালা হাতে ছুটেছে মাঠের মধ্যে, আর মাঠে এলিয়ে পড়ে এম-সি-সি সদস্যেরা সেই গোধূলিলগ্নের ইয়ে উপভোগ করছেন।

জয়সীমার সেঞ্চুরি না হওয়া পর্যন্ত দর্শকেরা যে বিচারবুদ্ধিকে স্থগিত রেখেছিল, খেলা দেখার আনন্দকে সেঞ্চুরি দেখার আনন্দের পায়ে উৎসর্গ করেছিল—সেঞ্চুরি হবার পরে তারা সহসা বুঝল—'তাঁহারা কি হারাইয়াছেন।' জয়সীমা প্রথম ৪০ রান করেছিলেন ৩৭ মিনিটে, পরবর্তী ৬৩ রান করতে লাগল ২০৬ মিনিট! সবাই ভাবল—তিনি যেখানে আমাদের তুলে দিয়েছিলেন, সে আসনে স্থিতির অধিকার তিনি আমাদের দিলেন না কেন? জয়সীমা যদি লাঞ্চের পরে রানের একটা মধ্যগতিও বজায় রাখতে প্যরতেন, তাহলে, ভারতের জেতার কথা বলছি না, কিন্তু পঞ্চম দিনের সকালে ঘণ্টাখানেক খেলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে খেলাটাকে অন্তত আরও কয়েক ঘণ্টার 'জীবন্ত' জীবন দিতে পারত ভারত। এরকম যে আমরা ভাবতে পেরেছি, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি—'জয়সীমা! সে তোমারি দান!'

ইংলণ্ডের স্পিনবোলিং উচ্চাঙ্গের হয়েছে—নিঃসন্দেহে। এবং সেই বোলিংয়ের উচ্চধারা বজায় রাখতে লাঞ্চ-উত্তর কালে সে-সব ভারতীয় ব্যাটসম্যান সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত মঞ্জরেকর। সরদেশাই আউট হলে প্যাভিলিয়ান থেকে নির্গত হতে তাঁর বিলম্ব হয়েছিল, রান করতে বিলম্ব হওয়াও তাই স্বাভাবিক। তাই বলে ৬০ মিনিটে ৪ রান! 'কী অপূর্ব সময়-ঘন এক একটি রান!'—একজন চেঁচালেন। পরে ব্যাখ্যা করলেন কথাটা—'ষাট মিনিটে চার রান, মানে পনের মিনিট ধরে পাক করে এক একটি কড়াপাকের রান-সন্দেশ প্রস্তুত। তাড়াতাড়ি পচবার ভয় নেই। মঞ্জরেকর সন্দেশগুলি অনেকদিন ধরে মাঠে বসে চিবোবেন।'

দিনশেষে আট উইকেট হাতে নিয়ে ভারত ১৫৪ রানে এগিয়ে। পঞ্চম ও শেষ দিনে একমাত্র প্রাণ-সম্ভাবনা—যদি ভারত শুরুতে ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ৮০/৯০ রান ক'রে, ২৩০/২৪০ রানের ব্যবধানে, সমপরিমাণ সময় দিয়ে ইংলণ্ডের পৌরুষকে আবার আহ্বান করে!

পাতৌদি কী করবেন?

ভারত—প্রথম ইনিংস—২৪১

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস: কাউড্রে ক পাতৌদি ব দেশাই—১০৭; টিটমাস ব দেশাই—২৬; প্রাইস নটআউট—১; লার্টার ক মঞ্জরেকর ব দেশাই—০; অতিরিক্ত—১৪। মোট ২৬৭।

বোলিং (সম্পূর্ণ ইনিংসের)—দেশাই—২২·৫-৩-৬২-৪; সুর্তি—৬-২-৮-০; জয়সীমা—৪-১-১০-০; দুরানী—২২-৭-৫৯-২; বোরদে—৩১-১৪-৪০-১; নাদকার্নি—৪২-২৪-৩৮-২; চন্দ্রশেখর—২১-৫-৩৬-১।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস: জয়সীমা নটআউট—১০৩; কুন্দরাম এল বি ডবলিউ ব উইলসন—২৭; সরদেশাই ক ও ব পারফিট—৩৬; মঞ্জরেকর নট-আউট—৪; অতিরিক্ত—১০; মোট—২ উইকেটে—১৮০।

পঞ্চম দিন : 'অবসাদ ও সাধের ক্রিকেট'

জয়সীমা সকাল থেকেই শুরু করলেন কাজ। আসলে তিনি প্রভাতেই সুন্দর। অপরদিকে ইংলণ্ডের অধিনায়ক মাইক স্মিথ ভুল করেননি। সুইং-বোলারদের লাগিয়ে ভারতের রান দ্রুত বাড়তে দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তিনি টিটমাস-পারফিটের মাপা বলের বরাদ্দ করলেন ভারতের জন্য। জয়সীমা তবু অদম্য। তাঁর উল্টোদিকে মঞ্জরেকর আছেন বলে শর্টরান নেবার অভিপ্রায় ত্যাগ করে বাউণ্ডারির ভাষায়—তাতেও না থেমে ওভারবাউণ্ডারির ভাষাতে—কথা বলতে চেষ্টা করলেন—এবং সেই চেষ্টায় যখন এগারোটার সময়ে ১২৯ রান করে টিট-মাসের বলে কট-আউট হয়ে বিদায় নিলেন, তখন তাঁর 'খেলোয়াড়ী' মনোভাব প্রশংসিত হল সর্বত্র। তাঁর ক্যাচটি ধরেছিলেন লার্টার, বহুদূর থেকে ছুটে এসে। সে ছুট লার্টারের রণ-পায়েই দেওয়া সম্ভব।

জয়সীমা আজ ৪৫ মিনিটে ২৬ রান করলেন। কিন্তু মোট রান কত হয়েছিল ঐ ৪৫ মিনিটে?—৩৭। যেহেতু অপরদিকে মঞ্জরেকর ছিলেন এবং জয়সীমার আউটের পনের মিনিট পরে মঞ্জরেকর পারফিটের বলে বোল্ড হয়ে গেলে সহস্র-সহস্র মানুষ পারফিটের জয়ধ্বনি দিল! বিচিত্র দৃশ্য! অপূর্ব দেশদ্রোহিতা! প্রশংসনীয় বিজাতীয়তা!

স্কোর-বই সর্বসময় গর্দভ নয়। পঞ্চম দিনের স্কোরপৃষ্ঠা খেলার গোটা চরিত্র-কেই প্রায় প্রকাশ করেছে সংখ্যাযোগে—কেবল ব্যতিক্রম মঞ্জরেকর। তাঁর মন্দত্ব স্কোর-বইয়ের দীন সংখ্যার দ্বারাও সর্বাংশে ফোটেনি। মঞ্জরেকর 'পেশাদার'—বৃত্তিতে ও চিত্তে, উভয়ত। হাততালির হাওয়া দিয়ে তাঁকে নাড়াবার কত চেষ্টা করেছে দর্শক। কিন্তু তিনি অনড়, অচল, সাংখ্যপুরুষ—খেলার 'প্রকৃতির' কোনো প্রভাব তাঁর উপরে নেই। দলে স্থান পাবার জন্য রান তাঁর চাই, সুতরাং রান করতে তিনি বদ্ধপরিকর। ফল দাঁড়াল এই, তিনি আউট না হয়ে দর্শকদের বুকের যন্ত্রণা ও চোখের শূল হয়ে (এম-সি-সি-র নয়, মঞ্জরেকরের ব্যাটিং তাঁদের বাঁচার সহায়ক) বিরাজ করেছিলেন। তিনি বল মারলে ও তাতে কোনোক্রমে রান হলে ঘৃণাবোধ করল দর্শক। তাঁর পায়ে বল লাগলে চল্লিশ হাজার দর্শক একযোগে এল-বি আবেদন জানাল। আবেদন অগ্রাহ্য হলে ভারতীয় দর্শকেরা এম-সি-সি-র চেয়ে বড় আকারে হাহাকার করল। এমন-কি তাঁর বিরুদ্ধে বাবা তারকনাথকে পর্যন্ত নিয়োগের সতর্কবাণী ঘোষণা করা হয়েছিল। অবশেষে, ১২০ মিনিটে ১৬ রান করার পরে, পারফিটের বলে আউট হয়ে যেতে যে-উল্লাসধ্বনি উঠল, তা জয়সীমার ওভার-বাউণ্ডারির আনন্দধ্বনিকেও হারিয়ে দিল।

দেখা গেল, ওভার-বাউণ্ডারি-করা জয়সীমাই ভারতীয় ক্রিকেটের নব্য ন্যায়। জয়সীমার গতকালের সেঞ্চুরিপীড়ার সমালোচনা আমরা করেছি। সুখের বিষয় জয়সীমা ডবল-সেঞ্চুরির আকাঙ্ক্ষায় আক্রান্ত হননি। তার ফলে টিটমাস ও পারফিটের হস্তোৎক্ষিপ্ত ঘূর্ণ্যরঙ্গিম মোহগুলিকে সব্যাটে প্রত্যাখ্যান করে, কখনো বা শূন্যে প্রেরণ করে, তিনি যে নতুন মোহমুদ্গর রচনা করেছেন শেষ দিনে, তাতে বৈরাগ্যের পরিবর্তে ছিল অপূর্ব জীবনপ্রেম। কতদিন পরে আমরা আবার সমস্বরে চিৎকার করতে পেরেছি—'ওভার বাউণ্ডারি! ওভার বাউণ্ডারি!' —কতদিন আগে সি কে নাইডু আমাদের মধ্যে ছিলেন।।

আর বাঙালী যে কতখানি দায়িত্বহীন প্রেমিক, তাও প্রমাণ হয়ে গেল পঞ্চম দিনে পাতৌদি সম্বন্ধে তার মনোভাবের পরিবর্তনে। স্টাইল সম্বন্ধে বাঙালীর অনপনেয় আসক্তি। জয়সীমার জায়গায় পাতৌদি যখন নেমেছিলেন, উপেক্ষা ছাড়া কিছু পাননি। পাঁচ মিনিট পরে টিটমাসের বলে কোনোক্রমে একটি রান নিয়ে যখন 'একশ্চন্দ্রের' উদয় ঘটালেন রান-গগনে, তখন সেটাকে 'নষ্টচন্দ্র' বলেই ধরেছিল সকলে। আরও ১২ মিনিট পরে যখন তিনি টিটমাসের বলে এক রান করলেন (মাঝে আরও এক রান করেছিলেন) তখন যথেষ্ট আনন্দধ্বনি শুনলেন, কারণ তার দ্বারা মোট ৩ রান করে প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যা (২) পেরোলেন।

তারপরেই সব ভুলে গেল লোকে। সুন্দরের আহ্বান সামনে—স্বীকার করো। পাতৌদি পারফিটের বলে অন্তত চার পা এগিয়ে মিড-অনে ড্রাইভ করলেন, তেমন মার, এই টেস্টে তখনো-পর্যন্ত ইডেনে ঘটেনি। কোনো একটি মাত্র স্ট্রোক দীর্ঘসময়ের গ্লানির ও অভিযোগের জঞ্জালে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে—আমার পূর্ব অভিজ্ঞতায় ছিল না। সে আগুন দাউদাউ করে উঠল, যখন ঐ ওভারের শেষ বলে মিড-অনে তুলে পাতৌদি বাউন্ডারি ঘটালেন।

টিটমাসের হাতের বল এইকালে বিষাক্ত। পরিমাপে স্থির, পেষণে নিষ্ঠুর ও দংশনে জ্বালাময় বোলিং। মঞ্জরেকর আউট হবার পরে বোরদে এসে স্নিক-বাউন্ডারির সাহায্যে রান শুরু করেছিলেন। অল্পসময়ের মধ্যে টিটমাসের আচরণে উত্যক্ত হয়ে লেগে পুল করতে গেলেন, আর আউট হলেন বিচিত্র দুর্ভাগ্যে। শর্ট-স্কোয়ারে ফিল্ডিং করছিলেন মাইক স্মিথ। বোরদের প্রচণ্ড মার থেকে প্রাণ বাঁচাতে পিঠ ফেরালেন—বল পিঠে প্রতিহত হয়ে পার্কাসের কাছে গেল, তিনি ধরে নিলেন ও বোরদেকে পিঠ ফিরিয়ে চলে যেতে হল। বোরদের জায়গায় এলেন দুরানী। উইলসনও এলেন বোলাররূপে। উইলসনের বল দেওয়ার ভঙ্গি নিয়ে কিছু কৌতুকরসের সৃষ্টি হল। বল দেওয়া শেষ করেই তিনি হাতের চেটো উল্টে দেন, তাতে 'কি একটা হলো না, অথচ হওয়া উচিত ছিল' ভাব ফুটে ওঠে—ঘোষণা করলেন মাস্টার ঝণ্টু, আমার পার্শ্ববর্তী দ্বাদশ 'বর্ষীয়ান্' সুবিজ্ঞ বালক।

পাতৌদি এবং দুরানী একত্র খেলছিলেন। দুজনেই এখন আকর্ষণীয় ভাবে প্রাণবন্ত। বারটা আটচল্লিশে পারফিটের বলে দুরানীর রকেট-সিক্সার বেরিয়ে গেল। তার ঠিক আগেই পাতৌদি পারফিটের বলে প্রহার করেছিলেন, সে বলের গতি এতই তীব্র ছিল যে, সম্পূর্ণ গতিরেখা অনুসরণ করা পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

বারোটার সময়ে, যখন ভারতের রান ৫—২৫৩, তখন মাইক স্মিথ নতুন বল নিলেন, এবং প্রাইসের প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলটি পাতৌদির ইচ্ছায় এক্সট্রা-কভারে মাঠ চিরে বেরিয়ে গেল মাঠের বাইরে। পরের বলে মধুরতম স্পর্শে ও ছন্দে ডিপ ফাইনলেগে গ্লান্সে বাউন্ডারি; এবং একটি বল বাদ দিয়ে পঞ্চম বলে লেট-কাট করে পাতৌদি হয়ত এক রান পেলেন, কিন্তু দর্শক পেল অনেক বেশি—সুষমার সাহিত্য।

পাতৌদি এখানেই থামলেন না। অতঃপর হাইকোর্টের দিক থেকে লার্টারের তৃতীয় বলে পা মুড়ে যে-মারটি দিলেন, তা অনিবার্যভাবে উইকস্-স্মৃতি বয়ে আনল, এবং তারপরে লার্টারের পরবর্তী ওভারের ঐ তৃতীয় বলেই একই চেষ্টায়

যখন কট হলেন, তখন তাঁর রান মাত্র একত্রিশ, কিন্তু দর্শকের মতে, রানে কি এসে যায়! একত্রিশ রানের বিদ্যুন্ময় পাতৌদি তখন জনতার প্রাণপুরুষ।

লাঞ্চের ঠিক আগে আউট হয়ে পাতৌদি নিশ্চিন্ত মনে আহারের সন্ধানে যাত্রা করলেন, কিন্তু নিজেদের খাবারের বাক্স কোলে করে দর্শকের মনে শান্তি রইল না—পাতৌদি লাঞ্চের পরে ব্যাটসম্যান পাঠাবেন, না বিপক্ষের ব্যাটসম্যান মাঠে আনাবেন ইনিংস ঘোষণার দ্বারা? ভারতের রান ৬—২৮২, এগিয়ে আছে ২১০ রান, সময় বাকি ২৪৬ মিনিট। এই পরিস্থিতিতে কি কর্তব্য, তাই নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল ক্রীড়ামোদীরা।

অ্যাডভেঞ্চারবাদীদের হতাশ করে লাঞ্চের পরে ব্যাট হাতে নামলেন নাদকার্নি ও দুরানী। সমালোচনায় মুখর সবাই, বিশিষ্ট সমালোচকেরা পর্যন্ত। পাতৌদি আরও আধ ঘণ্টা খেলা চলতে দেবার পরে ৭—৩০০ রানে যখন ডিক্লেয়ার করলেন, (২৭৪ রানের ব্যবধানে, হাতে সময় ১৭০ মিনিট), তখন প্রবীণ বিশেষজ্ঞও ক্ষোভে বিরক্তিতে বললেন—'ডিক্লেয়ার, না প্রহসন?'

এই ডিক্লেয়ার 'প্রহসন', স্বীকার করি, যে-প্রহসন সৃষ্টির জন্য আমি দুঃখিত নই, বরং কৃতজ্ঞ পাতৌদির কাছে। পাতৌদি অন্তত প্রহসন দর্শনের সুযোগটা দিয়েছেন।

যাঁরা তামাশা পছন্দ করেন না, তাঁদের কাছে নিবেদন করি—পাতৌদি কাদের কাছে খেলোয়াড়ী ডিক্লারেশন করবেন—মাইক স্মিথের ইংলণ্ডের কাছে—যে দল ২৭০ মিনিটে ২৯৩ রানের, এবং ৩৫০ মিনিটে ৩১৭ রানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে ইতিপূর্বে দুবার? সবকিছু শিভাল্‌রির দায়িত্ব বুঝি ভারতের—যে-দেশে 'দ্বিতীয়' দল পাঠিয়ে টাকা লুঠের সুযোগ নেয় এম-সি-সি? কপিবুকের দেড় টাকা সিরিজের খেলা দেখিয়ে যারা স্কোরবোর্ডকে অরম্যরচনায় পরিণত করে, সেই ইংলণ্ডের পক্ষপাতী ইংরেজ-সমালোচকেরা কি করে আশা করেন অন্য পক্ষের উদ্দীপনার? লাঞ্চের সময়ে পাতৌদি যে ডিক্লেয়ার করেন নি, তার অবশ্য একটা দলীয় কারণ আছে—গতকাল লাঞ্চ-উত্তরকালে ভারতের শ্লথ ব্যাটিং এবং আজ সকালে প্রথম ঘণ্টায় ৪২ ও দ্বিতীয় ঘণ্টায় ৫০ রান। তার থেকে বড় কথা, এই ইংলণ্ড দলের সঙ্গে বেশি উৎসাহী ক্রীড়ামোদী হওয়ার অর্থ হয় না। চ্যালেঞ্জ নেবার মতো শিরদাঁড়ার জোর এই দলের নেই। এঁদের মনোভাব—ডিক্লারেশনের চ্যালেঞ্জের সামনে ধীরে-সুস্থে খেলব, যদি ব্যাটে রান আসে স্বাভাবিকভাবে, যদি তার ফলে অনুকূল অবস্থায় পৌঁছই, এবং কোনো ঝুঁকি না নিয়ে জিতে যাই—বেশ কথা, কিন্তু তাই বলে জয়ের চেষ্টায় হারব না। এই মনোভাবের কাছে উদারতার অর্থ—নির্বুদ্ধিতা।

আজ ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং তার আর একটি প্রমাণ। দিনের শেষে ইংলণ্ড করল ১৭০ মিনিটে ১৪৫ রান—যদিও উইকেট গেল মাত্র দুটি। মাইক স্মিথ নিজের নৈপুণ্যে এবং ভারতীয় দলের অনতি-উৎসাহী বোলিংয়ের সাহচর্যে ৭৫ করে নটআউট ছিলেন, কিন্তু 'বিলাতের নহ তুমি, তুমি গো বিশ্বের'—বে-কাউড্রে, তিনি পরের টেস্টের জন্য নেটহীন মুক্ত মাঠের প্র্যাকটিসে করেছেন ৭০ মিনিটে ১৩ রান! কলিন কাউড্রে চারদিন ব্যাট-হাতে মাঠে ছিলেন। আর একদিন বেশি থাকলে [illegible] রেকর্ড স্পর্শ করতে পারতেন। কিন্তু তৃতীয়

টেস্টে জয়সীমাকে তিনি স্পর্শ করতে পারেন নি সাহসের শক্তিতে। তাঁর খেলার মধ্যে একটা সময়ে স্টেডিয়ামের দিক থেকে হাজার-হাজার ওষ্ঠে পাখির কৃত্রিম ডাক উঠেছিল। মানুষের পক্ষীকণ্ঠ বলতে চেয়েছে—'ভোর হল, ব্যাট তোল, কাউড্রে খেলো রে!'

সুতরাং আর একটি ড্র। অর্থাৎ তুমিও ভালো, আমিও ভালো। যদুও ভালো, বদুও ভালো। সবাই ভালো—ভা—লো—।

অথচ হাত-ধরাধরি করে এক মাঠে বেড়াবার মেজাজ নিয়ে কলকাতায় তৃতীয় টেস্ট শুরু হয়নি। পাঠক স্মরণ করুন, প্রথমদিনে ভারতের হারের চেহারা—৯ উইকেটে ২৩০ রান। ভারতের খরচে খেলাটি আশাতীতভাবে জীবন্ত। অবস্থা এমন যে, ভারত যদি হার এড়াতে পারে, সৌভাগ্য মানবে। চতুর্থ দিনে লাঞ্চের সময়ে দেখা গেল দান উল্টে গেছে—ইংলন্ডকে কঠিন কণ্ঠে আদেশ করছে ভারত। প্রথমদিনের শেষে ভারত যে-অবস্থায় ছিল, সেই একইরকম অবস্থায় দাঁড়িয়ে ইংলন্ড কাঁপছে চতুর্থ দিনের দুপুরে। এবার উদার হবার পালা ভারতের। কি হবে মিথ্যা উত্তেজনায়! আত্মগঠনেই মানবমহত্ত্ব। সকালের বালক জয়সীমা লাঞ্চের জন্য নির্ধারিত প'য়তাল্লিশ মিনিটকালের মধ্যে প্রবীণ গৃহস্থ হয়ে উঠে উত্তর-কালে একটি ধীরতাপূর্ণ সেঞ্চুরি করলেন। মঞ্জরেকর করলেন, পুনশ্চ জানাই, ৬০ মিনিটে ৪ রান।

জয়পরাজয় আমাদের লক্ষ্য নয়; আমরা খেলায় অংশগ্রহণ করতে চাই; সবুজ মাঠের ধারে বিশ্বমানবের পানভোজন ও মাঠের মধ্যে আপসে ব্যাট-বল চালা-চালির নামই ক্রিকেট—ভারত ও ইংলণ্ডের অধিনায়কদ্বয় যৌথ ঘোষণা প্রচার করলেন দুই জাতির উদ্দেশ্যে।

তবু ক্রিকেট, আমি ভাবছিলুম। ভাবছিলুম রসিক বন্ধুর বিষণ্ণ কৌতুকের কথাটি—'মহামেলার অবসান।' সূর্য নেমে গিয়েছে দেবদারুর পিছনে, ঝাউয়ের স্বপ্নকেশে আভাটুকু রেখে। শীতল ছায়ার ঢেউ গড়িয়ে যাচ্ছে মাঠের মধ্যখানের সবুজ-সোনালি রৌদ্রদ্বীপের দিকে। আমাদের পিছনে রয়েছে পাঁচ দিনের নর্ম-কাহিনী। কাউড্রের আবির্ভাব ও জয়সীমার উদ্বেল অবেগ পেরিয়ে, নাদকার্নি-চন্দ্রশেখরের শেষ পর্যায়ের শৌর্যকে অতিক্রম করে, টিটমাস-প্রাইস-বোরদের বোলিংকে ছাড়িয়ে, মারামারি, পেটাপেটি, লাঠালাঠি, রঙ ও রঙ্গ, বৃষ্টি ও 'মিষ্টি', এবং বহু ভাষাময় লক্ষ-লক্ষ দৃষ্টির উপর দিয়ে, আমরা সকলে যখন পঞ্চম দিনের শেষে হাজির হলুম—যখন মাঠ ছেড়ে যাবার সময় এল—তখন সহসা অভাবিত নিঃস্বতায় ভরে গেল মন—ক্রিকেট হারালুম বলে নয়, অনেক মানুষের সঙ্গ হারালুম বলে। ক্রিকেটের মধ্য দিয়ে বহু মানুষের সঙ্গ পাই আমরা—আজ ক্রিকেট আমাদের সামাজিক উৎসব।

একটা অদ্ভুত সত্য অনুভব করলুম—ফুটবল জাতীয় ক্রীড়া হলেও সামাজিক অনুষ্ঠানের চেতনা মনে জাগায় না। ক্রিকেট তেমন মনোভাবকে জাগাতে পারে এইজন্য যে, সে অনেকগুলি মানুষকে অনেকক্ষণ একত্র রাখে। নতুন সম্পর্কের সূচনা হয়, নতুন সান্নিধ্যের। রেলের কামরায় বহু ঘণ্টার যাত্রা যেমন মানুষকে এনে দেয় অচেনা মানুষের কাছে, এখানেও তেমনি—[illegible] আগে এখানেও

তেমনি আবার ফিরে দেখা হওয়ার কামনা—যে ইচ্ছার জীবন যদিও পথে নামার পরেই পায়ে-পায়ে গ‍ুঁড়িয়ে যাবে।

খেলাশেষের রাত্রে বসে ভাবলুম, বিপুলসংখ্যক মানুষের ঐ পঞ্চ দিনস্থায়ী সমাবেশটি বিশ্বজীবনের খণ্ডরূপকে কী অব্যর্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছে—তার মধ্যে অমোঘ নিয়তির নিষ্ঠুরতার অংশই বা কি অল্প? আমরা সবাই হেসেছি যখন শুনেছি, মাইকে ডাক পড়েছে ছেলের, তার বাবা গেটে দাঁড়িয়ে। তা নিয়ে রসিকতা হয়েছে—নিশ্চয় বাবার টিকিট নিয়ে পালিয়ে এসেছে ব্যাটা—বেরুলেই থাপ্পড়। তারপরেই সে হাসি আঁতকে স্তব্ধ হয়ে গেছে—মৃত্যু! মাইকের গম্ভীর কণ্ঠ ক্রীড়ামুগ্ধ একটি মানুষের কাছে বহন করে আনল তার একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ।

সে মৃত্যু আছেই, কিন্তু তার সংখ্যা অল্প, আমাদের বেঁচে থাকার চেয়ে। আমাদের এই খেলা কত মৃত্যুকে পার হয়ে, কত জীবনের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে, আমাদের কাছে এসে হাজির হয়েছে—এই যে সকলের ক্রিকেট খেলা, একজন ইংরেজ-কবি বিশ্বাস করতে চাননি, এ-খেলা ইংরেজের সৃষ্টি। তিনি বলেন, এ হল চিরদিনের খেলা। এর শুরু সৃষ্টির আদি উদ্যান গার্ডেন অব ইডেনে—'সময় যখন ছিল তরুণ বালক।'

But come again tomorrow
To mingle with our joy,
The magic learnt in Eden
When time was but a boy.

এ কবিতা ক্রিকেটের সম্বন্ধেই লেখা।

ভারত—প্রথম ইনিংস—২৪১

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—২৬৭

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস: জয়সীমা ক লার্টার ব টিটমাস—১২৯; মঞ্জরেকর ব পারফিট্—১৬; পাতৌদি ক স্মিথ ব লার্টার—৩১; বোরদে ক পার্কস ব টিটমাস—৮; দুরানী ক কাউড্রে ব লার্টার—২৫; নাদকার্নি নটআউট—১০; দেশাই নটআউট—২; অতিরিক্ত—১৬। মোট ৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার—৩০০।

বোলিং (সম্পূর্ণ হিসাব)—প্রাইস—৭-০-৩১-০; নাইট—৪-০-৩৩-০; উইলসন—২৭-১-৫১-১; লার্টার—৮-০-২৭-২; টিটমাস—৪৬-২৩-৬৭-২; পারফিট—৩৪-১৬-৭১-২।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস: বোলাস ক জয়সীমা ব বোরদে—৩৫; বিঙ্কস ব দুরানী—১৩; স্মিথ নটআউট—৭৫; কাউড্রে নটআউট—১৩; অতিরিক্ত—৯। মোট ২ উইকেটে—১৪৫।

বোলিং—দেশাই—৫-৯-১২-০; পাতৌদি—৩-১-৮-০; দুরানী—৮-৩-১৫-১; বোরদে—১৫-৫-৩৯-১; চন্দ্রশেখর—৮-২-২০-০; জয়সীমা—১৩-৫-৩২-০; সরদেশাই—৩-০-১০-০।

* * * উত্তরকাব্য * * *

কলকাতার ক্রিকেট-প্রসঙ্গ শেষ হল, কিন্তু সম্পূর্ণ হল না, কারণ—

কৌতূহলই আবিষ্কারের জননী, একথা বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি বহুবার জানিয়ে গেছেন। এই অধম লেখকও তাঁদের সেই মহাবচনের সমর্থনে দৃষ্টান্তসহ উপস্থিত। যদি না আমি কৌতূহলী হয়ে, নগদ দশ নয়া পয়সা খরচ করে—

পরিবেশটা আর একটু পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। কলকাতায় ভারত-ইংলণ্ড টেস্ট-ম্যাচের পঞ্চমদিনের শেষ। বিষণ্ণ মনে গ্যালারি থেকে নেমে, সস্তা-হয়ে-যাওয়া এক ভাঁড় চায়ে চুমুক দিচ্ছি, দেখি-যে গ্যালারির তলা থেকে বেরিয়ে আসছে একটি কাগজ-কুড়ুনে ছেলে। তার হাতে খবরের কাগজ, পিচবোর্ডের বাক্স, ঠোঙা, ইত্যাদির সঙ্গে কতকগুলো লেখা কাগজ। লেখা কাগজ কোথা থেকে পেল ছেলেটা? আমার নোট-করা কাগজগুলো নয় তো? ভয় পেয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখি, না, সেগুলো ঠিকই আছে। তবু কৌতূহল হল।

আপনাদের আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, কৌতূহলই আবিষ্কারের জননী। আমি যদি কৌতূহলী হয়ে নগদ দশ নয়াপয়সা খরচ করে ঐ হাতে-লেখা কাগজ-গুলি তখনি সংগ্রহ না করতুম, তাহলে পাঠকগণ কতকগুলো মজাদার টুকরো লেখা থেকে বঞ্চিত হতেন।

কাগজগুলো আর কিছু নয়, কিছু এলোমেলো বিক্ষিপ্ত কবিতার আঁচড়। ক্রিকেট-মাঠে বসে লেখা। দু'-চার লাইন গদ্যও আছে, এমনকি কার্টুনের চেষ্টা পর্যন্ত। অনুবাদ কবিতাও। অনুবাদ কবিতার তলায় 'অনুবাদ' লিখে দেওয়া আছে। লেখার ভাবে-ভঙ্গিতে কবিকে তরুণবয়স্ক বলে বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবে মনটি খোলা। পুরনো রীতিকে বর্জন করেননি। বরং তার প্রতি পক্ষপাত আছে। বেশির ভাগ লেখায় পরিচিত কবিতার প্যারডি করার চেষ্টা।

লেখাগুলো থেকে অবশ্য কবিকে খুব প্রতিভাবান বলে মনে হয়নি। তা না হোক, সেগুলি কিছু রসাল। যদি সেগুলো কোনো পত্রিকার জন্য লেখা হয়ে থাকে, এবং কবির অনবধানতার জন্য পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের লোক-সমাজে হাজির করার একটা দায়িত্বও আমাদের আছে। আমি তাই প্রসঙ্গসহ কবির টুকরো লেখাগুলি যথাসম্ভব জুড়ে দেব—সবটা দেব না, কারণ 'ক্লেদাক্ত জিজীবিষু ইডেন গোঙায়'-জাতীয় অংশও ঐ কাগজপত্রে ছিল।

প্রথমেই কবির একটি মৌলিক সমাধানের উল্লেখ করি। সকলেরই জানা আছে টেস্টের তৃতীয় দিনে স্টেডিয়ামের তলায় পালে 'আগুন পড়িয়াছিল।' এ আগুনের কারণ-ব্যাখ্যা বহুভাবে করা হয়েছে। অনিচ্ছুক বিড়ি-সিগারেটের টুকরো থেকে ইচ্ছুক দেশলাইকাঠি পর্যন্ত সকল কিছুই অগ্নিসংযোজকরূপে উল্লিখিত হয়েছে। ইচ্ছা করে আগুন লাগানো হয়েছিল—এই কথাটি সানন্দে বিশ্বাস করে ক্রিকেটে অগ্নি-উপাসক(??)ইংরেজ-সাংবাদিক বলেছেন—ভায়েরা বেশ করেছ, আগুন লাগিয়েছ! কাউড্রে যা খেলছিল, তাতে তোমরা আগুন না লাগালে আমি লাগাতাম!

অগ্নিকাণ্ড ছাড়া স্টেডিয়ামে ও গ্যালারিতে কিছু দাঙ্গাকাণ্ডও হয়েছে। স্টেডিয়ামের হাঙ্গামাটি বড়ই মজাদার। তাতে মাত্র জন-বারো আহত এবং মাত্র সের চার-পাঁচ রক্তপাত—কিন্তু চল্লিশ হাজার দর্শক কতখানি আমোদগ্রস্ত হল তাতে ভেবে দেখুন দিকি! ক্রিকেট যারা দেখতে যায়, তারা একই সঙ্গে ক্রিকেট

খেলেও বটে। সেই গ্যালারির ক্রিকেট-খেলায় বল হল মাটির ভাঁড় ও লেবুর খোসা, উইকেট অন্য দর্শকের মাথা। হ্যারো-ইটনের ক্রিকেট-মাঠে ইংরেজ ওয়াটার্লু জিতেছে এই যদি সত্যি হয়, তাহলে সীমান্ত-যুদ্ধ জিতবার জন্য আমাদেরও ক্রিকেট-মাঠের গ্যালারিতে (মাঠে নয়, কারণ মাঠে নামলেই পুলিশ তাড়া করে) কিছু লোক্যাল ক্রিকেট সংগঠিত করা দরকার। উদ্দেশ্য যখন এমন মহৎ, তখন কার্যে বিলম্ব হবার কথা নয়, হয়নিও—যাঁরা কয়েকদিন টেস্টের সময়ে ইডেনে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাই জানেন, কিভাবে এই খোসা বা ভাঁড়-যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, কিভাবে সেনাপতি, ঘোড়ার অভাবে বাঁশে চড়ে শিস্-ধ্বনি করে আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর শত-শত অনুগামী কি-ভাবে থুতু, খিস্তি, ভাঁড় ও লেবু-খোসাস্ত্র সম্বল হয়ে ঐ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ধিক্! কয়েকজন লেখককে ধিক! যাঁরা এই যুদ্ধকে 'ভাঁড়ামি' বলেছেন, এবং যোদ্ধাদের বলেছেন, 'ভাঁড়ু দত্ত'। অথচ আমাদের তরুণ কবির দৃষ্টিভঙ্গি কত ভিন্ন! তাঁর পাণ্ডুলিপিতে উক্ত আগ্নেয় ব্যাপার সম্বন্ধে পেয়েছি :

=অগ্নিতত্ত্ব : উৎস-সন্ধান=
—উত্তর পবন-বাহিত স্ফুলিঙ্গই অগ্নিকারণ—
উত্তরে বিধানসভা, বড় পঞ্চায়েত,
মুখে বল, মুষ্টি ব্যাট, সপিণ্ড ক্রিকেট।

ভারত ও এম-সি-সি-র খেলার চরিত্র-বিষয়ে একটি কার্টুনের স্কেচ্ পেয়েছি। তাতে দেখা যাচ্ছে:

দুই ব্যক্তি নিরাপদ ব্যবধানে থেকে পরস্পরের দিকে প্রচণ্ড তড়পাচ্ছে; এক-জন মুক্তকচ্ছ, অন্যজনের ফুলপ্যাণ্ট স্খলিত, আণ্ডারওয়্যার দৃশ্যমান। দু-জনকেই পিছন থেকে তাদের আত্মীয়-স্বজন জাপটে ধরে রেখেছে। দুজনের মধ্যে যে-জায়গাটা পড়ে আছে সেখানে দুদিকে তিনটি করে খোঁটা পোঁতা, এবং খোঁটায় বাঁধা একটি গোরু ও একটি ভেড়া মনের সুখে পায়ের তলার নরম ঘাস চিবিয়ে যাচ্ছে (কিংবা রোমন্থন)। ছবির উপরে লেখা 'ড্র-এর ড্রয়িং'। তলায় দু' লাইন কবিতা, যার একটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি—

পঞ্চদিন লম্ফ-ঝম্প সহ্য করি হিম্ব,
প্রড্যুস হইল এক মহা হিপো-ডিম্ব।

'প্রড্যুস' তো বিলিতি উচ্চারণে প্রডিউস। কবি অশ্ব-ডিম্বের চেয়ে বড় ডিম চান বলে হিপো-ডিম্ব বা হিপোপটেমাসের ডিমের কথা বলেছেন তাও বুঝি। কিন্তু ডিম্বের সঙ্গে মিলনকামী 'হিম্ব'টি কি—তা কি বড় আকারের হিম? কবি কি খুব শীতকাতর?

মঞ্জরেকর যে পরম চিত্তাকর্ষক খেলোয়াড় তা কি জানতাম, এই তরুণ কবির লেখা পড়ার আগে? কলকাতা-টেস্টের সবচেয়ে মনোযোগধন্য চরিত্র মঞ্জরেকর। তিনি যথার্থই ভারতীয় ক্রিকেটের 'ক্যারেকটার'—ঐ জয়সীমারা নয়। সেই জন্যই তো মঞ্জরেকর বল ধরলেই হাততালি পেয়েছেন। তাঁর খেলার সময়ে প্রতি-মুহূর্তে গুঞ্জন উঠেছে, প্রতিঘণ্টায় গর্জন। আহা, সে যদি অনুরাগে না হয়ে রাগে হয়ে থাকে, ক্ষতি কি—লোকনয়নের অবহেলা তো তাতে নেই। অপরদিকে,

দর্শকের চেঁচানিতে নাচবার বয়স মঞ্জরেকরের নেই। ইয়র্কারের হাঁচি, ফ্লাইটের টিকটিকি সামলে, পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ রান করে ঘরে ফিরতে পারলে হয়। এ বয়সে রান-আউট মানে ইউনিয়ন করে রিটায়ারের আগে বরখাস্ত হওয়া। শর্ট-রানের লট্‌ঘটে নেই বাবা! তাই মঞ্জরেকর রান না নিয়ে রানআউট বাঁচিয়েছেন ক্রমান্বয়ে। শর্টরানলুব্ধ দর্শক চেঁচায়, ওয়ান ফর থ্রো, মঞ্জরেকর পার্টনারকে উপদেশ দেন—রেস্ট ফর থ্রো। মঞ্জরেকরের দাবি, তিনি হলেন ভারতীয় দলের বয়া, ঝড়ের দিনে ওতে নোঙর বেঁধে নৌকা-ডুবি এড়ানো হয়। দর্শক বলে, কথা ঠিক, তবে ঝড় থেমে গেলে ও বয়া গলার কলসী হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের তরুণ কবি মঞ্জরেকরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাপর হয়ে তাঁকে 'ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র ইংরেজ ক্রিকেটার' বিবেচনা করেছেন। আমাদের দেশে খুব বড় প্রশংসা করতে গেলেই তো লোকে বলে, ও-ব্যক্তি জন্মে ভারতীয়, চরিত্রে ইংরেজ, যেমন বলা হয়েছে বিদ্যাসাগরের প্রশংসায়!

মঞ্জরেকর সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কবি একটি অনুবাদ কবিতা উপহার দিয়েছেন—

আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি গতকাল থেকে,
ঠিক চায়ের পর থেকেই,
এ পর্যন্ত আমার ঝুড়িতে রান উঠেছে মোটমাট এগারো,
দলের রান একশো তিন,
দর্শকেরা চেল্লামেল্লির একশেষ করছে,
কতভাবে ভ্যাঙাচ্ছে তার ঠিক নেই,
কিন্তু আমি, চেঁচামেচি, ভ্যাঙ্‌চানি, সিটি দেওয়া,
সব কিছুকে গ্রহণ করেছি খেলার অঙ্গরূপে।
আহা মরে যাই! আমাকে দান ছেড়ে দিতে হবে!—বটে!
যেহেতু কতকগুলো চ্যাংড়া আর বদমাস হল্লা করছে?—ইল্লি!
একজন ইংরেজের কাছে ক্রীজ তার দুর্গ, মনে রেখো!
যতক্ষণ প্রাণ চায় আমি দাঁড়িয়ে থাকব ব্যাট হাতে,
বেশ করব।

এখানেই মঞ্জরেকরের প্রতি তরুণ কবির পক্ষপাতের ইতি হয়নি। তিনি আরও কিছু লিখেছেন, একটি রচনা, যার নাম "নিউটন ও মঞ্জরেকর"। অসমাপ্ত রচনাটি নিম্নোক্ত প্রকার:

"বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আইজ্যাক নিউটন ক্রিকেট খেলিয়াছেন কিনা ক্রিকেট-কীটগণ বলিতে পারিবে, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য, তিনি আদর্শ ক্রিকেটারের স্বভাব লইয়া আসিয়াছিলেন—এই কয়দিন ক্রিকেটখেলা দেখিয়া আমি অনুভব করিতে পারিতেছি। আপনারা বিখ্যাত আপেল-পতনের কাহিনী স্মরণ করুন। নিউটন বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। তাঁহার মুখভাবে বৈজ্ঞানিকসুলভ মনোযোগ এবং দার্শনিকসুলভ ঔদাস্য। এমন সময়ে গাছ হইতে একটি আপেল পড়িল। তিনি উঠিয়া গিয়া আপেলটি কুড়াইয়া কামড়াইতে গেলেন, কিন্তু দেখিলেন আপেলটি পোকা ধরা। তখন সেটিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলেন—আপেল পড়ে কেন? মনুষ্যের প্রয়োজনে নিশ্চয় নয়। যদি

তাহাই হইত ঐ আপেলটি কীটদষ্ট হইত না। সেক্ষেত্রে, আপেল পড়ে কেন? নিউটন ভাবিয়া অস্থির হইলেন, এমন লোকহিত-পরাঙ্মুখ আপেল উপরে উঠিয়া বা পাশে ছুটিয়া যায় না কেন? ভাবিতে-ভাবিতে নিউটন মহা সত্য আবিষ্কার করিলেন, আপেল কাহারও প্রয়োজনে পড়ে না—না পড়িয়া পারে না বলিয়া পড়ে—আপেলের এই অনিবার্য পতনের মূলে আছে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম।

"অদ্য মঞ্জরেকরের খেলা দেখিয়া বারবার নিউটনের কথাই মনে পড়িতেছে। মঞ্জরেকরের সম্মুখে আপেলতুল্য লাল বল খসিয়া পড়িল। তাহাকে ধরিতে মঞ্জরেকরের কিছু ইচ্ছা হইল, কিন্তু ভাবিলেন, ঐ নিপতিত বলটিকে ধরা আমার সাধ্যে নাই। সুতরাং মঞ্জরেকর দাঁড়াইয়া বলটিকে পড়িতে দিলেন। তাহাতে দর্শকগণ কিছু বিক্ষোভ দেখাইল—মঞ্জরেকর ভাবিতে লাগিলেন—বল পড়ে কেন? যদি পড়ে তাহাতে দর্শক চেঁচায় কেন..."

রচনা অসমাপ্ত। এর সঙ্গে কবিতাংশও ছিল :

আপেল পড়িল, কেন যে পড়িল,
মাটিতে পড়িল বল!
নিউটন ভাবে, ভাবিছে মঞ্জু,
ভাবেতে অচঞ্চল।
ভাবিয়া ভাবিয়া নিউটন পেল
গ্র্যাভিটেশনের law,
চেল্লানি শুনি মঞ্জু রাগিল—
এরা তো আচ্ছা raw!

পরম দুঃখের কথা, তরুণ কবির সব রচনা আমি পাইনি, নিশ্চয় পাইনি, কারণ মাঠের কোনো বিষয় সম্বন্ধে তিনি অযথা উদাসীন থাকবেন, এ হতে পারে না। কুন্দরামের সম্বন্ধে তিনি অবশ্যই কিছু লিখেছিলেন, সে কাগজ হারিয়ে গেছে, এই আমার বিশ্বাস। কুন্দরাম ব্যাটকে তলোয়ারের বদলী ব্যবহার করেন। তিনি ব্যাট চালালে সভয়ে দর্শক চোখ বোজে—বুঝি গোটা দশেক মুণ্ড ধড় থেকে খসে গেল! চোখ খুললে সাধারণত দেখা যায়, বেঁচে-যাওয়া বলটিকে আদরে টেনে নিয়েছে উইকেট-কীপারের মুক্ত করতল।

সুর্তি সম্বন্ধে অবশ্য কবির কিছু লেখার কথা নয়। সুর্তি অদ্ভুত ফিল্ডিং করেছেন, কিন্তু ন্যাটা সুর্তির সুইংগ-বলের বামগতি অল্প সময়ের মধ্যে গতি-মন্থর বামাগতি হয়েছিল। তাছাড়া তিনি অসুস্থতায় প্রায়ই অনুপস্থিত ছিলেন মাঠে। এবং—নাদকার্নি ভারতীয়-দলে উপযোগিতম খেলোয়াড় হলেও কাব্য-জাগানিয়া নন। শীতের বাতাসের দংশন বৃদ্ধি পেলে আত্মরক্ষা ও মেদাকাঙ্ক্ষা, এই দুই প্রয়োজনে দুটি সোয়েটার অঙ্গে ধারণ করে তীক্ষ্ন্যাকার নাদকার্নি দলের প্রয়োজনে ব্যাটের উপর ঝুঁকে পড়ে গুড-লেংথে ব্যাটিং করে গেছেন, এবং বিপক্ষের রানোৎপাদন বন্ধ করা যখন প্রয়োজন হয়েছে, তখন তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বোলিংয়ের সুইচ-বোর্ডে। এত প্রয়োজনীয় মানুষ কখনোই অকাজের কবিতার কাজে লাগে না।

বালক চন্দ্রশেখর যদি স্নেহাস্পদরূপে পিঠ-চাপড়ানির এক লাইন লাভ করেন

তাতে বলার কিছু নেই [**চাঁদু বাছা, বেশ খেলেছ, বল দিয়েছ, ব্যাট করেছ**], কিন্তু দুরানী কি করে বাদ পড়েন জানি না। বোরদের পরেই বর্ণময় চরিত্র দুরানী। তিনি যে-ভাবে ব্যাট চালান, সে ব্যাট থেকে বাঁচলে বল সিণি দেয় পীরের দরগায়, আর না বাঁচলে সে চন্দ্রমুখী টিকেট-কাটা। দুরানী ঘোড়দৌড়ে রান নেন, তাতেও লাইন ছুঁতে না পারলে ন ফুট লম্বা হয়ে উইকেটে শুয়ে পড়েন (দুরানী লম্বা ৬ ফুট+মাথার উপরে বাড়ানো হাত ১॥ ফুট+ব্যাট ১॥ ফুট=৯ ফুট)। নিশ্চয়ই দুরানীর উপর লেখা কবিতা হারিয়ে গেছে।

দেশাই ও সরদেশাইয়ের উপর সামান্য কিছু পাচ্ছি। আমাদের কবি দেশাই ও লার্টারকে মুখোমুখি দেখামাত্র এই ছত্রটি লিখে ফেলেছিলেন—'**বামন দেশায়ে দেখি লম্বু লার্টার হাসে**।' সরদেশাইও দু-এক ছত্রে বঞ্চিত হননি। সরদেশাই বড় সাধু খেলোয়াড়, মোরারজি দেশাইয়ের মতই প্রহিবিশনপন্থী, খেলায়। ক্রীজের দণ্ডীর বাইরে দশ-মুণ্ড বিশ-হস্ত রাবণ দাঁড়িয়ে, তিনি জানেন। তিনি জানেন উদ্বাস্তুর দুঃখ কত। সুতরাং সযত্নে চরণের চরিত্ররক্ষা করেন। প্রথম ইনিংসে লার্টার যখন তাঁর পায়ের অবৈধ অবস্থানের বিরুদ্ধে অ্যাপীল জানিয়েছিলেন, তখন সরদেশাই তাঁর অভিযুক্ত শ্রীচরণকে একচুল না নড়িয়ে আম্পায়ারের কাছে সাধুতার অ্যাপীল করেছিলেন। চান্স ও চেষ্টা মিশিয়ে সরদেশাই প্রথম ইনিংসে ৫৪ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬ রান গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তাই দেখে কবি প্রশংসভাবে লিখেছেন—

শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর,
শেয়ার কিনৈঃ ধুরন্ধর,
সহসা হলৈঃ ডিরেক্টর,
ক্যাপচার বিজনেস।

কবির হৃদয়-দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক নবাব-নন্দন পাতৌদি। রাজবন্দনা কবিদের আদি পেশা। আশ্চর্য, পাতৌদির ধারা-বাহিক ব্যর্থতা সম্বন্ধে কিছুই পেলাম না, অথচ সামান্য সাফল্যে প্রশংসার ছটা! এমন কি পাতৌদির সমালোচকেরা অকারণে গাল পর্যন্ত খেয়েছেন—

বাপ্‌কা বেটা টাইগার,
মুর্খে বলে সাইফার।

অতঃপর প্রিন্স-চার্মারের বিগলিত গুণগান—

ক্রিকেটে নাচিছে রাজার দুলাল,
বাতাসে উড়িছে আবীর গুলাল,
সে রঙে রাঙিয়া তরুণী শরমে
খেলা কি! লীলা কি! ভাবিছে ভরমে।

অথচ কী অন্যায়! জয়সীমা সম্বন্ধে মাত্র এক লাইন!—

'বীরহস্তে ব্যাটখানি, তুলি দিব আমি।'

আমি অবশ্য বিস্ময়বোধ না করলেও পারতুম, কারণ কবিদের সবই উদ্ভট। নচেৎ 'অতিরিক্ত' কৃপাল সিং কবির মনোযোগ আকর্ষণ করেন কিভাবে? ডবলিউ জি গ্রেস ও কৃপাল সিং কবির মনাকাশে পাশাপাশি উদিত ছিলেন:

ডাঃ ডবলিউ জি গ্রেস
তাঁর মুখভর্তি কেশ,
তাতে হারালো রে বল,
লোকে আনন্দ-চঞ্চল।

এক্সট্রা কৃপাল সিং
হায়রে শ্মশ্রুহীন,
কান্না-আকুল বল—
লুকোই কোথা বল?

আমি দেখে গভীর তৃপ্তিবোধ করেছি, ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে এক-জনের সম্বন্ধে আমার মতোই কবির কিছু পক্ষপাত আছে—তিনি হলেন কেশ-সুন্দর বোরদে। বোরদে সারাক্ষণই কিছু-না-কিছু দলকে দিচ্ছেনই—এবং দর্শককে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—বোরদে কোথায় নেই? বোরদে-প্রসঙ্গে আমাদের কবির অনেকগুলি টুকরো কবিতা পেয়েছি। এক জায়গায় দেখছি—গদ্যে লেখা এক লাইন—'টিটমাসের এক ওভারে বোরদের চার বাউন্ডারি'—তার তলায় এই কবিতাংশ—

রাজার প্রতাপে 'বলে' দূর লোকারণ্যে
নির্বাসিলে টিটমাসে, নষ্ট নারী সম,
মুড়াইয়া ব্যাটক্ষুরে।

কোন্ পরিস্থিতেতে বোরদের প্রতি কবির এই প্রীতির উচ্ছ্বাস, তাও কবি পরিষ্কার করেছেন ভারতমাতার উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েক পংক্তিতে। প্রথম ইনিংসে ভারতবীরেরা পটপট আউট হওয়ার পরে লিখিত—

এলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে ইয়া ইয়া লাশ,
গর্ভে ধরেছ মাতঃ খাইবার পাস।

এই দুর্লগ্নে বোরদে-বন্দনায় কবির লেখনীতে পুনশ্চ অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও বীররসের মহান আবির্ভাব—

'প্রাইস'-সঙ্কটে পড়ি ম্লানপূর্ণ দেশ
অসহায়, খাবি খায়, উদ্ধার' তাহারে
মুহুর্মুহু বাউন্ডারি, বীর বরোদার
বোরদে সুকেশ।

বোরদে কিন্তু কবির প্রত্যাশার অনুরূপ ব্যাটিং-বীরত্ব দেখাতে পারেননি তৃতীয় টেস্টে। তবে বল করেছিলেন অপূর্ব। তিনি, কখনো মাটিতে হাত ঘষে মাটির সমর্থন চেয়ে, কখনো মুখামৃতে বলকে পরিশুদ্ধ করে, যেসব বস্তু নিক্ষেপ করেছেন, সেগুলি ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের আত্মবিশ্বাস বিশেষভাবে হরণ করে নিয়েছিল। 'অ'-এ অচলের মতো 'ক'-এ কাউড্রেকে নাড়াতে বোরদে ক্রমেই বলের ফ্লাইট বাড়িয়ে গেছেন, সে ফ্লাইট প্রথমে ছিল ধনুকাকার, পরে দাঁড়াল গম্বুজ, তারও পরে হাওয়ায় ওড়া ফানুস—যদি কাউড্রে একটু মুগ্ধ হন। তিনি সাপের মুখে ভেককে নাচিয়েছেন যদি সাপের চিত্তে দাদুরী-প্রীতির সঞ্চার হয়। আমাদের কবি, বোরদের সেই কাণ্ড দেখে বিহ্বল হয়ে একটুখানি অন্যায় করেছেন, শুধু ইকটুখানি—

'পাখির নীড়ের মতো বল তুলে চাওয়া বরোদার বোরদের প্রেম।'

কবি-বন্ধুর ছিন্নপত্র থেকে বেশ স্পষ্ট বুঝেছি যে, কবিরা বচনে বিশ্বপ্রেমিক, কিন্তু অনুভূতিতে আঞ্চলিক। নচেৎ ইংরেজ খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে এত অল্প পেলাম কেন? কাউড্রেকে অবশ্য কবি একেবারে বাদ দিতে পারেননি। আমরাই

বা কে পেরেছি? কাউড্রেই ছিলেন কলকাতা টেস্টের বিশেষ আকর্ষণ। তিনি মাঠে আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে মাইক স্মিথ যে এম-সি-সি-র ক্যাপ্টেন, সকলে ভুলেই গিয়েছিল সে কথা। সকলে উদ্গ্রীব ছিল কাউড্রে-যোজনায় এম-সি-সি-র পঞ্চদিবসী উৎপাদনের হার কিভাবে বৃদ্ধি পায় তা দেখার জন্য। তাঁর ব্যাটের পিছনকার ব্যাটারির ভোল্টেজ নিয়ে গবেষণা হয়েছে মাঠে, এবং একজন দোকানদার-দর্শক মাঠে কাউড্রে নামামাত্র তাঁর সুপুষ্ট চেহারা দেখে সহর্ষে বলেছিলেন—'আমদানীর মাল ভালই হবে মনে হচ্ছে।'

কলকাতায় পা দিয়েই কাউড্রে নেট প্র্যাকটিসের সময়ে অঙ্গমর্দক জীবনের হাতে দু দুবার বোল্ড হয়ে নিউজ সৃষ্টি করেছিলেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। এ নিউজ কাউড্রের 'উপহার' সংবাদলোভীদের, আমাকে জানিয়েছেন জনৈক প্রথম শ্রেণীর আম্পায়ার। তিনি নেটের পাশেই ছিলেন। তাঁর ধারণা, কাউড্রে কায়দা করে আউট হওয়ার মজা করেছিলেন। সে কথাটা যখন সংবাদ-উন্মত্ত কোন ব্যক্তিকে আম্পায়ার জানালেন, তখন তিনি দারুণ ঘৃণায় 'ফুঃ' করে বললেন, 'চুপ করুন, খেলা দেখেছেন কখনো?'

নেটে কাউড্রে, জীবনের কাছে সত্যি মিথ্যা যেভাবেই আউট হ'ন, মাঠে 'জীবন' দিতে রাজী ছিলেন না একদম, তাও দেখেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠে 'বিনা জীবনে' তিনি অবস্থান করেছেন। 'ডাক'মোচন করতেই তাঁর ৩৫ মিনিট লেগেছে, মাঠে দাঁড়িয়ে এত দেখেছেন যে, উপাধি পেয়েছেন 'দর্শনসাগর', নব্বুয়ের বাঁশের ডগা ধরে দোল খেয়েছেন বহুক্ষণ পরমানন্দে, অবশেসে যখন গোঁফ-দাড়ি-ওয়ালা সেঞ্চুরিটিকে জন্ম দিয়েছেন, তখন তাঁর বৃদ্ধ বয়সের দুর্নীতি নিয়ে অনেকেই চাপা হাসি হেসেছেন।

কাউড্রের কাণ্ডে আমাদের কবি যে মোটেই খুশি নন, তা তাঁর রচনাতেই মালুম। লম্বু লার্টার সম্বন্ধে যা লিখেছেন, কাউড্রে সম্বন্ধেও সেই একজাতীয় কথা পাচ্ছি—'**বুড়ো কাউড্রে হাসে।**' অন্য এক স্থানে—

মহাযোগী কাউড্রে মিটিমিটি চায়,
নাচ সখি নাচ, দেখি বিনা পয়সায়।
যদি বল বিয়া কর হইয়া আউট,
চালাক মুনির তাহে বিশেষ ডাউট।

এবং আরও একটি লাইন: '**রম্ভার ছলাকলা নিতান্ত রম্ভা।**'

কাউড্রে কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নন, হবার কথা নয়। মস্ত একটা মেশিন, অনেকদিন লক-আউটে বন্ধ ছিল, চালু হতে দেরি হয় স্বভাবতঃই, কিন্তু চালু হলেই দেখা যাবে বল গুঁড়িয়ে তৈরি হচ্ছে রানের ছাতু, মণ মণ।

কাউড্রে সহজে হারার বা ক্রিকেটকে ছাড়ার পাত্র নন। অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে তাঁর ক্রিকেট এগিয়েছে। তাঁর জীবনের দুঃখকরুণ ঘটনাটি পাঠককে জানাই। ১৯৫৪ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি অস্ট্রেলিয়াগামী এম-সি-সি দলে নির্বাচিত হলেন। তাঁর জীবনের মহাগৌরবের দিন। কাউড্রের খেলা-পাগল বাবা ও মা এলেন টিলবারীতে, ছেলেকে বিদায় দিতে। তারিখটি ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪। তাঁরা জাহাজে বসেই লাঞ্চ খেলেন একসঙ্গে। তার পনেরো দিন পরে যাত্রাপথে কলম্বোর ম্যাচ খেলতে শুরু করলেন কাউড্রে।

এবার কাউড্রের নিজের কথাই উদ্ধৃত করি—

"যদিও আমরা এডেন থেকে দ্রুত কলম্বোর দিকে গিয়েছি, তবু অল্পাধিক চার ঘন্টা মাত্র খেলা হতে পারল। জাহাজ থেকে সোজা নেমে, প্র্যাকটিসহীন অবস্থায়, দ্রুত ধাঁচের পিচে, নিরক্ষ-সূর্যের তলায় খেলতে গিয়ে যা হবার তাই হল—আমরা ৫ উইকেটে ৩০ রান করলুম। পাবার বা যাবার কিছু নেই, এই মনোভাব নিয়ে ভিক উইলসনের সঙ্গে আমার কাজ আমি আরম্ভ করলুম। পিটার মে যখন ডিক্লেয়ার করলেন, তখন আমি ৮০ মিনিটে ৬৬ রান করেছি।...

"দূরে আমাদের বাড়িতে সেই সন্ধ্যায় বাবা রেডিওর ধারে বসেছিলেন। সুখবর শুনে তিনি তাড়াতাড়ি উপরতলায় উঠে গেলেন কাগজ-পেন্সিল আনতে, আমার স্কোর টুকবেন তিনি। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে নেমে এসে রেডিওর ধারে আবার বসলেন। কয়েক মিনিট পরে আমার কাকা যখন কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকালেন, দেখলেন যে, আমার বাবা মারা গেছেন, চেয়ারে বসে। তিনি কিছুদিন থেকে হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন।"

এই শোক বহন করেও কাউড্রে ক্রিকেট খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ায়। খেলা ছেড়ে দেশে ফিরে আসেননি। হয়তো ভেবেছেন, পিতার গৌরবময় স্বপ্ন সফল হয়েছে তিনি টেস্টদলে জায়গা পাওয়ায়—তিনি ভালভাবে ব্যাট করছেন এই তীব্র আনন্দের মধ্যে পিতার শেষ নিশ্বাস পড়েছে—তাঁর সেই অন্তিম তৃপ্তির প্রতি তাঁর একটা দায়িত্ব আছে।

ঐ ১৯৫৪-৫৫ সালে কাউড্রে তাঁর ক্রিকেট-জীবনের পরম সাফল্যময় অধ্যায় কাটিয়ে যখন ফেরার পথে নিউজিল্যাণ্ডে আছেন শেষ দু একটি খেলার জন্য—তখন তাঁর কাছে তার গেল—তাঁর মা গুরুতর পীড়িত। কাউড্রে তৎক্ষণাৎ বিমান ধরলেন। অবশ্য, মাতাকে পুত্র জীবিতই পেয়েছিলেন।

ইংলণ্ডের অপরাপর খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্যাচাকৌচির বিঙ্কস (যিনি প্রথম ইনিংসে ৫টি ক্যাচ ধরে রেকর্ড করেছেন) বা প্রথম উইকেটের বোলাস কবির মনাকর্ষণের মতো আকর্ষণীয় ছিলেন না। ঠুকোধর্মী বোলাস তাঁর ক্যালাস নৈপুণ্যে রান করেন, কিন্তু রানের বাড়তি রসের বোনাসটুকু দেবার সামর্থ্য তাঁর নেই। লম্বু লার্টার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ কাব্য আগেই উপহার দেওয়া গেছে, কিন্তু অধিক নয়। লার্টার ব্যাটসম্যানকে লটকে দেবার বাসনায় লটপট করে ছুটে আসেন, কিন্তু বিশেষ-কিছু করে উঠতে পারেন না শেষপর্যন্ত। নিজেকে গুছিয়ে পথ চলাই তাঁর পক্ষে মুশকিল, প্রমাণ-সাইজ বিছানা জোগাড় করতে তাঁর নিশান্ত—তারপরে আবার বলের হাঙ্গামা—সুবিধে করা সত্যই কঠিন। আমার এক ক্রিকেটার-বন্ধু বলেন, লার্টার দাঁড়িয়ে বল করলে খেলা কঠিন হত—সেক্ষেত্রে ঊর্ধ্বপতনের জন্য বলের লাফানিতে ব্যাটসম্যানের নাকানি-চোবানি হত। যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ লার্টার ভারতবর্ষে সদয় দৈত্য। অপর পক্ষে টিটমাসকে দেখলে বোঝা যায় তিনি টাইট হয়ে বসেছেন ক্রিকেটে। তাহলেও, টিটমাস যা উইলসন বা প্রাইস বা নাইট কবির মন পাননি। পারফিট তাঁর বিচিত্র নামের জন্য মৃদুহাসাময় দুটি লাইন লাভ করেছেন—

বল দেয় পারফিট
দৌড়িয়া চার ফিট।

কবির কাব্যে এম-সি-সি-র অনেক সদস্যের অনুল্লেখের কারণ বুঝি—কিন্তু তাই বলে অধিনায়ক মাইক স্মিথ একেবারে বাদ? ক্ষীণদৃষ্টি চশমাধারী মাইক স্মিথ সত্যই মন্দভাগ্য, তিনি ব্যাট করতে নামার সময়েও অধিনায়কের হাততালি পাননি, দ্বিতীয় ইনিংসে দুটি ওভার বাউণ্ডারিসহ তাঁর নটআউট ৭৫ উপেক্ষিতই থেকে গেছে কবির কাছে, পাবলিকের কাছেও।

অধিনায়ক মাইক স্মিথের মতোই, আম্পায়ার-দুজন চোখের সামনে বজায় থেকেও চিরপরিচিত বস্তুর মতো অস্বীকৃত থেকে যেতেন যদি-না সহানুভূতিতে বৃষ্টি পড়ত। বৃষ্টিই তাঁদের উপর লক্ষ নয়নের বিদ্যুৎপাত ঘটিয়েছে। সে কিন্তু বিষদৃষ্টি। যখন বৃষ্টিসিক্ত তৃতীয় দিনটির বাঁচা-মরার পূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁরা গ্রহণ করলেন, তখনও, এই গুরুতর দায়িত্ব বহন করা সত্ত্বেও, শ্রদ্ধাবোধ করা তো দূরের কথা, তাঁদের সম্বন্ধে বাঁকা কথায় বেঁকে রইল সকলের মুখ। আম্পায়ারদের একজন টুপি খুলে টুপির নীচের অত্যন্ত উজ্জ্বল পরিষ্কার মাথা দেখিয়েও জনশ্রদ্ধা পাননি। বরং মাঠ পরীক্ষার জন্য তাঁদের সঙ্গে গামছা-গায়ে যে মালী এসে উপস্থিত হয়েছিল—তার প্রতি সহানুভূতির বান ডেকেছিল গ্যালারিতে গ্যালারিতে। আমাদের কবিও আম্পায়ারদের নিয়ে তামাশার লোভ ছাড়তে পারেননি। একথা ঠিক যে, ভিজে মাঠে বর্ণহারা বলের রক্তিমা উদ্ধারের জন্য যখন বোলাররা নিতম্ব-ঘর্ষণের পরিবর্তে আম্পায়ারের কাঁধের ঝাড়নে তাকে রগড়াচ্ছিলেন, তখন বাস্তবিক আম্পায়ারকে দূর থেকে হোটেলে ওয়াশবেসিনের পাশে দাঁড়ানো ঝাড়ন-কাঁধে বেয়ারার মতই দেখাচ্ছিল—কিন্তু দেখাচ্ছিল বলেই, কবিকে সে-কথা লিখতে হবে? অত্যন্ত আপত্তিকর সেই দুই ছত্র, যা আম্পায়ারদের স্বগতোক্তিরূপে লিখিত—

পাদরীর রূপে থাকি গম্ভীর বদনে,
খেলার বেয়ারা বলি চিনিলে কেমনে?

কবির অনেক কবিতাংশ স্বচ্ছন্দে উদ্ধার করেছি, কিন্তু এবার ভয় পাচ্ছি। দর্শকদের বিষয়ে বড় যাচ্ছেতাই কথা কবি লিখেছেন। দর্শকেরা কিছু উত্তেজিত থাকে—তাই বলে তারা সুন্দরবনের বাঘ? আর ষণ্ডা-গুণ্ডা ক্রিকেটাররা হরিণী? কবির অপসৃষ্টির চেহারা এই—

সুন্দরবনে চরে সাদা হরিণী
হালুম হালুম রে নিয়ত শুনি।

অথচ, তৃতীয় টেস্টে দর্শকরাই সর্বাধিক খেলোয়াড়। মরা ভেজা খেলাকে বাঁচিয়ে তাতিয়ে রাখতে তাঁদের চেষ্টার তুলনা নেই। তাঁরা কালিদাসের মতোই নিজেদের পালে আগুন লাগিয়ে 'কাষ্ঠাহরণ' করতে চেয়েছেন, নিজেদের রক্ত বইয়ে রক্তহীন খেলায় শোণিত-সঞ্চারে সচেষ্ট হয়েছেন।

খেলার সূচনায় মাঠের ছবিটা চোখের সামনে আনুন। ছবিটা পুরনো। ক্রিকেট যেহেতু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের সামাজিক আউটিং সে-কারণে হাজার-পঞ্চাশ মানুষ সেজে-গুজে, খাবার-দাবার নিয়ে মাঠে যেতে বাধ্য। মাঠে গিয়ে পূর্বের মতই দশটায় সময়ে হুটোপাটি করে প্রবেশ, একই সঙ্গে আসন ও ভলাণ্টিয়ার সন্ধান, আসন-প্রাপ্তি ও বন্ধু-সন্ধান, টসের সময়ে হাততালি, দণ্ডায়মান অবিবেচকদের প্রতি দাঁড়িয়ে নিন্দাবর্ষণ, সম্মুখে বাঁশপ্রান্ত ব্যক্তিগণ

কর্তৃক কর্তৃপক্ষের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ-সম্পাদন, আম্পায়ার, ফিল্ডার ও ব্যাটসম্যানের ক্রমঅভ্যুদয়, শাটার টিপতে-টিপতে, পেছিয়ে-পেছিয়ে ক্যামেরাম্যানদের অনুনয়—'আর একটু রূপ দেখান স্যার'—সবই এক রকম। ব্লেজারগরবী তরুণ, 'টাই-টম্বুর' ভদ্রজন ও চর্চাসুন্দরী ভদ্রমহোদয়া। সেই প্রবেশপথে হট্টগোল, ঠেলাব্রতে প্রত্যেকের কর্মযোগ, বেড়ালঙ্ঘনে উৎসাহদান ও লঙ্ঘিত হলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর হতাশা প্রকাশ, নতুন কিছু নয়। এমনকি খেলা শুরু হবার আধঘণ্টা পরে ভিড়-বিরক্ত স-নারী বিজ্ঞজনের আগমন ও খেলাশেষের আগেই বুদ্ধিমানের মতো প্রস্থান—এও পুরাতন।

টেস্টের প্রথম দিনে ভারতীয় দর্শকদের যন্ত্রণার সীমা ছিল না। চোখের সামনে পট-পট পটল তুলেছে প্রিয়জন। উজ্জ্বল সূর্য ও উজ্জ্বলতর জয়সীমাকে দিয়ে খেলা শুরু হয়েছিল, বেলা বাড়লে দেখা গেল সূর্য ম্লান এবং ততোধিক ম্লান ভারতীয় ব্যাটিং। আকাশের মেঘ-রৌদ্রের খেলায় মেঘের ভাগ ভারতের ভাগ্যে পড়ল বেশি। মেঘলা দিনটি ভারতীয় দর্শকদের কাছে 'মধ্যাহ্নে আঁধার'; হায়, সূচনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের স্বদলের লেজের শক্তিসন্ধান করতে হয়েছে। এই শোচনীয় অবস্থাতেও কিন্তু দৈনিক দর্শক সম্পূর্ণ আনন্দতৃষ্ণা বিসর্জন দিতে পারেনি। সে 'মার্ মার্ মার্' রবে বিউগল্ বাজিয়েছে ভারতের উদ্দেশ্যে। ইংলণ্ডের ব্যাটিং না দেখে যে সিরিয়াস দর্শক ভারতের ব্যাটিং কত মন্দ বলতে রাজি হননি, তিনি রেগে গিয়েছিলেন, দৈনিক দর্শকের এই চোখের হ্যাংলামিতে। দ্বিতীয় দিনে দর্শকের মহা স্ফূর্তি। নাদকার্নি-চন্দ্রশেখর দারুণ খেলেছে। তদুপরি দিনের মধ্যে ইংলণ্ডের উইকেটও পড়েছে অনেকগুলি। দামী গরমজামা পরে দামী বাবুদের আর ঘামতে হল না, চা-ওয়ালা বোরদের চেয়ে পপুলার হয়ে দাঁড়াল, এবং তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সে চেঁচাতে লাগল—আরও চা লিন বাবু, আরও সায়েব আউট হোবে বাবু।

কিন্তু সবটা আউট করা গেল না ইংলণ্ডকে। পথে কাউড্রে পাহাড়। না নড়ে, না চড়ে কাউড্রে নির্বিচল রইলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ব্যাপারটা বিচলিত করেছিল কবিকে। এতখানি বিচলিত যে, ছন্দ-হারা হয়ে গদ্যে লিখতে বাধ্য হয়েছেন:

ব্যাটসম্যানকে প্রশ্ন—তুমি কি কখনো মারো না?

—কেন, মারি তো!

—কখন?

—যখন চাকর বাজারের পয়সা চুরি করে।

তৃতীয় দিনে দর্শকের দুর্গতির একশেষ। গাছের ডালে বসে কাকগুলো ভিজছিল চুপচাপ, গ্যালারির ডালে বসে মানুষগুলো ভিজছিল 'সোচ্চারে'। এর উপর আম্পায়ার বন্ধ করে দিলেন খেলা। তখন খেলা শুরু হল ভেন্ডারদের। কাশী বিশ্বনাথ সমিতির পবিত্র পানি ঈষৎ বর্ণান্তরে চা নাম গ্রহণ করে আসতে লাগল ভাণ্ডে-ভাণ্ডে। এই অবস্থায়, বৃষ্টির জন্য বাচ্চারা যখন হুটোপাটিতে, তরুণেরা পর্যবেক্ষণে, তরুণীরা ঈক্ষণে, মধ্যবয়সীরা আলোচনায়, সর্ববয়সীরা খাদ্য-চর্বণে নিরত, তখন ইডেনের পূর্বদিকের গ্যালারিতে গাছে ঠেসান দিয়ে জমিয়ে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ। চায়ের ভাঁড় হাতে তাঁকে ঘিরে বসেছিল নতুন-পাওয়া নাতি-নাতনির দল। দাদু গল্প করছিলেন পুরনো ইডেনের। ইডেনে

কতবার বৃষ্টি হয়েছে, তাতে কি দুর্গতি হয়েছে খেলার, খেলোয়াড়দের—বর্ষার মেঘলা দিনে পুরনো সুখের স্মৃতিমেদুর কাহিনী। ইডেনের গ্যালারি এখন আত্মবিস্তার করে অনেকগুলি বৃদ্ধ বৃক্ষকে ভিতরে টেনে নিয়েছে। তার মধ্যে যে-গাছটিতে হেলান দিয়ে বৃদ্ধ বসেছিলেন, তার গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে, হাতের ডগাটুকু ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুমু খেয়ে বৃদ্ধ ঘনস্বরে বললেন, 'জানো বাবারা, নাইডুর ওভার-বাউন্ডারি এই গাছে ধাক্কা খেয়ে ফিরে গিয়েছিল মাঠে।' তারপর যখন হু-হু করে বাতাস বয়ে এল উত্তর থেকে, গায়ের চাদর ভাল করে টেনে নিয়ে মুখ টিপে হেসে বৃদ্ধ বললেন, 'বাবাসকল দেখ, ক্রিকেট কত বড় খেলা, কেমন করে সে সব-কিছু মিলিয়ে দেয়। ইংরেজরা ক্রিকেট খেলে গ্রীষ্মে, আমরা খেলি শীতে। ক্রিকেট শীত গ্রীষ্মকে এক ঘাটে জল খাওয়ায়—কি বলো বাবারা ?'

এই মধুর কৌতুকের রেশ মিলাতে না মিলাতে হৈ-হৈ রব উঠল স্টেডিয়ামে। সেখানে বড় করে 'কালস্রোত'-এর বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল। তারই উদ্দীপনায় কি না কে জানে, স্টেডিয়ামকে ঘিরে কুটিল হয়ে হয়ে উঠল কালস্রোত।

চতুর্থ দিনে আকাশ পরিষ্কার। দর্শকের পক্ষে বিশেষভাবে। সকালেই ইংলন্ডের ইনিংস শেষ হল দেশাই-কামড়ে। ভারতের রানকে বেশিভাবে অতিক্রম করতে পারল না ইংলন্ড। তবু ভারতের বিপদ যায়নি। যদি আবার শীতের ঝরাপাতা হয় উইকেটগুলো ? পাতা ঝরল ঠিকই, তবে উইকেটের নয়, রানের। জয়সীমা খেলাচ্ছলে বালক বৃকোদরের মত এমন নাড়া দিতে লাগলেন এম-সি সি গাছটাকে যে, ঝুপঝাপ সব খসে পড়তে লাগল গাছ থেকে, আর পালাল প্রাণভয়ে। আমি হাসলুম প্রাণভরে। সকালে বাসে আসছি—বাস খারাপ হয়ে গেল পথে। কি একটা তার ছিঁড়েছে অন্ত্রে। গাড়ির বনেট খুলে পরীক্ষা চলেছে—যাত্রীরা অধীর। কি হল ? কখন চলবে ? চলবে কি চলবে না ? ড্রাইভার ভরসা দিয়ে বলল, চলবে বাবু চলবে, দড়ি দিয়ে যন্তরটাকে বেঁধে দিচ্ছি। সেই শুনে ভিতর থেকে বাজখাঁই গলা গাঁক করে উঠল—'দড়ি বেঁধে কি বাস চলে হে ?' ভেবেছিলাম, চতুর্থ দিনের শেষে এই কথাটাই লিখতে হবে ধ্বসে-পড়া ভারতীয় দলের সম্বন্ধে—দড়ি বেঁধে কি বাস চলে হে ? জয়সীমার তাড়নায় যখন রানের বাস চলতে লাগল উর্ধ্বশ্বাসে, তখন সকালের কথাটা মনে পড়ল, আর হাসলুম, বারবার হাসলুম, অনুমানের ব্যর্থতায়।

জয়সীমা যখন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে নাইটকে এক ওভারে পরপর তিনটে আগুনের বেড়া দেখালেন, তখন দর্শকেরা উত্তেজনায় পাগল। বিউগল্, ঘণ্টা, শিস, হাততালি, এবং কলকাতার মাঠের নতুন আনন্দরব—উলুধ্বনি। এক উত্তেজিত আধুনিক পুরুষ দাঁড়িয়ে উঠে উন্মাদের মত চিৎকার করতে লাগলেন—'চার্মিং! চার্মিং!' তাঁর সঙ্গিনীর মধ্যে সেই উন্মাদনা এমনভাবে সংক্রামিত হল যে, তিনিও মুক্ত বাহুর আন্দোলনে হর্ষপ্রকাশ করে উঠলেন—'ডার্লিং! ডার্লিং!' বিরক্ত পুরুষ উত্তেজনা সংবরণ করে বসে পড়লেন।

লাঞ্চের পরে যখন জয়সীমা যত্নের সঙ্গে তন্ন-তন্ন করে সেঞ্চুরি সন্ধান করতে লাগলেন, তখন দর্শক তাঁর বিষয়ে পুরনো কৃতজ্ঞতা ত্যাগ করতে পারল না—তাঁর সেঞ্চুরির জন্য নিজেদের আনন্দকে উৎসর্গ করল। ধোঁয়ার রিঙ পরপর

শূন্যে ভাসিয়ে দর্শক বলল উদাসভাবে—'যাও রিঙ, বোলো তারে...।' মাঠের বাইরে তখন শ'য়ে-শ'য়ে গাড়ি কুমীরের মত রোদে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে সারে-সারে।

চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে টিটমাস ও পারফিট যখন ভারতীয় ব্যাটকে পেন্ডুলাম করে ছেড়েছেন, তখন দুই দর্শকের সংলাপটি মনোরম :

—টিটমাসের স্পিনেই এই? গিবস্-এর বলে কি হবে?

—জিভস্ বেইরে পড়বে।

মহিলাগণ বর্ধিততর সংখ্যায় টেস্ট দেখতে গিয়েছিলেন অথচ আমার লেখনী 'রমণীয়তা' ত্যাগ করল কেন এবার, এ নিয়ে অনেকেই ক্ষোভ করেছেন। ক্ষুণ্ণ ব্যক্তিদের জানাই, টেস্ট-ক্রিকেট এইভাবে আরও কয়েক বৎসর চললে ক্রিকেট-মাঠে মহিলা-রহস্যের অবসর একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। মহিলারা এই কয়েক বৎসরে বেশ কিছু ক্রিকেট শিখে নিয়েছেন, সে কথাটা রস-পিপাসুরা ভুলে যাবেন না দয়া করে। মহিলাদের এখন নব শিক্ষার আনন্দ, সুতরাং উন্নতির গতিও তীব্র। ডালহৌসী স্কোয়ারে মেয়েদের উপস্থিতি যেমন আর বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না, তেমনি ক্রিকেট-মাঠেও করা উচিত নয়। বেকার ব্যক্তিই মেয়েদের অফিসে কাজের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে; তেমনি টিকেটহীন বা ক্রিকেট-জ্ঞানহীন লোকেরাই মেয়েদের ক্রিকেট-জ্ঞানের অল্পতায় সন্দেহ করে।

ক্রিকেটকে পুরুষের খেলা ধরে নিয়ে ভারতে মাঠের ধারে মেয়েদের উপস্থিতির বিশেষ মূল্যের কথা লিখেছেন ইংরেজ পুরুষপ্রধান টেড ডেক্সটার :

"ভারত-পাকিস্তানে নয়া জাতীয়তাবাদ হাজার-হাজার দর্শককে মাঠে টেনে আনে বহিরাগত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের নির্বাচিত যোদ্ধাদের যুদ্ধ ব্যাপার দেখবার জন্য।...মেয়েদের সাধারণত বিচ্ছিন্ন করে একটা বিশেষ স্থানে বসতে দেওয়া হয়। আমি সবসময় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন যারা, তাদের লেডিজ-স্ট্যান্ডের দিকে ফিল্ডিং করতে পাঠাতুম। অবশ্য ক্যাপ্টেন হয়েছি বলে (বড় দুঃখ!) আমি সেই সুদূর লোকে কখনই যেতে পারতুম না; দূর থেকে আমি ভেবেই পেতুম না—কয়েকজন তরুণী কী-যে-সব বলে আমাদের ছোকরা-দের উদ্দেশ্য ক'রে—আর তারা টকটকে লাল হয়ে ওঠে সেই শুনে!"

এবারকার ক্রিকেট-মাঠে শীত ও স্ত্রী-শালীনতার সম্পর্ক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে উৎসাহিত করেছেন আমার এক সুহৃদ্। আমি তাঁর ফাঁদে ধরা দিতে রাজি নই। শীতে সকলেই অঙ্গে বোঝা চাপায়, এবং গরমে সব শালীনতাই কিছু গলে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেটা মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের ক্ষেত্রেই আপেক্ষিক-ভাবে বেশি ঘটছে ইদানীং। কৃকলাস তরুণেরা যখন নাভিকুণ্ডলীর নীচে বেল্ট-বাঁধা, ন্যাকড়া-জড়ানো দুটি মুরগীর ঠ্যাং ঝুলিয়ে ট্যাং- ট্যাং করে রাস্তায় ঘোরে, কিংবা ক্রিকেট-মাঠের গ্যালারিতে ধিং-ধিং নাচে, তখন মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি মেয়েলী তারা—এক্ষেত্রে 'সুন্দর' যদি বলেন, মেয়েরা মাঠের চেয়ে গ্যালারিতে আরো অধিক মেয়েলী খেলা দেখেছেন, আপত্তি করব না।

আমাদের অজ্ঞাতনামা কবিও ইডেনে-উপস্থিত মেয়েদের প্রশস্তি করেছেন :

লর্ডসেতে লেডি যায় নাতি শুদ্ধমতি,
ইডেনে ইভের দল কিছু জ্ঞানবতী।

কবির শেষ বাণী কি? ৩রা ফেব্রুয়ারির তারিখ দেওয়া যে একটুকরো কবিতা পেয়েছি, মনে হয় সেই তাঁর চরম বাণী। ক্রিকেটের ইতিহাস, পুরাণ, উপভোগ-রীতি—সবই ফুটিয়েছেন অতি সামান্য স্থানে:

স্বাপরে কন্দুক-ক্রীড়া, ত্রেতায় গেণ্ডুয়া,
কলিতে ক্রিকেট, দেখ টানিয়া চণ্ডুয়া।

উপরের কবিতার ঠিক পাশেই আরও চার লাইন অনুবাদ-কবিতা ছিল। ক্রিকেট সম্বন্ধে কবির আর একটি মুড প্রকাশ পেয়েছে তাতে। ওমর খৈয়ামের অনুকরণে লেখা সেই চার ছত্র—

একটি সেরা মাঠের পরে সুষম উইকেট,
সাহসভরা একটি ব্যাট—একটি রাঙা বল,
এবং তুমি বলটি লয়ে আমারি সম্মুখে,
ক্রিকেট পিচে স্বর্গ নামে, স্বর্গ কোথা বল্?

শেষ কবিতাটি একটি নূতন আলোক দিল আমাকে—তার স্বারা এই অজ্ঞাত কবির রহস্য যেন কিছুটা স্বচ্ছ হল। আমি যেন অনুমান করতে পারছি, এই কবি কে? বর্ষার দুপুরে যে-গাছটিতে ঠেসান দিয়ে বৃদ্ধ বসেছিলেন, তারই খানিক দূরে আর একটি গাছের গায়ে শরীর এলিয়ে দিয়ে উদাস হয়ে বসেছিল একটি ভাবালু যুবক—দূর থেকে দেখেছিলুম। আর তার পাশে বসে একটি চঞ্চল মেয়ে সারাক্ষণ হাত-পা নেড়ে কী-সব বকবক করছিল। শেষ কবিতাটি পড়ে মনে হচ্ছে, ঐ উদাস ছেলেটিই আমাদের কবি—প্রেরণাকে নিয়ে মাঠে স্বর্গবাস করতে এসেছিল কয়েকদিনের জন্য।

কিন্তু কবিতার পাতাগুলো গ্যালারির তলায় গেল কি করে? সিনেমারসিক পাঠক-পাঠিকাকে তাও বলে দিতে হবে? নিশ্চয় শেষদিনে দুজনের মধ্যে কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল, আর ব্যথিত নায়ক, নায়কের মতোই পাতাগুলো বেদনার মতো ঝরিয়ে দিয়েছিল গ্যালারির তলায়।

* * * পি চৌধুরীর শেষ খেলা * * *

ডিসেম্বরের শীতস্নিগ্ধ প্রভাতে দুজন আম্পায়ার যখন উইকেটের মাথায় বেলের কিরীট পরিয়ে সরে দাঁড়ালেন, তখন, তার মধ্যেই, পাত্র-একাদশ তুমুল করতালি-ধ্বনির মধ্যে মাঠে নামতে শুরু করেছে। সামনে বহু যুদ্ধের প্রবীণ যোদ্ধা—বিরল-কেশ, অক্ষৌরিত-আনন সুবিখ্যাত র'বে পাত্র—পাত্র-একাদশের ট্রাডিশন্যাল অধিনায়ক।

প্রাচীন হাওড়ার মধ্যাঞ্চলের দীর্ঘ দিনের পুরাতন একটি বাৎসরিক খেলা—শীতের শ্রেষ্ঠ খেলা এবং শ্রেষ্ঠ উৎসব এই পাত্র ও মিত্র-একাদশের ক্রিকেট প্রতি-যোগিতা। ডিসেম্বরের শেষ দিনটিকে রমণীয় করে তোলে খেলাটি। প্রবীণ নবীনের সমান আগ্রহ ও উৎসাহের বস্তু। প্রবীণ আসে বয়সকে ঝেড়ে ফেলে, নবীন আসে বয়সকে জাগিয়ে তুলে।

ডিসেম্বরের সুন্দর মধ্যাহ্নে আজ যেন কেমন একটা বিষণ্ণ মধুরতা। পূর্ণ আনন্দের মধ্যে বিষাদের স্মৃতি থাকে, ভরা মন কেবলই ছলছল করে, তাই কি বিষাদের সুর? কে জানে! একটি কথা কিন্তু সকলের মনে পড়ছে, আজকের

এই দুপুরে, বিশেষভাবে। কেউ ভুলতে পারছে না।

কাতারে-কাতারে লোক জমেছে মাঠের চারপাশে, যেমন প্রতি বছর এসে থাকে। তারা বাদাম চিবুচ্ছে, মুড়ি-মসলার সঙ্গে দরাদরি করছে, ঝগড়া করছে, রগড় করছে, চেঁচাচ্ছে—কিন্তু মনের একটি জায়গায় নীরব হয়ে আছে—তার পূর্ণ চিত্তের মাঝখানটিতে। তারা বিদায় দেবে।

বিদায় দেবে মাঠের প্রবীণতম খেলোয়াড়টিকে। বিদায় দেবে এই বাৎসরিক ক্রীড়াসম্মেলনের যিনি স্রষ্টা—তাঁকে। খেলার জগৎ থেকে সাধারণভাবে তিনি বিদায় নিয়েছেন অনেকদিন, কিন্তু নিজের সৃষ্টিকরা এই বিশেষ খেলাটির লোভ ছাড়তে পারেননি এতদিন। গত বছরও মাঠে তাঁর উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশি। এ বছরও নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু শরীর সায় দিচ্ছে না, সায় দিচ্ছে না ডাক্তারে। স্কুলের গাড়ী-বারান্দার প্যাভিলিয়নে একটি স্থায়ী আসনের অধিকার গ্রহণ করবেন তিনি। খেলার মাঠ বঞ্চিত থাকবে তাঁর দৃঢ়প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের মহনীয়তা থেকে।

পি চৌধুরীর আজ শেষ খেলা।

খেলার শেষ নেই, আমাদের বুঝিয়েছিলেন প্রৌঢ় চৌধুরী। যেখানে আছো, সেইখানে থেকে খেলো; যে বয়সে আছো, সেই বয়সে থেকে খেলো; খেলো—খেলে যাও। ভারতের চিরন্তন জীবনদর্শনে বিশ্বাসী চৌধুরী আমাদের সেদিন কোন্ খেলার কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন?

জানি না কেন, খাঁটি ভারতীয় চৌধুরী খাঁটি বিলেতী এই খেলাটিকে এত ভালবেসেছিলেন? 'কেন?—আমিও জানি না'—আমাদের প্রশ্নের উত্তরে অন্য-মনস্ক হয়ে যান। তখন শরৎকাল। সকালের তপ্ত রৌদ্র খানিকটা চৌধুরীর নীল-কালো মুখে, বাকিটা সামনের পুকুরের কালো জলে ঝলমল করছে। জলে স্থলে আগমনীর আদরের সুর। স্থির চোখে ঝলমলে জলের দিকে তাকিয়ে চৌধুরী গুন্‌গুন্ করে সুর ধরলেন—'তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি।' ফিরে ফিরে কয়েকবার ঐ কলিটি গাইলেন। তারপর একেবারে চুপ করে গেলেন। আমরা আবার প্রশ্ন করলুম। চৌধুরী উত্তর না দিয়ে ছেড়ে-দেওয়া গানের পরের পংক্তি ধরলেন—'আমি হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাব্‌তেছি।' কিছুক্ষণ পরে সুরেলা আচ্ছন্ন গলাতে যেন গানের জের টেনে বলতে লাগলেন—'কি জানিস্, ছোটবেলা থেকে ক্রিকেট দেখলে আমার একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মতো দর্শন ঘটে। ঠিক যেন দেখি, কি বলি, দেখি যেন আকাশের নীল মাঠের পাশে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর দিব্যোজ্জ্বল কারা সব সেই অপার্থিব নীল মাঠে খেলছে—ক্রিকেট।' বলেই হা-হা করে প্রৌঢ় মানুষটি হেসে ওঠেন। হাসিটা ঝন্‌ঝন্ করে বেজে ওঠে আস্তে-আস্তে থেমে আসে। আমরা হাসি না। চৌধুরী কুণ্ঠিত লজ্জিত সুরে বললেন, 'আমি তাদের সঙ্গে খেলেছি।'

চৌধুরী তাঁর মহৎ জীবনকে উৎসর্গ করেছেন লোককল্যাণে। সমস্ত পল্লীর ভালবাসা আর ভক্তির পাত্র তিনি। ছোটদের মানুষ করব—এই কথাটি বাংলা-দেশের এক গৌরবময় যুগে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছিল। ছোটদের সঙ্গে

বড়রাও তাঁর উদার হৃদয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—মানুষ হবার জন্য যতখানি না, সুযোগ নেবার জন্য আরো বেশি করে। চৌধুরী ছোটদের মানুষ করার চেষ্টা করেছেন, সাধ্যমত চেয়েছেন বড়দের উপকার করতে।

আর চৌধুরী প্রবর্তন করেছেন এই বাৎসরিক ক্রিকেট-উৎসবটির। অনেক বছর আগে।

অ—নে—ক—ব—ছ—র। তখন তোদের স্কুলের বাড়ী কোথায়! কত বছর আগে জানিস্—আমার বয়স তখন বছর-কুড়ি। এখন হোল পঁয়ষট্টি। তার মানে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। আমরা এই মাঠেই খেলতুম, তোরা যেখানে খেলছিস। তবে সে মাঠের চেহারাই ছিল আলাদা। দুধারে তখন পানা পুকুর আর পচা নর্দমা। চারদিক ঘন জঙ্গলে ঢাকা। আগে নাকি ডাকাত থাকত। আমরা জঙ্গল পরিষ্কার করে মাঠ তৈরী করলুম। সেখানে ব্যাটবল খেলা শুরু হোল আমাদের। তখন বাপু এত নিয়মের হাঙ্গামা ছিল না। আমরা ব্যাট চালাতে জানতুম, জানতুম বল ছুঁড়তে। বল হয় উইকেটে, নয় ব্যাটে লাগত। ব্যাটসম্যান জানত না ঠেকাতে, বোলারের নিন্দে হোত যদি ফস্কে-যাওয়া বল উইকেটে না লাগত।

চৌধুরী শুধু নিজের দলবলের সঙ্গেই সেখানে 'ব্যাটবল' খেলা শুরু করেননি, পাড়ার ছেলেবুড়ো সকলকে জুটিয়ে আনতেন সেই পানাপুকুরের ধারে, জঙ্গল ও নর্দমার পাশে, একটি শীতের দুপুরের জন্য। ৩১শে ডিসেম্বর কারো অব্যাহতি ছিল না—ছেলেটিকে সবাই ভালবাসত—ছেলে বুড়ো সকলে।

আমরা হেসে গড়িয়ে পড়ি যখন শুনি সান্ন্যালদের বুড়ো-কর্তা এক হাতে হুঁকো ধরে টান দিতে-দিতে মাঠে নেমে আম্পায়ারের হাতে হুঁকো জমা দিয়ে ব্যাট ধরলেন। কিংবা ঘোষ-খুড়ো নিজের নাতির হাত ধরে আলগা গায়ে মাঠে নামছেন ব্যাট করতে। সকলে ঐ সঙ্গে খুড়ীকেও আনবার কথা বলতে রেগে উঠছেন বেমক্কা রসিকতায়। বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে কিংবা নামাবলী গায়ে ক্রিকেট-খেলা হয়েছে, একথা বাংলাদেশের ক্রিকেট-ইতিহাসে লিখে রাখার মতো। মজার শেষ থাকত না যখন চক্রবর্তী-মশাই ফতুয়া ও ফুলপ্যাণ্ট পরে বল করতেন!

সেই থেকে চলে আসছে। অনেক বদলেছে—মানুষ, পোষাক, নিয়ম। ঠিক আছেন একমাত্র চৌধুরী। এবার তিনিও বদলাবেন। চলে যাবেন তাঁর নিজের রচনাকরা খেলার পৃথিবী থেকে।

মাঠের হৈ-হৈ বেড়ে উঠেই কমে গেল—ব্যাটসম্যান দুজন প্রচুর আড়ম্বর করে গার্ড নিচ্ছে ভুল স্ট্যান্সে। আমাদের এই ভুল করার স্বাধীনতায় ইংরেজ ক্রিকেট-সমালোচক মুগ্ধ। আহা! ক্রিকেটের প্রাচ্যদেশীয় অরক্ষণশীলতা। মিত্র-একাদশের প্রথম জুটির খেলোয়াড়েরা দেখবার মতো পদার্থ। একজনের বয়স চল্লিশের উপর, অন্য জন পনেরোর নীচে। চল্লিশোর্ধ্বে যিনি, তাঁর মালকোঁচা বাঁধা, ভাল করে বাঁধাও হয়নি, রুমাল-বাঁধা প্যাড উপচে পড়ছে ধুতি। মাথায় তৈলসিক্ত সোলার হ্যাট।

একটি বিষয়ে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ক্রিকেটারের সমতুল—উদরে ও ওজনে। গ্রেট ডবলিউ জি গ্রেস ছিলেন তিন মণ, ইনি তার আধ মণ কম—আড়াই। ক্রি

হিটার বলে এ'র খ্যাতি।

এ'র সহযোগী খেলোয়াড়টি 'হাতে কালি, মুখে কালি, বাছা'—অর্থাৎ ক্লাস এইট-এ পড়ে। খাটো কালো টাইট চেহারা, পরনে খাকি হাফ-প্যাণ্ট। পায়ের প্যাড পৌঁছেচে বুকে এবং হাতের গ্লাভস্ কনুই পর্যন্ত। ব্যাটখানি নাবালকটির কাছে বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির মতো, থাকলে মন্দ, না থাকলেও তাই—ভাল করে ধরতেও পারছে না।

পাড়ায় এবং স্কুলে বিশ্বপাজি ছেলে, খেলার মাঠে শিবস্বরূপ, ধীর-স্থির-ধ্যানস্থ। যেভাবেই বল দাও না কেন সে আটকাবেই তাকে। মারধর কিছু নয়, শুধু আটকে রাখা। আউট করার পক্ষে সবচেয়ে বিরক্তিকর খেলোয়াড়। এমনিতে স্নেহ করতে ইচ্ছা যায়—কিন্তু খেলার মাঠে বিপক্ষ দলে থাকলে—থাক। দেড় ঘণ্টায় শূন্য রান—তার মোটামুটি অ্যাভারেজ।

যাঁরা পাড়া-ক্রিকেট খেলেন, তাঁরাই এইরকম ওপেনিং-জুটির কার্যকারিতা বুঝবেন। একদিকে নিরেট ডিফেন্স, অন্যদিকে উন্মাদ আক্রমণ।

একটা চীৎকার ফেটে পড়ল। ফ্রি-হিটার একটি ফ্রি-হিট দেখিয়েছেন। প্রথম বলেই ওভারবাউণ্ডারি। দ্বিতীয় বলেও অফে ওভারবাউণ্ডারি (মাঠটি ছোট এবং ব্যাটসম্যান স্বাধীন)। তৃতীয় বলে ক্যাচ, যদিও ফসকালো। চতুর্থ বল ব্যাটসম্যান ফসকালেন। পঞ্চম বলও ফসকালো, যেটা ব্যাটে লাগলে রাস্তায় গিয়ে পড়ত। এই সময় উইকেটের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল উইকেটকীপার, ঘোরানো গদাঘাত থেকে কোনোক্রমে মাথা বাঁচালো। ষষ্ঠ বল পড়ল নিখুঁত লেংথে, ফ্রি-হিটার মনস্থির করতে পারলেন না কি করবেন। কিন্তু পাবলিক-এণ্টারটেনমেণ্টের দায়িত্ব নিয়ে পেছিয়ে যাওয়া যায় না। অতএব ওয়েস্টইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের মত ব্যাকফুটে ওভারবাউণ্ডারি। তাঁর ব্যাটিংয়ের শব্দব্রহ্ম—ওভার-বাউণ্ডারি।

অট্টহাসি এবং হট্টগোল মিলিয়ে এমন একটা শব্দ উঠল, যা অনেক কিছু সহ্য করতে হয় বলে মানুষের কান সহ্য করতে পারল।

বল নয়, উইকেট প্রায় ওভারবাউণ্ডারি হয়ে যাচ্ছিল।

এক উইকেটে ১২ রান। হিট-উইকেট ও বোল্ড একসঙ্গে। দলের ভীমসেনের বিদায়।

জি মিত্র নামলেন। মিত্র-দলের তারকা। এ'র স্টাইলই আলাদা। রান করুন বা না করুন, যে-কোনো অবস্থাতেই সমান মর্যাদাপূর্ণ। খেলার ফলাফলের দায়িত্ব অবশ্য এ'র নিজেরই, কিন্তু ক্রীড়াভঙ্গির দায়িত্ব নিয়েছেন সারা পৃথিবীর খেলোয়াড়েরা, গ্রেস থেকে গ্রেভনি, ব্রাডম্যান থেকে হার্ভে, রনজি থেকে নির্মল চ্যাটার্জি। ইনি ক্রিকেট খেলেন, ক্রিকেট পড়েন, ক্রিকেট দেখেন—চাক্ষুষ ও স্বপ্নে। এবং সবচেয়ে ঘৃণা করেন অক্রিকেটোচিত কোনো কিছুকে। হাল্কা হলুদ সিল্কের প্যাণ্ট-সার্টে, নিজস্ব ক্রিকেট-গীয়ারে ইনি একজন ক্ষুদে হ্যামণ্ড—ক্রিকেটীয় গরিমা এবং রাজকীয় মহিমার সর্বাত্মক খেলোয়াড়।

দর্শকেরা এতক্ষণে একটু নিশ্বাস ফেলার অবকাশ পেয়েছে। তারা জানে কিছুক্ষণ উইকেট পড়বে না।

' মাঠের চারিদিকে তাকিয়ে নেবার অবসর পাওয়া গেছে। একদিকে স্কুলের প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি। একতলার ঝোলানো গাড়ী-বারান্দার নীচে 'প্যাভি-লিয়ান।' প্রত্যেক তলার লম্বা বারান্দা নেড়ামাথা রনজি-স্টেডিয়ামকে লজ্জা দিতে পারে—ছেলে-বুড়োর ঠাসাঠাসি। স্কুলের উপরে একেবারে খোলা ঘন নীল আকাশ, সেখানে দুলছে ত্রিবর্ণের ইন্দ্রধনু। মাঠের চারপাশ দড়ি দিয়ে ঘেরা—ছাপিয়ে-পড়া যৌবনের মতো দর্শকের চাপ মাঠে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। তাদের সামলাবার জন্য রুমাল-হাতে দুজন ক্রিকেটের লাইনস্‌ম্যান। এক কোণে আমগাছের তলায় একটি ব্ল্যাকবোর্ড, তার উপর লাল কালিতে সংখ্যা-লেখা পিচবোর্ড টাঙিয়ে সেটাকে স্কোরবোর্ড করা হয়েছে। বোর্ডে রান ঝোলাবার সঙ্গে-সঙ্গে পাছে কোনো সন্দেহ থাকে চেঁচিয়ে রানসংখ্যা বলে দেওয়া হচ্ছে। টেবিল নিয়ে 'প্যাভিলিয়ানে' বসে আছে স্কোরার, তাকে উপদেশ দিচ্ছে গুটি পনেরো ছোকরা। দূরে দেখা যাচ্ছে শিবমন্দিরের চূড়ো, নারকেল গাছের মাথায় সূর্য, আকাশ পরিষ্কার—

একটা ছোট হালকা মেঘ সূর্যের উপর দিয়ে সরে গেল—একটা ছায়া পড়ল মাঠে—জি মিত্র নিপুণ-হাতে স্কোয়ারকাট মারলেন—সম্ভ্রান্ত প্রশংসার হাত-' তালি চারিদিকে—

মাঠের উপরকার ছায়াটা কিন্তু অন্যমনস্ক করে দিল আবার। পি চৌধুরী স্কোয়ারকাট মার ভালবাসেন না। লেগগ্লান্স তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়, উল্লাস বোধ করেন লেগে পুল করে। তিনি একবার আমাদের বুঝিয়েছিলেন—তোরা কি-সব কাঠের পুতুলের মতো খেলিস বুঝি না। তোদের খেলার ধরন—দেড় ঘণ্টা পরে অফে খুট্। রামঃ! ওকি খেলা নাকি? আমাদের কালে খেলার প্রাণ ছিল। সব কিছু লেগের ব্যাপার। বোলার লেগ তাক করে বল দেয়, আমরা লেগের দিকে পিষে দিই।

—দেখ, যদি অফ থেকে বল আসে, লেগে ঘোরাবি, স্বচ্ছন্দে, কোনো বিপদ নেই তাতে। যদি সোজা উইকেটের উপর বল আসে, লেগে পেটাবি, তবে একটু দেখে। যদি লেগ থেকে বল ঢুকে আসে, তবে পারলে তোলা মারে বেড়ার বাইরে পাঠাবি, কিংবা মাটিতে ঠুকে স্কোয়ার-লেগে চালিয়ে দিবি—কিন্তু খু-উ-ব সাবধানে।

অর্থাৎ যেন-তেন-প্রকারেণ লেগে পাঠাতে হবে। চৌধুরীর কথার ভঙ্গিতে ক্রিকেটের জার-নিকোলাস ডাঃ গ্রেসের নির্দেশের প্রকৃতি: 'যদি টসে জেত এবং উইকেট ভাল থাকে'—ডাঃ গ্রেস বলবেন—'ব্যাট করতে নামবে। যদি উইকেটের অবস্থা সন্দেহজনক হয়—ব্যাট করতে নামবে। এবং—' ডাঃ গ্রেস চোখ কুঁচকে একটি ভঙ্গি করে যোগ করে দেবেন—'যদি দেখ উইকেটের অবস্থা খারাপ, খুব বেশি করে চিন্তা করবে...তারপর ব্যাট করতেই নামবে।'

আমরা জানি, চৌধুরী কি মারাত্মক কেতাবিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছিলেন আমাদের। বলের গতির বিপরীত দিকে পেটানো মানে উইকেট ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। চৌধুরী তা জানতেন, নিজস্ব-ভাবে। তাই লেগ থেকে ছুটে-আসা বলকে লেগে পাঠানোর ব্যাপারে সাবধান হতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, প্রথম

সুযোগে তাকে মাটিতে ঠুকে দাও, কিংবা পাঠিয়ে দাও সকলের নাগালের উপর দিয়ে বেড়ার ওপারে।

পঞ্চাশ বছরেও হাতের কি জোর ছিল চৌধুরীর! তাঁর পঞ্চাশে পৌঁছবার পর থেকে তাঁর সঙ্গে খেলার বয়সে উঠেছি। বেশিক্ষণ খেলতে পারতেন না, চাইতেনও না। দরকারও ছিল না। অল্প সময়েই যে-রান তুলে দিয়ে যেতেন, আমরা বহুক্ষণ 'নিখুঁতভাবে' খেলেও তাকে অতিক্রম করতে বেগ পেতুম। আর যে খেলা দেখাতেন! শুনেছি বৃদ্ধ দ্রোণাচার্যের কৌশল দেখে অর্জুনকে পর্যন্ত মাঝে-মাঝে চমক উঠতে হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে।

বিবশ মনের উপর দিয়ে পুরোনো স্মৃতিগুলো চলচ্চিত্রের মতো সরে যাচ্ছে। যে-চমৎকার মারটি জি মিত্র মারলেন, সে রকম মার মেরে বছর কয়েক আগেও অন্তত চার আনার জিভে-গজা খেয়েছেন চৌধুরীর অ্যাকাউণ্টে। তার পরেই, ঠিক এখনি, যেভাবে বোকার মতো আউট হলেন মিত্র, তাতে কানমলা, কয়েক বছর আগে হলে, নির্ঘাত তোলা ছিল। এই আরো দুজন পর-পর আউট হবার পরে ষষ্ঠ ব্যক্তি নামছেন, তাকে চৌধুরী যা বলবেন, তা আমাদের সকলের জানা আছে—'দেখো ভাই, তোমার উপর দলের ভরসা।' এ-অঞ্চলে কে আছে, চৌধুরীর কথায় মূল্য না দেয়!

প্রচুর হাততালি পড়ল। মিত্র-একাদশের প্রধান আর মিত্র নামছেন। নার্ভাস এলোমেলো হাসি, উস্কোখুস্কো চুল, মুখে পানের ছোপ, এবং খেলায় সাহসী সৌন্দর্য—আর মিত্র এই মাঠের একজন প্রিয় খেলোয়াড়। অধিনায়করূপে তিনি সব সময় তাঁর খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সাধ্যমতো সহযোগিতা পান। তাঁকে সবাই ভালবাসে।

চৌধুরী কিন্তু কোনো কথা বললেন না। পরিচিত উপদেশ দিলেন না। সকলে চিরকাল তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে খেলতে নামে, অধিনায়ক পর্যন্ত। কয়েকদিন আগেও নেমেছে। টেবিলের উপর দুটো কনুই ভর করে, হাতের দুই চেটোর উপর মুখ রেখে, তিনি বসে রইলেন সুদূর চোখে স্থির হয়ে। মুখে মৃদু হাসি ফুটল। দুই চোখে স্নেহ ঝরতে লাগল আশীর্বাদের মতো। আর মিত্র তাঁর হাতে তৈরী খেলোয়াড়।

নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন চৌধুরী। কোনো নির্দেশ দেবেন না আজ।

হাততালির আর বাহবার ঝড় বয়ে গেল—মুস্তাক আলীর রীতিতে মুস্তাক-ভক্ত অধিনায়ক মিত্র প্রথম বলে সুইপ করে লেগে বাউণ্ডারি করেছেন। চৌধুরীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিড়বিড় করে কি বললেন। বোধ হয় বললেন...

...ওর বাবা ঐ রকমই খেলত!

আর মিত্র লেগে কোনো সুন্দর মার মারলেই চৌধুরীর ঐ ধরনের একটা মন্তব্য অবধারিত, তা আমরা জানি। অত্যন্ত নিরপেক্ষ চৌধুরীর এই এক দুর্বলতা। এ নিয়ে আমরা চিরকাল হাসিঠাট্টা করেছি। আর মিত্রের মার দেখলেই তাঁর বাবার কথা চৌধুরীর মনে পড়ে। এবং সেই 'আদি' মিত্রের কোনো একটি মার ভাবনেত্রে তিনি দর্শন করবেনই। আমাদের একজন তামাশা করে বলত, আর মিত্রের অন্নপ্রাশনের সময় 'খোকা' মিত্র একটি লাল পদ্মের ফুল ছুঁবার চেষ্টার পর বিরক্ত হয়ে বাঁ পাশে ছুঁড়ে দিয়েছিল। নিমন্ত্রণ খেতে উপস্থিত

চৌধুরী সেই ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যেও নাকি একটি অপূর্ব লেগস্লুইপ আবিষ্কার করে 'পিতা' মিত্রের সত্যযুগীয় মারকে স্মরণ করেছিলেন।

মুখুজ্জে দাদু বললেন, অনাদি মিত্তির, বদন পাত্র, এবং ফেলু চৌধুরীকে আমরা বলতুম ত্রিমূর্তি, ছেলেবেলায়। অমন ভাব দেখা যায় না। পাড়ার সবচেয়ে ভাল আর সবচেয়ে পাজি তিনটি ছেলে।

একটু থেমে মুখুজ্জে দাদু বললেন, অনাদি মিত্তির প্রথম ছেলে হবার বছরখানেক পরে মারা যায় উড়িষ্যার জঙ্গলে শিকার করার সময়ে।

চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বাৎসরিক খেলার দল-দুটির নাম পাত্র ও মিত্র-একাদশ হবার কারণ কি? চৌধুরী ঐ কথাই বলেছিলেন—বর্তমান পাত্র ও মিত্রের পিতারা তাঁর বন্ধু ছিলেন। এ পাড়ায় তাঁরাই ক্রিকেটের সূচনা করেন। তাঁদের থেকে নাম দুটি হয়েছে। তাছাড়া, হেসে বললেন—রাজা হচ্ছে একজন একাদশ তৈরী হয় পাত্র-মিত্রকে নিয়ে।

আমাদের একজন টপ করে বলল—রাজাটি কে, আপনি?

আরে ছি ছি! রাজা আমি হব কেন—এই খেলাই হচ্ছে রাজা। রাজার খেলা আর খেলার রাজা ক্রিকেট।

তারপর গুন্-গুন্ করে 'আবৃত্তি' করলেন, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।'

অথচ রাজদ্রোহী দলে প্রথমবয়সে নাম লিখিয়েছিলেন চৌধুরী। পরে রাজনীতি ছেড়ে দিলেও তাঁর রাজনৈতিক মত পাল্টায়নি। কেবল এই একটি ক্ষেত্রে তিনি রীতিমত মোটা কালিতে আনুগত্যের দস্তখত করেছিলেন।

খেলা জমে উঠেছে। একদিকে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং-এর অগ্নিবাণ, অন্যদিকে বোলিং-এর বরুণাস্ত্র। কখনো জ্বলে কখনো নেভে। দর্শকেরা চমকিত, উল্লসিত, উৎকণ্ঠিত। এবং উচ্ছ্বসিত। শীতের সুখাবিষ্ট দুপুরে নিরাপদ উত্তেজনার মধুর আস্বাদ। একই বোলার ছটি বল ছয় রকম ছাড়ছে, ছাড়ার পরে মাঠের গুণে সেগুলি আবার নতুন ছয় হয়ে উঠছে। যেমন গমনে দমনে প্রথমশ্রেণীর ব্যাটসম্যান, তেমনি বেগে ও বঙ্কিমে উচ্চস্তরের বোলার। তেমনি সহৃদয় সামাজিক দর্শক। তারা বেঁটে বি মণ্ডলের ফিল্ডিং-এ বাহবা দেয়, এস দত্তের দেড়গজী ব্রেক দেখে চমকে ওঠে, এস বোসের ঠুকঠাক দেখে বিরক্ত হয় এবং এন ঘোষের ড্যাস-এর প্রশংসা করে। তারা উপভোগ করে স্নিক বাউণ্ডারিকে, স্নেহ করে বৃদ্ধের অনাড়িপনাকে, চটে যায় ছোটর ছেলেমিতে। তবে সবচেয়ে আনন্দ করে স্থূলের অধঃপতনে। সমস্ত মাঠে পাগলা হাসির একটা সাইক্লোন বয়ে গেল যখন বর্তুলাকার হারান ঘোষ উদর-নির্গত দুই হস্ত 'পর্বতোপরি শ্রীভগবান্ মুসার' ভঙ্গিতে উপরে তুলে ক্যাচ ধরতে অগ্রসর হলেন এবং সেই সদভিপ্রায়ে ব্যর্থ হলেন কোনো এক বিশ্রী ভারসাম্যনীতির প্রতিবন্ধকতায়।

এলোমেলো কান-ফাটানো চীৎকার হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এবার কলরোল উত্তাল কিন্তু ছন্দোময়। তালে-তালে দুন্দুভি বাজতে লাগল করতলে। এল মহাবিদায়ের লগ্ন।

চৌধুরী নামছেন। বগলে ব্যাট। গ্লাভস্‌ পরতে গররাজি। বাঁ-পায়ে শুধু প্যাড। টান করে মালকোঁচা-বাঁধা ৬৫ বছরের নিটোল কালো পাথরে গড়া চৌধুরী মাঠের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন—পায়ের তলায় শেষবারের মতো রোমাঞ্চিত হয়ে নিচ্ছে শ্যামল তৃণগুলি, তারো তলায়—রক্তমাংসের মাটি।

চৌধুরী কি স্বপ্নের মধ্যে হাঁটছেন।

ধীর গতি। এত ধীর যে, মনে হয়, পা-টিপে-টিপে যাচ্ছেন। তিনি কি পথের শেষ চাইছেন না? অসীম অশেষ হোক এই যাত্রা। 'ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।' লীলায় বিশ্বাসী চৌধুরী চাইছেন না তাঁর খেলা শেষ হোক। স্বপ্ন, বাঁচুক স্বপ্ন! মুছে যাক বাস্তব। প্যাভিলিয়ান থেকে উইকেট পর্যন্ত অব্যাহত থাক চৌধুরীর অভিযাত্রা।

উইকেটে পৌঁছে গেছেন চৌধুরী। দাঁড়িয়েছেন স্ট্যান্স নিয়ে, পুরনো দিনের মতোই সিংহের অবহেলা আর মহিমায়। আমি কিছুতে সহজ হতে পারছি না। সব জিনিস দেখছি ঠিকই, কিন্তু দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে মনের কেমন একটা ব্যবধান। মনের সমাচ্ছন্ন দূরত্বের বোধটি এড়াতে পারছি না, সবই তন্দ্রাচ্ছন্ন অপূর্ব অলীকতায় ভরে আছে। খেলার মাঠ, খেলোয়াড়, দর্শক, চৌধুরী—সব কিছু। চৌধুরী কি খেলছেন? খেলছেনই তো। সেই পুরোনো লেগগ্লান্স। লেগপুল। অনড্রাইভ। সব কিছু। কিন্তু সব কিছু যেন আমার কাছে তার পরিচিত গতি হারিয়ে ফেলেছে। বোলার, ব্যাটসম্যান, ফিল্ডস্‌ম্যান, দর্শক—সকলেই ছন্দোময় তরঙ্গে ওঠাপড়া করছে। অতি ধীর মধুরতায় ভরা ওঠা-নামা—যেমন স্লো-মোশন ছবিতে হয়ে থাকে। আবেশে দেখছি—চৌধুরীর মারাত্মক প্রিয় অফের বল লেগে ঘোরানোর চেষ্টা—তার ব্যর্থতা—ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপে ক্যাচ ওঠা—তর্পণের অঞ্জলিভরা জলের মতো বলটিকে ফিল্ডসম্যানের নম্র ভঙ্গিতে ছেড়ে দেওয়া—তাতে চৌধুরীর ক্ষুব্ধ চাহনি—কয়েকটি বলের পরে চৌধুরীর আবার সেই একই মারের চেষ্টা—একইভাবে স্লিপে ক্যাচ ওঠা—এবার একটি পবিত্র দানের মতো তাকে করপুটে গ্রহণ করা—আম্পায়ারের দিকে ফিরে বোলারের নিবেদনের ভঙ্গিতে মাথা নামানো—অদৃশ্য নক্ষত্রলোকের দিকে শান্ত সঙ্কেতের মতো আম্পায়ারের তর্জনী তোলা—সমস্ত দর্শকের অভিনন্দনের মন্ত্রোচ্চারণ—নতমস্তকে তা স্বীকার করে আকাশের দিকে হাতের ব্যাটটি শেষবারের জন্য তুলে ধরা—তাঁর কাছে সমস্ত খেলোয়াড়ের ছুটে আসা—আলিঙ্গন, প্রণাম—গলায় মালা পরিয়ে চৌধুরীর নিষেধ না শুনে তাঁকে কাঁধে তুলে প্যাভিলিয়ানে ফিরিয়ে আনা—আমার চোখের সামনে এ সকলই ঘটে যাচ্ছে। চৌধুরীর যেন ঘোর কাটেনি। আমারও ঘোর কাটছে না। চৌধুরী কি তাঁর শেষ খেলার শেষে দেখতে পেয়েছিলেন আকাশের সেই ক্রিকেট-খেলাটি, যার একজন খেলোয়াড় তিনি? যদি না দেখতে পান, তাহলে যিনি চিরকাল ঘাড় সোজা রেখে মাঠে হেঁটেছেন, তিনি নিজেকে ফেরার পথে বাহিত হতে দিলেন কেন?

যা দেখলুম, তা কি ক্রিকেট?

জানি না।

"Ah, memory will play again
Many and many a day again
The game that's done, the game that's never done"

স্মৃতির খেলা চলবে মনে অনেক দিন
অনেক দিন অনেক দিন অনেক দিন...
খেলার শেষ অশেষ খেলা স্বপ্নসুখে লীন
অনেক দিন অনেক দিন অনেক দিন...

সারাদিনের খেলা



উৎসর্গ

শ্রীমান্ সন্দীপ বসু

শ্রীমান্ শঙ্খ বসু

আমার দুই উৎসাহী পাঠককে

'অলৌকিক' শব্দটি এখন 'উল্লেখযোগ্য', বড় জোর 'অসাধারণ' শব্দের প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রিকেটের মতো জীবন্ত এবং ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তনশীল খেলায় নূতন নূতন ব্যাপার এত বেশি ঘটে যে, তার স্বাদ ও রোমাঞ্চ ফোটাবার জন্য লেখকেরা বা ক্রিকেট-বক্তারা প্রায়ই চড়া সুরে লিখে বা বলে থাকেন। সুতরাং অলৌকিক শব্দ ক্রিকেট-রচনায় লৌকিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে একটু সরে যাওয়া যাক। রনজি সম্বন্ধে নেভিল কার্ডাসের বিখ্যাত কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি :

"ব্যক্তিপ্রতিভাকে খেলার মধ্যে মানুষ কিভাবে উন্মোচন করতে পারে রনজির স্টাইল তারই অনবদ্য দৃষ্টান্ত। না, কেবল ব্যক্তি-প্রতিভা নয়, জাতি-প্রতিভাও। রণজিৎ সিংজীর ক্রিকেট তাঁর স্বদেশী ক্রিকেট। তাঁর ব্যাটিংকালে ইংলন্ডের মাঠে এক বিচিত্র আলোক দেখা গিয়েছিল—প্রাচ্যের আলোক যা। অপরূপ যাদু, রনজির অভ্যুদয়ের পূর্বে যে-সংঘটন ক্রিকেটে ঘটেনি।"

ব্যক্তির মধ্যে জাতিকে দেখা কার্ডাসের মহৎ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট-লেখক রে রবিনসন তাঁর 'Between Wickets' নামক বইয়ে (যে বইটিকে কার্ডাস কোনো অস্ট্রেলিয়ানের দ্বারা লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট বই বলেছেন) কার্ডাসের এই পরিচিত দুর্বলতার বিষয়ে সশ্রদ্ধ কটাক্ষ করে লিখেছেন—'জাতীয় স্বভাব ক্রিকেটারের খেলাকে প্রভাবিত করে—কিন্তু যে-পরিমাণে করে বলে আমরা মনে করি, তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণে।' এই মন্তব্যের পরে শ্রীযুক্ত রবিনসন বেশ কয়েকটি বিরোধী দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, বহু বড় ক্রিকেটারের জাতি-বর্ণ তাঁদের গাত্র-বর্ণের তলায় নামেনি, তাঁরা অনেকেই বর্ণজ্বলা বিশ্বমানব।

তবে খেলার রঙের মধ্যে গায়ের রঙ খোঁজার এই প্রবণতা কেন দেখা গেছে তার কারণও সহৃদয় সম্বুদ্ধির সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—"ভারতীয় ক্রিকেটকে ব্যাপকভাবে প্রাচ্যের যাদু বা রহস্যে পূর্ণ বলা হয়। বৃটিশ বা সেই জাতীয় খেলোয়াড়গণ পেশীর যে নমনীয়তায় অনধিকারী, ভারতীয় খেলোয়াড়গণ নাকি তাতে সুপ্রচুরভাবে সমৃদ্ধ, তাদের দৃষ্টি এতই দ্রুত যা প্রায় ভোজবাজির জগতেই সম্ভব!—এসব কথার উৎপত্তির মূলে রয়েছে রণজিৎসিংজীর খেলার দারুণ অপূর্বতা।"

এই মন্তব্যের মাত্র দেড় পাতা পরে শ্রীযুক্ত রবিনসন যা লিখেছেন, তার মধ্যে স্বতোবিরোধের লক্ষণ রয়েছে। ভারতবাসীর পক্ষে অতীব উপাদেয় বক্তব্যটি উদ্ধৃত করছি—

"যদি দলীপ সিংজী ১৯৩২ সালে অস্ট্রেলিয়াগামী ইংলন্ড দলে যাবার আমন্ত্রণ স্বীকার করবার মতো শারীরিক অবস্থায় থাকতেন, তাহলে দুজন ভারতীয় রাজবংশীয় সেই দলে থাকতেন। দুজনের মধ্যে একজন অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলেন—পাতৌদির নবাব, এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ১০২ করে ক্রিকেটের চরম বিস্ময়কর রেকর্ড সম্ভবপর করেন। যে-তিনজন ভারতীয় এ পর্যন্ত ইংলন্ডের পক্ষে খেলেছেন তাঁরা সকলেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন। এই ত্রিকীর্তি মনে হয় কোনো গুপ্ত রহস্যবিদ্যার

শক্তিতেই ঘটেছে।"

তাহলে? রবিনসন-মহাশয়ও তাহলে ভারতীয় রহস্যবিদ্যার অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য স্বীকার করলেন। স্বীকার না করে উপায় আছে? আমাদের ভালবাসেন এবং বাসেন না এমন সকলেই ভারতবর্ষকে রহস্যের গর্ভধারিণী বলে প্রচার করেছেন সারা পৃথিবীতে। সুতরাং বিখ্যাত খেলোয়াড় জর্জ গিফেন বলতেই পারেন—"রনজি? তিনি আবার ব্যাটসম্যান নাকি? ভেল্কিবাজের এতটুকু কম নাকি?" সুতরাং ভারতীয় রনজির ব্যাটিংয়ের সঙ্গে প্রাচ্যের উড়ন্ত কার্পেট, শূন্যে খাড়াই রজ্জু, বা এই জাতীয় জাদুবিদ্যার আবশ্যিক সম্পর্ক। সুতরাং জয় কার্ডাসের জয়।

ঠিক কতদিন আগে আমাদের আলোচ্য তিন ভারতীয়ের উক্ত অলৌকিক কীর্তির কথা পড়েছিলাম মনে নেই, তবে ব্যাপারটাকে প্রথমদিকে গুরুত্ব দিয়েছিলাম মনে হয় না। অল্পবয়সে রেকর্ড ব্যাপারটা কয়েক টাকার জিনিস, দোকানে গিয়ে কিনলেই হয়। কিংবা অপরে কিনে বাজাচ্ছে শুনে নিলেই হয়। পরবর্তীকালেও ব্যাপারটাকে অর্ধ অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখেছি—প্রায় অসম্ভব কাণ্ড ওটা—সম্ভবত রেকর্ড-কীপারদের চালাকির সৃষ্টি—সুতরাং শুনে যাওয়াই ভাল, বিশ্বাসের প্রয়োজন কি? তারপরে অকস্মাৎ একদিন মনে হল—হঠাৎ জ্ঞানোদয়ে মানবসন্তানের জন্মগত অধিকার অনুযায়ী মনে হল—কী কাণ্ড! সত্যই ব্যাপারটা ঘটেছিল? সেই থেকে ইচ্ছা জেগেছিল, এই তিনটি 'কাণ্ড' সম্বন্ধে কিছু তথ্যানুসন্ধান করা যাবে সময় সুযোগ মতো। এবং তা করলামও সমকালীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টে।

রণজিৎ সিংজীই প্রথম ব্যক্তি যিনি শুরু করেছিলেন। ১৮৯৬, জুলাই মাসের মাঝামাঝি কয়েকটি দিন ক্রিকেট-ইতিহাসে চিহ্নিত দিন। কারণ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ এক ইনিংস ঐ দিনগুলিতে খেলা হয়েছিল। ভারতের ক্রিকেট-ইতিহাসে ঐ কয়দিনের গুরুত্ব কোনো মাপেই ধরা পড়বে না। টেস্টম্যাচের প্রাঙ্গণে সেই প্রথম ভারতীয়ের পদক্ষেপ।

সে পদক্ষেপ হবে কি-না তাই ছিল প্রশ্নের অধীন। রণজিৎ সিংজী তার আগেই কয়েক বৎসর ধরে ইংলণ্ডের মাঠ ব্যাটচ্ছুরিত বিচিত্র আলোকে ভরিয়ে রেখেছেন। নতুন প্রতিভার অভ্যুদয়ে সন্দেহ নেই কারো—রনজি ইংলণ্ডের টেস্টদলে স্বচ্ছন্দেই স্থান পেতে পারেন—কিন্তু—যদিও রক্ত তবু দুষ্কুলজাত—একবার টেস্টাঙ্কে উন্নীত হলে রক্তমিশ্রণ এড়ানো শক্ত।

১৮৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়া এসেছিল ইংলণ্ডে। প্রথম টেস্ট হয় লর্ডসে। লর্ডদের নামে যদিও লর্ডস-মাঠের নামকরণ নয়, তবু লর্ডস লর্ডদেরই জায়গা। সেখানে কালা ভারতীয়ের (যদিচ রাজকুমার) অনুপ্রবেশ-সম্ভাবনাকে সাদর চোখে দেখা হয়নি। লর্ডস-টেস্টে ইংলণ্ড জেতে ৬ উইকেটে। এর পরে রনজির স্থান পাওয়ার কথাই ওঠে না। তবু—হ্যাঁ—অস্বীকার করা শক্ত ছিল রনজির প্রতিভাকে। তিনি পরবর্তী ওল্ড-ট্রাফোর্ডের টেস্টে জায়গা পেয়েছিলেন। এ বিষয়ে সমকালের লণ্ডন টাইমস পত্রিকা সন্ধান করে যা পেয়েছি তুলে দিচ্ছি। ২০শে জুলাই, ১৮৯৬-র টাইমস কাগজে লেখা হয়:

"কোনো-কোনো ক্রিকেটার নীতিগত কারণে রণজিৎ সিংজীর অন্তর্ভুক্তির বিরোধী ছিলেন। মেরিলীবোন ক্লাব-কমিটি বিষয়টি সম্পূর্ণ বিবেচনা করার পরে উক্ত ক্রিকেটারের অসাধারণ সামর্থ্য স্বীকার করেও তাঁকে ইংলণ্ডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলানো উচিত হবে না—এই সিদ্ধান্ত করেন। এম-সি-সি-র পক্ষে মিঃ পারকিনস তাই তাঁকে মনোনীত করেননি। কিন্তু ল্যাঙ্কাশায়ার-কমিটি এম-সি-সি-র পূর্ব সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করেননি।* তাঁদের নীতি সবিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।"

ম্যাঞ্চেস্টার-কমিটি রনজিকে ওল্ড-ট্রাফোর্ড টেস্টের জন্য নির্বাচিত করলেও রনজি তৎক্ষণাৎ রাজি হননি। তাঁর আত্মমর্যাদা যথেষ্টই ছিল, যদিও তার অহেতুক আড়ম্বর ছিল না।—

"ইংলণ্ড-দলে তরুণ ভারতীয় রাজকুমারের উপস্থিতির বিষয়ে এই আকর্ষণীয় সংবাদটি জানানো যায়: রনজি বলেন যে, তিনি খেলতে পারেন যদি তাঁর নির্বাচন সর্বসম্মত হয়, এবং যদি অস্ট্রেলিয়ানরা কোনো আপত্তি না তোলেন। অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক মিঃ ট্রট খোলাখুলিভাবে রণজিৎ সিংজীকে ইংলণ্ড দলে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।" (টাইমস, ১৭ জুলাই, ১৮৯৬)।

প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে অক্লেশে ৬ উইকেটে হারাবার পরে ইংলণ্ডের গর্ব ও আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। আরে ছোঃ—অস্ট্রেলিয়া আবার একটা দল—ও-দলে ব্যাটসম্যান কোথায়? তাই ইংলণ্ড দ্বিতীয় টেস্টে উপযুক্ত সংখ্যায় বোলার নেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। তিনজন সেরা বোলার আঘাত বা অসুস্থতার জন্য যখন সরে দাঁড়ালেন (মোল্ড, পিল ও লোম্যান), তখন অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাসী ইংলণ্ড সারের হেওয়ার্ডকে ডাক দেয়নি। তার ফল?—চুপসানো বেলুনের কথা বলবার ক্ষমতা থাকলে যেভাবে সে কথা বলত, সেই কথাই শোনা যাক ইংলণ্ডের প্রধান সংবাদপত্রের কণ্ঠ থেকে:

"এম-সি-সি-র কাছে লর্ডসে পরাজয়ের পরে ওল্ড-ট্রাফোর্ডে এই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া যেভাবে শুরু করেছে, তা প্রায় অবিশ্বাস্য। গতকালকার খেলা দেখে মনে হয়, তারা যদি আমাদের হারাতে নাও পারে, গত পরাজয়ের প্রতিশোধ তোলার চমৎকার চেষ্টা করবে।"

হয়েছিল কি, অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে প্রথমদিনে ইংলণ্ডের অহঙ্কারকে ডুবিয়ে দিয়ে রান করেছিল আট উইকেটে ৩৬৬। খেলা পড়ে যাবার জন্য যাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই আয়ারডেল তারপর সেঞ্চুরি করা অভ্যাসে দাঁড় করিয়েছিলেন, এবং সে অভ্যাস এই খেলাতে পর্যন্ত ত্যাগ করেননি। আয়ার-ডেল তার ১০৮ রানের জন্য যথেষ্ট সময় নিয়েছিলেন, যথেষ্ট ধৈর্য দেখিয়ে-ছিলেন, তাঁর খেলায় ম্যাকলারেনী সৌন্দর্য ছিল না, মন্দ বলের জন্য তাঁর সুধীর প্রতীক্ষা ইংলণ্ডের দর্শকদের কাছে নীরস ঠেকেছিল—কিন্তু তিনি অস্ট্রেলিয়ার বৃহৎ স্কোরের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। আর রানের মুক্তি এনে-ছিলেন জর্জ গিফেন ঝঞ্ঝাবেগে ৮০ রান করে। বিশ হাজার দর্শক, যাদের অনেকেই স্পেশাল ট্রেনে করে নানা স্থান থেকে এসে উপস্থিত হয়েছিল—

---

*পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, এখন যেমন লর্ডসে এম-সি-সি-র কেন্দ্রীয় কমিটি সকল টেস্টের জন্য দলনির্বাচন করেন, আগে তা করা হত না।

আতঙ্কিত আনন্দের সঙ্গে তারা গহ্বরাসীন অস্ট্রেলিয়ার বৃহৎ ঊর্ধ্বলাফের চেহারা দেখল।

যাই হোক, অস্ট্রেলিয়া যা করেছে, তার থেকে অনেক বেশি করার যোগ্য দল ইংলণ্ড। অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে হারাবে—কদাপি নয়। সুতরাং 'তারা যদি আমাদের হারাতে নাও পারে...'

দ্বিতীয় দিনের শেষে লিখিত সংবাদপত্রের বিবরণীর প্রথম বাক্য এই:

"কী দুঃখজনক দৃশ্য গতকাল ওল্ডট্রাফোর্ডে দেখা গেল! অতগুলি সর্বোচ্চ-স্তরের ইংরাজ-ব্যাটসম্যান উদগ্র অস্ট্রেলিয়ানদের কাছে কিভাবে না ব্যর্থ হল! অস্ট্রেলিয়ানরা বারবার দেখিয়েছে, আবার দেখিয়ে দিল, যদি একবার খেলাটিকে হাতের মুঠোয় পায়, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করায় তাদের ক্ষমতা অসীম।"

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দিনের গোড়ায় আরও ৪৫ মিনিট টিকে থেকে ৪১২ রানে ইনিংস সমাপ্ত করে। ইংলণ্ড আরম্ভ করে, কিন্তু বোধনেই বিজয়ার গান, ২৩ রানের মধ্যে অধিনায়ক ডাঃ গ্রেস এবং স্টডার্ট গেলেন ট্রট-এর লেগব্রেক বুঝতে না পেরে, স্টাম্পড হয়ে। রনজি ও অ্যাবেল জুটি-বেঁধে কিছু উন্নতি ঘটালেন —সওয়া ঘণ্টায় তৃতীয় উইকেটে ৮১ রান হল। তারপরেই গেলেন অ্যাবেল এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দুরূহ ক্যাচে রনজি। জ্যাকসন, ব্রাউন, ম্যাকলারেনের খ্যাতি-হীন বিদায়ের পরে লীলির কিছু উদ্বুদ্ধ প্রয়াস—হার্নের সহযোগিতায় ৬৫ রান। লীলির মনোহর ঝলক দেওয়া ৬৫ রান সত্ত্বেও ইংলণ্ড সমাপ্ত ২৩১ রানে।

১৮১ রান পিছনে থেকে ফলো-অন করে পাঁচটার কিছু পরে ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করার পরে সন্ধ্যাকে ঘনীভূত দেখল আকাশে এবং ভাগ্যে। ৩৩ রানের মাথায় পয়েণ্টে সহজ ক্যাচ দিয়ে চলে গেলেন ডাঃ গ্রেস। তারপর রনজি ও স্টডার্টের মনোহর খেলা, কিন্তু দলের ৭৬ রানের মাথায় স্টডার্ট গত। অতঃপর পর্যায়ক্রমে আগত অ্যাবেল ও জ্যাকসনও একই পথের পথিক।

সুতরাং ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের চার উইকেট খুইয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যা থেকে ৭২ রান পিছিয়ে। চমৎকার উইকেটে ৩৪০ রানে ইংলণ্ডের ১৪টি উইকেটে পড়েছে, গোড়ার ৪৫ মিনিট বাদ দিয়ে, একদিনের মধ্যে।

"বৃষ্টি না বাঁচালে আমাদের নিশ্চিত পরাজয়"—দু' দিন আগে ইংলণ্ডের জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত টাইমস লিখল মর্মান্তিক ক্ষোভে।

'বৃষ্টি' শব্দটি কেটে দিয়ে ওখানে রণজিৎ সিংজী বসিয়ে দাও—ইংলণ্ডের ক্রিকেট-মহাদেবী নির্দেশ দিলেন। আর বৃষ্টির সঙ্গে বিদ্যুৎ যেমন, তেমনি রণজিৎ সিংয়ের সঙ্গে রিচার্ডসনের নামটিও যোগ করে দিও।

গাত্রবর্ণের জন্য অপমানিত রনজি মনে-মনে বলেছিলেন, জন্ম দৈবায়ত্ত কিন্তু ব্যাটিং মদায়ত্ত।

তৃতীয় দিনে কী ঘটল? রনজি কী করলেন?

দ্বিতীয় দিনেও কি কিছু করেননি? ছেড়ে-আসা কথা বলে নেওয়া যাক।

রনজি ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের ২৩১ রানের মধ্যে ৬২ রান করেছিলেন। দলের মধ্যে তাঁর রানসংখ্যা দ্বিতীয়। লীলির ৬৫ রানের পরেই তাঁর রান।

এ'রা দ্‌জনেই মাত্র পঞ্চাশ পেরিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস দ্বিতীয় দিনেই আরম্ভ হয়। রনজি পুনশ্চ খেলেন এবং নটআউট থাকেন। তাঁর ঐ দিনের খেলার বিষয়ে সংযত প্রশংসার চেহারা :

"কে এস রণজিৎ সিংজী দুটি চমৎকার ইনিংস খেলেছেন—দ্বিতীয়টি এখনো অসমাপ্ত। রান করেছেন অনন্‌করণীয় ভঙ্গিতে—যার সমাপনের অপরূপ দ্রুত ব্যক্তিগত রীতিতে—লেগের দিকে অনবদ্য মারগুলির প্রাধান্য অব্যাহত ছিলই। ইতিমধ্যেই এই খেলায় তিনি একশোর উপরে রান করেছেন। আবার সেই নৈপুণ্য দেখিয়েছেন—কেমব্রিজে কয়েক বৎসর বাস করে যা আয়ত্ত করেছেন।"

তৃতীয় দিনে মাত্র পাঁচ-ছয় হাজার লোক মাঠে উপস্থিত। স্বদলের পরাজয়ের সাক্ষী হতে কে চায়? ইংলণ্ড হারবেই শোচনীয়ভাবে, সুনিশ্চিত। ওল্ড-ট্রাফোর্ডের যে চিরকাঁদুনে আবহাওয়া কান্নাকাটি করে ইংলণ্ডকে বাঁচাতে পারত, তা সকালবেলা একটু থমথমে ভাব দেখিয়ে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে গেল। চার উইকেটে ১০৯ রান নিয়ে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের স্থগিত যাত্রার পুনরারম্ভ। ৪১-এ নটআউট রনজি এবং ব্রাউন ব্যাট ধরে দাঁড়ালেন গিফেন ও জোনসের বলের সামনে। ব্রাউন অচিরে পরিমুক্ত-প্রকৃতি, তড়বড়িয়ে অপরিষ্কার কিছু রান—জুটির ২৩ রানের মধ্যে ১৯, তারপরেই কট হয়ে বিদায়। ৫—১৩২। ম্যাকলারেন এলেন। সাবধানে দেড় ঘণ্টা খেলে ৫০-এ উঠলেন রনজি। তারপরেই বলের সঙ্গে লাজুক চোখাচোখির পালা শেষ হয়ে যখন রনজি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাবার অবস্থায় এলেন—গিফিনকে পিটিয়ে তাঁর চার ওভার বল থেকে আদায় করে নিলেন ২৬ রান। এই সময়ে ম্যাকলারেন হঠাৎ ক্যাচে গতজীবন। ইংলণ্ডের হাতে আছে চারজন লোক, এখনো দু' রান পিছনে। সে রান অবশ্যই হল। সহযোগী লীলি দেখলেন রনজির ব্যাটে অনর্গল রক্তধারা। সুতরাং তিনি আর রক্তারক্তিতে না গিয়ে অপরপ্রান্তে ঠাণ্ডা হয়ে রইলেন। একশোর দিকে রনজি উঠতে লাগলেন আনকোরা লিফটে চড়ে সাঁ-সাঁ করে। দু' ঘণ্টা দশ মিনিটে সেঞ্চুরি হল, শেষ ৫০ রান হল ৪০ মিনিটে। লীলি আউট হয়ে গেলেন তারপর। জুটিতে হয়েছিল ৫৩। ব্রিগস ও হার্নে ক্রমান্বয়ে আগত—তাঁদের হাত ধরে রনজির দৌড়-দৌড়—কিন্তু শেষপর্যন্ত সবাই সরে গিয়ে রনজিকে দাঁড় করিয়ে গেলেন অপরাজিত ১৫৪ রানের স্তম্ভের উপরে। ইংলণ্ড ৩০৫।

স্তম্ভ থেকে নেমে রনজি যখন প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটছেন—স্বপ্ন থেকে নেমে তখন দর্শকেরা পাগলের মতো জয়ধ্বনি দিচ্ছে। একেবারে ত্রুটিহীন একটি ইনিংস, তেইশটি চার, পাঁচটি তিন এবং নয়টি দুইয়ের দ্বারা গঠিত, তিন ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ে কৃত।

রনজি কি খেলা খেলেছিলেন সে-বিষয়ে রক্ষণশীল টাইমসের রচনা :

"কে এস রণজিৎ সিংজীর ব্যাটিং—সেইসঙ্গে পরবর্তীকালে খেলাটিকে খাদ থেকে টেনে তোলার ইংলণ্ডীয় প্রয়াস—শনিবার দিনটিকে খেলার শ্রেষ্ঠ দিন-রূপে চিহ্নিত করেছে।...অপমানজনক পরাজয় থেকে ইংলণ্ডকে উদ্ধার করতে সর্বাধিক যিনি করেছেন তিনি হলেন কে এস রণজিৎ সিংজী, যিনি তাঁর ১৫৪ রানের ইনিংসের মধ্যে দূরে দুর্গম চড়াইভাঙার সুকঠিন কর্মে তাঁর বহু অতীত

কীর্তির মহিমাকে অতিক্রম করে গেছেন।...এই মরশুমে রণজিৎ সিংজী যে-ভাবে খেলছেন তা অনেকের কাছে গ্রেসের সত্তরের দশকের খেলার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। অপূর্ব তাঁর স্বচ্ছন্দে সংক্ষিপ্ত রেখাটানার ভঙ্গিটুকু। লেগের দিকে খাটো হাতে মারের কৌশলটিকে যে-পরিমাণে অধিগত করেছেন, ইতি-পূর্বে অন্য কারো পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। ইয়র্কশায়ারের ব্রাউন কখনো-কখনো ঐ মারের চেষ্টা করেন কিন্তু রণজিৎ সিংজীর ধারাবাহিক সাফল্যের সঙ্গে তা কদাপি তুলনীয় নয়। তিন ঘণ্টার উপর খেলেছেন, কিন্তু ভারতীয় রাজকুমারের মারে সময়ের ভুল দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। দলের মোট ৩০৫ রানের মধ্যে তাঁর রান ১৫৪, দু ইনিংস জড়িয়ে ২১৬। এই সংখ্যাগুলিই দেখিয়ে দেয় তাঁকে বিনা ইংলণ্ডের কি দুর্দশা হত!...এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইংলণ্ডের ৩০৫ রানই এই মরশুমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ রান এবং কে এস রণজিৎ সিংজীর ১৫৪-ই প্রথম সেঞ্চুরি।"

অতঃপর? বলাই বাহুল্য অনুতাপ ও আনন্দে ইংলণ্ড ভরে গেল। রাজপুত-শৌর্যের বন্দনায় উচ্চকণ্ঠ হল ইংলণ্ডের ক্রিকেট-টডের দল। 'তাঁর খেলা গতির গীতি কবিতা'—লেখা হল সংবাদপত্রে—'যে-কোনো ইংরেজের চেয়ে আগে তিনি বল দেখেন এবং পরে মারেন। মাথার উপরে ছুটে-আসা বল থেকে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা-মাত্র না করে যেভাবে তিনি সেগুলিকে লেগের দিকে পাঠান, তা দেখলে গা শির্ শির্ করে।' 'বর্তমানে তিনি ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে 'জনপ্রিয়'—এখানেই থামলেন না লেখকেরা—গ্লাডস্টোন বা সলস্‌বেরীর চেয়ে জনপ্রিয়।'

কবিদের হৃদয়ে তরঙ্গ ওঠে বেশি, তাঁরা চিরদিনই তরঙ্গিণী-তপস্বী। সুতরাং 'পাঞ্চ' পত্রিকার কবি যদিও জানেন:

'Though the poets from Pentaour to Petrach, from Homar to Ausstin would fail

To picture in adequate tints this sweet boss of the bat-ball-and bail!'—

তথাপি তাঁর অপরূপ লেটকাট দেখে ('a serenc thing of beauty, a dream of delight, an ideal art–') তাঁরা কলম থাপমুক্ত না করে পারেন না—

When we want some one brilliant and steady, hawk-eyed, lion-hearted and cool.

A blend of MacLaren and Grace, with the "stick" of the Shrswebury school,

The sparkle of stoddart or Wynward, the patience of Surrey's brave Bob,

May Ranjit, the Black Prince of cricket, be with us, and "will on the job."

এখানেই যদি এই খেলাটির প্রসঙ্গ থামিয়ে দিই তাহলে লেখায় আমি ক্রিকেট খেলব না। রনজির সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ইংলণ্ড মাত্র ১২৫ রানে এগিয়ে ছিল। সওয়া-শো রানের সেই সহজ কৃত্যকে মরণ লড়াইয়ে পরিণত করেছিলেন যিনি, যাঁর "বিশাল দেহও যাঁর বীর-শক্তিপূর্ণ হৃদয়কে ধারণ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল

না”—সেই টম রিচার্ডসনের প্রয়াসের কথা ভুললে চলবে না। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে রিচার্ডসন ৬৮ ওভার বল করে ১৬৮ রানে ৭টি উইকেট নিয়েছেন। ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁকে মাত্র ১২৫ রান দিয়েছে—অস্ট্রেলিয়াকে শেষ করার জন্য। এর পর যা ঘটল তার বর্ণনা আমি সাহিত্যিকের রচনা থেকে উদ্ধৃত করছি, যদিও টাইমস্-এর নিছক বিবরণও ছিল যথেষ্ট রোমাঞ্চকর।

[রিচার্ডসন ও ব্রিগসের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার আয়ারডেল ও ডার্লিং আরম্ভ করলেন। তাঁরা মোটেই স্বচ্ছন্দ নন। হড়কে-ভড়কে কিছু রান হল। ব্রিগসের জায়গায় বল করতে এলেন হার্নে, তাঁকে মারা অসম্ভব, রিচার্ডসন তো ভয়াবহ। প্রথম উইকেট (আয়ারডেল) পড়ল ২০ রানে। ৬ রান পরে গিফিন রনজির হাতে কট। ২৮ রানে ট্রট গেলেন। ৪৫ রানে গেলেন ডার্লিং। তারপর—]

“এক ঘণ্টার মধ্যে ৪৫ রানে চার উইকেট। যদি ইংলণ্ড তার বোলারদের আরও কিছু রান দিতে পারত—দর্শকেরা বুক চিরে আশা করতে লাগল—যদি রিচার্ড-সন আর এক ঘন্টা তাঁর বলের গতি বজায় রাখতে পারেন! কিন্তু এই অমানুষিক বোলিং বেশিক্ষণ চালিয়ে যাবেন, এ আশা করা যায় না। তা ভেবে দর্শকদের বুক দুঃখে ও দীর্ঘশ্বাসে আন্দোলিত। কিন্তু রিচার্ডসনের প্রাণের জ্বলন্ত শিখা আরও জ্বলন্ত। বিকাল গড়িয়ে গেল ধীরে সূর্যাস্তের দিকে —প্রতিটি ঘণ্টাই অনন্তের সাক্ষী। রিচার্ডসন সত্যই বল করে চললেন—বল বল বল—আগুন কমল না এতটুকু। অন্য ইংরেজ বোলাররা বিচলিত, রিচার্ডসন নন। পঞ্চম অস্ট্রেলিয়ান উইকেট পড়ল ৭৯-তে, ষষ্ঠ ৯৫-তে, সপ্তম ১০০-তে। অস্ট্রেলিয়ার চাই ২৫ রান, হাতে তিনটি মাত্র উইকেট। ম্যাককিবিন ও জোনস—এই দুটি মুষিক ঐ তিনজনের মধ্যে আছেন। ‘সম্ভব কি’, দর্শক ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল নিজের মধ্যে, ‘হবে কি, হতে পারে কি—আমরা কি—জিততে পারি?’ কেন—রিচার্ডসনের দিকে চেয়ে দেখো একবার—ইংলণ্ড জিতবেই, নিশ্চয়ই। ঐ লোকটির মধ্যে নৈরাশ্য বলে কিছু নেই। উনি আড়াই ঘণ্টা বল করেছেন—বিনা ছেদে। উনি বল করে গেছেন—ওঁর বিরাট দেহের প্রতিটি স্নায়ু ও পেশীকে প্রতিবাদের সূচীতে বিদ্ধ করেছে প্রকৃতি—তবুও। উনি বল করে গেছেন—নিদারুণ অত্যাচারিত প্রকৃতি শত চেষ্টা সত্ত্বেও ওঁকে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পারেনি—মানুষটি এখন ঘোরে আছেন, শরীর হেলছে-দুলছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো—একটিমাত্র যে-চেতনায় তা সাড়া দিচ্ছে তা হল—‘ইংলণ্ড জিতবে...জিতবে...জিতবে...।’ অস্ট্রেলিয়াকে ৯ রান এখনো করতে হবে। এমন সময়ে কেলী লীলির হাতে একটি চান্স দিলেন, লীলি সেটি মাটিতে ফেলে দিলেন। রিচার্ডসনের বুক দু’ ফাঁক? না, তাঁর জন্য আছে শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা এবং তার যন্ত্রণা।

“অস্ট্রেলিয়া জিতল তিন উইকেটে। মাঠ থেকে খেলোয়াড়রা ছুটল, একজন বাদ—রিচার্ডসন তিনি। বোলিং-ক্রীজে দাঁড়িয়ে, যেন সম্মোহিত। সত্যই হেরেছি? তাঁর আত্মা প্রতিবাদ করে। দেবতারা উপরে আছেন—এতখানি মাত্রনার সংগ্রামকে চলতে দিয়ে বিনা পুরস্কারে তাকে সমাপ্ত হতে দেবেন তাঁরা? এখনো তাঁর শরীর দারুণ বেগের শিহরণে কম্পমান।...একজন সঙ্গী তাঁকে প্যাভিলিয়নে নিয়ে গেলেন। সেখানে ক্লান্তভাবে আসনে বসে পড়লেন।

ঐ বিকালে রিচর্ডাসন বিনা বিশ্রামে তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করেছেন। সমস্ত খেলাতে বল করেছেন ১১০'৩ ওভার, ২৪৪ রানে ১৩টি উইকেট পেয়েছেন। এরপর ম্যাঞ্চেস্টারে টেস্টে তিনি আর কখনো বল করেননি।"

চৌত্রিশ বছর পরে।

পৃথিবীর সভ্যতা কত ধীরগতি তা নিম্নের সংবাদে প্রকাশিত :

"নির্বাচকমণ্ডলীকে নিশ্চয় বেশ-কিছু পরিমাণে তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কেননা কে এস দলীপসিংজী এবং জি ও অ্যালেন—যদিও এঁরা অতি সুনিশ্চিতভাবে ইংলিশ-ক্রিকেটার, তবু জনৈক ভূতপূর্ব অধিনায়ক মিঃ পি এফ ওয়ার্নারের অপেক্ষা অবশ্যই জন্মে অধিক ইংরাজ নন! কিন্তু এইসব আপত্তি পুঁথিগত ছাড়া আর কিছু নয়।" (টাইমস, ২৬শে জুন, ১৯৩০)।

কাকার ভাইপো প্রথম টেস্টে জায়গা পাননি। অবশ্য দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে টেস্ট-লাঞ্চ খেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকেও ঠেকানো সম্ভব হয়নি। কেমব্রিজ, সাসেক্স ও ইংলণ্ডদলে খেলার যে-ধারা কাকা রনজি সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, দলীপ তাকে বজায় রেখেছিলেন। কাকার দৃষ্টিশক্তি, দ্রুতগতি এবং কব্জির মোচড়-চাতুরীও তাঁর ছিল। আবার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কাকার রেকর্ড ভেঙে-ছিলেনও। "২৯ বছর ধরে বজায়-থাকা সাসেক্সের পক্ষে করা রনজির ২৮৫ রানের রেকর্ড দলীপ ভাঙেন নর্দাম্পটনশায়ারের বিরুদ্ধে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় ৩৩৩ রান করে—কাউণ্টি-খেলায় একদিনে যার থেকে বেশি ব্যক্তিগত রান কেউ করতে পারেননি।" এবং কেণ্টের বিরুদ্ধে লাঞ্চের আগেই চোখ-ঝলসানো ১১৫। অকল্যাণ্ড-টেস্টে ১৯৩০ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দু' ঘণ্টায় ১১৭—ট্রাম্পারের পরে যার তুল্য বস্তু নিউজিল্যাণ্ডীরা দেখেনি।

১৯৩০, ২৭শে জুন, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্ট আরম্ভের আগে দলীপকে একটি অসামান্য খেলা দেখাতে হয়েছিল। ৯ই জুন লর্ডসে মিডল-সেক্স-সাসেক্স খেলা আরম্ভ হল। 'কুড়ি হাজার দর্শক সেদিন মাঠে যা দেখতে হাজির হয়েছিল, তা তারা দেখতে পেয়েছিল—কে এস দলীপ সিংজীর তিন সংখ্যার ইনিংস।' টেট, ওয়েনস্লে, ল্যাংরিজ, কুক, বাউলি প্রভৃতি বোলার-সমন্বিত মিডলসেক্স আক্রমণে অসীম শক্তিশালী। কিন্তু ৩৯ রানে প্রথম উইকেট পড়ার পরে দলীপ প্রথম যে-বলটি ব্যাটে নিয়েছিলেন—তাকে নিয়ে-ছিলেন একেবারে ঠিক ব্যাটের মাঝখানটিতে—এবং বোঝা গিয়েছিল কি জিনিস আসছে। মিডলসেক্সের প্রচণ্ড আক্রমণশক্তি দলীপের ব্যাটের সামনে বর্ণহীন হয়ে উঠল অচিরে এবং পরবর্তী তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাঁকে একবারও কোনো মার মারবার জন্য ব্যস্ত হতে হল না।

পরদিন টাইমস পত্রিকার খেলাধুলার পৃষ্ঠায় প্রধান শিরোনামা :

লর্ডসে অসামান্য খেলা

দুটি জোড়া সেঞ্চুরি

"মিডলসেক্স ও সাসেক্সের মধ্যে খেলাটি গতকাল অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।...কয়েকটি কারণে খেলাটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথম কারণ, মিডল-সেক্সের প্রথম ইনিংসে শেষ উইকেটে ১০৭ রানের জুটি, যার মধ্যে এইচ জে

এনথোভেন করেন ১০২ এবং প্রাইস ৩। গতকাল এনথোভেন দ্বিতীয়বার শতাধিক রান করে তাঁর দলকে বাঁচান। সাসেক্সের দ্বিতীয় ইনিংসের মন্দ সূচনার পরে কে দলীপ সিংজী, যিনি প্রথম ইনিংসে ১১৬ রান করেছিলেন, পুনরায় ১০২ নটআউট করলেন, যখন সাসেক্স খারাপ আলোর বিরুদ্ধে আবেদন করল।

"এই আবেদন করার সময়ে জয়ের জন্য সাসেক্সের ৩৮ মিনিটে ৭২ রান করার প্রয়োজন ছিল; তাদের আটটি উইকেট পড়ে গিয়েছিল; কিন্তু দলীপ সিংজী ও কুকের হাত জমে আছে, এবং চমৎকার বেগে রান করে যাচ্ছেন। দলীপ সিংজী তাঁর শেষ ২১ রান করেছিলেন ৮ মিনিটে। সারাদিনই আলোর গতিক মন্দ, আবেদন করার সময়ে মন্দতম।"

দ্বিতীয় টেস্টে দলীপের যে-কীর্তির কথা বলতে এখানে আমি দায়বদ্ধ, তার বিষয়ে আসার আগে ১৯৩০-এর দলীপের আকার একবার দেখে নিতে ইচ্ছে হয়। দলীপ সিংকে ক্রিকেটের শুভ্র শীর্ণ পুষ্প বলা যায়। এতখানি তাঁর প্রতিভা—কারো-কারো সন্দেহ হয়েছিল তিনি রনজিকেও অতিক্রম করে যাবেন। কিন্তু রনজিকে কেউ অতিক্রম করে, তা বোধহয় ভারতভাগ্যবিধাতার অভিপ্রেত নয়। ভারতের গুপ্ত বিদ্যার মারাত্মক ক্ষমতা আত্মঘাতী হয়েই বোধহয় ২২ বছর বয়সে দলীপকে নিদারুণ নিউমোনিয়ায় আঘাত করে, এবং তারও পরে যে, দলীপ খেলতে পেরেছেন, তা তাঁর সম্ভাবনার প্রকৃতি দেখিয়ে দেবার জন্য, সিদ্ধি ঘটাবার জন্য নয়।

দলীপ সিংজীর প্রতিভা সম্বন্ধে আমরা বেশি সচেতন নই, কাকার ব্যাপক মহিমার কাছে তাঁর মহান ক্ষণজীবন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। [রনজি-ট্রফি দলীপ-ট্রফির চেয়ে অনেক ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা!], সেই কারণে এই সুযোগে তাঁর প্রতিভার কিছু গুণগান করে নিই।

১৯৩০ সালে, খেলার পর খেলায় দলীপের দ্যুতি। 'তাঁর নিয়মিত সুনিয়ন্ত্রিত অসামান্যতা' দিনের পর দিন সংবাদপত্রের উচ্ছ্বাসের বিষয়বস্তু। "৩২২-এর ইনিংসে ১৬৮, (সাসেক্স-হ্যামশায়ার)"; "দিনশেষে ১৮৫ নটআউট, তখনো উত্তরোত্তর বলাধান হচ্ছে ব্যাটে" (সাসেক্স-এসেক্স)—এমনি সব। জেণ্টলম্যান ও প্লেয়ার্সের খেলার বিবরণ খানিক এই :

"অবশ্য এই খেলাটি চিরদিন স্মরণে থাকবে—এই খেলায় কে এস দলীপ সিংজী জেণ্টলম্যানের পক্ষে স্বর্গত আর এস ফস্টারকৃত দুই ইনিংসে দুটি সেঞ্চুরির সমরেকর্ড করেন। দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি করার সময়ে ফস্টার তাঁর জুটি সি বি ফ্রাইয়ের কাছ থেকে যে-সাহায্য পান তা অপরিশোধ্য। ফ্রাই সমস্ত ইনিংসেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ফ্রাই নিজেকে যথাসম্ভব পিছিয়ে রাখেন; তরুণ বন্ধুটিকে যতখানি পেরেছেন বোলিং ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন, মারের নৈপুণ্য-প্রতিযোগিতায় তাঁর সঙ্গে মাতেন নি। সহযোগী ব্যাটসম্যানদের কাছে কে এস দলীপ সিংজীর ঋণ অবশ্যই যথেষ্ট—কিন্তু তার ধরন ভিন্ন। জি ও অ্যালেন তাঁকে বোলিং ব্যবহারের সুযোগ দিলেও মধ্যবর্তীকালে যখনি পেরেছেন প্রচণ্ডভাবে, এমন কি বলা যায় উন্মত্ততার সঙ্গে পিটিয়েছেন।" (টাইমস, ১৯ জুলাই)।

দলীপ প্রথমে ইনিংসে করেন ১২৫, দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৩ নটআউট। খেলা ড্র হয়।

ফিরে যাই পুরনো প্রসঙ্গে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট-অবতরণে দলীপের সেঞ্চুরির কথায় প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া হেরেছিল। আগের সিরিজে ১৯২৮ সালে অস্ট্রেলিয়া শোচনীয়ভাবে হেরে অ্যাসেজ হারিয়েছে ইংলণ্ডের কাছে। ১৯৩০-এ প্রথম টেস্টে হারের পরে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থা আরও সঙীন। ইংলণ্ডের ক্রিকেটবুদ্ধি অস্ট্রেলিয়াকে কি চোখে দেখছিল তার নমুনা তুলে দিই ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান থেকে (২৭ জুন, ১৯৩০)—

"অস্ট্রেলিয়া দলকে কোনোমতেই উত্তম একটি কাউণ্টি-দলের চেয়ে—ধরা যাক নটিংহ্যামশায়ারের চেয়ে—শক্তিশালী বলা যাবে না। ইংলণ্ড-একাদশ মনে রাখুন এই কথাটি, আর স্ফূর্তি করুন—যেমন কয়েক বৎসর আগে আর্মস্ট্রং-এর (অস্ট্রেলিয়ান) দল করেছিল যখন ইংলণ্ড মন্দ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের এখন সেই অবস্থা।"

দ্বিতীয় টেস্ট আরম্ভ হল ইংলণ্ডের ইনিংস দিয়ে, ২৭শে জুন, ১৯৩০। ২৮শে জুন তারিখে বড় অক্ষরে শিরোনামা—**"ইংলণ্ডের সারা দিনের ব্যাটিং; দলীপ সিংয়ের সেঞ্চুরি।"**

অস্ট্রেলিয়ার গ্রাউণ্ড-ফিল্ডিং হয়েছিল অনবদ্য। কত যে রান বাঁচিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ান ছোকরারা তার সীমাসংখ্যা ছিল না। বুলেটের মতো বল, তাও তারা থামিয়েছিল—কিভাবে? 'যেমন কাদামাটিতে গুলি গিয়ে ঢোকে।' তবু তারা একদিনে ইংলণ্ডের চারশো রান করা ঠেকাতে পারেনি। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি স্মরণে আনতে পারলেন না, তার আগে টেস্টম্যাচে একদিনে চারশো রান হয়েছে কি-না। উলী করেছিলেন ৪১, হ্যামণ্ড ৩৮, হেনড্রেন ৪৮, এবং—

'হিজ হাইনেস শ্রী স্যার রণজিৎ সিংজী বিভাজী মহারাজা জামসাহেব অব নবনগর', যাঁর সম্মানে ১৩টি তোপগর্জন হয়, বোম্বাই ও করাচীর মধ্যবর্তী অংশে পশ্চিম সমুদ্রকূলে ৩৭৯১ স্কোয়ার মাইল আয়তনের এক দেশীয় রাজ্যের পাঁচ লক্ষ অধিবাসীর ২৭ বর্ষব্যাপী অধিপতি—তিনি বসেছিলেন প্যাভিলিয়নে, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দিগ্বিজয় সিংজীর ভ্রাতা দলীপ সিংজী তাঁর প্রবর্তিত ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন কি-না দেখবার জন্য। দলীপের ইনিংস-শেষে তিনি নিশ্চয় গর্ববোধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কঠোর মান-বুদ্ধি কিছু আহত না হয়ে পারে নি, যেহেতু দলীপের ইনিংস নিখুঁত হয় নি। ৯৮ রানের মাথায় তিনি চান্স দেন, দিতে বাধ্য, কারণ ধারা সৃষ্টিকরা থেকে ধারা বজায়রাখা সব সময়েই শক্ত। সেঞ্চুরির পরে দলীপ বাকি ৭৩ রান ঝড়ের বেগে করেছিলেন, ক্রিকেটে যত রকম মার সম্ভব সবগুলির 'মার্মার' তুলে। শেষে আউট হয়ে যান মাঠের ধারে ব্রাডম্যানের হাতে কট হয়ে। খেলা শেষে ব্রাডম্যান তাঁকে বলেন—'আরে ভায়া করলে কি? এমন করে উইকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে!

'হ্যাঁ—১৭৩ রানেও কারো উইকেট ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত নয়।'

দলীপ সিংজী কোন্ ইনিংস খেলেছিলেন সৌভাগ্যের বিষয় টাইমস ছাড়া ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা থেকেও তার বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছি। 'দি ক্রিকেটার' অর্থাৎ নেভিল কার্ডাস লেখেন (২৮ জুন, ১৯৩০)।

"হ্যামণ্ড এবং দলীপ সিংজী ইংলণ্ডের তৃতীয় উইকেটে ৮৫ মিনিটে ৫২ রান করলেন।...লাঞ্চের সময়ে খেলার অবস্থা দু'পক্ষে সমান, হবস, উলী ও হ্যামণ্ডকে হারিয়ে ইংলণ্ডের রান ১২৯।

"লাঞ্চের পরে দলীপ ও হেনড্রেন অস্ট্রেলিয়ান আক্রমণকে তার যথাস্বরূপে দর্শন করতে পারলেন—যা পরিশ্রমী কিন্তু ভেদকারী নয়।...দলীপের ঐশ্বর্যপূর্ণ একটি অনড্রাইভ। প্যাভিলিয়নে উপবিষ্ট ম্যাকলারেন মারটিকে অন্যের অপেক্ষা যোগ্যতরভাবে সমাদর করার যোগ্যতায় দিলেন, কারণ মারটির মধ্যে ছিল ম্যাকলারেন যখন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লর্ডসে টুপি পরেছিলেন, তখনকার গরিমার প্রতিফলন। দলীপের ক্রিকেট কব্জির সুসম্পূর্ণ নমনীয় চাতুরী। তাঁর লেট-কাট স্বাদু ফলের মতোই মধুর। হেনড্রেনের জীবনীশক্তির পাশাপাশি দলীপের কমনীয়তা। দুজনের পার্থক্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের পার্থক্য, কিছু জটিল রহস্যাচ্ছন্নের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্পষ্ট-প্রতক্ষের পার্থক্য।...দেড় ঘণ্টা ধরে দলীপ এবং হেনড্রেন খাঁটি ক্রিকেট দিয়ে দর্শকদের আমোদিত করলেন—সমুচ্চ শব্দে যে-ক্রিকেটের জয়ধ্বনি ঘোষিত হল। অভিনন্দনের সীমা নেই। মধ্য বসন্তে লর্ডসের আদর্শ চেহারা—মাথার উপরে নীল আকাশ, মাঠের চারদিকে সুখী সমাবেশ, ক্রিকেটারদের সাদা ফ্লানেলে দিনের কোমল মধুরতার তরঙ্গ।

"ব্যাটসম্যানেরা এমনই জমে আছেন যে, বল মাটিতে পড়ার আগেই তাঁদের মারের হিসাব ঠিক হয়ে গেছে। ৯০ মিনিটে দলীপ ও হেনড্রেন ১০৪ রান যোগ করলেন, তার মধ্যে ৫০ হল ৩৫ মিনিটে। [তারপর ২০৯ রানের মাথায় হেনড্রেন আউট]...

"উইকেটের উপরে পিছিয়ে পড়ে গ্রিমেটের লেগস্পিন বলে দলীপ কাট করলেন উপভোগ্য বিলম্বিত অন্তরঙ্গতায়। ৯৮ রানের মাথায় সকলকে আতঙ্কিত করলেন থার্ড স্লিপের হাতে চান্স দিয়ে, যিনি তৎক্ষণাৎ সেটিকে ফেলে দিয়ে নৈরাশ্যকে ধন্যবাদে রূপান্তরিত করে দিলেন।

"ঝলসানো একটি লেগগ্লান্স দেখিয়ে দিল দলীপের কাকার নাম রণজিৎ সিংজী। এখন-তখন দলীপ অদ্ভুত কিছু ঘটাতে লাগলেন—কিছু বন্য উন্মত্ত অপণ্ডিত মার। চমৎকার খেলোয়াড় তিনি, কিন্তু মাঝে-মাঝে দেখিয়ে দেন, বৈদগ্ধ্যকে এখনো দ্বিতীয় অভ্যাসে পরিণত করতে পারেননি।"

দলীপের খেলার বিষয়ে আরও কিছু মন্তব্য এখনি উপস্থিত করা যায়, কিন্তু তার আগে বলে নিই—এই টেস্টে ইংলণ্ড শোচনীয়ভাবে সাত উইকেটে হেরেছিল। পরের টেস্টে ইংলণ্ডকে বাঁচিয়েছিল আবহাওয়া, তার পরের টেস্টেও, কিন্তু শেষ টেস্টে ইনিংসে না হেরে ইংলণ্ডের উপায় ছিল না, কারণ—

আর কিছু নয় ব্রাডম্যান। ১৯৩০-এর ব্রাডম্যান। তরুণ ক্ষুধার্ত নির্বিকার হিংস্র ধ্বংসকারী প্রতিভা। এই ১৯৩০-এর অস্ট্রেলিয়া-দল সম্বন্ধে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের উন্নাসিক মন্তব্য আগে উদ্ধৃত করেছি, যাতে তাকে ইংলণ্ডের কাউন্টি-দলের সমতুল বলা হয়েছিল—সে লেখার লেখক ছিলেন অন্য কেউ নন —নেভিল কার্ডাস—তাঁর পক্ষেও ব্রাডম্যানকে—২৫৪, ৩৩৪ রানের পরবর্তী ব্রাডম্যানকে হিসেবের মধ্যে আনা সম্ভব হয় নি—ক্রিকেটে ভবিষ্যৎবাণী যে মনে রাখার জন্য করা হয় না, তা পুনশ্চ প্রমাণিত হয়েছিল।

১৯৩০-এর পরবর্তী টেস্টগুলিতে দলীপ অপরূপ খেলেছিলেন। দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মনোরম ৪৮ করেন। পরের টেস্টে প্রথম ইনিংসে তাঁর ৫৪ উচ্চ প্রশংসিত হয়।* তার পরের টেস্টে তাঁর ৫০ একই প্রশংসা পায় (টাইমস —১৮ আগস্ট, ১৯৩০)। কিন্তু এ সকলই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ব্রাডম্যানের খাণ্ডব-দাহনে। দু' বছর পরে দলীপ যখন অস্ট্রেলিয়াগামী ইংলণ্ড দলে স্থান পেলেন, তখন বাদ সাধল তাঁর স্বাস্থ্য। ক্রমে খেলা থেকে অবসর নিলেন—যার ফলে তিনি চিরদিনের জন্য রনজির যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুগত গৌরবে অভিষিক্ত হয়ে রইলেন—সেই মাত্র।

ইংলণ্ড টেস্টে-দলে শেষ ভারতীয় খেলোয়াড় পাতৌদির নবাব—স্থানপ্রাপ্ত ভারতীয়গণের পক্ষে অবশ্যকৃত্য করেছিলেন, অবশ্যই করেছিলেন, কিন্তু মন্ত্রশক্তি তখন হ্রাস পাওয়ার মুখে। বার বার তিনবার—এই বঙ্গদেশীয় বা ভারতবর্ষীয় প্রবাদ অনুসারেই পাতৌদি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট-অবতরণে সেঞ্চুরি করেন, কিন্তু তা করবার সময়ে তাঁকে যে-পরিমাণে ঘর্ম ও অশ্রু ঝরাতে হয়, তাতে ভারতের অলৌকিকতা যে বহুলাংশে লৌকিক প্রতিভা-নির্ভর, তা-ও প্রমাণিত হয়ে যায়।

"অলিভ রঙের পাতৌদির নবাব ইফতিকার আলি খান অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে বলের দিকে চেয়ে থাকেন এবং তার সমস্ত ছলাকলা ধরে ফেলেন। আফগান রক্ত-সম্ভূত এই ব্যক্তি পঞ্জাবের অন্তর্গত পাতৌদি-নামক ক্ষুদ্র দেশীয়রাজ্যের (৫৩ স্কোয়ার মাইল) অধিপতি এবং অশ্বারোহী দেহরক্ষী বাহিনীর অধিকারী। ইনি হকি, বিলিয়ার্ড এবং ক্রিকেটে অক্সফোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১৯৩১ সালে কেমব্রিজের বিরুদ্ধে তাঁর ২৩৮ নটআউট ইউনিভার্সিটি ম্যাচের পক্ষে

*("চতুর্থ টেস্ট) With three out for 119, a great responsibility was imposed on K. S. Duleepsinhji and Leyland. They rose to the occasion splendidly. K. S. Duleepsinhji decided that attack was the most profitable form of defence... The occasional high-rising ball which had bothered Hobbes and Sutcliffe gave him no trouble at all, and when Grimmette came on he took three quick steps down the pitch and either drove him hard enough to beat Bradman at deep mid off or smothered the ball before it quite knew whether it was a leg break or googly." (The Times, July 28th)

"Sutcliffe and Duleepsinhji showed us batting of the match-winning kind. Sutcliffe has not played so stylishly for years... Duleepsinhji earned even higher marks. He made it impossible for Woodfull to let Grimmette continue bowling lest any inferiority complex which that remarkable little man has inspired into English batsmen should be finally dispelled. (*The Times*, July 30).

রেকর্ড”—পাতৌদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পাতৌদি অক্সফোর্ডের খাঁটি প্রতিনিধি। অক্সফোর্ডের বাচনভঙ্গি তাঁর ক্রিকেটে। কব্জির যেটুকু খেলা দেখাতেন, তাকে ‘ভারতীয়’ না বলে ‘পার্থিব’ বলাই ভাল, কারণ, পৃথিবীর মানুষের কব্জি আছে, এবং ব্যাট ধরলে কব্জির মোচড়ে বলকে নানাস্থানে পাঠানোর ইচ্ছাও স্বাভাবিক। রনজি ও দলীপ কেমব্রিজের, এবং পাতৌদি অক্সফোর্ডের—এঁদের খেলার মধ্যে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বভাবচরিত্র ফুটে উঠেছে। যত দূর শোনা গেছে—কেমব্রিজে শিক্ষার দিকে এবং অক্সফোর্ডে রীতি-শিক্ষার দিকেই বেশি জোর দেওয়া হয়।

রনজি ও দলীপ কেমব্রিজের কিন্তু ভারতেরও বটেন। পাতৌদি অক্সফোর্ডের সেই সঙ্গে ভারতেরও। অক্সফোর্ড কেমব্রিজের চির-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও তাই পাতৌদি রনজি-দলীপের ধারা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে সিডনিতে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টম্যাচ শুরু হল। ব্রাডম্যান ১৯৩০ সালে ইংলণ্ডকে মেরে ছরকুটে দিয়ে অ্যাসেজ লুণ্ঠন করে এনেছিলেন, সেই অ্যাসেজ পুনরুদ্ধারের মারণযজ্ঞের মহা পুরোহিত জার্ডিন তাঁর শত্রুঘ্ন-অস্ত্ররূপী লারউডকে নিয়ে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ায়—বডিলাইন-নামক অতীব অশালীন উগ্রঅভিপ্রায়ে তিনি লুব্ধ—পাতৌদি সেই দলের হয়ে টেস্ট খেলতে নামলেন। পাতৌদির সামনে দুটি উদ্দেশ্য ছিল, ক্রিকেট-খেলা এবং ভারতীয় রেকর্ড বজায় রাখা।

প্রথম টেস্টে ব্রাডম্যান খেললেন না। ঐবারের জন্য অন্তত তাঁর বডিলাইন লারউড ভোসের লোলুপ বিষচুম্বন থেকে রক্ষা পেল। অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিং আরম্ভ করে করল ৩৬০। তার মধ্যে বীরগাথা রচনা করাতে পারে, এমন একটি ব্যক্তিগত ইনিংস খেলেছিলেন ম্যাককেব। সে-বিষয়ে অন্যত্র আমি যথেষ্ট লিখেছি, এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। লারউড উইকেট পেলেন—প্রথম ইনিংসে ৩১ ওভার বল—৯৬ রান—৫ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে—১৮ ওভার বল—২৮ রান—৫ উইকেট। ইংলণ্ড দশ উইকেটে জিতল।

প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ড ৫২৪ রান করেছিল। সেঞ্চুরি করেন সাটক্লিফ (১০৪), হ্যামণ্ড (১১২) এবং পাতৌদি (১০২)।

পাতৌদির সেঞ্চুরি একদিনে হয়নি। খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড তার প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৪৭৯ রান করে—পাতৌদি ৮০ রান করে নটআউট থাকেন। এইদিন তাঁর খেলার কিছু বিবরণ :

‘পাতৌদির নবারের নিরেট ইনিংস, কিছু চমৎকার মার তাতে ছিল—সময়জ্ঞানে নিখুঁত সেগুলি। উল্লেখযোগ্য প্রথম অবতরণ। কিন্তু ৬৮ রানের মাথায় অকস্মাৎ বিস্ময়করভাবে গুটিয়ে গেলেন—পরের রানটি করতে ২৫ মিনিট সময় লাগল। শেষ পঁচিশ মিনিটে মাত্র ১২ রান করেছেন।...দলের ৪৪১ রানের মাথায় ন্যাগেলের জায়গায় গ্রিমেট আবার এলেন। পাতৌদির নবাব এবং জার্ডিন দুজনেই আত্মরক্ষার উদ্যোগী থাকায় ৭ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট কাটার আগে ৪৫০ রান উঠল না।’ (টাইমস—৬ ডিসেম্বর, ১৯৩২)। পাতৌদি এবং ভারতের পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত (ইংলণ্ডের পক্ষে বা জার্ডিনের পক্ষে নয়) সেঞ্চুরি পাতৌদি করলেন পরদিন। মহৎ দায় যাঁরা বহন করেন, তাঁদের আত্মকৃচ্ছ্রের রূপ যেরকম হাওয়া উচিত,

পাতৌদির খেলার রূপও সেই জাতীয় হয়েছিল :

"পাতৌদির নবাবের উল্লেখযোগ্য আবির্ভাব। কিন্তু তাঁর খেলায় শক্তির অভাব ছিল, এবং তাঁর সেরা চেহারা এই খেলায় দেখা যায়নি।...

"১০ রান করার জন্য পাতৌদির নবাব আধ ঘণ্টা ব্যাট করেছেন; ৯৮ রানের মাথায় আটকে দিলেন ২৫ মিনিট। সেঞ্চুরিতে পৌঁছানোর আগে অ্যালেন খসে পড়েন ওরিলীর বলে তাঁরই হাতে কট হয়ে। ন্যাগেলের বলে লেট-কাট এবং তাতেই পাতৌদির সেঞ্চুরি-লাভ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন, এমন খেলোয়াড়ের তালিকায় তিনি অষ্টম ব্যক্তি। পূর্ব-বর্তীরা হলেন, ডবলিউ জি গ্রেস, কে এস রণজিৎ সিংজী, আর ই ফস্টার, জি গান, সাটক্লিফ, লেল্যান্ড, এবং কে এস দলীপ সিংজী।...পাতৌদির নবাবের ধৈর্যশীল ইনিংস শেষ হয় ৫২৪ রানের মাথায় ন্যাগেলের দ্বারা বোল্ড হয়ে।" (টাইমস—৭ ডিসেম্বর)।

সেঞ্চুরি শেষ করার পরে মুখে ঘাড়ে রুমাল রগড়ে পাতৌদি নিশ্চয় ভেবে-ছিলেন—অলৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।

পাতৌদির সেঞ্চুরিতে যে-পরিমাণে রক্তশূন্যতা ছিল, তা রক্তারক্তির বোলার লারউডের ভাল লাগার কথা নয়। পাতৌদির ইনিংস সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

"জীবনে যত মন্থর সেঞ্চুরি দেখেছি, তার মধ্যে মন্থরতম পাতৌদির সেঞ্চুরি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করার যে-রাজকীয় ধারার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পূর্বসূরী দুই রাজবংশীয়, তা বজায় রাখায় তিনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন। সে ঐতিহ্য তিনি রক্ষা করেছিলেন, তবে তার জন্য ৫ ঘণ্টা ১৭ মিনিট সময় তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছিল।

"নবাব মোটেই রসবোধবর্জিত নন। ২৫ রানের জন্য ঘণ্টা-দেড়েক সময় তাঁকে ধস্তাধস্তি করতে দেখে, এবং তারপরেও রানসংগ্রহে সময়ক্ষেপের ব্যাপারে কোনো উন্নতি না দেখে, ভিক রিচার্ডসন ওভারের ফাঁকে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—'প্যাট হল কি? বলগুলো কি তেমন ভালভাবে ঠাহর হচ্ছে না?'

" 'আ—হাঃ—' নবাব উত্তর দিলেন, 'আমি উইকেটের গতি পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছি।'

"রিচার্ডসন—'হা ভগবান! তোমার আসার পরে তিনবার যে গতি বদলেছে!"

সেঞ্চুরি করার ফল কিন্তু ভাল হয়নি। জার্ডিন পাতৌদির সেঞ্চুরি নিয়ে ধুয়ে খেতে রাজি ছিলেন না। তাঁর দরকার ইংলণ্ডের জয়, তার কম বা বেশি-কিছু নয়। সুতরাং ভারতবর্ষের পাতৌদি 'অলৌকিক' ভারতীয় রেকর্ড করতে পারলেন কি-না, সে বিষয়ে বোম্বাইজাত জার্ডিন মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। উল্টোপক্ষে পাতৌদির সেঞ্চুরি-কামনায় দলের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে ভেবে রুষ্ট হয়েছিলেন যথেষ্ট।

তা ছাড়া পাতৌদি জার্ডিনের জো-হুজুর ছিলেন না। ক্রিকেটকে খেলারূপে তিনি নিয়েছিলেন, সে-জন্য দেশে-দেশে হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ হওয়ার কথা নয়। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, জার্ডিনের চরিত্রে ভালো লাগার কিছু আছে বলে তাঁর সন্দেহ হয়নি। অস্ট্রেলিয়াজাত এম-সি-সি সদস্য 'গাবি' অ্যালেন জার্ডিনকে বলেছিলেন, 'আমাকে বডিলাইন বল করতে বলো না। যদি

রেখো, অস্ট্রেলিয়ায় আমার জন্ম'—পাতৌদি সে-কথা বলেননি, কারণ, ভারতের বিরুদ্ধে বডিলাইন প্রযুক্ত হচ্ছিল না, কিন্তু তা যদি করা হত, ঐ কথাই বলতেন বলে মনে হয়।

বিরক্তিকর, তবু সেঞ্চুরি, সে-জন্যে জার্ডিন পরের টেস্টে পাতৌদিকে জায়গা না দিয়ে পারেননি। সে টেস্টে পাতৌদি ১৫—৫ রান করায় তাঁকে বসিয়ে দিতে অসুবিধা হয়নি। অবশ্য মাত্র একটা খেলাতে খারাপ খেললে বসিয়ে দিতে হবে—এটা জার্ডিনের ব্যক্তিগত নীতি। তাই পাতৌদির বর্জনে বিস্ময়ের সৃষ্টি না হয়ে পারেনি।

"The teams were not announced until the last minute, when some surprise was caused by the omission of the Nawab of Pataudi." (*The Times*, Jan. 14, 1933).

পাতৌদিকে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করতে হয়েছিল অতঃপর। অন্তত আমার তাই অনুমান। প্রথমত, ঐতিহ্য জিনিসটা ভালো, কিন্তু তার দায় উদ্ধারে প্রাণান্ত হয়। অতএব যদি 'সেই ট্রাডিশান' সহজভাবে 'সমানে চলে', তাহলে তাকে চলতে দাও, কিন্তু ট্রাডিশানের টাগ অব ওয়ারে নেমো না। দ্বিতীয়ত, ভারতে জন্মে ইংলিশ ক্রিকেটার হবার দিন আর নেই। রনজি, দলীপ বা পাতৌদি—এ'রা খাঁটি ইংলিশ ক্রিকেটার। যদিও রক্তে এবং তক্তে ভারতীয়, অর্থেও, কিন্তু ক্রিকেটে ইংরেজ। এই অন্যায় চললে মন্দ হয় না, কিন্তু অন্যায়ের পক্ষে লড়াই চালানো উচিত নয়।

তাই পাতৌদি, পাছে তাঁর নন্দন 'তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি' জাতীয় আদর্শবাদী হয়ে ওঠে, সে-জন্য নিজে ১৯৪৬ সালে ভারতের অধিনায়ক হয়ে বসলেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, যাতে—

তদীয় নন্দন পরে ভারতের ক্রিকেট-অধিনায়ক হতে পারে।

আমার তাই ধারণা। পাঠক যা-ইচ্ছা সিদ্ধান্ত করুন।

* * * ক্রিকেটের কুরুকুমার * * *

রনজিতে প্রত্যাবর্তন করি। ফিরে যাই সেই যুগে যখন পৃথিবী যথার্থই রূপবতী ছিল—ঘাস সবুজতর, বাতাস মধুরতর, আকাশের নীল আরও নীল—যখন আমাদের জন্য বাড়ি তৈরি করতেন ময়দানব, চাল সরবরাহ করতেন শায়েস্তা খাঁ, গোরীসেন ঢালতেন টাকা, কাপড় বিলোতেন হর্ষবর্ধন—

—আর রনজি খেলতেন ক্রিকেট!

দোহাই আমার পণ্ডিত বন্ধুগণ! একটু চুপ করুন! আমাকে স্বপ্নরক্ষা করতে দিন। আমাকে শোনাবেন না যে—জনগণের ক্রয়ক্ষমতা না থাকলেই তবে শায়েস্তা খাঁর আমলের সস্তামি সম্ভব হয়, হয়বুদ্ধি ব্যক্তিই ময়দানবকে ঐতিহাসিক চরিত্র মনে করে, সুষম ধনবণ্টন না হলে হর্ষবর্ধন অরণ্য-আড়ালে গিয়ে শেষ লেংটি দান করেও দেশের লজ্জা ঢাকতে পারবেন না—এবং—

বাঁচতে দিন মশাই বাঁচতে দিন। সত্যের কশাঘাতে জর্জরিত করবেন না। জেনে রাখুন, ইতিহাসের পাঁকের উপরকার পদ্মগন্ধই আমাদের মনের স্বাস্থ্য-

উপর গিয়ে পড়ে—উক্ত প্রণামকে নিকটে দাঁড়িয়ে নয়নে লেহন করছে যে-দেব-দাসগণ—তাদের উপরে নয়।

সুতরাং চলে যাই বিস্ময়ে জাগর সেই প্রভাতকালে যখন রাজকুমার রণজিৎ-সিংজী এসে দাঁড়িয়েছেন ইংলণ্ডের খেলার মাঠে—১৮৯৪—১৮৯৫—১৮৯৬—

পাঠক আশ্বস্ত হোন। এই ফাঁকে রনজি সম্বন্ধে একটা গোটা বই গুঁজে দেবার কোনো মতলব আমার নেই। কিন্তু একদিন সত্যই তা ছিল। সেজন্য ভিন্ন এক গবেষণার কারণে যখন উনিশ শতকের শেষ কিছু বছরের সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা উল্টেছিলাম, তখন রনজির সংবাদ পেলেই নোট করে রাখতাম। সব সংবাদ তুলে নেওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু যা জোগাড় করেছিলাম তার পরিমাণও প্রচুর। অনেক সাধুবাসনার মতো রনজির উপরে গ্রন্থরচনার অভি-প্রায় এখন ত্যাগ করেছি। তাই ভাবছি, রনজির ভাবী জীবনীকারদের সুবিধার্থে সংগৃহীত সংবাদের কিছু-কিছু পরিবেশন করে দেওয়া উচিত—বিশেষত যখন সংবাদগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের কাগজগুলিতে এবং তার দ্বারা এ-দেশের শিরা-ধমনীতে রক্ত-গতি কিছু বেড়ে গিয়েছিল।

এদেশের সংবাদপত্রগুলি বিলেতী কাগজ থেকে সংকলন ক'রে প্রচুর রনজি-সংবাদ তখন প্রকাশ করত মন্তব্যসহ। ১৮৯৪ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত সময়ের কিছু-কিছু সংবাদ হাজির করা যাক।

কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান নেশনে' ১৮৯৪, ৭ মে রনজির অভ্যুদয়ে লেখা হয়: "হিন্দু ছাত্র মিঃ রণজিৎসিংজী কেম্ব্রিজের ক্রিকেট-মাঠে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছেন।...অনেক হিন্দু-ক্রিকেটার ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে দেখিয়ে দিয়ে-ছেন, কিভাবে সেরা ইউরোপীয় ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে রুখে খেলতে হয়। ইংরেজদের নিজভূমে ঐ ব্যাপারটা দেখিয়ে দেওয়া অপেক্ষা করছিল মিঃ রণজিৎ-সিংজীর জন্য।"

ইণ্ডিয়ান নেশন তারপর লণ্ডনের 'মর্নিং লীডার' কাছ থেকে রণজিৎ সিং সম্বন্ধে যে-'উচ্চ প্রশস্তি' উদ্ধৃত করেছিল, সেটি বিশেষ মূল্যবান এইজন্য যে, রনজির পরবর্তী অগণিত প্রশস্তির সূচনায় তার স্থান। মর্নিং লীডার লেখে: "সুতরাং আনন্দদায়ক রণজিৎসিংজী আমাদের মধ্য থেকে [ভারতে] চলে গেছেন বা যাচ্ছেন। নিজ পথে তিনি অগ্রদূত। তিনিই প্রথম খাঁটি 'আর্যভ্রাতা' যিনি লাইট ব্লু ক্রিকেট-একাদশে অংশ নিয়েছেন। তিনিই প্রথম হিন্দু যিনি প্রথম-শ্রেণীর ইংরাজ-ক্রিকেটারদের মধ্যে গুরুত্বের আসন গ্রহণ করেছেন।...তিনি সত্যই আনন্দদায়ক মানুষ। তাঁর ইংরাজ-বন্ধুরা তাঁর বিষয়ে একেবারে মোহিত, কারণ তাঁর স্বভাব উচ্ছল ও সহানুভূতিপূর্ণ, সানন্দ ঔদার্যে তা ভরপুর, বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই কোথাও। তিনি রাজবংশীয়, এইজন্য ভারতে হয়ত বর্ণপার্থক্য রক্ষা করেন, কিন্তু কেম্ব্রিজে তা একটুও দেখান নি। কেম্ব্রিজের সমাজজীবনে তিনি অতীব প্রিয়পাত্র—বিশেষতঃ মহিলাগণের মধ্যে। তাঁর ঝক্-ঝকে দাঁত, দীপ্ত-উজ্জ্বল চোখ, তৃপ্তিপূর্ণ খিলখিল হাসি—রমণীরাজ্যে যে-বিজয়-অভিযান চালিয়ে যায়, তার জন্য গ্রাম্ভারি স্যাক্সনগণ হিংসা না করে পারে না। ক্রিকেট-মাঠে চিত্রবৎ আকার তাঁর। লম্বু, যেন প্রায় দুর্বল-শরীর এই তরুণটির গাত্রবর্ণ তাঁর শাদা সিল্কের শার্টের বর্ণের সঙ্গে তুলনায় চমকপ্রদ-

ভাবে বিপরীত। এমন অনায়াস লাবণ্যের সঙ্গে তিনি খেলেন যে, তাতে আবৃত থাকে তাঁর তীক্ষ্ন আঘাতের অন্তর্নিহিত শক্তি। কেম্ব্রিজে প্রায় অভূতপূর্ব কাণ্ডের নায়ক তিনি—এক মরশুমে দু'হাজারের বেশি রান করেছেন।"

ঠিকভাবে বলতে গেলে, পরের বছর ১৮৯৫ সালেই ইংলণ্ডের বড় ক্রিকেটে রনজির আবির্ভাব। সাসেক্সের হয়ে খেলেন। মরশুমের শেষে ৪৯'১১ গড় রান ক'রে চতুর্থ স্থানাধিকারী হন। দারুণ কৃতিত্ব, একজন নবাগতের পক্ষে, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ছিল সূচনায় ব্যাপারটি—ঊষাকালেই খর সূর্য—দেখা দিয়েই লর্ডস-লুণ্ঠন। মোদ্দা কথা, সাসেক্সের পক্ষে প্রথম খেলায় এম-সি-সির বিরুদ্ধে লর্ডসে করলেন ৭৭ নটআউট এবং ১৫০। ফলে আহা-রে-রে-রে—সারা ইংলণ্ড জুড়ে। ভারতীয় পত্রিকাসূত্রে তেমন বেশ কিছু সংবাদ আমাদের হাতে আছে। প্রথমেই 'এশিয়ান' কাগজে 'রনজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত জনৈক পুরাতন ক্রিকেট-লেখক' যা লিখেছিলেন (পুনার 'মরাঠায়' ২৫ অগস্ট, ১৮৯৫-তে উদ্ধৃত), তার অংশ উপস্থিত করছি, যার মধ্যে রনজির প্রথম-জীবনের অনেক চিত্তাকর্ষক খবর পাওয়া যাবে :

"রণজিৎসিংজী জামনগরের আসল 'জাম'। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে, যথা বিষ-প্রয়োগের জন্য, তিনি বিপজ্জনক গদী-লাভের প্রচেষ্টা ত্যাগ ক'রে...'স্বাধীনতার আবাসে' [অর্থাৎ ইংলণ্ডে] স্বেচ্ছানির্বাসিত। জামনগরীয়াদের, ফুঃ ফুঃ! কি নাম রে বাবা, মন কেন-যে এমন একজন অনবদ্য ক্রিকেটার ও সর্বাত্মক খেলোয়াড়ের বিষয়ে মৃত্যুশীতল হয়ে আছে বলা কঠিন। তিনি সাহসী খেলোয়াড়ী রাজপুত—অতীব খোলামনের মধুরস্বভাবের মানুষ—বাল্যকাল থেকেই যার পরিচয় পাওয়া গেছে। শিক্ষকশ্রেষ্ঠ মিঃ চেস্টার ম্যাক্‌নাঘাটেনের কাছে তিনি শিক্ষা পেয়েছেন। মিঃ ম্যাক্‌নাঘাটেন কুশলী ক্রিকেটার।...ইনি রাজকোটের রাজকুমার কলেজের প্রিন্সিপাল—এই শিক্ষামন্দিরেই এ'র প্রিয় ছোট্ট রণজিৎসিংজীর শিক্ষা। এই ছোট্টখাট্ট রাজকুমারটি অতি বাল্যকাল থেকে ক্রিকেটের বিষয়ে দারুণ আকর্ষণের পরিচয় দিয়েছেন, এবং মিঃ ম্যাক্‌নাঘাটেন এই পুরুষোচিত খেলাটির প্রতি বালকের তীব্র আসক্তিকে সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করেছেন। তার ফল...ডাঃ ডবলিউ জি গ্রেস না থাকলে ভারত তার জনৈক রাজপুত-সন্তানকে বর্তমান ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান বলে দাবি করার গৌরব অর্জন করত। প্রথম যে-ম্যাচে রণজিৎসিংজী অংশ নিয়েছিলেন, তার কথা আমি কখনো ভুলব না। রণজিৎসিংজীর মাথা তখন ব্যাট ছাড়িয়ে উঠেছে কি-না সন্দেহ। সবশেষে তার স্থান। এখন তিনি ইংলণ্ডে ব্যাট করতে নামলে অনেকে কেঁপে ওঠেন। সেদিন কিন্তু 'অনেকে' নন,'সবাই' হেসে গড়িয়ে পড়েছিলেন যখন এই খাটো একগুঁয়ে বালকটি মাঠে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছিল না—সে নটআউট তবু কেন তাকে খেলতে দেওয়া হচ্ছে না! সে সবশেষে নেমেছিল, এবং কোনো একটা বল খেলতে পাবার আগেই তার সঙ্গী বোল্ড হয়ে গেছল। বালক কিছুতে মানবে না তার খেলাও শেষ! ফলত দেখা গেল—দি বয় স্টুড অন দি বার্নিং স্পেন—একা বালক দাঁড়িয়ে আছে জ্বলন্ত ঐ প্রান্তরে—সত্যই দিনটি ছিল তরল অগ্নিপ্রবাহের—আর 'সে ছাড়া সবাই পালিয়েছিল।' কৌতুকজনক কাণ্ড। আমরা অবশ্য বেচারা ছেলেটির জন্য দুঃখবোধ করেছিলাম

—যখন দেখা গেল, আকুল হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে সে টেপ্টে ফিরল—তার নৈরাশ্যের শেষ নেই—হায়! যে-খেলাকে সে এত ভালবাসে তাতে সে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে পারল না।”

১৮৯৫ সাল থেকেই দেখা গেল, রনজি-রহস্যের মধ্যে সাংবাদিকরা অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ঢুঁ দিচ্ছেন। কোথা থেকে এলো এই বিস্ময়টি, কী করে সম্ভব হল এ-বস্তু—প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে জেনে নিতে চাইলেন তাঁরা, এবং সংবাদ-পত্রের পাতা জোড়া ক'রে সেইসব সন্ধানফল ছাপাও হতে লাগল। আমার হাতে ঐ বছরের তেমন দুটি সাক্ষাৎকার-বিবরণ আছে। একটি 'ক্রিকেটার' পত্রিকার, বেরিয়েছিল অমৃতবাজারে, ২৪ অগস্ট, ১৮৯৫, অন্যটি 'ডেইলি ক্রনিকলে'র সেটিও অমৃতবাজারে বেরোয়, ২৭ অগস্ট।

ক্রিকেটারের সাংবাদিক 'জনগণের নয়নমণি', 'প্রাচ্যদেশীয় ভদ্রলোক' রণজিৎ-সিংজীর খোঁজে হাজির হন লর্ডস-মাঠে সকাল বেলাতেই, মিডলসেক্স ও সাসেক্সের খেলার শেষ দিনে—খেলা আরম্ভের আগে। অবিলম্বে রনজির দেখা ইনি পেলেন না, কারণ ভোর থেকেই প্রাচ্য ভদ্রলোকটি নেটে আছেন। তারপর খেলা শুরুর ঘণ্টা পড়া-মাত্র তিনি মাঠে ছুটলেন, মধ্যপথে সাংবাদিককে বলে গেলেন, খেলা শেষ হলেই প্রাণখুলে কথা বলবেন। সাংবাদিককে অগত্যা ঘণ্টা-খানেক, কি তারও বেশি সময় ধরে, 'রনজির সুমোহন খেলা দেখতে হল, যখন তাঁর দলের অপর খেলোয়াড়রা একে-একে হার্ন এবং রলিন-এর অসাধারণ ভালো বলে আউট হয়ে ফিরে গেলেন।' রনজিও রলিনের জোর বলে ব্যাটের কোণায় বল লাগিয়ে 'সহজ ক্যাচ' তুলে বিদায় নিলেন [কার্ডাস নিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন, ধন্য আগেকার ক্রিকেট-সাংবাদিকতা, যা সর্বদাই ব্যাটসম্যানের 'সহজ ক্যাচ তুলে বিদায়ের কথা' বলে, কিন্তু বলে না, ওটা ব্যাটসম্যানের দোষে নাও হতে পারে—খুবই সম্ভব, হয়েছে বোলারের বোলিংয়ের গুণে—যা উক্ত উপায়ান্তরহীন ক্যাচ-'দানে' ব্যাটসম্যানকে বাধ্য করেছিল!]—কিন্তু তার আগে যা দিয়ে গেছেন, তাই নিজ দলের জয় সম্ভব করেছিল।

অতঃপর সাংবাদিক রনজির কাছ থেকে সবিশেষ সৌজন্যপূর্ণ 'উত্তর' লাভ করেছিলেন—জেনেছিলেন যে, নামের শেষে 'সিং' থাকলেও রনজি শিখ নন, রাজপুত, তাঁর জন্ম ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ সালে, বর্তমান বয়স প্রায় তেইশ, তাঁর পিতা নবনগরের জামসাহেব ইত্যাদি। এর পরে রনজির খেলাধুলা সম্বন্ধে কথাবার্তা :

"আপনি কি ভারতে স্কুলে পড়ার সময়ে বাল্যে ক্রিকেট খেলেছেন?—হাঁ, তবে উঁচুদরের কিছু নয়। রাজকুমার কলেজে ইংরেজ-শিক্ষকরা ছিলেন, তাঁরা ক্রিকেট খেলতেন।

"তারপর আপনি ইংলণ্ডে এসে খেলতে শুরু করে দিলেন?—হাঁ, তবে অংশত ঘটনাচক্রে। কেম্ব্রিজে যাবার আগে আমি ৬ মাস ইংলণ্ডে কাটিয়েছি। একদিন ট্রিনিটি কলেজ-ম্যাচের একটিতে বদলী খেলোয়াড় হিসেবে আমাকে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হল। ১৮৯২-এর গ্রীষ্মকালের ঘটনা।

"শীঘ্রই আপনি কলেজ-ক্যাপ পেয়ে গিয়েছিলেন, কি বলেন?—হাঁ, ঐ বছরই।

তবে ঐ বছরে আমি কেম্ব্রিজ ব্লু হতে পারিনি, যা হয়েছিলাম পরের বছর, ১৮৯৩ সালে।

"তারপর ঠিক করলেন, সাসেক্সে খেলবেন?—হাঁ। ১৮৯৩ সালে ব্রাইটনে গিয়েছিলাম প্রধানত ঐ উদ্দেশেই, যদিও এই ১৮৯৫-এর আগে প্রথমশ্রেণীর কাউণ্টির পক্ষে খেলতে পারিনি, কারণ আমার জন্ম ইংলণ্ডে নয়, এবং কোনো কাউণ্টিতে অন্ততঃ আগে দু' বছর কাটাইনি।...

"এখন আপনাকে প্রশ্ন করি, ভারতে ক্রিকেটের বিস্তার সম্বন্ধে আপনার মত কি?—ক্রিকেট ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় না হবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। বস্তুতঃপক্ষে তা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। একথা মোটেই সত্য নয়—ভারতীয়রা এত অলস যে, খেলাধুলা করতে চায় না। শারীরিকভাবে সে ইংরেজের অনুরূপ প্রাণশক্তিসম্পন্ন না হতে পারে, কিন্তু ক্রিকেট-খেলার পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রাণশক্তি তার আছে, এবং বেশ খানিক নৈপুণ্যের মান পর্যন্ত সে উঠতে সমর্থ।

"আপনি নিশ্চয় মনে করেন না, আমাদের শ্রেষ্ঠ একাদশ ভারতাগত কোনো দলের দ্বারা কখনো পরাভূত হবে?—না, অতটা নয়, কিন্তু আমি সত্যই মনে করি, আমাদের দেশে এই খেলার ভবিষ্যৎ আছে—এমন-কি সেই ভবিষ্যৎ ক্রমেই বর্তমান হয়ে উঠছে।"

এর পরে সাংবাদিক স্বতঃই ভারতের বিখ্যাত নৈসর্গিক উত্তাপের কথা তুলেছিলেন। উত্তরে রনজি বলেন—না, যতটা শোনা যায় অতটা গরম নয়—দুপুরে দু'-তিন ঘণ্টা একটু কষ্টকর, এই যা। ভারতীয় মাঠের কথা উঠেছিল। ভারতে অনেক সময়ে ম্যাটিং-উইকেটে খেলা হয়। ভালো ঘাসের উইকেট কিভাবে তৈরি করা যাবে তাও রনজি ব্যাখ্যা করে বলেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টাতে ও-বস্তু বানানো সম্ভব। তার জন্য ভালো মাটি চাই, তার উপরে ঘাস তৈরি করতে হবে প্রচুর জল ঢেলে, আবার পিচ ঢেকেও রাখতে হবে রোদ থেকে, যাতে ঘাস জ্বলে না যায়, ইত্যাদি। ইংলণ্ডের কোন্ মাঠ তাঁর পছন্দ—এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন—ক্রমমানে তারা হল—ফেনার, লর্ডস এবং ব্রাইটন। এর পরে রনজির খেলার কথা এসে গিয়েছিল।

"যাদের বিরুদ্ধে খেলেছেন সেইসব বোলারের মধ্যে সবসেরা কে?—ঠিকভাবে বলা শক্ত, অনেকেই ভালো। তবে ফাস্টবোলারদের মধ্যে মোল্ড ও রিচার্ডসনকে আমার সবচেয়ে মারাত্মক মনে হয়। আর ধীর-বোলারদের মধ্যে বিনা দ্বিধায় বলব—পীল।

"আপনার সেরা রানগুলি কি?—কঠিন পিচে অসুবিধার মধ্যে খেলার কথা বলছেন, না-কি সর্বোচ্চ রানের কথা? প্রথম ক্ষেত্রে অক্সফোর্ডের বিরুদ্ধে আমার ১৫৭ এবং সদ্য-সমাপ্ত ইনিংসটি। উভয়ক্ষেত্রেই পিচ জঘন্যভাবে ভাঙা। (সত্যই তাই। নার্সারির দিকে হার্নে একটি ক্ষত পেয়েছিলেন, যার সাহায্যে তিনি প্রায়ই ব্যাটসম্যান ও উইকেটকীপারকে পরাভূত করছিলেন!)।"

সাংবাদিক সংবাদ-হিসাবে এইসঙ্গে জানিয়েছিলেন, র‍্যাকেট, টেনিস, শুটিং ইত্যাদিতেও রনজি পারদর্শী, ফুটবলও খেলতেন, তবে হাঁটুর ব্যথার জন্য বর্তমানে তাতে বিরত।

'ক্রিকেটার' পত্রিকায় এই রচনায় দর্শক-প্রদত্ত রনজির কয়েকটি ডাকনামের

কথাও পাই—তার একটি 'রামস্‌গেট জিমি।' অন্য নামটি দ্রব্যগুণে সরস ও তপ্ত—'রাম-জিন-অ্যান্ড-হুইস্কি।' এইসঙ্গে ঐ সময় পর্যন্ত রনজির চমকপ্রদ ব্যাটিংয়ের হিসেবও ওতে ছিল :

এম-সি-সির সঙ্গে—৭৭ (নটআউট)—১৫০। নটস—২৯-২৭। ল্যাঙ্কাশায়ার—৩৫-৪৬। গ্লস্টার্সশায়ার—১৯-৯। সমারসেট—৯৫-৫৭। মিডলসেক্স—২২-৬৪। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি—৩৮ (নটআউট)-১৫৭। কেন্ট—৩০-৫৮। ইয়র্কশায়ার—৫৯-৭৪। হ্যামশায়ার—৮৩-৪১। মিডলসেক্স—১১০-৭২। মোট—২১ ইনিংস (দুবার নটআউট) ১২৬০ রান, গড় ৬৬˙৩১।

২৭ অগস্ট, ১৮৯৫ অমৃতবাজারে পুনর্মুদ্রিত ডেইলি ক্রনিকলের সাক্ষাৎকার-বিবরণে রনজির ক্রীড়াচরিত্রের চমৎকার রেখাচিত্র ছিল :

"রাজকুমার রণজিৎসিংজীই প্রথম ভারতীয় নন, যিনি প্রথমশ্রেণীর ইংলিশ কাউণ্টি-ক্রিকেটে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু নৈপুণ্যের হিসাবে তিনিই প্রথম, সন্দেহ না রেখে। উইকেটে তাঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে সহজতা ও সৌন্দর্যের নিখুঁত সমাহার, কিন্তু তাঁর কঠিন দক্ষিণ হস্ত বলকে প্রহারে থেঁতলে বাউন্ডারিতে পাঠাতে, কিংবা পরম শিল্পনৈপুণ্যে তাকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে লঙ-লেগে পাঠিয়ে দিতে সদাই প্রস্তুত। লঘু, কমনীয়, নমনীয়, অথচ শক্তিতে সতেজ রণজিৎসিংজী যখন একদৃষ্টে বলকে লক্ষ্য করেন তখন শিকারের উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে তৈরি চিতাবাঘ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। রিচার্ডসনের বিরুদ্ধে তিনি যে-সহজ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলেছিলেন তাতে বোঝা যায়, এখানে এমন একজন খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে, যিনি সাধারণ কাউণ্টি-ক্রিকেটারের চেয়ে বহু যোজন এগিয়ে।"

"কথা বলতে রাজি কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি কিছু বলতে রাজি নন" —এমন রণজিৎসিংজীকে সাংবাদিক "বৃটিশ জনগণের পক্ষে জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন"—রনজির ইংলণ্ডে অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হবে কি-না? প্রথমশ্রেণীর খেলায় তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি সম্বন্ধে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে রনজি বলেন, 'এই মরশুমের আগে তা আমি করতে পারি নি। ১৮৯৩ সালে আমার সর্বোচ্চ রান অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৫৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ নট-আউট। জেন্টলম্যান দলের বিরুদ্ধে (একবার আউট হয়ে) ৫১, এম-সি-সির বিরুদ্ধে ৫৫, সারের বিরুদ্ধে ৩৮। ইউনিভার্সিটিতে পড়বার দ্বিতীয় বছরের সময়ে এ-জিনিস করেছি। ১৮৯৪-তে কিন্তু প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে আরও ভালো করেছি। যদিও আমার সর্বোচ্চ রান হয় মাত্র ৯৪, কিন্তু ১২টি সমাপ্ত ইনিংসে আমার গড় ছিল ৩২। বর্তমান মরশুম অবশ্য আমার খেলার জীবনে সবচেয়ে সাফল্যময়।

"আপনি কি বেশি বল করেন না?—কদাচিৎ করি। তবে মাঝে-মাঝে উইকেট পাই। যেমন লর্ডসে আমি ডাঃ গ্রেসকে ফিরিয়ে দিই, তিনি ১০৩ করার পরে। ঐ অভিনন্দন তিনি প্রত্যর্পণ করেছিলেন আমি ১৫০ রান করার ঠিক পরের বলটিতে আমাকে বোল্ড ক'রে। আমি তাঁকে প্রথম ইনিংসেও নিয়েছিলাম। সব-জড়িয়ে ঐ খেলায় ৬টি উইকেট নিয়েছি।"

[illegible] ইংলণ্ড থেকে অমৃতবাজারে (১০

জ্ন, ১৮৯৫) দীর্ঘ বিবরণ লিখে পাঠান, তার থেকে আমরা জেনে ফেলি, বৃটিশ জনগণ তাদের পার্লামেন্টের ঘটনাবলী বা সীমান্তসংঘর্ষের ব্যাপারেও তত ব্যস্ত নয়, যত ব্যস্ত ক্রিকেট নিয়ে। 'সেজন্য আমার ভারতীয় পাঠকগণ হয়ত জেনে আগ্রহবোধ করবেন, কোনো ইংরেজ নন, একজন ভারতীয়ই, এ-পর্যন্ত এ-বছরের চাম্পিয়ান ক্রিকেটার।' ডিগবি 'সেন্ট জেমস গেজেট' থেকে রনজি-সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন। তারপর জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর যে-বিবরণ তিনি উদ্ধৃত করেন, তার মধ্যে অন্যান্য কথার সঙ্গে এও ছিল :

"কুমার রণজিৎসিংজী চমকপ্রদ খেলা দেখিয়েছেন, প্রথমশ্রেণীর খেলার ইতিহাসে কদাচিৎ সে-জিনিস দেখা গেছে। তরুণ ভারতীয় খেলোয়াড়টি যখন মাঠ তাগ করে যান তখন যে-সংবর্ধনা পেয়েছিলেন, বৃহৎ রানকারী কোনো ইংরাজ তা লাভ করেননি।...শুক্রবার তাঁর মাঠে প্রবেশ করবার সময়ে সাসেক্সের আশা-ভরসাহীন অবস্থা। কিন্তু যথার্থ রাজপুত যোদ্ধার মতো রণজিৎসিং সুদূর আশাকে অধিকার করবার জন্য সাহসী আক্রমণ চালালেন, যার ফল ৭৭ নট-আউট। এটাই দারুণ ব্যাপার—জনৈক ক্রিকেট-লেখকের মতে, 'স্মরণীয় ঘটনা'—কিন্তু পরদিনের ঘটনা স্মরণীয়তর। অল্পাধিক আড়াই ঘণ্টার মধ্যে তিনি ত্রুটিহীন ১৫০ রান করলেন, যেখানে মার্ডক, নিউহ্যাম, বেনান প্রমুখ অভিজ্ঞরা জে টি হার্ন, ও মার্টিনের উচ্চাঙ্গের ধ্বংসাত্মক বোলিংয়ে সহজেই খারিজ হয়ে গিয়েছিলেন।...রনজির ব্যাটিংয়ের মধ্যে যেটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে—তিনি মন্দ বলকে শায়েস্তা করতে কখনো ছাড়েন না। কাট-ই তাঁর প্রিয় মার, স্বচ্ছন্দে যে-কোনো সংখ্যার ফিল্ডসম্যানের মধ্য দিয়ে তিনি বল গলিয়ে পাঠান, ডবলিউ জি গ্রেস পর্যন্ত [ফিল্ডিং-কালে] অন্য সঙ্গী নিয়েও তাদের থামাতে পারেননি। জনৈক লেখকের ভাষা-অনুযায়ী, তিনি তাঁর ক্ষুদ্র তনুদেহকে যে-কোনো দিকে বাঁকাতে, এবং তার দ্বারা বলকে যে-কোনো দিকে পাঠাতে সমর্থ।...শর্ট-স্লিপে তিনি তৎপর মার্জারের মতো প্রস্তুত।"

পরিস্থিতি এখন সম্ভাবনাগর্ভ, সুতরাং কল্পনা বাধাবন্ধহারা। শোনা গেল, উদারনৈতিক ছোকরা রনজি ইলেকশনে দাঁড়াতে চান। ইংলণ্ডের 'ইণ্ডিয়া' কাগজ লিখল, যদি একবার তিনি নির্বাচিত হয়ে পড়েন, কে বলতে পারে, দ্রুত প্রধান-মন্ত্রী হয়ে পড়বেন না—খেলাধুলার যে-রকম ডমডমার সময় যাচ্ছে এখন। পুনার 'মরাঠা' ঐ সংবাদ পরিবেশনকালে ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫, ব্রাইটনের জনৈক কবির রচিত লম্বা একটি কবিতা ছেপে বসল, যাতে রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতা লিখিত হবার বহু আগেই তার ভাব এসে গিয়েছিল। 'সাগরজলে সিনান করি' লণ্ডন বসেছিল, রাজকুমার তাকে জয় করতে চলে এলো সমুদ্রপথে ইত্যাদি। কবিতাটি মোটেই ভালো লেখা হয়নি, উচ্ছ্বাসের কবিতা তা হয়ও না, কিন্তু 'প্রিন্স অব ক্রিকেটের' গুণগান-যে যথেষ্ট করা হয়েছিল সহজেই বুঝতে পারি, বিশেষত কবি যখন 'মোদের গরব মোদের আশা...মোদের মহামনা সম্রাট' ডাঃ গ্রেসের পাশেই এই বিদেশী কুমারটিকে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

এই অবস্থায় অমৃতবাজার না-বলে পারেনি (৩১ অগস্ট, ১৮৯৫), 'যদি ডাঃ গ্রেস ইংলণ্ডের একনম্বর ক্রিকেটার হন, তাহলে দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত রণজিৎসিংজীর। বয়স যখন তাঁর খুবই কম তখন কে জানে, তিনি কালক্রমে ডাঃ গ্রেসের

জায়গায় উঠে পড়বেন কি-না?'

উঠে পড়বেন কি—উঠে পড়লেন—পরের বছরই! মর্যাদায় না হলেও রান-সংখ্যায় অন্তত। ইংলণ্ডে প্রথমশ্রেণীর খেলায় তাঁরই সর্বাধিক রান, ঐ বছর—২৭৮০। এর দ্বারা ডাঃ গ্রেসের ১৮৭১ সালে করা ২৭৩৯ রানের রেকর্ড ভাঙলেন—যা পঁচিশ বছর ধরে বজায় ছিল। এই বছরই তিনি সম্ভবত তাঁর জীবনের সর্বোত্তম খেলা খেলেছিলেন—অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে—নিজ জীবনের প্রথম টেস্টখেলায়—যার বিষয়ে পূর্ববর্তী রচনায় যথেষ্ট লিখে এসেছি। এই খেলাটিই রনজিকে রূপকথার নায়ক করে দেয়। তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি, মাতামাতি। কেম্ব্রিজে তাঁকে বিরাট ব্যাঙ্কোয়েট দেওয়া হয়—তার গৌরবপূর্ণ বিবরণ ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়, এবং তা ভারতীয় সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হয়ে এদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। রনজির খ্যাতিকে কিভাবে ভারতের রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা নিয়ে উত্তেজিত মস্তিষ্কে সম্পাদকীয়ের পর সম্পাদকীয় লিখতে থাকেন ভারতীয় সম্পাদকেরা। (বিষয়টি নিয়ে আমি 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (২য়) গ্রন্থে লিখেছি)। ভারতের সাম্রাজ্যপ্রহরী 'ইংলিশম্যান' কাগজ-পর্যন্ত বর্ণাভিমান ভুলে উদারভাবে লেখে—রনজিকে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম টেস্টখেলার সময়ে বাদ দেওয়া ঠিক হয়নি।

এই বছরের দুটি সাক্ষাৎকার-বিবরণের কিছু অংশ উপস্থিত করতে পারি: 'স্ট্রান্ড ম্যাগাজিন' থেকে অমৃতবাজারে উদ্ধৃত (৬ অক্টোবর ১৮৯৬) সাক্ষাৎ-বিবরণে, চমকপ্রদ কথাবার্তা ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসই ছিল। 'মাঝারি আকারের চেহারা, বাহ্যত শক্তসমর্থ নন, কিন্তু চামড়ার তলায় পেশীতে আছে প্রচণ্ড শক্তি, ইস্পাতের মতো তা কঠিন এবং আবেগতীব্র'—এই রণজিৎসিংজী নিজের বাল্য-ক্রিকেট সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, ইতিপূর্বে তা অন্যত্র বলেছেন বলে আমাদের জানা হয়ে গেছে। এখানে রনজি স্কুলে পড়বার সময়ে কি ধরনের ক্রিকেট-ম্যাচ খেলতেন, তার কিছু বেশি বিবরণ দিয়েছেন। প্রাক-টিশের সময়ে বালকেরা দেশীয় পোষাকেই খেলত, যদিচ রনজিদের স্কুলে কেবল রাজারাজড়াদের ছেলেরাই পড়ত। প্রফেশন্যাল কোচ ছিল না, খেলা শিখতে হোত নিজেদেরই, ইংরেজ-শিক্ষকরা একটু-আধটু দেখিয়ে দিতেন এই পর্যন্ত। ইংলণ্ডে এসে কলেজে পড়ার সময়ে যখন ক্রিকেট ধরলেন তখন 'অনেক-কিছু ভুলতে হল' অনেক-কিছু শেখার সঙ্গে। শিক্ষা নিয়েছিলেন সারের পেশাদার খেলোয়াড় শার্প, রিচার্ডসন, ওয়াটস্ প্রভৃতির কাছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ের ক্রিকেট নিয়েও রনজি আলোচনা করেছিলেন। সেখানকার ব্যাটিং ও ফিল্ডিং কাউন্টি-ক্রিকেটের সমমানের, কিন্তু বোলিং নয়, কারণ অনেক উঁচুদরের পেশাদার বোলার এসে খেলা শিখিয়ে যান, যার জন্য বোলিংয়ের ঝঞ্চাট নিতে চায় না ছাত্ররা। তবে কেম্ব্রিজের তুলনায় অক্সফোর্ডে বেশি ভাল বোলার তৈরি হয়, যেহেতু অক্সফোর্ডের ফেনার মাঠের পিচ বোলারদের সাহায্য করে। 'বোলাররা সেখানে প্রাকটিশের সময় অনেক বেশি সাফল্যলাভ করে, সেজন্য তাদের মনোভঙ্গ হয় না।' কাউন্টি-ক্রিকেটের বিশেষ প্রশংসা রনজি করেন। তাঁর মতে সারে সেরা

দল, তবে ভাল উইকেটে। আর সর্বশ্রেণীর উইকেটে ইয়র্কশায়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সারে-দল থেকে রিচার্ডসনকে সরিয়ে নিলে সে নেবে যাবে, ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে মোল্ডকে সরিয়ে নিলেও তাই ঘটবে, কিন্তু সেকথা বলা যাবে না ইয়র্কশায়ার সম্বন্ধে—তাদের ভাঁড়ারে পুঁজি অনেক এবং তারা সর্বদিকে এমন সম্পন্ন যে, কোনো-একটি ক্ষতিতে ভেঙে পড়বে না।

'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে'র প্রতিনিধির সঙ্গে রনজির সাক্ষাৎ-সংবাদের পুনর্মুদ্রণ করেছিল সাহেবি কাগজ 'বম্বে গেজেট', ২০ অক্টোবর, ১৮৯৬। তার মধ্যে রনজির ক্রিকেট-জীবনের সূচনা, ঠিকভাবে বলতে গেলে, তাঁর সেঞ্চুরি-কীর্তির সূচনা সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় খবর ছিল। সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন —আপনি কি আপনার প্রথম সেঞ্চুরি কখন, মনে করতে পারেন ? রনজি বললেন, হুঁ, আমি আমার রেকর্ড সহজেই ভুলে মেরে দিই। খবরের কাগজগুলি আমার থেকে ও-ব্যাপারে বেশি জানে। তবে মনে পড়ছে, ১৮৯২-এর আগে তিনটি সেঞ্চুরি করেছি—ভারতে দুটি, ১৮৮৭ সালের শেষের দিকে, এবং ইংলণ্ডে ১৮৮৭ সালের শেষের দিকে, এবং ইংলণ্ডে ১৮৯১ সালে একটি, স্যাফ্রন ওয়ালডনে। সেটিই ইংলণ্ডে প্রথম সেঞ্চুরি। এই সময়ে সেখানে উপস্থিত রনজির এক বন্ধু জানিয়ে দিলেন, সেক্ষেত্রে এঁর সেঞ্চুরির সংখ্যা ৪৩, ৪০ নয়, যা সাধারণত বলা হচ্ছে।

এই সাক্ষাৎকারে ভারতীয় ক্রিকেট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রনজির কণ্ঠে যেন একটু দেশপ্রীতির সুর লেগেছিল। তিনি বলেন, ক্রিকেট সম্বন্ধে ভারতে আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। কিন্তু পেশাদার খেলোয়াড়রা না থাকায় ইংলণ্ডের পর্যায়ে ওঠা কঠিন হবে। 'তবে ইংরেজ খেলোয়াড়দের সম সুযোগ দিলে আমার দেশবাসী আপনারা যে-ক্রীড়ামান এখানে সৃষ্টি করেছেন, তাতে কেন পোঁছবেন না তার কারণ দেখি না।' সাংবাদিক আপত্তি তুলে বলেন, রনজি এক্ষেত্রে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণার বিরোধিতা করছেন। রনজি বলেন—'আমাদের জনগণ উত্তম ক্রিকেটার হবার পক্ষে বেশি চঞ্চলমন—আপনি সম্ভবত এই সমালোচনার কথাই বলছেন। জানি, একথা বলা হয় যে, আমরা ভাল বোলার হতে পারব, কদাপি প্রথমশ্রেণীর ব্যাটসম্যান নয়।' রনজি কথা বাড়াননি, কিন্তু সাক্ষাৎকারী সাংবাদিকের বক্তব্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ যে স্বয়ং রনজি, সেকথা উক্ত সাংবাদিক সহাস্যে স্বীকার না করে পারেননি। রনজি নিজের সম্বন্ধে এইটুকু বলেন, 'বোধহয় অধিকাংশ ভারতীয়ের তুলনায় স্বভাবে আমি কম স্পর্শকাতর। ইংলণ্ডে আমার অবস্থান আমার স্পর্শকাতরতা আরও কমিয়ে দিয়েছে। আমাদের দেশের মানুষ খুব ছোটখাট ব্যাপারেও আদবকায়দা ও আনুষ্ঠানিকতার চর্চা করে—ক্রিকেট-মাঠ কিন্তু তার অনুকূল স্থান নয়।"

বম্বে গেজেটের এই উদ্ধৃত রচনার গোড়ায় রনজির বিষয়ে সাধারণ কিছু মন্তব্য ছিল। "সম্ভবত তাঁর তুল্য জনপ্রিয়তা এ-পর্যন্ত কোনো ক্রিকেটার লাভ করেননি। জনসাধারণের কল্পনাকে তিনি যেন ঝঞ্ঝাবেগে লুণ্ঠন করে নিয়েছেন।...মাত্র আট বছর আগে যিনি দেশীয় পোষাক পরে ঘুরতেন তিনি এখন যেভাবে অ্যাংলো-স্যাক্সন খেলাটি অধিগত করেছেন, তার মধ্যে বিচিত্র কিছু-একটা আছে—তা অত্যাশ্চর্যভাবে, অনিবার্যভাবে, মনোহারী।"

রনজির প্রাথমিক ক্রিকেট-জীবনের আরো কোনো-কোনো সংবাদ আমরা সংবাদপত্র থেকে পেয়ে যাই, বিশেষত বড় ক্রিকেটের স্বপ্ন কিভাবে তাঁর মনকে প্রথম আচ্ছন্ন করেছিল, তার বিবরণ উপাদেয়। অমৃতবাজারে (১৫ অগস্ট, ১৮৯৬) এবং হিন্দু পেট্রিয়টে (১৪ অগস্ট) ঐ বিবরণ বেরিয়েছিল—ইংলণ্ডের 'ওভারল্যাণ্ড মেল' থেকে সংকলন ক'রে। ১৭ বছরের গুজরাটি রাজকুমার বছর-সাতেক আগে সদ্য ইংলণ্ডে এসেছিলেন আরও দুটি ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষালাভের জন্য—সেই সময়ের ঘটনার কথা ডবলিউ ক্যাম্বেল পারীব্রিজ বার্মিংহাম গেজেটে লিখেছিলেন—'ওভারল্যাণ্ড মেল' সেটিকে উদ্ধার করেছিল। পারীব্রিজ, রাজকুমার ও তাঁর সঙ্গীদের প্রথম বড় ক্রিকেট দেখার অভিজ্ঞতা এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

"তখনো তাঁর প্রথম ক্রিকেট-ব্যাট কেনা হয়নি—এবং ইংলণ্ডে অন্তত তিনি কোনো খেলা দেখেননি। ওভালে সারের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার খেলা দেখতে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল তাঁর—সেই উন্মাদনার জাগরণের জন্য—যা অত্যাশ্চর্য ফলোৎপাদন করেছে পরবর্তীকালে। রনজির সমস্ত জীবনের গতি পরিবর্তিত করে দিয়েছে ঘটনাটি। আমি ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী, ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ঘটনাটি নিয়ে, সপ্তাহ-তিনেকও হয়নি, কথাবার্তা বলেছি অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের সঙ্গে। ১৮৮৯ সালের সফরের সময়ে অস্ট্রেলিয়ার গোড়াকার একটি খেলা—সারের সঙ্গে। রাজকুমারের শিক্ষক খেলাটি দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব করলে তা তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে গৃহীত হল। সারের সেক্রেটারির কাছে একান্তে কুমারের পরিচয় দেবার পরে তাঁদের প্যাভিলিয়নের উপরে বসবার আসন দেওয়া হল। খুবই সুবিবেচনা দেখিয়ে মিঃ অ্যালকক অস্ট্রেলিয়া-দলের কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়কে আনলেন কথাবার্তা বলার জন্য, যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন ম্যাকডোনেল, স্কট এবং সি এইচ এস ট্রট—বর্তমানে যিনি ক্যাপ্টেন। গৌরবময় ক্রিকেট খেলা হয়েছিল সেই দিনটিতে—সারে-দল অপূর্ব বোলিং ও ফিল্ডিং করেছিল, অপরপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার সি টি বি টার্নার সমস্ত আক্রমণ অগ্রাহ্য ক'রে ১০৫ রান করেছিলেন। অর্থাৎ মহাবীরগণের সংগ্রাম। আর কী উন্মাদনা তাতে! ভারতীয়দের স্বভাবগত ভাবদমনের অভ্যাস সত্ত্বেও দেখা গেল, তারা আনন্দে আত্মহারা! সেই দিন থেকেই রনজির স্থির সিদ্ধান্ত—তিনি ক্রিকেটার হবেন। বস্তুত ঐটিই সূচনার প্রহর।"

ক্যাম্বেল পারীব্রিজের স্মৃতিকথা উদ্ধৃত করার পরে ওভারল্যাণ্ড মেল মন্তব্য করেছিল :

"ক্রিকেটের রোমান্সে যুক্ত হল আর একটি পরিচ্ছেদ। সাত বৎসর আগেকার এক অপ্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়—আমাদের জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনে অপরিচিত বিদেশী আগন্তুক—তিনিই পরে হয়ে উঠলেন বিরাট এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ইংরাজ-দলের হীরো—এবং তিনি সে-ই অস্ট্রেলিয়ান-ক্যাপ্টেনের বলকে পিটিয়ে মাঠের বাইরে পাঠাতে লাগলেন যিনি ১৮৮৯ সালে ওভালের গ্রাণ্ডস্ট্যাণ্ডে বসে সদয়ভাবে তাঁকে ক্রিকেটের প্রাথমিক জ্ঞান দান করেছিলেন।"

রনজির স্টাইলের উপরে এই সময় থেকে আলোচনা আরম্ভ হয়ে যায়।

কেম্ব্রিজ-ব্যাঙ্কোয়েটের সময়ে ডাঃ বার্টলার ('মাস্টার অব ট্রিনিটি কলেজ') সকৌতুকে বলেছিলেন—রনজির একটি বিশেষ মার আছে, যা বলকে লেগের দিকে বাউন্ডারিতে খেদিয়ে দেয়—সেটি বোলারদের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার বিষয়-বস্তু। বলা বাহুল্য সুবিখ্যাত রনজি-লেগ-গ্লান্স সম্বন্ধেই এই মন্তব্য। 'ইন্ডিয়ান নেশন' (৮ জুন, ১৮৯৬) লন্ডনের 'ডেইলি ক্রনিকল' থেকে রনজির ব্যাটিংয়ের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছিল। শেফিল্ড-পার্কে লর্ড শেফিল্ডের দলের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রনজির খেলার সূত্রে মন্তব্য করা হয়:

"ডাঃ গ্রেসের খেলাকে যদি 'গ্রেট' বলতে হয়, তাহলে রনজিৎসিংজীর অনবদ্য ইনিংসটির বিষয়ে আমরা কী বলব? ভারতীয় রাজকুমার প্রথমাবধি চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলেছেন। এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট উইকেটে অবস্থান-কালে বোলিং সম্বন্ধে কোন্ ব্যবহার করবেন তা নিয়ে তাঁকে কোনোপ্রকার চিন্তায় পড়তে হয়নি। সদাই আক্রমণ যেন তাঁর স্বাভাবিক রীতি। অপর ব্যাটসম্যানেরা যখন থরহরি হয়ে পরাভূত হচ্ছেন, তখন তাঁর ঐ খেলা উত্তেজিত দর্শকদের উল্লাসধ্বনিতে প্রাপ্য সংবর্ধনা লাভ করেছিল। বিরাট ইনিংস খেললেন তিনি, যা সর্বোচ্চ শ্রেণীর ব্যাটসম্যানরূপে তাঁকে চিহ্নিত করল।... ছিপছিপে লঘু খাটো চেহারা সত্ত্বেও নিশ্চয় তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি, সেই সঙ্গে কব্জির জোর। লাবণ্যের মূর্ত বিকাশ তাঁর ক্রীড়ারীতি। কঠিনতম মার দেন বাহ্যত কোনো চেষ্টার লক্ষণ না দেখিয়ে। ক্রিকেট-মাঠে ডবলিউ জি গ্রেস জনপ্রিয় চরিত্র—ছিলেন আছেন থাকবেন—কিন্তু ক্রিকেটারদের মধ্যে ভারতীয় রাজকুমারের অনুরাগীর সংখ্যা অধিকতর কিনা ভাববার বিষয়।"

লন্ডনের 'ইন্ডিয়া' পত্রিকায় রনজি-স্টাইলের আর এক বর্ণনা (বেঙ্গলীতে উদ্ধৃত, ২৯ অগস্ট, ১৮৯৬):

"তাঁর স্টাইল সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে বলা যায়, তা হল—গতির কবিতা। কতক-গুলি মার এককথায় অপূর্ব। যেমন দ্রুতগতি, তেমনি সূক্ষ্ম—ভারতীয় যাদু-করের চকিত চমকিত অথচ পরিমাপিত কৌশলের মতোই অভ্রান্ত।...রনজি জানেন, তাঁর ইচ্ছায় কোথায় যাবে বলটি—তাঁর চোখ ও হাত এমনই এক তারে বাঁধা। অধিকাংশ ইংরেজ-ব্যাটসম্যানের চেয়ে দেরিতে তিনি মারেন। বলের বাঁক শেষ হয়ে যাবার পরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে তাকে নিয়ে খেলবার স্বাধীনতা তিনি উপভোগ করতে পারেন। তাঁর শরীরের দু'-এক ইঞ্চির ব্যবধানে বল ছুটে যাচ্ছে অথচ তিনি অবিচলিত দাঁড়িয়ে আছেন—দেখে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে অপার্থিব রহস্যময় হয়ে দাঁড়ায় যখন তিনি মাথা-উঁচু বলকে কাঁধের কাছ থেকে পাঠিয়ে দেন লেগে। অন্য কেউ হলে মাথা বাঁচানো ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না। তারপর লেগের দিকে তাঁর আধা-গ্লান্স ও আধা-পুশ্-জাতীয় মারটি—ওর থেকে কার্যকর কোন্ মার সম্ভব? এমন কি পয়েন্টের সামনে দিয়ে তাঁর সুন্দর কাট—কিংবা ছন্দোময় হস্ত ও কমনীয় কব্জির সাহায্যে লাবণ্যময় ভঙ্গিতে স্লিপের মধ্য দিয়ে তিনি দ্রুত মাটি-ঘেঁষা যে-সব লেট-কাট করে থাকেন—তারাও কার্যকারিতায় ঐ মারটির সমতুল নয়। অথচ প্রিন্স রনজিৎসিংজীর বয়স এখনো চব্বিশ হয়নি।"

টাইমস অব ইন্ডিয়া 'ওয়ার্লড' পত্রিকা থেকে রনজির-স্টাইল সম্বন্ধে অনেক

কথাই তুলেছিল (১৫ অক্টোবর), তার মধ্যে পাই :

"প্রত্যেকেই জানেন, রনজি কিভাবে তৎপর পদে প্যাভিলিয়নের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন, উইকেটের দিকে অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে যান। কিন্তু উইকেটে পেঁছবার পরে তাঁকে পুরোপুরি চোখে ধরে রাখা সহজ নয়—তাঁর কোনো-কোনো মার এমনই দ্রুত। ভারতীয় ব্যক্তিটির শকুনের চোখ আর টোলেডো-ইস্পাতের মতো কব্জি—সেই সঙ্গে ঠিক সময়ে বল মারার সর্বাঙ্গসুন্দর শিল্প-কৌশল। অপরে তাঁর থেকে জোরে ব্যাট চালাতে পারেন...কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে ব্যাট থেকে বল ছুটে যায় 'চিন্তার থেকেও দ্রুতবেগে'—যে-কথা প্রাচীন লেখক নঈরেন বলেছেন বেল্ডহ্যামের কাট্ সম্বন্ধে।...ইচ্ছানুরূপ জায়গায় বল পাঠানোর ব্যাপারেও তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য—এই চারু কৌশলের ক্ষেত্রে তিনি ডাঃ গ্রেসের শ্রেষ্ঠ রূপের সমতুল। যে-বলকে দলে-দলে প্রথমশ্রেণীর ব্যাটসম্যান একমাত্র কভার-পয়েন্টেই পাঠাবে, অন্য কোথাও পাঠাতে পারবে না, তাকেই এই সামন্তরাজ ওখানকার ফিল্ডসম্যানের নাগালের অন্ততঃ এক ফুট দূর দিয়ে চালিয়ে দেবেন, ধরা-ছোঁয়া অসম্ভব ক'রে, সে ফিল্ডসম্যান স্বয়ং বিগ্রস্ কিংবা পুণ্যস্মৃতি চিরধন্য ভেরনন রয়লি, যিনিই হোন, কিছু যাবে-আসবে না। এই সূক্ষ্ম কৌশলের ব্যাপারে রনজি সম্ভবত তাঁর প্রাচ্য কাঠামোর কাছেই ঋণী।"

এর পরে, লণ্ডন টাইমস, যত রক্ষণশীল কাগজই হোক, নিম্নের মন্তব্য না ক'রে পারেনি : ('রইস অ্যাণ্ড রায়ত' কাগজে ২৬ সেপ্টেম্বর উদ্ধৃত) :

"আমরা দেখেছি, বর্তমান বৎসরে ভারতীয় রাজকুমারের দেহাধারে আবির্ভূত হয়েছে এক গৌরবান্বিত নূতন তারকা—না, নূতন সূর্য।"

আর সুবিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রের পত্রিকা 'পাঞ্চ' বারবার হাসতে-হাসতে নমস্কার করল চিত্রে ও কবিতায় 'নূতন সূর্যকে।' টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় ২০ অক্টোবর উদ্ধৃত পাঞ্চের কবিতার শেষ কয়েক লাইন :

Punch rings thee in with merry chimes,
Star risen in far-off Injy!
'England has need of thee' sometimes—
Slogging Prince Ranjitsinghji!

অন্য একটি কবিতায় হাসির পাঞ্চ খুশিতে বিহ্বল হয়ে যে-কথা লিখেছিল ('রইস অ্যাণ্ড রায়ত' এবং অন্যান্য ভারতীয় কাগজে উদ্ধৃত), তা যে সত্যই কোনোদিন লিখিত হয়েছিল বিশ্বাস হয় না। এই দীর্ঘ কবিতাটিতে রনজির লেট-কাট সম্বন্ধে বলা হয়, 'সৌন্দর্যের প্রশান্ত সৃষ্টি, আনন্দের স্বপ্ন, শিল্পের চূড়ান্ত আদর্শ, নিখুঁত আঙ্গিকের কুহক।' কবিতাটির শেষাংশের মূল ইংরেজি রূপ আগে উপস্থিত করেছি। কাজচলা গোছের অনুবাদে বক্তব্যটা এই দাঁড়ায় :

যখন এমন কোনো খেলোয়াড়কে চাই—
যিনি একই সঙ্গে প্রদীপ্ত এবং ধীর,
শ্যেনচক্ষু, সিংহহৃদয় অথচ শান্তস্বভাব,
যিনি হবেন ম্যাকলারেন ও গ্রেসের সমন্বয়,
যাতে থাকবে দ্রুসবেরী-ধরনের ন্যায়েতু-কায়দা

কিংবা স্টভার্ড ও উইনিয়ার্ডের ঝলক,
এবং সারের সাহসী বব-এর ধৈর্য—
তখন—আগচ্ছ রণসিংহ, ক্রিকেটস্য কৃষ্ণকুমার।
এসো এসো, রনজি এসো,
ক্রিকেটের ব্ল্যাকপ্রিন্স,
শুরু করো খেল্ ভাই!

১৮৯৬ সালে, রনজি-পূর্ণিমার সন্ধ্যালগ্নে, অপ্রাকৃতিক ব্যাটিংয়ের সৌন্দর্য দেখে যখন আনন্দে অপ্রকৃতিস্থ ইংরাজেরা, তাদের সংবাদপত্রের অক্ষরগুলো পুলকে নাচিছে পাতে-পাতে, তখন সেই মাতামাতির সময়ে যদি অমৃতবাজারের লণ্ডন-সংবাদদাতা নিম্নের কথাগুলি লিখে পাঠান (২৩ অক্টোবর), সত্যই কি কিছু অন্যায় করেন?—

"ঠিক বর্তমানের ইংলণ্ডে সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ মিঃ গ্লাডস্টোন বা লর্ড সলস্‌বেরী নন—তিনি নন্দিত বন্দিত প্রিন্স রনজিৎসিংজী।...এই মরশুমে তিনি সকল ক্রিকেটারকে ভূপাতিত করে এগিয়ে গেছেন। এই তরুণ অপূর্ব ভারতীয়টি কেবল যে প্রথমশ্রেণীর খেলায় ২৮৭০ রান করে সর্বাধিক রানের রেকর্ড করেছেন (সর্বোচ্চ ১৭১ নটআউট; ৫৫ ইনিংস খেলে গড় ৫৭৷), তাই নয়, তিনি প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে এক মরশুমে সর্বাধিক রানের রেকর্ডও করেছেন। ১৮৭১ সালে ২৭৩৯ রান করে ডাঃ গ্রেস যে-রেকর্ড করেছিলেন, তাকে পরে তিনি বা অন্য কেউ রনজি আবির্ভূত হবার আগে ভাঙতে পারেন-নি। আমি এই মরশুমেই লর্ডসে রনজির খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। যখন তিনি প্যাভিলিয়ন থেকে উইকেটের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন কুড়ি হাজার কণ্ঠ যে-ঘোর আনন্দনিনাদে বিদীর্ণ হয়েছিল, তার কথা কখনো ভুলতে পারব না।...আমার সামনে এখন ডজন-খানেক নামী সংবাদপত্র পড়ে আছে, সেগুলিতে রনজি-প্রশস্তিপূর্ণ সম্পাদকীয়ের পর সম্পাদকীয়। রনজি যদি পার্লামেন্টে প্রবেশে ইচ্ছুক হন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার দুর্ভাগ্য আমি গ্রহণ করতে চাইব না। এখন বিয়ে করতে চাইলে তিনি ইংরাজ অভিজাত পরিবার থেকে শত-শত কন্যা পেয়ে যাবেন।"

পরের বছর ১৮৯৭ সালে রনজিকে কিছুটা নীচে নামতে হল, কেননা নিয়মিত অলৌকিক করা কঠিন বিশেষতঃ যাদুকরকে যদি রোগে ধরে। এই বছর হাঁপানিতে ভুগেছেন রনজি। শেষের দিকে খেলতে পারেননি, ১৯৪০ রান ক'রে মোট রানের ব্যাপারে নেমে গিয়েছিলেন পঞ্চম স্থানে, যদিও সে-অবধি সর্বোচ্চ রান ২৬০ করেছিলেন লর্ডসে এম-সি-সি'র বিরুদ্ধে।

রনজি কিন্তু মরশুম শুরু করেছিলেন পতাকা উড়িয়ে—ব্যাধির প্রকোপ যখন যথেষ্ট হয়নি। আর বোলারের উপরে ব্যাটসম্যানের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে আর্তনাদ তখনি উঠতে আরম্ভ করেছিল। অভিযোগ করা হল, ব্যাটসম্যানের পিচ তৈরি করা হচ্ছে। স্টেটসম্যানের বিলাতী সংবাদদাতা এ-সম্বন্ধে যা লিখে পাঠালেন, (১৩ জুন, ১৮৯৭) তার মধ্যে ক্রিকেট-ইতিহাসের পক্ষে দরকারী কতকগুলি কথা আছে।

"ক্রিকেট-মরশুমের এখনো তিন সপ্তাহ কাটেনি, এরই মধ্যে অস্বাভাবিক বেশি রানের ছড়াছড়ি চতুর্দিকে। দুশোর উপরে ব্যক্তিগত রান করেছেন— প্রিন্স রণজিৎসিংজী, মিঃ ডিক্সন, মিঃ এন এফ ড্রুস, এবং অ্যাবেল। শত বা শতাধিক রানকারীদের মধ্যে আছেন প্রিন্স রণজিৎসিংজী-সহ তেরো জন।... যত বছর যাচ্ছে ততই যেন বলের উপরে ব্যাটের প্রাধান্য বাড়ছে। ১৮৮৮ সালে যেখানে গোটা মরশুমে প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে মাত্র ২৮টি সেঞ্চুরি হয়েছিল, সেখানে এই মাসে ১৪টি খেলায় সেঞ্চুরি হয়েছে ১৭টি। বস্তুত এখন সবই যেন ব্যাটসম্যানের পক্ষে—উন্নত পিচে ভালো আবহাওয়ায় বোলারের দুঃখদিন কাটে মাঠে। অথচ এই পটভূমিকায়, রাউন্ডআর্ম বোলিং যখন সত্তর বছর আগে লিলি-হোয়াইট কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল, তখন তার বিরুধে যে-সমালোচনার ঝড় উঠেছিল, তা কী কৌতুকজনক বোধ হয়। [আগে আন্ডারহ্যান্ড বল দেওয়া হোত। মহিলাগণের ফাঁপানো পোষাকে হাত বেধে গিয়ে অসুবিধা হোত বলে রাউন্ডহ্যান্ড বল দেওয়া চালু হয়।] তখনকার কালের ক্রিকেট-লেখক মিঃ ড্যান্‌লসন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—এর ফলে কেবল রানের সংখ্যা কমে যাবে তাই নয়, পয়েন্ট বা স্লিপে বল কাট্‌ করা প্রায় হবে না, সামনে ড্রাইভও নয়।

"এই সপ্তাহের বিস্ময়কর খেলা—এম-সি-সি'র হাতে শক্তিশালী ল্যাঙ্কাশায়ারের সুনিশ্চিত পরাজয়—এম-সি-সি প্রথম ইনিংসে মাত্র ১২৬ রানে আউট হওয়া সত্ত্বেও। এর মূলে আছে প্রিন্স রণজিৎসিংজীর অনবদ্য খেলা যিনি দ্বিতীয় ইনিংসে নিখুঁত রীতিতে খেলে ১৫৭ রান করেছিলেন—এমন খেলছিলেন যে, স্বচ্ছন্দে আরও চালিয়ে যেতে পারতেন যদি-না রান-আউট হয়ে যেতেন। নিঃসন্দেহে তাঁর এই খেলা কয়েকদিন আগে এম-সি-সির বিরুদ্ধে তাঁর ২৬০ রানের বিশাল ইনিংসের চেয়ে উঁচুদরের শিল্পকৌশলপূর্ণ। বিচিত্র এই, রণজিৎসিংজী ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে পূর্ব-অবতরণে ১০০-এর বেশি রান করেছিলেন, এবং সাসেক্সের পক্ষে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে ফিরতি-ম্যাচে করেছিলেন ১৬৫। আরও স্মরণ করা যায়, ওটিই সাসেক্সের পক্ষে একাদিক্রমে তিনি যে-তিনটি সেঞ্চুরি করেছিলেন তার প্রথমটি—একই সপ্তাহে তিনি চাম্পিয়ান কাউন্টি ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে ১০০ এবং ১২৫ নটআউট করেন। গতকাল পর্যন্ত তাঁর অ্যাভারেজ ৮১, যখন প্রত্যেকেই দুঃখের সঙ্গে দেখলেন, তিনি সারের বিরুদ্ধে খেলায় কোনো রান করার আগেই ব্রুকওয়েলের বলে বোল্ড হয়ে গেলেন। একটি অদ্ভুত ঘটনা হল, যার কথা রণজিৎসিংজীও সাম্প্রতিক এক ইন্টারভিউয়ের সময়ে বলেছেন, সারের বিরুদ্ধে তাদের মাঠে তিনি উল্লেখযোগ্য কোনো রান করতে পারেননি।"

১৮৯৭-৯৮ সালে এই স্টডার্ডের দলের সঙ্গে যখন রনজি অস্ট্রেলিয়া-সফরে গেলেন, তখনো তাঁকে বেশ খানিক বেঁধে রাখল মন্দ স্বাস্থ্য, কিন্তু সম্পূর্ণ বাঁধতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ায় সেবার ইংলন্ড-দলের খেলা আশানুরূপ হয়নি, যদিও কাগজে-কলমে দল খুবই শক্তিশালী। পাঁচটি টেস্টের মধ্যে ইংলন্ড কেবল প্রথম টেস্টে জিততে পেরেছিল। অসুস্থতা সত্ত্বেও রনজি অদ্ভুত খেলেছিলেন, সেই-সঙ্গে এ সি ম্যাকলারেনও। কিন্তু বাকি আটজন 'চমৎকার ব্যাটসম্যানের' শোকা-

টেস্টম্যাচ-সমেত সকল খেলাতেও তাই—গড় ৫৪·৮৮। টেস্টম্যাচে কিন্তু ম্যাক-লারেন তাঁর উপরে থাকেন, যাঁর গড় ছিল ৫৪·২২—রনজির ৫০·৭৭।

রনজির অপেক্ষাকৃত ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবাদপত্রে বিবরণ স্বতঃই কিছু কম হয়েছিল কিন্তু 'ভ্যানিটি ফেয়ার' থেকে 'গুজরাটি'তে সংকলিত (১৪ নভেম্বর, ১৮৯৭) এই কথাচিত্রটি নিশ্চয় নিন্দনীয় নয়:

"ছিপছিপে, একেবারে ছোট্ট মানুষটি—মাঠে তাঁর সক্রিয়তা ক্ষেত্রবিশেষে চিতাবাঘের কথা মনে পড়ায়। মাঠের বাইরে কিন্তু আগোছালো, ক্রিকেট-ভিন্ন অন্য এনগেজমেণ্ট প্রায়ই ভোলেন। ধূমপান করেন না, মদ্যপানও নয়। যদিচ চূড়ান্ত স্ফূর্তির পার্টি দেন, তথাপি দাবি করেন, নিজেকে 'খাড়া' রাখতে পারেন।... ভ্রমণের সময়ে প্রত্যেক স্টেশনে খোঁজ নেন—সেখানকার খেলাধুলোর ব্যবস্থা কি রকম? অত্যন্ত উদার, সর্বদাই আতিথ্যদানে প্রস্তুত, উত্তম গল্প বলবার বিচিত্র-মধুর পদ্ধতি আয়ত্তে।...প্রচণ্ড উগ্র মেজাজ, যাকে সুস্পষ্ট সামর্থ্যের সঙ্গে সংযত রাখেন। জনসাধারণ তাঁকে বন্দনা করে।"

অস্ট্রেলিয়ায় রনজির খেলার উপরে 'ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটারের' নিম্নের মন্তব্যে ১৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৭) তাঁর সাফল্যের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে:

"অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-মাঠে প্রিন্স রণজিৎসিংজীর কণ্ঠে নতুন বিজয়মাল্য দুলেছে। চ্যাম্পিয়ানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি নৈরাশ্যজনক টেলিগ্রামের পরে রয়টার তৃপ্তিকর সংবাদ পাঠিয়েছে—সিডনির মাঠে তিনি পূর্ণ প্রভায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। ৩৫১ রান করার আগে ইংলণ্ড-দলকে অস্ট্রেলিয়ানরা খারিজ করতে পারেনি—ঐ রানের মধ্যে রাজকুমার করেছেন ১৭৫। অপূর্ব কীর্তি। অস্ট্রেলিয়ানরা তা দেখে উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে যাবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।"

দুই মহাদেশের উপরে জয়পতাকা প্রোথিত ক'রে রাজকুমার ভারতে এলেন ১৮৯৮ সালে। কী প্রচণ্ড উৎসাহের আর অভিনন্দনের বন্যা বয়ে গেল ভারতের বিশেষত ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের উপর দিয়ে, তার ইতিহাস আমি উপস্থিত করতে চাই না, যদিও আমার সংগ্রহে সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সংবাদই আছে। রণজিৎসিংহ 'বিজয়সিংহ' হয়ে হেলায় ইংলণ্ড জয় ক'রে, উদারতাবশত সে দেশের নাম রনজিল্যাণ্ড না রেখে, স্বদেশে ফিরেছেন—অভাগিনী ভারতজননী ছেঁড়া আঁচলে আনন্দাশ্রু মুছে ছেলেকে কোলে নিতে গেলেন—চমকে শুনলেন—সে ছেলেকে দত্তক নিয়ে নিয়েছে ইংলণ্ড। রনজি জানালেন, তাঁর মাতৃভূমি তাঁর বাসভূমি নয়, ইংলণ্ডে তিনি 'অ্যাট হোম'। উপায়ও ছিল না—প্রাণের ভয়ে তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল, বা তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রনজি ভারতে অনেক মালা পরলেন, উপহার নিলেন, সবিনয়ে কিছু বক্তৃতা করলেন এবং ক্রিকেটও খেললেন।

এইখানে একটু ছন্দপতন হল। ১৮৯৮-এর গোড়ায় ভারতে যে-কয়টি ম্যাচ খেললেন, তাতে রনজি বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। চারদিকে আর্তনাদ —এ কি! ইংলণ্ডের রানভরা ব্যাট ভারতে এসে চৌচির—ভারত এত উত্তপ্ত! ভারতের তেপান্তরের মাঠে রাজকুমার, হায় পথ হারালেন! 'অ্যাডভোকেট অব ইণ্ডিয়ার' প্রতিনিধি' এই পরিস্থিতিতে [illegible]

—বলেই ফেলি' ক'রে বলেই ফেললেন—'কি বলেন, একটু স্পষ্ট কথাই বলি?' 'তা বলুন,' রনজি হাসলেন। 'পাবলিক যে বড্ড নিরাশ হয়েছে—তাদের মনোমতো গণ্ডায়-গণ্ডায় সেঞ্চুরি তো আপনি হাঁকড়াতে পারছেন না!' রনজি বলতে বাধ্য হলেন—'আপনাদের পাবলিক মশাই ভুলে গেছে, ক্রিকেট-ব্যাপারটা একেবারেই অনিশ্চিত। বলার আগে অনেক-কিছু হিসেব ক'রে বলা উচিত, তা কে মনে রাখে?' সত্যই, কেউ মনে রাখে না, নচেৎ তাদের জানা উচিত ছিল, মাস-ছয়েক ভারতে থেকেও রনজি মাত্র ছ'টি খেলা খেলেছেন, প্র্যাকটিশ একদম নেই। 'নিশ্চয়ই', সংবাদপত্রের প্রতিনিধি রনজির কৈফিয়ত সম্পূর্ণ স্বীকার করেও যোগ ক'রে দিলেন মুচকি হেসে, 'কিন্তু পুনায় পাওয়া আপনার ঐ চশমাখানা—ওতে আপনার রেকর্ড ভেঙেছে, কি বলেন?' [চশমা পাওয়া মানে কি, আশাকরি গো-গো চশমার যুগে কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। চশমার দ্বারা জোড়া গোল্লা যেমন বোঝায়, তেমনি তার ব্যঞ্জনা—ব্যাটসম্যানের চোখে এখন ছানি]। সাংবাদিকের কাছ থেকে খুব খারাপ একটি বল পেয়ে রনজি বিব্রত হয়ে বললেন, "হাঁ, ঐ চশমাটা আমার নতুন সম্পদ সন্দেহ নেই। হোমে ও-বস্তু আমি কখনো করিনি। ইংলণ্ডে আমরা খুব যত্নের সঙ্গে উইকেট তৈরি করি। ভালো নয় এমন উইকেট সেখানে কদাচিৎ দেখা যায়। আর, ভারতের উইকেট 'ভালো নয়,' এই কথাটাই যথেষ্ট নয়, তারা মন্দ। পুনায় উইকেট বৃষ্টিতে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।"

প্রশ্নের উত্তরে রনজি আরও জানালেন, তাঁর মতে, ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান ক্যাপ্টেন গ্রীগ। সেরা বোলার কে, তা বলতে সমর্থ নন, কারণ ভালো উইকেটের ভালো বোলারকেই সেরা বলা যায়—ভারতে সে উইকেট তো নেই। হোমে রনজির কোন্ খেলা শ্রেষ্ঠ—তার উত্তরে তিনি ১৮৯৬-এর ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের উল্লেখ করেছিলেন। এই সময় প্রতিনিধি বসে-বসে খ্যাতির বিড়ম্বনাও দেখতে লাগলেন—অজস্র নিমন্ত্রণ আসছে—যেগুলি রনজির পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। এদেশের মানুষ আবার এসব ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর। রনজি বললেন, 'হাঁ, আমাকে যে প্রচুর নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু প্রতিদিন মধ্য-রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকা নিশ্চয় ভালো ক্রিকেটের পক্ষে অনুকূল নয়। হোমে আমরা বড় ম্যাচের আগে বিশ্রাম নিয়ে শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা করি।'

[রনজির বাংলা জীবনীকার শ্রীখেলোয়াড় বড় খেলার আগে রনজির বিশ্রাম নেওয়ার কথায় নিশ্চয় মৃদুহাস্য করবেন। তিনি রনজির জীবনের একটি কাহিনী জানিয়েছেন: শিকার করা ও মাছধরা রনজির প্রচণ্ড নেশা। সারারাত তিনি ছিপ নিয়ে জলের ধারে বসে থাকতেন। রনজির কাউণ্টি-অধিনায়ক তাঁর এই নেশার কথা জানতেন। তাই বড় খেলার আগে রনজিকে চোখে-চোখে রাখতেন। সমারসেটের সঙ্গে খেলা। সমারসেট প্রথমদিন ভালো রান করেছে। রনজির অধিনায়ক মার্ডক খাওয়ার টেবিলে বসে খেলোয়াড়দের সকাল-সকাল শুয়ে পড়তে বললেন। খাওয়ার পরে তিনি নিজে রনজিকে লেপ-চাপা দিয়ে শুইয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। জ্যোৎস্না রাত। মার্ডক চলে যেতেই রনজি দুষ্টু ছেলের মতো পা টিপে-টিপে জানলা দিয়ে গলে বেরিয়ে পড়লেন। সারারাত মাছ ধরে ভোরে কেউ উঠবার আগে ঘরে ফিরে এলেন।

চায়ের টেবিলে যথাসময়ে হাজির। খেলা আরম্ভ হতেই ঝড়ের বেগে রান করে চললেন। স্কোরবোর্ডে যখন তাঁর রান ২৮৫, তখন বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় খেলা বন্ধ হয়ে গেল। প্যাভিলিয়নে মার্ডক রনজির কাঁধে হাত রেখে অন্য খেলোয়াড়দের উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'দেখলে তোমরা! রনজিকে সকাল-সকাল শুইয়ে এসেছিলাম—তার কী ফল?']

সাংবাদিকের অনুরোধে রনজি ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য বাণী দিলেন :

"শিখতে চেষ্টা করো ধাপে-ধাপে। যখন কিছু শিখেছ, তখন আরো শেখার পথ বন্ধ করে দিও না অহঙ্কারে। পূর্বের মতোই উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যাও। ক্রিকেটে—জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও—এই নীতি গ্রহণ করো : শেখার শেষ নেই।"

রনজি ভারতে ভালো খেলতে পারুন বা না-পারুন, ভারতীয় সাংবাদিকরা লেখনী-লীলায় পেছিয়ে থাকতে রাজি ছিলেন না। সুতরাং যে-দু' একটি ক্ষেত্রে অর্ধশত পেরিয়েছিলেন, তারই বর্ণনায় সুচারু বাক্যাবলী ঢেলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। 'গুজরাটি' পত্রিকায় তেমন 'গতির কাব্যের' কিছু গতিময় স্তুতি ছিল, সেগুলি বাদ দিয়ে আমরা স্মরণ করতে পারি ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটরের ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮-এর রচনাটিকে, যার মধ্যে রনজি-সূত্রে তৎকালীন ভারতীয় ক্রিকেটের কিছু সংবাদও মিলে যায় :

"কুমার রণজিৎসিংজী ক্রিকেটে বিপ্লব এনে দিয়েছেন। ক্রিকেটের এই নূতন জীবনরূপই তাঁকে জনবুলের কাছে এত জনপ্রিয় করেছে। ব্যাটিংয়েই তাঁর বিশেষ দক্ষতা। সতর্ক সাবধান খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমরা পরিচিত, যাঁরা ক্রীজে থেকে স্টাম্প-রক্ষাকেই প্রথম কর্তব্য বিবেচনা করেন, এই ধারণায়—টিকে থাকলেই রান এসে যাবে। ভারতে এই রীতির সেরা প্রতিনিধি মিঃ গ্রীগ। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সেরা ব্যাটসম্যানদের বিষয়েও একই কথা বলা চলে। এই পাথর-গাঁথার প্রয়াস দর্শকদের কাছে অন্তত খেলাটিকে ক্লান্তিকর ক'রে তোলে। তারা বোম্বাইয়ে, ইংলণ্ডেও, ঠ্যাঙাড়ে খেলোয়াড়দেরই পছন্দ করে। মারকুটে ব্যাটসম্যানেরা প্রতিটি বলে পেটাবে, উইকেট খোয়াবার ঝুঁকি নিয়েও। ভারতে এই ঠ্যাঙাড়েরাই সংখ্যাগুরু, দু'-একটি উত্তম ব্যতিক্রম আছে, যথা মিস্ত্রী ও ছোনকর।...রণজিৎসিং কিন্তু ঠ্যাঙাড়েও নন, বা পাথরজমানো খেলোয়াড়ও নন—উভয় রীতির শ্রেষ্ঠ বস্তুর সমাহার তিনি। তিনি সেই মারিয়ে-খেলোয়াড় যিনি উইকেট বিশ্বাসঘাতকতা না করলে বল ফস্‌কান না (ভারতের উইকেট অবশ্য অধিকাংশক্ষেত্রে ঐ চরিত্রের), এবং নিজেকে বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যান না, কারণ প্রতি বলে নিখুঁত মার অবধারিত।...দৃশ্যটি চেয়ে দেখবার মতো—রনজি উইকেটে দাঁড়িয়ে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের দিকে একনজর দেখে নিলেন। তারপর দেখলেন—বোলারের হাত থেকে বল বেরিয়ে আসছে। তারপরেই—যে-মুহূর্তে বলটি মাটি স্পর্শ করল তখনি ঝলক—এবং বলটি তাড়িত হয়ে ছুটে গেল নির্ধারিত লক্ষ্যে—চকিতে তা ঘটেছে—পায়ের, পিঠের, হাতের হিসেবী সঞ্চালনের দ্বারা, বলের লাইনে তাদের এনে সোজা আঘাতের দ্বারা। অদ্ভুত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এই ক্রিয়াকাণ্ড করেন, যাতে কোনোপ্রকার উত্তেজনা বা প্রয়াসের লক্ষণ থাকে না। অপূর্ব শান্ত আত্মস্থতা, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাকে বিচলিত করতে সমর্থ নয়। এ সকলই দেখিয়ে দেয়, তিনি যেন ক্রিকেটের

স্বতঃসিদ্ধ পুরুষ, তাঁর রীতিকে অভ্যাসে পাওয়া যাবে না, অনুকরণও অসাধ্য।"

১৮৯৯, ১৯০০, ১৯০১—রনজির সেরা তিন বছর। প্রথম দুই বৎসরে তিনি তিন হাজারের উপর রান করেছিলেন। ১৮৯৯ সালে যখন তিন হাজার রানের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন সমস্ত ইংলণ্ড উত্তেজনায় ফেটে পড়ে বুঝি—ক্রিকেটের ইতিহাসে যা ঘটেনি তা কি ঘটবে—এক মরশুমে তিন হাজার রান করতে পারবে কোনো ব্যাটসম্যান? অমৃতবাজারের লণ্ডন সংবাদদাতা সেই ঔৎসুক্যে উল্লাসে আন্দোলিত ইংলণ্ডের কথা জানিয়েছেন (১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯):

"গত সপ্তাহে রনজি তিন হাজার রানের ৩৬ রান পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ক্রিকেট প্রবর্তিত হবার পরে কোনো ক্রিকেটার এক মরশুমে তিন হাজার রানে পৌঁছতে পারেনি। এই সপ্তাহে বিরাট জনতা পোর্টসমাউথ-মাঠে হাজির মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেও—এই দেখবার জন্য—রনজি কি এমনভাবে বল পেটাতে পারবেন, যাতে তিনি তিন হাজার রানের স্বর্গলোকে পৌঁছে যাবেন? তারা নিরাশ হয়নি। গগনবিদারী হর্ষধ্বনির মধ্যে তিন হাজার রানে তিনি পৌঁছে গিয়ে ৩০৩৬ রান পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। মরশুম শেষ হবার আগে এখনো দুটি ম্যাচ বাকি।"

এই বছরই রনজি নটিংহ্যাম-টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হাতে নিশ্চিত পরাজয় থেকে ইংলণ্ডকে বাঁচিয়েছিলেন, যার বিষয়ে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের সংবাদদাতা লেখেন (বেঙ্গলীতে ১ জুলাই, ১৮৯৯ উদ্ধৃত):

"ইংলণ্ডের পক্ষে রণজিৎসিংজী এমন একটি ইনিংস খেলেছেন যা ইতিহাসে চিরজীবী হয়ে থাকবে। এক্ষেত্রে তিনি যেন নিজের গুণগরিমাকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছিলেন। দু' ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট ধরে তিনি হেওয়ার্ড ও টিলডেস্‌লির সহায়তায় কঠিন লড়াই চালিয়ে গেছেন। ঐকালে এমনভাবে ঠেকিয়ে আটকেছেন, যা কখনো পূর্বে করেননি। সেই সঙ্গে করেছেন স্বাভাবিক রীতিতে কল্পনাতীত সুন্দর কাট ও ড্রাইভ। জনতা একেবারে আনন্দে ক্ষিপ্ত, উদ্দাম নৃত্য করছিল, যখন রনজি শেষপর্যন্ত ইংলণ্ডকে বাঁচাতে পারলেন। সমবেত হাজার-হাজার মানুষের প্রত্যেকে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেলল। গৌরবময় ঘটনার যোগ্য সংবর্ধনা। রণজিৎসিংজী স্পষ্টতই অভিভূত, ভরা হাসি, সেইসঙ্গে চোখে জল। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের ১৯৩ রানে রনজির দান ৪২, এবং দ্বিতীয় ইনিংসে (১৫৫, ৭ উইকেটে) রনজি ৯৩ নটআউট। বলাবাহুল্য তা দলের সর্বোচ্চ রান।"

এই বছরের একটি খেলার সংক্ষিপ্ত সংবাদ অ্যালথামের ক্রিকেট-ইতিহাস থেকে হাজির করা যায়:

"রনজির এই সকল বিরাট রানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, হোভে মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে একটি ইনিংস। খেলার শেষ দিন। বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাতে উইকেট বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। বোলার—অ্যালবার্ট ট্রট, হার্নে, রলিন। আগের দিন ফ্রাই ও কিলিক ভাল রান করেছিলেন, কিন্তু শনিবার দলের বাকি সকলে দেখলেন, রান-করা নিরতিশয় কঠিন। ভাইন করলেন ১৭।

বাকি আর কেউ দশ পর্যন্ত উঠতে পারলেন না। রাজকুমার—২০২!"

১৯০০ সালেই রনজির ক্রিকেট-জীবন শিখরস্পর্শ করেছিল, সেকথা সকল সমালোচক একবাক্যে স্বীকার করেন। কিভাবে সাঁ-সাঁ ক'রে তলা থেকে উপরে উঠেছিলেন তার বিবরণ উদ্ধার করেছিল 'মরাঠা' (জুলাই ৮, ১৯০০) 'লয়েডস্ নিউজপেপার' থেকে।—"এক সপ্তাহ আগেও অ্যাভারেজ-তালিকায় ভারতীয় রাজকুমারের স্থান ছিল একাদশ।...এখন তিনি সর্বশীর্ষে—গড় ৮০·৫৫। ক্রিকেটের বিরল ঘটনা—পরপর তিনটি সিঞ্চুরি—ব্যক্তিগতভাবে দ্বিতীয়বার সে-কাজ করার গৌরব খুব অল্পের জন্য তাঁর ফসকে গেছে।" 'ইন্ডিয়ান স্পোর্টিং টাইমস' রনজিকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত ব্যাটসম্যান' ঘোষণা ক'রে লেখে: "বিচিত্র ঘটনাচক্রে যে-মরশুমে ডাঃ ডবলিউ জি গ্রেস প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেট থেকে কার্যত বিদায় নিয়েছেন, সেই মরশুমেই আর এক ব্যক্তি উইলো কাঠের অস্ত্রধারীদের মধ্যে তর্কাতীত প্রাধান্যের উচ্চস্থানে উঠে পড়েছেন। ১৯০০ সালের ক্রিকেট-বছর কে এস রণজিৎসিংজীর চিত্তাকর্ষক তেজোদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত। অন্যান্যরা প্রচুর রান করেছেন এমন এক মরশুমেও তিনি স্বচ্ছন্দে ব্যাটিং-অ্যাভারেজের চূড়ায় আছেন।...পুনর্বার তিনি এক মরশুমে তিন হাজার রান করার অনন্যসাধারণ কাণ্ড করলেন। বছরের শেষে দেখা গেল—সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত ব্যাটসম্যান হবার দাবি নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মতো আর কেউ নেই।" 'ইলিংশম্যান' পত্রিকায় রনজির চমৎকার মূল্যায়ন করা হয় সমকালীন অন্যান্য ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে তুলনা করে: "এই বিরাট ভারতীয় খেলোয়াড় ঊনিশ শতকের শেষে চমকপ্রদ বাটিংয়ের দ্বারা ক্রিকেট একেবারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছেন। তাহলেও বলতে হবে, দ্বিতীয়বার তিন হাজারের বেশি রান করে তিনি ক্রিকেট-ইতিহাসে নিজের নামকে অমর করে গেলেন। ডবলিউ-জি প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন।...তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ইংলণ্ডের ক্রিকেট-প্রেমিকরা চাম্পিয়ান বলতে ইচ্ছুক নয়।...কিন্তু রনজিৎসিংজীর সাম্প্রতিক কীর্তি দেখিয়ে দেয়, তিনি 'চাম্পিয়ান' শব্দের যোগ্য উত্তরাধিকারী। দেশের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানগণ—এ সি ম্যাকলারেন, সি বি ফ্রাই, আর ই ফস্টার, অ্যাবেল, হেওয়ার্ড—প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, মোট রান ও গড় রানের ক্ষেত্রে রনজি যেন স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী। গত পাঁচ বছরে রনজির কয়েকটি সেরা কীর্তির সঙ্গে অপরাপর সেরা অ্যামেচার ও প্রফেশন্যালদের তুলনা করলে তাঁরা তুচ্ছ হয়ে যান। রনজি দৃশ্যপটে আবির্ভূত হবার আগে বছরে দু'হাজার রান করা যেন অসম্ভব কাণ্ড মনে হোত। সাসেক্সের এই খেলোয়াড় দু'বছর আগে যখন ডাঃ গ্রেসের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভাঙলেন, তখন মনে হয়েছিল, তাঁর এই নতুন রেকর্ড বুঝি চিরদিন অনতিক্রান্ত থাকবে। কিন্তু কোথায়?"

রনজি এগারোটি সেঞ্চুরি ক'রে এই মরশুমে আরও একটি রেকর্ড করেছিলেন। কেন্টের সঙ্গে খেলার সময়ে ঐ রেকর্ড হয়, এবং চতুর্দিকে ধন্য-ধন্য পড়ে যায়। বেঙ্গলীতে উদ্ধৃত (১৯ সেপ্টেম্বর) তেমন একটি বিবরণ:

"রনজির সেঞ্চুরি করার রেকর্ড। কেন্টের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রহারের ২২০ রান। ভারতীয় রাজকুমার এই মরশুমে এগারোটি সেঞ্চুরি করেছেন। সাসেক্স ৬-৩৬৫।

গতকাল ব্রাইটনে সাসেক্স ও কেণ্ট তাদের শেষ খেলা যখন খেলছিল তখন রনজি অদ্ভুত সুন্দর ২২০ রান ক'রে এক মরশুমে এগারোটি সেঞ্চুরির রেকর্ড করলেন।

"কেণ্ট-দলে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। সাসেক্সে দুটি বদল হয়েছিল!... সাসেক্স টসে জিতলে ফ্রাই এবং রেলফ্ শুরু করেন। ফ্রাই দলের ৪২ রানের মধ্যে ৩৩ রান করার পরে দুর্ভাগ্যবশত একটি বল টেনে নিলেন নিজ উইকেটের উপরে। তারপর কিছু সময় সাসেক্সের মন্দ বরাত চলল। ল্যাথাম কোনো রান না করে লেগের দিক থেকে ঢুকে-আসা বলে বোল্ড হয়ে গেলেন। রেলফ্ সত্তর রানের সময়ে লঙ-অনে কট। কিলিকও যখন কট অ্যান্ড বোল্ড হয়ে গেলেন তখন সাসেক্সের চারটি ভালো উইকেট চলে গেছে ৮৭ রানে। তারপর রনজি ও কলিনস্ জুটি বাঁধলে খেলার চেহারা দ্রুত বদলে গেল। রনজিই বেশি রান করছিলেন। তাঁর খেলা ব্যক্তিগত ৯৮ রান পর্যন্ত নিখুঁত। ঐ রানের মাথায় তিনি স্টাম্পড্ হতে পারতেন। তারপর অবিলম্বে তিনি সেঞ্চুরি করলেন, একঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিটে। দ্বিতীয় শতরান মাত্র একঘণ্টা পাঁচ মিনিটে। এই জুটি দু'ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট একত্রে থেকে ২৪৬ রান করেছেন। কলিনস্ আগে যান...তার-পরে রনজি। তিন ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট উইকেটে থেকেছেন, ৩৪টি বাউণ্ডারি করেছেন।

"রনজির সেঞ্চুরির হিসাব : কেম্ব্রিজের সঙ্গে—১৫৮। ঐ—২১৫ নটআউট। সমারসেট—২২২। গ্লস্টার্সশায়ার—১২৭। কেণ্ট—১৯২ নটআউট। নটস—১৫৮। লিস্টার্সশায়ার—২৭৫। সারে- ১০৩। মিডলসেক্স ২০২। গ্লস্টার্সশায়ার—১০৯। কেণ্ট—২২০।...এই মরশুমে হেওয়ার্ড ও অ্যাবেল ১০টি এবং ফ্রাই ৯টি সেঞ্চুরি করেছেন। অন্য সুপরিচিত ব্যাটসম্যানের মতো রনজি কিন্তু এই মরশুমে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করতে পারেননি, তবে গ্লস্টার্সশায়ারের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৯৭ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৭ করেছিলেন।"

ডেইলি ক্রনিকলে রনজির উপরে উচ্চাঙ্গের একটি লেখা এই বছর বেরিয়েছিল (অমৃতবাজারে ২০ সেপ্টেম্বর উদ্ধৃত), যাতে ডাঃ গ্রেসের সঙ্গে রনজির তুলনা করে খেলোয়াড়-হিসাবে রনজির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের উপরে বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য করা হয়। রনজির সমকালীন এই মূল্যায়ন চিরকালীন মূল্যায়নের অংশ হতে পারে বলেই আমাদের বিশ্বাস :

"ক্রিকেট-জগৎ কে এস রণজিৎসিংজীর রেকর্ড-সংখ্যক সেঞ্চুরি-কীর্তিতে বিস্ময় ও উৎসাহে এখন পূর্ণ।...কিন্তু প্রায়ই ভুল ক'রে বলা হয়—এগারোটি সেঞ্চুরি করেছেন বলেই তিনি গৌরবান্বিত। না, তা নয়—সারা মরশুমে তিনি যে-ভাবে খেলেছেন গৌরবান্বিত তার দ্বারাই।

"এই যে-সব রানসংখ্যার দ্বারা রনজির রেকর্ড হয়েছে, তাদের ছাড়া অনেক-বারই তিনি ৮০-৯০-এর কোঠায় ছিলেন, এবং অ্যাভারেজ সম্বন্ধে যথোচিত ও সুউচ্চ ঘৃণায় তিনি সাসেক্সের অধিনায়করূপে একাধিকবার ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছেন, যখন আর সামান্য সময় ক্রীজে কাটালেই তিনি নিজ সেঞ্চুরিতে পৌঁছে ভাবাবেগের হাততালি পেতেন। পূর্বে অনেকবার আমি শত রান অথবা অর্ধশত রানের উপর কোন্ ভ্রান্ত গৌরব অর্পণ করা হয়, তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছি। চমৎকার ৪০ কিংবা ৮০-এর তুলনায় হায়, অনেক বেশি সংখ্যায় করা হয় বরাতে-পাওয়া ৫০ বা ১০০ রান।

"রণজিৎসিংজী জনবন্দিত এইজন্য যে, তিনি যথার্থ ক্রিকেট খেলেন। তাঁর খেলার নিখুঁত আঙ্গিকের বিষয়ে প্রশ্ন করার সাহস কারো হবে না, অথচ একই-সঙ্গে তা প্রদীপ্ত এবং উন্মাদনাকর। প্রাচ্যের এই অসাধারণ খেলোয়াড়ের সামর্থ্য-শক্তি বুঝবার জন্য কারো স্কোরবোর্ড বা সাংবাদিকের হিসাবখাতার উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। কয়েক বছর আগে রনজিৎসিংজীকে খেলোয়াড় অপেক্ষা যন্ত্রবিজ্ঞানী বলতে বেশি ইচ্ছা হোত। এই মরশুমে তিনি তাঁর পুরোতন সূক্ষ্ম সংগ্রামকৌশল ত্যাগ ক'রে সরাসরি বীর্যোদ্দীপ্ত ব্যাটিং-রীতি গ্রহণ করেছেন, যা অধিকাংশ দর্শককে আরও প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। **এবিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই—রণজিৎসিংজী এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান।** অ্যাবেল এবং হেওয়ার্ড উভয়েই ১০টি করে সেঞ্চুরি করেছেন।...কিন্তু গোঁড়া সারে-ভক্তও হেওয়ার্ডকে রনজির সমতুল ভাববে না। হেওয়ার্ড অবশ্য যদি অপেশাদার হতেন, তাহলে হয়ত আরও আকর্ষক ব্যাটসম্যান হতে পারতেন, তাঁর ব্যক্তিত্বও অধিক মনোহারী হত। সত্য কথা বলতে কি, অ্যাভারেজ বাড়াবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকায় হেওয়ার্ডের জনপ্রিয়তায় ঘাটতি ঘটেছে। কিন্তু রনজি সংখ্যার কথা ভুলেই ক্রিকেট খেলেন। তিনি যে, তাঁর রীতি বদলেছেন, তার কারণ মনে হয়, তিনি এই নতুন পদ্ধতিতে বেশি আনন্দ পান। রনজি সর্বাধিক জনরঞ্জক খেলোয়াড়, একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তিনি যথার্থ আত্মতৃপ্ত খেলোয়াড়—যিনি নিজের খেলাকে নিজেই উপভোগ করেন। ডাঃ গ্রেসের সঙ্গে রণজিৎসিংজীর তুলনার ব্যাপারটি এড়ানো সম্ভব নয়। পুরনোপন্থীরা গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যানের রীতির প্রচণ্ড সমর্থক। এঁরা বিশেষভাবে জানাতে চান, কোন্ পরিস্থিতিতে ডাঃ গ্রেস রান করেছেন। গ্রেস সর্বপ্রকার উইকেটে খেলেছেন, অধিকাংশক্ষেত্রে মন্দ উইকেটে। এই কারণে 'দুই রাজাকে' একস্থানে স্থাপন করা বিবেকসম্মত হবে না। কিন্তু একালের ক্রীড়ানু-রাগীরা ভাবতেই পারেন না—রণজিৎসিংজীর ব্যাটিংয়ের চেয়ে কোনো ব্যাটিং ভালো হতে পারে, তখন বা এখন। সব জড়িয়ে গ্রেস অনেক সহজ বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলেছেন।...এটা পরিষ্কার—রীতি এবং পরিমার্জনায় রণজিৎসিংজীর স্থান সর্বাগ্রে। এই অভূতপূর্ব সাফল্য তিনি কিভাবে অর্জন করেছেন বলা সহজ নয়। কিছুকাল আগে আমাদের সর্বসম্মত ধারণা ছিল—উইকেটের সামনে বেড়ে খেলার মতো তেজ তাঁর নেই। এখন তিনি, প্রায় জেসপের পরিমাণেই উইকেটের সামনে মেরে রান করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর রানগতি গ্লস্টার্স-শায়ারের উক্ত সাইক্লোনের শিহরণজাগানো গতির কাছে প্রায়ই পৌঁছে যায়।

"যে-সব পাঠক সংখ্যালোভী, তাঁদের সেবনের জন্য ভারতীয় ব্যক্তিটির আর একটি রেকর্ডের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়—তিনি এ-বছর পাঁচটি দ্বিশতা-ধিকের ইনিংস খেলেছেন। কোনো খেলোয়াড় এ-পর্যন্ত চারটির বেশি ও-জিনিস করতে পারেননি। কিন্তু রণজিৎসিংজী যদি সংখ্যার উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করতেন, তাহলে কদাপি কেণ্টের বিরুদ্ধে নিজের ১৯২ নটআউটের মাথায় ইনিংস ডিক্লেয়ার করতেন না।"

রনজির স্টাইলের প্রশংসায় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা এইসময়ে পূর্ণ। 'তাঁর ভঙ্গিতে

প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের' কথা বলেছিল 'ইণ্ডিয়ান স্পোর্টিং টাইমস'—'অনন্য তা, অননুকরণীয়।' অনুকরণ অসম্ভব এইজন্য যে, তাঁর অনুরূপ তীক্ষ্ন দৃষ্টি ও চাবুকের শরীর ছাড়া ও-বস্তু ঘটানো যায় না। 'ক্ষুদ্র শরীরে শক্তিশালী কব্জি, তার সহসা মোচড়ে তিনি যেভাবে বিদ্যুৎগতিতে বল বাউণ্ডারিতে পাঠান, সেই কাজই গিলবার্ট জেসপ করেন তিন গজ খেয়ে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যাট নাড়িয়ে বলে প্রহার ক'রে।'

রনজি এখন কেবল খেলার নায়ক নন, কাহিনীর নায়কও হয়ে উঠেছেন। রনজি-লিজেণ্ডের একটি পরিবেশন করেছেন সুবিখ্যাত ক্রিকেটার এফ এস জ্যাকসন 'ডে লাইট' পত্রিকায় (মরাঠায় উদ্ধৃত, ৮ জুলাই):

কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ইয়র্কশায়ারের খেলা। জ্যাকসন টানিক্লিফের বিরুদ্ধে বল করছেন। স্লিপে রনজি। টানিক্লিফ কাট করলেন—বলটি তাঁর ব্যাট থেকে বেরুবার পরে আর দেখা গেল না। ব্যাটসম্যান জানেন তিনি নির্ঘাত বাউণ্ডারি করেছেন—সুতরাং রান নেবার জন্য ব্যস্ত হলেন না। রনজি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। পকেটে হাত। হাসছেন। বলটির বিষয়ে তাঁরও কোনো ব্যস্ততা নেই। জ্যাকসন দেখে অত্যন্ত বিরক্ত—বললেন, কি ব্যাপার, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চেশায়ার-বেড়ালের মতো হাসছ, বল কুড়োবার মতলব নেই? তখন রনজি পকেট থেকে বল বার করলেন—সেটি লুফে, তামাশা করে তিনি পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছেন, যা অন্য কারো চোখে পড়েনি।

বেচারা ব্যাটসম্যান। বাউণ্ডারির বদলে আউট। কিন্তু আউটের বদলে নট-আউটও পেয়েছে কেউ-কেউ রনজির মহানুভবতার দৌলতে। তেমন একটি কাহিনী বম্বে গেজেটে বেরিয়েছিল (মরাঠায় উদ্ধৃত, ২৯ জুলাই)। হ্যালোজ বিপক্ষের ব্যাটসম্যান—পয়েণ্টে বল পাঠিয়েছেন। সেখানে রনজি ফিল্ডিং করছিলেন। বলটি তাঁর একেবারে আঙুলের কাছে উঁচু হয়ে ছুটে এলো। সেটি ধরেই উপরে ছুঁড়ে দিলেন—ক্যাচ ধরার পরে যেভাবে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। কে একজন আবেদন করল, আম্পায়ারের আঙুল উঠে গেল—ব্যাটসম্যান বিদায় নিলেন। যখন তিনি পয়েণ্টের কাছে রনজির কাছে পৌঁছলেন, রনজি তাঁর সঙ্গে অল্পক্ষণ কথা বললেন। তারপর দেখা গেল, ব্যাটসম্যান ও রনজি হাত-ধারাধরি করে উইকেটে ফিরছেন। রনজি জানালেন, ক্যাচটি ধরা হয়নি। সুতরাং ব্যাটসম্যান আবার ব্যাট করে চললেন, এবার ঝড়ের গতিতে—শেষপর্যন্ত নটআউট।

১৯০০ সালের গিরিচুড়া থেকে রনজি যখন ১৯০১ সালের খাদে—তখন চারিদিকে হায় হায়। কিন্তু অল্প পরেই মাথা তুললেন। এইতো প্রত্যাবর্তন!—বেঙ্গলীর লণ্ডন-সংবাদাতার বিবরণ (৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০১): "মাত্র কিছুদিন আগেই তো আমরা নিশ্চিতভাবে ভেবেছি, এবার আর রনজি নিজেকে ক্রিকেটের রাজকুমার করে তুলতে পারছেন না। মন্দ স্বাস্থ্যই তার কারণ। তারপর যখন বিলম্বে তিনি খেলা শুরু করলেন, তখন অগণিত অনুরাগীর সঙ্গে আমরা গভীর দুঃখে দেখলাম—আমাদের চাম্পিয়ান সেরা ফর্মে নেই। রান অপ্রচুর, এবং স্টাইল সেই সৌন্দর্যের মাদকতা হারিয়েছে, যা দেখে জনৈক অনুরাগী বলেছিলেন, 'রনজি তো ক্রিকেট খেলেন না, তিনি বল নিয়ে যাদু খেলেন।' ফলে

দেখা গেল, সপ্তাহে-সপ্তাহে প্রকাশিত ব্যাটিং-হিসাবের তালিকায় তাঁর নাম উপরে নেই।...কিন্তু সিজন যতই এগুতে লাগল, দেখা গেল, যাদুকর ক্রীজে নিজ স্থান করে নিয়েছেন। কয়েকটি সুন্দর খেলার পরে এখন তাঁর স্থান দ্বিতীয়। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁরই দলীয় মিঃ সি বি ফ্রাই।...এবছর আর একটি রেকর্ড তিনি করেছেন—২৮৫ নটআউট। ক্রিকেট-ইতিহাসে এই অদ্বিতীয় ঘটনা ঘটাবার গৌরব জনৈক ভারতীয়ের।"

এই বৎসর সর্বোচ্চ মোট রান সি বি ফ্রাইয়ের। তবু সকলেই স্বীকার করলেন, রনজিই শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। তা সবচেয়ে বেশি স্বীকার করলেন ফ্রাই, ডেইলি একস্‌প্রেসে এক রচনায় (বেঙ্গলীতে উদ্ধৃত, ৯ অক্টোবর)। ফ্রাই বললেন, "যত খেলোয়াড় তিনি দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে বল দেখে বোঝার চোখ রনজির তুল্য কারো নেই। মারের সৌকর্যেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সর্বোপরি তাঁর অনন্যসাধারণ দেহ-গতি। ব্যাট নিয়ে বলের সম্বন্ধে রনজি বহু সংখ্যায় অসাধারণ জিনিস করতে পারেন—সেখানে অপর ব্যাটসম্যানেরা রনজির মতোই ভালভাবে করতে পারেন—অনেক নয়—কোনো একটিমাত্র জিনিস! ভালো ব্যাটসম্যান যেখানে কোনো বলে দু'তিন রকম মারতে সমর্থ, সেখানে রনজি তাদের মধ্যে সেরা মারটি মারতে পারেন—আবার বাকি উপায়গুলিরও সর্বোত্তম প্রয়োগ করে থাকেন। তার চলাফেরার বিদ্যুৎগতিই এর মূলে। তিনি স্বচ্ছন্দে ঝুঁকি নিতে পারেন, যা আমরা পারি না, কারণ ভ্রান্তির ফাঁক তাঁর নেই। কার্যত প্রথম যে-খেলাটি তাঁকে খেলতে দেখেছি, তাতে উইকেট ছিল অত্যন্ত দ্রুত এবং আগ্নেয়—সেই উইকেটে প্রচণ্ড ফাস্টবোলারের সেরা গুডলেংথ বলকে তিনি অস্বাভাবিক সহজতার সঙ্গে পুল করছিলেন, তা আমার মনের উপরে অনপনেয় প্রভাব রেখে গেছে।"

ইংলণ্ডের 'স্টার' পত্রিকা লিখেছিল, 'যে তাঁকে খেলতে দেখেনি, সে কোনোদিন তাঁর ম্যাজিক বুঝতে পারবে না। তিনি অপর সকল ব্যাটসম্যান থেকে স্বতন্ত্র।'

ফ্রাইয়ের রনজি-দর্শনে ফিরে যাওয়া যাক। তার আগে জানানো যায়, ১৯০১ সালে রনজি তিন হাজার রান করার অভ্যাস ত্যাগ করেছিলেন। ঐ বছর রান —২৪৬৮, গড় ৭০·৫১। ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটার কাগজের লণ্ডন-সংবাদদাতা ইংলণ্ডের 'ক্রিকেটার' কাগজ থেকে ফ্রাইয়ের লেখা রনজির সর্বোচ্চ রেকর্ড-রানের একটি মনোরম বর্ণনা পাঠিয়েছিলেন। ফ্রাইয়ের সরস হাস্যে পূর্ণ এই বর্ণনা ক্রিকেট-সাহিত্যে স্থানলাভ করেছে (ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটরে উদ্ধৃত, ১ সেপ্টেম্বর) :

"গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সমারসেট ৫৬০ রান তুলে, সাসেক্সের উপরে ৩২৪ রানের আধিক্য ধার্য ক'রে, আট উইকেটে ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছিল। সাসেক্সের পক্ষে রণজিৎসিংজী ও ভাইন অবশিষ্ট আধঘণ্টা কাটালেন ৪০ রানের বিনিময়ে। খেলার পরে রণজিৎসিংজীর দলের কমিটি-মিটিংয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল—রাজকুমারকে শনিবার সারাদিন খেলতে হবে এবং ৩০০ নট-আউট থাকতে হবে।

"এ-ব্যাপারে রনজির আপত্তিকে সম্পূর্ণই অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, যদিচ

উইকেটের অবস্থা ও বোলিংয়ের প্রকৃতি যথাযোগ্যভাবে বিবেচিত হয়নি তা নয়। স্থির হয়, দুটির বেশি উইকেট খোয়ানো যুক্তিযুক্ত হবে না, আর রান করার দায়িত্ব রনজিরই।

"ঘটনাগতি দাঁড়াল—দু'বার দু' পশলা জল ৪০ মিনিটের মতো সময় ক্ষয় করায় রনজি কেবল ২৮৫ রান করতে পারলেন।

"সব জড়িয়ে, কমিটি রনজির উপরে যে-আস্থা স্থাপন করেছিল, তিনি তা রক্ষা করেছেন। বোলিং নিয়ে যথা-ইচ্ছা-তাই করেছেন। তিনি যে কেবল চান্স নামক বস্তুর টিকিমাত্র দেখার সুযোগ দেননি, তাই নয়, ব্যাট-ক্রিয়ায় কোনো দর্শনীয় ভ্রান্তিও ঘটাননি।

"কে ব্যাট করতে পারে, আর কে পারে না—এ-বৎসর কে ব্যাট করতে পারছে আর কে পারছে না—এ-বিষয়ে সাধারণের মধ্যে বিচিত্র ধারণা আছে। আমি খোলাখুলি বলতে শুনেছি—হায়, সে রনজি আর নেই। টন্‌টনে [সমারসেটের বিরুদ্ধে] তাঁকে এই অত্যাশ্চর্য পরমোৎকৃষ্ট খেলা খেলতে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা অবিলম্বে স্বীকার করবেন—রনজি সেই একই অপূর্ব খেলোয়াড় আছেন। বর্তমান ব্যাটসম্যান-কুলে তিনি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী।

"তাঁর সুপরিচিত স্টাইলের কথা বাদ দিলে, তাঁর খেলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—ফিল্ডারদের মধ্য দিয়ে বল গলানোর অলৌকিক ক্ষমতা। পূর্বোক্ত রাত্রে একটি প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন—কোনো ক্ষেত্রেই পায়ে বল লাগতে দেবেন না। আমি যতদূর দেখেছি, তিনি একবারই মাত্র ব্যর্থ হয়েছেন—পাঁচটা-নাগাদ উইকেটের ৬ ইঞ্চি বাইরে-পড়া একটি লেগব্রেককে নিজের জুতোর ডগায় লাগতে দেন—স্কোয়ারলেগের দিকে সেটিকে যখন সুইপ করতে চেয়েছিলেন।"

সমকালীন সংবাদপত্রের বিবরণ যথেষ্ট হল। পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছি—ব্যাপারটা যথেষ্ট নীরস দাঁড়াল। অভিপ্রেত নাটকীয়তা এখানে নেই, যা ক্রিকেটারদের কাহিনীতে পাঠক পেতে অভ্যস্ত। সবিনয়ে জানাচ্ছি, এখানে আমার উদ্দেশ্য ভিন্নতর। এই খসড়া-রচনাটিতে কিছু সংবাদ সরবরাহ করতেই চেয়েছি, তাও সব দিতে পারিনি, বাদ দিতে হয়েছে অনেক কিছু, খাঁটি ক্রিকেটের অনেক কথা, যথা, সমকালীন ক্রিকেটারদের কিংবা উইকেটের বিষয়ে রনজির নানা মন্তব্য। না, একেবারে বাদ না দিয়ে সামান্য কিছু জানাই। যথা, সিংহলে পৌঁছে রনজি 'টাইমস অব সিলোন'-এর প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন, সেই কথাগুলি। ঐ সূত্রে আমরা জেনেছি, এম-সি-সি কৃত্রিম-ভাবে উইকেট তৈরী করা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করলে রনজি তার প্রতি পুরো সমর্থন জানিয়েছিলেন। রনজির মতে, ওর দ্বারা ব্যাটিংয়ের কোনো ক্ষতিই হবে না, যেহেতু কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত উইকেট বৃষ্টি পড়লে নরক, এবং বৃষ্টি না পড়লেও উত্তম নয়। অপরপক্ষে বল 'ছোঁড়া' প্রশ্নে বোলারের বিরুদ্ধে এম-সি-সি'র সিদ্ধান্তকে রনজি সমর্থন করতে পারেননি। বোলারের উপরে বিধিনিষেধ আরোপের পক্ষপাতী তিনি নন। বল-ছোঁড়া প্রশ্নে বোলারের 'অসদভিপ্রায়' সম্বন্ধে ক্রিকেট-আইনে যে-কটাক্ষ আছে, রনজি তার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

আমরা দেখি, ১৯০২ সাল থেকে রনজির ক্রিকেট ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে—স্বাস্থ্য একটা প্রধান বিরোধী ব্যাপার ছিল। ১৯০৩ সালে মোট ১৯২৪ রান, গড় ৫৬·৫৮; দ্বিতীয় স্থান। ১৯০৪ সালে ২০৭৭ রান, গড় ৭৪·১৭, প্রথম স্থান। তারপরে ১৯০৫—১৯০৭—এই তিন বছর খেলেননি—নবনগরের জামসাহেব হয়েছেন ইতিমধ্যে। রাজকীয় ভার জমিয়েছেন শরীরে। তারপরে আরও কয়েক বছর অল্প-বিস্তর খেলেছেন, তখন মাঝে-মাঝে রনজি-ঝলক দেখা গেলেও পুরো রনজিকে অবশ্যই পাওয়া যায়নি।

তারপর ঘটল সেই ঘটনা—দুর্ঘটনা—যা রনজিকে সরিয়ে দিল মাঠ থেকে। ১৯১৫ সেপ্টেম্বরে ইয়র্কশায়ারের ক্রসক্লিফ-মুরে শিকার করার সময়ে নিকট-বর্তী চাঁদমারির জায়গা থেকে অসতর্কভাবে নিক্ষিপ্ত গুলিতে ডান চোখে আহত হলেন, যার ফলে ঐ চোখ নষ্ট হয়ে গেল। 'এ পৃথিবীতে মাত্র দুটি মানুষ জানতেন—কে ঐ কাজ করেছে—অপরাধী স্বয়ং এবং রনজি। রনজি জানাননি—কে ঐ কাজ করেছে।'

রনজি জানাতেই পারেন না। তিনি ক্রিকেটার। কখনো কোনো বোলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি। এক্ষেত্রেও করলেন না। রনজি—যাঁর যুগ্ম নয়ন ও দৃষ্টি সম্বন্ধে অগণ্য কাব্যিক শব্দ ব্যয়িত হয়েছে—একচোখে ক্রিকেটে ফেরা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তবু ফিরেছিলেন, ১৯২০ সালে যখন শেষবারের মতো ইংলণ্ডে প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁকে দেখা গিয়েছিল—এবং অনিবার্য ব্যর্থতা লাভ করেছিলেন—চার ইনিংসে ৩৯ রান!

রনজি কেন ফিরেছিলেন? দুই আশ্চর্য চোখের আলো জ্বেলে অলৌকিক সৌন্দর্যে ইংলণ্ডের ক্রিকেট-মাঠে সঞ্চরণ করার পরে কি তিনি দেখাতে চাই-ছিলেন—এক নয়নে অন্তত অর্ধ-অলৌকিক সম্ভব—এই জন্য?

ব্যাপারটা অতটা কাব্যিক কিছু নয়, কিন্তু অবশ্যই চমৎকার-জনক। উইস-ডেনের সম্পাদক এস জে সাদারটনকে রনজি জানান:

"মহাযুদ্ধের পরে ক্রিকেট-মাঠে নামার কারণ, তিনি একটি বই লিখতে চান, যাতে কেবল একচোখে ক্রিকেট-খেলার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হবে।"

না, এখানে রনজি কেবল প্রাক্তন যাদুকর নন, সাক্ষাৎ-বর্তমান ঋষি। অনেক বছর পরে মনসুর আলি পাতৌদির একটি চোখ যাবে—তাঁকে সাহায্য করবার জন্যই রনজি ঐ কাজ করেছিলেন। এবং মনসুর আলিও পিতামহ রনজির লেখা বা না-লেখা বইটি থেকে অনেককিছু শিখে এক চোখে যতখানি মহান ক্রিকেট সম্ভব তাই খেলবেন।

শেষ করে দিতে পারতাম এখানে—একটু নাটকের আভাস এখানে ছিল। কিন্তু পাঠক হয়ত জানতে চাইবেন, ইতিহাসে রনজির স্থান কোথায়? সম-কালীন বিচার কি চিরকালীন রায়? এখানে আমন্ত্রণ করে আনা যেতে পারে ক্রিকেটের প্রধান ঐতিহাসিক এইচ এস অ্যালথামকে। তিনি রনজির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সমালোচনার হিসাব নিয়েছেন, যেমন, রনজির সময়ে উইকেট নিরেট, বোলিং যথেষ্ট উচ্চমানের নয়, ফিল্ডিংও তাই—এইসব। অ্যালথাম কিন্তু বোলিংয়ের নিম্নমানের কথা স্বীকার করেননি। উইকেট [illegible]

কিন্তু মন্দ উইকেটও যথেষ্ট। আসল কথা, ব্যাটসম্যানেরা ছিলেন উচ্চমানের—যার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল ব্যাটিংয়ের স্বর্ণযুগ। অ্যালথাম বলেছেন, রনজি, ফ্রাই এবং জেসপ—এই তিনজন ডবলিউ জি-র পরে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়াতে সর্বাধিক করেছেন। এঁদের মাঠে দেখতে পেলেই দর্শক জানত, তাদের দর্শনীর মূল্য বহুগুণ অধিক ক'রে ফেরত পাবে। রনজি ও ফ্রাই—১৮৯৯, ১৯০০, ১৯০১—এই তিন বৎসরে কদাচিৎ ব্যর্থ। 'এক প্রান্তে বিশুদ্ধ শিল্পের বিস্তার. অন্যপ্রান্তে চূড়ান্ত আত্মনির্মাণ ও নিখুঁত শারীরশক্তি। দিনের পর দিন, সর্বশ্রেণীর উইকেটে, সর্বপ্রকার বোলিংয়ের বিরুদ্ধে, তাঁদের খেলা—আর টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা চতুর্দিকে ছুটে যাওয়া: সবসেরা জুটি ব্যাটসম্যান... খেলছেন একই কাউন্টি দলে...যে-রকম কখনো দেখা যায়নি...

রনজিকে আকাশ থেকে খসে-পড়া প্রতিভারূপে গণ্য করার যে ভ্রান্ত ধারণা বলবৎ আছে, তাকেও অ্যালথাম দূর করতে চেয়েছেন। 'বস্তুতপক্ষে তাঁর থেকে কঠিন অনুশীলন আব কোনো ক্রিকেটার করেননি। বসন্তঋতুতে এক মাস বা বেশি সময় তিনি সেরা পেশাদার বোলার নিযুক্ত ক'রে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভ্যাস করেছেন আত্মরক্ষার কৌশল, যা তাঁর ভারতীয় অভিজ্ঞতা তাঁকে দান করেনি। অবশ্য তাঁর চূড়ান্ত স্বাভাবিক প্রতিভা ছিলই।. .চমকে উঠত আই-ডিয়ার বিদ্যুৎ মনে আর ঝলসে উঠত হাতের ব্যাট একই সঙ্গে। ধারণার উদয় আর তার রূপায়ণ—যৌথ আবির্ভাব। যেভাবে ও-কাজ তিনি করতেন তা আর কোনো মানুষ করতে সমর্থ হননি, ভিক্টর ট্রাম্পাব পর্যন্ত নন।'

ক্রিকেটের প্রধান ঐতিহাসিকের পরে প্রধান সাহিত্যিককে স্মরণ করতে পারি। নেভিল কার্ডাসও মনে-মনে ইতিহাসের পাতা উল্টেছেন। রনজির আগের যুগ—ডাঃ গ্রেসের। 'নব্বুইয়ের দশকের সেই ক্রিকেট সম্পূর্ণ ইংরেজি খেলা। এমন-কি তাকে ভিক্টোরীয়ও বলা যায়। ডবলিউ জি গ্রেস বছরের পর বছর ধরে ক্রিকেটের উপরে ইংরেজি-মার্কা বসিয়ে গেছেন—যুগের ছাপ। সহজ প্রাথমিক নীতির সেই যুগ—সোজা ব্যাটের সুদৃঢ় গণ্যমান্যতা এবং অনুরূপ মাপা বল। গন্ধে পুরো জনবুল।' তারপর হঠাৎ এলো প্রাচ্যের আলো। বদলে গেল সব—নীতি-কথার পৃষ্ঠাগুলো উড়তে লাগল বাতাসে—মহানিয়মের অঙ্কাসীন বেনিয়মের লীলায় সকলে অবিশ্বাসের বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল। অথচ অপূর্ব—প্রাচ্যের পাশে প্রতীচ্যও রইল—রনজির পাশে রইলেন ফ্রাই—যাঁর খেলার বিষয়ে কার্ডাস বলতে চেয়েছেন—তা হল, মহিমান্বিত ব্যাকরণ, কিংবা গণিতের নির্ভুল প্রয়োগ।

কার্ডাসের সঙ্গে বাক্যালাপ হল সে-যুগের বোলার টেড ওয়েনরাইটের। ওয়েন-রাইট স্মৃতির মধ্যে ডুবে বিড়বিড় ক'রে বলতে থাকেন: 'রনজি...ফ্রাই...প্রতি বছর একই কাহিনী...। ব্রাইটনে গিয়েছি, উপরে ঝকঝকে সূর্য। লোহার মতো কঠিন মাঠ। হায়...সাসেক্স টসে জিতল। ফিল্ডিং করতে নামলাম...বল শুরু হল...নির্ঘাত সাড়ে বারোটার সময়ে ভাইন আউট...স্কোরবোর্ডে—সাসেক্স ১-২০। একটায় জর্জ হার্স্ট কিলিককে নিয়ে নিলেন...সাসেক্স ২-৪৩। চমৎকার, চালাও প্যান্‌সি ইয়র্কশায়ার...কিন্তু...দিনশেষে...সেই পুরোতন কাহিনী... সাসেক্স ২-৩৯২...রনজি আর ফ্রাই...'

সি বি ফ্রাই—পরিচিত প্রত্যাশিত সুলিখিত ইতিবৃত্ত। কিন্তু রনজি? কার্ডাস বলেছেন :

"আজ তিনি পৌরাণিক কাহিনীতে পর্যবসিত। একালের ক্রিকেট-প্রেমিকরা তাদের বীরগণের প্রতি ভালবাসার স্বার্থে ব্যস্ত হয়ে বলে, রনজি অন্যান্য প্রাচীন কীর্তিমানের মতোই আমাদেরই কল্পনার রচনা।...এইসব সন্দেহবাদীরা যখন দেবনিন্দা ক'রে যাবে তখন আমরা যারা তাঁকে দেখেছি, নীরব থাকব। যা দেখেছি সে তো আমরাই দেখেছি। এখনো সেই কুহককে যেন স্পর্শ করতে পারি—মনোরথে ফিরে যাই শান্তি ও প্রাচুর্যের হারানো ইংলন্ডে, তার আতপ্ত দিবসে, যখন রনজি ব্যাট করতেন, না-কি আমাদের সম্মোহিত করতেন! বোলারকেও করতেন। সকলকেই করতেন। তারপর যখন আউট হয়ে চলে যেতেন, তখন সহসা যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠতাম। ক্রিকেটারের চেয়ে বেশি-কিছু তিনি। খেলার চেয়ে বেশি-কিছু তাঁর খেলা।" "ক্রিকেট থেকে রনজি যখন বিদায় নিলেন তখন খেলা থেকে চিরতরে বিদায় নিল বিস্ময় আর গৌরব। প্রকৃতির নির্দেশ—দ্বিতীয় রনজি হবে না। আমাদের মতো রনজিকে যাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, তারা যেন কৃতজ্ঞ থাকি। সত্যই কি তিনি ছিলেন—না-কি কেবল স্বপ্ন!"

অ্যালফ্রেড জর্জ গার্ডিনার তাঁর 'পিলার্স অব সোসাইটি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এক অমর রচনায় রনজিকে অভিবাদন জানিয়েছেন। ঐ লেখায় বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন—রনজির প্রতি ইংরেজ-দর্শকদের অতুলনীয় আকর্ষ-ণের কারণ কি। সাধারণ ইংরেজ প্রথমে চমকে উঠেছিল এই দেখে—অবজ্ঞাত পরাধীন ভারতবর্ষের একটি মানুষ ইংরেজের মতো করে ক্রিকেট খেলতে পারেন। না, ততোধিক—ইংরেজের সাধ্যাতীত উপায়ে খেলতে পারেন!! ইংরেজ-দর্শক দেখল—পরাধীন দেশের লোকটি মাঠে দাঁড়িয়ে এমনভাবে ব্যাট চালিয়ে যাচ্ছেন, যার কুহক-সৌন্দর্য চোখের উপরে টেনে আনছে এক বিশাল স্বপ্নময় দেশের ছবি, যে-দেশকে তারা শাসন করে, অথচ সন্ধান করেনি তার গোপন রহস্যকে কোনোদিন। মুখের হাসি ও হাতের ব্যাট নিয়ে জামসাহেব তাদের কাছে ভারতের শ্রেষ্ঠ দূত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

গার্ডিনার তাঁর দেখা ক্রিকেটারদের মধ্যে রনজিকে সর্বোচ্চে স্থাপন করেছেন। বিচারমুখে বলেছেন : 'আগেও এই ক্রীড়ার রাজন্যবর্গ ছিলেন, যাঁদের কাছে নতজানু হয়েছি।' ইংরেজ-জাতির প্রথম পূজা-বিগ্রহ বিপুল কৃষ্ণ শ্মশ্রুবহুল মানুষটি—ডাঃ গ্রেস—যিনি দাউদাউ-জ্বলা অগ্নিদেবতা। এমনই প্রতিভা তাঁর যে কার্পেন্টার তাঁর বিরুদ্ধে বল করে সগৌরবে বললেন, 'যে-জায়গায় আমি বল ফেলতে চেয়েছি ঠিক সেখানেই ফেলতে পেরেছি।' তারপর সসম্ভ্রমে যোগ করলেন, 'আর তিনি সেগুলিকে যেখানে পাঠাতে চেয়েছেন সেখানেই পাঠিয়ে-ছেন।' অস্ট্রেলিয়ান স্পফোর্থের কথা গার্ডিনারের মনে উঠেছিল, যিনি দূরে থেকে মহাবেগে নিক্ষিপ্ত ভল্লের মতো ছুটে এসেছিলেন, দুর্বার গতি ও প্রচণ্ড কামনার প্রতীক; লোম্যান : বহুগুণান্বিত, স্বচ্ছন্দ, সতেজ ও মৌলিক; জনি ব্রিগস্ : অনবদ্য ভঙ্গিকারী, নবনবোন্মেষিত চতুরতার আবেগের প্রতিযোগী;

[illegible]

"আশির দশকের গোড়ায় লর্ডসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর ১৪৮ মনে পড়ে? ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন গ্রেস, লুকাসও। ইংলণ্ডের ভাগ্যাকাশ অন্ধকার। এক-গুঁয়ে লড়িয়ে রিচার্ড বার্লোকে সঙ্গে নিয়ে স্টীল ধীরে-ধীরে খেলাটিকে টেনে তুললেন। বোলিংকে মারলেন, ভাঙলেন, পদানত করলেন, ধুলায় মিশিয়ে দিলেন।"

গার্ডিনার বললেন: হাঁ, জামসাহেবের আগেও বিরাটাকার ব্যক্তিরা ছিলেন। তথাপি একথা অনস্বীকার্য—এই ভারতীয় মানুষটি ইংরেজি-খেলাটির চূড়ান্ত শিল্পস্রষ্টারূপে চিরদিন স্বীকৃত হবেন। তাঁর রান-কীর্তির হিসাবের উপরে ঐ মন্তব্য নির্ভরশীল নয়, যদিও সেদিক দিয়েও ঐ দাবি স্বীকার্য থাকবে। তিন-বার তিনি তিনহাজার রানের বেশি করেছেন, সে রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেননি। এবং সেই বিস্ময়কর কাণ্ডটি—একদিনে একই খেলায় দু'ইনিংসে দুটি ডবল সেঞ্চুরি—কোনো দুর্বল আক্রমণের বিরুদ্ধে নয়, নানামুখী অভিসন্ধিতে পূর্ণ প্রতিজ্ঞাকঠিন ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে।

কিন্তু গার্ডিনার জানেন এবং অনবদ্যভাবে জানিয়েছেন, রনজির মহিমা সংখ্যা-নির্ভর নয়। রনজির স্টাইলই প্রথম ও শেষ কথা। রনজির স্টাইলের উপরে গার্ডিনারের অসামান্য রচনার মোটামুটি অনুবাদ এই:

"কত সংখ্যায় [রান] করা হল তা দিয়ে নয়, কিভাবে তা করা হল, তাই দিয়ে ক্রিকেটারের বিচার। ওয়াশিংটন আরভিং বলেছেন, 'সাহিত্য এবং অর্থ-নীতিতে প্রচুর ছাপা কাগজ এবং প্রচুর দারিদ্র্যের সহাবস্থান সম্ভব।' ক্রিকেটেও প্রভূত রান এবং প্রভূত নীরসতা একত্র থাকতে পারে। ক্রিকেট যদি এখন ক্রমেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়তে থাকে, তাহলে তার কারণ, এখন তা আনন্দময় দুঃসাহ-সিকতার প্রবণতা ত্যাগ করে পরিসংখ্যানের উৎপাদক যন্ত্র হতে মনস্থ করেছে। খেলায় এমন-সব স্থূলস্বভাব কারিগর থাকতে পারে যারা, যন্ত্র যেভাবে বিনা চেতনায় আলপিন বের করে, ঠিক সেইভাবেই ব্যাট থেকে রান বের করে।... তাদের খেলায় না আছে রঙ, না রস, না প্রাণ না চরিত্র। খেলা—খেলা নয় তাদের কাছে, নিছক ব্যবসা। যেমন ছিল স্রুসবেরীর কাছে। বিস্ময়করভাবে নিখুঁত তাঁর আঙ্গিক, কিন্তু ছিল না আত্মার স্পর্শ। ছিল না সূর্যালোক, চকিত বিস্ময় কিংবা অপূর্ব নিঃস্বার্থতা।...অপরদিকে জামসাহেবের খেলা তাঁর মুখের মতোই সূর্যোজ্জ্বল। কৃপণের সংগ্রহ তাঁর নয়, কোটিপতির বিতরণ। অপূর্ব এক বিচারশীল অমিতব্যয়িতা। মনে হত, তাঁর ঝুলিতে রান ভরে গিয়ে উপচে পড়ছে, সেগুলিকে তিনি প্রত্যাশী উৎসুক বিপুল জনসংঘের উপরে আশীর্বাদের আকারে বর্ষণ করতে ব্যগ্র।...

"ক্রীড়ারীতির দিক দিয়ে একথা নিশ্চিত বলা যাবে, আমাদের কালে অন্তত তাঁর চরিত্রের কাউকে পাওয়া যাবে না। তাঁর রীতিতে বাহ্য প্রদর্শনীর অংশ কত অল্প।...আমাদের নিজেদের স্টাইলিস্টদের মতো বাহার-দেওয়া সৌন্দর্য তাঁর নয়—তাঁর ছিল আশ্চর্য পরিমিত সক্রিয়তা। বোলার যখন ছুটতে শুরু করে তখন সাধারণ ব্যাটসম্যান স্বাভাবিক সংস্কারে একইসঙ্গে গতিশীল হয়। শত্রুর গতির সঙ্গে সে তাল রাখতে চায়। নাটকে কাহিনী যখন চরম সংকটের অভিমুখী, তখন আবহসঙ্গীত যেভাবে চড়তে থাকে, এখানে ব্যাটসম্যানের

ভাবভঙ্গিও তেমনই হয়। তারপর যখন সে মার শেষ করে, দেখা যায় যে, চক্রবৎ ঘুরছে ব্যাট, স্থানচ্যুত হয়েছে পা, গতির বেগে ভ্রষ্ট হয়েছে সে পূর্বাবস্থা থেকে। হেওয়ার্ডের মতো খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে এটা হয়ত পরিকল্পিত 'ঘূর্ণাবর্ত,' তাতে আছে নিখুঁত নৈপুণ্য, একঘেয়েমি এবং কর্মকৌশল—যা থাকে আইন-গ্রন্থে—আর আইনের বই পড়ার ফলশ্রুতিও এখানে ঘটে—অনিবার্য নিদ্রা। কিংবা হয়ত তা জন টিলডেস্‌লির অপূর্ব উন্মত্ততার 'ঘূর্ণাবর্ত,' অনিয়মের সাধনায় সিদ্ধগৌরব যিনি, আইনকানুন ব্যাপারটা আছে কোনোদিন যেন শোনেননি, সবকিছুই করেন দ্রুত ঝলকিত প্রেরণায়।...জামসাহেবের স্টাইল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বোলার যখন উইকেটের দিকে ছুটে আসছে তখন তিনি নিষ্কম্প। বল দেওয়া হল—তখনও তাই। কোনো ব্যবস্থাই তিনি নেননি—বল এসে পড়েছে—এমন সময়, পূর্বপ্রস্তুতির আড়ম্বর ছাড়াই, ব্যাট ঝলসালো, আর মারও শেষ হয়ে গেল। শরীরের নড়চড় হয়নি যেন, পা বাহ্যত অটল, ব্যাট যথাপূর্ব। কিছুই ঘটেনি—শুধু একটা আকস্মিক ঝলক, একেবারে যথাসময়ে, নির্দ্বিধায় ঘটে গেছে, 'চলচপলার চকিত চমকে।' বিদ্যুতের অস্তিত্বের কথা কি কেউ জানে যতক্ষণ না তা ঝলসায়?

"স্বল্পতম প্রয়াসে সর্বাধিক ফললাভ যদি সর্বোচ্চ শিল্পের লক্ষণ হয়, তাহলে ব্যাটসম্যান হিসাবে জামসাহেব স্বতন্ত্র জগতের অধীশ্বর।...মহান রেখা-শিল্পী তাঁকে বলি যিনি একটি রেখার টানে অনন্তকে উন্মোচন করেন। তিনিই মহান নাট্যকার যিনি একটি সার্থক শব্দে আলোড়িত করেন আত্মাকে। কোলরিজ বলেছেন, শীলার ভয়ঙ্করতাকে আঁকতে একটি গোটা নগরীতে আগুন লাগিয়ে দেন; শেক্সপীয়ার সেখানে একটি রুমাল ফেলে দেন, আর আমাদের রক্ত জমে হিম হয়ে যায়। অন্যান্য ব্যাটসম্যানেরা একটা বল খেলার জন্য কত-কি জটিল কায়দাকানুনের মধ্য দিয়ে যান, সেখানে জামসাহেবের ক্ষেত্রে শুধু কব্জির মোচড় এবং মুহূর্তে বল গিয়ে ধাক্কা খায় বেড়ায়। এটা ভোজবাজি ভেলকি নয়, এ হল লক্ষ্যে পৌঁছবার পক্ষে ন্যূনতম অব্যর্থতম প্রয়াস।"

এই রনজি—বিদায় নেবেন ক্রিকেট থেকে—গার্ডিনার লেখনীতে তুলে নিয়েছেন মহান বিদায়সংগীত:

"শেষ বল গড়িয়ে গেছে মাঠের উপর দিয়ে। এবারের মতো খেলা শেষ।...লর্ডসের গ্র্যান্ড-স্ট্যান্ড নির্জন, শূন্য। ক্রিকেটকে বিদায় দিয়েছি আমরা, আর বিদায় দিয়েছি ক্রিকেটের রাজাকে। ক্রিকেট আবার আসবে যখন ফিরবে বসন্ত, নবীন তৃণ, তরু। কিন্তু রাজা ফিরবেন না। কারণ জামসাহেব এখন চল্লিশে পৌঁছে গেছেন, দেহ হয়ে পড়েছে স্থূল। সেইসঙ্গে তাঁর রাজ্য নবনগর, সেখানকার মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি, উজ্জ্বল রৌদ্র, মসলাগন্ধ, তালীবন তাঁকে ডাকছে, রাজকর্তব্য পালনের জন্য। প্যাভিলিয়নের সিঁড়ি দিয়ে মুখভরা হাসি নিয়ে লঘুপদে নেমে আসতে আর তাঁকে দেখব না। সুখরৌদ্রের মধ্যে আসীন থেকে তাঁর অতুলনীয় রূপকলা দেখতে-দেখতে সারাদিন কেটে যেত। তারপর যখন সন্ধ্যার ছায়া আড়াআড়ি রেখা টেনে দিত তৃণাস্তীর্ণ মাঠের উপরে তখন আমরা ফিরে যেতাম মাঠ থেকে তৃপ্তিভরা মন নিয়ে—না, তা আর ঘটবে না। বহুসমাদৃত ধন্য অভিনেতা শেষ রজনীর শেষে বিদায় নিয়েছেন। এখন তিনি শুধু স্মৃতি

—সুখস্মৃতির রাজ্যে। নমস্কার করি নমস্কার। জামসাহেব! ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজ-কুমার—বৃহৎ খেলার সম্রাট।"

* * * ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট-সিরিজ—১৯৬৪ * * *

মাদ্রাজে প্রথম টেস্ট

১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট-সিরিজ খেলা হয়। তার আগের তিনটি সিরিজে (১৯৪৭-৪৮, ১৯৫৬-৫৭, ১৯৫৯-৬০) মোট তেরোটি টেস্ট খেলা হয়েছিল। ভারত জিতেছিল মাত্র একটিতে, হেরেছিল আটটিতে, অমীমাংসিত চারটি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রেকর্ডে দেখা যায়—উভয় দেশের টেস্ট-সিরিজে তখন-পর্যন্ত সর্বাধিক মোট রান ডন ব্রাডম্যানের। ১৯৪৭-৪৮ সিরিজে চারটি সেঞ্চুরিসহ রান ৭১৫। ভারতের পক্ষে ৬টি টেস্ট খেলে সর্বাধিক রান করেছেন নরী কণ্ট্রাকটার—৪৮০। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যাটিং-গড় ব্রাডম্যানের ১৪৫'০০। ভারতের পক্ষে বিজয় হাজারের—৪৭'৬৬। বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বাধিক উইকেট বেনোডের—৮ টেস্টে ৫২ উইকেট—গড় ১৮'৩২। ভারতের পক্ষে মানকদের—৮ টেস্টে ২৩ উইকেট—গড় ৪১'০০। ভারতের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ব্রাডম্যানের—২৩১। অস্ট্রে-লিয়ার বিরুদ্ধে হাজারের—১৪৫। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৮ জন ১৫টি এবং ভারতের পক্ষে ৫ জন ৭টি সেঞ্চুরি করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ ইনিংস ১৯৪৭-৪৮-এ এডিলেডে—৬৭৪।একই স্থানে ভারতের সর্বোচ্চ রান—৩৮১। অস্ট্রেলিয়ার সর্বনিম্ন রান ১৯৫৯-৬০-এ কানপুরে—১০৫, ভারতের সর্বনিম্ন রান ১৯৪৮-৪৮ ব্রিসবেনে—৫৮।

এইসব ও অন্যান্য হিসাব সামনে ঝুলিয়ে ২ অক্টোবর ১৯৬৪, মাদ্রাজে নেহরু-স্টেডিয়ামে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টম্যাচ আরম্ভ হল। পাতৌদি সিম্পসনের কাছে টসে হারলেন। অস্ট্রেলিয়া সানন্দে আরম্ভ করল। ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ল্যরী ও সিম্পসন রান ক'রে চলেন, না ক'রে পারেননি, কারণ ভারতের সূচনার বোলার রঞ্জনে ও জয়সীমা সুইংয়ের পিত্তরক্ষার জন্য অবতীর্ণ। ৬৬ রানের মাথায় দুরানী সিম্পসনকে টেনে এনে সরিয়ে দেন—উইকেটকীপার ইন্দ্র-জিৎ সিং তাঁকে স্টাম্পড্ করেছিলেন। ল্যরী কিন্তু অবিচলিত, এবং নবাগত ও'নীল পুরো চক্ষুস্মানের খেলা না খেললেও ভাগ্যসম্পন্ন। তাঁদের সরাবার জন্য বোরদেকে আনা হলে, বোরদের নাতিবক্র, অস্থান-পতিত বলের সাহায্যে তাঁরা রান বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। তখন উদিত হলেন নাদকার্নি, অপরকে অস্তে পাঠা-বার জন্য। সেইকাজে তিনি সহায়ক পেলেন কৃপাল সিং ও দুরানিকে। ১২৭ রানের মাথায় তিনি ল্যরীকে বোল্ড করে দিলেন, যিনি হিসেবী আক্রমণে ৬২ রানের সুষ্ঠু ইনিংস খেলেছেন। "লাঞ্চের পরেই অস্ট্রেলিয়ার ধ্বসে-পড়া শুরু হয়। ভয়ঙ্কর ভূমিকা নাদকার্নির, যিনি সর্বদা স্টাম্প আক্রমণ করে গেছেন, এবং ব্রেকের সঙ্গে সোজা বল মিশিয়ে ব্যাটসম্যানকে হতবুদ্ধি করেছেন, যারা পিছিয়ে ব্রেক-বল খেলতে গিয়ে সহসা দেখেছে বলটি সোজা ছুটে আসছে।...এই বিধ্বংসী মোহবিস্তারের সময়ে নাদকার্নির যোগ্য সহযোগী কৃপাল সিং। ঐকালে অস্ট্রে-লিয়ার শেষ পাঁচটি উইকেট গেছে ৭ ওভারে, ৮ রানে। ভারতের সবসেরা বোলিং-

স্পেল-এর একটি এই।"

২১১ রানে অস্ট্রেলিয়া আউট। নাদকার্নি : ১৮-৬-৩১-৫। কৃপাল সিং : ১৮-৫-৪৩-৩। দুরানি : ২১-৫-৬৮-২।

নাদকার্নি ও কৃপাল সিং-এর সৎকর্মফল ক্ষয় করবার জন্য তারপর ভারত-পক্ষে মাঠে নেমে ইন্দ্রজিৎ সিং ও সরদেশাই ১৩ রানের মধ্যে বিদায় নিলেন। জয়সীমা ও মঞ্জরেকর অবশিষ্ট সময় কাটিয়ে দিতে পারায় দিনশেষে ভারতের রান হল —২—৩৪।

প্রথম দিনেই উইকেট স্পিন নিচ্ছিল, অস্ট্রেলিয়ার মার্টিন বাঁ-হাতের উত্তম স্পিনার। ম্যাকেঞ্জির মতো সুইং-সমর্থ দ্রুত বোলারও সেই দলে আছেন, হক্‌ও অমর্যাদার পাত্র নন, আর...সিম্পসন বিচক্ষণ অধিনায়ক। দ্বিতীয় দিন সকাল থেকেই সিম্পসন একদিকে মার্টিনকে লাগিয়ে রাখলেন, অন্যদিকে বদলে ব্যবহার করতে লাগলেন ম্যাকেঞ্জি ও হককে, ছাড়া ও টানার প্যাঁচ খেলায়। আকাঙ্ক্ষিত ফলও পেয়ে চললেন। অনুল্লেখ্য রানে ক্রমান্বয়ে বিদায় নিলেন জয়সীমা, হনুমন্ত সিং ও মঞ্জরেকর। ভারতের রান দাঁড়াল ৫ উইকেটে ৭৬। পাতৌদি ও বোরদে জুটি বাঁধলেন, ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অর্ধ ভগ্নাংশের উপরে। নৈরাশ্যের অন্ধকারের সঙ্গে তাঁরা ধীরে লড়াই ক'রে চললেন। লাঞ্চের সময় পর্যন্ত তাঁরা থাকলেন—ভারতের রান ৫—১০৮।

এবং চায়ের সময় পর্যন্ত তাঁরাই থাকলেন—ভারতের রান ৫—১৮৮। পাতৌদি ৬৯, বোরদে ৩৬। ভারতের আকাশ পরিষ্কার। এই জুটি ঘাঁটিরক্ষা করছে। চায়ের পরে নতুন বল নেওয়া হলে বোরদে ম্যাকেঞ্জির আউট-সুইঙ্গারকে অনুচিত স্পর্শে যখন স্লিপে সিম্পসনের হাতে তুলে দিলেন তখন তাঁর ব্যক্তিগত রান ৪৯, পাতৌদির সঙ্গে জুটি-বাঁধা রান ১৪২, ভারতের রান ২১৮—অস্ট্রেলিয়ার রানসংখ্যা পেরিয়ে গেছে।

দুরানি এলেন—ম্যাকেঞ্জির শূন্যে-বাঁকা বলে টলমল করতে লাগলেন—পতন ঘটল অচিরে—নাদকার্নি এলেন—

না, দুরানি, নাদকার্নিতে কারো মন নেই—সব চোখ গিয়ে আঠার মতো জুড়ে আছে পাতৌদির ব্যাটে—কেবল সৌন্দর্যের লোভে নয়, আরো কিছুর আকর্ষণে।

লাঞ্চের আগে ৫—৭৬ রানের সময় যে-পাতৌদি এসেছিলেন তিনি অধিনায়ক, তারুণ্যকে উৎসর্গ করেছেন দায়িত্বের পায়ে। পাতৌদি ধীর লয়ে খেলেছিলেন বোরদের সঙ্গে। বুদ্ধি না হারিয়ে, বিবেচনাকে সম্বল ক'রে, মাঝে-মাঝে প্রতিভার দর্পণে নিজের মুখ দেখে নিয়ে, গহ্বর থকে বেরিয়ে আসার সেই অনবদ্য প্রয়াস। তাতে সফল হয়েছিলেন। তারপর উপরে উঠে মোকাবিলা করতে চাইলেন শত্রুর সঙ্গে—যারা তাঁদের গর্তে ঠেলে দিয়েছে। চায়ের আধ ঘণ্টা আগে থেকে তাঁর সুন্দর প্রতিহিংসা ছুটে যেতে লাগল গ্লান্স, পুল, ড্রাইভের আকারে। শূন্য চিরেও বেরিয়ে যেতে লাগল বলের রক্তবিদ্যুৎ। চায়ের পরে সবাই হঠাৎ সচেতন হয়ে দেখল, পাতৌদি যেন অজান্তে সকলকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন একটি বিজয়মঞ্চের কাছে, যার উপরে টাঙানো আছে তাঁর পিতার ছবি, তারও উপরে আরো দুটি ছবি...দলীপের...এবং রণজির...অস্ট্রেলিয়ার

সঙ্গে প্রথম টেস্টখেলাতে যাঁরা সেঞ্চুরি করেছেন...তারই নীচে এখন দাঁড়িয়ে মনসুর আলি! তিনি চাইলেন, কাজটা আজকেই সমাধা করাই ভাল, কারণ আজ নগদ, কাল ধার...মিলবে কি-না ঠিক নেই। ঝুঁকি নিয়ে কভারের উপর দিয়ে বল চালালেন, তারপর কাট করলেন, বলটি একটু উঠেও গেল, রান হল ৯৭। দিনের শেষ ওভার এসে গেল। এখনো সুযোগ আছে। না, মাত্র একটি খুচরো রান নিতে পারলেন। অপরাজিত ৯৮ নিয়ে এবং স্বপ্ন-জড়ানো উদ্বেগ নিয়ে, ফিরে চললেন প্যাভিলিয়নে, তখন ভারত ৭ উইকেটে করেছে ২৪১, এবং ম্যাকেঞ্জি উচ্চাঙ্গের বল করে পেয়েছেন ২৫—৬—৪৩—৪, সেই সঙ্গে মার্টিন ২৫—১১—৫৫—২।

তৃতীয়দিনে পাতৌদি নিজেকে এবং হাজার-হাজার দর্শককে আলোছায়ার খেলা দেখালেন না—আলোই দেখালেন—পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুটি গ্লান্সের সাহায্যে আকাঙ্ক্ষিত সেঞ্চুরি করে, ব্যাট উঁচু করলেন ঊর্ধ্বে, সম্ভবত—সম্ভবত কেন নিশ্চয়ই—পিতার উদ্দেশ্যে। তারপর ব্যাট নামিয়ে চালিয়ে গেলেন, থামবার উপায় ছিল না, যেহেতু নাদকার্নি, কৃপাল সিং, রঞ্জনে দ্রুত-পদে দৌড় দিচ্ছিলেন, উইকেটের মধ্যে নয়, প্যাভিলিয়নের দিকে। পাতৌদি ১২৮ করে, আউট না হয়ে যখন ফিরলেন, ভারতের রান তখন ২৭৬, প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ৬৫ রান এগিয়ে।

অধিনায়ক সিম্পসন, ল্যরীকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করতে নামলেন—তাঁর সামনে প্রথম দায়িত্ব—ঐ অপমান ও অস্বস্তিদায়ক ৬৫ রানের ব্যবধান মুছে ফেলা। দ্বিতীয় দায়িত্ব, ভারতীয় স্পিনারদের প্রাধান্য করতে না দেওয়া। তৃতীয় দায়িত্ব, যত সময় সম্ভব উইকেটে থেকে, রান তুলে, উইকেটের স্বাস্থ্য নষ্ট করে ভারতকে চতুর্থ ইনিংসে ম্যাকেঞ্জির মুখে ঠেলে দেওয়া, যিনি প্রথম ইনিংসে ৫৮ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ভারতীয় রক্তমাংসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখিয়ে দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ানদের পক্ষে ভারতীয় স্পিনারদের মোকাবিলা করার কাজটা সহজসাধ্য হয়েছিল এইজন্য যে, উইকেট প্রথম দু'দিন বিচিত্রভাবে স্পিন নিলেও তৃতীয় দিন থেকে বলের বক্রোক্তিকে অপছন্দ করছিল। তথাপি নাদকার্নির বিষদাঁত ভাঙেনি। সিম্পসন-ল্যরী জুটি যখন ৯১ রান করেছে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ল্যরীকে, (ল্যরী ক বদলী ব নাদকার্নি ৪১), একই ওভারে ও'নীলকে। ল্যরী আগেই যেতেন, যদি-না ২২ রানের মাথায় কৃপাল সিং নাতিব্যস্ততার আভিজাত্যে দুরানির বলে ওঠা তাঁর ক্যাচকে উপেক্ষা করতেন।

কিন্তু একথা ভুললে চলবে না—সিম্পসন ও ল্যরী যখন ব্যাট করছিলেন, তখন সম্ভবত বিশ্ব-একাদশের ওপেনিং জুটিই ব্যাট করছিল। সিম্পসন স্বকার্য-সচেতন। ব্যস্ত না হয়ে, বিপক্ষকে ব্যস্ত না ক'রে, তথাপি চাপা উদ্বেগের কাঁটা ফুটিয়ে-ফুটিয়ে, তিনি রান ক'রে গেছেন, ব্যবধান মুছেছেন, জমাও দিয়েছেন নিজ ভাণ্ডারে মাঝারি মাপের রান...এবং আত্মক্ষয় করেননি। অস্ট্রেলিয়া দিনশেষে ২—১৫৪। সিম্পসন ৬৭, অপরাজিত।

চতুর্থ দিনে ভারত ফিরতি লড়াই শুরু করল। ২৩ মিনিটের মধ্যে সিম্পসন গেলেন রানআউট হয়ে—৭৭ রান ক'রে। তারপর বার্জ ও বুথ জুটি বেঁধে

৫৩ রান করার পরে হঠাৎ নামল ধ্বস—বার্জ গেলেন নাদকার্নির বলে এল-বি হয়ে (৬০)। ৪ রান পরে বুথ দুররানির বলে উইকেটকীপারের হাতে কট। রেডপাথও গেলেন অবিলম্বে নাদকার্নির বলে উইকেটকীপারের হাতে। অস্ট্রেলিয়া ৬—২৩৭। ১৫ মিনিটের মধ্যে ২৩টি বলে ৩ জন অস্ট্রেলিয়ান গেছেন। তারপর—

আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ! লাঞ্চ ও চা-এর মধ্যে ৬টি ওভারবাউন্ডারি। মার্টিন ও ভিভার্স কাণ্ডটা ঘটালেন। সপ্তম উইকেটে ৫১ মিনিটে ৬৪ রান ক'রে তাঁরা ঐ উইকেটে ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলীয় রেকর্ড করলেন। মার্টিন গেলে (৩৯), ভিভার্স ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে অষ্টম উইকেটে জুটি বেঁধে আবার রেকর্ড করলেন, ৬৩ মিনিটে ৭৩ রানের। ভিভার্স ৭৪, ম্যাকেঞ্জি ২৭। অস্ট্রেলিয়া ৩৯৭। ভারতের সঙ্গে ৩২৩ রানের ব্যবধান—জিততে গেলে ভারতকে যা অতিক্রম করতে হবে চতুর্থ ইনিংসে। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসশেষে ভারত হিসাব মেলাতে গিয়ে একমাত্র নাদকার্নি ছাড়া গৌরবের কিছু খুঁজে পায়নি। নাদকার্নি : ৫৪·৪—২১—৯১—৬।

খেলা শেষ হতে ৫৮ মিনিট বাকি—ভারত দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করল—এবং যৎপরোনাস্তি নিজের সর্বনাশ করল : জয়সীমা ব ম্যাকেঞ্জি—০; ইন্দ্রজিৎ সিং ব হক—০; সরদেশাই ক রেডপাথ ব মার্টিন—১৪; কৃপাল সিং ব ম্যাকেঞ্জি—০।

ভারত চার উইকেটে ২৪।

পঞ্চম দিনে ভারত আবার প্রতিরোধ শুরু করল হনুমন্ত ও মঞ্জরেকরের সাহায্যে, লাঞ্চ পর্যন্ত দু'জনে খেলে চললেন, জুটিতে ৯৩ রান হল, কিন্তু লাঞ্চের পরেই যেতে হল মঞ্জরেকরকে। পাতৌদি এলেন রেকর্ড মাথায় চাপিয়ে, এক রান করে রানের খাতা খুললেন, কিন্তু তাঁকে খাতায় অধিক অঙ্কপাতের দায় থেকে ছুটি দিলেন ম্যাকেঞ্জি—তাঁর ইয়র্কারে অবিলম্বে ছিটকে গেল লেগস্টাম্প। এলেন বোরদে, ধীরে, মাটি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, ফিরে গেলেন একই-ভাবে, প্রথম বলেই তাঁর উইকেটও ভেঙে দিলেন ম্যাকেঞ্জি। নাদকার্নি আসছেন, হ্যাটট্রিক-লোভী হায়নার মতো উইকেট ঘিরে আছে অস্ট্রেলিয়ানরা, না, হ্যাট-ট্রিক হয়নি, কিন্তু শেষপর্যন্ত ম্যাকেঞ্জি উইকেট পেয়েছিলেন ২০—৯—৩৩—৪, দু' ইনিংসে দশ উইকেট, এবং তাঁর সহযোগী দ্রুত বোলার হক মোট চার—তার দ্বারা দেখা গেল, ভারতের গতিতে দুর্গতি!

প্রথম ইনিংসে ৬৫ রানে অগ্রগামী ভারত যে, শেষপর্যন্ত চরম অপমানের পরাজয় লাভ করেনি, তার কারণ দ্বিতীয় ইনিংসে হনুমন্ত সিং দলের দায় একার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অনবদ্য তার ৯৪ রান। '৪ উইকেটে ২৪ রানের মাথায় তিনি ক্রীজে আসেন। কিন্তু ঐ পরিস্থিতিও তাঁর ব্যাটিংকে প্রভাবিত করেনি। অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণকে ফিরে আক্রমণ করা যায় তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। ২০৫ মিনিটের অবস্থানকালে ১৮টি বাউন্ডারি করেছেন, খুচরো রান মাত্র ১১। এবং এই সংখ্যাতত্ত্ব তাঁর ব্যাটিংয়ের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনোই সুবিচার নয়।' হনুমন্তকে সরাবার জন্য ন্যায়-অন্যায় সকল চেষ্টাই বোলার করেছে। হক তাঁর উপরে না-হক নরঘাতী বীমার ছুঁড়েছেন, খাড়া

দাঁড়িয়ে তাকে হুক করতে চেষ্টা করেছেন হনুমন্ত, ব্যাট ঠিকভাবে লাগাতে পারেননি, তা ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছে উইকেটকীপার গ্রাউটের ডান কানে এবং সেখানে ফ্রাক্চারসহ (বলাবাহুল্য এবার অনুতপ্ত হুকের ব্যথাসহ) গ্রাউট মাঠ ত্যাগ ক'রে গেছেন ভাগ্যের পরিহাস কথাটাকে প্রমাণ করতে।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টে জয়ী ১৩৯ রানে। সিরিজে এক ধাপ এগিয়ে।

বোম্বাইয়ে দ্বিতীয় টেস্ট

ব্র্যাবোর্ন-স্টেডিয়ামে ১০ অক্টোবর দ্বিতীয় টেস্ট আরম্ভ হল পরীক্ষা-মূলকভাবে নির্মিত নতুন পীচে, যা সন্দিগ্ধ ক'রে রেখেছিল অস্ট্রেলিয়ানদের, এবং বিরক্ত করেছিল বিবেচক ভারতীয়দের। মাটির তলায় দু' থাক ইঁট বিছিয়ে, বোলার ও ব্যাটসম্যানকে সমসুযোগ দেবার অভিপ্রায়ে রচিত এই উইকেটকে টেস্টম্যাচের দ্বারা প্রথম পরীক্ষা করার প্রয়াসকে অস্ট্রেলিয়ানরা মোটেই পছন্দ করেননি, বিশেষতঃ উইকেটে যখন ঘাসের চিহ্ন ছিল না, ফলে স্পিনারদেরই সুবিধা হবার কথা। আর, অস্ট্রেলিয়ানরা ঐ সন্দেহ করবার কারণ খুঁজে পেয়েছে বলে ভদ্রমন ভারতীয়রাও সন্তুষ্ট হল না একটুও। সূচনায় উইকেট সত্যই স্পিন নিয়েছিল, বলের লাফানোও অনিশ্চিত ছিল, আকাশে মেঘাড়ম্বর কম ছিল না, কিন্তু ক্রমে উইকেট সহজ হয়েছে, বল নিয়মিত ছন্দেই লাফিয়েছে, আকাশের মেঘ কেটেছে এবং অস্ট্রেলিয়া দিনশেষে সুখদায়ক রান তুলেছে—৬ উইকেটে ৩০১। সিম্পসন দ্বিতীয়বার টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার এমন তৃপ্তিকর দিনান্ত হবে বোঝা যায়নি গোড়ায়, বিশেষতঃ যখন ৫৩ রানে তাদের তিন উইকেট পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বার্জ (৮০) প্রতিরোধ করেছিলেন কাউপারের (২০) সহযোগিতায়, (চতুর্থ উইকেট জুটিতে ৮৯ রান, ৮০ মিনিটে), তারপর হাল ধরেছিলেন পূর্ব টেস্টের সফল আততায়ী ভিভার্স (৬৫ নটআউট), জার্মানের (৭৮) সঙ্গে জুটি বেঁধে, ৬ষ্ঠ উইকেটে ১৫১ রানের রেকর্ড করে।

ভারতপক্ষে আক্রমণে ধার এনেছিলেন পুরাতন নাদকার্নি। নিখুঁত তাঁর লেংথ, যা ব্যাটসম্যানের চাঞ্চল্য নিবারণ করে। তাঁর বোলিংয়ে এমনই রান-গত মিতব্যয়িতা যে, ব্যাটসম্যান শেষে ক্ষুধায় ছটফট করে। সে অস্থিরতা সীমা ছাড়ালে তাকে টুক্ করে তিনি তুলে নেন সাধু চৌর্যের হস্তকৌশলে। তরুণ চন্দ্রশেখর কিন্তু এতখানি প্রশান্ত-নৈপুণ্য নন, সর্বদাই আগ্রহে উদ্যত এবং দংশনে জ্বালাময়। সেইসঙ্গে তাঁর ভেদশক্তি মারাত্মক—তা প্রমাণ করেছেন সিম্পসন ও বুথকে বোল্ড ক'রে।

দ্বিতীয় দিন সকালে অস্ট্রেলিয়ার বাকি তিনটি উইকেট আধ ঘণ্টার মধ্যে পড়ে গেল (ও'নীল ব্যাট করেনি)—মাত্র ১৯ রানে—সম্ভব ছিল না চন্দ্র-শেখরকে নিবারণ করা তাঁদের পক্ষে—যিনি আরও দুটো উইকেট নিলেন। এইকালে চমকপ্রদ তাঁর বিষমারা—৪—৩—১—২। সব জড়িয়ে ২—১০—৫০—৪। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হল ৩২০ রানে।

ভারত প্রথম ইনিংসে আরম্ভ করে ৩০ রানে প্রথম ২ উইকেট খুইয়েও

যে শেষপর্যন্ত এইদিন ৪ উইকেটে ১৭৮ রান করতে পেরেছে, তার মূলে জয়সীমা-মঞ্জরেকর জুটির সতর্ক আত্মরক্ষা ও সাবধান পদক্ষেপ, যাঁরা একত্রে ১১২ রান ক'রে দলের রানকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন ১৪২-এ। ওরই মধ্যে মঞ্জরেকর টেস্টে তিনহাজার রান করার গৌরবলাভ করেছেন (উমরিগরই মাত্র দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি ঐ গৌরব পেয়েছেন)। উইকেট অল্পবিস্তর স্পিন নিয়েছে। তাতে গতিও ছিল। এবং সিম্পসন স্পিন ও পেস-এ সমৃদ্ধ তাঁর ভারসাম্যযুক্ত আক্রমণশক্তি ব্যবহার করেছেন বদলে-বদলে, উলটে-পালটে, কিন্তু ঐ দুজনকে বিচলিত করতে পারেননি। তবে চায়ের পরে ভিভার্স লেগ-ট্র্যাপ আক্রমণ চালিয়ে, সুফল পেয়েছিলেন—অল্প ব্যবধানে ঐ দুজনই বিদায় নেন। ভিভার্সের বোলিং তখন মৃত্যুচুম্বন দান করছে। তারই মধ্যে হনুমন্ত ও পাতৌদি জুটি বাঁধলেন, বহু মন্ত্রে ও বহু ভাগ্যে নিজেদের রক্ষা করলেন। দিনের শেষপর্যন্ত তাঁরা অবিচ্ছিন্ন ছিলেন। কিন্তু ভিভার্স লাভ করেছিলেন স্মরণীয় এক মোহবিস্তার-পর্ব : ১৯ ওভার—১৮ রান—২ উইকেট।

তৃতীয় দিনে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে একই প্রকার মন নিয়ে ভারতের খেলা আরম্ভ হল, অবস্থা-সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হতে লাগল, অল্প রানে বিদায় নিলেন হনুমন্ত ও বোরদে। ভারত ৬—১৮৬। সুর্তি এলেন, চান্স দিলেন স্লিপে, গ্রহণসুখী সিম্পসনের হাতে, কিন্তু দেখা গেল সিম্পসনেরও ক্ষুধামান্দ্য, সুর্তি অব্যাহতি পেলেন। তখন সুর্তি স্থির করলেন অধিনায়ক ও দলের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দেবেন। প্রয়োজনীয় এই সেবা-সিদ্ধান্ত। কেন-না ইতিমধ্যেই পাতৌদি, তরুণ পাতৌদি, ভারতের মাঠের মেঘ দূর ক'রে মঙ্গলালোক বিস্তার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনবদ্য সেই খেলা, যাকে সমালোচকেরা কেবল 'অধিনায়কোচিত' বলে সন্তুষ্ট হননি, বলেছেন 'মহা-বীরোচিত।' ধীরতার সঙ্গে বীরতার অপূর্ব মিশ্রণ। যে-সব মার জানলে ব্যাটসম্যান আখ্যার যোগ্য হওয়া যায়, পাতৌদি সেই সব মারই জানেন, তদুপরি জানেন পুরনো যুগের কিছু রীতি, যখন মাটিতে আঁচড় কেটে বল পাঠানোর সঙ্গে ফিল্ডসম্যানের উপর দিয়ে টপকে বল পাঠানোর চল্ ছিল। সেকাজ পাতৌদি যখন করছিলেন তখন দর্শক উক্ত ইচ্ছাকৃত উচ্চতাকে অনিচ্ছাকৃত উড্ডয়ন কল্পনা ক'রে পতন-আশঙ্কায় ক্ষণে-ক্ষণে শিহরিত হয়েছে। উইকেটের মধ্যে ক্ষুদ্র দৌড়ের 'ধর্ দিকি যদি পারিস্' মজাও পাতৌদি কম করেননি। লাঞ্চের সময়ে পাতৌদি ৭৮ অপরাজিত। ভারত ৭—২৬৯। লাঞ্চের পরেও এগিয়েছেন, কিন্তু ৮৬ রানের মাথায় যখন ভিভার্সের বলে ম্যাকেঞ্জির হাতে ধরা পড়লেন, তখন ভারতের রান উঠে পড়েছে ২৯৩-এ। সে রানকে আরও টেনে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পড়ল নাদকার্নির উপর, যিনি সুর্তির বিদায়ের পরে পাতৌদির সহযোগিতা করছিলেন। প্রধানত নাদকার্নির চেষ্টায়, ইন্দ্রজিৎ সিংয়ের চেষ্টারও অভাব ছিল না, ভারতের রান শেষপর্যন্ত দাঁড়াল ৩৪১, অস্ট্রেলিয়ার থেকে ২১ রান এগিয়ে। এই সিরিজে ভারত দ্বিতীয়বার প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার থেকে অগ্রগামী হল।

—হোক গে, মাদ্রাজে তবু আমরাই জিতেছি, এবারও জিতব, যদি পরিকল্পনা-মতো কাজটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি, এখনো উইকেট অনিশ্চিত হয়নি,

অথচ হতে পারে আরও একদিন গেলে, তখন ভারত খেলতে নামলে দ্রুত বা নাতিদ্রুত, উভয় প্রকার বল-প্রয়োগের সামর্থ্য আমার আছে—সিম্পসনের মনোভাব যে এই রকমই ছিল, তা দেখা গেল গোড়া থেকেই। রান করতে হবে, দ্রুত রান করতে হবে, সময় বেশি নেই, অপরাহ্ণে ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যে যতখানি জোগাড় করা সম্ভব তাই করা যাক—অস্ট্রেলিয়ানরা তাই করলেন বটে! সিম্পসন যদিচ নিজস্ব কুড়ি রান ক'রে সুর্তির বলে বিদায় নিলেন, কিন্তু পৃথিবীর সেরা ওপেনিং-জুটি মানে নয়, দুজনই প্রতিবার একসঙ্গে বিরাট রান করবেন, সিম্পসন গেলে ল্যরী থাকেন, এবার দায় তাঁর, যেহেতু গতবারে সিম্পসন কাজটা করেছিলেন—সুতরাং ল্যরী দায়িত্ব পালন করলেন কাউপারের সহায়তায়। ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার রান ছুটে দিনশেষে দাঁড়াল এক উইকেটে ১১২। ঘাটতি পূরণ ক'রে অস্ট্রেলিয়া এখন ৯১ রানে এগিয়ে, হাতে ৯টি উইকেট এবং—সামনে মাদ্রাজ-টেস্টের পুনরাবৃত্তির সুখ-সম্ভাবনা। ল্যরী অপরাজিত ৬৩, কাউপার অপরাজিত ২২।

চতুর্থ দিনে কিন্তু সাধ ও সাধ্যের পূর্ব-পরিণয়ে বিচ্ছেদের লক্ষণ দেখা গেল। প্রভাতী সূর্যমদ্যপানে উজ্জীবিত তরুণ চন্দ্রশেখর তাঁর 'দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলে ল্যরীকে লেগ-বিফোর করলেন।...তৃতীয় বল গুগলি—তচ্‌নচ্‌ করে দিল বার্জের স্টাম্প।' দশ মিনিটের মধ্যে ৯ রানে দুটো উইকেট গেল। অস্ট্রেলিয়া ৩—১২১। কাউপার কিন্তু অব্যাহত খেলে চললেন বুথকে সঙ্গে নিয়ে। আত্মশাসন ও আত্মবিস্তারের ইনিংস তাঁর—লাঞ্চের পরেও ৪০ মিনিট তা এগিয়েছিল, তারপর নাদকার্নির বলে যখন উইকেটকীপারের হাতে ধরা পড়েছিলেন, তখন তাঁর ব্যক্তিগত রান ৮১, অস্ট্রেলিয়া ৪—২৪৬। বুথ তখনো বজায় আছেন, হাতে আছে ৬টি উইকেট, খেলা অস্ট্রেলিয়ার আয়ত্তে।

কিন্তু নাদকার্নি—আবার দেখা দিলেন। এবং চন্দ্রশেখর। অস্ট্রেলিয়ার ২৪৬ রানের মাথায় নাদকার্নি কাউপারকে নিয়েছেন। তার পরেই ভিভার্স চন্দ্রশেখরের বলে এল-বি। একই ওভারে জার্মান সোজা বোল্ড। বুথ চালিয়ে যাচ্ছিলেন; নিঃশব্দে পঞ্চাশ পেরিয়েছেন, ষাট পেরিয়েছেন; চুয়াত্তর রানের মাথায় নাদকার্নির বলে স্টাম্পড। ম্যাকেঞ্জি একই বোলারের বলে কট। মার্টিনও তাই। ও'নীল নামলেন না অসুস্থতার জন্য। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ ২৭৪ রানে। লাঞ্চ-উত্তরকালে নাদকার্নির অসাধারণ যাদুক্রিয়া: ৯.৪—৫—১৬—৪। চন্দ্রশেখর গোটা ইনিংসে ৩০—১১—৭৩—৪।

অস্ট্রেলিয়া নিজের জন্য যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটাতে না পারলেও যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারল পরের ক্ষেত্রে। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ রানের মাথায় জয়সীমা গত হলেন, কনোলির বলে—কট। চায়ের সময়ে ভারত—১—১৮। চায়ের পরে ৭০ পর্যন্ত রান উঠল, তারপরেই দুরানি ও নাদকার্নির ক্রমান্বয়ে বিদায়। দুরানি (৩১) ও সরদেশাইয়ের (৩৬ অপরাজিত) কিছু কেজো ব্যাটিংয়ের ফলে ভারত দিনশেষে ৩—৭৪। ভারতের হাতে ৭টি উইকেট—১৮০ রান করলে জিতবে—কাগজ-কলমে ভারত তা করতে সমর্থ, কিন্তু কোনোমতে পারবে না, কারণ—পঞ্চম দিনের অত্যাচারিত উইকেট—ম্যাকেঞ্জি-কনোলির অগ্নিবাণ—ভিভার্স-মার্টিনের গুপ্ত চক্রান্ত—এবং ভারতের স্বভাবসঙ্গত উদার অসহায়তা।

তবু পঞ্চম দিনে, দশেরার ছুটির দিনে, স্বপ্নলালিত সম্ভাবনাকে বুকে ধরে পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় দর্শক ব্রাবোর্ন-স্টেডিয়ামে হাজির—কোনো এক অপমানজনক পরাজয়, আশ্চর্যজনক জয়, কিংবা জয়-পরাজয়কে সমআলোকে ধন্য করে এমন অপূর্ব খেলা—দেখবার জন্য।

ভারত শুরু করল তিন উইকেটে ৭৪ রানসহ। সওয়া ঘণ্টার মধ্যে সুর্তি, সরদেশাই, হনুমন্ত সিংয়ের বিদায়। ভিভার্স ও ম্যাকেঞ্জি দুই প্রান্তে খুনীর চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে। এই পর্বে অস্ট্রেলিয়ার 'পাঁচ ওভার বল, দুটি মেডেন, ছয় রান, দুই উইকেট।' ভারত—৬—১২২।

অবধারিত পরাজয় ভারতের। কেননা জয়ের জন্য প্রয়োজন ১৩২ রান, হাতে আছে চারটি মাত্র উইকেট। আছেন পাতৌদি—কিন্তু বারবার একই খেল্ হয় না। আছেন মঞ্জরেকর, কিছুটা আটকাতে সমর্থ, কিন্তু ম্যাচ-জেতা খেলোয়াড় নন। নাদকার্নি করেন এবং করেন না, আর বোরদে—একদা-খেলোয়াড়। অপর-দিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেকটি বলে দাঁত আর নখ—ছিঁড়ে চিবিয়ে খাওয়ার জন্য হিংস্রভাবে ছুটে আসছে। কিন্তু পাতৌদি টিকে রইলেন, গেলেন না মঞ্জরেকর। কনোলি ও ম্যাকেঞ্জির গতিভীষণ বলগুলির মুখশ্রী ক্রমে সরল হয়ে এল। ম্যাকেঞ্জি-কনোলি সরে গেলেন। তখন আসতে লাগল ভিভার্স-বুথের আঁকা-বাঁকা বিনোদিনী বলগুলি। পাতৌদি ও মঞ্জরেকর ভয়ের কিংবা লোভের, যে-কোনো 'মার'-এর আক্রমণের সামনেই স্থির রইলেন বোধিপীঠে। ফলে লাঞ্চের সময়ে ভারত—৬—১৪৬। পাতৌদি ১৬, মঞ্জরেকর ৯। এখনো চাই ১০৮ রান। বহুদূরে বহুদূরে। পথিক পথ হারাইও না!

লাঞ্চের পরেও গুরুভোজনের আলস্য দেখালেন না পাতৌদি। মার্টিন এসেছেন বল করতে, মিড-অনে তাঁকে সুন্দরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন পাতৌদি, ভিভার্সকেও একইভাবে। দুটি বাউন্ডারি। শান্ত আছেন মঞ্জরেকর। স্তব্ধ বলাই ঠিক। সিম্পসন দেখলেন, ম্যাচ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর নিজের হাতেই তো আছে দু'-একটি ফাঁকি-বল, প্রতিষ্ঠার মধ্যে যা হঠাৎ দেখায় গোপন রন্ধ্র, কাউপারও সেই গুণে গুণী, সুতরাং সিম্পসন ও কাউপারও বল করলেন, কিন্তু পাতৌদি ও মঞ্জরেকর স্থির করেছেন বলে অবল হব না, না হব চতুরে ফতুর। ভারতের রান দুশো উঠে গেছে, পাতৌদি ৪৫, মঞ্জরেকর ৩১। কুড়ি মিনিট বাকি আছে চা-পানের।

কিন্তু দু'শো মানে নতুন বল—হাতে তুলে নিলেন সিম্পসন—ভাঙো, ভেঙে চুরমার ক'রে দাও—নতুন বল সমর্পণ করলেন ক্রমান্বয়ে ম্যাকেঞ্জি ও কনোলির হাতে। নব বলে বলীয়ান হয়ে ছুটছেন ম্যাকেঞ্জি, কনোলি—সাঁ-সাঁ ক'রে ছুটছে বল, কখনো লাফিয়ে উঠছে হঠাৎ-চমকে, কখনো ব্যাটের দিকে ধেয়ে এসে শিউরে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিংবা বেঁকে ঢুকে আসছে শূন্য-পথে। রক্ত চাই রক্ত, যার নাম উইকেট—জিততে হবে অস্ট্রেলিয়াকে—যেমন করে সে জেতে—

মৃদু মধু হাসিতে মুখ ভরে, টুপি খুলে কপালের ঘাম মুছে, শ্বাস টেনে জয়লক্ষ্মীর দেহগন্ধ আঘ্রাণ করতে-করতে পাতৌদি ও মঞ্জরেকরই ফিরলেন চা-সেবনের জন্য। উভয়ে একত্রে করেছেন ৬৯। পাতৌদি ৫০, মঞ্জরেকর ৩৯। ভারত ৬—২১৩। জয়ের জন্য প্রয়োজন মাত্র ৩৯ রান। হাতে চারটি উইকেট।

হা—হা—হা—ক'রে উঠল অস্ট্রেলিয়া চায়ের পরেই। কনোলি প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলে মঞ্জরেকরকে খেয়ে নিয়েছেন—স্লিপে সিম্পসন ধরেছেন। ভারত ৭—২১৩। ধ্বক্ করে উঠল পঞ্চাশ হাজার দর্শকের বুক। শেষের শুরু? জুটি ভাঙলেই ছুটি। সত্যই! পাতৌদি দু'রান বাড়ালেন। কনোলিকে কাট করলেন, গালিতে বল চলে গেল তীব্র বেগে—সেটা ক্যাচ নয়—ক্যাচ হয় না—হয়, যদি ফিল্ডসম্যান হয় অস্ট্রেলিয়ান, যারা এখন জয়ের গন্ধে লেজ আছড়াচ্ছে, লোভের জিভ বাড়িয়ে হ্যা-হ্যা করছে। কঠিনতম ক্যাচ ধরে বার্জ ফিরিয়ে দিলেন পাতৌদিকে। পাতৌদি ৫৩। ভারত ৮—২২২।

বোরদে খেলছেন ইন্দ্রজিৎ সিংয়ের সঙ্গে। তিরিশ রান প্রয়োজন। যাও বোরদে, তুমি কতক্ষণ। বর্ণহারা তুমি। তোমাদের কেউ একজন গেলে বাকি থাকবেন চন্দ্রশেখর—যেহেতু ক্রিকেট খেলেন সুতরাং ব্যাট ধরতে জানেন—ব্যাট করতে পারেন? পারবেন কেন, যখন বল করতে জানেন? দীর্ঘ তিরিশ রান—এই পরিস্থিতিতে! প্রেতকৃত্যে অংশ নেবার জন্য প্রস্তুত দর্শকেরা। মানুষের মহাসাগর এতক্ষণ তরঙ্গে-তরঙ্গে আছড়াচ্ছিল, হঠাৎ কোন্ দৈব হিংসায় জমে বরফ হয়ে গেছে। আর হাজার-হাজার মৃত চোখের উপরে ক্লিষ্ট জীবনের মতো নড়ছে দুইজন, বোরদে ও ইন্দ্রজিৎ সিং।

কিন্তু বোরদে যেন মন থেকে মুছে ফেলেছেন সবকিছু। পিছনে কি আছে জানি না, সামনে কি আছে জানতে চাই না। আমি খেলছি সেটাই একমাত্র কথা—খেলছি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে—ভিভার্সের বিষাক্ত স্পিনের বিরুদ্ধে, ম্যাকেঞ্জির সজোর সুইংয়ের সঙ্গে—মোকাবিলা করতে-করতে। অপরদিকে ইন্দ্রজিৎ—তাঁর কিন্তু স্মরণে আছে সবকিছু। অস্ট্রেলিয়ার যত 'লাক্ষ্মণিক' গুপ্ত আক্রমণই হোক, 'ইন্দ্রজিৎ' অপরাজিত থাকবেনই।

অস্ট্রেলিয়ার একটি-একটি বল পড়তে লাগল—দর্শকদের হৃৎপিণ্ডের উপরে। তোলপাড় তোলপাড় বুক। আর বোরদে আত্মবিশ্বাসের অবহেলায় সেই হৃদয়ের কাঁটা উপড়ে চললেন। ধীরে রান বাড়ছে। প্যাভিলিয়নে কাঁপছেন চন্দ্রশেখর। অস্ট্রেলিয়ার ম্যানেজার ছটফট করছেন। বেতার-ঘোষকদের কণ্ঠে যন্ত্রণার পেষণ। রান বাড়ছে। যন্ত্রণা বাড়ছে। কখনো আনন্দের কখনো উদ্বেগের। আর দশ রান বাকি। সহ্য করা যাচ্ছে না। জল এল। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ গলা শুকিয়ে কাঠ। পাশের লোক পর্যন্ত দৃষ্টির অগোচর। বোরদে জল মুখে নিলেন! কুলি ক'রে ছড়িয়ে দিলেন। তাতে যেন দেখা গেল ইন্দ্রধনু। বোরদে ব্যাট হাতে নিয়ে ভিভার্সকে অফে বাউন্ডারিতে পাঠালেন। এখনো বাকি—এ-খ-নো। বোরদে ব্যস্ত হয়ো না। ধীরে বোরদে ধীরে। ব্যাটের মুখে আঠার মতো লেগে আছে ফিল্ডসম্যান। ঠেলে বল পাঠাও ওরই ফাঁক দিয়ে। অসম্ভব। যে-কোনো পুশ্-কে ক্যাচ করে তুলবে অস্ট্রেলিয়ানরা। আকুঞ্চিত আঙুলের নখগুলো নখরের মতো ঝলসাচ্ছে। ঢাল নয়, তরবারিই ব্যবহার্য এখন। বোরদে প্রচণ্ড বেগে বল পাঠালেন মিড-অনে। বাউন্ডারি। হো—হো—হো। জয়—জয়—জয়—। ভারত আট উইকেটে ২৫৬। বোরদে ৩০ অপরাজিত। ইন্দ্রজিৎ সিং ৩, অপরাজিত। ভারতের জয় দু' উইকেটে। ভারতের হাতে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় পরাজয়। সিরিজ এখন সমান-সমান। লোক নেমে

পড়েছে মাঠে। বোরদেকে হে'টে ফিরতে দেব না। তারা বোরদেকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ড্রেসিংর়ুমের দিকে।

বিজয় মার্চেন্টকে প্রশ্ন করলেন ডিকি রত্নাকর—কি রকম খেলা দেখলেন?

মার্চেন্ট—এ খেলা কেবল স্বপ্নেই দেখা যায়।

ইডেনে তৃতীয় টেস্ট

প্রথম দিন : দিন দর়ানী

অসাধারণ টেস্টম্যাচ ভারতবর্ষে অল্পই হয়েছে। সদ্য সমাপ্ত তেমনি একটি অসাধারণের দিকে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে কলকাতার দর্শক পাগলের মতো ছুটতে লাগল ইডেন গার্ডেনের দিকে—দ্বিতীয় অসাধারণের প্রত্যাশায়। এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার সংগে সমান-উ'চু মাথা নিয়ে ভারত দাঁড়িয়ে আছে। বোম্বাইয়ের জয় হঠাৎ-পাওয়া নয়, অর্জন। মাদ্রাজেও হার নিতান্ত লাঞ্ছনার ব্যাপার নয়—হার হয়েছে—জিতও হতে পারত। কাগজে-কলমে গুণবিচারে অস্ট্রেলিয়ার দিকে পাল্লা অল্প-কিছু ঝুকে আছে, কিন্তু উল্টোদিকে ভারতের নবযৌবনের চুম্বক-শক্তি ওঠা-পাল্লাকে সজোরে নীচে টান দিচ্ছে। ভাগ্য-নির্ধারক কলকাতার টেস্ট। ভারত কি সত্যই জয়ী হয়ে রাবার ছিনিয়ে নেবে অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে? সে গৌরব যদি নাও পায়, ড্র করে কি সিরিজ সমান রাখবে? কিংবা হারবে, এমন হার যাতে অগৌরব নেই? অন্তত খেলা দেখতে চাই আমরা—খেলা—খেলা—। আমরা চাই সেই খেলা যাতে রক্ত কল্লোলিত হয়ে ওঠে, স্নায়ু-শিরায় শিহরণ বয়ে যায়, চেতনার ঝঙ্কারে শোনা যায়—ক্রিকেট, এই তো ক্রিকেট—যার নাম জীবন।

অস্ট্রেলিয়া-দলের ম্যানেজার মিঃ রে স্টীল বললেন—দুটো খেলাতেই জয়-পরাজয় হয়েছে, ভাগাভাগি হয়ে গেছে সাফল্য—ক্রিকেট-প্রিয়রা আর কী আশা করতে পারে ক্রিকেট থেকে? পারে, আরও কিছু পারে, শেষ আছে কি চাওয়ার, এমন-কি পাওয়ার?

১৯৬৪ সালের ১৭ অক্টোবর ইডেনগার্ডেনে রনজি-স্টেডিয়ামে ভারত-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শুরু হল। কলকাতার পরিচিত ক্রিকেট-ঋতুতে খেলা হচ্ছে না—এবার শারদীয়া ক্রিকেট। একাদশীর দিন খেলা আরম্ভ।

পাতৌদি অবশেষে টসে জিতলেন। অত্যন্ত অখুশি হলেন তিনি পরিচিত ভাগ্যের পরিবর্তনে। ভাবলেন, এবার সেই সিদ্ধান্ত করতে হবে, যা অজস্র নিন্দা টেনে আনবে। অতিথি সিম্পসনকেই প্রথম খেলার সুযোগ দিতে হবে তাঁকে। তাই দিলেন। টসে হেরেও অস্ট্রেলিয়াই ব্যাট করতে নামল।

পাতৌদির অতিথিসেবার পিছনে অবশ্য ক্ষুদ্র একটি স্বার্থোদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল। পিচ পরীক্ষা করে বুঝেছিলেন, বাইরে শক্ত চেহারা ধরলেও ইডেনের এই অক্টোবরের পিচ ভিতরে নরম—এই পিচে ম্যাকেঞ্জির লেগ-কাটার কেটে ঢুকবে। ভারতের সুর্তিও ঐ কাজে সমর্থ কিন্তু এত নম্রভাবে তা করেন যে, উদ্ধত ব্যাটসম্যান স্বচ্ছন্দে তাঁকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। আগে পিচে বল পড়ুক, দেখা যাক তার স্বভাব-চরিত্র কেমন, তখন ব্যাট-হাতে নামলেই চলবে—

পাতৌদি ভাবলেন।

এই সিদ্ধান্ত করার সময়ে বহুদূর থেকে ব্রাডম্যান ও বেনোডের কথাবার্তা তাঁর কানে ভেসে এসেছিল কি-না জানি না। ১৯৫৮-৫৯ সালে ইংলণ্ডের সঙ্গে চতুর্থ টেস্টে টসে জিতেও যখন বেনোড ব্যাটিং নিলেন না, তখন ড্রেসিংরুমে বেনোডের দিকে এগিয়ে গিয়ে ব্রাডম্যান বললেন : 'রিচি, জানো কি, আগে এ-জিনিস কখনো হয়নি।' বেনোড : 'কি হয়নি ?' ব্রাডম্যান : 'এ-পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার কোনো ক্যাপ্টেন টসে জিতে ইংলণ্ডকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে খেলা জিততে পারেনি ?' স্যার ডোনাল্ডের মতো গালভরা হাসি নিয়েই বেনোড বললেন : 'কিন্তু সব নতুন ঘটনারই তো একটা আরম্ভ থাকবে ? আমরা ফিল্ডিং নেব, তাই ঠিক করেছি। সুতরাং নেমে পড়া যাক। আমরা নামলাম।' বেনোড বাজি জিতেছিলেন।

ইডেনে বসে অনেকেই ভেবেছেন, পাতৌদি কি বেনোডের মতোই বাজি জিতবেন ? চাপা ধিক্কারে পূর্ণ গোটা মাঠ সারা সকাল ব্যঙ্গ ক'রে বলতে লাগল, বাহবা পাতৌদি বাহবা! একটা টেস্ট জিতেই দেখা যাচ্ছে তুমি বেনোড হয়ে উঠেছ! অস্ট্রেলিয়া তখন ব্যাটিং করে চলেছে মন্থরপদে কিন্তু স্থিরলক্ষ্যে। ভারতের সূচনার আক্রমণে ভয়াবহ কিছু ছিল না, তবে দু'-একটি বল বেয়াড়াপনা করছিল, বাড়তি কিছু লাফানি-ঝাঁপানি, কিন্তু সিরিজ হারাতে সিম্পসনের ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং তিনি ও ল্যরী সন্দিগ্ধচোখে তাকিয়ে খেলতে লাগলেন, প্রথম তিরিশ মিনিটে বারো রান মাত্র হল। অ-গতির গতি জয়সীমা ও সুর্তিকে মাত্র ৬ ওভার ডান ও বাম হাত চালাবার সুযোগ দেবার পরে পাতৌদি তাঁর স্পিনারদের ডাক দিলেন। সুইং-বোলারদের প্রতি প্রভাতী সুবিচারের জন্য বিখ্যাত ইডেন-গার্ডেনে ব্যাপারটা অভিনব বটে। সিম্পসন স্বস্তি বোধ করলেন না উত্তম ফ্লাইটের বাঁকা বলে, ভুল ব্যাট চালালেন একাধিকবার, বেঁচে গেলেন ভাগ্যবলে, দুরানী এবং চন্দ্রশেখর তাঁকে ৪৫ মিনিট ১৩ রানের উপরে বসিয়ে পশ্চিমী কুসংস্কারে বিশ্বাস করার শাস্তি দিলেন, কিন্তু বিদায় নিতে তিনি এমনই অনিচ্ছুক যে, শ্লথগতি উত্তেজনাহীন খেলাকে ক্রমেই টেনে বাড়াতে লাগলেন, আর তার দ্বারাই অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্য-ভবনের ভিত্তিতে ইস্টক-যোজনা হতে লাগল, লাঞ্চের সময়ে ল্যরীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন বন্ধুত্বে তিনি ফিরে চললেন প্যাভিলিয়নে, তাঁর ৪৪, ল্যরীর ৩৪, অস্ট্রেলিয়ার ৯১।

হাজার-হাজার দর্শকের নৈরাশ্যের শেষ নেই। যে গভীর আবেগ, প্রচণ্ড প্রত্যাশায় তারা অধীর হয়ে মাঠে ছুটে এসেছে, তার কোনো প্রতিফলন নেই খেলার মধ্যে। ভারতপক্ষে নেই আঘাতের ক্ষমতা, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে নেই প্রতিঘাতের ইচ্ছা। সদাচার-সমিতিতে নাম লেখানো খেলা চলেছে। তখন উপায়ান্তর কী—প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের দিকে দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া ? দর্শকদের নৈরাশ্যের উপরে ছড়িয়ে পড়ল শারদ প্রভাতের মধুর ঔদাস্য। আকাশ বাতাস মাঠ মানুষ—সব জড়ানো মগ্ন সুখ। ঈষৎ গরম, তাই যাঁরা কোট-প্যাণ্টের কুঠুরিতে শরীরটাকে ঢুকিয়ে টাইয়ের তালা এঁটে তাকে বন্দী করে রেখেছিলেন, তাঁরা হয়ত এই ন্যাস্টি দেশ সম্বন্ধে হতাশ ছিলেন, এবং অঙ্গশোভিত বর্ণমাধুরীতে

কিছু-কিছু ক্রীড়ারসিকা চিত্রিত হরিণী না হয়ে পারেননি—তবু শরতের সকাল তো, শরতের দুপুর তো—বাতাস বইছিল, দেবদারু পাতা উড়ছিল, হালকা মেঘ আনাগোনা করছিল আকাশের নীল প্রাঙ্গণে, তারই মায়ায় খেলা আর মেলার রঙে রঙিন ছিল মন।

লাঞ্চের পরেও ধীর লয়ে খেলা চলল। ল্যরী পঞ্চাশ পুরোলেন। অস্ট্রেলিয়ার রান ৯৭। তারপর দুরানী বোল্ড করে দিলেন অর্ধশত রানে ও রৌদ্রে তপ্ত ল্যরীকে। স্বাভাবিক চাঞ্চল্য। দিনে একটা-দুটো উইকেট পড়েই। শেষপর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার তিন উইকেটে ২৩১ অবধারিত। কাউপার এসেছেন। দুরানী এ'কে কিছু উত্যক্ত করছেন। ব্যাট চালাতে ও ফসকাতে ইনি জানেন; দুরানীর হাতে এখন কিছু দিবা-দুঃস্বপ্ন দর্শন করছেন। তাহলেও ওটা কিছু নয়। ও-রকম হয়ই গোড়ায়-গোড়ায়। ডুবে-ডুবে জল খেয়ে ছেলে তৈরি হয়ে উঠবে—এমন সময়ে দেড়টা বাজল—কালপ্রহরের ঘণ্টা বাজল কি?—দুরানী হাইকোর্ট-প্রান্তে হাত তুললেন—তাঁর হাতে ও কী, মুষল?—না বল—

দুরানী উঠে এলেন ক্রিকেট-ইতিহাসে—ভারতীয় বোলিংয়ের চরম নাটকীয় কয়েকটি মুহূর্তকে মুঠিতে ধরে—

দুরানীর ঊর্ধ্বহস্ত থেকে ঘুরতে-ঘুরতে বল ছুটে গেল—চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।

কাউপার আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ব্যাট এগিয়ে পেতেছেন। লেগ-ট্র্যাপ করছেন দুরানী। ব্যাটের কোণায় লেগে বল চলে গেল নাদকার্নির দিকে—ঝাঁপ দিয়ে অসাধারণ ক্যাচ তুলে নিলেন তিনি। কাউপার আউট। অস্ট্রেলিয়া ২—১০৪। কাতর কাউপারের জায়গায় এলেন বৃহৎ বার্জ। দুরানীকে শিক্ষা দিতে প্রথম বলেই শর্ট-লেগে পুল করে প্রচণ্ড বাউন্ডারি। পরেরটি নো-বল। চতুর্থ বল—নিজের দৈর্ঘ্যকে পূর্ণ ব্যবহার করে দুরানী বলে যথেষ্ট বাতাস ও মতলব ভরে দিয়েছেন। বার্জের কেয়ার নেই। সজোরে পেটালেন পূর্ববৎ শর্ট স্কোয়ার-লেগে—বাউন্ডারি...আ হাঃ...বাঁদিকে মনোবেগে সরেছেন হনুমন্ত আর ধরে নিয়েছেন এক হাতে বলটি! অপূর্ব, অসামান্য! প্রদেয় বজ্রগুলিকে বগলে পুরে বার্জের বিদায়। অস্ট্রেলিয়া ৩—১০৯। এলেন বুথ, যেন ভূতগ্রস্ত। দুরানীর বল এলোমেলো এসে তাঁকে এবং উইকেটকে এলোমেলো করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। অপূর্ব অদ্ভুত। দর্শকের বুক-ফাটা আনন্দ ধ্বক্ করে স্তব্ধ হয়ে গেল।—তবে কি—তবে কি—হ্যাটট্রিক দেখব টেস্টে? এবং এক ওভারে চারটি উইকেট? না, ওটা অলৌকিকের মধ্যে অলৌকিক। তাই রেডপাথ যখন ইডেনের সবুজ পথ অতি ধীরে মাড়িয়ে উইকেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন যদিও দুরানী জীবনে সহজে আসে না ক্ষণটিকে লাভ করবার জন্য সকল ফিল্ডার দিয়ে ঘিরিয়ে দিলেন তাঁকে, তবু রেডপাথ বলটিকে থামাতে পেরেছিলেন, হ্যাটট্রিককেও, কিন্তু থামাতে পারেননি কয়েক মিনিটে দুরানীর খণ্ড ইতিহাসের নায়ক হওয়াকে।

সিম্পসন ও রেডপাথ দুরানীর সঙ্গে যুঝে ৪—১০৯-কে ১৪৫ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সুর্তির বলে সিম্পসন এল-বি (৬৭)। প্রয়োজনীয় সেবার পূর্ণ তাঁর ইনিংস। কুড়ি মিনিট পরে ভিভার্স দুরানীর বলে

কট। তাঁর পঞ্চম শিকার। জার্মানও যেতে পারতেন, কিন্তু কীর্তিক্লান্ত দুরানী সুর্তির বলে জার্মানের সহজ ক্যাচ ফসকেছিলেন। অস্ট্রেলিয়া যখন ভেঙে পড়ার মুখে, ৬—১৬৭, তখন আম্পায়াররা ইংলণ্ডে টেস্টম্যাচ খেলানোর স্বপ্ন চোখে নিয়ে খেলাটির অকাল বিজয়া ঘটালেন। মাঠে কটকটে রোদ না থাকলেও ঘুটঘুটে অন্ধকারও ছিল না। অন্তত এমন আলো ছিল যাতে আশি বছরের বৃদ্ধ বর্জাইসে ছাপা ফুটনোট পড়তে পারেন। কিন্তু বৃদ্ধের চোখ নয়, আম্পায়ারের জ্বলন্ত চোখই এক্ষেত্রে গ্রাহ্য লাইট-মিটার। ফলে পঁয়ত্রিশ মিনিট আগে খেলা বন্ধ।

খেলা আগেও একবার বন্ধ হয়েছিল। দুটো পনের মিনিটের সময়ে দক্ষিণ থেকে সাঁ-সাঁ করে ধেয়ে এসেছিল ঝড়, মুহূর্তে ধূলিতে আচ্ছন্ন সর্বদিক, দেবদারু গাছ নাড়া খেয়ে পঙ্গপালের মতো পাতা উড়িয়ে দিয়েছিল লাখে-লাখে, চটের পালে আথালপাথাল ঢেউ, চোখে হাত চাপা দিয়ে মাঠে বসে পড়েছে খেলোয়াড়, মালীর দল ছুটে ঢুকেছে মাঠে, খেলোয়াড়রা উঠে মাঠ ছেড়ে যেতে শুরু করেছে, এমন সময়, এ কী কাণ্ড, দুটি টিনের বাড়ি সচল হয়ে মাঠে ঢুকছে কেন? বুঝলে না? মাঠ ঢাকা দেওয়া হবে। ত্রিপলের উপর আস্থা নেই, তাই পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে পিচ ঢাকার এই নয়া ব্যবস্থা। তারপর যখন শরতের শাদা-কালো মেঘ থেকে হাসির মতো জল ঝরেছিল, মালীরা অ্যালুমিনিয়াম-চালার চারপাশে কম্বল বিছিয়ে জলশোষণে নিরত ছিল, তখন এক মহিলা উদারকণ্ঠে 'প্রস্তাব দিয়েছিলেন'—প্রয়োজনে তিনি তাঁর হেয়ার-ড্রায়ারটা ধার দিতে পারেন। এবং এই সময়েই এক মধ্যবিত্ত আকারের মহিলা দুই বৃদ্ধকে অনুনয় করলেন, দোহাই, আমার বাচ্ছা ছেলেটাকে কু-শিক্ষা দেবেন না। উক্ত দুই বৃদ্ধ তখন আসনের দাবি নিয়ে দ্বৈরথ সমরে প্রবৃত্ত।

খেলা যখন শেষ হল—তখন সকলেই অনুভব করেছে, অনেক সম্ভাবনায় ভারাতুর হয়ে আছে আগামী দিনগুলি। প্রকৃতিতে আছে মেঘরোদ্রের অনিশ্চয়তা, মাঠের পিচে বলকে দক্ষিণে ও বামে আকর্ষণ করার মতো কোমল আহ্বান, অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ে দুর্বলতা এবং ভারতের ব্যাটিংয়ের দেবা ন জানন্তি চরিত্র—সুতরাং—

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস

ল্যরী ব দুরানী—৫০; সিম্পসন এল-বি ব সুর্তি—৬৭; কাউপার ক নাদ-কার্নি ব দুরানী—৪; বার্জ ক হনুমন্ত ব দুরানী—৪; বুথ ব দুরানী—০; রেডপাথ ব্যাটিং—২৫; ভিভার্স ক পাতৌদি ব দুরানী—২; জার্মান ব্যাটিং—১। অতিরিক্ত—১৪। মোট (৬ উইকেটে)—১৬৭।

বোলিং : সুর্তি—১৬-৩-৩৭-১; জয়সীমা—৫-৩-২-০; দুরানী—২৪-৭-৭৩-৫; চন্দ্রশেখর—১৯-৯-৩৩-০; নাদকার্নি—২-০-৮-০।

দ্বিতীয় দিন : রোদ্র ও মেঘ

প্রথম দিন দুরানী-সেনার করে বিপর্যস্ত অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দিন সকালে খেলতে নেমে ৫০ মিনিটের মধ্যে বধ্যলাভ্ত ভঙ্গিতে ৭ রান বাগিয়ে নিয়ে ১৭৪

রানে প্রথমবারের খেলা খতম ক'রে বিদায় নিয়েছিল। উইকেট স্পিন নিচ্ছিল—এবং ও-ব্যাপারে বদান্য ভারতীয় বোলাররা প্রস্তুত ছিলেন। তার ফল : দুরানী ও চন্দ্রশেখরের প্রথম ৩১টি বলে কোনো রান নেই। বত্রিশতম বল—রান নেই, উইকেট আছে। দুরানীর বলে জার্মান সামনে ব্যাট পেতেছিলেন, ফাঁকি দিয়ে উইকেট ভেঙে দিয়ে বল ছুটে গেছে। পরের ওভারে ম্যাকেঞ্জি বাঁচলেন, চন্দ্রশেখরের বলে ক্যাচ দিয়ে, দুরানীর শ্লথগতির জন্য। দুরানী হড়কে পড়ে, হাতে ব্যথা লাগিয়ে, দোষের খেসারত দিলেন। দুরানীর জায়গায় সুর্তি এলেন। সুর্তির লেগ-কাটার এখন আয়ুকর্তনে অভিলাষী—ম্যাকেঞ্জি ক্যাচ তুললেন—ম্যাকেঞ্জির ক্রীড়া-মুগ্ধ নাদকার্নি সেটি ফেললেন। এক মেডেন ওভারে তিনি দু'বার 'প্রাণ'প্রাপ্ত। কিন্তু নিয়তির সঙ্গে বৃথা সমরের অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। এই উইকেটে ভারতীয়দের দেখিয়ে দেব—বল করা কাকে বলে—ম্যাকেঞ্জি সেই আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে, সুর্তির পরের বলেই দ্রুত এগিয়ে গেলেন, মনে হয় মারবার জন্যই, কিন্তু বল কোথায়? উইকেটকীপারের হাতে—এবং সেই হাতের ঝোঁকে বেল ছিটকে গেছে—স্টাম্পড। সেলার্স এলেন। তারপরে একটা দারুণ কাণ্ড হয়ে গেল : একাদশ ওভার খেলা চলছে, এমন সময়ে রেডপাথ চন্দ্রশেখরের বলে একটা রান নিলেন—দিনের প্রথম রান!!! সুর্তির বলেও তিনি একটা রান করে ফেললেন—দিনের দ্বিতীয় রান। কিন্তু তার ফলে সেলার্স সুর্তির মুখে। সেলার্স বোল্ড। রেডপাথ কিন্তু মোটেই অসুবিধা বোধ করছেন না। নিখুঁত আঙ্গিকে তিনি মারাত্মক স্পিন খেলছেন। চন্দ্রশেখরের বলে পাঁচ রান জোগাড় করলেন। অপরদিকে কনোলির রানগত অভিপ্রায় ছিল না বলে চন্দ্রশেখরের বলকে আকাশলক্ষ্যে তুললেন, সেটি নিম্নগামী হতেই হনুমন্ত ধরে নিলেন। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ—১৭৪। সকালে সুর্তি-স্পেল : ৫—৪—১—২। শেষ চার উইকেটে অস্ট্রেলিয়া মাত্র ৭ রান করেছে—সবটাই করেছেন অপরাজিত রেডপাথ, তাঁর রান যদিও ২৫ কিন্তু গুণান্বিত।

রবিবারের পঞ্চাশ হাজার দর্শক এখন সৌভাগ্য-চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশির মতোই উদ্বেল। প্রত্যাশার অন্ত নেই সেখানে। 'এসো বীর' জয়সীমা এসে গেছেন, 'তুমিও কি কম' সরদেশাইকে সহযাত্রী ক'রে। ঈষৎ আশঙ্কা—যে-পিচে অস্ট্রেলিয়া ধ্বসে পড়েছে, তাতে কি দাঁড়াতে পারবে ভারত? পারবে না মানে? ম্যাকেঞ্জি যতই লাফান, এ হল স্পিনারদের উইকেট, ভারতীয়রা যে বল-সর্পের সরীসৃপ-গতির সঙ্গে 'যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।' এই পিচে অবশ্যই সে অক্লেশ-পরমানন্দ হবে না। তা হলেও—বাঁকা হয়ে আছো সখা তবু আমার প্রাণসখা!

জনতার প্রাণচ্ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে সরদেশাই উইকেটের উপর পদসঞ্চার এবং ব্যাট-সঞ্চালন করতে লাগলেন। সওয়া এক ঘণ্টার মধ্যে তর্‌তর্‌ করে রান উঠে গেল ৬০-এ—তার মধ্যে সরদেশাই একা করলেন ৪২। জয়সীমা তাঁর তুলনায় গুটিয়ে। অদ্ভুত তাঁর মনোপ্রকৃতি—কখনো এনার্জির বোতাম টিপে দেন, স্প্রিংয়ের চাবুকের মতো ব্যাট সপাসপ্‌ বলকে পিটিয়ে দেয়। তারপরেই তাকে খাপে পুরে দাঁড়িয়ে থাকেন পরবর্তী প্রেরণার জন্য। ৪০ মিনিট রান না করে দাঁড়িয়ে থাকা জয়সীমার পক্ষেই সম্ভব—সাহারা মরুভূমির উপরে উত্তরমেরুর

সব বরফ চাপিয়ে ঝিমানো—কথাটা কে বলেছেন?—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেই-বা এমন বলবেন?

তার পরে, সরদেশাই যখন বুথের ফ্লাটস বলে ভিভার্সের হাতে স্কোয়ার-লেগে ক্যাচ তুলে বিদায় নিলেন, তখন ভারতীয় ব্যাটিং রানভক্ষণের বদলে খাবিভক্ষণ করতে লাগল বাকি সময়। ভারতের রানগতি সরকারী অফিসের কর্মগতির পরিচিত ত্রিগতি-সূত্র অবলম্বন করল—ধীর, ধীরতর, ধীরতম। ফলে জয়সীমার মতো ব্যাটসম্যান তিন ঘণ্টারও বেশি সময়ে করেছেন ৫৭, এবং মঞ্জরেকর এক ঘণ্টারও বেশি সময়ে—৯। বহুদর্শী শ্রীযুক্ত বেরী সর্বাধিকারী পর্যন্ত বিতৃষ্ণায় বলতে বাধ্য হয়েছেন: 'মঞ্জরেকরের কথা ছেড়েই দিলাম। নিস্তেজ, প্রাণহীন, জড় ব্যাটিং করে, ভারতের বিপদ ডেকে এনে, ভরাডুবির সময়ে অধিকাংশক্ষেত্রে বিপদভঞ্জনরূপে দেখা দিয়ে তিনি সারা ভারতের প্রশংসা পেয়ে থাকেন। আর কতদিন আব্বাস আলী বেগের মতো ব্যাটসম্যান ড্রেসিংরুমে বসে থাকবেন?'

দিনশেষে ভারতের রান ৫-১৩০।

আজকের উইকেটে ম্যাকেঞ্জি, কনোলিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে না পেরেও, সিম্পসন তাঁর সংসারের স্পিন-অসচ্ছলতার মধ্যেও, ভারতীয়দের যথেষ্ট ক্ষয় করেছেন। অফ-স্পিনার ভিভার্স লেংথ বজায় রেখে একটানা তিন ঘণ্টা বল করে গেছেন উইকেট লক্ষ্য করে, পুরস্কৃতও হয়েছেন সেইভাবে। ভিভার্স সত্যই বাঘ। কিন্তু 'কাগজের বাঘ' বুথও রক্তমাংসের বাঘ হয়ে ভারতের ঘাড়ে থাবা বসিয়েছেন। অধিনায়ক সিম্পসন হাত ঘুরিয়ে যেসব নাড়ু দিয়েছেন, সেগুলি রীতিমতো দুষ্পাচ্য ঠেকেছে ভারতীয় উদরে।

এই অবস্থায় ভারতীয় দর্শকদের মনে যখন শারদীয়া ক্রিকেটে, দ্বাদশীর দিনে বিজয়া দশমীর সুর—'সকলি ফুরায়ে যায় মা'—তখন অকাল সন্ধ্যায় ম্লান আলোর বিরুদ্ধে পাতৌদি ম্লান কণ্ঠে আম্পায়ারদের কাছে অভিযোগ জানিয়ে-ছিলেন, তাঁদের সহানুভূতি আকর্ষণে শেষপর্যন্ত সফলও হয়েছিলেন—তিরিশ মিনিট আগে খেলা শেষ হয়েছিলও—তখন সবাই ভেবেছে—কলকাতা-টেস্ট দাঁড়িয়ে কোথায়? কেউ জানে না। এইটুকু বলা যায়, দু'দলের কারো হাতে নয়—বিধাতা নামক দুর্জ্ঞেয় চরিত্রটির হাতে।

ভারত কি অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রানকে পেরোতে পারবে? পারবে কি, যখন দেখা গেছে দুরানী, মঞ্জরেকর, হনুমন্ত—এঁরা কেউই সাড়া-দেওয়া পিচের স্পিন-বলকে সধৈর্য তাড়নায় বিদায় দিতে পারেননি। মনে রাখতে হবে, এই শেষ নয়—ভারতকে চতুর্থ ইনিংস খেলতে হবে এমন ঝিলিমিলি বলের সঙ্গে।

তবু সব শেষ হয়ে যায়নি। এখনো অবশিষ্ট আছেন পাতৌদি, যিনি একটি চোখ হারানোর অন্ধকারকেও নিজ প্রতিভায় আলোকিত করতে পারেন; আছেন নাদকার্নি, যাঁর শরীরে মেদ নেই, আছে শুধু প্রতিজ্ঞা; এবং যে-কোনো বরদানে সমর্থ বোরদে অপেক্ষমাণ—

সকালে দেখেছিলুম নরমালাবিভূষণা ইডেনকে—কিন্তু ভয়ঙ্করী নয়—সুন্দরী। অপরাহ্ণে শরতের মেঘল আকাশের সমস্ত সৌন্দর্যের সমারোহ সত্ত্বেও সেই ইডেনকে যেন দেখলুম—

না, ভয়ঙ্করীকে চাইনা। সুন্দরী ইডেনই আমাদের কল্পনার অধীশ্বরী।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

...রেডপাথ নটআউট—৩২; জার্মান ব দুরানী—১; ম্যাকেঞ্জি স্টাঃ ইন্দ্রজিৎ ব সুর্তি—০; সেলার্স ব সুর্তি—০; কনোলি ক হনুমন্ত ব চন্দ্রশেখর—০। অতিরিক্ত—১৪। মোট—১৭৪।

বোলিং সুর্তি: ২১-৭-৩৮-৩; জয়সীমা: ৫-৩-২-০; দুরানী: ২৮-১১-৭৩-৬, চন্দ্রশেখর: ২৮·৫-১৫-৩৯-১; নাদকার্নি: ২-০-৮-০।

ভারত প্রথম ইনিংস

সরদেশাই ক ভিভার্স ব বুথ—৪২; জয়সীমা ক বুথ ব সিম্পসন—৫৭; দুরানী ক সিম্পসন ব ভিভার্স—১২; মঞ্জরেকর এল-বি ভিভার্স—৯; হনুমন্ত সিং ক বার্জ ব ভিভার্স—৫; পাতৌদি ব্যাটিং—১; নাদকার্নি ব্যাটিং—০; অতিরিক্ত—৪। মোট (পাঁচ উইকেটে)—১৩০।

বোলিং ম্যাকেঞ্জি: ৫-০-১০-০; কনোলি: ৪-৩-৩-০; ভিভার্স: ৩৫·২-১৩-৪৭-৩, সেলার্স ১৫-১-১৭-০; বুথ: ১০-৫-২০-১; কাউপার: ৬-০-১৪-০; সিম্পসন: ১৬-৬-১৫-১।

তৃতীয় দিন: কোজাগরী ক্রিকেট

অর্ধ লক্ষ মানুষকে পাগল করে বলটা উড়ে গিয়ে পড়ল ইডেনের পূর্ব দিকের বেড়ার বাইরে। হা-হা-হা করে উঠল সারা মাঠ। বোরদের সিক্সার, বুথের বলে। সময় একটা বেজে পাঁচ, বোরদে শেষ উইকেটে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে খেলছেন। বোরদে খেলছেন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে—এবং বাঙালীর সঙ্গে। তাজমহল-গমনে অসমর্থ কাব্যপ্রাণ বাঙালী কোজাগরী পূর্ণিমার অপূর্ব মধ্যাহ্ন যাপন করল বোরদের প্রতিভার সঙ্গসুখে। বোরদের মধ্যে আছে সেই দ্যুতিময় ব্যক্তিত্ব, যা এই রূপতৃষ্ণ জাতির ক্রীড়ারসিকদের মোহিত করে। আমার এক বন্ধুর তিক্ত প্রশ্ন মনে পড়ছে: 'বলতে পারো, বোরদেকে দলে রাখা হয়েছে কেন?' আমি বললুম, 'সে কি, অত বড় অলরাউন্ডার?' বিরক্তিতে বন্ধুর মুখ আরও কুঞ্চিত: 'তাই বটে! অষ্টম খেলোয়াড় হিসেবে উনি ব্যাট করতে নামেন, এবং প্রায়ই বল করেন না। ক্রিকেটের ইতিহাসে কখনো পড়িনি, অষ্টম উইকেটে ব্যাট করার জন্য কাউকে টেস্ট-দলে স্থান দেওয়া হয়েছে।' আমি হেসে বললুম, 'অথচ এই বোরদে পাতৌদির সঙ্গে অধিনায়কত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাস্টিং-ভোটে হেরে গেছেন।'

দলের পক্ষে নিজের মূল্য বোরদে যথেষ্ট বুঝিয়েছিলেন আগের টেস্টে। লোকে বলেছে, 'বোড়ের চালে' অস্ট্রেলিয়া মাত হয়েছিল। এই টেস্টেও সেই বোড়ের চালের চেহারা দেখা গেল। ভারতীয় ইনিংসের শেষ পর্যায়ে খেলতে এসে বোরদে ৬৮ রানে অপরাজিত।

ভারতের অসমাপ্ত ইনিংস সকালে আরম্ভ করেন পাতৌদি ও নাদকার্নি। ৫-১৩০। বহু প্রত্যাশা নিয়ে দর্শক অপেক্ষা করছে মনসুরের মনোহারী সুর-বিস্তারের জন্য। দুর্ভাগ্য তাদের। প্রভাতী আলস্যে ধরা দিলেন পাতৌদি—

বিপক্ষে ছিলেন 'বলকারক' দলনায়ক সিম্পসন। তখনো দশ মিনিট কাটেনি, সিম্পসন লেগস্টাম্পের বাইরে বল ফেললেন, লেগব্রেক ঘুরল বিষাক্তভাবে, পাতৌদি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, সুতরাং উইকেট কভার না করেই লেগ-সুইপ করতে গেলেন—বোল্ড। ভারত—৬-১৩৩। বোরদে এলেন। নাদকার্নি ও বোরদে খেলেছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পঞ্চাশ হাজার মানুষের আনন্দকামনার উপরে কৃষ্ণমেঘের চন্দ্রাতপ। পুরাতন ছবি। স্থির কঠিন প্রতিজ্ঞামূর্তি নাদকার্নি, ছুরির ফলাটুকুর মতো বাহুল্যহীন আকার, কোমর বাঁকিয়ে স্টান্স নিয়েছেন, যেন ৪৪০ মিটার দৌড়ের জন্য প্রস্তুত, কেবল মুখটি বোলারের দিকে ফেরানো। সঙ্গে আছেন সুকেশ বোরদে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে, 'কার কি' ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছেন। এই দুজন ভারতের আহত দেহে রক্ত সঞ্চার করতে পণবন্ধ। নাদকার্নির সুইপে আসক্তি দেখা গেল, পতনের মুখে স্পিনের জঞ্জালকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেওয়াই তাঁর অভিপ্রায়। রান উঠতে লাগল ধীরে। সপ্তম উইকেটে তাঁদের জুটি-খেলা অস্ট্রেলিয়ার রানসংখ্যার কাছে টেনে নিয়ে গেল ভারতের রানকে, মাত্র আট রান বাকি, এঁদের এমনই সচ্চরিত্র আচরণ যে, সুস্বাস্থ্য দীর্ঘজীবিতা অপরিহার্য—তখনি নাদকার্নির ব্যাটকে ভেদ করে ঢুকে গেল ম্যাকেঞ্জির দ্রুততর একটি বল—বোল্ড। নাদকার্নি ২৪, ভারত ৭-১৬৬।

সুর্তি এলেন। বোরদে ছড়াচ্ছেন। তাঁর মনোরম কভার ড্রাইভের বাউন্ডারিতে ভারতের রান হল ১৭৭, অস্ট্রেলিয়ার রান পেরোল। সকাল থেকে ভিভার্স হাই-কোর্ট প্রান্ত থেকে বল করছিলেন, তাঁকে বিশ্রাম দিতে সিম্পসন এলেন, সুর্তিকে বিশ্রাম দেওয়াও তাঁর ইচ্ছার মধ্যে ছিল, আস্তে ভাসিয়ে দিলেন একটি বল, সেটিকে ফানুসের মতো পুনশ্চ উড়িয়ে দেবার জন্য হাত খুলে ব্যাট চালালেন সুর্তি, ডিপ স্কোয়ারলেগে সেলার্স যেন বাউন্ডারি-সীমানায় সেটিকে লঙ্গর করে নামিয়ে নেবার জন্যই দাঁড়িয়েছিলেন। সুর্তি আউট। রুসি সুর্তি রুষি' কিছু রান করতে চেয়েছিলেন—ফুর্তি হারিয়ে ফিরে গেলেন প্যাভিলিয়নে। ইন্দ্রজিতের আগমন। অল্প পরেই মধ্যাহ্নভোজনের সময় এসে গেল। ভারত তখন ৮-১৯৫, বোরদে—২৯, ইন্দ্রজিৎ—২।

ভোজনশেষে খেলতে নেমে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ তাঁর লক্ষ্মণকে দেখলেন বুথের মধ্যে—তাঁকে স্টাম্পড করলেন জার্মান। ভারত—৯-১৯৬।

বোরদে এখন চন্দ্রশেখরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে। কিংবা ছুটছেন তাঁকে নিয়ে? দেখা গেল সংকটের সংগ্রামীকে। বোরদে গোড়ায় দ্রুত শুরু করে পরে খানিক থিতিয়ে দিলেন। সেইকালে নানা জনের সঙ্গে খেলার মধ্যে 'অল্পে সুখমস্তি'-দর্শনে বিশ্বাস ক'রে ক্ষুদ্র রানলুব্ধতা দেখিয়েছেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের শয্যাশায়িত নব-নব জন্মদিনের মতো ভারতের রান তখন একে-একে বেড়েছে। অবিরাম হস্তচালনে কিংবা ভিতরের উত্তেজনায় বোরদের হাত ঘেমেছে—গ্লাভস খুলে মাটিতে হাত ঘষে নিয়েছেন। ক্রমে একের পর এক সঙ্গী হারিয়েছেন তিনি। শেষ সম্বল যখন চন্দ্রশেখর তখন বোরদে বেপরোয়া। ড্রাইভে কাটে পুলে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলেন। ওভারের শেষ বলে রান নিয়ে ক্ষীণজীবী চন্দ্রশেখরকে বাঁচিয়ে রেখে, লোভী আয়তির ক্ষুধায় গোগ্রাসে গিলেছেন রান-মাংস। 'চাঁদু' ও 'চন্দ্রে' ওভারের শেষ বলে রানারানির মাতামাতি। অবশেষে সিম্পসন

চন্দ্রশেখরকে কেড়ে নিলেন—কিন্তু তার আগে শেষ উইকেট-জুটিতে ৩৯ রান হয়েছে, তার দ্বারা ইডেনেই বেনোডের দলের বিরুদ্ধে দেশাই-প্যাটেলের ২৩ রানের রেকর্ড ভেঙেছে। ঐ ৩৯ রানের মধ্যে বোরদে করেছেন ৩৮—চন্দ্রশেখর—১ !!! ভারত প্রথম ইনিংসে ২৩৫।

বোরদের খেলায় এক বিচিত্র পদ্ধতি লক্ষ্য করেছি। আগেই বলেছি, তিনি শুরু করেন দ্রুতগতিতে, তারপর ঝিমিয়ে পড়েন, পরে আবার জেগে ওঠেন উন্মাদনায়। কেন এমন হয়? হয়ত, কে জানে, বোরদে যখন প্যাভিলিয়নের কাঠের সিঁড়ি থেকে সবুজ মাঠে পা দেন, চলতে থাকেন তৃণে পুলকিত মৃত্তিকার উপর দিয়ে, তখন তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে পুরাতন বোহেমিয়ান শিল্পী। আরম্ভে তাই নির্দায়িত্ব সৌন্দর্যচর্চা করে যান। কিছু পরে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে যায়—কী অন্যায়, আমি তো প্রোফেশন্যাল! বোরদে তখন রান কুড়ুতে শুরু করেন—সদ্য ভোজনের জন্য নয়—শুকিয়ে রেকর্ড-হাঁড়িতে আমসত্ত্ব ক'রে রাখবেন বলে। বেশ খানিকক্ষণ সেই কাজ করার পরে অন্নদাসত্বের গ্লানিতে যখন মন ভারাতুর হয়ে ওঠে, তখন সান্ত্বনা খুঁজতে তুলে নেন বাদ্যযন্ত্র—ঝঙ্কার ওঠে রানের—গানের।

বোরদে চলে গেলেন, উঠে এলেন আর একজন—সিম্পসন। সিম্পসন যা করলেন! অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস-সূচনায় পুনশ্চ ভারতের পশ্চাদ্বর্তী। সেই রান পুরিয়ে, এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে দলকে। সিম্পসন অত্যন্ত ব্যস্ত। কাজটা করতে হবে। ওটা করা তাঁর পক্ষে দৈনন্দিনের কাজ যেন—করলেন—

যদি একথা বলি, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আর কোনো খেলোয়াড় একা গোটা দলকে বহন করছেন না যেমন করছেন সিম্পসন—তাহলে কোনো মতভেদের সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি না। গত ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া সিরিজকে সিম্পসন-সিরিজ বলাই উচিত। এই কলকাতার টেস্ট ধরলেও দেখা যাবে, একক গৌরবে দু'দলের বাইশ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে সিম্পসনের স্থান এখনো সর্বোচ্চে। তিনি অধিনায়ক, দলের অন্যতম প্রধান বোলার, বিশ্বের অদ্বিতীয় স্লিপ-ফিল্ডার, এবং পৃথিবীর সেরা ওপেনিং-ব্যাটসম্যান। যে-অনবদ্য ব্যাটিং আজ করেছেন, তা যে শুধু অস্ট্রেলিয়াকে সাচ্ছল্যের ভিত্তিতে স্থাপন করেছে তাই নয়, ঐ ব্যাটিংয়ের শালীনতা ও সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছে ক্রীড়া-রসিকদের। একথা সত্য, ব্যাটসম্যান হিসাবে তিনি ব্যক্তিত্ববান নন। যে-গরীয়ান্ মহিমা আছে একজন ডেক্সটারের মধ্যে, যে-প্রখর গর্জন দেখা যায় উইকস বা অমরনাথের মধ্যে, কোনো এক ওরেল বা মুস্তাক আলী যে রাগ-দীপকে জ্বলে উঠতে পারেন—সে-সব বস্তু নেই সিম্পসনের মধ্যে—কিন্তু আত্মবিশ্বাস ও অধিকারের উচ্চারণ কখনো অশ্রুত থাকেনি, ন্যূনতম প্রয়াসে বৃহত্তম অর্জনের দক্ষতা অলক্ষিত ছিল না, তিনি ব্যাটিংয়ের কার্যকারিতাকে আকর্ষণ ক'রে শিল্পসৃষ্টির দ্বারপথে স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

সিম্পসন ও ল্যারী জুটিতে ১১৫ রান হয়েছে ১১৮ মিনিটে। সিম্পসন নিজস্ব পঞ্চাশ করেছেন ৭৭ মিনিটে। চায়ের পরে তাঁর বোলার-শাসনের সীমা ছিল না। নিজস্ব ৫৯ রানের মাথায় সূর্তির বলে স্লিপে নাদকার্নিকে কঠিন একটি সুযোগ দেওয়ার পরে অব্যাহতি পেয়ে, ঐ ওভারেই মুক্তি-উৎসব পালন করলেন

তিনটি বাউণ্ডারি করে, একটি কভারে, বাকি দুটি স্কোয়ারলেগে। এরইমধ্যে তিনি ৭১ রান করে ফেলেছেন, অনায়াসে ১৪টি বাউণ্ডারি হয়ে গেছে, আজকেই সেঞ্চুরিটা হওয়ার কোনো বাধা নেই, প্রয়োজনীয় সময়ও আছে—সুর্তির অষ্টম ওভারের প্রথম বল, সামনে ব্যাট বাড়িয়ে সেটিকে স্বচ্ছন্দে ঠেলে দিলেন, ওকি, সিলি মিডঅফের হনুমন্ত সিং ঝাঁপ দিয়ে বলটি হাতে পেয়ে গেছেন! না, হল না, হনুমন্ত ভারসাম্য হারিয়েছেন, গড়াচ্ছেন পিচের উপরে...এক পাক...দু পাক...নাঃ হল, সত্যই হল, হনুমন্ত বল ছাড়েন নি। সিম্পসনের যোগ্য বিদায় এক অসাধারণ ক্যাচে।

সিম্পসনের সূচনা-সঙ্গী ল্যরী, অর্ধশতের নিকটবর্তী, দিনান্তে অপরাজিত, কিন্তু সিম্পসনের সুষ্ঠুতা ছিল না তাঁর খেলায়, যথেষ্ট খুঁচিয়েছেন, খুঁচিয়ে ঘা করা ইনিংসটি এখনো বেঁচে আছে, দুঃখের বিষয়। 'দুঃখের বিষয়' এইজন্য যে, ল্যরীর ঐ ৪৭ রানের মধ্যে ৪টি রান তৃতীয় শ্রেণীর লোলুপতার স্মারক। ক্রিকেটকে 'লাঠি-পেটা' করে ল্যরী ঐ রান-কটি জোগাড় করেছেন। সুর্তির হাত-ফসকানো একটি বল যখন মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়ে, তখন সম্পূর্ণ স্থির বলটির কাছে গিয়ে ল্যরী গলফ্-লাঠির মতো ব্যাট চালিয়ে তাকে বাউণ্ডারিতে পাঠান। তার দ্বারা ল্যরী ক্রিকেটের আইন ভাঙেননি, ক্রিকেটকে ভেঙেছেন।

আজ অনবদ্য অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং—'রান মেরে জান্' করে তাঁরা বল আঁকড়েছেন। স্বচ্ছন্দে বলা যায়, অস্ট্রেলিয়ার মিঃ ফিল্ডিং অন্তত ৫০ রান করেছেন। অপরপক্ষে ভারতের ফিল্ডিং আবার আয়েশী নিদ্রার সুখলোভী।

দিনশেষে মনে হল, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত—দুই মুখেই সমান ভালবাসার চুম্বন করছে খেলাটি। ভারত জিততে পারে। যদি জেতে, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সিরিজ-জয়। ইংলণ্ডের সঙ্গে সিরিজ জিতে সে নাবালকত্ব কাটিয়েছে, এই জয় হলে তার যৌবনলাভ। তা কি হবে? আজকের ভারতের বোলিং-ফিল্ডিং দেখে সে আশা খর্ব। অস্ট্রেলিয়ার দ্রুত রানও সে আশার পরিপন্থী। অস্ট্রেলিয়ার হাতে এখনো ৯টি উইকেট, সে ৮২ রানে অগ্রগামী (অস্ট্রেলিয়া ১—১৪৬), পিচ সহজ হয়ে উঠছে, এক্ষেত্রে সুবিধা আদায় করতে পারে ফাস্টবোলাররা। অস্ট্রেলিয়ার আছে ম্যাকেঞ্জি, কনোলি। পিচ ভাঙলে আরও সুবিধা, ভারতকে খেলতে হবে চতুর্থ ইনিংস—

থাক ও-চিন্তা। গৌরবময় একটি দিনের শেষে মনে হচ্ছে—আজ জিতেছে দু'পক্ষই। তার মানে জিতেছে ক্রিকেট। শেষপর্যন্ত এই খেলায় ভারতই জিতুক বা অস্ট্রেলিয়াই জিতুক, কিংবা ড্র হোক, আমরা যেন অনুভব করি পাঁচ দিনের শেষে—শেষ জয় খেলার, শুধু খেলার।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—১৭৪

ভারত—প্রথম ইনিংস

...পাতৌদি ব সিম্পসন—২; নাদকার্নি ব ম্যাকেঞ্জি—২৪; বোরদে নটআউট —৬৮; সুর্তি ক সেলার্স ব সিম্পসন—৯; ইন্দ্রজিৎ সিং স্টাঃ জার্মান ব বুথ —২; চন্দ্রশেখর ব সিম্পসন—১। অতিরিক্ত—৪। মোট—২০৫।

বোলিং: ম্যাকেঞ্জি—১৯-৯-৩১-১; কনোলি—৮-৪-১০-০; ভিভার্স—৫২-

১৮-৮১-৩; সেলার্স—৫-১-১৭-০; বুথ—১৮-১০-৩৩-২; কাউপার—৬-০-১৪-০; সিম্পসন—২৭˙৩-১২-৪৫-৪।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস

সিম্পসন ক হনুমন্ত ব সুর্তি –৭১; ল্যরী ব্যাটিং—৪৭; কাউপার ব্যাটিং—১৪। অতিরিক্ত—১১। মোট (এক উইকেটে)—১৪৩।

বোলিং : সুর্তি—১০-২-৩৭-১; জয়সীমা—২-১-৪-০; দুরানী—১৮-৩-৫৯-০; চন্দ্রশেখর—৮-৩-২৭-০; নাদকার্নি—৮-৬-৫-০।

চতুর্থ দিন : বৃষ্টির মধ্যে কর্মকর্তাদের খেলা

চতুর্থ দিন বৃষ্টির জন্য খেলা হয়নি। এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত বেরী সর্বাধিকারীর বিবরণ এই :

"মাঠে জল, গ্যালারির দর্শকদের মনে আগুন। ৩-১৫ মিনিটে ইডেন-উদ্যানে মাইকে ঘোষণা—বৃষ্টির জন্য টেস্টম্যাচের চতুর্থ দিনের খেলা বন্ধ। সঙ্গে-সঙ্গে বিপুল দর্শকের বিক্ষোভ। শেষে গ্যালারির চাঁদোয়ায় সত্যি-সত্যিই আগুন। বিক্ষোভকারীদের পুলিশ সামান্য লাঠি চালিয়ে আয়ত্তে আনে, আর আগুন নেভাতে ছুটে আসে স্বেচ্ছাসেবক। দমকল আসে কিছু পরে। সামান্য আগুন। ক্ষতি হয়নি বললেই চলে।

"সারাদিন খেলা হবে-হবে বলে দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে। বারে-বারে আম্পায়াররা পিচ দেখেছেন। দুই অধিনায়ক, পাতৌদি ও সিম্পসন পিচ দেখে খেলা হবে বলে একমন হননি। অবশেষে আম্পায়ার পিচ দেখে সন্তুষ্ট হলেন। তবে দক্ষিণপ্রান্তে জল থাকায় খেলা সম্ভব নয় বলে ঘোষণা করলেন। দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।"

দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি অকারণে নয়। ক্রিকেট-কর্তৃপক্ষ দর্শকদের সঙ্গে মোটেই ভালো খেলেননি। ফল শেষপর্যন্ত সুবিধের হয়নি। এ-বৎসরের মৃদু বিক্ষোভ কয়েক বৎসর পরে বজ্রের মতো ফেটে পড়ে কলকাতার ক্রিকেট-ইতিহাসে আগ্নেয় ইতিহাস সৃষ্টি করবে। সে ইতিহাস যে, বহুদিনের সঞ্চিত দাহ্য পদার্থের দ্বারাই রচিত হয়েছিল, তার পক্ষে কিছু প্রমাণ দেবার জন্য, আমি ২২ অক্টোবর, ১৯৬৪ তারিখে 'সি-এ-বি জবাব দিন' বলে সাধুভাষায় যে-লেখাটি লিখেছিলাম, তার বড় অংশ এখানে উপস্থিত করছি :

"কলকাতা-টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা, সকাল ৯টার সময়কার এক পশলা বর্ষণের জন্য বন্ধ থাকে। এই বন্ধ থাকা লইয়া নানা প্রকার প্রশ্ন উঠিয়াছে, অধিকাংশ অভিযোগ সি-এ-বি-র বিরুদ্ধে।

"শোনা গেল, অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়-মহলে বৃষ্টির সময়ে মাঠ ঢাকা লইয়া নানা প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। মাঠ সময়মতো ইচ্ছা করিয়া ঢাকা হয় নাই, এরূপও নাকি আভাসে-ইঙ্গিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া-পক্ষে এরূপ সন্দেহ স্বাভাবিক। তাঁহারা ব্যাটিং করিতেছিলেন, পিচ ভিজিলে তাঁহাদের ক্ষতি। তৃতীয় দিনের খেলা অনুযায়ী, খেলার উপরে তাঁহারা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে পিচ ভিজিলে

তাঁহাদের সন্দেহ করিবার বা অভিযোগ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে।

"আমরা ধরিয়া লইতে পারি, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিয়া পিচ ভেজান নাই। হঠাৎ-বৃষ্টির জন্য পিচ অবিলম্বে ঢাকা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সত্যই কি বৃষ্টি হঠাৎ পড়িয়াছিল? তাহা নহে। বেশ কিছু সময় পূর্ব হইতে আকাশে মেঘ ঘনাইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে, খেলা শরৎ কালে হইতেছে, যখন হঠাৎ-বৃষ্টি স্বাভাবিক। এবং গত তিন দিন বৃষ্টি বা মেঘের জন্য খেলা বিঘ্নিত হইয়াছে। সুতরাং প্রস্তুত না থাকাই অপরাধ। বিশেষতঃ খেলাটি যখন আন্তর্জাতিক এবং ইহার সঙ্গে হাজার-হাজার মানুষের অর্থ ও আকাঙ্ক্ষা জড়িত। কিছু হিসাবের কথা এখানে উঠিতেই পারে। শুনিয়াছি, পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া পিচ ঢাকার জন্য কতকগুলি অ্যালুমিনিয়াম আচ্ছাদনী নির্মিত হইয়াছিল। অনেকগুলি কম্বল নাকি একই উদ্দেশ্যে ক্রীত এবং বহুসংখ্যক মালীও নিযুক্ত। এই বিপুল অর্থব্যয়ের পরে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে দায়িত্ব কাহার?

"তিনটার পরে আম্পায়ারগণ জানাইলেন, মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ খেলার অনুপযোগী থাকার জন্য খেলা হইবে না। ঐ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জল শুকাইবার চেষ্টা করা হয় আড়াইটার পর হইতে। বেলা ৯টায় জল হইয়াছিল, এগারোটায় জল অনেক সরিয়া গিয়াছিল। এগারোটা হইতে আড়াইটা—এই সাড়ে তিন ঘণ্টা মাঠের ঐ অংশের জল শুকাইবার চেষ্টা করা হয় নাই কেন? বিশেষত মালীদের যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠে শুইয়া বসিয়া গুলতানি করিতে দেখা গিয়াছে?"

পঞ্চম দিনেও খেলা হয়নি। তার ফলে ১৯৬৪ ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট-সিরিজের ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। 'মহান অনিশ্চয়তায়' চিহ্নিত ক্রিকেটের উপর অনিশ্চিত 'প্রকৃতির' সরস পরিহাসের প্রভাব কম নয়, কলকাতার দর্শক নৈরাশ্যের মধ্যে বুঝেছিল। আর একটি গ্রেট টেস্ট হবার প্রতিশ্রুতি ললাটে ধারণ করে যে-খেলা অগ্রসর হয়েছিল, তা মধ্যপথে বিধাতার মারে গতায়ু হয়ে শোকাচ্ছন্ন করে রেখেছিল ক্রীড়ারসিকদের।

বৃষ্টিতে খেলা বন্ধের শোককাব্য আমি ইচ্ছে করেই লিখিনি, অশ্রুতে অশ্রু মেশাবার ইচ্ছা ছিল না। আমার প্রিয় দর্শকদের অব্যাহতি দিয়েছিলাম। নিজেদের নিয়ে আর কত খেলা করব। এমন সময়ে হাতে এসে পড়েছিল নর্ম্যান ও'নীলের ক্রিকেট-গ্রন্থ, যাতে ভারতীয় দর্শকদের বিষয়ে অনেককিছু লেখা আছে। ভারতের দর্শকেরা যাতে বিপক্ষের চোখের আয়নায় নিজেদের দেখতে পারেন, তার জন্য 'ও'নীলের চোখে ভারতের দর্শক' বলে একটি রচনা পাঠকদের উপহার দিয়েছিলুম।

ও'নীলের কথা বিশেষভাবে মনে উঠেছিল এইজন্য যে, অসুস্থতার কারণে তিনি মধ্যপথে দেশে ফিরে যান। (ক্রিকেট-বহির্ভূত কারণে প্রস্থান, একথা বলেছিলেন কেউ-কেউ, তাতে অস্ট্রেলিয়ার ম্যানেজার দৃঢ় প্রতিবাদ করেন)। ও'নীলের লেখায় পূর্ববর্তী ১৯৫৯-৬০ সফরের সময়কার অস্ট্রেলীয় শিবিরের ব্যাধি-সংবাদ প্রাধান্য পেয়েছিল। আমরা জেনেছি, ভারতের আকাশে বাতাসে ও খাদ্যে ছড়ানো ব্যাধির কথা। যদিচ সফরের আগে শরীর সম্বন্ধীয় উপদেশের অন্ত ছিল না, দলে ডাক্তারও ছিল, তবু তিনজন হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত

হন। তার ফলে দ্'জনের ক্রিকেট-জীবন খর্ব হয়ে যায়। অনেকের সঙ্গে ও'নীলেরও পেটখারাপ হয়। এই স্বাস্থ্যবান ভোজনবিলাসী য্বকটির পাকিস্তানের বির্দ্ধে স্থায়ী অভিযোগ—ওখানে তিনি প্রায় না-খেয়ে মরছিলেন। না, পাকিস্তানীরা মোটেই কৃপণ নন, খ্বই অতিথিবৎসল, রোজ তাঁরা অতিথিদের ম্রগির কালিয়া খাইয়েছিলেন—কিন্তু এই সায়েবের যে আবার গর্ না হলে চলে না- এবং হা হতোস্মি!—অন্য কোথাও নয়, পাকিস্তানে, ও'নীল গোমাংস পেলেন না খাবার জন্য!!

দর্শকদের কথায় আসা যাক। ও'নীল লিখেছেন, 'খেলা ও ভ্রমণের সময়ে অতি-উৎসাহী হাজার-হাজার দর্শকের অবিরত মনোযোগের ঠেলায় আমাদের প্রাণান্ত। অপরপক্ষে বলতে হবে, আমরা রাজার হালে ছিল্ম। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে একেবারে ঠাসা মাঠে খেলে যাওয়া এক ধরনের মাদকতাময় অভিজ্ঞতা বৈকি।'

ক্রিকেট-পাগল ভারতীয়দের ছবি পরপর এই রকম : ঢাকা যাওয়ার পথে দমদম বিমানঘাঁটিতে দ্'ঘণ্টার জন্য অবতরণ করে অস্ট্রেলিয়ানদের চক্ষ্স্থির—ওরে বাবা—ঈ কী কাণ্ড!! "বিমানঘাঁটি ছেয়ে আছে হাজার-হাজার লোক—গ্ঁতো-গ্ঁতি ঠেলাঠেলি করছে ক্ষেপে গিয়ে, অটোগ্রাফ সংগ্রহের চেষ্টায়। মত্ত উৎসাহের চেহারা দেখে আমরা অবাক। এখন তো কলকাতায় খেলার কথা নয়। সফরের শেষ খেলা তো সেখানে! আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল, ভবিষ্যতে শ্ধ্ কলকাতায় নয়, সারা ভারতে কোন্ জিনিস দেখব।"

দিল্লীর দর্শক : "দিল্লী-টেস্টের প্র্বে প্রাকটিশের সময়ে অদ্ভ্ত কাণ্ড।... নেটের আশপাশ কিংবা বোলারের পিছন থেকে দর্শকদের সরানো গেল না, অথচ ঐসব জায়গায় তারা অরক্ষিত অবস্থায়। একজন কর্মকর্তা ছড়ি ঘ্রিয়েও তাদের সরাতে পারলেন না। অ্যালান ডেভিডসন ও ভারতীয় অধিনায়ক রামচাঁদের মতো কড়া মারিয়ে প্রাকটিশ শ্র্ করলে বোঝা গেল, এবার কেউ না কেউ আহত হবেই। ডেভিডসনের একটি প্রচণ্ড ড্রাইভ কপালে লেগে সত্যসত্যই রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটল কিন্তু তাতেও নড়বার নাম নেই। তখন প্রাকটিশ অসময়ে বন্ধ করা ছাড়া উপায় রইল না—আমাদের হাতে কারো ম্ত্যু ঘট্ক আমরা চাইনি।

"টেস্টম্যাচের সময়ে ভারতীয় দলের ব্যর্থতায় নিরাশ দর্শকেরা মাঠে বোতল ছ্ঁড়তে লাগল। তারা সর্বপ্রকারে গোলমাল করল—বোলার দৌড় শ্র্ করা থেকে শেষপর্যন্ত চীৎকারের ক্রমব্দ্ধি ঘটতে লাগল।...কোনো খেলোয়াড় সেঞ্চ্রি করলে শিশ্ থেকে ব্দ্ধ পর্যন্ত সকলে মাঠের মধ্যে ছ্টে গিয়ে তাঁকে মাল্যদান করে, সেইসঙ্গে টাকাকড়ি ও অন্যান্য জিনিস উপহার দেয়। দর্শকদের ক্রীড়াপ্রীতিতে সন্দেহ করতে পারি না, যখন জেনেছি, এদের অনেককেই সপ্তাহের বা গোটা মাসের মাহিনা ব্যয় করতে হয়েছে টেস্টম্যাচ দেখার জন্য।"

দর্শকদের ভালবাসার গ্ঁতোয় অস্ট্রেলিয়ানরা অস্থির। "পিঠ চাপড়ানো, হ্যাণ্ডসেক, ঠিকভাবে বলতে গেলে হাত ধরে হাড়-ঝাঁকানো—সফরের স্থায়ী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।" বাঙ্গালোরের দর্শকদের প্রীতির প্রহারে "অস্ট্রেলিয়ানরা ধরাশায়ী।"

দিল্লী বা বাঙ্গালোরের কাছে কলকাতা হার মানতে পারে না। আরম্ভে কলকাতাকে ও'নীল দেখেছেন, অন্তেও :

"ফিরে যাওয়ার আগে কলকাতাই আমাদের শেষ বন্দর। বিমান যখন কলকাতায় এসে থামল...সামনেই হাজার-হাজার বাঁধনছেড়া ক্রিকেট-ফ্যান।...বেশ বোঝা গেল, পুলিশ-পাহারা ছাড়া বিমান থেকে নামতে পারব না, কারণ উৎসাহীরা বিমানটিকে ঘিরে ফেলেছে। পিছনের দরজা খুলে অন্য আরোহীদের নামিয়ে দেওয়া হল—আমরা বসে রইলুম ভিতরে। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে উৎসাহীর দল প্লেনে উঠে পড়ল। প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে তাদের বাধা দিতে লাগলুম। সে চেষ্টা থামা পড়ল প্লেনের সম্মুখবর্তী একজনের চীৎকারে—উৎসাহীরা সামনে দিয়েও প্রবেশ করছে। তারা নিশ্চয় পাইলটের ককপিট বেয়ে উঠেছে—এবং দুদিক দিয়ে প্রবেশ করছে। আমরা বন্দী হয়ে পড়লুম।

"কিছু সময় পরে পুলিশ এসে অবরোধ মুক্ত করে, আমাদের উদ্ধার করে ভিতরে ঢুকিয়ে-আনা মোটরে তুলে দিল। চাপড়ানির চোটে কাঁধে-পিঠে বাড়তি কিছু যন্ত্রণা ছাড়া এক্ষেত্রে ঘটনার তুলনায় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

"কলকাতাকে সত্যি ক্রিকেটজ্বরে ধরেছিল। বহু সহস্র দর্শক জুটল প্রাকটিশ দেখতে, ফলে তা বন্ধ করে দিতে হল।...মাঠ থেকে ড্রেসিংরুমে নিরাপদে ফেরাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।...ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে গুজব রটল—টিকেট সংগ্রহে ব্যর্থ দর্শকেরা রাত্রে গ্যালারিতে আগুন ধরিয়ে দেবে।..."

* * * ক্রিকেট-মঙ্গল * * *

[মোহনবাগান ক্লাব নিজেদের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতায় ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের নিয়ে পাঁচ দিনব্যাপী একটি প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করে ইডেন-উদ্যানে ১৯৬৪ ডিসেম্বরে। ভারতীয় একাদশে ছিলেন—সরদেশাই, জয়সীমা, হনুমন্ত সিং, বোরদে, মঞ্জরেকর, সুব্রহ্মনিয়াম, পাতৌদির নবাব, দুরানী, তামানে, দেশাই, চন্দ্রশেখর। কমনওয়েলথ-দলে—রিচার্ডসন, সি স্মিথ, বুচার, কাউড্রে, সোবার্স, মুস্তাক মহম্মদ, ক্লোজ, নাইট, মর্টিমোর, গিবস, কে অ্যান্ড্রুজ।

খেলাটিতে প্রদর্শনী খেলার চরিত্র যথাসম্ভব বজায় রাখা হয়। হিসেবী দান-ছাড়াছাড়ির দ্বারা তাকে উজ্জীবিত রেখে দর্শকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টার অভাব ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ প্রথম ইনিংসে করে ৩৩৯। তার মধ্যে বোরদে ১২৪, দুরানী ৯২, সরদেশাই ৪৬। বোলিংয়ে ক্লোজ—১৩-৩-৩৫-২; গিবস ১৭-৫-৪৭-২; মর্টিমোর ১৭-৩-৫৩-২; মুস্তাক মহম্মদ ৭-০-৪৮-২। কমন-ওয়েলথ-দল প্রথম ইনিংসে অল্প এগিয়ে থাকেন—৩৫৫। সোবার্স—৮৩, কাউড্রে ৬৬, মুস্তাক মহম্মদ ৫৯, রিচার্ডসন—৪৩, বুচার—৪০। বোলিং: দেশাই—১৬-৩-৫৮-৩; জয়সীমা—১৩-০-৬৬-২; দুরানী—১৭-০-৮৭-২; সুব্রহ্মনিয়াম—৪·২-০-২১-২। মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দ্বিতীয় ইনিংসে করে ৪৩৯। হনুমন্ত সিং—১৫৪; জয়সীমা—৬৪; দেশাই (নটআউট) ৬৩; বোরদে—৫৭। বোলিং: সোবার্স—১৯-১-৯৪-৪; মর্টিমোর—১৭-০-৭৯-২; ক্লোজ—১৭-১-১১০-২। কমনওয়েলথ দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ৪২৭। সোবার্স—১০২, সি স্মিথ—৬৮, ক্লোজ—৫২, মুস্তাক মহম্মদ—৫১। কমনওয়েলথ দল এক উইকেটে জিতে যায়—'টাই'ও হতে পারত॥

পাঁচদিনের খেলা কিছুকম চারদিনে শেষ হয়েছিল। রান হয়েছিল মোটমাট ১৫৬০। সেরা ব্যাটসম্যানেরা হাত খুলে খেলেছিলেন। রানের ফোয়ারার তলায় বসে ইডেনে শীতের দুপুর কাটিয়েছিলেন দর্শকেরা নিরুদ্বেগে, কারণ প্রতিযোগিতার দংশন ছিল না। এই খেলার প্রথম দিনের যে-বিবরণী লিখেছিলুম —তার মধ্যেই ধরা পড়েছে খেলার মেজাজ। তলায় সেটাই উপস্থিত করছি—]

সোবার্স তাহলে এলেন—রাত্রি একটায়!—নেট-প্র্যাকটিস সোবার্সের না হলেও চলবে, নাকি প্লেনেই সেরে নিয়েছেন—

ভাবতে-ভাবতে মাঠে ঢুকে চমকে গেলুম, এ আমি কোথায়! ক্রিকেটমাঠে কিংবা অগ্রহায়ণের কোনো পরিণয়মঙ্গল ভবনে! সানাই বাজছে, বাজি ফাটছে, আকাশে উড়ছে রকেট, আলোকের ঝরণার মতো ছড়িয়ে নামছে বহু রঙের চিকন কাগজ, দুলে-দুলে ভেসে চলেছে ফানুস—

আমি কিছুটা সচেতন হলুম ভারতীয় ক্রীড়াগগনের সুবিখ্যাত সবুজ-মেরুণ পতাকাকে চতুর্দিকে দোলায়িত দেখে। সত্যই উৎসবস্থলীতে এসেছি আমরা। 'রুপো', 'সোনা', 'হীরে'—সব 'জয়ন্তী'র পরে ভারতের মোহনবাগান ক্লাব 'প্লাটিনাম-জয়ন্তীতে' আসীন—শতবার্ষিকী ভবনের দিকে মুখ করে।

প্লাটিনাম-জয়ন্তী উদ্‌যাপনের জন্য মোহনবাগানের আয়োজন প্রচুর। খেলার বিশ্বকে মেলাতে চেয়েছে এই উপলক্ষে। জার্মান অ্যাথলেটরা ছোটাছুটি করে গেছে, হাঙ্গেরীয়ানরা ফুটবল খেলেছে, এবং ক্রিকেট খেলতে এসেছে ইংরেজ, ওয়েস্টইণ্ডিয়ান ও পাকিস্থানীরা কমনওয়েলথ-দলের হয়ে। সর্বদেশ-মিলিত এই আনন্দাঞ্জলি—মোহনবাগানের প্লাটিনাম-জুবিলীর জন্য—এ যে যোগ্য ব্যবস্থা, স্বীকার করি।

মোহনবাগান আলো দিয়ে ঘিরিয়ে দিয়েছিল তাদের ময়দানের শিবির। অনেক অনেক আলো ঘিরেছিল রাতের পর রাত মোহনবাগানের ময়দান-ভবনকে। কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন বোধহয়, রাত্রির সেই আলোর আয়োজন করবেন দিবালোকেও—ইডেন-উদ্যানের গ্যালারিকে ঘিরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারদের প্রতিভা-বিচ্ছুরণকে দেখতে-দেখতে মনে ফুটবে খুশির আলো, মুখে জ্বলবে হাসির আলো।

এই খেলার আয়োজনকে আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সংবর্ধনা করেছিলুম। এ খেলা টেস্ট নয়, "টেস্ট"ও নয়—এ খেলা, শুধু খেলা। এ খেলায় খেলা দেখতেই লোক আসবে, কোনো 'জাতীয় দুর্ভাবনা' নিয়ে নয়। এ খেলায় যখন ইচ্ছে লোক আসবে, দেখবে, আবার চলে যাবে। যাওয়া আসার পথের ধারে অবাঞ্ছিত ভিড় থাকবে না, থাকবে না ইতর কলহ। একটি খেলা, যা যতক্ষণ ভালো লাগবে দেখব, তার বিষয়ে লিখব, কিংবা লিখব না, এবং আসবও না যদি মারাত্মক কাজ থাকে অফিসে, কিংবা যদি ডাক্তার হই, নিশ্চয় আসব না যদি রোগী আমারই অস্ত্রের প্রতীক্ষায় টেবিলে শুয়ে ছটফট করে।

আমার রসলোভী মন বিনা যন্ত্রণায় কাউড্রের কয়েকটি ড্রাইভ, সোবার্সের সেঞ্চুরি, মুস্তাক মহম্মদের হুক এবং বোরদের অনুপম প'য়ষট্টি দেখতে চেয়েছে। তার সংগে পাতৌদির ভদ্র একটা ইনিংস কিংবা বুচারের কিছু খেলার

বুচারি।

সেই প্রত্যাশায় মাঠে প্রবেশ করে মাঠের সানাইয়ের সুরে আমার আশার প্রশ্রয় যেন দেখতে পেলুম : অন্তত যখন ভারতীয় সুন্দরীরা বীরগণকে তিলকে ও মালায় অর্চনা করলেন। ভারতীয় তরুণীদের প্রথম মালা পেলেন বিদেশীরাই, তাঁরা তখন অতীব উৎফুল্ল। প্রসন্ন ঈর্ষায় সেই অতিথিপরায়ণতা লক্ষ্য করছিলেন অপেক্ষমাণ ভারতীয় বীরগণ—এবং যখন এই বরণ-অধ্যায় চলছিল, তখন সানাইয়ের সুর গাঢ় মধুরতাকে উদ্‌গিরণ করছে সুখাবেশে—সবই আমরা উপভোগ করছিলুম।

সন্ধ্যায় যখন মাঠ ছেড়ে চলে আসছি—তখনও সানাইয়ে সুরের বিস্তার। এবার ভৈরবী নয়—পূরবী। আর তারই মাঝে ক্রিকেট! পাঠক বিশ্বাস করুন, এতটুকু অতিরঞ্জন আমি করছি না।

সে ক্রিকেটও সুরের মতো। তার কতকগুলো তার অবশ্য ছিঁড়েছিল মধ্যাহ্নপূর্ব-কালে তখন ভারতীয় ব্যাটিং ভেঙে পড়ার মুখে দাঁড়িয়ে। বারটার সময়ে ৬ উইকেটে যখন ১০৭ রান, তখন সকলেই ভেবেছিল, ভারতীয় দল একটা রেকর্ড করার পথে—মধ্যাহ্নভোজের পূর্বে গোটা দলের সহজ মাঠে সহজ সমাপ্তি। জয়সীমা আউট হবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে খেলেছিলেন, গ্লান্স-গ্লাইড-পারদর্শী সারদেশাই অর্ধশত অতিক্রম করার প্রতিশ্রুতি দেখাননি, পাতৌদি ও হনুমন্ত তাঁদের সুমোহন খেলার সকল সম্পদকে বোম্বাই-দিল্লীতে ফেলে এসেছিলেন, মঞ্জরেকর অদ্ভুত করেছিলেন নামমাত্র শূন্য ভঙ্গ করে, এবং সেই উল্লাসে দ্রুত বিদায় নিতে দ্বিধা করেন নি—কিন্তু—হাঁ—'কিন্তু'—কলকাতার বোরদে অপেক্ষা করছিলেন এবং মেজাজী দুরানী। বোরদে ও দুরানী ভারতীয় ব্যাটিংয়ের স্বীকৃত ঐশ্বর্যকে 'এই তো রয়েছে' বলে দেখিয়ে দিলেন।

দুটি খেলোয়াড় মুখোমুখি—দুটি সেঞ্চুরি মুখোমুখি—বোরদে ও দুরানীর। একটি সেঞ্চুরি হল, অন্যটি হল না। বোরদে পারলেন, দুরানী পারলেন না। ক্ষতি কি? আমরা কি সেঞ্চুরি চাই, না খেলা চাই! সেঞ্চুরিও পেয়েছি (যদিও একটি), খেলা পেয়েছি—যার পরিমাণ প্রচুর।

একটি ছবি আমি বহুবার এঁকেছি—বোরদে ও দুরানীর—দুজনের বোলিংয়ের। দুরানী দীর্ঘদেহ, অবিন্যস্তকেশ, ঈগলচক্ষু, চওড়া কব্জির মালিক। তাঁর বাড়ানো ব্যাট ব্যক্তিত্বে ও বহ্নিতে পূর্ণ। তাতে সরব আত্মঘোষণা। অপরদিকে বোরদের খেলায় শিল্পের ব্যঞ্জনা। তাঁর সুঠাম গঠন, উজ্জ্বল চক্ষু, সাজানো চুল, এবং চকিত অথচ পরিমাপিত আবেগ। বোরদে চার-এর ভাষায় কথা বলেছিলেন। দুরানী অধিকন্তু ঊর্ধ্বচারিতায় অভীপ্সু ছিলেন। দুরানীর মারের সময়ে লেগের দিকের হতাশ ফিল্ডার ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'কোথায় দাঁড়াব?' অধিনায়ক রিচার্ডসন নাকি সদুঃখে কৌতুক করেছিলেন—'গ্যালারিতে।'

ফেস্টিভ্যাল ক্রিকেট যখন তখন পাঠকদের দু'একটি দর্শক-সংলাপ উপহার দেওয়া যায়। লাঞ্চের আগে একটা সময়ে গিবস প্যানিক সৃষ্টি করেছিলেন। সেইসময়ে তিনি দুটি উইকেট নেন ৯ রানে। সেই কাণ্ড দেখে যাদবপুরের জনৈক দর্শক নাকি বলেছিলেন—'গিবস্ জিভস্ বাইর কইর‍্যা দ্যাসে।' সাফল্যমণ্ডিত গিবস্-এর গোটা মুখে তখন পূর্ণ হাসি। তাতে শ্যামবাজারের দর্শক

চটে গিয়ে বলেন—'হাসি তো নয়, সোসির হাসি।' কিন্তু হাওড়ার ক্রিকেট-রসিক দর্শক খুশি না হয়ে পারেননি—'টাকার দাম উঠে গেল র‍্যা—।'

পিছনে ছিল সানাইয়ের সুর, সামনে সায়াহ্নের সহচর আমারই দীর্ঘ ছায়া, আমি খেলাশেষে কার্জন-পার্কের দিকে হাঁটছিলুম। ভাবছিলুম, যদি এমনই সুন্দর একটি দিনের ছায়াকে নিয়ে প্রতিদিন প্রত্যাবর্তন করতে পারি। যদি—।

✲ ✲ ✲ ভারত-ওয়েস্টইণ্ডিজ টেস্ট ✲ ✲ ✲

ইডেন-উদ্যানে-১৯৬৭

১৯৬৬-৬৭-তে সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্টইণ্ডিজ ভারতসফরে আসে। তিন টেস্টের ব্যবস্থা, সেইসঙ্গে কয়েকটি সাধারণ খেলাও। বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্টে ওয়েস্টইণ্ডিজ ভারতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে দেয়। একেবারে শোচনীয় পরাজয় হয়নি ভারতের। ভারত প্রথম ইনিংসে করে ২৯৬। তার মধ্যে বোরদের সেঞ্চুরি ছিল—১২১। দুরানী (৫৫), পাতৌদি (৪৪), এবং বেঙ্কটরাঘবনের (৩৬ নটআউট) কিছু উল্লেখযোগ্য রান। বোলিংয়ে সফল—সোবার্স (৩-৪৬), গ্রিফিথ (৩-৬৩), হল (২-৫৪), হলফোর্ড (২-৬৮)। ওয়েস্টইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে বড় সংখ্যায় রান করে—৪২১। তার মধ্যে হাণ্টের সেঞ্চুরি (১০১), লয়েডের ৮২, হলফোর্ডের ৮০, সোবার্সের ৫০ উল্লেখ্য। বোলিংয়ে চমকপ্রদ চন্দ্রশেখর—৭-১৫৭। বেঙ্কটরাঘবন—২-১২০। ১২৫ রানের ব্যবধানে থেকে ভারত যথেষ্ট উদ্দীপনার সঙ্গে খেলে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১৬ রান করে (কুন্দরন ৭৯, পাতৌদি ৫১, জয়সীমা ৪৪, বেগ ৪২)। গিবসই বোলিংয়ে ক্ষয়কারী ৫-৬৭। তাঁর সহায়ক হলফোর্ড—৩-৯৪, এবং সোবার্স ২-৭৯। যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ১৯১ রানের বেশি ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারেনি, এবং ওয়েস্টইণ্ডিজও ব্রাবোর্ন-স্টেডিয়ামের কুম্ভীরগাত্রের পিচে হঠাৎ বিদায়ের ইচ্ছাপ্রকাশ করেনি, ৪ উইকেটে ১৯২ রান করে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান করে ফেলেছিল (লয়েড ৭৮ নটআউট, সোবার্স ৫৩ নটআউট)—কিন্তু তা করতে হয়েছিল চন্দ্রশেখরের আক্রমণকে সম্মান করেই। চন্দ্রশেখর ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের বিদায়ী ১৪টি উইকেটের ১১টিই নিয়েছিলেন—৯২·৫ ওভার বল করে, ২৩৫ রানে। বহিরাগত-দলের বিরুদ্ধে ব্রাবোর্ন-স্টেডিয়ামে তখন-পর্যন্ত ঐ হল ভারতপক্ষে সর্বাধিক উইকেটগ্রহণের রেকর্ড।

প্রথম টেস্টে ওয়েস্টইণ্ডিজ বিজয়ী কিন্তু একেবারে অসমান প্রতিযোগিতা নয়। ওয়েস্টইণ্ডিজ ক্ষেত্রবিশেষে ভেঙে পড়তেও পারে দেখা গেল ইন্দোরে, সেখানে সে সম্মিলিত মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের কাছে ইনিংসে হারল—সুব্রত গুহ দুইনিংসে ১১টি উইকেট কেড়ে নিলেন।

এই অবস্থায় কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল—কেননা, এখানেই নির্ধারিত হবে : ভারত জয়ী হয়ে, বা ড্র করে, সিরিজ জেতার বা সমান রাখার প্রতিযোগিতা জিইয়ে রাখতে পারবে কি-না, কিংবা হেরে গিয়ে জলাঞ্জলি দেবে উচ্চাশায়। ওয়েস্টইণ্ডিজ-দলের কয়েকজনের শরীর তেমন ভাল যাচ্ছে না এবং আমাদের খেলোয়াড়েরা শীতসুখে ঝলমলে—এমন-সব সংবাদও ভারতীয় দর্শকদের চিত্তে শিহরণ এনেছিল। অকস্মাৎ বেদী নামক বাম-হাতের

স্পিনারের দলভুক্তি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি সুব্রত গুহকে বাদ দেওয়াও, যাঁর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কিছু আত্মঘোষণা করতে চাইছিল। সব জড়িয়ে কলকাতা কিন্তু ক্রিকেট-মাতাল।

টিকিটের জন্য কাঁদাকাটা হাহাকারে পৌঁছল। এরই উত্তেজনায় ওয়েস্ট-ইন্ডিজকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এক ভাবগদ্‌গদ্‌ রচনা লিখে ফেলেছিলুম :

স্বাগত ওয়েস্ট-ইন্ডিজ

মধুর রৌদ্রের সন্তান তোমরা—উষ্ণ রৌদ্রের মানুষ আমরা—তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের রৌদ্রতাপের অনুরূপ হৃদয়তাপ দিয়ে।

বিখ্যাত এক ভাগ্যান্বেষী অভিযাত্রী একদা ইউরোপ থেকে ভারতসন্ধানে বেরিয়ে তোমাদের দ্বীপগুলি আবিষ্কার করেছিলেন। যে-দেশ ভারত নয়, তাকে ভারত ভেবে তিনি তোমাদের দ্বীপগুলিব নাম দিয়েছিলেন 'পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।' তোমাদের সঙ্গে হৃদয়ের গভীর নৈকট্য আজ আমরা এতই অনুভব করছি যে, সে-ভ্রান্তিকে মনে হচ্ছে অনুকূল ভ্রান্তি। বিশ্বাস করতে চাইছি—বহুদূরে অবস্থিত থেকেও তোমরা ভারতেরই পশ্চিম দ্বীপের অধিবাসী।

ক্রিকেট বন্দী ছিল ইংলণ্ডের বদ্ধদ্বীপতায়, কশাহত হচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ার নিষ্ঠুর জিগীষায়, অল্পপ্রাণ হয়ে বজায় ছিল মনোরম নিউজিল্যাণ্ডে, কিংবা আহত হিংসায় ফুঁসছিল সাউথ আফ্রিকায়—তোমরা সেখানে এনেছ—খেলা—খেলা—খেলা—। তোমরাও দ্বীপেব মানুষ কিন্তু সংকীর্ণ দ্বৈপায়ন নও। সমুদ্রে ভেলার মতো তোমাদের দ্বীপগুলি ভাসছে—তোমাদের ক্রিকেটও।

সোবার্স নামক এক ব্যক্তি তোমাদের নায়ক। তাঁর প্রতিভার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্তুতি উদ্গীত হয়েছে। প্রতিমা ও পুরাণের দেশ আমাদের। যদি আমাদের কোনো কবিযশঃপ্রার্থী ঠিক এখনি ক্রিকেট-পুরাণ রচনা করতে বসেন, তিনি অবশ্যই সোবার্সকে ক্রিকেট-ব্রহ্মাণ্ডে চতুরানন, পঞ্চানন বা ষড়ানন কোনো দেবতা করে তুলবেন। ইডেন-উদ্যানে ক্রিকেটের পঞ্চদিবসী মহাপূজায় সোবার্সের বহুমুখ বহুবাহুর দেবলীলা দেখতে আমরা উৎসুক।

তোমাদের সোবার্স ক্রিকেট-সাহিত্যে একটি নতুন প্রয়োগ সম্ভব করেছেন—বর্ণরঞ্জিত মানুষদের মর্যাদার সপক্ষে একটি অলঙ্কার। ভবিষ্যতে ওয়েস্ট-ইন্ডিজের বাইরে কোনো বিরাট অলরাউণ্ডার জন্মালে তাঁর বিষয়ে বলতেই হবে—ইনি শ্বেত বা পিঙ্গল সোবার্স। জর্জ হেডলীকে যখন কালা ব্রাডম্যান বলা হয়েছিল, তখন তোমাদের আহত মর্যাদা প্রতিবাদে ঝলসে উঠে বলেছিল—ব্রাডম্যান 'সাদা হেডলী' নন কেন ? নন, এইজন্য যে, হেডলীর চেয়ে ব্রাডম্যান অনেক বড় প্রতিভা। সোবার্স সম্বন্ধে সে-সংশয় কিন্তু নেই। চৌকশের জগতে তিনি পঞ্চকোষ অস্তিত্ব।

ওয়েস্টইন্ডিজ-ক্রিকেটের শিরোমাণিক্য এখন সোবার্স—তিনি খেলতে এসেছেন। সে খেলা দেখতে এসেছেন সদ্য-অতীতের প্রাণপুরুষ—ফ্রাঙ্ক ওরেল। আসেন নি লিয়ারী কনস্টানটাইল—যাঁকে বলা হয় ওয়েস্টইন্ডিজের প্রতীক-ক্রিকেটার। কনস্টানটাইন যদি আসতেন, তাহলে ইডেন তার প্রাচীন অঙ্গনে ওয়েস্টইন্ডিজ-ক্রিকেটের ত্রিজন্মকে একসঙ্গে পেয়ে যেত।

সোবার্সের সঙ্গে কানহাইও এসেছেন, যিনি কোন্ বেদনায়, জানি না, এখন কিছু ম্রিয়মাণ, কিন্তু ইডেনের মতো উদ্যানে বাঁশির সুরে বেজে ওঠাই তাঁর স্ব-প্রকৃতি। হাণ্ট আছেন, উইকেটে যতক্ষণ থাকেন বোলারের চিত্তক্ষেত্র তখন 'হাণ্টেড' বা 'হণ্টেড।' গতিবেগে ব্যাটস্‌ম্যানকে পরমগতি দেবার মতো শক্তিধর হল ও গ্রিফিথ আছেন—আছেন, ল্যান্স গিবস্, যাঁর বলের জিভ সদাই লক্‌লক করে—হলফোর্ড ও লয়েড, মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মতো যাঁরা গর্ভচ্যুত হয়েই হড়হড়ে-তড়বড়ে লড়াই করছেন—এঁরা, এবং নামে নৃশংস বুচার বা কার্যে ধাত্রী নারস্-এর তুল্য খেলোয়াড়রা ইডেনে বহু রোমাঞ্চ, বহু রস আনবেন, তাই ভরসা করি।

যোগ্য সহবাসে গুণের যোগ্য বিকাশ হয়। যাতে তোমরা উপযুক্তভাবে গুণ-মহিমা দেখাতে পারো, তাই তোমাদের বিপক্ষে আমরাও যথেষ্ট প্রস্তুত হয়েছি। আমাদের রাজকুমার-অধিনায়ক পক্ষীরাজ ছেড়ে দিলেও উড়ে চলার মেজাজ ছাড়েন নি। তিনি তদুপরি বোরদে-যোগে বলীয়ান, চন্দ্রশেখরের বাঁকা বলের দ্বারা ক্ষুরধার, বেঙ্কটরাঘবনের সংকটমোচনের সামর্থ্যে সমৃদ্ধ। সরদেশাই, জয়-সীমা, হনুমন্ত, কুন্দরন, ইঞ্জিনীয়ার, ওয়াদেকর কিংবা বেগ—এঁদের সকলকে বা অনেককে সঙ্গে নিয়ে, নতুনদের আহ্বান করেও, স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলতে পারেন। আমরা নিশ্চয় তোমাদের ছেড়ে দেব না। বোম্বাইয়ে একেবারে ছেড়ে দিইনি। ইন্দোরে তোমাদের কিছু দেখিয়েছি। এখন ইডেনে আমাদের বাসনা, তোমরা চারদিন অপূর্ব খেলো, আমরাও খেলব সমানে-সমানে, তারপর পঞ্চম দিনে ভারতের মঙ্গলগ্রহের প্রভাবে যদি তোমাদের জীবনে কিছু অমঙ্গল ঘটে—

তোমরা এত বড় দল এবং এমন স্পোর্টসম্যান যে, শুনেছি হারলেও তোমাদের কুন্দহাসি অমলিন থাকে।

আমরা তাই দেখতে চাই। কারণ আমরা জানি, তোমরা কালার্ড খেলোয়াড়, বঙ্গানুবাদে—

রঞ্জিত খেলোয়াড়—বহু বর্ণরঞ্জিত ক্রিকেটার।

প্রথম দিন : ক্রিকেট আলাপ—ক্রিকেট বিলাপ

ওয়েস্টইণ্ডিজ যে সত্যই পৃথিবীর ক্রিকেটে স্থায়ী আসন নিতে বদ্ধপরিকর, তার প্রমাণ শনিবার, ৩১ ডিসেম্বর, সারাদিন ধরে তাঁরা ইডেন-গার্ডেনে সবিশেষ দিয়েছেন। 'বিশ্ববিজয়ী' আখ্যা একটা দারুণ দায়। ললাটে সেই জয়পত্র এঁটে পৃথিবীর মাঠে-মাঠে ছুটবার সময়ে ভারতের বাদাড়ে আটক পড়লে লজ্জার শেষ থাকবে না। সুতরাং টসে জেতার পরে সমস্ত দিনে ৯২ ওভার খেলে, মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে তাঁদের ২১২ রান করতে হয়—ওভার-পিছু ২ রানের কিছু বেশি! দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিজয়ী সাইনবোর্ডে চাপা পড়ে ওয়েস্টইণ্ডিজের ঘরে আলোকাভাব।

সারাদিন কী মিথ্যে ঠেকল সেই কথাগুলি যা আমরাই আগে লিখেছি—ওয়েস্টইণ্ডিজ খেলা ভালবাসে! কখনো শিরদাঁড়া সোজা করে, কখনো বাঁকিয়ে, হাই চিবিয়ে, ঘুম তাড়িয়ে, দেখতে লাগলুম—ওয়েস্টইণ্ডিজের অ-বন্য, অরম্য, সুসভ্য আত্মহনন। দেখলুম—ইন্দোরের মাঠের ধুলো-লাগা একটি দলকে।

বিশ্বাস করুন, কানহাইয়ের নটআউট ৭৮ দেখার পরেও আমি এসব কথা লিখছি। কানহাই, ১৯৫৮-র কানহাই, যিনি ইডেনে একদিনে দুশোর উপর রান করেছিলেন, যাঁর খেলার উত্তপ্ত জীবনরস এখনো যেন চোখ বুজলে ইডেনের সবুজ পাত্রে উচ্ছলিত দেখতে পাই—আট বছর তাঁর জীবনের এতখানি হরণ করল যে, ৭৮ রান করতে প্রায় ৩০০ মিনিট সময় নিলেন—তার মধ্যে দুটো সহজ চান্সও ছিল! ২৮ রানের মাথায় মায়ের 'আটাশে ছেলে' হয়ে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, দুরন্ত বেপরোয়া, খেলার নিত্য বালকটি! তিনি নিশ্চয় দু'-একটি ভালো মার মেরেছেন, লাঞ্চে যাবার ঠিক আগের বলটিতে তাঁর ওভার-বাউণ্ডারি অবশ্যই ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ককটেলী মার, দু'একটা ড্রাইভ বা গ্লাইড ছিল না তা নয়, কিন্তু সেগুলি এত বিলম্বে এসেছে যে, মনে হয়েছে, দরিদ্রের ভাগ্যে শিকে-ছেঁড়া ভোজ যেন, যা স্মরণে থাকে, রসনায় থাকে না। তাছাড়া ও-সব মার না মেরে তিনি পারেন নি, কারণ মাঠে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ক্রিকেট-বলকে ভূমণ্ডলের আকারে দেখছিলেন। রোদে পুড়তে-পুড়তে দুঃখ ভুলবার জন্য দর্শক বৃথাই আশা করতে লাগল কানহাইয়ান গীটারের মাদক সুরের জন্য—বৃথা আশা—কারণ ইতিমধ্যে কানহাইও জেনে নিয়েছেন—স্কোরবোর্ড 'অ্যাস্' হোক বা না-হোক, অবশ্যই 'ক্যাশ্।'

এখনো আমাদের শেষ বিশ্বাস, কানহাই অসুস্থ ছিলেন। মাতালের মুখের মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে তিনি যে-সব অসুন্দর মার মারছিলেন, সেইগুলিই বিখ্যাত কানহাই-সুইপের শেষ পরিণতির রূপ নয়—আগামীকালের জন্য কানহাই অবশিষ্ট আছেন।

হাণ্ট ইদানীং যেমন খেলছেন, তেমনি খেলেছেন। যথেষ্ট সাবধান, যথেষ্ট ভাগ্যপূর্ণ, বিপদে ধীর এবং সম্পদে অধীর খেলোয়াড়।

বয়সে তরুণ কিন্তু চেহারায় প্রৌঢ় শ্বেতাঙ্গ বাইনোকে ইডেন-উদ্যান প্রথম দেখল—দেখে খুশি হল না। বয়োগুণে মাঝে-মাঝে তেজীয়ান হয়ে ব্যাট ছুঁড়েছেন, প্রায়ই বলে লাগেনি, ঘণ্টাখানেক খেলে যখন ৮ রান করেছেন, তখন দর্শকেরা 'বন্য রক্তের গাহ জয়' বলে গান ধরেছিল।

ওয়েস্টইণ্ডিজের বোতলবন্দী বন্য রক্ত কিছুটা ফুঁসে ওঠে লয়েডের ব্যাটকে কাঁপিয়েছিল। দীর্ঘদেহ বলশালী এই ব্যক্তিকে দেখে ওয়ালকটের ন্যাটা-সংস্করণ মনে হয়েছিল, খেলায় শক্তিব্যঞ্জনা এনে তার সমর্থনও করেছেন। বিরাট আকারকে সংকুচিত করে, ব্যাটের মুখে নামিয়ে, যখন চন্দ্রশেখরের বলকে সামনে থামাচ্ছিলেন তখন তাঁর পক্ষে অপরিচিত আত্মনিগ্রহের চেহারাই দেখছিলুম—কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিলম্বিত হয়নি তাঁর এবারের জীবন।

"ভারতের পক্ষে এই খেলায় সবচেয়ে বড় আবিষ্কার একটি নূতন বোলার, যিনি ওয়েস্টইণ্ডিজের প্রথম দুটি উইকেট ৭৬ রানের বিনিময়ে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সারাক্ষণ নব-নব আউটের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়া খেলাটিকে জীবন্ত রাখিয়াছিলেন—সেই বোলারের নাম—রান-আউট!!"—একথা যদিও রসিকতা করে বলা হচ্ছিল, তবু এর মধ্যে ভারতের গ্রাউণ্ড-ফিল্ডিংয়ের প্রশংসাও লুকানো ছিল। তবে শূন্যে ক্যাচ ধরার ব্যাপারে ঐ প্রশংসা লঘুতাপ্রাপ্ত। কিন্তু প্রশংসা নয়, বন্দনা করতে হয় পাতৌদিকে তাঁর অপূর্ব ক্যাচটির জন্য, প্যাডি-

লিয়নের দিকে মুখ করে লম্বা দৌড় দিয়ে গতি বজায় রেখেই যাকে হস্তগত করেছিলেন। ম্যাচলেস ক্যাচ—নিঃসন্দেহে।

সদ্য টেস্টের টোপর পরা বেদী বোলার হিসাবে দৃষ্টি আকর্ষক। এই তরুণ খেলোয়াড়টির ভঙ্গিতে আত্মস্থতা আছে। লেংথ রেখে কব্জির মোচড়ে স্পিন দিতে পারেন। অল্পাধিক ফ্লাইট, নিয়ন্ত্রণও আছে। কিন্তু গুগলিতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত নয়, এবং যখন টপস্পিন দিতে গেছেন, বলে যথেষ্ট গতি আনতে পারেননি। পিচের মন্থরতাও তার জন্য দায়ী। অ-ব্যস্ত ধাঁচে বাঁ-হাতে বল করার সময়ে ইনি ভিনুর কথা অনেকের মনে টেনে এনেছেন, যদিও ভিনু মূলত ন্যাটা অফব্রেক বোলার, ইনি লেগব্রেক।

বেদী ও চন্দ্রশেখর যখন একসঙ্গে বল করছিলেন, ফুটে উঠেছিল লেগব্রেক বোলিংয়ের দুই বিপরীত ছবি। বেদী ফ্লাইটযুক্ত, রক্ষণশীল, ধীর ন্যাটা লেগ-ব্রেক বোলার; চন্দ্রশেখর সতর্ক অথচ অধীর, দংশনশীল, ডানহাতে ফ্লাইটহীন বল দেন, লেগব্রেকের সঙ্গে অফব্রেক ও টপস্পিনও মেশাতে পারেন।

চন্দ্রশেখর উইকেট পাননি। বোম্বাইয়ের পুনঃপ্রদর্শনী দেখবার জন্য অপেক্ষা করছিল দর্শকেরা—সিটি, কোলাহল ও ভেঁপুধ্বনিতে তাঁর আবাহনও করেছে তারা, উইকেট মাথার উপর তুলে সে অভিনন্দনের স্বীকৃতি দেখানো যদিও চন্দ্রশেখরের পক্ষে সম্ভব হয়নি, বারবার এক জিনিস হয় না, সর্বসময়ে ফণা-ধরা সম্ভব নয়, ইডেনের পিচ প্রথম দিনে তার অনুকূলও ছিল না, তবু সারা-ক্ষণ ব্যাটসম্যানদের ব্যস্ত ও বিব্রত রেখে তিনি—তিনি কী—কিছুটা দেখিয়েছেন। ওয়েস্টইণ্ডিয়ানদের পক্ষে চন্দ্রশেখর এখনো অনায়ত্ত সমস্যা। দর্শক তাঁর আক্রমণভঙ্গিকে ভালবেসেছে, কৌতূহলে খোঁজ নিতে চেয়েছে দক্ষিণী আহার্যের খাদ্যপ্রবণতার বিষয়ে—এবং নিজেরাই সিদ্ধান্ত দিয়েছে—তিন্তিড়ীরসে জারিত যুবকটি এখন তেঁতুলে বিছে।

শনিবার দর্শকেই সবচেয়ে ভালো খেলেছে। পলি উমরিগর বললেন, ভারতের কোনো ক্রিকেট-মাঠে এতবড় জনতা আমি দেখিনি। গুহ স্থান পাননি—এই গুহ্য বেদনা বুকে চেপে সাধারণ দর্শক 'দিবারাত্র' পরিশ্রমের পরে গেটে 'সেবাদলিত' হয়ে মাঠে ঢুকতে পেরেছিল, তাদের অনেকেই গ্যালারিতে বসবার জায়গা পায়নি, দাঁড়াবার জায়গাও নয়, যে প্রতিদিনের বস্তুজগৎকে ভুলতে তারা মাঠে এসেছিল, তাকেই বহুগুণিত আকারে মাঠে পেয়েছিল—খাদ্য-পানীয় ও স্থানসংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিড়ির চেনা চেহারাকে, তৎসহ রক্ত-আঁখি শান্তিরক্ষককে। উল্টোপ্রান্তে দেখা গিয়েছিল—সম্ভ্রান্ত বেশ, পুষ্ট আহার এবং সাধারণের প্রতি অসাধারণ উন্নাসিক ঘৃণা। সাধারণ দর্শক অবশেষে বেড়া টপকেছিল—মাঠের মধ্যে ছাপিয়ে পড়েছিল জনতরঙ্গ (আমি ঊনিশটি তরঙ্গ গুণে পেয়েছি), মাঠের বাউণ্ডারি-লাইন জনতার বডিলাইন-আক্রমণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যে-রান মাঠের মধ্যে খেলায় ছিল না, পুলিশের তাড়ায় সে রান মাঠের ধারে ঘটেছিল—দর্শকদের সবই সহ্য করতে হয়েছিল, কারণ তারা ঘটি-বাটি বাঁধা রেখে খেলা-নামক আশ্চর্য কাণ্ড দেখতে মাঠে ঢুকেছে এবং শেষপর্যন্ত বুঝেছে—যুগযন্ত্রণার ছোট ভাইয়ের নাম—ক্রিকেট-যন্ত্রণা।

একটি কাহিনী কাণে এসেছে—সত্য-মিথ্যা জানি না। বেড়া-টপকানো দর্শক

সামলাতে জনৈক পুলিশ যখন লাঠি তুলেছেন—তখন চমকে শোনেন—'বাবা, আমি—'

শনিবারের অপরাহ্ণশেষে সারাদিনের ক্রিকেটের লাঠির তলায় দাঁড়িয়ে, অসহ্য ক্লান্তির গুমোটের মধ্যে ঐ কথাটাই আমার কানে বাজছিল—'বাবা আমি।'

ওয়েস্টইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস

হাণ্ট রানআউট—৪৩; বাইনো রানআউট—১৯; কানহাই নটআউট—৭৮; বুচার ক পাতৌদি ব বেদী—৩৫; লয়েড ক কুন্দরন ব বেদী—৫; নারস্ নটআউট—২৩। অতিরিক্ত—৯। মোট—(৪ উইকেটে)—২১২।

বোলিং: সুর্তি ১৬-২-৫০-০; সুব্রহ্মনিয়াম ৫-২-৫০-০; চন্দ্রশেখর ২৯-৯-৫৪-০; বেদী ৩৩-১১-৭১-২; বেঙ্কটরাঘবন ৯-৩-২৩-০।

দ্বিতীয় দিন: ওঁ আগ্নেয় স্বাহা!

দ্বিতীয় দিন 'ক্রিকেট' লিখিনি, লেখা সম্ভব ছিল না বলে—কেন, তা সংবাদপত্রের নিম্নলিখিত বিবরণ দেখলেই বোঝা যাবে।

চরম অব্যবস্থার চরম পরিণাম

জনরোষে দ্বিতীয় দিনের টেস্টখেলার অন্ত্যেষ্টি

খেলার বদলে: লাঠি, গ্যাস, অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক হাঙ্গামা

নতুন বছরের প্রথম দিন, কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টের এটি ছিল দ্বিতীয়। কলকাতার হাজার-হাজার দর্শকের ক্রিকেট-খেলা দেখার আশা ছাই হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ইডেনে খেলা হয়নি, হয়েছে হাঙ্গামা, এবং সেই হাঙ্গামার তাপ ও ছাপ নিয়েই রবিবার মানুষকে বাড়ী ফিরতে হয়েছে। মিনিট তিনেকের জন্য অবশ্য খেলোয়াড়রা মাঠে এসেছিলেন কিন্তু খেলা দেখবার সুযোগ তাঁরা পাননি। পরিবর্তে দর্শকেরা পেয়েছে পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে-গ্যাস। এবং বহ্ন্যুৎসব।...

হাঙ্গামার শুরু বেলা দশটার মিনিট সাতেক আগে। মাঠের সব গ্যালারিই তখন থই-থই। ভিড়ের চাপ সবচেয়ে বেশি ২৫ টাকার গ্যালারিতে। সেই চাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ'দেড়েক দর্শক বেড়া টপকে মাঠের মধ্যে ঢুকতে গেলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে দু'পাশ থেকে শ'খানেক পুলিশ লাঠি নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর চলল বেদম প্রহার। মার খেয়ে প্রাণ নিয়ে সবাই বেড়া টপকে ভেতরে চলে গেলেন। ততক্ষণে গ্যালারি থেকে চায়ের ভাঁড় ইত্যাদি পুলিশের দিকে নিক্ষিপ্ত হতে দেখা গেল।...কাঁদানে গ্যাসবাহিনীও সারি বেঁধে ২৫ টাকার গ্যালারির সামনে দাঁড়িয়েছে। তাদের দেখে দর্শকের রাগ বেড়ে যায়। স্টেডিয়ামের উপর থেকে গোটা দুই ভুঁই-পটকা এবং কিছু-কিছু ইঁট পুলিশবাহিনীর উপর এসে পড়ে। দর্শকদের চীৎকারও বেড়ে যায়। পুলিশ লাঠি নিয়ে তেড়ে যান, বেষ্টনীর এপাশ থেকেই ওপাশের দর্শকের উপর লাঠি চালায়। কিছু দর্শক এক-আধখানি বাঁশ নিয়ে জবাব দেন। একজন পুলিশ-অফিসার সেই ভিড়ে মার খেয়ে পড়ে যান। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে যায় কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া। পুলিশ তাক্ করে পঁচিশ টাকার গ্যালারির উপর কাঁদানে

গ্যাসের গোলা ছুঁড়তে থাকেন।...

মাঠের পূব দিকে যখন এই ঘটনা ঘটছে তখন দুই আম্পায়ার মাঠে নামছেন। ...ভারতের ফিল্ডাররা এবং ওয়েস্টইণ্ডিজের দুই ব্যাটসম্যান মাঠে নামলেন।... পূব দিকে কিন্তু তখনো লাঠিচার্জ ও কিছু-কিছু টিয়ারগ্যাস চলেছে। খেলোয়াড়রা উইকেট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে মিনিট দুয়েক তাকিয়ে-তাকিয়ে পুলিশ ও জনতার লড়াই দেখলেন, তারপর মাঠ ছেড়ে প্যাভিলিয়নের দিকে চলে গেলেন।

খেলোয়াড়েরা যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন দেখা যায়, হাইকোর্টের দিক থেকে একদল পুলিশ ও হোমগার্ড এক ভদ্রলোককে ঘিরে পশ্চিমদিকে নিয়ে যাচ্ছেন, ভদ্রলোক হাত-পা নেড়ে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছেন। ক্রমে তাঁর চতুর্দিকে হোমগার্ড ও পুলিশের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং শুরু হয় প্রচণ্ড মার। মারের ঘায়ে ভদ্রলোক মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু মার তখনো চলেছে।

একজন মানুষকে একদল খাকি পোষাকপরা মানুষ মারছে দেখে গোটা মাঠের হাজার-হাজার মানুষ চীৎকার করে ওঠে এবং দু'মিনিটের মধ্যে চতুর্দিক থেকে কয়েক হাজার দর্শক বেড়া ডিঙিয়ে মাঠের মধ্যে দৌড়ে আসে।

পুলিশ মিনিট দুয়েক তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করে। তারপর দেখা গেল, হঠাৎ পুলিশ ছুটে পালাচ্ছে এবং জনতা পিছনে ধাওয়া করছে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য--চড় ঘুষি লাথি লাঠি ইঁট খেতে-খেতে প্রায় দেড়হাজার হোমগার্ড ও পুলিশ মাঠ ছেড়ে পালাচ্ছে। মিনিট তিনেকের মধ্যে মাঠ পুলিশ ও হোমগার্ড-শূন্য।

হাতের কাছে পুলিশকে না পেয়ে ক্ষিপ্ত জনতা ছুটে গেল প্যাভিলিয়নের দিকে। একদল সি-এ-বি'র কর্তাদের খোঁজে। আর একদল ভি-আই-পি-দের বেতের চেয়ারগুলো নিয়ে এল মাঠের মধ্যে. শুরু হল বহ্ন্যুৎসব। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। একদল লোক তখন উইকেটও তুলে নিয়েছে। কয়েক-জন আসনের মাথার উপরের চটের ছাউনিগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন ১০ মিনিটের মধ্যে মাঠের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্যাভিলিয়নের মাথায়ও তখন আগুন পেঁৗছে গিয়েছে।...ততক্ষণে অধিকাংশ দর্শক মাঠ ছেড়ে রাস্তায়। বহু মহিলা ভয়ে কাঁপছেন। রাস্তায় ক্ষিপ্ত জনতা হাওড়ার পুলিশ-সুপারের জিপে আগুন ধরিয়ে দেয়। দুখানি পুলিশের মোটর-বাইকেও। পুলিশ তাদের চার্জ করে যাচ্ছে সমানে। কাঁদানে গ্যাস. লাঠি অবিরাম চলছে। জনতার হাতে ইঁট। ক্ষিপ্ত মানুষ আরও ছড়িয়ে পড়ল। এবার পালা শ্রী এম দত্তরায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের। দেখতে-দেখতে তাঁবু ছাই।...

ইতিমধ্যে সৈন্যদল এসে ইডেনের কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছেন।...কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে সৈন্যদলের প্রথম নির্দেশ : পুলিশ ও হোমগার্ড মাঠ থেকে বেরিয়ে যাও।

একই তারিখের আনন্দবাজারে আরও নানা হেডিং-এ ব্যাপারটির নানা দিক। যথা :

কোন্ আদি পাপে ? বক্তব্য : কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অজস্র বাইরের লোক ঢোকাতেই এই কাণ্ড। দর্শকদের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের অমার্জনীয় নিষ্ঠুর

অবহেলা।

স্বচক্ষে দেখেছি : জনৈক দর্শকের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ—মাঠে চরম অব্যবস্থা সম্বন্ধে। পুলিশ সদলবলে একটি বয়স্ক মানুষকে অমানুষিকভাবে কিভাবে পিটিয়েছে, তার বর্ণনা। তারপর—'মাঠে নেমে এলাম। কেউ-কেউ বলছেন, আসুন সি-এ-বি জ্বালাই, পুড়িয়ে দিই, কর্মকর্তাদের এই আগুনে আহুতি দেওয়া হোক, খেলা নিয়ে ছেলেখেলা শেষ করে দিই।'

ভীত সন্ত্রস্ত খেলোয়াড় : প্যাভিলিয়নে ওয়েস্টইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের পাগলের মতো পায়চারি। সোবার্স, হেনড্রিকস্ লাথি মেরে টিনের বেড়া ভেঙে বেরিয়েছেন, ময়দানের দিকে ছুটেছেন। লয়েড পথভ্রান্ত হয়ে ছুটেছেন গঙ্গার দিকে। এঁদের জনতা সাদরে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে পেঁছে দিয়েছেন। 'কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁরা আগে থেকে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন, দুপুর-নাগাদ তাঁদেরও হোটেলে পাওয়া গেল, কারো-কারো চোখে জল, কেউ-বা ক্রন্দনোদ্যত।' কোনো খেলোয়াড় আহত হননি, 'শুধু পাতৌদি ছুটতে গিয়ে চোখের পাশে একটু আঘাত পেয়েছেন।'

ওখানে কী ঘটেছিল !!! ১৯৬০—১, ২ ফেব্রুয়ারির সংবাদপত্র থেকে পোর্ট অব স্পেনে ওয়েস্টইণ্ডিয়ান দর্শক আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে ক্রুদ্ধ হয়ে কিভাবে খেলা ভেঙে দিয়েছিল, তার বিবরণ।

২০০ **দর্শক এবং** ৫০ **জন পুলিশ আহত।**

সেই মানুষটির কথা : শ্রীসীতেশচন্দ্র রায়, যাঁর উপরে পুলিশী হামলা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের কাজ করে, তাঁর সঙ্গে স্টাফ-রিপোর্টারের সাক্ষাৎ-বিবরণী। শরীরের নানা স্থানে ব্যাণ্ডেজ-জড়ানো ৫৩ বছরের শ্রীরায় জানান, পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছোঁড়া আরম্ভ করলে তিনি প্রতিবাদ জানাতে একলা পুলিশের মধ্যে হাজির হন, তারপর দু'-একটি কথাবার্তার পরে পুলিশদল তাঁকে পেটাতে আরম্ভ করে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

মঙ্গলবার খেলা হতে পারে : মাঠের পিচ খেলার উপযোগী—ওয়েস্টইণ্ডিজ সে সম্পর্কে নিশ্চিত হলে খেলা হবার সম্ভাবনা। 'খেলা হবার সম্ভাবনায় স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের কিছু ভূমিকা আছে। ভারত ও ওয়েস্টইণ্ডিজ দলের কর্মকর্তাদের গ্রেট ইস্টার্নের ৭২৩ নং ঘরে ছুটাছুটি করতে হয়েছে। এখানে স্যার ফ্রাঙ্ক অবস্থান করছেন।'

তদন্ত হবে : মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পূর্ণাঙ্গ তদন্তের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। খেলা সম্ভব হলে কিভাবে মাঠের ভিতর-বাহিরে শৃঙ্খলা-রক্ষা করা হবে, তাও তিনি বলেছেন।

যথার্থ ক্রিকেট : "ইডেনের চারিদিকের গ্যালারির উপরে চটের আচ্ছাদনে যখন আগুনের লেলিহান শিখা, আগুনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দিশেহারা মানুষের উর্ধ্বশ্বাস পলায়ন, তখন ন্যাশন্যাল ক্রিকেট ক্লাবের প্যাভিলিয়নের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন ওয়েস্টইণ্ডিজের সহ-অধিনায়ক কনরাড হান্ট। দৃষ্টি তাঁর উপরের দিকে, যেখানে ভারত ও ওয়েস্টইণ্ডিজের জাতীয় পতাকা পত্-পত্ করে উড়ছিল। নৈতিক পুনরুজ্জীবন সমিতির সদস্য হান্ট ছুটে চললেন পতাকা নামিয়ে আনার জন্য। তাঁর কথা : 'আমার জীবনের চেয়ে জাতীয়

পতাকার মূল্য বেশি।' বলা বাহুল্য পতাকা নামানো হয়েছিল।"

তৃতীয় দিন : ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন

অশ্রু ও রক্তে সিক্ত এবং অগ্নিতে দগ্ধ ইডেন-উদ্যানের উপর দিয়ে মঙ্গলবার সাড়ে দশটায় যখন লাল বল আবার গড়ালো, পরপর গড়াতে লাগলো, তখন বিশ্বাস করতে হল—ক্রিকেটের সত্যই প্রত্যাবর্তন ঘটেছে ঐতিহাসিক ইডেন-উদ্যানে। যে-ওয়েস্টইন্ডিয়ান খেলোয়াড়রা খেলতে রাজি হয়েছেন, যে-ভারতীয় দর্শকেরা আবার খেলা দেখতে রাজি হয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে ভাবছি—রবিবার বেলা ১২টার সময়ে যদি কেউ আমাকে বলত, এই মাঠে এই টেস্টের খেলা আবার আরম্ভ হবে, তাহলে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের সংবাদ সরবরাহের জন্য তাঁকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতুম। মনে পড়ছে ঘটনাগুলো। প্রাণভয়ে ব্যাজ খুলে কর্মকর্তাদের পলায়ন, সেই কারণে তাঁদের উষ্ণ ভালবাসার পাণি-পীড়ন থেকে ওয়েস্টইন্ডিজের বহুমান্য অতিথিদের সাময়িক অব্যাহতি; অপরিচিত দেশে ময়দান-বিপ্লবের মধ্যে দিশাহারা ওয়েস্টইন্ডিজের খেলোয়াড়-গণ, ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ এবং সভ্য, সাধারণ দর্শকগণ কর্তৃক উক্ত অতিথিদের সাদরে হোটেলের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া; কিছু পূর্বে 'কোথায় অদৃশ্য কে জানে' কর্তৃপক্ষীয় হস্তগুলির সুদৃশ্য ভঙ্গিতে সেখানে পুনরাবির্ভাব অতিথি-দেন পাণিগ্রহণের জন্য—সবই মনে পড়ছে। তখন কি ভাবতে পেরেছিলুম—চোখের জল জলেই দূর হয়, কারণ ও-জল ঝরেছে কাঁদানে গ্যাসের জ্বালায়? বুকের ধড়পড়ানি?—সেও দূর হয় ওঁদের—আরও একটু ঘন রঙিন জলে! ভাবতে কি পেরেছিলুম- বহু মানুষের দ্বারা মথিত হয়েও ইডেনের পিচরূপী সতী মৃত্তিকা অটুট থাকে?

পিচ অটুট ছিল—কারণ কয়েকজন যুবক পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের মধ্যে, চরম উত্তেজনার মধ্যেও, পিচকে ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। উদ্‌ভ্রান্তির ক্ষণেও তাঁদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল একটি কথা—ক্রিকেটের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

কিন্তু বিশ্বাসনাশের আয়োজন ছিল চূড়ান্ত। ৫৩ বছরের প্রৌঢ় অভিমন্যুকে ত্রিসপ্তরথী মিলে সারা পৃথিবীর চোখের সামনে পেটাচ্ছিল যখন—তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশী-বিদেশী ভদ্রজন, সাংবাদিক, উচ্চ রাজকর্মচারী, পুলিশের বড়কর্তারা, এবং কে জানে স্বয়ং পুলিশমন্ত্রীও কি-না? মানুষের রক্ত অতঃপর বিদ্রোহ না করে পারেনি। মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমার মনে থাকবে—লক্ষ লোকের সেই রোষগর্জন, যা আছড়ে পড়েছিল তরঙ্গে-তরঙ্গে। দেখে-ছিলুম—ইডেনকে ঘিরেছে অগ্নিবলয়। প্রাণভয়ে হাজার-হাজার নরনারীর ঊর্ধ্ব-শ্বাস পলায়ন। সে দৃশ্য আগেও দেখেছি—বহু লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত ফিল্মে যুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের রূপ যেখানে চিত্রায়িত।

ক্রিকেট যখন পুড়ছিল, তখন নীরো-কর্তারা কী করছিলেন? শোনা গেল, তাঁদের কেউ-কেউ অনিবার্য অধোবেগে বাথরুমে ঢুকে ক্লাশ-ঝরণার গান শুনে-ছিলেন কম্পিত দন্তবাদ্যের সঙ্গে।

মঙ্গলবার সকালে মাঠে ঢুকে দেখি—অপূর্ব! আলোয় ধোয়া আকাশ, মাঠ আর মানুষ। চটের কুদর্শন পাল পুড়ে অদৃশ্য। মানুষের রেণুভরা পাপড়ির

মতো খুলে আছে ইডেনের পারিজাত। দু'-একটি কালো পোড়া খুঁটি এখনো অবশিষ্ট, মাঠের মধ্যে একটা-দুটো জায়গা ক্ষতচিহ্নের মতো দেখাচ্ছে, কিন্তু সব ঢেকে গেছে মানুষের অমেয় আশার আনন্দে। 'ভস্ম-অপমানশয্যা' থেকে ক্রিকেট আবার জেগেছে—সব কয়টি আন্দোলিত পতাকায় তার ঊর্ধ্বঘোষণা।

আর দেখলুম...নতুন লাল-সাদা সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে প্যাভিলিয়নের সামনে। পুনশ্চ বেতের ও গদীর চেয়ার সার-সার সাজানো, ঠিক সেইখানে, যেখানে চেয়ারের বহ্ন্যুৎসব হয়েছিল রবিবার মধ্যাহ্নে।

চেয়ার মরিয়াছেন। চেয়ার দীর্ঘজীবী হউন!

মঙ্গলবার ব্যাট-বলের খেলা উপভোগ্য হয়েছে। পাঁচদিনের টেস্ট চারদিনের হয়ে ড্র-এর দিকে ছুটেছে। ওয়েস্টইণ্ডিজ, জোরসে জিতবই—এই ভঙ্গিতে খেলা আরম্ভ করেনি। কিন্তু সে জানে, ভারতের সীমিত বোলিং-শক্তির জন্য দেখে-শুনে খেললে চারশোর মতো রান করা যায়, তাই সে করেছে, কানহাইয়ের ৯০, নারসের ৫৬, সোবার্সের ৭০ রান-সমৃদ্ধ। কানহাই সেঞ্চুরি করতে পারেন নি, তার দ্বারা ক্রিকেটের ন্যায়পরতা অন্তত রক্ষিত হয়েছে। মঙ্গলবারও তিনি চান্স দিয়েছেন, তা না ধরে সুর্তি কানহাইয়ের গত-প্রতিভার প্রতি দীর্ঘায়ত নমস্কার জানিয়েছেন, প্রথম দিনেও সুর্তি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন—তবু রানের সঙ্গে সুর্তি চিবিয়েও কানহাইয়ের পক্ষে সেঞ্চুরি করা সম্ভব হয়নি। নারস্ তুলনায় অনেক উজ্জীবিত। আর সোবার্স অনবদ্য। তার মানে নয় সোবার্সের এই ইনিংস ত্রুটিশূন্য। তাঁর মারে সময়ের হিসাবে মাঝে-মাঝে ভুল হয়েছিল, দু'-একটি উঠন্ত মার শ্রীযুক্ত বেদী একটু তৎপর হলে 'সুযোগের' মতো দেখাত—তবু সোবার্স যে প্রতিভার বরপুরুষ তা বোঝা গেল যখন দেখলুম—কত সংক্ষিপ্ত নিশ্চিত শব্দে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারলেন। দশটার অল্প পরে এসেছিলেন, সুর্তির বল স্কোয়ারলেগে বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে প্রথম রানের অঙ্কপাত করেছিলেন—সে অঙ্ক লাঞ্চের পরে গুণযোগে বৃদ্ধি পেয়ে চারে-চারে অর্ধশত এবং তদূর্ধ্বে উঠেছিল—যখন মারছিলেন, 'মার'ও তখন বশীভূত হয়ে দাসীর মতো সেবা করছিল—তারপরে কিছুটা ইচ্ছা করেই, দলের ইনিংস শেষ হোক এই বাসনায়, উইকেট প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে যখন চলে গেলেন, তখন দর্শকের সহর্ষ অভিনন্দনে বাহিত হয়ে তিনি নিশ্চয় অবিলম্বে আরামের আসনে ফিরে গিয়েছিলেন, যা তাঁর কাছে বহু দূরবর্তী মনে হয়েছিল পূর্ব রবিবারে।

হল ৩৫ রান করেছিলেন। হলের একটি কথা মনে পড়ছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে পঞ্চাশ রান করার পরে অধিনায়ক ওরেলকে তিনি বলেছিলেন —হুঁ হুঁ স্কিপার, রান আমি করতেই পারি, তবে এ-বান্দা খাঁটি বোলার, তাই করে না—হুঁ!

হলের ব্যাটিং দেখে আমাদের সুখের সীমা ছিল না। অনেকগুলি বিরাট ব্যাটসম্যানকে তিনি নিজের বৃষস্কন্ধে বহন করেছেন। যখন সামনে পা বাড়িয়ে নিখুঁতভাবে বল ব্লক করছিলেন, তখন তিনি পৃথিবীর সেরা ওপেনার—ধরা যাক—স্যার জ্যাক হবস্। যখন তিনি নবমীর কামারের ভঙ্গিতে ব্যাট চালিয়ে হাঁকড়াচ্ছিলেন, তখন তিনি খাঁটি খুলে ওয়েস্টইণ্ডিয়ান ব্যাটসম্যান—ধরা যাক,

এভার্টন উইকস। যখন একশো মাইল বেগে ব্যাট চালিয়ে ভারতীয় বোলারদের পঁচিশ মাইল বেগের বল মুহুর্মুহু ফসকাচ্ছিলেন, তখন তিনি নিছক বোলার - স্বয়ং ওয়েসলি হল। আর যখন মনোরম দু'-একটি স্ট্রোক করছিলেন তখন তিনি—হাঁ গো হাঁ, একদম আনাড়ি নই আমি।

হলের সঙ্গী-বোলার গ্রিফিথও ব্যাটের দ্বারা বহুবার কচুকাটা করেছেন—না, বলকে নয়—বাতাসকে!

প্রায় চারশো রান ঘাড়ে নিয়ে ভারতের যাত্রা হল শুরু—সে-যাত্রা কুন্দরনের ছোটাছুটি সত্ত্বেও আজকের ঘণ্টা-দুই খেলায় কিছু মন্থর—তাই স্বাভাবিক। জয়সীমা ও কুন্দরন ইনিংস আরম্ভ করেন। কুন্দরন অচিরে এমন রণোন্মত্ত যে, দুর্গরক্ষার দায় নিতে হল জয়সীমাকে। অবিরাম ব্যাট চালানো কুন্দরনের অবশ্য-কর্তব্য। তিনি রোষে-রসে থাকেন। স্রাডপ্রেসার সর্বদাই ২০০-র উপরে। গিবসের মিডলস্টাম্পের বলকে তিনি যেভাবে ঘুরিয়েছেন, তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব, এবং স্বীকার্য, গিবসকে যে-মারে লেগে ওভার-বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে-ছিলেন, সেটি একটি সুন্দর সংহার। তদুপরি ইনি 'জীবনে' বিশ্বাসী—সুতরাং জীবন' পাবার পরেও একই মার মেরে যান। তিনি বিনা ভ্রূক্ষেপে হলের স্টাম্প-লক্ষ্য বলকে ড্রাইভ কবতে পাবেন—তার দ্বারা বোল্ড হতে পারেন—হয়েছেনও। কুন্দরন পুণ্যে শূন্যে সমআনন্দ।

ভারতের ফিল্ডিংয়ের মান উচ্চ ছিল না। সুর্তি ক্যাচ ধরেছেন ও ছেড়েছেন, যদিচ মাটিতে বল থামানোয় তাঁর ত্রুটি ছিল না। অপরদিকে বেদীর আজ মন্দ দিন, মার খেয়েছেন। ফিল্ডিংয়ের সময়ে তিনি বোলিংয়ের মতোই ধীরগতি। বেদী-তলে ক্যাচ-বলি গেছে কয়েকটি, যদিও বুদ্ধিমানের মতো শরীর না নাড়িয়ে, সেগুলিকে ক্যাচ বলে বুঝতে না দিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেছেন। পাতৌদি যথারীতি ক্যাচ-পারদর্শী।

ওয়েস্টইণ্ডিজ বোলিংয়ের সত্যকার শক্তিও আজ ধরা পড়েনি। ছুঁড়তে না পেরে গ্রিফিথ ম্রিয়মাণ ও কিছু গতিহারা। বয়স, অসুস্থতা বা অন্য কারণে হলের কৃষ্ণ-ভীষণতা বহুলাংশে ফিকে। সোবার্স নানারকম বল করেছেন, নানা-রকম করতে পারেন দেখা গেছে, কিন্তু সত্যকার 'আদেশ' এনেছিলেন গিবস্। তাঁর বলের বাঁক, অফব্রেকের সঙ্গে দু-একটা টপস্পিন ও লেগব্রেক মিশিয়ে পরিবেশন করার রীতি, ব্যাটসম্যানদের ত্রস্ত রেখেছিল।

এই খেলা। উপভোগ্য ও ঘটনাহীন। অনেকটা প্রদর্শনী খেলার মতো। দর্শকদের টিকিটের দাম কিছুটা ফিরিয়ে দেওয়ার সাধু চেষ্টা। টেস্টম্যাচের আবহাওয়া নেই যেন। আসবেও না, যদি ভারত আত্মঘাতী ব্যাটিং ক'রে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের হাতে জয়-সম্ভাবনা তুলে না দেয়। বেশ সুন্দর দিন, স্ত্রী-পুরুষের সুন্দর রৌদ্রস্নান কোনো এক কাল্পনিক সমুদ্রতটে—শৃঙ্খলার সুখ এবং সুখের শান্তি—এই সময়ে এক বৃদ্ধ বলে উঠলেন: 'বুঝেছি, গতদিন গণ্ডগোল হয়েছিল কেন? আজ কেন হয়নি?' সবাই উৎসুক হয়ে তাকাতে তিনি আঙুল তুলে দেখালেন—'আজ এন-সি-সির ঘড়ি ঠিক চলেছে।'

শুনে মহিলাটি উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। 'ঘড়ি ভুল চললো না কেন? আর কি সেই কাঁধটি পাওয়া যাবে?'

রবিবার গণ্ডগোলের সময়ে উক্ত অসহায়া নারী এক ক্ষত্রিয় পুরুষের উপহৃত স্কন্ধে পদার্পণ করে গ্যালারি থেকে নেমেছিলেন।

মহিলাটি বেদনার সঙ্গে স্মরণ করলেন—যথার্থ খেলোয়াড়েরা নারীদের বহন করে থাকেন।

ওয়েস্টইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস

...কানহাই ক পাতৌদি ব সুর্তি—৯০; নারস্ ক সুর্তি ব জয়সীমা—৫৬; সোবার্স ক জয়সীমা ব চন্দ্রশেখর—৭০; হেনড্রিকস ব সুর্তি—৫; হল ক বালসুব্রহ্মনিয়ম ব চন্দ্রশেখর ৩৫; গিবস্ এল-বি ব চন্দ্রশেখর—১; গ্রিফিথ নটআউট -৯। অতিরিক্ত—২২। মোট ৩৯০।

বোলিং: সুর্তি—৩০-৩-১০৬-২; সুব্রহ্মনিয়াম—৬-১-৯-০; বেদী—৩৬-১১-৯২-২: চন্দ্রশেখর—৪৬-১১-১০৭-৩; বেঙ্কটরাঘবন—১৪-৩-৪৩-০; জয়সীমা ৬-২-১১-১।

ভারত—প্রথম ইনিংস

জয়সীমা নটআউট—৩৪; কুন্দরন ব হল—৩৯; সুর্তি নটআউট—১০। অতিরিক্ত—৬। মোট—(১ উইকেটে)—৮৯।

বোলিং: সোবার্স ৭-৫-৬-০; গ্রিফিথ ৬-৩-১৪-০; গিবস ১২-৫-২৭-০; হল ৫-০-৩২-১; লয়েড ৪-২-৪-০।

তৃতীয় দিন: ভারতীয় ক্রিকেটের পলায়ন

মঙ্গলবার সকালে ইডেনে ক্রিকেট প্রত্যাবর্তন করেছিল, একথা গতদিন লিখেছি। সে কথাটা কি করে জানি না, ওয়েস্টইণ্ডিজ ও ভারতীয় খেলোয়াড়দের কানে গিয়েছিল। তদনুযায়ী তাঁরা স্থির করলেন—'ইহাই ক্রিকেট' নামক মহাবাক্যটি ক্রিকেটকে উপহার দেবেন। 'ইহাই ক্রিকেট' মানে 'অনিশ্চয়তাই ক্রিকেট', অর্থাৎ 'Frailty, thy name is Cricket!' চারদিনের যে-টেস্ট ড্র হওয়া অবধারিত, তাকে শুধু ফলাফলের মধ্যে আনা নয়, একপক্ষের ইনিংস-পরাজয়ের মধ্যে ঠেলে দিতে না পারলে ক্রিকেটের কুহকিনী প্রকৃতি প্রমাণিত হয় না। তার জন্য ওয়েস্টইণ্ডিজের বোলিং-সামর্থ্য আশ্চর্য বেড়েছিল, আর ভারতের ব্যাটিং-সামর্থ্য অদ্ভুত কমেছিল। একদিনে ২১১ রানে ভারতের ১৪টি উইকেট পড়ল। বলাবাহুল্য ভারত ফলো-অন করেছে।

আজকের খেলা অতীব রোমাঞ্চকর। সেই রোমাঞ্চকর স্বাদ পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নেবার ইচ্ছায় কিছু ধারাবিবরণী উপস্থিত করা যাক:

—আবহাওয়া ঘনীভূত—

প্রাকৃতিকভাবে বলতে গেলে, বুধবার সকালে আবহাওয়া ছায়াচ্ছন্ন; প্রবল শীতল উত্তর-বাতাস; আকাশে সূর্যের উপরে পাতলা মেঘের আস্তরণ—নিম্নে আসীন ক্রিকেট-প্রিয় দর্শকদের রৌদ্রক্লেশ নিবারণের জন্য। আবহাওয়ার দিকে তাকিয়ে পণ্ডিতগণের অভিমত, বল দারুণ সুইং করবে। তাহলেও ভয়ের কিছু নেই কারণ ভারতের ঘরে বলন্দাজের অভাব থাকলেও ব্যাটস্‌ম্যানদের ভিড়।

বিস্ময়ের কথা, পণ্ডিতদের ভবিষ্যৎবাণীর মর্যাদা রক্ষার চেষ্টামাত্র না করে সোবার্স সকাল থেকে স্পিন-আক্রমণ চালালেন। ময়দানপ্রান্তে নারস্, হাইকোর্ট-

প্রান্তে গিবস। এ তো ভালই। ফাস্টবোলিং হলেই ভারতের ভয়ের কারণ ছিল। কিন্তু—

—দুটি সমস্যা—

তেইশ মিনিট কাটার পর, গিবসের বলের সঙ্গে কিছু ঝটাপটির চেষ্টা করে, ব্যাট ও বল, দুটোকেই নিজের উইকেটের উপরে এনে ফেললেন জয়সীমা। জয়সীমার আউটে বিস্মিত হল না কেউ, এই কয়েক মিনিট তাঁর থাকাতেই সকলের বিস্ময়ে টান পড়েছিল। প্রতি বলে থতমত মানুষটি আউট হয়ে নিষ্কৃতি পাবার পরে সকলে আতঙ্কিত হয়ে দেখল—

ল্যান্স গিবস অসমাধেয় সমস্যার আকার নিয়েছেন, বিশেষত হাইকোর্ট-প্রান্ত থেকে বল করছেন বলে। ময়দানপ্রান্তে নিশ্চয়ই কোনো ক্ষত দেখা গেছে, কিংবা সে-দিকটির ধূলিতে বল পতনের পরে তাকে আঁকাবাঁকা করে দেবার কোনো গোপন আহ্বান আছে!

প্রথম সমস্যা এই গিবস। গিবসের হস্ত-নির্গত প্রথম বলটি, বিপুল হাত-তালির মধ্যে অবতীর্ণ বোরদে খেলতে গিয়ে ফসকালেন, এবং এল-বি ডাকে নিজেই সাড়া দিয়ে চলে যেতে লাগলেন, যদিচ আম্পায়ার তাঁর সঙ্গে একমত না হওয়ায় তাঁকে ফিরতে হয়েছিল এবং তিনি হারিয়েছিলেন ভারতের খরচে 'ইহাই ক্রিকেট' দেখাবার সুবর্ণ সুযোগ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দ্বিতীয় সমস্যার আবির্ভাব। ময়দানের দিক থেকে বল হাতে নিলেন সোবার্স। হাইকোর্টের দিকে মাটি তত সম্ভাবনাগর্ভ নয়, কিন্তু সোবার্সের প্রতিভায় অভিনবের নিত্যজন্ম। বাঁ-হাতের চায়নাম্যান, গুগলি, লেগব্রেক, টপস্পিন ছুটতে লাগল আলেয়ার আলো নিয়ে। ক্রিকেট-লড়াই শুরু হয়ে গেল। একদিকে পৃথিবীর সেরা দুজন স্পিনার, অনদিকে অন্তত একজন প্রথমশ্রেণীর ব্যাটসম্যান।

—শিরোনামার অপমৃত্যু—

তিরিশ মিনিট কেটেছে, ভারত রান করেছে ১০। শীতের হু-হু হাওয়ায় কাঁপুনি সর্বত্র : বলে, বাতাসে ও হৃদয়ে—দর্শক ও ব্যাটসম্যানদের। বাউন্ডারি-সহযোগে বোরদে-সূচনা হয়নি। ব্যাটসম্যানদের সাহস ও মেডেন হরণ করে নিয়েছেন বোলার দুজন। পুনঃপুনঃ পরামর্শে বল-প্রকৃতি পর্যালোচনা করছেন ব্যাট-বীরেরা। বোরদে রোদে চুল না মেলে টুপিতে ঢেকে রেখেছেন, জীবন্ত বলের বিরুদ্ধে মৃত ব্যাট পেতে রেখে বোলারের লালসাকে নিবৃত্ত করতে চাই-ছেন, ৯৯-এ আটক ভারত গাঁট ছাড়িয়ে ১০০-তে উঠেছে বহু চেষ্টায়—এমন সময়ে, দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে সূর্তি সোবার্সের বলে এল-বি। বাঁ-হাতে পরিষ্কার খেলার মানুষটি, বিনা ভূমিকায় কাট বা গ্লান্স করতে পারেন—বিদায় নিলেন।

ক্রিকেট-চিন্তাকালে দুদিনের লেখার জন্য দুটি শিরোনামা আমার মাথায় এসেছিল। তার একটি 'ক্রিকেটের রোমান্সকুমার।' বলা বাহুল্য, পাতৌদির সম্ভাব্য নন্দন ইনিংসকে মনে করেই ঐ কথার উদয় হয়েছিল। অপূর্ব খেলবেন তিনি। এই-যে দারুণ স্পিন নিচ্ছে বল, সাপুড়িয়া নায়কের মতো এর বিষদাঁত তিনি লীলার ছাঁদে ভাঙতে পারবেন—পারবেনই। তিনি-যে তরুণ পাতৌদি, আলী মনসুর, সুর-জাগানিয়া—কী না করতে পারেন!

জানিনা কি করতে পারেন। এই তিনি এসেছেন, ফিল্ডিং গুটিয়ে ব্যাটের মুখে চলে এসেছে. পাঁচটি লোক তাঁকে ঘিরে, যেন পাঁচ আঙুলের একটি মুঠি শক্ত হয়ে বসতে চাইছে কণ্ঠে। মোট ৪২ মিনিট কেটেছে, একটিও আত্মবিশ্বাস-পূর্ণ মার হয়নি, দুর্ভিক্ষের সঞ্চয়ের মতো খুঁটে-খুঁটে রান, আকাশের আলো ম্লান. প্রতিভার ক্রন্দন—আলো! কোথায় আলো!—এহেন সময়ে সত্যই ঝলক, সোবার্সকে কভারে বাউন্ডারিতে পাঠালেন বোরদে—দিনের প্রথম চার। কিন্তু অপরপক্ষে টাইগার-পাতৌদি গিবসের বলজালে আবদ্ধ। স্পিন-বলে পা যে ব্যবহার্য, পাতৌদি দেখাচ্ছেন—বলকে হাতে-পায়ে ধরছেন—হেনকালে বেলা যখন এগারোটা, মেঘনাদবধ কাব্যের একখানি ঈষৎ পরিবর্তিত কাব্যছত্র কেঁপে উঠল—'শর্মিলার বামেতর নয়ন নাচিল'—পাতৌদি স্কোয়ারলেগে গিবসের বল তুলে দিলেন গ্রিফিথের হাতে, উত্ত্যক্ত হয়ে।

না বললেও চলে, এক রানের পাতৌদি সম্বন্ধে 'রোমান্সকুমার' শিরোনামটি দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় ঈপ্সিত শিরোনামায় কিছু রাজনৈতিক শব্দ-গন্ধ আছে ('শব্দ-গন্ধ' ব্যাপারটা জীবনানন্দ-স্পর্শে যথেষ্টই রোমাণ্টিক), সেটি হল : 'চাঁদু বোরদে—আবার কে?' ভারতের দারুণ বিপদ, যায়-যায় অবস্থা, তখন পরিত্রাণায় আবির্ভূত বোরদে, যিনি সম্ভবামি মুহুর্মুহু। তবে ক্রিকেটের পরিভাষা তো গীতা থেকে নিলে চলবে না—চলতি জীবন থেকেই নিতে হবে—নিয়ে নিলাম একেবারে বামপন্থী পথধ্বনি থেকে—অসুবিধা নেই, ভারতের ক্রিকেট-মাঠে বুর্জোয়া ও সাম্যবাদীর গাত্রঘর্ষণ হয়।—'ভারত ডোবে—বাঁচায় কে? চাঁদু বোরদে—আবার কে?'

দ্বিতীয় শিরোনামাকে বিসর্জন দিয়ে বোরদে পাঁচ মিনিট পরেই নিজ দোষে রানআউট হয়ে গেলেন। ভারত ৫-১১৯।

—শীতের ঝরাপাতা—

এর পরে আর কি!—দারুণ কাব্যের মৃতদেহের পাশে করুণ কাব্যের 'অশ্রু-বাষ্প বিসর্জন।' সংকটক্ষণে বোরদের রানআউট ভারতের অভয় সঙ্গীতকে উচ্ছলিত করে তুলল : 'বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা।' হনুমন্ত, সুব্রহ্মণ্য, বেঙ্কটরাঘবন, বেগ, বেদী—লাঞ্চের আগে ক্রমান্বয়ে এসেছেন, চলেও গেছেন। লাঞ্চের পরে চন্দ্রশেখরও চরৈবেতি। এ'দের খেলা-কালে প্রতিটি রান অভ্যর্থিত—না, অর্চিত—এবং করনিনাদিত, দর্শকদের দ্বারা। বলে মার—ইডেনে গত দিনের অগ্নিকাণ্ডের পরে দর্শকদের ধরে পুলিশের মার দেওয়ার মতোই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। 'পিচ তাহলে একেবারে অক্ষত ছিল না! সামাজিকের কানাকানিতে তাহলে কিছু সত্য ছিল!'— সবাই কানাকানি করেছে। দম বন্ধ করে দর্শক দেখছে—গিবসের বল ছুরির মতো ঝলসে উঠে, রেসিং-কারের মতো বাঁক নিয়েছে প্রায় সমকোণে। ফলো-অনের খাঁড়া ঝুলিয়ে গিবস ও সোবার্স ভারতকে ডাক দিয়েছেন—'ফলো মি'—ঘাড়ের উপরে ঝুলে-পড়া মাথা লটপট করতে-করতে ব্যাটসম্যানেরা তাঁদের পিছনে সার দিয়ে এগিয়ে এসেছে—তাদের ওঁরা ঠেলে দিয়েছেন মৃত্যু-উপত্যকায়। আশে-পাশে হিংস্র শিকারী-শ্বাপদের মতো ফিল্ডাররা ঘোরাফেরা করে প্রতিটি দুর্লভ রানকে নখরে আঁচড়াতে

চেয়েছে। সেই মৃত্যুপ্রহরে বাঁচার আকৃতি-শিহরণও পরিমাণে কত অল্প! বেঙ্কটরাঘবন বা সুব্রহ্মণ্য দু' একবার পরপর বাউন্ডারি মেরেছেন সত্য, বেদীও মনোরম কিছু 'স্পর্শ' করেছেন (যা দেখে এক ব্যক্তি বাক্-নিপুণ হবার ইচ্ছায় সোচ্ছ্বাসে বলেছেন—'আহা বেদীং বিউটি'—তাতে কেউ হেসেছে. কেউ ভ্রূকুটি করেছে)—অসুস্থ বেগ ক্ষণকালীন সাহস দেখিয়েছেন, কিন্তু "বেগরক্তরবি" 'বিগত' সহসা", এবং--ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে গেল ১৬৭ রানে: গিবসের অ্যাভারেজ: ৩৭-১৭-৫১-৫: সোবার্সের ২৮·৫-১৬-৬২-৩। সকালের ২৩ মিনিট বাদ দিলে (২৩ মিনিট পরে প্রথম উইকেট পড়েছিল)—১০৭ মিনিটে ৯ জন ব্যাটসম্যান আউট। ভারতের ফলো-অন—যা দূর কল্পনাতেও ছিল না অধিকাংশ মানুষের। ঘূর্ণ্যমান মোহিনী বিভীষিকা—তোমায় নমস্কার!

--নতুন রেকর্ড—

শেষের কথাটা আগে করে নিই। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রান করেছে। ইনিংস পরাজয় সামলাতে আরও ৯০ রান দরকার।

এখন নতুন যে-রেকর্ডের কথা বলছি, তার সম্পাদনকর্তা জয়সীমা। রেকর্ড হয়েছে—তা অবশ্য বলছি আন্দাজে। আমার ভুল হতে পারে।

না, জয়সীমা ওপেন করতে এসে ৫০ মিনিট পরে প্রথম রান করেছিলেন. এটিকে রেকর্ড বলছি না (রেকর্ড নয়. তাও জোর করে বলতে পারছি না)—২৪ থেকে ২৬ রানের মধ্যে তিনি তিনটি সহজ সুযোগ দিয়েছিলেন, এবং সেগুলি ওয়েস্টইন্ডিয়ানরা ছেড়েছিলেন, এইটেই রেকর্ড। জয়সীমার দেওয়ার মতো ওয়েস্টইন্ডিয়ানদের ছাড়াটা রেকর্ড এইজন্য যে. তাঁদের গ্রাউন্ড-ফিল্ডিং অপরপক্ষে প্রায় অলৌকিক পর্যায়ে উঠেছিল।

জয়সীমা ছাড়া আউট হয়েছেন—কুন্দরন, সুর্তি, বোরদে. পাতৌদি। পাতৌদি আউট হতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বিশ্রাম চান. কারণ দু'দিন বিরতির শ্রমে তিনি ক্লান্ত।

গল্প এই. বাবুর বাড়িতে উমেদার এসেছে। দারোয়ান বলল, বাবু ঘুমুচ্ছেন। কতক্ষণ ঘুমুবেন? বেলা চারটে পর্যন্ত। সুতরাং চারটে পর্যন্ত উমেদার বসে রইল। সাড়ে চারটে নাগাদ অধৈর্য উমেদারের তাগিদে দারোয়ান ভিতরে গেল খবর নিতে। ফিরে এসে বলল. না দেখা হবে না। কেন—ঘুম তো ভেঙেছে? হাঁ, লেকিন বাবু নিদের পর বিস্‌রাম করছেন।

—শেষ সন্দেশ—

ভারতের হাতে এখনো পাঁচটি উইকেট। সুখের বিষয়. তাঁদের অনেকেই তরুণ। আগামীকাল উন্নত আক্রমণের সামনে তাঁরা হয়ত পরাভূত হবেন, কিন্তু মনের দিক থেকে লড়াই করবার বাসনা তাঁরা রাখবেন বলেই বিশ্বাস করি। দলে থেকে দলকে ধন্য করার পর্যায়ে তাঁরা এখনো ওঠেননি। বড়রা পৃথিবীর অনেক পান্থশালায় ঘুরেছেন। জেনেছেন: এ-পৃথিবী রঙ্গালয়, আর. জীবন ক্ষণস্থায়ী. বিশেষত ক্রিকেটারের জীবন। সুতরাং দ্যাখো, পৃথিবীকে চোখ মেলে দ্যাখো, দিবসকে দীর্ঘ করে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাও—মধ্যাহ্ন ও মধ্যনিশীথ একাকার করে খেলে যাও ক্রিকেট—রমণীয়. ক্রিকেট।

—অধিকন্তু উপদেশ—

তাই, নবীন ক্রিকেটার-ভ্রাতৃগণ! ভারতের প্রতি তোমাদের যদি কোনো দায়িত্ব থাকে, তাহলে—

প্রভাতে উঠিয়া আমি মনে-মনে বলি,
সা-রা-রা-ত আমি যেন ভাল হয়ে চলি।

ওয়েস্টইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস—৩৯০

ভারত প্রথম ইনিংস

জয়সীমা ব গিবস্—৩৭; সুর্তি এল-বি ব সোবার্স—১৬; পাতৌদি ক গ্রিফিথ ব গিবস্—১; বোরদে রান-আউট—১১; হনুমন্ত সিং ক বাইনো ব গিবস্—৪; সুব্রহ্মনিয়াম ক হের্নান্ড্রিকস ব গিবস্—১২; বেঙ্কটরাঘবন ব সোবার্স—১৮; বেগ ব গিবস্ ৪; বেদী স্টাম্পড ব সোবার্স—৫; চন্দ্রশেখর নটআউট—৩। অতিরিক্ত -১৭। মোট--১৬৭।

বোলিং: সোবার্স—২৮'৫-১৬-৪২-৩; গ্রিফিথ—৬-৩-১৪-০; গিবস্—৩৭-১৭-৫১-৫; হল ৫-০-৩২-১; লয়েড—৪-২-৪-০; নারস—৪-১-৭-০।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস

কুন্দরন এল-বি ব হল—৪; জয়সীমা ক ও ব গিবস্—৩১; সুর্তি ক গ্রিফিথ ব সোবার্স—৩১; বোরদে ব লয়েড—২৮; পাতৌদি ক গ্রিফিথ ব লয়েড —২; হনুমন্ত ব্যাটিং—১৬; সুব্রহ্মণ্য ব্যাটিং—৭। অতিরিক্ত—১৪। মোট (৫ উইকেটে)—১৩৩।

বোলিং: হল—৭-০-৩৫-১; গ্রিফিথ—৫-৪-৪-০; সোবার্স—৯-০-৩৪-১; গিবস্—১৯-৫-২২-১; লয়েড—১৩'৫-৫-১৯-২; হাণ্ট—১-০-৫-০।

চতুর্থ দিন: ক্রিকেটহীন ক্রিকেট খেলা

ভারতীয় ক্রিকেট-লেখকদের আচার্যস্থানীয় শ্রীযুক্ত বেরী সর্বাধিকারীর রচনা গোড়ায় উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি বহু খেলা দেখেছেন—বহু সামান্যের স্বর্ণময় হয়ে ওঠা, বহু অসামান্যের অধঃপতন, কাঞ্চন ও কাচের ভাগ্যবিনিময় —সুতরাং বিচলিত হবার মানুষ তিনি নন। তাঁকেই আশ্রয় করি চতুর্থ ও শেষ দিনের খেলার প্রসঙ্গে:

"যা ভয় করা হয়েছিল তাই হল। শেষ দিন বৃহস্পতিবার এক ঘণ্টায় ভারতের বাকি ৫টি উইকেট পড়ল ঝপাঝপ মাত্র ৪৫ রানে। সর্বসাকুল্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৮—ভারতের পরাজয় হল এক ইনিংস এবং ৪৫ রানে। হনুমন্ত সিং এবং সুব্রহ্মণ্যমের ব্যাটিং শুরুতে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার করেছিল, কিন্তু সে আশা ক্ষণিকের—সোবার্স এবং গিবস্ শেষপর্যন্ত সকল ভারতীয় ব্যাটস-ম্যানকে নাজেহাল করলেন। পরাজয় প্রত্যাশিত কিন্তু দু' ইনিংসে ব্যর্থতা অভাবনীয়।

"শেষ দিনের খেলার কথা বলার বিশেষ কিছু নেই। উল্লেখ করব কিন্তু দুটি বিশেষ ঘটনা। যেভাবে সোবার্স মাথা খাটিয়ে হনুমন্ত সিং-কে বোল্ড করেন, সেটা ওয়েস্টইণ্ডিজের অধিনায়কের তীক্ষ্ন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। লেগ-স্টাম্পে খেলিয়ে-খেলিয়ে সেই লেগ-স্টাম্পই কাত করলেন। সুব্রহ্মণ্যমের রান-আউটও অদ্ভুত। কড়া ড্রাইভ করেন সোজা হনুমন্ত সিং, রান নেবার

জন্য সুব্রহ্মণ্যম স্বতঃই 'ব্যাক' করলেন, ইতিমধ্যে বোলার গিবস্ বল ধরতে গিয়ে ঠিক ধরতে পারলেন না, বল তাঁর হাতে লেগে উইকেটে রান-আউট! তাজ্জব ব্যাপার!

"এ টেস্ট যেন অভিশপ্ত.. অন্তত ভারতের পক্ষে।...পাতৌদি যখন পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক হিসাবে ১৯৬২ সালে ওয়েস্টইন্ডিজে ভারতীয় দলের হাল ধরেছিলেন. তখন বার্বাডোজ-টেস্টে অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেলের কাছে এক ইনিংস ও ৩০ রানে হার স্বীকার করেছিলেন। ১৭টি টেস্টের অধিনায়ক পাতৌদির এটা ইনিংসে পরাজয়ের দ্বিতীয় ঘটনা।"

ওয়েস্টইন্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৩৯০

ভারত—প্রথম ইনিংস—১৬৭

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস—১৭৮

হনুমন্ত সিং ব সোবার্স ৩৭, সুব্রহ্মনিয়াম রান-আউট—১৭; বেগ ব গিবস্—৬; বেঙ্কটরাঘবন ক হেনড্রিকস ব সোবার্স—২; বেদী ক বাইনো ব সোবার্স—০; চন্দ্রশেখর নটআউট—১। অতিরিক্ত—১৯। মোট—১৭৮।

বোলিং: হল—৭-০-৩৫-১; গ্রিফিথ—৫-৪-৪-০; সোবার্স—২২-২-৫৬-৪; গিবস্—৩৪'৪-৮-৩৬-২; লয়েড—১৪-৫-২৩-২।

* * * বন্দীর মুক্তি * * *

ক্রিকেট-লেখার ব্যাপারে সচ্চরিত্র হব, এবার এমন সিদ্ধান্ত করে বসেছিলুম। খেলা দেখব, শুধু মাঠের খেলা, আশপাশের কোনো খেলা নয়—এই শুভেচ্ছার অধীন হয়ে নিজেকে বন্দী করেছিলুম সাংবাদিকদের লগ্-কেবিনে। হায়, বিধি বাম! আগুন জ্বলল না ক্রিকেট-খেলায়, ফলে ক্রিকেট লেখাতেও—যদিও তা যথেষ্ট জ্বলল অন্যত্র। যাইহোক. খেলা যখন অকালে শেষ হল, তখন সময়-সাশ্রয়ে নানাদিকে দৃষ্টিপ্রেরণের সুযোগ পাওয়া গেল, হাতে এসে পড়ল সুনন্দর অর্থাৎ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটুকরো লেখা, যার মধ্যে তিনি গৃহাভ্যন্তরের ক্রিকেট-মাতন নিয়ে যথেষ্ট কৌতুক করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রখ্যাত গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, মানুষের ভিতর-বাহির সব দেখার বিশেষ অধিকার তাঁর আছে, তদনুযায়ী তিনি ঘরের কথা লিখতেই পারেন, লিখলেনও চমৎকার-ভাবে, আরও চমৎকার হোত যদি মাঠের কথা লিখতেন মাঠে বসে, কারণ তাঁর ক্রীড়াপ্রীতির কথা আমাদের তো অজানা নয়। যাই হোক, তাঁর 'পারিবারিক ক্রিকেট' রচনাটি সত্যই উপভোগ্য। ঐ লেখায় 'সুনন্দ' জানিয়েছেন, তিনি সকল উঠতি বালকের মতোই প্যাকিং-বাক্সের কাঠের ব্যাট, থান-ইঁটের উইকেট, পুরনো টেনিস বল বা সদ্যোবিকশিত বাতাবি লেবু-যোগে ক্রিকেট খেলেছেন। কলেজেও ক্রিকেট আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন, তবে খেলোয়াড়-রূপে নয়, 'সচীৎকার সমর্থকরূপে।' সুনন্দ স্বতঃই দাবি করেছেন, 'এই ক্রমবিকাশ থেকে বোঝা যাবে—যদিও আমরা ক্রিকেটার হতে পারিনি, তা সত্ত্বেও ক্রিকেটের একটা ট্রাডিশন আমাদের ছিল।' কিন্তু তাঁর দূর সম্পর্কের মামাতোভাই ভজুদা? রাম রাম! 'ভজুদাকে আমরা কখনো বাতাবি লেবু পেটানোতেও অনুপ্রাণিত করতে পারিনি। সে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত ম্যালেরিয়ায় জৃম্ভিত, পাইরেক্স-ডি

গুপ্ত খেত, জ্বর না থাকলে চীৎকার করে ভূগোল পড়ত...আর আমাদের খেলার মাঠের পাশ দিয়ে, ডি গুপ্ত-খাওয়া বিকট মুখ নিয়ে, এক দার্শনিক অনীহায় উদাস হয়ে, পাড়ার ডাক্তার রাজেনদার কাছে পিলে দেখাতে যেত।' এই ভজুদা, যিনি শারীরিক-ব্যাপারে সর্বপ্রকারে অনুৎসাহী, পড়াশোনায় অনন্যব্রতী, পরিশেষে এম-এস-সি পাশ করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত—তাঁর কলকাতার ফ্ল্যাটে একদিন হাজির হলেন সুনন্দ। কী দেখলেন—কোন্ কিমা-শ্চর্যকে—তা পাঠক শুনুন :

"ভজুদা ডিভানে অর্ধশায়িত, অর্থাৎ দরকার পড়লেই লাফিয়ে উঠতে পারে, এই অবস্থা। ভজু-বউদি সামনের সোফায় বসে কার্ডিগান-জাতীয় কিছু বুনছে, কিন্তু তার চোখ জ্বলন্ত—একটা গভীর আবেগ ভেতরে ফুঁসে উঠছে বোঝা যায়। পেছনের একটা টেবিলে ক্রিকেট-রিলে-মন্দ্রিত রেডিও—সেই টেবিলের কোণা ধরে ভজুদার বারো বছরের ছেলে ঘণ্টু একেবারে অবলোকিতেশ্বরের মতো দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ সমস্ত ঘরটাই যেন সার্‌চার্জড্—যাকে বলে বজ্র-সচকিত। আমি কেবল বলেছি : 'কী ব্যাপার, তোমরা হঠাৎ এমন ঘনীভূত হয়ে--' সঙ্গে-সঙ্গে ধিক্কারভরা চোখে ভজুদা আমার দিকে তাকালো। মেঘ-রবে বলল, 'চুপ করে বোস্ সুনন্দ, রোহন কানাই খেলছে।'

"কীর্তন শুনতে-শুনতে যখন সকলের চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়ছে, তখন যদি কোনো অরসিক আর অভক্ত হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে : 'তোমাদের হাটে হুঁকো কত করে হে--', তাহলে তার যে-দশা হয়, আমারও তাই হল। আমি বোকার মতো বসে পড়লুম। ইতিমধ্যে কানাই ধাঁই করে একখানা চার মারলেন এবং ভজুদা বললে, 'দেখ্‌লি একখানা মার! কানাইয়ের হাতে তো ব্যাট নয়—যেন বাঁশি, কানাইয়ের বাঁশি। দেখ্‌লি?'

" 'কানাইয়ের বাঁশি'—সন্দেহ হল, ওটা ভজুদার মৌলিক নয়, যেন শঙ্করী-প্রসাদ বোসের লেখায় ও রকম কিছু পড়েছিলুম। কিন্তু কপিরাইট যখন আমার নয়, তখন কথা না বাড়িয়ে সংক্ষেপে বললুম, 'দেখলুম আর কোথায়—শুনছি!'

" 'ভিস্যুয়ালাইজ করতে পারছেন না'—কার্ডিগান থেকে চোখ তুলে আমার দিকে মেশিনগানের মতো তাকালেন বউদি : কী ফাইন স্কোয়ারলেগের মধ্যে দিয়ে—।' রেডিওতে একটা বিকট কলরব উঠল, ভজু-বউদির বাকিটুকু তাতেই তলিয়ে গেল। কিন্তু যে-টুকু শুনলুম, তাতেই আমার বিষম লাগল।...বেসুরো রবীন্দ্রসঙ্গীতেই বউদির পারদর্শিতা এতদিন জ্ঞাত ছিলুম, কিন্তু ক্রিকেটে তিনি যে এতদূর এগিয়ে গেছেন, সেটা এর পূর্বে অনুমান করতে পারিনি। নিরীহের মতো প্রশ্ন করলুম, 'স্কোয়ারলেগ কাকে বলে বউদি? ক্রিকেটের মাঠে কি কারো চতুষ্কোণ পা গজায়?...ভজুদা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, মেশিনগান গর্জন কর-বার উপক্রম করল, আর হঠাৎ অবলোকিতেশ্বরের মতো ধ্যানস্থ ঘণ্টু হাতে হয়ে—' সঙ্গে-সঙ্গে ধিক্কারভরা চোখে ভজুদা আমার দিকে তাকালো। মেঘ-রবে বললেন, 'সাইলেন্স্! খেলা শুনতে দে।'

"পরাভূত চিত্তে আমি মিনিট-তিনেক বসে রইলুম। রেডিওর কলরব চলতে লাগল, আর হঠাৎ একটা কথা কানে এল : 'এ গুগ্‌লি বল—।' চকিত হয়ে বললুম, 'গুগ্‌লি? আচ্ছা ভজুদা, গুগ্‌লির তো ঝোল খায় বলেই শুনেছি,

তা দিয়ে আবার বলও করে নাকি? আশ্চর্য!'

"আবার বজ্রাঘাত। ভজুদা বোধহয়, সিংহনাদে বলতে যাচ্ছিল, 'তুই একটা ইডি—' কিন্তু সেই মুহূর্তে প্রায় নাচতে-নাচতে ঘরে ঢুকল ঘণ্টুর পনেরো বছরের দিদি ডিব্রু (ডিব্রুগড়ে জন্মসূত্রে)—যার ভালো নাম মহাশ্বেতা। রেডিওর রোল ছাপিয়ে ডিব্রুর কাকলি বেজে উঠল: 'জানো বাবা, আমাদের ক্লাসের বীণার সঙ্গে বাজি রেখেছি যে, ফার্স্ট-টেস্টে যদি ওয়েস্টইণ্ডিজ হারে—'

"পাদপূরণ আমিই করে দিলুম: 'তাহলে তোর একটা ল্যাজ আর বীণার দুটো শিং গজাবে।'

"এর পরে আর বসা যায় না. এক লাফে বেরিয়ে আসতে হল। ক্রিকেট-সিজ্‌ন শেষ না হলে ভজুদার ফ্ল্যাটে আর পা দেওয়া যাবে না—সেটা বুঝতেই পারছি।

"জানি রহস্যের খাসমহলটি কোথায়। ওই ক্রিকেট-রিলে। তার ফলে ভজুদাও সপরিবারে ক্রিকেট-রসিক। 'পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌।' জানি, ক্রিকেটের ভাষ্য-কারেরা কী অসাধ্যসাধন করতে পারেন। পর-পর মেডেন-ওভারের যে-জঘন্য খেলা মাথা ধরিয়ে দেয়, বেতারের মাধ্যমে তাতে তাঁরা নরহত্যার শিহরণ জাগাতে পারেন।"

এমনি একটি রসরচনা দিয়ে ১৯৬৭ ক্রিকেটের সাহিত্য-মরশুম শুরু হয়েছিল। পাঠকদের রসায়িত করবার জন্য আমিও আগে-ভাগে তৈরি হয়েছিলুম। খেলা যেহেতু ওয়েস্টইণ্ডিজের সঙ্গে তাই তাঁদের পূর্ববারের কীর্তির মধ্যে সরস কোনো ব্যাপার ছিল কি-না, জানতে চেয়েছিলুম—এবং সেই উদ্দেশ্যে দ্বারস্থ হয়েছিলুম 'শ্যেনচক্ষু জীবন ঘোষে'র। ঘোষ-মহাশয় বিশিষ্ট আম্পায়ার এবং অতীব ভদ্রলোক। বিনয়ী. সদাহাস্য—সৌজন্য ও শালীনতায় পূর্ণ। আপাতত তাঁর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চোখে অম্লান হাসি. কিন্তু খেলার মাঠে হাউ-হাউ-করা খেলোয়াড়রা জানে, ঐ দুটি চোখ কী অভ্রান্ত দৃষ্টিসম্পন্ন। আমরা সর্বদাই তাঁর সঙ্গ করতে উৎসুক, যেহেতু বেড়ার ধারে বসে খেলা দেখি, আর তিনি মধ্যমাঠে থাকেন. এবং লাঞ্চ খান প্যাভিলিয়ানে ঢুকে। সুতরাং ক্রীড়া-রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যবার্তা তিনি সরবরাহ করতে সমর্থ। ভদ্রলোক কিন্তু এধারে বিশেষ টাইট. খুবই নীতিবাদী. পর্দার আড়ালে যে-সব কাণ্ড ঘটে সেদিকে চোখ দেন না, বা অগত্যা চোখে পড়ে গেলে, পাঁচচোখ করেন না। তবু চাপা-চাপিতে পড়ে তিনি একটি ক্ষুদ্র কাহিনী শুনিয়েছিলেন. যার কপিরাইট তাঁর একেবারেই নয়, তাও জানিয়েছিলেন।

ওয়েস্টইণ্ডিজের ১৯৫৮-৫৯ সফর—যাতে হল ও গিলক্রিস্ট নামক দুই পরশুরাম ভারতীয় ক্রিকেটকে নিঃক্ষত্রিয় করতে এসেছেন। হল-গিলির সামনে দাঁড়াবার 'সাধ্য' কারো ছিল না, কিন্তু 'সাহস' ছিল পূর্বভারতের এক তরুণ ওপেনারের। তার এত সাহস যে, গিলক্রিস্টের বাম্‌পার যেই পড়ল, কাপুরুষের মতো ডুব না দিয়ে, বুক চিতিয়ে বলটাকে 'হুকিয়ে' দিল। একটা খট্‌ শব্দ—তারপরেই বল বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেল সীমান্তে। উল্লাসে পাগল দর্শক—সবার চোখ বাউণ্ডারি-সীমানায়। উল্লাস কমলে পরের কীর্তি দেখবার জন্য তারা বিজয়ী ব্যাটসম্যানের দিকে যেই তাকিয়েছে, দেখে—তাকে অভ্যর্থনা

জানাতে ছুটে আসছেন কর্মকর্তারা—স্ট্রেচারসহ। কী ব্যাপার? খেলোয়াড়ের ব্যাট হুক করেনি-করেছে মুন্ড!! উৎপাটিত জয়ধ্বজার মতো পড়ে আছে তরুণ শৌর্য :

পপাত ধরণীতলে ধন্য বীরবর!
রণস্থলে শুয়ে আছে কাষ্ঠদন্ডবৎ
সুকঠিন প্রতিজ্ঞার লম্বমান শব।

দুঃখের বিষয়, এই সিরিজে দেখা গেল—হুল-বল হীনবল। তাই জীবন ঘোষের গল্পটা কাজে লাগানো গেল না।

লেখকদের কিন্তু প্রস্তুত থাকতেই হয়। যে-লেখায় শেষ অবধি করুণরস ছাড়া কিছু নেই, লেখকদের কলম থেকে কাজল-কালো অশ্রু ছাড়া (আহা!) যা আর কিছু ঝরাতে সমর্থ নয়, সেখানেও তাঁরা উদ্‌গ্রীব—যদি কোনো সুযোগে হেসে ফেলতে পারেন। সেই কথাটাই বলেছিলুম বৃহস্পতিবার, ৬ জানুয়ারি সকালে এক বন্ধুকে, মাঠের দিকে এগোবার সময়ে—যেদিন মাঠে যাবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। বন্ধুকে বলেছিলুম, 'এক ধরনের লোক আছে যারা সানাই বাজাতে পারে, গান গাইতে পারে, খাট বইতে পারে, এবং ঘাটে বসে কাঁদতে পারে। আমাদেরও সেই ভূমিকা, ক্রিকেট-মাঠে।'

বৃহস্পতিবার সকালে ইডেনের ঘাটে বসে কাঁদতেই যাচ্ছিলুম, কেবল মনে ক্ষীণ আশা ছিল, রোগে মৃত্যু নয়, সর্পাঘাতে, বিষ ঝাড়বার লোক কি শেষ অবধি পাওয়া যাবে না! পাওয়া গেলে শ্মশানে সানাই শুরু করে দেওয়া যাবে।

তা কিন্তু হবার নয়। শরৎচন্দ্রের গল্পটি মনে পড়ল। সর্বজনশ্রদ্ধেয়, 'সর্বজনীন দাদা' জলধর সেন একদা একখানি উপন্যাস লিখে শরৎচন্দ্রকে পড়তে দেন। শরৎচন্দ্র বইটি পড়ে বলেন—'দাদা, এটা কী হল?' দাদা প্রতিপ্রশ্ন করলেন – 'কোন্‌টা?' 'এই-যে আপনি উপন্যাসের শেষে নায়ক-নায়িকার মিলনের পরিপাটি ব্যবস্থা করার পরে বিয়ের রাতে সর্পাঘাতে নায়ককে মেরে ফেলে ব্যাপারটাকে বিয়োগান্ত করে ফেললেন—এটা কি ঠিক হল?'

চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে দাদা শুধু বলেছিলেন—'কেন, সাপের কামড়ে কি কেউ মরে না?'

একথার জবাব নেই। ড্র-এর খেলাকে ইনিংসে হারবার অধিকার অবশ্যই ভারতের আছে।

বিষণ্ণ লেখককে সাহায্যের জন্য জনগণও এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদেরই একজন গ্যালারি-দর্শনের ফলরূপী কিছু খুচরো কবিতা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তার সব-ক'টি ছাপা সম্ভব নয়, সেগুলিতে এমনই নগ্ন সত্য-দর্শন আছে। নিরাপদ দু'-একটিকে এই ক্রিকেটহীন ক্রিকেট-লেখায় তুলে দিই। উক্ত দার্শনিক-কবি কিঞ্চিৎ বামাচারী। তিনি অতি-পোষাকে এবং নাতি-পোষাকে দেখেছেন দুই নারীকে :

হিমালয়-মেষপাল করিয়া নিঃশেষ
এক নারী লোমবতী পরিয়াছে বেশ।
অন্য নারী তপস্বিনী, পট্টি-মাত্র গায়,
হু-হু শীতে হি-হি হাসি ঠোঁটেতে গড়ায়।

কেশ সম্বন্ধে কবিদের আসক্তির কথা সর্ববিদিত। সেকালের 'বিদিশার নিশা' থেকে একালে পতিত কবি-মন 'অশ্বপুচ্ছ' ধরে কিছুকাল আগেও ছুটেছিল। এখন সেই প্রেরণার অশ্বশক্তি হ্রাস পাওয়ায় তাঁদের মন পাখির বাসায় নীড় বাঁধতে চাইছে। না, সেখানেও থেমে নেই, চালের খুদুনি কিংবা ধানের মরাই পর্যন্ত ছোটাছুটি করছেন। শেষোক্ত প্রসঙ্গে কবির টুকরো কবিতায় সবিশেষ সমাজসচেতনতা :

খরায় জ্বলিল মাঠ, ঘরে ধান নাই,
খরায় জ্বলেই হল চুলের মরাই।

মাঠ ছেড়ে চলে আসছি. লাঞ্চের তখনো প্রায় এক ঘণ্টা বাকি। অনিচ্ছুক একটি ছেলেকে টেনে-হিঁচড়ে তার বাবা গ্যালারি থেকে নামাচ্ছেন। ছেলেটি লাঞ্চ না খেয়ে মাঠ থেকে যেতে রাজি নয়। তার বাবা বোঝালেন, লাঞ্চের আগে খেলা শেষ হলে কেউ লাঞ্চ খায় না। তখন ছেলেটি শান্ত হল, খুশি হল।—'তাহলে খেলোয়াড়রাও লাঞ্চ খেতে পাবে না—কি বলো বাবা!'

* * * সোবার্স অথবা কনস্টানটাইন * * *

সোবার্স কলকাতায় খেলে গেলেন। সোবার্স কলকাতায় অপরিচিত চরিত্র নন। তাঁর প্রতিভার নানামুখিতা সকলেই চোখের সামনে দেখলেন। আলোচনা এখানে এবং অন্যত্র চলল—লোকটি কী—কী কাণ্ড—'কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান ব্যাপার।' ক্রিকেটের অর্থশাস্ত্রীরা বিতর্কে নেমে পড়লেন—সোবার্স একের ভিতরে পাঁচ না পাঁচশো? কোনো এক পৌরাণিক সৃষ্টির মতো তিনি, যাঁর হস্তপদের সীমা-সংখ্যা নেই, হিসাব নেই মস্তক ও মস্তিষ্কের, প্রতিভার অকল্পনীয় স্বেচ্ছাচারিতায় তিনি সমর্থ—কলমের কালি শুষে নিয়ে বন্দনার শব্দরাজি নৃত্য করতে থাকে সোবার্সকে ঘিরে।

সোবার্স কি পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার?

স্বয়ং নেভিল কার্ডাস এই বিতর্কে যোগ দিলেন। বললেন, সোবার্স নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান, বর্তমানে তাঁর মতো বহুগুণান্বিত চৌকশ খেলোয়াড় নেই, কিন্তু একনিঃশ্বাসে তাঁকে সর্বকালের সর্বোত্তম বলা যুক্তিসংগত হবে না। ও-প্রশ্নের ঠিক সমাধান হতে পারে যদি সোবার্সকে নানা কালের মাঠে, নানা সঙ্গে ঘোরানো যায়। সেটা খুব সহজবোধ্য কারণে সম্ভব নয়। সোবার্স অবশ্যই বিরিঞ্চিবাবা নন। কিন্তু ক্রিটিকরূপে যিনি সদর্থে বিরিঞ্চিবাবা দাঁড়িয়ে গেছেন ষাট বছরের ক্রিকেট দেখার অভিজ্ঞতায়—সেই কার্ডাসের মতে সোবার্স পৃথিবীর প্রধান অলরাউণ্ডারদের অন্যতম।

কে সবচেয়ে বড় অলরাউণ্ডার. তার মীমাংসার জন্য যদি রেকর্ডবুকের দ্বারস্থ হতে হয়—সোবার্স অবশ্যই সর্বোচ্চে আসীন।*

---

*শ্রীযুক্ত অজয় বসু সোবার্সের দশানন, বিশহস্ত কাণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটি চমৎকার মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তাঁর 'ব্যাটে বলে ক্রিকেট' গ্রন্থে। রিচি বেনোড ও টেড ডেক্সটার বলেছেন, 'সোবার্স যে-দলে থাকেন, সে-দল তেরো জনে খেলে। কারণ সোবার্স—ব্যাটসম্যান, ফিল্ডসম্যান, পেস বোলার এবং স্পিন বোলার।' শেফিল্ড

এ প্রসঙ্গ থাক। কার্ডাসের একটা প্রিয় প্রসঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করা যাক। সোবার্সকে কি ওয়েস্টইণ্ডিজের প্রতীক-ক্রিকেটার বলা যায়—যে-অর্থে লিয়ারী কনস্টানটাইনকে ঐ অভিধায় কার্ডাস ভূষিত করেছেন? আমরা যতদূর জেনেছি, (অবশ্যই অল্প জেনেছি)—সোবার্স কী পরিমাণে জাতীয় প্রতিভার বিকাশ, সে আলোচনায় কার্ডাস মনোনিবেশ করেননি। তা কি করেননি এইজন্য যে কার্ডাস ব্যক্তিপ্রতিভার মধ্যে জাতিপ্রতিভা সন্ধানের সুপরিচিত সুমহৎ দুর্বলতায় আর ধরা দিতে চাননি? কার্ডাস মূলে শিল্পরসিক বলে, আমরা দেখেছি, তিনি জাতীয় প্রাণাবেগ ভিন্ন মহৎ শিল্পের জন্মের কথা ভাবতে পারেন নি। বিশ্বাত্মবোধ উত্তম বস্তু, কিন্তু তাই বলে বিশ্বরক্তের সংমিশ্রণে তৎক্ষণাৎ শ্রদ্ধেয় মানুষের সৃষ্টি হয় না। এই কথাটি উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে কার্ডাস ক্রিকেটে জাতীয় প্রতিভার প্রফেট-কবি হয়ে উঠেছেন।

ব্যক্তিতে তার জাতি-সন্ধানের 'দুর্বলতা' ত্যাগ করেছেন বলেই কার্ডাস সোবার্সের মধ্যে তাঁর জাতি-প্রকৃতি দর্শন করতে চাননি, এ-কথায় আমার বিশ্বাস হয় না—আমার ধারণা তিনি সোবার্সের মধ্যে তাঁর কল্পিত ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ-স্বভাবকে খুঁজে পাননি, যা সর্বাধিক পেয়েছিলেন লিয়ারী কনস্টানটাইনের মধ্যে। কনস্টানটাইন সম্বন্ধে নেভিল কার্ডাসের বিশিষ্ট ও বিখ্যাত রচনাটি উপস্থিত করতে চাই। এর মধ্যে তাঁর 'জাতীয় প্রতিভা' তত্ত্বটি সুব্যাখ্যাত। কনস্টানটাইনের প্রাণশক্তির সর্বাত্মক রূপের কথা সকলেই বলে থাকেন—তার নিজস্ব চেহারাকে কার্ডাসই উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন সবচেয়ে সার্থকভাবে। এই লেখার মধ্যেই তিনি বিতর্কমূলক খোঁচাটি দিয়েছিলেন—ওয়েস্টইণ্ডিয়ানদের ফাস্টবোলিং-সামর্থ্য এবং স্পিনবোলিংয়ে বীতরাগ সম্বন্ধে। ওর বিষয়ে স্বয়ং কনস্টানটাইন পর্যন্ত প্রতিবাদ করেছেন—আসল প্রতিবাদ এসেছে পৃথিবীর দুই সেরা স্পিনার রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইনের কাছ থেকে। কার্ডাস অবশ্য সহাস্যে বলতে পারেন, রামাধীন তো রক্তে ভারতীয়, এবং... ভ্যালেণ্টাইনের রক্ষণশীল লেগস্পিনের তীব্রগতি অনেকাংশে ওয়েস্টইণ্ডিজীয়। কিন্তু গিবস্? 'ব্যতিক্রম নিয়মকে প্রমাণ করে'—গিবস্ সেই নিয়মের সৃষ্টি নাকি?

শীল্ডে সোবার্সের ব্যাটিং দেখে এক নামজাদা সাংবাদিক স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানকে বলেন, 'আচ্ছা সোবার্স বড় বেশি মাথার উপর ব্যাট তোলেন, না?' স্যার ডন বলেন, 'হ্যাঁ, তা তোলেন কিন্তু...যতই তুলুন...ঠিক সময়ে নামাতে ভুল করেন না!'

অজয়বাবু অস্ট্রেলিয়ান উইকেটকীপার ব্যারি জার্মানের উপাদেয় মন্তব্যও এই সূত্রে আমাদের উপহার দিয়েছেন : শেফিল্ড শীল্ডে সোবার্স ও জার্মান এক দলে খেলছেন। একবার ব্যাটসম্যানকে রানআউট করার চেষ্টায় সোবার্স এক টিপে বল ছুঁড়ে উইকেট ভেঙে দিলেন। ব্যাটসম্যান অবশ্য আউট হলেন না কারণ তিনি যথাসময়ে পিছিয়ে এসেছিলেন। সোবার্স তখন তাড়াতাড়ি ছিটকে যাওয়া বেল তুলে স্টাম্প সাজানোর কাজে লেগে গেলেন। আর তাই দেখে জার্মান সহাস্যে মন্তব্য করলেন: 'কি ভায়া গ্যারি, আম্পায়ারকেও বেকার করে ছেড়ে দেবে নাকি?'

এই সহাস্য মন্তব্যটি সোবার্সের সর্বাত্মক প্রতিভার এক অত্যুচ্চ প্রশস্তি।

সোবার্সের কথায় ফেরা যাক। আমরা তাঁকে বেশ কয়েকবারই খেলতে দেখেছি। তাঁর প্রতিভায় মোহিত হয়েও বলব, যে-উপস্থিতিতে ওরেল ধন্য সোবার্সের মধ্যে তা নেই। বিশ্বরণক্ষেত্রে অসীম নিপুণ এক তরুণ যোদ্ধা এই সোবার্স, যেখানে থাকেন মথিত করেন রণতরঙ্গ যৌবনাবেগে, কিন্তু তিনি বিশেষ দেশের বা বিশেষ নামের বর্মে-পতাকায় সজ্জিত নন। তবে এইটুকু শেষপর্যন্ত বলা যায়, এতগুলি মুখে সমান উদ্‌গিরণ নিয়ে এই-যে আগ্নেয়-গিরিকে ক্রিকেটে দেখা গেল—এ-জিনিস একালে ওয়েস্টইণ্ডিজ ছাড়া হয়তো আর কোথাও সম্ভবপর হত না—যে-ভূখণ্ডের নাড়া-খাওয়া জীবন প্রধান সৃষ্টিক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করেছে ক্রিকেট-মাঠকে। পৃথিবীর ক্রিকেটে বর্তমানে আদিম আফ্রিকা-রক্তের জয়।

এখন তুলে ধরা যাক নেভিল কার্ডাসের রচনাটি—মোটামুটি অনুবাদে :

—কনস্টানটাইন—

মৌলিকতাই প্রতিভা। ক্রিকেটে প্রতিভাবান বলি তাঁকে যিনি একটা কিছু করেন অনবদ্য রাজকীয় মহিমায় এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে। তাঁর খেলা দেখে আমাদের যেন হর্ষধ্বনি করে বলতেই হয়, 'আঃ, এ জিনিসটি আর কারো সাধ্যে নেই।' তা দেখে আমরা যেন মনে-প্রাণে অনুভব করি যে, এ জিনিস আবির্ভূত না-হলে ক্রিকেটের সকল আনন্দরূপ উদ্‌ঘাটিত হত না, কিছু গুণ ও শক্তির ঘাটতি থেকে যেতই।

ডবলিউ জি গ্রেস, রনজি, ম্যাকলারেন, হবস, উলি—এ'দের স্বাক্ষর ছাড়া ক্রিকেটের কল্পনা করতে পারি না আমরা। বহু অপরিহার্য নামের কয়েকটি মাত্র এ'রা।* এইসব ব্যক্তিরা ক্রিকেটকে ছায়াশরীর না রেখে রক্তমাংসময় করে তুলেছেন। বিমূর্ত তত্ত্বরূপে ক্রিকেট দুটি দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা; যেখানে ব্যাট, উইকেট ও একটি বল প্রধান যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যাকে আমরা, সারা পৃথিবীর মানুষেরা ভালবাসি, তা হল, এই খেলার বিরাট খেলোয়াড়দের ব্যক্তিনৈপুণ্য ও ব্যক্তিচরিত্রের সম্মিলিত রূপ-বিকাশ। ঐসব খেলোয়াড়রা নানা কালে ক্রিকেটের আঙ্গিকে নিজস্ব কিছু বেগ বা বাঁক দিয়েছেন—যার ফলে ক্রিকেটের জীবন্ত গতি অব্যাহত আছে, এবং ক্রিকেট জনজীবনের সঙ্গে যুক্তও আছে কালে কালে। ডবলিউ জি গ্রেস কেবল পদচালনার অখণ্ড ছন্দে এগিয়ে-পেছিয়ে খেলবার বা বলকে প্রয়োজনীয় জায়গায় পাঠানোর রীতিই দেখাননি, তিনি একইসঙ্গে মুখ্য ভিক্টোরিয়ানদের অন্যতম এবং গ্লস্টারশায়ারের প্রতিভূ-চরিত্র। রণজিৎ সিংজী শুধুই লেগগ্লান্স দেখাননি, তিনি স্বজাতীয় প্রতিভার

* তিরিশের দশকে এই রচনাটি কার্ডাস লিখেছেন। আরও তিরিশ বছর পরে লিখলে নিশ্চয় ওরেল, কম্পটন মিলারের নাম বাদ যেত না। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা যোগ করে দিতে পারি, সি কে নাইডু, অমরনাথ, মুস্তাক আলীর নাম। পাঠকগণও যথেচ্ছ নাম যোগ করতে পারেন। কারণ ক্রিকেটে প্রতিটি দর্শকই, খেলোয়াড় এবং লেখক। এমনকি রেডিও-শ্রোতারাও। ক্রিকেট সকলকে খেলিয়ে ও বলিয়ে নেয়। তবে, সময় সুযোগ বা ইচ্ছার অভাবে সকল দর্শক মাঠে নামেন না, বা কলম ধরেন না, এই যা।

প্রকাশও দেখিয়েছেন। হার্স্ট আদিপর্বে বাতাসে বল ভাঙানোর মহান বোলারই ছিলেন না, ঐ বলের বঙ্কিমতায় অধিকন্তু ইয়র্কশায়ারীয় টান ছিল।...

সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে মৌলিক ক্রিকেটার কনস্টানটাইন। আমাদের সময়ে, ক্রিকেট-মাঠে এহেন মৌলিক কাউকে সত্যই দেখা যায়নি। তিনি প্রায়শঃ প্রচণ্ড পেটান, এবং তাঁর মারের চরিত্র, বিশ্লেষণে উদ্‌ঘাটন করা যায় না—এটা বলাই যথেষ্ট নয়, কেননা জেসপও ঐ কাজ করেছেন—অতুলনীয়ভাবে করেছেন। না, শুধু তা নয়, আসল কথা, কনস্টানটাইনের মৌলিকতা ওয়েস্টইণ্ডিয়ান চরিত্রের পরিপূর্ণ প্রাণগত উন্মোচন ছাড়া কিছু নয়, যে ওয়েস্টইণ্ডিয়ান চরিত্র এ-পর্যন্ত কোনো ওয়েস্টইডিয়ান ক্রিকেটারের মধ্যে সর্বাত্মক ও সুস্পষ্ট প্রকাশ লাভ করেনি, কারণ মহান প্রতিনিধি-চরিত্রের আবির্ভাবের জন্য সময় লাগে—জাতীয় জীবন সক্রিয় হয়ে বিবর্তনের একটা বিশেষ পর্যায়ে উপনীত না হলে ঐ ধরনের চরিত্র আসে না। বড় ওয়েস্টইণ্ডিয়ান ক্রিকেটার আগেও হয়েছেন, কনস্টানটাইনের তুল্যই নৈপুণ্য তাঁদের। যেমন চ্যালেনসার, বিরাট ব্যাটসম্যান, কিন্তু মেজাজে বা রীতিতে তিনি ওয়েস্টইণ্ডিয়ান নন। অপরপক্ষে কনস্টান-টাইনকে যখন বল বা ব্যাট করতে কিংবা ফিল্ডিং করতে দেখি, তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি তিনি ইংরেজ ক্রিকেটার নন, অস্ট্রেলিয়ান বা সাউথ আফ্রিকান নন। আমরা বুঝে নিই, তাঁর কাট, তাঁর ড্রাইভ, তাঁর বলের ঝড়, স্লিপে থাকা-কালে তাঁর লাফানো-ঝাঁপানো, ধরা এবং ছোঁড়া--সবই স্বদেশী। আমরা বুঝতে পারি যে, এ-আবেগের জন্ম এমন এক রক্ত থেকে, যা সূর্যে উত্তপ্ত হয়েছে, প্রস্তুত হয়েছে বিশেষ ধরনের জীবনের কটাহে, প্রভাবিত হয়েছে পরিবেশের দ্বারা—যা আমাদের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক—যা প্রাপ্তব্য নয় অতি-সভ্যের বাস্তু-পল্লীতে। কনস্টানটাইন যখন খেলেন, সমস্ত মানুষটাই খেলে, পেশাদার অংশ-টুকুই শুধু নয়। যখন ব্যাট করেন, পৃথিবীতে তখন করবার একটি কাজই তাঁর আছে, বলটিকে পেটানো এবং পিটিয়ে বাউণ্ডারিতে পাঠানো। তাঁর বল করার সময়ে পৃথিবী তিনটি উইকেটে তৈরী, সেখানে ঘূর্ণী ঝড় বইয়ে দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। ক্রিকেট কনস্টানটাইনের ধাতু। তিনি ক্রিকেট খেলেন বলাও যা, মাছ জলে সাঁতার কাটে বলাও তাই। কনস্টানটাইন স্বয়ং ক্রিকেট, ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট, যেমন গ্রেস ইংলিশ ক্রিকেট। শাখা নিয়েই গাছ -খেলোয়াড় নিয়েই খেলা।

ইংলেণ্ড বা অস্ট্রেলিয়ানের সংবাদ-সাগরিকায়' লেখা নেই, এমন-সব মার কনস্টানটাইন মারেন। নিজের নিয়ম ছাড়া সব নিয়ম তিনি ভাঙেন। উদ্দীপনার অভাবের ক্ষেত্রে তুচ্ছ হওয়ার চেয়ে তাঁর প্রাণশক্তি বেরিয়ে আসে স্থূল উগ্র-রূপে। একবার লর্ডসে এক টেস্টম্যাচে স্কোয়ার-লেগের কণ্ঠনালীতে বল চালিয়ে দিয়ে তিনি উইকেট হারান। মারটা যতটা কনস্টানটাইনের তারও থেকে বেশি গাঁয়ের 'মার ডাণ্ডা' খেলোয়াড়ের স্ফূর্তির কাণ্ড। কিন্তু পরদিন আবার শিল্পীকে দেখা গেল—অদ্ভুত আর উদ্ভটের সৌন্দর্যবিধাতাকে। এত সুন্দর-ভাবে লেগের দিকে একটি ছক্কা মারলেন, যার সম্বন্ধে যেন দিব্যি গেলে বলা যায়, সেটি নির্ঘাত উইকেটকীপারের মাথার উপর দিয়েই উড়ে গেছে। বলটি ব্যাট থেকে বেরিয়ে যাবার পরেই যেন মেরেছিলেন, যেন দ্বিতীয় চিন্তায়,

অবিশ্বাস্যরকম দেরীতে। কনস্টানটাইনের মার সব সময়েই দেরীতে। অপূর্ব তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্নতা। বল আসার সময়ে ব্যাট পিছনে বেশি তোলেন না। পিছনে ব্যাট বেশি ওঠানো মানে ব্যাটসম্যান বেশি সময় নিতে প্রস্তুত। কনস্টানটাইন তাঁর উপরে বল এসে-পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন; তারপরেই চাবুকের মতো ব্যাট, যা জোরালো অথচ নমনীয় হাতে ধরা ছিল, সাঁক্ করে ওঠে বিদ্যুতের মতো কিংবা তারো চেয়ে বেগে।

জীবিত কিংবা মৃত কোনো মানুষই কনস্টানটাইনের চেয়ে শক্তিতে এবং বেগে বাউন্ডারিতে বল পাঠাননি। উদ্ধত আক্রমণের বিজয়বাদ্যসহ বল যখন মাঠের বাইরে বেরিয়ে যায় তখন ফিল্ডসম্যান দাঁড়িয়ে থাকে যথাপূর্ব। মিডলস্টাম্পের উপরে বল কাট্ করে তিনি পরিষ্কার থার্ডম্যানের কাছে পাঠাতে পারেন—সেই আকস্মিক ছুরিকাঘাত ক্ষণকালের জন্য স্লিপফিল্ডারদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দেয়।...কনস্টানটাইনের ব্যাটিংয়ের সময়ে যে-কোনো মুহূর্তে ফিল্ডারদের গুরুতর আহত হওয়ার সম্ভাবনা। সবচেয়ে বড় ক্রিকেট-মাঠকেও তিনি ছোট ক'রে তোলেন। যখন তিনি ঝড়ের ঘোড়ায়, তখন মাঠে এগারোর বদলে বাইশ-জন ফিল্ডার থাকলেও যথেষ্ট হয় না। তাই বলে মারগুলি এলোপাথাড়ি নয়। কি করছেন, তা তিনি জানেন। তাঁর ব্যাটের ভেদশক্তি এমন যে, দ্রুততম ফিল্ডারকেও হুড়মুড়িয়ে গড়িয়ে ছিটকে-পড়া কাষ্ঠখণ্ডের মতো মনে হয়।

ওয়েস্টইণ্ডিজ ক্রিকেটের প্রতিনিধি হতে দেহধারণ করেছিলেন বলে ফাস্ট-বোলার না হয়ে তাঁর উপায় ছিল না। সকল ওয়েস্টইণ্ডিয়ানই স্বভাবধর্মে যথা-সাধ্য জোরে বল করতে সচেষ্ট। যদি কোনো ওয়েস্টইণ্ডিয়ানকে ধীর-বোলার করে তুলতে চায় কেউ, তার ঠাকুর্দা থেকে আরম্ভ করাই ভালো। মহাপ্রাণটি হাতে নিয়ে যেন কনস্টানটাইন উইকেটের দিকে ছোটেন, লাফিয়ে-লাফিয়ে টগ্-বগে দৌড়। তারপর একদিকে হেলে, আর কোনো লাফ না দিয়েই হাত উঁচুতে উঠে যায়, এবং—। যথার্থ মারমুখী বোলার। প্রতি ফাস্টবোলারকে মারমুখী হতেই হয়। প্রতি বলেই উইকেট পাবার আশা কনস্টানটাইনের। প্রতিটি ব্যর্থ ওভারের শেষে বিমূঢ়: যখন আম্পায়ারের কাছ থেকে টুপি নিচ্ছেন তখন মাথা ঝোঁকানো, গভীর চিন্তায় মগ্ন, ব্যর্থতার রহস্যসন্ধানে ব্যাপৃত। তাঁর হাত থেকে বল বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে বলের উঁচু রেখাটি যেন উইকেটের দিকে তাঁর দৌড়েরই বিস্তারিত অংশ। কনস্টানটাইনের বোলিং, তার গতিরেখা এবং লক্ষ্য, সব সময়েই আমার কাছে মানুষটির প্রাণশক্তির আছড়ে-পড়া তরঙ্গের মতো মনে হয়েছে। বলের গতি বাস্তবিকই তাঁর দেহকে নিজের পিছনে টান দেয়, ছাড়া-পাওয়া বলকে অনুসরণ করে তাঁর দেহগতি, এবং কারো পক্ষে ঠিকভাবে বোঝাই সম্ভব নয় ঠিক কোন্ জায়গাটিতে বোলার-কনস্টানটাইনের শেষ এবং ফিল্ডার-কনস্টানটাইনের শুরু। ইঁদুর ধরতে বিড়ালের দ্রুত চকিত গতির মতোই শিকার-লক্ষ্যকে ধরতে কনস্টানটাইনের অগ্রধাবন। কনস্টানটাইন এমন বহু 'কট এণ্ড বোল্ড' করছেন, যা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সামর্থ্যকে লুপ্ত করে দিয়েছে। দৃশ্যত, একই সময়ে দু'জায়গায় থাকার ক্ষমতা ছিল যেন তাঁর।

বছর কয়েক আগে, ইংলণ্ডের মাটিতে ওয়েস্টইণ্ডিজের সঙ্গে ইংলণ্ডের যে সর্বপ্রথম টেস্টম্যাচ হয়, লর্ডসের সেই খেলায় লারউড কনস্টানটাইনের বিরুদ্ধে

দ্বিতীয় দিনে ব্যাটিং আরম্ভ করেন। দারুণ জোর একটি বল সোজা লাফিয়ে ওঠায় লারউড নিজের বুক বাঁচাতে ব্যাট তোলেন এবং বলটি তাঁর আত্মরক্ষার ব্যাটে ধাক্কা খেয়ে সামনে একটু উঠে পড়ে। কেউই সেটিকে চান্স বলে ভাবেনি। বলটিকে একটু উঁচু দেখে আমরা নিজেদের মধ্যে বললাম, 'আহা, উইকেট-কীপার যদি আর একটু কাছে থাকত, যদি পয়েন্ট-এর লোকটি একেবারে নিজের জায়গাতেই না থাকত—' কিন্তু, অহো! ওকি! দুই শ্বাপদ-লম্ফে কনস্টানটাইন পিচের উপর এগিয়ে এসে একেবারে ব্যাটধরার জায়গাটির সামনে লম্বমান—। নাঃ, ইণ্ডিয়ানেকের জন্য পারেননি। যদি পারতেন, ক্রিকেট-ইতিহাসে এর থেকে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটতে পারত না। কাণ্ড দেখে আমাদের শ্বাস-রোধ—লারউড বিস্ময়ের মূর্তি—'অ্যাঁ, লোকটি এল কোথা থেকে!' মাঠে কনস্টানটাইনের বিচিত্র বিস্ময়কর চলাফেরা। উদগ্র প্রচণ্ড ক্ষুধায় এবং অচেতন লাবণ্যে তা আদিম প্রকৃতি। সুন্দর কিন্তু ডায়ন্যামিক সুন্দর—অলস বিলাসের মোলায়েম সুন্দর নয়। স্লিপে ঠিকরে-যাওয়া বল ধরতে তিনি ছোটেন না, লাফ দিয়ে পড়েন। বলকে এমনি তোলেন না, ছোঁ মেরে তোলেন। শরীরে হাড় বলে যেন কোনো জিনিস নেই, শুধু শক্তির বৈদ্যুতিক শিহরণ আর প্রবাহ। তাঁর কিছু স্লিপ-ফিল্ডিং এত দ্রুত ঘটে যে, চোখে ধরাই পড়ে না।—ব্যাটসম্যানের মারার শব্দ—তার পরেই বলের ধাক্কায় উইকেট ভেঙে যাওয়ার শব্দ। যে-কোনো জিনিসকেই তিনি ধরতে পারেন। মাঠের যে-কোনো জায়গায় ওঠা চান্সকে কনস্টানটাইন ছেড়ে দেবার পরেই তবে অন্যের ভাগে পড়তে পারে। কেবল একটি জিনিস তিনি করতে পারেন না—মাঝে-মাঝে তাঁর নিজের ছোঁড়া বল উইকেট ফস্‌কে বেরিয়ে গেলে সেগুলিকে ধরতে পারেন না।

প্রতিভা ও প্রতিনিধি—স্বজাতির। খেলার আঙ্গিকে ও শিল্পে তাঁর অপূর্ব অবদান। একই সঙ্গে নিজ জনগণের কাহিনীও উচ্চারিত। ঐ যে-দিনটির কথা বলেছি, সেই দিনটিতে লর্ডসে কনস্টানটাইনের ব্যাট করার সময়ে তাঁর দেশ-বাসীর অনেকেই আনন্দে কেঁদেছে, ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পরের হাত জড়িয়েছে। তাদের প্রফেট—কনস্টানটাইন। তাঁর প্রতিভার মধ্যে তারা নিজেদের কোনো এক শক্তির বিকাশ দেখেছে, কালাতীত যে শক্তি, অমেয় অদম্য মুক্ত এবং অপূর্ব! অপূর্ব!

মুস্তাকের জন্য দীর্ঘশ্বাস

ক্রিকেটে যখনই সুন্দর আসে, অমনি আমার অতীত-রসাতুর মনে আসেন মুস্তাক। কোনো এক রূপের ছন্দে দুলিয়ে, সুরের ইশারায় উন্মনা করে তিনি চলে যান, আর আমি...হতভাগ্য...পড়ে থাকি স্মৃতিভারে...

জি শংকরের 'দুরন্ত ক্রিকেটার মুস্তাক' বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে সেই 'আমার মুস্তাক'কে টান দিয়েছিলুম—রূপের ব্যাটে রসের খেলার শিল্পীকে। যা লিখেছিলুম সেই কথাগুলি এই:

স্মৃতির কারাগারে যদি বন্দী করে রাখতে পারতুম এবং বলতে পারতুম—'বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'—তাহলে ব্যাপারটা নাটকীয় হোত সন্দেহ নেই, তবে তা জীবননাট্যেরই অংশ। আমরা যারা মুস্তাককে খেলার মাঠে দেখেছি, তাদের

বোধহয় একমাত্র ইচ্ছা—যেন আবার তাঁকে দেখতে পাই! দেখা পাওয়া যাবে না জানি। স্টাম্প বেল তুলে নিয়ে মুস্তাক নিজের খেলার মাঠ থেকে চলে গেছেন—রেখে গেছেন কতকগুলো খণ্ড স্মৃতি আর ছবি। 'তুমি কি কেবলই ছবি?'—ভাবছি।

হ্যাঁ ছবি, তবে ছায়াছবি। চিত্র, তবে চলচ্চিত্র। জি শংকরের লেখা 'দুরন্ত ক্রিকেটার' বইখানি হাতে নিয়ে সেই কথা মনে হচ্ছে। জি শংকর নবীন লেখক, কিন্তু স্বচ্ছন্দ তাঁর রচনা, নাটকীয় গতি আছে তাতে, আর আছে দুরন্ত ক্রিকেটারটির প্রতি বাঙালীর ভালবাসা—বেহিসেবী, বেপরোয়ার প্রতি যা স্নেহাতুর। নিয়ম আমরা ভালবাসি না—মুস্তাক ক্রিকেটে অনিয়মের অবতার।

উক্ত লেখক ক্রিকেট-সাহিত্যের আগ্রহী পাঠকদের প্রতি সুবিচার করার প্রেরণায় গ্রন্থশেষে মুস্তাকের স্কোর-বোর্ডটি হ্রস্বাকারে ছেপে দিয়েছেন। পরবর্তীকালের পাঠক, যাঁরা মুস্তাককে দেখেননি, তাঁদের কাছে মুস্তাকের কোন্ আকার এর ফলে ফুটে উঠল?

টেস্ট-ক্রিকেটে মুস্তাকের স্কোর :

২০ ইনিংস—৬১২ রান—সর্বোচ্চ ১১২—গড় ৩২·২১।

এ ছাড়া বাকি প্রথমশ্রেণীর খেলায় মুস্তাক ৩৬৯টি ইনিংস খেলে মোট ১২·৬৬০ রান করেছেন, গড় মাত্র ৩৫·৮৬। তালিকায় দেখতে পাচ্ছি, সেঞ্চুরির সংখ্যা মোটেই বেশি নয় (৩০টি, একবার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি-সমৃদ্ধ), এবং ডবল সেঞ্চুরি মাত্র একটি!

তবু মুস্তাক আলী হলেন মুস্তাক আলী—যে-কথাটা মুস্তাকের খেলা যাঁরা না দেখেছেন, তাঁদের কখনো বোঝানো যাবে না। মঞ্চের কোনো অবিস্মরণীয় অভিনয়-রজনীকে কোনো নাটকের ইতিহাস কি কখনো ফিরে দিতে পেরেছে? চেতনার অস্থির রেখার মতো মুস্তাকের যে-ব্যাট একদিন মাঠে ছটফট করেছে, তাকে আবদ্ধ করে রাখবে কতকগুলো অঙ্কের সংখ্যা? আনন্দ অগণিতকে রেখাঙ্কিত করবে কিছু নিরানন্দ গণিত?

মুস্তাকের ক্ষেত্রে স্কোরবোর্ড যে রামপ্রসাদের হিসাবের খাতা, কে না জানে? তহবিলের হিসাব রাখতে গিয়ে মূল তহবিল চেয়ে বসেছিলেন সেই মগ্ন অধ্যাত্মকবি। ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ক্রিকেটকেই চেয়ে বসেছিলেন এই বোহেমিয়ান খেলোয়াড়টি। খেলা সম্বন্ধে এই মনোভাব ছিল বলে মুস্তাককে ছাড়তে হয়েছে অনেক কিছু। ক্রিকেট-কনট্রোল-বোর্ডের মুস্তাক-অপ্রীতির নানা কাহিনী লেখক জানিয়েছেন। পরিবর্তে মুস্তাক পেয়েছেন 'তাহার অধিক'—একটা গোটা জাতের খেলোয়াড়ী বিবেক এক সুরে বলেছে—'না হলে মুস্তাক, না হবে টেস্ট।'

সে কাহিনী আছে এই বইয়ে, এবং আরো বহু মনোরম কাহিনী : গুরু সি-কে'র কাছে অনুগত মুস্তাক, ভাড়াটে গুরু ওয়েনস্‌লের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মুস্তাক, স্লো-বোলাররূপে টেস্টে অবতীর্ণ মুস্তাক, এবং ফাস্ট ব্যাটিংয়ের দুর্নামে টেস্টদল থেকে বিতাড়িত মুস্তাক—কাহিনী নানা আকারের, প্রকারের, কিন্তু কদাপি বিকারের নয়। এমনই মুস্তাক, যিনি খেলার মাঠে আমাদের বহু যন্ত্রণা দিয়েছেন, কারণ আমাদের আশা ও আতঙ্কের পদ্মপত্রে তিনি অবিরত

নৃত্যগীত করেছেন—যাঁর সম্বন্ধে, সমস্ত সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে, একটি কথা চিরসত্য—

খেলায় জাত, জীবিত এবং লীন খেলোয়াড়টির নাম—মুস্তাক আলী।

ক্রীড়া-সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উদ্দেশ্যে * * .

ক্রিকেট যখন প্লাবনের মতো কলকাতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কয়েক বছর আগে, তখন দেখা গেল, বাংলাসাহিত্যের এক সেরা নাম সেই বন্যায় ভাসছে সরস্বতীর হাঁসের উপর চড়ে, তারই পালক আঙুলে ধরে। অচিন্ত্যকুমার ক্রিকেট লিখতে শুরু করে দিলেন। লোকে কিছু বিস্মিত হল, কিন্তু যথেষ্ট বিস্মিত নয়। ইতিমধ্যে অচিন্ত্যকুমার বেশ-কিছু চমকের দ্বারা পাঠকের চমকে যাওয়ার ক্ষমতা কমিয়েছেন। তবু অনেকে রাগ করেছিলেন। অচিন্ত্যর এই নতুন প্রেমে বৃদ্ধের বাসনা লক্ষ্য করে তাঁরা বিরক্ত হয়েছিলেন—সবকিছুকে উচিছষ্ট করার এ এক অনুচিত লোলুপতা। 'বেদ'-এর অচিন্ত্যকুমার রামকৃষ্ণের জীবনবেদকে যখন স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন, তখনও এ'রা তাকে অনধিকারচর্চা মনে করেছিলেন। এ'দের ধারণা, যে-খুঁটিতে একবার বাঁধা পড়েছো, চিরদিন তাতে বাঁধা থাকবে—তবেই না গলায়-দড়ি প্রগতিবাদ!

আমরা কিন্তু কম বুদ্ধিমান এবং রসলোভী, আমরা খুশি হয়েছিলুম। আমরা আরও জানতুম, অচিন্ত্যকুমার এই প্রথম ক্রিকেট লিখলেন না। এখন থেকে প'য়তাল্লিশ বছর আগে তিনি মৌচাক পত্রিকায় জার্ডিনের দলের সঙ্গে ভারতের টেস্টম্যাচের ও অন্যান্য খেলার বর্ণনায় কিছু পৃষ্ঠা ব্যয় করেছিলেন, যাদের আমি পূর্বে এক রচনায় বাংলা ক্রিকেট-সাহিত্যের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা বলে অভিহিত করেছিলুম। আমরা এও জানতুম, তারও অনেক বছর আগে সারদারঞ্জন রায় কি তাঁদেরই বংশের কেউ-কেউ ক্রিকেট সম্বন্ধে লিখেছেন। তবু অচিন্ত্যকুমারই এনেছিলেন খেলার সাদা-মাঠা বর্ণনায় রসের আমেজ। সেদিন 'নীল পাগড়ি-বাঁধা লাল সিংকে' ছুটতে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, 'যেন একটা রঙিন হরিণ, এমন দ্রুত অথচ লীলায়িত।' এবং 'নাইনথ্ উইকেটে ভেরিটির দীর্ঘায়ুতা প্রায় একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার।'

তারপরে অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল যুগ'-এ দেখিয়ে দিলেন, খেলার মধ্যে তিনি সহসাগত কেউ নন, এই আনন্দযজ্ঞে আমন্ত্রিত অনেকের একজন। মাতোয়ারা যৌবনের দিনগুলিতে কিভাবে তাঁরা মোহনবাগানের খেলা দেখতে ছুটতেন, তা জানলুম, এবং ঐ বইয়ে এমন কয়েকটি লাইন পেলুম যা কলকাতার ফুটবলের আনন্দে আদর্শে আবর্তিত একদা-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রেখাঙ্কন।

অনেকদিন পরে অচিন্ত্যকুমার আবার যখন ক্রিকেট লিখতে বসলেন, তখন তাঁর মেজাজ বদলে গেছে। এখন আর তিনি প্রভাতী মানুষটি নন, সায়াহ্ন-জীবনে এসেছেন—এখন যতখানি সাক্ষাৎ দেখা ততোধিক দূরদর্শন, অবিলম্ব-চর্বণার সঙ্গে সুখরোমন্থন একত্রে। অচিন্ত্যকুমার আর গতির উপাসক নন, অগতির গতিকে যেহেতু চিনতে চান। তাই তিনি ক্রিকেট-লেখায় আনলেন নতুন মাত্রা। ক্রিকেট নবদেবতা হয়ে উঠল, যার আছে নিজস্ব শাস্ত্র—অচিন্ত্যকুমার তারই সরস ভাষ্যকার হতে ইচ্ছুক। খেলা ও লীলার ভেদরেখা আর

তিনি মানছেন না, লীলাস্থলী ও খেলাস্থল এক হয়ে গেছে। তাই তাঁর লেখা ভরে গেল সুরে-সঙ্গীতে, রূপে-অলঙ্কারে, সূক্ষ্ম রসের কারিকুরিতে। এ-লেখা পড়তে হলে, ভুলতে হবে আপিস আদালত আছে, যে-কথা বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী-প্রসঙ্গে। মাঠের খেলা দেখতে-দেখতে অচিন্ত্য-কুমার লেখায় খেলতে লাগলেন, বলতে চাইলেন—ওরা খেলে বল নিয়ে, আমি খেলি শব্দ নিয়ে—আমি লেখক—শব্দই আমার বল—আমি শব্দ-সম্বল।

শেষ পর্যন্ত ক্রিকেট-দর্শনই ক্রিকেট-সাহিত্যে অচিন্ত্যকুমারের শ্রেষ্ঠ সমর্পণ। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের মুগ্ধ-মায়ার সঙ্গে ভারতীয় বৈরাগ্যমায়াকে বুনেছেন এক কাঠিতে। ক্রিকেটের চির অনিশ্চিত স্বভাব তাঁর কাছে 'পদ্মপত্রে জল', 'চলৎ ক্রিকেট-জীবনম্', 'নিঃশ্বাসেও সেখানে বিশ্বাস নেই', 'সেখানে কখনো সিংহাসন কখনো বনবাস', 'কখনো ব্রাডম্যান কখনো ব্যাডম্যান', 'যখন একজনের ঘর পোড়ে তখন অন্যজনে আগুন পোহায়।' বড় আনন্দে তিনি নব 'শূন্যপুরাণ' লিখে-ছেন—কত শূন্যে পূর্ণ হয়ে আছে রেকর্ড-বই দেখিয়েছেন খুলে-খুলে। সুতরাং টস্-নামক ব্যাপারটা—'বৈজ্ঞানিক খেলার অবৈজ্ঞানিক আরম্ভের' তাৎ-পর্য নিয়ে তিনি মোহিত। তারো বেশি চমৎকৃত—আম্পায়ারের আঙুলের দিকে তাকিয়ে, যার নড়াচড়ায় কত জীবনের শেষ আর কত জীবনের শুরু।

ক্রিকেটে যখন কিছুই ঠিক নেই, আজকের আমীরের কাল ফকির হওয়া অবধারিত, তখন খেলোয়াড়ের কর্তব্য কী? শব্দে-শব্দে নৃত্য করে ছুটে যায় অচিন্ত্যকুমারের কলহাস্যের বাণী: 'উদার হাতে দেদার মারো', 'চারে চারে হও সোচ্চার, মারে মারে হও ধুন্ধুমার', 'বলো, অক্কা তো পাবই, অন্তত ছক্কা মেরে যাই', 'মারো উল্কা-উজ্জ্বল মার', এমন মার, যাতে বল 'মাটিতে না পড়ে তারা হয়ে ফুটে থাকে আকাশে।'

মারতেই হবে তোমাকে, যখন তোমার 'শত্রু বল, যার খলের স্বভাব।' আর তোমার শত্রু আম্পায়ার! নিয়তি-দর্শনের উল্লাসে অচিন্ত্য বলেন:

'অসারে খলু সংসারে। যতদিন পারো ব্যাট চালিয়ে যাও। কখন আম্পায়ার আঙুল তুলে দেয় ঠিক নেই।'

ব্যাটের মতো বলেরও কথা অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, তবে কিছু কম আসক্তির সঙ্গে। উত্তেজিত কলমে কখনো লিখেছেন, বর্বর বলের কথা, যার নাম 'বীমার', যার 'উদ্দেশ্য উইকেট নয়—উইকেড।' অপরদিকে ভারতের ফাস্টবোলিং-চেষ্টার রূপকে ফুটিয়েছেন স্নিগ্ধ ব্যঙ্গে: ভারতের ফাস্টবোলিং—আহা—'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।' বিষাদ নিঃশ্বাস ফেলেছেন: একদিন আমাদের নিসার ছিল, এখন তা 'নিশার স্বপন।'

খেলাকে গোটাগুটি নিয়েছেন বলে মাঝে-মাঝে মাঠ ছেড়ে বাউণ্ডারি-প্রান্তে চোখ ছড়িয়েছেন তিনি, 'বিবাহের চেয়ে বড়ো'র মতো ক্রিকেটের চেয়ে বড়ো ক্রিকেট যেখানে খেলা হয়, মাঠের মার্-মার্ গর্জনের কোলে শোনা যায় কিছু-কিছু মার্মার—মধুগুঞ্জন—দেওয়া-নেওয়ার পালা-গান। মাঠের মধ্যে দেখা যায়, আগের ইনিংসে ব্যর্থ ব্যাটসম্যানের 'টায়ারলেস এফর্ট' রান-সন্ধানে, আর গ্যালারিতে বারে-বারে প্রত্যাখ্যাতা তরুণীর 'অ্যাটায়ারলেস এফর্ট'—স্বামী-সন্ধানে। মেডেন-ওভার পাওয়ার জন্য বোলারের চেষ্টা, মেডেন-ওভার হওয়ার

জন্য জয়ন্তীদের চেষ্টা—সকৌতুক কিন্তু সকরুণ। লেখকের তৈরী চোখ গ্যালারিতে অলরাউন্ডার মেয়েদের নানা খেলা দেখেছে—বেচারী তারা—'অল-রাউন্ডার হতে না পারলে আজকাল বিয়ে নেই মেয়েদের।' তবে সবটাই বিষণ্ণ অবসান নয়, সুন্দর সমাপনও ঘটে। অচিন্ত্যকুমারের চোখ পড়ে যায় মোহন-বাগানের মেয়ের দিকে—জনৈক মোহনকে বাগিয়ে, মোহনবাগানোর মেয়ে হয়ে, বাইরের খেলা ছেড়ে, যে চলে গেছে ঘরের খেলায়।

অচিন্ত্যকুমার দর্শকদের অবশ্যাই দেখেছেন। ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ দর্শকদের প্রতি তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি। 'তারা কত সাধ্যসাধনা, চুরিচামারি করে একখানি টিকেট পেয়েছে', তা কি ব্যাটিংয়ের 'খুক্‌খুকে কাশি' দেখবার জন্য? ওরা চায় উত্তেজনা উল্লাস। তোমরা ওদের নিরাশ করো না: 'দর্শকের মর্জিতেই ক্রিকেট। দর্শক যদি না দেখতে আসে, তবে কোথায় খেলা, কোথায় বা পৃথিবীর জীবননাট্য?'

তাই খেলো—খেলে যাও—ন্যায়ে ধর্মে—সুখে ঐশ্বর্যে—ভোগে ত্যাগে—বর্ণে রাগে—ক্রিকেট খেলে যাও। অচিন্ত্যকুমার এবার কবিতার কলম তুলে নিলেন:

'যতই দেখাও ভয়, ছুঁড়ে মারো বিদ্যুৎ-রকেট
করব না কভু মাথা হেঁট,
খেলে যাব, খেলে যাব, রঙিন ক্রিকেট।'

* * * খেলার রাজা কবির রাজা * * *

॥ ১ ॥

খেলা শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শীতের দুপুর। আকাশে উত্তরায়ণের সূর্য, সুখসেব্য উত্তাপ এবং মধুরোজ্জ্বল আলোক ছড়িয়ে। মর্ত্যের 'উত্তরায়ণের' সূর্য এই সবে এসেছেন মাঠে। শান্তিনিকেতনে ক্রিকেট-খেলা। সে খেলাকে নিত্যখেলার মহিমা দেবার জন্য মাঠে উপস্থিত রবীন্দ্রনাথ।

খেলাটি শান্তিনিকেতনের নতুন-পুরনো ছাত্র ও বন্ধুদের মধ্যে। কলকাতা থেকেও অনেকে এসেছেন। শালবনের পটভূমিকায় সামিয়ানার বর্ণগরিমায় উৎসবের উত্তাপ। চন্দ্রাতপের তলায় মর্ত্যরবি আসীন হলে যে-আকর্ষণ এত-ক্ষণ মাঠের মধ্যে ছিল তা বহুলাংশে সরে এল মাঠের বাইরে। যারা খেলা দেখছিল, এবার তারা রবীন্দ্রনাথকে বেশি করে দেখতে লাগল। যারা খেলছিল, তারা চেষ্টা করল খেলায় চোখ রেখেও গুরুদেবকে যতখানি পারা যায় দেখে নিতে। তারা জানত, 'খেলার রাজা' এতক্ষণ ছিল মাঠে, যার নাম ক্রিকেট, এখন কিন্তু মাঠের বাইরে, যার নাম রবীন্দ্রনাথ।

কয়েকদিন আগে খেলার মাঠে তাঁকে হাজির করার জন্য মেয়ের দল গিয়েছিল তাঁর কাছে। ছেলেরা ভয়ে এগোয়নি। কিন্তু মেয়েদের দাবি নিঃসঙ্কোচ।

'কি-গো বরবর্ণিনীরা, কি খবর?'—কবি শুধিয়েছিলেন সকৌতুকে।

'একটি প্রার্থনা আছে গুরুদেব।'

'প্রার্থনা? বৃদ্ধ কবির কাছে?—এই আধুনিকা বিনোদিনী দুলিয়ে যাঁরা চলেন বেণী—তাঁদের?'

'আপনাকে খেলার মাঠে যেতে হবে।'

'আ-হা-হা! খেলার মাঠ কোথায় নেই বলো আমার এই শান্তিনিকেতনে? সেখানে আবার কোন্ বিশেষ মাঠ বাছব, কোন্ বিশেষ খেলায় মাতব বলো এই বয়সে?'

'আপনাকে ক্রিকেট-মাঠে যেতে হবে।'

'সর্বনাশ! ক্রিকেট-মাঠে! ও বৌমা, শোনো শোনো, এরা বলে কি। বিশ্ব-কবিকে ক্রিকেট-মাঠে নামাবে।—ওরে ও হতভাগা বনমালী, গেলি কোথায়? অনিল, সুধাকান্ত, রথী, যাকে পারিস ডেকে আন্। খবরটা রয়টারে যাওয়া দরকার। দি পোয়েট অ্যাকসেপ্টস্ দি টিপিক্যাল ব্রিটিশ গেম—হি প্লেজ্ ক্রিকেট—অ্যাঁ! ওরে ও হতভাগা বনমালী, এখনো এলি না! বৌমা, একবার শুনে যাও—তোমার বাবামশায়ের সৌভাগ্যের বার্তা একবার কান ভরে শুনে যাও—'

'আমরা কোনো কথা শুনব না, আপনাকে যেতেই হচ্ছে।'

'যেতেই হচ্ছে। ইস্, কী জোর। তা তো হবেই। আগে ছিলে ভক্তির দাসী, এখন শক্তির ঈশ্বরী। তোমরা একালিনী, ভূকম্পনের বিগ্রহবতী, তোমাদের নমস্কার করি—

হায় কালিদাস, হায় ভবভূতি,
এই গতি আর এই সব জুতি
তোমাদের গজগামিনীর দিনে
কবিকল্পনায় নেয়নি তো চিনে;
কেনেনি ইস্টিশনের টিকেট;
হৃদয়ক্ষেত্রে খেলেনি ক্রিকেট
চণ্ডবেগের ডাণ্ডা গোলায়—'

'তাহলে তো আমাদের যথেষ্টই জানেন। এ-ক্ষেত্রে জোর করেই ধরে নিয়ে যেতে হয়—'

'ও বৌমা, কোথায় গেলে! কি দুর্দান্ত এরা! কবিবরণ নয়—একেবারে কবি-হরণ করতে এরা এল...এলেই যদি, বয়স থাকতে এলে না কেন...'

খেলা চলেছে মাঠে। রবীন্দ্র-একাদশ ব্যাটিং আরম্ভ করেছে। ইতিমধ্যে শাস্ত্রী-একাদশের ব্যাটিং শেষ হয়ে গেছে। গুরুদেবকে বুঝিয়ে দেওয়া হল, তাঁর দল এখন খেলছে। 'আমার দল?'—সবিস্ময়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'শীতোৎসবেও আমিই ঠাকুর্দা! বলো কি?' কবি কিন্তু দলীয় হতে পারলেন না কিছুতে। নিজ-দলের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী সব রসিকতা করতে লাগলেন। হাসির তরঙ্গ মাঠের তটে আঘাত করে উছলে উঠতে লাগল। শব্দে-শব্দে ধরা পড়তে লাগল ক্রিকেটের রূপের বাহার। কৌতুকের মাণিক্যের ঝিকিমিকিতে তার রসের পাত্র-খানি খচিত হয়ে উঠল মহাশিল্পীর প্রতিভাস্পর্শে।

কোন্ ব্যাটসম্যান ব্যাট করছে, দূর থেকে ঠাহর করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গুরু-দেব জিজ্ঞাসা করলেন—'দণ্ডপাণিটি কে?' উল্টোদিকে যে-ষণ্ডামার্কা বোলার ছুটতে শুরু করেছে, সেই 'বলবর্দ' তার ভাবগতিকের জন্য মোটেই তাঁর সহানু-ভূতি পেল না। কিন্তু দেখা গেল, বোলার যদি হয় দারুণ, ব্যাটসম্যান দারুণতর।

পিটিয়ে-পিটিয়ে ছারখার করে দিল যেন। 'সুখের ঘরে মহামারী'—গুরুদেব বললেন। গুরুদেবের দলের সমর্থকেরা দারুণ উল্লসিত। স্বয়ং তিনিও। কিছু বিষণ্ণ শাস্ত্রী-মহাশয়কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'শান্তিপাঠের ব্যবস্থা করলে হয় না?' স্বর নামিয়ে শাস্ত্রীপক্ষীয় উৎসাহী এক সমর্থককে খোঁচা দিলেন, 'আরে বাপু, শান্তিপাঠে কি মহামারীকে এড়ানো যায়?'

কিন্তু 'মহামারী' হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে গেল 'বলাবিবির' দয়ায়। বেশি উৎসাহী হয়ে বোহিসেবী মার দিতে গিয়ে সে ধরা পড়ে গেল—কট্। তার খেলায় গর্বিত, ও তার বিদায়ে বিষণ্ণ কবিগুরু বললেন, 'হঠাৎ কটাৎ বিদায়, কি বলিস?' উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করে নিলেন, 'ক্যাচক'টি কে?

এরপরে যে 'ব্যাটব্যাল' নামল সে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল প্রথম বলেই একইভাবে 'কটাৎ' হয়ে গিয়ে। পর-পর বলে পর-পর উইকেট। মাঠ মাতোয়ারা। কবিগুরুকে সচেতন করিয়ে দিল জনৈক 'ক্রিকিট'*—এইবার একটা মহাকান্ড হতে যাচ্ছে, পর-পর তিন বলে তিনজন আউট হলেই হ্যাটট্রিক, যা সহজে হয় না। এবার গুরুদেবের স্থৈর্যও যেন নাড়া খেল। অতীব উৎসুক হয়ে বারবার বলতে লাগলেন, 'কি হয়! কি হয়! এ কী চঞ্চলতা অকারণে।...না না, অকারণ কেন! হ্যাটট্রিক কি সহজে হয়? ও হে ক্রিকিট, তোমার রেকর্ড বাজিয়ে শোনাও তো হ্যাটট্রিকের ইতিহাস।...হ্যাটের তলায় কোন্ ট্রিক রয়েছে কে জানে...অঘটনটা ঘটবে তো...!'

নতুন ব্যাটসম্যান কিন্তু খুবই তেজী। অপরদিকে বোলারও সাফল্যে পরাক্রান্ত। নতুন ব্যাটসম্যান 'হুক' মারতে ওস্তাদ। 'বলবীর সিং, হুক্কাহুয়াটাকে বল ছুঁড়ে ভাগিয়ে দাও'—গুরুদেব পর্যন্ত সাধারণ দর্শকের মতোই উত্তেজিত। সেই সঙ্গে বীণানিন্দিত সুরে বললেন, 'মহাবলী, বল দাও বল দাও।'

'বলটি আমার নাচেরে এবার'—এই ভাব নিয়ে 'মহাবলী' বাম্পার† ছাড়ল, 'ব্যাটচন্দর'ও লাফিয়ে উঠে ঘ্যাক্ করে হুকিয়ে দিল, কিন্তু একটু সময়ের ভুলে বলটি উঠে পড়ল উঁচুতে—ভাসতে-ভাসতে গিয়ে হাজির হল মাঠের প্রায় শেষপ্রান্তে—সেখানে যে-ফিল্ডারটি ছিল, সে এতক্ষণ মুগ্ধ ছিল মাঠ-বহির্ভূত প্রকৃতিমায়ায়; হঠাৎ আহবানে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এদিক-ওদিক নড়াচড়া করল, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করল না লোফার। 'লোফার!'—সারা মাঠ হায়-হায় করছে, তার মধ্যে গুরুদেবের মুখে প্রথম অর্ধ-অশালীন শব্দ শুনল শান্তিনিকেতন।

হ্যাটট্রিক হল না, উত্তেজনা কিছু কমল কালক্রমে, তখন একজন অনুযোগ

---

*শব্দটি কবিগুরুর দান। ক্রিকেটেও ক্রিটিক হয় শুনে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর স্তম্ভিত হয়েছিলেন যখন শুনেছিলেন যে, ক্রিকেটের রাশি-রাশি বইয়ের মধ্যে কেউ ডুবে থাকতে পারে। সুতরাং ক্রিকেট ও ক্রিটিক মিশে 'ক্রিকিট' হল, যার মধ্যে 'কীট' শব্দের ইঙ্গিত অপ্রত্যক্ষ নয়।

†এই বাম্পারটি দেখে 'ক্রিকিট' খুব বিষণ্ণ হলেন। হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেখানে তৃতীয় বলে উইকেট আক্রমণ করাই রীতি। বাম্পারে ডুব দিয়ে ব্যাটসম্যান সহজেই বল ছেড়ে দিতে পারে—একথা তিনি পরে খুবই ক্ষুণ্ণভাবে জানিয়েছিলেন।

করল কবির কাছে, 'আপনি করছিলেন কি! নিজের দলের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক চাইছিলেন!'
'তাই তো বটে! তাই তো বটে!'—শুভ্র কেশ-রেশমের মধ্যে চাঁপার আঙুল নড়াচড়া করে সংকোচে। তার পরেই—'আরে বাপু, আমি হলুম গিয়ে বিশ্বকবি। কবি কি লেখেননি, সব ঠাঁই মোর ঘর আছে? তোরা শান্তিনিকেতনে থেকেও রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়লি না...'

'এবার একবার নামতে হবে মাঠে গুরুদেবকে।' ক্রীড়া-উৎসব পূর্ণাঙ্গ হবে না খেলার রাজার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ভিন্ন। গোড়ায় তিনি একটু আম্পায়ারের কাজ করুন না কেন!
'তা আমাকে ঠিক-ঠিক করতে হবে কি?'
'কিছু নয়, শুধু বলে দেবেন, আউট কি আউট নয়।'
চোখের কোণে আলোর দ্যুতি নিয়ে বললেন, 'না না, ওসব পারব না, আমি আউট করে দেব কাউকে, তা কি হয়—'
'আপনাকে নিজে থেকে কিছু করতে হবে না। আমরা যা বলে দেব, তাই করবেন।'
'চল্ বাবা চল্; যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ চঞ্চল—
যদি দেখ খোলসটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের,
যদি দেখ চপলতা
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের—
—চল্ বাবা চল্। তোরাই চালক এখন আমার।'

সেই সুদীর্ঘ সুগোর দেহ, সেই শালবনরাজিনীলা ভুবনের শালপ্রাংশু মহিমা, শুভ্র শমশ্রুকেশ এবং আপাদলম্বিত আলখাল্লা, সেই চলমান গিরি-শিখরের আকার। অবশেষে গুরুদেব ক্রিকেটের আম্পায়ার!
গুরুদেব দাঁড়িয়ে রইলেন। খেলা চলতে লাগল তাঁকে ঘিরে। ঘুরেছে ব্যাট, ছুটেছে বল, উড়েছে বেল—প্রাণে উদ্বেল—মাঠ। এরই মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য একবার খেলা থেমেছিল, কারণ খেলার বল হারিয়ে গেছল। বলটা ও'র দিকে ছুটে এসেছিল। বলটা ধরতে উনি নীচুও হয়েছিলেন। কিন্তু বোধহয় ও'র পাশ দিয়ে বেরিয়ে মাঠের বাইরে চলে গেছে। নইলে বলটা পাওয়া গেল না কেন? উনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চারিদিক সন্ধান করলেন, নিজের আলখাল্লা পর্যন্ত হাতড়ালেন। পাওয়া গেল না। অগত্যা নতুন বল নিয়ে খেলা চালাতে হল।
গুরুদেবকে কিন্তু কঠোর কর্তব্য পালন করতে হচ্ছিল, কারণ আউট দিতে হচ্ছিল নিজের খেলোয়াড়দেরই। বেশি লোভে হাঁকড়াতে গিয়ে যে কট্ হল, তাকে বললেন, 'তোর লোফাৎ পতন।' আম্পায়ারের নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন করে একজন ব্যাটসম্যানকে 'ব্যাটারি'র বৈদ্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে সাবধান করে দিলেন! 'ব্যাটারি' অর্থাৎ ব্যাটের অরি, বোলার। যে আনাড়ির মতো খেলে আউট হল,

তাকে বললেন, 'তুই ড্যাংগুলিও ভুললি, ক্রিকেটও শিখলি না।' যে গোল্লা করল, সে নাকি এ-বিষয়ে পারদর্শী, তাকে বললেন, 'শূন্যেরে করেছ পূর্ণ—যাও বৎস!'

আকাশ পৃথিবী মিশেছে যেখানে, সেই দিগন্তের দিকে উত্তোলিত গুরুদেবের অমোঘ অঙ্গুলী-নির্দেশ যখন একে-একে নিজ-দলের খেলোয়াড়দের বিদায় দিয়ে-দিয়ে 'রবি-দল' শেষ করে এনেছে—যখন একমাত্র বাকি আছেন স্বয়ং তিনি--তখন খেলার পরিস্থিতি উত্তেজনার চূড়ায়। শাস্ত্রী-দলের সঙ্গে রবি-দলের পাঁচ রানের ব্যবধান। হাতে একটি উইকেট। অবশিষ্ট...রবীন্দ্রনাথ!

'এবার আপনাকে নামতে হবে।'

'বলিস কি রে? বাদ রইল কি? তা যা বলিস—'

রবীন্দ্রনাথ ব্যাটখানি তুলে নিলেন।—আমার এ ব্যাটখানি কি জানি কি সৃষ্টি করে!

সাদা আগুনের শিখার মতো রূপ ধরল ব্যাটখানি দূর থেকে রবীন্দ্রনাথের হাতে। গুন্‌গুন্‌ করে গাইতে লাগলেন, 'সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্‌ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ, ওগো খেলার সাথি।'

একটি বল ছুটে এল এবার তাঁর পদাবলী লক্ষ্য করে। তিনি একটু ঝুঁকে চকিতে ঘুরিয়ে দিলেন কব্জি—বলটি ছুটল বাউন্ডারি-লক্ষ্যে। ও-হো-হো—বাউন্ডারি, প্রথম বলেই, লেগ-গ্লান্সে, অর্থাৎ গুরুদেবের 'চরণে-নয়ন' মারে। আর এক রান হলেই 'টাই', দু'রান হলেই জয়। রানটি, কিংবা রান-দুটি হবে কি?

বলটি পড়ল অফের দিকে, বাঁকল—একটা শব্দ—তারপরে মাঠ স্তব্ধ—বেদনায় মুহ্যমান।

স্তব্ধতার বুকে স্নিগ্ধ সকৌতুক কণ্ঠ খেলে গেল হঠাৎ-ভাঙা বাসন্তী বাতাসের মতো—

'প্রশান্ত, বলটি আমাকে প্রতারণা করে উইকেটের হৃদয় ভেঙে চলে গেল।'

সবাই ছুটে এল মাঠের মধ্যে। গুরুদেব না-পেরে আউট হলেন, না-কি ইচ্ছে করে ছেড়ে দিলেন! সবাই ছি-ছি করতে লাগল বোলারকে। সব ধিক্কার থেমে গেল একটি গানে—

মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে,
জানি আমরা পারব না।
হারাও যদি হারব খেলায়
তোমার খেলা ছাড়ব না।

খেলা-শেষে সবাই কিছু শুনতে চাইল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমরা যারা এসেছ আমার জীবনের সায়াহ্নবেলায় বল ব্যাট নিয়ে আমার কাছে, তোমাদের সবুজ খেলার লীলায় প্রাণভরে যোগ দেব, এমন সামর্থ্য আমার নেই। বিধাতা অকৃপণ হাতে আমাকে যা দিয়েছিলেন, তা হরণ করেছেন নিষ্ঠুরের মতো। তবু যা দেখলেম, তোমাদের আনন্দতরঙ্গের জলস্পর্শ করে যা পেলেম, তাকে ধন্য মানি। আবার দাঁড়ালেম আমি খেলা ও লীলার মোহানার তটে, ভৈরবী আর

পূরবী একাকার হয়ে গেল পারাবারের শেষ খেয়ায়। একদিন যা লিখেছিলাম, তাকেই একটু বদল করে তোমাদের বলি—

সকাল বিকেল খেলার মাঠে আসি
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালবাসি,
ব্যস্ত হয়ে ওরা খেলে চলে,
কেউ বা আসে—আউট হয়ে কেউ বা যায় চলে।
সকাল থেকে কেউ বা ব্যাট করে,
ক্ষণকালের ভুলের মারে হঠাৎ কেউ মরে।

খেলাচ্ছবির এই যে মূর্তিখানি
মনেতে দেয় আনি
নিত্যকালের নিত্যভোলার ভাষা
কেবল যাওয়া-আসা।
মণ্ডতলে দণ্ডে পলে ভিড় জমা হয় কত—
উঁচুতে দেয় আঙুল তুলে, কে কোথা হয় গত!

॥ ২ ॥

সুরসিক পাঠক-কুলকে বলে দিতে হবে না যে, সম্পূর্ণ অবাস্তব একটি গল্প ফেঁদেছি আমি। অবাস্তব এবং কুরচিত। মোটেই ভালভাবে লেখা হয়নি। হওয়া উচিত ছিল, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে যেখানে খেলা করা হয়েছে। কিন্তু দোষটা সম্পূর্ণ আমার নয়। ঘটনাটি যদিও অবাস্তব তবু একেবারে ভিত্তিহীন নয়। এটা স্বপ্ন-কাহিনী। আসলে রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট-খেলার স্বপ্নই দেখেছিলুম আমি। স্বপ্নে ঘটনার ধারাবাহিকতা বা সঙ্গতি থাকে না। তার উপরে, সেখানে যা দেখা যায়, পরে তা সবটা মনেও থাকে না। ঐ অপূর্ব স্বপ্নের সবটা আমিও মনে রাখতে পারিনি। ফলে কিছু কিছু পুনর্গঠন করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মুখে যে-সব ক্রিকেটের নব-শব্দ বসিয়েছি, তার সবগুলি তিনি ঠিক ঐ ভাবেই বলেছিলেন মনে হয় না। অনেকটা ঐ ধরনের বলেছিলেন এই পর্যন্ত। কিন্তু বেশ মনে আছে, রংমশালের মতো শব্দের আলো আর ফুল ঝরেছিল তাঁর মুখ থেকে। সে এমন এক সৃষ্টি যে পরে যখন নেভিল কার্ডাসের সঙ্গে আমার দেখা হল (ঐ স্বপ্নেই), তিনি খুব দুঃখ করলেন, টাগোর ক্রিকেট খেললেন, অথচ তিনি উপস্থিত থাকতে পারলেন না। স্বপ্নের উপরে কারো হাত নেই, এই কথা মনে রেখে স্পর্শকাতর রবীন্দ্র-ভক্তেরা এই প্রগল্‌ভ লেখককে ক্ষমা করবেন বলে বিশ্বাস করি।

কিন্তু হঠাৎ এমন স্বপ্নদর্শন কেন? কারণ, রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট খেলার উপরে একটি প্রবন্ধ রচনার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের। শ্রীযুক্ত রবি বসুর অভিপ্রায়ে সেই লেখাটি উল্টোরথের পাঠক-পাঠিকার উপরে নিক্ষেপের মনস্থ করেছিলুম। কিছু কিছু তথ্য-সংগ্রহও করেছিলুম। আমার মনে ছিল, কয়েক বৎসর আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বিতর্কের কথা—'রবীন্দ্রনাথ কি ক্রিকেট খেলতেন?'

একটি কৌতুকজনক বিষয় মনে পড়ছে এখানে। আনন্দবাজারে ঐ বিতর্কটি হবার তিন বছর আগে আমি আমার জীবনের প্রথম ক্রিকেট লেখা লিখেছিলুম একটি কলেজ-পত্রিকায়। তার আরম্ভে জনৈক বিখ্যাত কবির ক্রিকেট খেলার কথা ছিল, যিনি 'সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায়' গানটি গেয়েছিলেন, এবং স্পিন-বলে আউট হয়ে বলেছিলেন যে, বলটি প্রতারণা করে উইকেটের হৃদয় ভেঙে চলে গেছে। পাঠক লক্ষ্য করেছেন, আমার স্বপ্নের রবীন্দ্রনাথ একই জাতীয় কথা বলেছেন। তার হেতু, আর কিছু নয়, আমার ঐ প্রথম লেখায় আমি রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট-খেলা নিয়ে প্রচলিত একটা কৌতুক-গল্পকেই নাম বাদ দিয়ে পরিবেশন করেছিলুম।* তখন জানতুম না যে, ঐ গল্পটিই সত্য ইতি-হাসের দাবি নিয়ে সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠার স্বারস্থ হবে।

ব্যাপারটার শুরু আমেরিকার 'লাইফ' পত্রিকার একটি লেখা থেকে। ১৯৬১ সালের জুন মাসে ঐ পত্রিকায় শ্রীমতী শান্তা রামারাও রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক এক রচনায় লেখেন যে, 'পরিণত বয়সে কবি ক্রিকেটে পারদর্শী হবার উদ্দেশ্যে খেলা শুরু করেন, কিন্তু খেলার কায়দা আয়ত্ত করতে না পেরে তিনি খেদোক্তি করে বললেন—ক্রিকেট আমার কাছে ভ্রান্তির সৃষ্টি করে।' এই অদ্ভুত তথ্যটি স্বভাবতই 'অদ্ভুতাচার্যের' দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। সুতরাং তিনি ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে আনন্দবাজারের ভারত-ইংলণ্ড টেস্ট-ক্রোড়পত্রের জন্য ঐ বিষয়ে ক্ষুদ্র লেখা উপস্থিত করলেন। লেখাটি প্রকাশের আগে শ্রীযুক্ত মুকুল দত্তের সঙ্গে আমার আলাপের বিষয়ে মনে আছে। লেখাটি যে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করবে, আমরা একমত হয়েছিলুম।

শ্রীমতী রামারাও-এর লেখাটির উল্লেখ করবার পরে অদ্ভুতাচার্য লেখেন :

"কবি সম্পর্কে এই বিচিত্র তথ্যের সূত্রধার কবির প্রাক্তন একান্তসচিব, শিক্ষা-ব্রতী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দকে এক পত্র লেখা হয়, সঠিক খবর জানবার উদ্দেশ্যে। পত্রের উত্তরে শ্রীচন্দ দিল্লী থেকে জানালেন, প্রবন্ধটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং কবির ক্রিকেট-খেলার কথায় তিনি নিজেও আশ্চর্যবোধ করেছেন। এ-বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। উৎসাহী পত্রলেখক হতাশ হয়ে নিউইয়র্কে পত্র লিখলেন লেখিকাকে। লেখিকা উত্তরে জানালেন, এ তথ্য তিনি পেয়েছেন শ্রীচন্দের কাছ থেকেই। শ্রীচন্দ আবার এ-সংবাদ পেয়েছেন অধ্যাপক মহলানবিশের কাছ থেকে। লেখিকা শুনে পরিবেশন করেছেন মাত্র।"

অদ্ভুতাচার্য তাঁর লেখায় শ্রীমতী রামারাও-প্রদত্ত তথ্যের সত্যতায় সন্দেহ-প্রকাশ করেছেন।

এর পরে অদ্ভুতাচার্যের এবং বাংলাদেশের পাঠকদের সন্দেহ-ভঞ্জন করবার জন্য এগিয়ে এলেন শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের

*এই জাতীয় আরও একটি কথা আমাদের মুখে মুখে ফিরত। ইংরেজীর জনৈক বিখ্যাত অধ্যাপক ফুটবল-মাঠে ভাবোচ্ছ্বাসভরে যা বলেছিলেন, অনুবাদে তা অনেকটা এই রকম—

'পশ্য! পশ্য! বায়ু-বিস্ফারিত চর্ম-গোলকটি সবুট পদাঘাতে ভীম বেগে উর্ধ্বোৎ-ক্ষিপ্ত।'

নয়, প্রথম বয়সের (?) ক্রিকেট-শিক্ষার বিষয়ে অতীব আকর্ষণীয় তথ্য পরিবেশন করলেন আনন্দবাজারে ৩।১।৬২ তারিখে প্রকাশিত পত্রে। চিঠিটির প্রয়োজনীয় অংশ :

"...এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট-খেলা সম্পর্কে যা-যা দেখেছি লিখলাম। ১৯নং স্টোর রোডে (বালীগঞ্জ) স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় থাকতেন। তিনি তাঁর পেনসনের সমস্ত টাকাটাই দেশের জন্য খরচ করতেন। বিশেষ করে পালোয়ানদের ও লাঠিয়ালদের মাহিনা দিয়ে দক্ষিণ কলকাতার ছোট-ছোট ছেলেদের সংগঠন ও শক্তিশালী করতেন। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো থেকে সপ্তাহে তিন দিন নিয়মিত এসে খেলায় যোগ দিতেন।

"১৯নং স্টোর রোডের সামনেই মিলিটারী মাঠ; সেই মাঠের একপাশে তখনকার দিনের ভারত-বিখ্যাত সাহেবদের ক্রিকেট-ক্লাব। ঐ ক্লাবে ভারতীয়দের সভ্য হবার কোন উপায় ছিল না, তাঁরা যতই বড় হউন না কেন।

"কোনো একদিন ঐ ক্লাবের ক্রিকেট-খেলা দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজদাদাকে বলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ম্যানেজার মিঃ ভোগেল এবং আমাকে ব্যাট, বল, নেট প্রভৃতি কিনতে পাঠিয়েছিলেন। ঐ সঙ্গে বলে দেন—ভারতীয় দোকান থেকে জিনিস কিনতে। আমরা এস্‌প্লানেডের উত্তর দিকের দোকান থেকে সমস্ত জিনিস কিনে ফিরি। তার পরদিন থেকেই খেলা আরম্ভ হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দুই জন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে মাইনে দিয়ে খেলা শিখাবার জন্য নিযুক্ত করলেন। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো থেকে প্রত্যহই খেলা দেখতে ও খেলতে আসতেন। রবীন্দ্রনাথের এই খেলা কিন্তু মোটেই ভাল লাগেনি। তার কারণ একদিন খেলতে-খেলতে একটা বল তাঁর পায়ে লাগে এবং তিনি জখম হন। তাছাড়া ক্রিকেট খেলার যা বিশেষ দরকার, তা তাঁর ছিল না। অর্থাৎ তিনি তাঁর মন ও চোখ ঠিক রাখতে পারতেন না। প্রায় তিন মাস পরে ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় খেলা লাঠি নিয়ে থাকতেন। তাঁর দাদা অবশ্য বৃদ্ধ বয়সেও ক্রিকেট খেলতেন।"

রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট-খেলা বিষয়ে এবার আর কোনো সন্দেহ রইল না। একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। পত্রলেখক স্বয়ং এই খেলার সহায়ক। শুধু তাই নয়, তিনি ক্রিকেট-ব্যাপারটি জানেন, কেন না তিনি ক্রিকেটের পরিভাষায় কথা বলেছেন। ক্রিকেটের ব্যাপারে চোখ ও মনের জৈবিক সংযোগ প্রয়োজন, এবং রবীন্দ্রনাথের তা ছিল না বলেই (মন চায় চক্ষু না চায়) তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেননি, এ-কথা অকুণ্ঠে জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, পত্রলেখকের মতানুযায়ী, ক্রিকেট মাঠেও রোমাণ্টিক অনির্দেশ্যতায় আচ্ছন্ন থাকতেন। অবশ্য সেই একই রবীন্দ্রনাথ কি করে লাঠি খেলতেন, বুঝতে পারছি না, যেখানে চোখ ও মনের সামান্যতম বি-সংযোগে লাঠির বাড়ি নিজের বা অপরের মাথায় পড়ার কথা।

রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট-খেলা ছেড়ে দেওয়ার যে-কারণ পত্রলেখক জানিয়েছেন—সেই একই কারণে জগতের বহু বড়-বড় ক্রিকেটার খেলা ছেড়ে দেন, তা আর কিছু নয়, আঘাত পাওয়া। রবীন্দ্রনাথের 'সর্বজনবন্দনীয়' চরণ আহত হয়েছিল বলের দ্বারা। 'প্র-বলের উদ্ধত অন্যায়' রবীন্দ্রনাথ তখন পছন্দ করেননি। পরেও

নয়।

শ্রীযুক্ত রায়ের চিঠিতে একটি দরকারী সংবাদ নেই—কোন্ সময়ে ঐ ক্রিকেট ব্যাপারটি ঘটেছিল? অনুমান করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের পরিণত যৌবন-কালে বা চল্লিশের আশেপাশের সময়ে। কারণ, শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট-আসক্তি ছিল না, এ-কথা আমরা জেনেছি। আমার অনুমান, যদি ব্যাপারটি সত্যই ঘটে থাকে, তাহলে ১৮৯৮-৯৯ সাল নাগাদ বা কিছু পরে ঘটেছিল, কারণ ঐ সময়ে দেখতে পাই, সত্যেন্দ্রনাথের বালী-গঞ্জের বাড়িতে নানা শ্রেণীর মানুষের সম্মিলন, নানা ইচ্ছা ও চেষ্টার সমাবেশ। ভগিনী নিবেদিতা একটি সাইকেল উপহার পেয়ে পরমানন্দে ঐ বাড়ির মাঠে চালাচ্ছেন, এ-সব তথ্য আমরা নিবেদিতার চিঠি থেকে পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট-চেষ্টা কি যৌবনেই সমাপ্ত? নতুন তথ্য নিয়ে আর একটি চিঠি বেরুল আনন্দবাজারে ৯।১।৬২ তারিখে। লেখক শ্রীদাশরথি ঘোষ। তিনি লিখলেন—

"...এই প্রসঙ্গে আপনাকে এবং আচার্য মহাশয়কে শ্রীব্রহ্মণ্যভূষণ ও শ্রীমতী ক্ষমা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'কবিগুরুর ক্রিকেট-খেলা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ক্রিকেট-খেলার স্থান গোমো জংসন।

"এই প্রবন্ধে লেখক ও লেখিকা খেলার সরঞ্জাম ও খেলোয়াড়দের কৌতু-হলোদ্দীপক বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু খেলার বিস্তৃত বিবরণ কিছু দেন নাই। খেলায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন, আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী, সর্বশ্রী ধীরেন সেন, অনিল চন্দ ও আরও অনেকে।

"প্রবন্ধটির শেষ হইয়াছে এই বলিয়া—'খেলা শুরু হইল; প্রথমে ব্যাট ধরিলেন মহারাজা কুচবিহার। পরের কাহিনী পরে।' কিন্তু পরের কাহিনী অনেক খুঁজিয়াও পাই নাই।"

পরের কাহিনী কেন, আগের কাহিনীও আমরা পাইনি। ব্রহ্মণ্যভূষণ ও ক্ষমা বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত প্রবন্ধটি কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল ঘোষ মহাশয় জানাননি, এবং আমরা নানা সন্ধান করেও সেটি পাইনি। মাসিক বসুমতীতে নাকি এই জাতীয় একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, এই সংবাদ পেয়ে সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটকের নিকট জিজ্ঞাসা করি: তিনি 'হতে পারে' বলায় ঐ কালের বেশ কয়েক বৎসরের বসুমতী খুঁজি, কিন্তু লেখাটি মেলেনি।

শ্রীদাশরথি ঘোষের পত্রে প্রদত্ত সংবাদে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত হতে পারেননি 'অম্ভূতাচার্য'। ১২।২।৬২ তারিখে আনন্দবাজারে তিনি পুনশ্চ লেখেন, 'স্বভাবতই শ্রীঘোষ-উল্লিখিত প্রবন্ধের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় আছে। শ্রীঘোষ-উল্লিখিত উক্ত প্রবন্ধে কবির লেখার দর্শক হিসাবে যাঁদের নাম করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন এবং বিধুশেখর পরলোকে। অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীধীরেন সেন এবং শ্রীঅনিলকুমার চন্দ।' শ্রীঅনিল চন্দ যে বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন, এ-কথাও পুনরায় জানালেন ঐ পত্রে অম্ভূতাচার্য।

এ ব্যাপারে আমি ১৯১০ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের অধিবাসী শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করলুম। তিনি জানালেন, ঐকালের মধ্যে ক্রিকেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগাযোগ তাঁর জানত ঘটেনি।

ফ্ুটবল-মাঠে দর্শক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ হয়তো দ্ু-একবার গিয়েছেন, কিন্তু ক্রিকেট-মাঠে নয়, যদিও শান্তিনিকেতনে ক্রিকেট-খেলা হত। শ্রীদাশরথি ঘোষ গোমো স্টেশনে রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট-খেলার বিষয়ে যে-উল্লেখের উল্লেখ করেছেন, তার বিষয়ে প্রমথবাব্ু বললেন, ক্ুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের বন্ধ্ুত্ব ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ধীরেন্দ্র সেন বা অনিল চন্দের নামোল্লেখ থাকায় ঐ ক্ুচবিহারের মহারাজ রবীন্দ্রনাথের বন্ধ্ু ক্ুচবিহারের মহারাজ হতে পারেন না। বিশী-মহাশয় অবশ্য যোগ করে দিলেন, কবির খ্ুশিতে রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছ্ু করতে পারেন, সেখানে অন্ুরোধে একবার মাঠে ব্যাট ধরে দাঁড়ানো আর আশ্চর্য কি!

ব্যাপারটির মীমাংসা হল না। অধিকতর সংবাদ প্রার্থনা করে শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় ও শ্রীদাশরথি ঘোষের ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে খেলাধ্ুলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতির বিষয়ে তথ্য-সংগ্রহেরও চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্র-জীবনীতে এবিষয়ে অল্প-কিছ্ু আছে, এবং রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর সময়ে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় একটি লেখাও এই প্রসঙ্গে বেরিয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রবীন্দ্রনাথ পাকা লোকের কাছে বাল্যে ক্ুস্তী ও ব্যায়ামাদি করেছেন আদা-ছোলা খেয়ে; ব্যায়ামোত্তর অঙ্গমর্দনাদিও বাদ যায়-নি। এই সময়ে শরীরটা তাঁর এতই ভাল ছিল যে, গ্ৃহ-শিক্ষকের কাছ থেকে অব্যাহতির মহৌষধ অস্ুখ-বিস্ুখের স্ুযোগ কখনো পাননি। হিমালয়ে তাঁর ভ্রমণ ও শিকারচেষ্টা এবং পদ্মায় সাঁতারের কথা শোনা গেছে। বিখ্যাত সাঁতার্ু প্রফ্ুল্ল ঘোষকে নিয়ে তিনি কিভাবে শিলাইদহে নদীতে সাঁতার দিচ্ছিলেন এবং তাঁর জীবনাশঙ্কায় কর্মচারীরা নৌকা করে পিছনে-পিছনে ধাওয়া করে-ছিল, তার কথাও শোনা গেছে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষানীতির মধ্যেও খেলা-ধ্ুলার স্থান ছিল এবং বিশ্বভারতীর আদর্শ অন্ুসারে তিনি জাতীয় ও আন্ত-র্জাতিক খেলাধ্ুলার সমাবেশ সেখানে করেছিলেন, যেমন, ক্ুস্তী, কপাটি, লাঠিখেলা, ছোরাখেলার সঙ্গে ইউরোপীয় ফ্ুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, বক্সিং এবং মঙ্গোলীয় য্ুয্ুৎস্ু।

শান্তিনিকেতনের কাছে সাহিত্যপ্রীতির ব্যাপারে ঋণস্বীকার অনেকে করে-ছেন। এখানে জানিয়ে রাখি, খেলাধ্ুলার ক্ষেত্রে অন্তত একজন তা করেছেন, তিনি হলেন অতীতের শ্রুতকীর্তি ফ্ুটবল-খেলোয়াড়, শান্তিনিকেতনের ছাত্র স্ুর্য চক্রবর্তী।

॥ ৩ ॥

না, অজ্ঞানে আমাদের অধিকার নেই। উল্টোরথ পত্রিকায় আমার এই লেখাটি বের্ুবার পরে আমার সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন প্রীতিভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমলক্ুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি মাসিক বস্ুমতীর আষাঢ় ১৩৬২ সংখ্যা থেকে শ্রীব্রহ্মণ্যভ্ুষণ ও শ্রীমতী ক্ষমা বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "কবিগ্ুর্ুর ক্রিকেট খেলা" লেখাটি সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেটি—হা হতোস্মি! হে ঈশ্বর! মাই গড্! অপ্ুর্ব একটি রসরচনা!—কদাপি ইতিকথা নয়। আমরা অবশ্য ইদানীং এত সিরিয়াস হয়ে উঠেছি যে, রসিকতা ব্ুঝতে নোটবই লাগে। যাই হোক, তথাপি-রসিক পাঠক-পাঠিকারা যাতে ঐ লেখাটি উপভোগ করতে

পারেন, সেজন্য তার একটা বড়ো অংশ তুলে ধরছি। শ্রীব্রহ্মণ্যভূষণ এবং শ্রীমতী ক্ষমা যে, শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত, সহজেই বোঝা যায়।

ভবিষ্যতের রবীন্দ্র-গবেষকগণের উপকারার্থে প্রদত্ত 'রবীন্দ্রনাথের একদিনের খেলার' উক্ত বিবরণের গোড়ায় আছে, রবীন্দ্রনাথ একদা গোমো-স্টেশনের প্ল্যাট-ফর্মে পাদচারণকালে কোনো যুবকের নজরুলীগান 'ক্রিকেট এসো এসো ডাকিছ মোরে ভাই' শুনে স্থির করে ফেলেন তিনি ক্রিকেট খেলবেন—গোমোতেই। লেখক-লেখিকাদ্বয় উদারভাবে জানিয়েছেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যে-কবি "কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে ঋতুরঙ্গ দেখাইয়াছেন, নিদারুণ গ্রীষ্মেও হৈমন্তিক আবহাওয়া বহাইয়াছেন, বৈশাখের রুদ্র তেজের মধ্যেও সংগীত ও নৃত্যদ্বারা শীতের নাচন লাগাইয়াছেন, তিনি যে সুকোমল তরুণ-তরুণীদের লইয়া 'টেগোর ওয়ান্ডারার্স' তৈয়ারি করিবেন কিংবা গোমোতেই ক্রীড়াক্ষেত্র করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি!"

এর পরে আমি কল্পকুহকভরা ঐ অনবদ্য রচনাটি উদ্ধৃত করছি, অল্পস্বল্প বাদ দিয়ে :

"সব আয়োজন হইয়াছে। মাঠ ঠিক হইয়াছে, স্টেশন হইতে অদূরে ছোট পাহাড়টি পার হইয়া গেলে যে-উপত্যকা পড়ে, সেইখানে। উপত্যকার একদিকে পাহাড়শ্রেণী, অপর দিকে পার্বত্য স্রোতস্বিনী জামুয়া। উপত্যকার এক প্রান্তে কবির শিবির, অপর প্রান্তে রাজন্যবর্গের তাঁবু।

"বলা হয় নাই,...অপর পক্ষ প্রিন্সেস ইলেভন্। পাতিয়ালা, পতৌদি, দলীপ সিংহজী ও আরো অনেকে নিজ-নিজ প্লেনে আসিলেন। কুচবিহারের মহা-রাজা আসিলেন মোটরে, মোটর-চালক স্বয়ং মহারাণী এক টানেই (one lap) আগে-ভাগেই পৌঁছিয়াছেন।...অনেক বড় বড় রাজারা আসিয়াছেন—স্বয়ং কবি-গুরুর টিমের সহিত খেলা, কেহই মিস্ করিতে চাহেন না। যাঁহারা ক্রিকেট খেলেন না, শুধু শিকার ও অন্যান্য মনোবিনোদন কার্যে সময় ব্যয় করেন, তাঁহারাও আসিলেন।

"কবিগুরু চঞ্চল হইয়াছেন—খেলার দিন সন্নিকট। কিন্তু তিনি কি শেষপর্যন্ত বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিবেন—ব্যাট, বল, স্টাম্প প্রভৃতির জন্য তাঁহার চিরদিনের সংস্কার কলুষিত করিবেন? ইউবেরয়, এস রয় প্রভৃতি সমস্ত দেশী দোকানদার আসিলেন, কিন্তু কবির চক্ষে ধুলা দেওয়া অত সহজ নয়। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহারা বিদেশী ব্যবসায়ীর এদেশী এজেন্ট মাত্র।

"তাই কবি বাহিরিলেন দেশী ব্যাটের সন্ধানে। প্রথমে যে-গ্রামে গেলেন তাহার নাম গুণঘুস্‌সা। এবং যে-কাঠের সন্ধান পাইলেন—যাহা দ্বারা ভালো ক্রিকেট-ব্যাট তৈয়ারী হইতে পারে—তাহার নাম জানিলেন 'আঁকো।' কাঠ খুব শক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু 'আঁকো' নামটা যেমনই শ্রীহীন—তেমনই বীভৎস গ্রামের নাম 'গুণঘুস্‌সা'। কবি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কয়েকজন শিষ্যের সহযোগিতায় ছোট একটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান-দ্বারা ঐ কাঠ ও গ্রামের নূতন নামকরণ করিলেন—অঙ্কন ও অঙ্কনবর্তিকা। 'আঁকো' চলতি নাম—[illegible] অঙ্কন; এবং অঙ্কন-কাঠের দ্বারা সুসজ্জিত গ্রামের নাম হইল [illegible] বা [illegible]।

"ব্যাট হইল, স্টাম্প হইল কিন্তু ভাল ম্যাটিং চাই।...সময়টা শীতকাল, মাঠে ঘাস তো নাই-ই, সুতরাং টার্ফ কথাটা মনেই পড়ে না। কিন্তু দুঃখ কি—মেদিনীপুর হইতে শীলা মাইতি অনেক মছলন্দ আনিয়া দিলেন। রাজন্যবর্গ বিলাতের টার্ফ, ম্যাটিং সবই দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন চিত্র-বিচিত্র মছলন্দ কখনও দেখেন নাই।

"খেলার দিন সমুপস্থিত।...প্রভাত বেলা—অরুণ আলোর অঞ্জলি না থাকিলেও রোদটি খুব মিঠা। খেলা সকালে হইবে—মধ্যাহ্নে বিশ্রাম। আবার বৈকালে খেলা। তাঁহার বিদ্যায়তনেও এই নিয়ম। দ্বিপ্রাহরিক মুহূর্তগুলি বিশ্রামের জন্য। বৃথা পরিশ্রমে জর্জরিত হইবার জন্য নহে। ব্রাহ্ম-মুহূর্তে তিনি শয্যা-ত্যাগ করিয়াছেন। বাদলবাবুর বাড়ীতে তিনি অতিথি। সম্মুখের পাহাড়ের উপর যে প্রশস্ত স্থানটি আছে সেইখানে তাঁহার প্রার্থনা-বেদী স্থাপিত হইয়াছে।...তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি 'পেট'—বামে ময়ূর 'কেকা', দক্ষিণে হরিণ 'তৃষ্ণা'। সম্মুখে ক্ষুদ্র রোপ্যাধারে আদা, ছোলা ও কফি। তৃষ্ণা ও কেকা আদা-ছোলার প্রসাদ পাইবার পর তবে নড়িবে। হঠাৎ কবি একটি নূতন সুরের সন্ধান পাইলেন। সুমিষ্ট কণ্ঠে ডাকিলেন, দিনু দিনু। তাঁর সে মধুর কণ্ঠ-স্বরের নিকট বীণা-মুরজ-মুরলী লজ্জা পাইল। দীনেন্দ্র ঠাকুর ইদানীং অত্যন্ত মোটা হইয়া পড়িয়াছেন। বুনিয়াদী জমিদারবংশের সন্তান, পেলব-তনু রাখা তাঁহার পক্ষে খুবই শক্ত। তবু তিনি আগেভাগেই কবির নিকটে নিজের আসন রাখেন—কারণ, কখন কি সুর তুলিয়া লইতে হইবে কে জানে? এবারও তিনি সুরটি তুলিয়া লইলেন, কিন্তু ক্রিকেট-খেলার বিবরণের সঙ্গে সেটা অবাস্তব বলিয়া লেখা হইল না।

"ওদিকে রাজন্যবর্গের তাঁবুতে কর্মব্যস্ততা দেখা দিয়াছে।...মহারাজ-বাহাদুরেরা ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গগণ আর চিত্তচাঞ্চল্য রোধ করিতে পারিতেছেন না। ইতিমধ্যেই নিজ নিজ শরীর সম্মার্জিত করিয়া ফ্লানেল চড়াইয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের ব্লেজারে তাঁদের কৃতিত্ব-চিহ্ন আঁকা। কেহ-না কেম-ব্রিজের ব্লু কেহ-বা এম-সি-সি'র সভ্য, ইত্যাদি। তাঁদের তাঁবুতে স্কটিশ হাই-ল্যাণ্ডার-দলের ব্যাগপাই বাজিতেছে। স্যর ভি জি ব্যাট-হাতে ছুটাছুটি করিতে-ছেন। কিছুদিন কংগ্রেসী-রাজনীতি অনুধাবন করার ফলে তাঁর ইচ্ছা, সানাই বাজানোর ব্যবস্থা করেন। কাশীধামে তাঁর বন্ধু মহারাজা প্রদ্যোতকুমারের বাড়ীতে সানাই-এর মৃদু মূর্চ্ছনা তাঁর প্রাণে অপরূপ পুলক জাগাইয়াছিল। তিনি সে-কথা পাতিয়ালাকে জানাইবার পূর্বেই তাঁদের কোনো বিলাতী বন্ধু একজন বড় স্কটিশ পীয়র তাঁর পাইপ-ব্যাণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছেন—উড়োজাহাজে তাহারা আসিয়া গিয়াছে।

"কবির প্লেয়াররা রেডি। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন ও আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী-মহাশয় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—মাঠের পূজা ও দেবতার বন্দনা-গান হইল। এ কার্যে সক্রিয় সহযোগিতা দিলেন বালিগঞ্জের শীলা ও মীরা এবং বেহালার ঋতা গাঙ্গুলী।

"কবির এ খেলার কথা রয়টার সারা পৃথিবীতে প্রচার করিয়া দিয়াছে। সভ্য জগতের স্পোর্টসম্যানরা কবিকে নিজেদের দলে পাইলেন বলিয়া আনন্দে

উৎফুল্ল এবং কবিকে জয়যুক্ত করিবার জন্য ইচ্ছা তাঁহারা প্রত্যেকে টেলিগ্রামে প্রকাশ করিলেন।

"অল ইণ্ডিয়া রেডিও কবির খেলা উৎসারিত করিবার জন্য গোমোতে হাজির। রয়টার, এ-পি, ইউ-পির প্রতিনিধিরা আগে-ভাগেই পৌঁছাইয়াছেন এবং কবির সেক্রেটারী অমিয় চক্রবর্তীকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে জর্জরিত করিয়া তুলিলেন।

"ক্ষুদ্র গোমো আজ লোকে লোকারণ্য। পাহাড় দুইটির কোলে একজোড়া তাঁবু দেখা যাইতেছে। কবির তাঁবু হইতে কী সুর ভাসিয়া আসিতেছে।... দেখা গেল, কবি তাঁবুর বাহিরে আসিতেছেন, কিছুটা পুলকিত, কিছুটা উদ্বেলিত। কিন্তু কই তাঁহার পরনে খেলার পোষাক নাই তো? অবশ্য ভিন্ন-দেশে প্রস্তুত অথবা তাঁহাদের অনুকরণে তৈয়ারী কোনো ফ্লানেল-প্যাণ্ট বা ব্লেজার পরিতে আমরা কোনোদিন আশা করি নাই, কিন্তু তাঁর হাতে ওটা কি? সেই 'অঙ্কন'-জাত হাতে-গড়া খাঁটি নির্ভেজাল অনাবিষ্কৃতপূর্ব ব্যাট-নামধারী সোঁটা। পরনে তাঁর সেই সর্বতনু-পরিব্যাপ্তকারী আগুল্‌ফবিলম্বিত আল-খাল্লাটি। প্রভাত-সমীরণে তাঁর সুন্দর সুকোমল রেশমী চুলগুলি উড়িতেছে। যদি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে-হইতে একদমকা বাতাসে কয়েক গাছি চুল চোখে-মুখে আসিয়া পড়ে, এবং সেই মুহূর্তে বিপক্ষের একটা সজোর-নিক্ষিপ্ত বল...ওঃ! শান্তিনিকেতনের রেণুকা রায় আর ভাবিতে পারেন না। শীলাকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি দৌড়াইয়া কবি-সন্নিধানে গেলেন এবং রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন—গুরুদেব! কবি তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইয়াই তাঁহাদের মনো-ভাব বুঝিলেন—এবং বালিগঞ্জের জেদী মেয়ের কাছে হার মানা অবশ্যম্ভাবী জানিয়া মাথা নীচু করিয়া দিলেন। দুই বান্ধবীতে একটা হেলীয়োট্রোপ রঙের কাপড় বৃহত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে মাথায় জড়াইয়া দিলেন—খানিকটা বর্মী, খানিকটা যবদ্বীপীয় ফ্যাশনে।

"টাগোর ওয়ানডারার্স তাঁহাদের তাঁবু হইতে নির্গত হইলেন। পুরোভাগে চলেছেন কবি তাঁহার 'অঙ্কনা'-হাতে। তাঁহার পশ্চাতে আছেন মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে ধীরেন সেন, অনিল চন্দও আছেন। তাহাদের পরনে ধুতি, মালকোঁচা-বাঁধা। গায়ে হাফ-পাঞ্জাবী, চলতি ভাষায় যাহাকে নিমে বলা হয়। মাথায় তালপাতার হাল্কা টোকা।...মেয়েরা সাড়ী পরিয়াছেন মহারাষ্ট্রীয় প্রথায়—তাঁহাদের দেখিতে অনেকটা রাজা রবিবর্মার ছবির নায়িকাদের মতো। মেয়েদের মধ্যে দেখা গেল, বাদলদেবের শিষ্যা শেলী (শেফালীর 'ফা' বাদ) ও মণি বেন, যিনি গরবী-নৃত্যকে জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ভঙ্গিমার মধ্যে মূর্ত করেন, এবং বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীশ্রীগণ্ডল বিষণগড়-রাজের রাজকুমারী শর্মিলা, যিনি এ-এ-বি পরিচালিত মোটর-দৌড়ে প্রথমস্থান অধিকার করেন। এঁরা, ওঁরা এবং আরও অনেকে আছেন।

"ওদিকে রাজাদের তাঁবুতে আছেন স্বাধীন ত্রিপুরার পঞ্চশ্রী সেনবর্মা, পাতিয়ালার রাজা, পতৌদির নবাব, বিজয়নগরম্-এর স্যর ভি জি, ও নিজাম-নন্দন প্রিন্স অব বেরার। ওদিককার তাঁবুতে দেখা যাইতেছে গায়কোয়াড়-

দুহিতা, বারদোয়ানের মহারাজাধিরাজ-কুমারী এবং ফ্রান্সে সুশিক্ষিতা শামসের জঙ্গ বাহাদুর রানার কন্যাদ্বয়। তাঁদের নৃত্যোদোদুল ছন্দে চলন-বলন দেখিলেই বোঝা যায়, রাজাদের খেলাতে ও সর্বকর্মে প্রাণসঞ্চার করার জন্য তাঁহাদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা।

"কবিগুরু মাঠে নামিতেই শান্তিনিকেতনের স্পেশাল ফটোগ্রাফার শম্ভু সাহা একটি ছবি তুলিলেন। অরোরা ফিল্ম করপোরেশন ছবি তুলিবার জন্য সেট প্রস্তুত করিয়া সময় গুণিতেছেন। বিশ্ব-ভারতীকে অনেক টাকা দেওয়ায়, কবি অরোরার অনুরোধ মঞ্জুর করেন। সূর্যদেব তখন দিক্‌চক্রবাল ছাড়িয়া অনেকটা উপরে উঠিয়াছেন। শারদ-রবির সোনালি-আলোয় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত। কবি ও মহারাজা-পাতিয়ালা টসের ফলাফল দেখিবার জন্য ঝুঁকিলেন! রাজন্যদলেরই জয়—তাঁহারাই খেলা আরম্ভ করিবেন।...পাতিয়ালা বলিলেন—So Poet, you lose the toss but I hope you will win the game. কবি, আপনি টসে হারিলেন বটে, কিন্তু খেলাতে আশা করি জিতিবেন। অপূর্ব সে কথনভঙ্গী, সেই আড়নয়নের দৃষ্টিপাত, কাঁধের পেশী সঙ্কোচন, নাসিকার উন্নত ভাব, সবই অনবদ্যভাবে বিলাতী অ্যারিস্টক্রেসীর ছাপ মারা।

"খেলা শুরু হইল। প্রথম ব্যাট ধরিলেন মহারাজা কুচবেহার। পরের কাহিনী পরে।"

॥ ৪ ॥

এখন তাহলে দাঁড়িয়ে আছি কোথায়? কী পাওয়া গেল এতাবৎ? সুস্পষ্ট তথ্যে প্রমাণ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ যৌবনে দু'-একবার ক্রিকেট-ব্যাট হাতে নিয়েছিলেন। তারও পরে তিনি ক্রিকেট-মাঠে নেমেছেন, তবে বাস্তবে নয়—শ্রীযুক্ত ব্রহ্মণ্যভূষণ ও শ্রীমতী ক্ষমার 'কল্পনায়' এবং আমার 'স্বপ্নে।' রসিক পাঠক নিশ্চয় মানবেন, রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ বাস্তব ক্রিকেট অপেক্ষা অনেক বেশি সত্য আমাদের কল্পনা ও স্বপ্নাসীন তাঁর রূপের খেলা, রঙের খেলা। তাই পাঠকের কাছে প্রশ্রয় ভিক্ষা করে আমি আমার স্বপ্নের উপসংহার দিয়ে এই রচনার সমাপ্তি করছি। স্বপ্নের শেষাংশটুকু আগে জানাইনি।

শান্তিনিকেতনে কবির ক্রিকেট-খেলার পরদিন সকাল...

রবীন্দ্রনাথের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল: 'বনমালী, বনমালী, আমার আসনের তলায় শক্ত একটা ইঁট ঢুকিয়ে রেখে গেছিস্...'

প্রতিমাদেবী ছুটে এলেন।

'বৌমা, দেখে যাও তোমার সাধের ভৃত্যের কাজকর্মের চেহারা। হতভাগা আমার সঙ্গে জামাই-ঠকানো রসিকতা করেছে। চেয়ারের কী একটা শক্ত জিনিস রেখে দিয়েছে—'

'বাবামশায়, উঠুন দিকি, কি হয়েছে দেখি!'

দেখা গেল, আসনের উপরে কিছু নেই। তখন রবীন্দ্রনাথের আলখাল্লার পকেট অনুসন্ধান করে বেরুল—একটি লাল বল—ক্রিকেট-বল!

গুরুদেব বড় লজ্জা পেলেন। 'ছি ছি! গতকাল তাহলে বলটা আমার পকেটেই ঢুকে গিয়েছিল! ছি-ছি ওরা কী মনে করবে! সাহিত্যে চুরি চলে, তার নাম

সাঙ্গীকরণ, কিন্তু অন্য জিনিস চুরি হলে...সব-কিছুর জন্য ব্যাটা বনমালীই দায়ী। সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখো না, আমাকে লজ্জা দেবার জন্য। সুমুখে দাঁড়িয়ে আছো কিন্তু 'সুমুখ' নও বাপু তুমি। তোমাকে দেখলেই মন খিঁচড়ে যায়, বিনা দোষে তিরস্কারে ইচ্ছা হয়...'

বনমালী মুচকি হেসে বলটা তুলে নিয়ে গেল ছোকরা-বাবুদের ফেরত দেবার জন্য।

•

সেই বলটির সন্ধান আপনারা কেউ জানেন? আমার একান্ত ইচ্ছা, যদি পাওয়া যায়, তাহলে কেউ যেন সেই স্বপ্নাদ্য বলটিকে লর্ডসের সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন।



উৎসর্গ :

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বড়াল,

বন্ধুবরেষু

প্রতি দিনের জীবনে যাঁর
সাহায্য আমাকে নিতে হয়।

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

অনেক দিনের ইচ্ছাপূরণ হল এই বইটি লিখে। ক্রিকেট-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংঘর্ষ—বডিলাইন। তাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন ক্রিকেট-প্রধানেরা। রাজনীতির শিকড়ও তলে-তলে প্রবেশ করেছিল। সব জড়িয়ে এমন একটা জটিল দারুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, যার রোমাঞ্চের স্বাদ সর্বসময়ে পেয়েছি—প্রথম যেদিন এই ইতিহাসকে স্পর্শ করেছিলুম, তখন থেকে আজ অবধি।

এই ইতিহাস লিখব, বাসনা ছিল। খণ্ড আকারে এর বিষয়ে লিখেছিও, যেমন 'রমণীয় ক্রিকেট' বইয়ে 'ক্রিকেটের কুরুক্ষেত্র' রচনায়। কিন্তু গোটা ইতিহাস? এক্ষেত্রে তথ্যবাহুল্য একটা বাধা। সমকালীন ক্রিকেটের প্রায় সব বইয়ে, পরবর্তী স্মৃতি-কথায়, ও ইতিহাসগুলিতে বডিলাইন সম্বন্ধে ভূরি-ভূরি লেখা রয়েছে। তার সব কথা লিখলে ব্যাপারটা নীরস ও ক্লান্তিকর ঠেকতে পারে আশঙ্কা ছিল। বডিলাইনের ইতিহাস-রচনা উদ্দেশ্য, অথচ কিভাবে লিখব সেই চিন্তা—

এমন সময়ে সম্প্রতি প্রকাশিত লারউডের আত্মকথা, 'লারউড-কাহিনী' হাতে পড়ল। মনস্থির হয়ে গেল তাতেই। এর আগেও লারউড বডিলাইন-কথা লিখেছেন, কিন্তু নিজেকে, নিজের গোটা জীবনকে তার সঙ্গে যুক্ত করেন নি। বডিলাইন আগে ছিল লারউডের ভালো (!) বা মন্দ কাজ, আত্মকাহিনী প্রকাশের পরে তা আমাদের কাছে হয়ে দাঁড়াল তাঁর গোটা জীবনের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি—দৈবাহত পৌরুষের মর্মান্তিক আত্মঘোষণার প্রয়াস। ইতিহাসের কক্ষবন্দী বডিলাইন অকস্মাৎ কফিনের ডালা খুলে বেরিয়ে এল আরক্ত রোষে—

ঠিক করলুম, বডিলাইনের কথাই লিখব, তবে প্রধানত একজনের জীবনের ধারা-সূত্রে। ইতিহাসনাট্যের যবনিকামোচন করব একটি জীবনের নামে—বডিলাইনের শিকারী এবং শিকার যিনি এক দেহে—সেই লারউডের নামে।

লারউডকে অবলম্বন করে ঘটনাধারা উন্মোচন করলেও তাঁকে সমর্থন করা আমার অভিপ্রায় নয়। 'আলো, আমার আলো'-র অর্থাৎ ব্রাডম্যানের শত্রুতা যিনি করেছিলেন, সেই লারউডকে বাল্যকালে ক্ষমা করিনি, এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পরে আমার এতখানি নাস্তিকতা আসেনি যে, লারউড-জার্ডিনের 'ন্যায়' শাস্ত্রের ভক্ত হয়ে পড়ব। ও'দের অন্যায় এখনো আমি দেখি, তবু একথাও জানি, শয়তানের পাওনা ঈশ্বরও বন্ধ করতে পারেন না।

গ্রন্থরচনার কালে স্বভাবতই বহু বিদেশী বইয়ের সাহায্য নিতে হয়েছে। লারউড ছাড়া প্রধানত যাঁদের লেখার সাহায্য নিয়েছি, তাঁরা হলেন, ডন ব্রাডম্যান, আর্থার মেইলী, ওয়ালী হ্যামন্ড, জ্যাক হবস, রে রবিনসন, জ্যাক ফিঙ্গলটন, বব ওয়াট, পেলহ্যাম ওয়ার্নার। 'বডিলাইন' নামের উৎপত্তির চমৎকার কাহিনী রে রবিনসনের

লেখা থেকে পরিশিষ্টে অনুবাদ করে দিয়েছি। জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্রিকেট বই ঘেঁটে পুরনো বহু বই থেকে সমসাময়িক ছবি জোগাড় করে দিয়েছি।

গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যাপারে অনেকেই সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন শ্রীসুনীল-বিহারী ঘোষ, শ্রীতারকদাস সুর, হুগলী জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅনিল-কুমার দত্ত, শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগুণেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীবিমল ঘোষ প্রভৃতি। শ্রীরবি বসু এবং শ্রীবিকাশ বসু এই বই লেখার কালে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীবিমল সেনগুপ্ত ফটো তোলার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, এবং শ্রীমুকুল দত্ত ও শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ যখনি প্রয়োজন—প্রয়োজন মিটিয়েছেন।

বইয়ের নাম অনেক সময়েই লেখকদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়। ইমপ্রুভমেন্ট-ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষ রাস্তার নামের ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্য সংখ্যাকেই নাম করেন—এক নম্বর রাস্তা, দু' নম্বর রাস্তা ইত্যাদি। এই সূত্রে আমিও বইয়ের নাম দিতে পারতুম 'ষষ্ঠী', কারণ এটি আমার ষষ্ঠ ক্রিকেট বই, এবং সুরসিক পাঠক-পাঠিকারা ক্রমান্বয়ে ৬টি ক্রিকেট-বই জন্ম দেওয়ার অসংযমকে করুণা-হাস্যে লাঞ্ছিত করে বলতে পারতেন, আহা মা ষষ্ঠীর কৃপা। কিন্তু 'রমণীয় ক্রিকেট' ইত্যাদির পরে নামের এতটা 'ইমপ্রুভমেন্ট' তাঁদের সইত কিনা সন্দেহ হয় ('পঞ্চদশী', 'ষোড়শী' হলে ব্যাপারটা কাব্যিক হয় অবশ্যই, কিন্তু তাদের সঙ্গে দৃষ্টি-পরিণয়ের দুর্ভাগ্যের আগে, পাঠকদের ভরসা দিয়ে বলি, বিজয়া 'দশমী' আছে এবং বৈধব্যের 'একাদশী'), অগত্যা তাই দ্বিধায় ছিলুম। এক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য, 'শঙ্করায় চ।' অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হতে হল সমস্যা নিয়ে। ঠিকভাবে বলতে গেলে, আমরা ছাতস্থ হলুম কোনো এক হৈমন্তী সন্ধ্যায়, যেদিন আকাশজোড়া পূর্ণিমার সোনারচাঁদ। শিরশিরে ঠাণ্ডার মনোরম পরিবেশে আমরা ভয়ঙ্কর সংঘাতের ইতিহাসের আলোচনায় উত্তপ্ত হলুম ক্রমে। দীর্ঘ বিষয় ভাষণের শেষে বললুম, 'লাল বল; লারউড' নাম দিলে কেমন হয়?

মানে?—কুণ্ঠিত প্রশ্ন।

আবেগে বললুম—লারউড!—তার আগে লাল বল।—লারউডের হাতে-ধরা যে-লাল বলটি প্রাণের রক্তে লাল—রোষের রঙে লাল—বাসনার—

মা—নে—???

থতমত খেয়ে, ঢোক গিলে বলি—মানে—A Red Ball and Larwood—এই আর কি—ভালো নয়—?

আর কিছু সাজেশান্ আছে?

অসভ্য! কিন্তু অপরিহার্য। সুতরাং বুদ্ধিজীবীর নিরপেক্ষ-নির্জীব কণ্ঠে নামের আলোচনা চালিয়ে যেতে হল : নাটকীয় ক্রিকেট, নামটা কি রকম?—যেহেতু এহেন মহানাটকীয় ক্রিকেট অল্প ক্ষেত্রেই হয়েছে।—হাঁ, মন্দ নয়, তবে বিষয়ের পরিচয় ও-নামে নেই, ওটা অন্য বইয়ের জন্য তুলে রাখুন।

শ্রীযুক্ত মণিশঙ্কর যোগ করলেন—ব্যাপারটা আপনার মুখে যা শুনছি, তাতে 'নাটকীয় ক্রিকেটের' বদলে 'নারকীয় ক্রিকেট' নাম হওয়াই উচিত। কিন্তু অতটা বডি-ল্যাইনী নাম আপনার তরলমতি পাঠক এবং কোমলমতি পাঠিকারা সহ্য করতে পারবেন কি?

শুনে মর্মবাতনার সীমা রইল না। আমার অল্পসংখ্যক পাঠক এবং অত্যল্পসংখ্যক পাঠিকার বিষয়ে কটাক্ষের প্রতিবাদ করলুম সবেগে। আমার উত্তেজনার তপ্তললাটে বিমল হাস্যের চন্দনলেপন করে মুখুজ্জেমশায় বললেন—বুঝেছি, বুঝেছি, আপনার পাঠক-পাঠিকারা কেউই তরলমতি নন, সবাই গম্ভীরাত্মা গুরু দার্শনিক; কেউ হঠ-যোগী নন, সবাই কাষ্ঠ-মঠ-যোগী, কিন্তু—

কথা বাড়াতে দিলুম না, কুকথাশিল্পে আমার নিতান্ত অরুচি, পুরনো প্রসঙ্গই টেনে রাখলুম, ক্রিকেটের আলোচ্যপর্ব সম্বন্ধে নাটক উপন্যাসাদির শব্দ আমার মাথায় জাল বুনছিলই—দুটি প্রধান চরিত্রের সংঘর্ষ—ব্রাডম্যান ও লারউডের—যাঁদের একজন হলেন প্রতিভূ-ব্যাটসম্যান, অন্যজন বোলার-প্রতিনিধি, সুতরাং—

মণিশঙ্করই এবার সিদ্ধান্ত দিলেন—তাহলে 'ক্রিকেটের নায়ক প্রতিনায়ক' এই নাম দিয়ে দিন।

মনে হল, ঠিক, নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু—নায়ক প্রতিনায়ক ব্র্যাডম্যান লারউড ছাড়া ক্রিকেটে আরো আছেন; তা ছাড়া প্রতিনায়ক কথাটার দ্বারা কিছু অগ্রিম নিন্দা চাপিয়া দেওয়া হবে বোলার-প্রতিনিধির ঘাড়ে—

নিজের মনে ভাবছিলুম, মণিশঙ্করও তাই। নামটাকে অতঃপর তিনি আরও তীক্ষ্ণাগ্র করলেন—'নায়ক ব্রাডম্যান, প্রতিনায়ক লারউড'—এই নামটা দিন।

চমৎকার! উঁহু না, কেন নয়—আগেই বলেছি। তাছাড়া লারউড যদি প্রতিনায়ক হন, জার্ডিন তবে কি? আর—ব্রাডম্যানকে এই লেখায় যথেষ্ট জায়গা দেওয়া হলেও লারউডই মূল চরিত্র, সেক্ষেত্রে ঠিক নাম হবে—'প্রতিনায়ক ও নায়ক'—কিন্তু কোনো অলঙ্কারশাস্ত্রই কি এমন গণেশ ওল্টানো কাণ্ড ভালো চোখে দেখবে?

মণিশঙ্করের ধারালো গলা—ঝঞ্ঝাটের দরকার নেই, নাম দিন—'দুই প্রধানের সাক্ষাৎ—ক্রিকেটে।' এতে রাজনীতি খুশি হবে, খবরের কাগজ পড়ুয়ারা চেনা শব্দ পেয়ে স্ফূর্তিবোধ করবে—

গলা বদলে সহানুভূতির সঙ্গে মুখুজ্জে-মশায় বললেন—'লাল বল লারউডই' থাক। যে লেখে, সে অনেক ভেবে একটা নাম ঠিক করে, তারপরে অন্যদের ডাকে সেই সিদ্ধান্তকে বিশেষভাবে যাচাই করে অবশেষে সমর্থন করতে। 'লাল বল, লারউড' শব্দগুলোর উপর আপনি যে-অতিরিক্ত তাৎপর্য আরোপ করতে চেয়েছেন, তা ইতিমধ্যে যদি আরোপিত হয়ে না থাকে, আপনার লেখার দ্বারা তা হোক, ইয়ে, শেষ কথা—'তুমি সুখী হবে, ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে—'

দেখি, পদ্মনয়ন মুদিত, অভয় হস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত।

মণিশঙ্করের তুলনায় আমি যথেষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ। বড়দের সঙ্গে তার এই ইয়ার্কিতে রাগব না হাসব, ঠিক করতে-করতে ঢঙ-ঢঙ করে রাত দশটা—কার্ত্তিকের হিমে গলা ব্যথা-ব্যথা, আকিয়া ভিজে-ভিজে, জীবনানন্দের কবিতা-কবিতা—

'লাল বল, লারউড'ই রয়ে গেল। [ডিসেম্বর ১৯৬৭, অগ্রাহায়ণ, ১৩৭৫]

...ক্রিকেটের ট্র্যাজিক নায়ক কে—এ প্রশ্নের একটাই উত্তর আছে। কিন্তু—ট্র্যাজিক নায়ক? না তিনি প্রতিনায়ক? প্রতিনায়ক কথাটাই বোধহয় ঠিক। নচেৎ ক্রিকেটের সেই চরম প্রতিভার বিষয়ে আমরা সহানুভূতি-শূন্য কেন—কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিস্মিত? তাঁর সম্পূর্ণ কাহিনী আমরা আগে জানিনি। এখন জেনেছি। সম্পূর্ণ কাহিনী তিনি স্বয়ং লিখেছেন। রোমাঞ্চকর সে কাহিনী—রক্তগাঢ় এবং বেদনাগভীর। অশান্ত কামনা, জীবনতৃষ্ণা, সংঘাত, জয় ও পরাজয়ের অসাধারণ ইতিহাস। ক্রিকেটের স্বর্গরাজ্য পাওয়া এবং হারানোর মহাকাব্যিক ইতিকথা...

* * * কোথায় আছে মধ্যাহ্নে অন্ধকার: * * *

১৯৪৮-এর ইংলন্ড। কেনিংটন-ওভালে ক্রিকেটের মহানায়ক প্রবেশ করছেন তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট-ইনিংস খেলার জন্য। ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট। ডন ব্রাডম্যানের খাটো খেলোয়াড়ী চেহারাকে প্যাভিলিয়ন-সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গেল, আর উত্তাল হয়ে উঠল সারা মাঠ। টুপিতে হাত ছুঁইয়ে মহান ডন দর্শকদের অভিনন্দনকে স্বীকার করলেন। মাথা একটু ঝুঁকিয়ে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলেন উইকেটের দিকে। জয়রব চলতে লাগল। ডন একটু লজ্জিত, ভাবাতুর—আরও এলোমেলো হয়ে গেলেন যখন ইংলন্ডের অধিনায়ক ইয়ার্ডলে তাঁর সকল খেলোয়াড়কে কাছে ডেকে এনে জয়ধ্বনি দিলেন সমস্বরে—থ্রি চিয়ার্স ফর...

কয়েক মুহূর্ত পরে আবার উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন: হাসিতে, আনন্দে, বিষাদে এবং বিচিত্র স্বাদে পূর্ণ মনের কলধ্বনি: পৃথিবীর রানের ঈশ্বর বিদায় নিচ্ছেন শূন্য রানে: ব্রাডম্যান তাঁর জীবনের শেষ টেস্টে শূন্য রানে বোল্ড হয়ে গেছেন—দ্বিতীয় বলেই!

'ক্রিকেট দেয়, কেড়েও নেয়। যে-খেলা এত দিয়েছে—সর্বশেষ টেস্টে সে ফিরিয়ে দিল শূন্য হাতে।'

ব্রাডম্যান বিশ্বাসই করতে পারেননি তিনি আউট। অবিশ্বাসে, নৈরাশ্যে, ভাঙা স্টাম্পের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার, তারপর ফিরতে শুরু করলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল হবসের কথা—এই ওভালেই তিনিও বিদায় নিয়েছিলেন—তিনিও আমারই মতো অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন এবং...আমারই মতো রান করেছিলেন, না—৯ রান বেশি করেছিলেন—ব্রাডম্যান ভাবতে লাগলেন।

ব্রাডম্যান আরও অনেক-কিছু ভাবছিলেন। ওভালে করা বিরাট রানের স্মৃতি নিশ্চয় মনে আসছিল—তারও বড় কথা, একটি সুবৃহৎ পরাজয়ের স্মৃতি। ১৯৩৮-এ অস্ট্রেলিয়ান-দলে সেই প্রথম তিনি অধিনায়ক হয়েছেন—সেই বছরই ওভাল-টেস্টে ইংলন্ড সর্বোচ্চ টেস্ট-স্কোর করল—৭ উইকেটে ৯০৩; হাটন ৩৬৪ রান করে তাঁর ৩৩৪ রানের টেস্টের বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন; এবং ভাঙা পা নিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হল তাঁকে, অস্ট্রেলিয়ার একটি বৃহত্তম

পরাজয়ের লজ্জা সর্বাঙ্গে মেখে। এবার আমার রান—শূন্য—হোক গে—ইংলণ্ড নিজ দেশে সর্বনিম্ন টেস্ট-স্কোর করেছে—মাত্র ৫২—এই ওভালেই!! ব্রাডম্যান ভেবে চললেন...

আর একদিন আর একজন ভাঙা পা নিয়ে ব্রাডম্যানের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কিন্তু...সেকথা এখন থাক। দেখে নেওয়া যাক, ১৯৪৮-এর ইংলণ্ডের আর একটি দৃশ্য, একই জাতীয়...এবার অনুবাদ করে দিই ফিঙ্গলটনের রচনা থেকে :

"১৯৪৮-এর ১০ই সেপ্টেম্বরের এক রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্নে ডন ব্রাডম্যান ইংলণ্ডের মাটিতে শেষ ফার্স্টক্লাস খেলা থেকে বিদায় নিলেন। বাউণ্ডারির প্রবল বর্ষণে ও দৌড়োদৌড়িতে ১৫৩ রান করে, ঐ খেলায় বার্নসের ১৫১ রান পেরিয়ে, ব্রাডম্যান স্থির করলেন, বেডসারকেই উইকেট দেবেন, সুতরাং কভারের উপরে তুলে দিলেন তাঁর একটি বলকে—যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, বিচিত্র ভাগ্য, লেন হাটন—যিনি দশ বছর আগে কেনিংটন-ওভালে টেস্টের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। বলটা তখনো শূন্যে—ব্রাডম্যান ঘুরে পড়লেন বলটা হাতে নামার আগেই—টুপি খুলে ফেলে দৌড়তে শুরু করে দিলেন—দৌড় দৌড়—প্যাভিলিয়নের দিকে।

হাটনের অভ্রান্ত হাতের মুঠির মধ্যে বলটি যখন সম্পূর্ণ ধরা পড়েছে—তারই মধ্যে ব্রাডম্যান অর্ধেক মাঠ পেরিয়ে গেছেন। ক্যাচটি ধরা হয়েছে কি-না দেখবার জন্য তিনি ফিরেও তাকালেন না। দৌড়েই চললেন। হাতের ব্যাট, গ্লাভস ও টুপি লটপট করে নড়তে লাগল। সমবেত বিরাট ইয়র্কশায়ারীয় দর্শক উত্তপ্ত অভিনন্দনের করবাদ্য চতুর্দিকে নিনাদিত করবার আগেই ব্রাডম্যান প্রথমশ্রেণীর খেলায় ইংলন্ডের মাঠ থেকে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ইংলণ্ডে সেই তাঁর ১২০তম ইনিংস। চারটি সফরে অকল্পনীয় রানসংখ্যা, ৯৮৩৭। পরিসংখ্যানকারীরা তারই মধ্যে সক্রিয় হয়ে বলছেন, গড় দাঁড়িয়েছে প্রতি ইনিংসে ৯৬।

"ক্রিকেট-ইতিহাসের চরম তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত এটি।...

"'এর থেকে বেদনাদায়ক ভাষণ আর কখনো কোনো মানুষের মুখে আমি শুনিনি,' স্যার নরম্যান ক্রিকেট বলেছিলেন লণ্ডনের এক ভোজসভায় এই বছরের এপ্রিল মাসে, যখন ব্রাডম্যান জানিয়েছিলেন, এইটেই তাঁর শেষ সফর—'কিন্তু মানুষের জীবনে অনুতাপের সুযোগ কখনো হারায় না, সুতরাং হয়তো ব্রাডম্যান এখনো তাঁর উক্তি ও অভিপ্রায়ের বিষয়ে অনুতপ্ত হয়ে পুনর্বিবেচনা করবেন—আঃ! অসহনীয় তাঁর উক্তি, দারুণ তাঁর অভিপ্রায়!'"

১৯৪৮-এর ইংলণ্ড ব্রাডম্যানে পূর্ণ। জয় জয় জয়। দিকে-দিকে দিগ্বিজয়ীর এবং তাঁর সৈন্যদলের ব্যাট-হর্ষ, বল-গান। ব্রাডম্যান তাঁর শেষ সফরে, 'সর্বশ্রেষ্ঠ' অস্ট্রেলিয়ান দল এনেছেন ইংলণ্ডে। সে দল অ্যাসেজ তো পেয়েছেই, কোনো সন্দেহ না রেখেই, সেইসঙ্গে অপরাজিত হয়ে সফর শেষ করেছে, যা ইতিপূর্বে কোনো অস্ট্রেলিয়ান দলের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। অস্ট্রেলিয়া খেলেছে ৩১টি ম্যাচ, ২৩টি জিতেছে (১৫টি ইনিংসে জয়), ৮টি ড্র—যা সফরকারী দলের

পক্ষে শ্রেষ্ঠতম রেকর্ড। সেঞ্চুরির সংখ্যাও অনেক এগিয়ে গেছে যে-কোনো পূর্ববর্তী দলের তুলনায়। কাউন্টি-খেলায় বিপক্ষে কেউ সেঞ্চুরি করতে পারেনি। ৩০০ রানে পৌঁছয়নি কোনো কাউন্টি-দলই।

স্বয়ং ব্রাডম্যানের চেহারা কি—ক্রিকেট মাঠের বাইরে? এমন ভাল ভোজনান্ত-ভাষণ কদাচিৎ কেউ দিতে পারে, এমন ক্ষুরধার বিবেচনা-বুদ্ধি অল্পই দেখা যায়। মাঠের মধ্যে: অতিশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে তাঁর, যার দ্বারা ক্রিকেটের সব-কিছু ধরতে পারেন; প্রায় অন্তর্যামী। এবং—

হ্যাঁ, চাম্পিয়ানের বয়স হয়েছে, চল্লিশকে স্পর্শ করেছেন, যৌবনের দীপ্তি অপরাহ্নে অবশ্যই নেই, তবু সফরে দু'হাজারের উপর রান, এবং...ব্যাটিং-অ্যাভারেজে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষে—শেষ সফরেও!

'আ—উঁ'—হুম্'—আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে জাগলেন হ্যাসেট, তখন ব্রাড-ম্যান প্রথমশ্রেণীর খেলায় শেষ ব্যাটিং সেরে, দেড়শোর উপর রান করে, প্যাভি-লিয়নে ঢুকছেন।

'কি ব্যাপার! শেষ করে এলেন মোসায়—'

'কি করি। করতেই হল'—ব্রাডম্যানের ভরপুর হাসি—'হিসেব করে দেখলুম, ইংলন্ডে প্রতি ইনিংসে গড়ে ১০০ রান দাঁড় করাতে হলে আমাকে এই খেলায় ৫০০ নটআউট থাকতে হয়—কিন্তু খেলাটি যে—হায়! হায়!—মাত্র তিন দিনের—'

ব্রাডম্যান—ব্রাডম্যান—ব্রাডম্যান—পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান—শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার। মুক্তভাবে, বা কিছু সংকুচিতভাবে সবাই মেনে নিল কথাটা।[১] ক্লাবের পর ক্লাব তাঁকে আজীবন সম্মানিত সদস্য করল। উপহার দেওয়া হল অজস্র-ভাবে। সাম্রাজ্যেশ্বর ইংলন্ডাধিপতি জিজ্ঞাসা করলেন সকৌতুকে—ডনের রান গুণতে হিসেবের যন্ত্র ব্যবহার করা হয় কিনা? তাঁর প্রজারাও কৌতুকে পিছপাও রইলেন না: 'যে-কোনো বল, ওয়াইড বল পর্যন্ত, ফসকানো মাত্রই ডনকে আউট দিতে হবে, উইকেটে না লাগলেও'—দাবি করলেন ক্রিকেট-লেখক। একজন ডনের উপহারের জন্য চাঁদা পাঠিয়ে লিখলেন—'তুমি গিয়েছ—সেই খুশিতে। এবার আমরা একটু চান্স পাব।' কিংবা দুঃখী কেউ লিখল গভীর কৃতজ্ঞতায়—'সারা দিনের খাটুনির পরে যখন বেতার-বিবরণী শুনেছি, তখন তার আকর্ষণে এত মগ্ন হয়ে যেতাম যে, আমাদের চায়ে এখন-যে কম চিনি পাই, আমাদের খাবারের থালায়-যে কম মাংস পাই—তাও যেন মনে থাকত না!'

Bradman is forty, Bradman will play no more.

---

(১) ফিঙ্গলটন তাঁর 'Brightly Fades the Don' গ্রন্থে অনেক ক্রিকেট-লেখক, সমজদার ও খেলোয়াড়ের মত সংগ্রহ করেছেন ব্রাডম্যান সম্বন্ধে। ডনের প্রতিভা-স্বীকারে সকলেই বাধ্য হয়েছেন। পেলহ্যাম ওয়ার্নার সানন্দে দাবি করেছেন, ডন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণীতে তিনি ঋষি, কেননা ডনের যৌবনের একটি বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কোনো দিন কি এই ব্যক্তি ৬০০।৭০০-র ইনিংস খেলে বসবে নাকি? তাঁর ভবিষ্যৎবাণী প্রায় সফল। ১৯২৮-৪৮, এই কুড়ি বছরকে 'ব্রাডম্যান যুগ' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, অতীত ও বর্তমানের ব্যাটস-

ম্যানদের সঙ্গে যে-ভাবেই তাঁর তুলনা করা হোক না কেন, তাঁর থেকে বড় ব্যাটসম্যান হয়নি, হবেও না, (যিনি প্রতি তিন ইনিংসে গড়ে একটি সেঞ্চুরি করেছেন, যার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় দ্বিশতাধিক ও ত্রিশতাধিক আছে)। রবার্টসন-গ্লাসগোর মতে, Polygon-এর বহুভুজক্ষেত্র মতো ডনের বহু angle। ভাল পিচে অদ্বিতীয় খেলোয়াড়। ডনের নামের পাশে লেখা সংখ্যাগুলো আছে এবং থাকবে। অলৌকিক এক মনুষ্য যার নাম ব্রাডম্যান—আ শি—ত, আত্মসম্মানিত, এবং আত্মস্থ। ডেনজিল ব্যাচিলর তাঁকে সর্বোচ্চ পরিমাণ রানকারী যন্ত্রমানব বলেছেন, বোর্ডে নামের পাশে দেড়শো রান উঠতে দেখলে যাঁর মুখে সামান্য আভামাত্র দেখা যায় ('উদ্-ভাসিত' তাঁর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কথা), অন্য উত্তম ব্যাটসম্যান ৫০ পেরোলে যেটুকু সুখবোধ করেন এখানে তার বেশি নয়। যতই যা হোক, দেড়শো তো ভাল রানের অর্ধেক মাত্র! জিম কিলবার্ন জানিয়েছেন, ডনের বিষয়ে বেশি উচ্ছ্বাস বোধ করবার কারণ তাঁর নেই, কারণ ডনের আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁর ক্রিকেট-বীরদের

লর্ডসের 'গ্রেস গেট' দিয়ে ব্রাডম্যান বেরিয়ে আসছেন খেলোয়াড় হিসেবে ক্রিকেটের হেড-কোয়ার্টারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে। মনে বিষাদ ও গর্বের মিশ্র অনুভূতি। 'জেন্টলম্যান' দলের সঙ্গে খেলার শেষদিনের স্মৃতিতে মন ভারী হয়ে আছে। খেলার মধ্যেই নিজের জন্মদিন পড়েছে। লর্ডস থেকে উপযুক্ত-ভাবে বিদায় নিতে পেরেছেন—দেড়শো রান করেছেন, তার দ্বারা সফরে দু-হাজার রান পেরিয়ে গেছে—তাঁর দল জিতছে—শেষদিনে মাঠে নামবার পরেই নিজ দলের খেলোয়াড়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সমস্বরে গেয়েছে 'হ্যাপি বার্থডে' গান—যখন খেলা শেষ করে ফিরছেন, দর্শকেরা প্যাভিলিয়ানের সামনে আবার ঘিরে ধরেছে—হাজার-হাজার কণ্ঠ সুরে উদ্বেল হয়েছে—'সুখ জন্মদিন, শুভ জন্মদিন—'

Brightly Fades the Don.—ডনের উজ্জ্বল অবসান—ফিঙ্গলটন লিখলেন। 'ডন' শব্দটি অর্থশ্লেষে আরও অর্থ আনল—Don এবং Dawn—অর্থাৎ প্রভাতী উজ্জ্বলতা নিয়েই অবসান।

আসন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং পরিষ্কার চোখে ডনকে দেখে তিনি বলেন ...ডন অতুলনীয়! নিজের শ্রেষ্ঠ সময়ে নিজ পদ্ধতির সর্বোত্তম রূপকার। সেই পদ্ধতি বদল করানোর ষড়যন্ত্র যখন হল, তখন কিলবার্নের অভিমত, ডনের স্বৈরাচার বডিলাইনের 'নৈরাচারে'র চেয়ে ভাল। যেখানে ট্রাম্পারের স্পর্ধিত ঘোষণা, রনজির জাদুবিস্তার, সেখানে ডনের ধ্বংসের দণ্ড—শীতল, নিষ্ঠুর, ইচ্ছাচালিত। তাঁর শক্তিই তাঁর উল্লাসের হেতু। যতদিন ক্রিকেট থাকবে, তিনি আলোচিত বিশ্লেষিত, হয়তো আক্রান্ত হবেন, কদাপি বিস্মৃত নন। রায়ান সেলার্স ডনকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার নামে অভিহিত করে নিজের পিতার অনুরূপ অভিমতের কথা বলেছেন, যিনি ডবলিউ জি'র সঙ্গেও খেলেছেন। জন আর্লট বিশ্বাস করেন, ডনের মনোনিবেশের ক্ষমতা এমনই অসাধারণ যে, যে-কোন বিষয়ে তিনি সাফল্যলাভে সমর্থ—যদি মানুষের ক্ষমতার মধ্যে তা থাকে। ব্রাডম্যান রেকর্ডলিপ্সু সন্দেহ নেই, কিন্তু রেকর্ড করার কালে নিতান্ত ব্যবসায়িক মারেও তিনি সর্বাধিক সৌন্দর্য বজায় রাখেন। ক্রিকেট, ব্রাডম্যানের চামড়ার তলায় নয়, তা আছে তাঁর খুলির তলায়, সম্পূর্ণ কঠোর নিয়ন্ত্রণে। তাই তিনি অল্পশক্তিমানেরা যা পেয়েছেন তাতে বঞ্চিত। ব্রাডম্যান সুখ কাকে বলে জানেন কি? আর্থার মেইলি বলেন, লক্ষ-লক্ষ লোকের স্বপ্নের দেবতা

কিন্তু কোথায় আছে মধ্যাহ্নে অন্ধকার? সন্ধানী ফিঙ্গলটন তারই সন্ধানে। সফল মহানায়ক ব্রাডম্যান, আর ট্র্যাজিক প্রতিনায়ক—কোথায় তিনি—? ক্রিকেট একজনকে দিয়েছে—ঢেলে দিয়েছে—অকৃপণ হাতে। কিন্তু বঞ্চিত যিনি, অথচ মহাপাণ্ডবদেরই একজন, যাঁর রথচক্র গ্রাস করল বিরূপ ভাগ্য—

"তাঁকে পেলাম—ব্লাকপুলের একটা ছোট রাস্তায়। খেলার জীবনে তাঁর সেরা বন্ধুদের একজন, জর্জ ডাকওয়ার্থ, তাঁর বাড়ির পথ জানতেন। 'ছোট, সাজানো পাঁচমিশেলি দোকান—কিন্তু তাতে তাঁর নাম কোথাও পাবে না'—জর্জ জানালেন। নাম সত্যিই পেলাম না—কী অদ্ভুত! তাঁর কালে তাঁর নাম ব্রাডম্যানের মতোই বিখ্যাত—কিন্তু সে-সব ব্যাপার একেবারে চুকিয়ে দিয়েছেন। সে-সব কথা শোনায় তাঁর আগ্রহ নেই একেবারে।

"তাঁর বড় মেয়ে আমাদের প্রথম দেখতে পেয়েছিল। জর্জকে চিনতে পেরে প্রবল আনন্দে অভ্যর্থনা জানালো। বাড়ির পিছন দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সেখানে এক ঘরোয়া কক্ষে—যার দেওয়ালে ক্রিকেটের মহাচাঞ্চল্যের নানা ক্ষণের ফটোগ্রাফ টাঙানো আছে—তিনি আমাদের শান্ত কিন্তু উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। আমাকে অবিলম্বে চিনলেন, যদিও ১৯৩২-৩৩-এর ঝঞ্ঝাময় দিনগুলির পরে এই প্রথম তিনি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার দেখলেন—আমাকে। সে-সব দিনে সংবাদ-পত্রের উপরে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত আড়া-আড়ি লেখা থাকত তাঁর নাম—যেমন মাঠের উপরে আড়া-আড়ি শুইয়ে দিতেন তাঁর শিকারদের। এখন, ১৯৪৮ সালে, তখনকার তুলনায় অনেক রোগা হয়ে গেছেন। তাঁর পিছনে চলতে-চলতে কারো পক্ষে কোনোভাবে অনুমান করা সম্ভব নয় যে—ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফাস্ট-বোলার বর্তমান কালের। এ'র কালে এ'র মতো সুষম বোলিং-রীতি দেখাই যায়নি। তবে যথেষ্ট রোগা হলেও মুখের চেহারা বিশেষ বদলায়নি। তিনি এখনো সেই একই হ্যারল্ড লারউড।"

ক্রিকেটের সর্বোচ্চ ট্র্যাজিক চরিত্র হ্যারল্ড লারউড। ক্রিকেটের সর্বোত্তম ফাস্ট-বোলার। কেন তাঁর এহেন স্বেচ্ছা-নির্বাসন? ক্রিকেটের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ক্রিকেট-মাঠে যান না কেন? কেন নিজেকে এমনভাবে সরিয়ে নিয়েছেন, যাতে

ব্রাডম্যান অল্প-কিছু লোকের কাছে নিতান্ত বিদ্বেষের পাত্র। ঈর্ষাই তার কারণ, এবং ব্রাডম্যানের স্বাতন্ত্র্যও। যে-আইনভঙ্গের জন্য ব্রাডম্যান অল্প-কিছু ফাইন দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছেন সেই অপরাধ করলে অন্য খেলোয়াড়ের কাছে খেলার দ্বার চির-দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। কারণ গ্রেট ডন খেলার চেয়ে বড়, অন্তত খেলার পরি-চালকদের চেয়ে। ব্রাডম্যান কঠিন ও নিঃসঙ্গ পথ বেয়ে উঠেছেন। তিনি জানতেন বিরোধীদের বিরুদ্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠ অস্ত্র সেঞ্চুরি, আরও সেঞ্চুরি। কখনো এ-ভুল করেননি, যে-ভুল অনেকেই করে থাকেন, ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা সাফল্যের চেয়ে বড় জিনিস। মাননীয় স্যর জি মেনজিস-এর কাছে ডন ব্রাডম্যান সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান, দারুণতম মারিয়ে, আর ধুরন্ধরতম কৌশলী। রাজনৈতিক নেতা মেঞ্জিস ব্রাডম্যানের সর্ববিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিতে বিস্মিত, যিনি এমনকি অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধেও সমান দক্ষতার সঙ্গে চিন্তা করতে পারেন। ক্রিকেট-নামক সর্বশ্রেষ্ঠ খেলার দর্শক হিসেবে তিনি ডনের কাছে যে-ঋণী, তা কখনো শেষ হবার নয়।

তাঁর অবস্থিতির চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গেছে লোকচক্ষু থেকে, যেখানে তাঁর চেয়ে বহু নিম্নক্ষমতার অজস্র ক্রিকেটারের নাম নানা আকারে বিজ্ঞাপিত হয় সারাক্ষণ, সর্বত্র। লারউড ১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৪৮—কোনো অস্ট্রেলিয়া-দলেরই খেলা দেখেননি। নিজ সেনাপতি জার্ডিনের সঙ্গে ১৯৩৫ সালের পরে দেখা হয়নি। কেন? কি কারণে? একেবারে খেলার মাঠে যাননি তা হয়তো নয়, কিন্তু মাত্র একবারই গিয়েছিলেন, পয়সা দিয়ে টিকেট কেটে। ব্যালকনিতে বসে-থাকা হ্যামণ্ডের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন—তিনি উপরে উঠে আসতে ইঙ্গিত করলেও লারউড যাননি। তখন ডাকওয়ার্থ এসে তাঁকে ড্রেসিংরুমে নিয়ে যান। সেক্রেটারী জিজ্ঞাসা করলেন—কিভাবে মাঠে ঢুকেছেন। 'পয়সা দিয়ে'—উত্তর হল। 'কী-ই-ই! কি করে?'—'হ্যাঁ পয়সা দিয়ে। আমি কারো দরজায় দাঁড়াতে রাজী নই।' 'হ্যারল্ড, শোনো, এই মাঠে অন্তত তুমি পয়সা দিয়ে ঢুকো না। তোমার কাছে আমাদের যে ঋণ, তাতে পয়সা দিয়ে তোমার ঢোকার কথা নয়'—সেক্রেটারী বলেছিলেন। লারউড বলেছিলেন—'ধন্যবাদ।' কিন্তু আর যাননি।

না না, ক্রিকেট নয়—কি দরকার? তার থেকে ফুটবল ভাল। নিজের পরিবারের স্নেহ-ভালবাসা, দায়-দায়িত্ব, সেইসঙ্গে কিছু ফুটবলের আকর্ষণ—আর অবসর-প্রাপ্তের শান্তির জীবন। ক্রিকেট? সে থাক স্মৃতিতে। স্মৃতিচিহ্নগুলি দিয়ে মোড়া একটি ঘরের মধ্যে লারউড সময় কাটান—নিজের গৌরবের মধ্যাহ্নদিনের কল্পনালোকে। কিংবা যখন সত্যই বল-হাতে খেলতে নামেন—সে-খেলা ছেলে-খেলা, উঁহু, মেয়ে-খেলা—বাক্সভাঙা কাঠে তৈরি ব্যাট, রবারের বল, খেলোয়াড় হল কয়েকটি বাচ্চা মেয়ে—তাদের বল দেন তাদের বাবা, চশমা-পরা এক ব্যক্তি যাঁর নাম হ্যারল্ড—যিনি ব্রাডম্যানেরও রানের প্রাসাদ বলের গোলায় গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন একদিন।

এইখানে ক্রিকেটের মহানাট্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। কেন লারউড একদিন খেলেছিলেন—কেন একদিন নিজেকে খেলা থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন, অন্তত টেস্টখেলা থেকে—সেই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জন্য উদ্যত হয়ে আছে—স্বয়ং লারউড সে উত্তর দিয়েছেন—

* * * আকাঙ্ক্ষার ক্রন্দন এবং উত্তর * * *

'আলো—কোথায় আলো—দম বন্ধ হয়ে আসছে—আলো চাই—'

একটি কিশোর বালকের আর্তনাদ আছড়ে পড়তে লাগল খনির অন্ধগুহায়। আর্তনাদের সঙ্গে কতকগুলো অশালীন শব্দের গোঙানি।

দরিদ্র পিতার অনেকগুলি ছেলের একটি—চৌদ্দ বৎসর না হতেই পেটের দায়ে কাজ নিয়েছে কয়লাখনিতে। তিন মাইল দূরে কয়লাখনি, সেখানে রোজ পায়ে হেঁটে যেতে, ও সেখান থেকে হেঁটে ফিরতে হয়। সূর্য-ওঠা সকালে খনির মুখে পৌঁছয়, তারপরেই হারিয়ে যায় সব আলো—চিররাত্রির আঁধারে ঢুকে পড়ে বালকটি। 'পিটবয়'-এর চাকরি তার।—

"রোজ সকালে খাঁচায় করে খাদের তলায় নামিয়ে দেওয়া হোত। তারপর কালি-ঢালা অন্ধকারে অতি সংকীর্ণ টানেলের মধ্য দিয়ে দু'-তিন মাইল হেঁটে পৌঁছতে

হোত কয়লা কাটার জায়গায়।...আমার কাজ ছিল চার পাঁচটি টব-এর একটি ট্রেন' চালানো—যেটি টানত একটা টাট্টু ঘোড়া।...সেই অন্ধকারে একমাত্র আলো, শ্রমিকদের হাতের তেলের কুপি। আলোর পরিমাণ এতই অল্প যে, মুখের উপর তুলে না ধরলে লোক চেনা যেত না।

"আমার হাতের আলো প্রায়ই নিভে যেত। তখন সত্যই কয়লার মতো কালো অন্ধকার। সেই নীরন্ধ্র আঁধারের মধ্যে টানলের গা হাতড়ে-হাতড়ে আমাকে এগোতে হোত...

"যেসব টানেলের মধ্য দিয়ে কয়লার 'ট্রেন' নিয়ে যেতাম, সেগুলি এতই সরু যে, আমাকে গাড়ির সামনে কিংবা পিছনে কোনক্রমে হেঁটে চলতে হত। উপরে এমন জায়গা ছিল না যে ভর্তি টবের উপর বসে পড়ি।...

"ঘর্মাক্ত-কলেবর শ্রমিকেরা সশব্দে টবের উপর খোন্তা করে কয়লা ছুঁড়ে ফেলে দিত, তারপর আমার যাত্রা শুরু হত অন্ধকারে। হাঁপাতে-হাঁপাতে টাট্টু ঘোড়াটি গাড়ি টেনে চলত, যদিও তাকে দেখতে পেতাম না। এই একঘেয়ে যাত্রার বিরতি ঘটত, যখন টাট্টুর জিন ধাক্কা খেত পাথরে, আর তার তীক্ষ্ন চীৎকার ছড়িয়ে পড়ত গুহাগর্ভে।...

"দিনের পর দিন এই জিনিস—যদিও দিন তা নয়—রাত্রি—রাত্রি!"

শুধু এই কষ্ট? আরও অনেক অনেক যন্ত্রণা। ভারী টব উল্টে যেত। দম বন্ধ করে, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত যেন ব্যয় করে তাকে সোজা করার চেষ্টা করতে হোত। পারত না অনেক সময়—চেঁচিয়ে কাঁদত—নৈরাশ্যে হাহাকার করত—বুকের যন্ত্রণা মুখের নোংরা শব্দে নির্গত হোত।

এমনি করে তিন বছর কাটার পরে কিশোর যখন যৌবনের মুখে, তখন ১৭ বছর বয়সে কয়লাখনিতে এক নতুন চাকরি—এবার দিনে নয়—রাত্রে। আগে ছিল দিনে রাত, এখন রাতে রাত।

শীতের ভয়ঙ্কর রাত্রি। তবু পায়ে বুট ও পরনে ট্রাউজারের বেশি কিছু দরকার হোত না। আলগা গায়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘামতে হোত, যখন ফুট-তিনেক গর্তের মধ্যে ঘাড় গুঁজে ঢুকে তেলের অস্বচ্ছ প্রায়-ভৌতিক আলোয় আবর্জনা পরিষ্কার করতে হোত—দিনের শ্রমিকদের কাজের সুবিধার জন্য! ধারালো কয়লার খোঁচায় পিঠ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেত, সর্বাঙ্গ টনটন করত, তবু করতে হোত, কারণ উপায় ছিল না।

উপায় ছিল না। উপায় হবে না? মুক্তি নেই—এই মৃত্যুতমসা থেকে?

"আমার মুক্তি—ক্রিকেটে।"

নটিংহ্যামের নানকারগেট নামক গ্রামে ১৯০৪, ১৪ই নভেম্বর লারউড পরিবারে যে-ছেলেটি জন্মেছিল, তার মধ্যে অচিরকালে এমন কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়নি, যার জন্য ইতিহাস কৌতূহলী হতে পারে! একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংবাদ, ছেলেটি অপুষ্ট আকারে ভূমিষ্ঠ হয়, এবং ভবিষ্যতে তার সর্বোচ্চ উচ্চতা ৫ ফুট ৭½ ইঞ্চির উপরে ওঠেনি। অথচ 'দৈত্য', 'রাক্ষস' ইত্যাদি শব্দ তার বিষয়ে এতবার উচ্চারিত হবে—খুব কম খেলোয়াড়ের বিষয়েই যা হয়েছে।

ছটফটে ছ' বছরের ছেলেটি একদিন বেশ খানিক প্যারাফিন খেয়ে ফেলল—

অনেক চেষ্টায় শেষপর্যন্ত প্রাণে বাঁচল। তার মনোযোগ প্যারাফিনাদি থেকে সরিয়ে দেবার জন্য তার বাবা বেড়া ভেঙে একটা ব্যাট তৈরি ক'রে রবারের বল-সহ তার হাতে ধরিয়ে দিলেন। ছেলেটি বস্তুগুলোকে আঁকড়ে ধরেছিল বটে! পড়াশোনায় তার মন গেল না—বাড়িতে মায়ের দুঃখ, বাবার প্রহার, এবং স্কুলে শিক্ষকদের নানাবিধ পীড়ন সত্ত্বেও। বাবাকে অধিকন্তু সে তাগিদে-তাগিদে অস্থির করে মারতে লাগল—ব্যাট কিনে দাও, বল কিনে দাও! গরীব বাবার তাতে অসুবিধের সীমা ছিল না। শুধু তাই নয়, ছেলেটির সঙ্গে খেলতেও হোত তার বাবাকে। বাবা অল্প-স্বল্প খেলতে পারতেন। কোলিয়ারীতে যখন ছেলেটি ঢুকল, তখনো খেলা চলতে লাগল সবেগে—খাদের ছেলেগুলিকে জুটিয়ে নিয়ে। 'বিদ্যুৎ'—এই উপাধিও পেয়ে গেল, এতই জোরে দৌড়ত সে। রোগা লিকলিকে, শরীরে বেশি-কিছু আছে মনে হয় না, তবু হাতের বলে জোর কম ছিল না। অনেককেই চমকে দিত তা।

কোলিয়ারীতে রাতে কাজ করায় একটা সুবিধা হয়েছিল—দিনে মিলত খেলার অবসর! যে-বছর সে গাঁয়ের একনম্বর দলে জায়গা পেল সেই বছরটি, ও প্রথম খেলাটি তার জীবনে চিরস্মরণীয়।

আগের গোটা রাত্রি সে কাজ করেছে কোলিয়ারীতে। তবু খেলতে নামল ম্যাচে। এত গরীব যে, ক্রিকেট-বুট জোটাতে পারেনি। সাধারণ জুতো পরেই খেলছে। কয়েক ওভার বল করার পরেই নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। সঙ্গী খেলোয়াড়রা বলল, যাও যাও, বিশ্রাম করো, আর খেলে কাজ নেই। ছেলেটি শুনল না। বল করে চলল—চলল—কারণ সে খনির অন্ধকারের মধ্যে কাজ করার সময়ে ক্রিকেটের স্বপ্ন দেখে। অন্ধকারেই সে কল্পনার বল ছোঁড়ে—বল গিয়ে ছিটকে দেয় স্টাম্প—তার শব্দ ছড়িয়ে পড়ে—ঘুরপাক খায় টানেলের গায়ে-গায়ে—কল্পনার কানে সে শোনে। সেখানে—এই সত্যকার খেলায়—জীবনের প্রথম এই বড় খেলায়—থেমে যাবে সামান্য নাকের রক্তের জন্য? কখনো না, কখনো না।

রক্ত মুছে ছেলেটি ছুটতে শুরু করে আরও জোরে। আরও জোরে বল—আরও জোরে। রক্ত পড়া বেড়ে যায়। গল্‌গলিয়ে ঝরে পড়ে—জামা রক্তে রাঙা। সবাই বলে—চলে যাও, চলে যাও। না—না—না—। হঠাৎ ছিটকে পড়ে মিডল-স্টাম্প—আঃ—! রক্ত-মোছা হাত আবার বল ছোঁড়ে—এবার ভেঙে গেল সব-ক'টা উইকেট। রক্তপাতে আর অসহ্য আনন্দে দুর্বল হয়ে পড়ে সে। তবু—তৃতীয় বল—ভেঙে গেল অফস্টাম্প।

রক্তের মূল্যে ছেলেটি জীবনের প্রথম হ্যাটট্রিক পেল!

সে ক্রিকেট খেলবে না? ক্রিকেট-যে তার কাছে বাঁচার একমাত্র কারণ!

* * * এ গি য়ে এ লো সে... * * *

অনেক পথ হেঁটে এসেছি আমি, অনেক পথ—নান্‌কারগেটের কয়লাখনি থেকে লর্ডসের সবুজ কার্পেটে ঢাকা মাঠে—একেবারে হেডকোয়ার্টারের চোখের সামনে—ক্রিকেটের মক্কায়। 'The pony pit-boy had come a long way.'

ছেলেটি থামেনি, থামার কথা ভাবতে পারেনি। প্রতি মরশুমের গোড়ায় লেগে

বল হাতে নিয়ে অজানা আশঙ্কায় সে শিউরে উঠেছে—বোধহয় সে আর বল করতে পারবে না—যা শিখেছে হয়তো ভুলে গেছে ইতিমধ্যে—যদি তাই হয়—না না—হে ঈশ্বর! তার চোখের সামনে ঝোলানো ছিল কালো দুঃস্বপ্ন—কয়লা-খনির গুহাগর্ভ।

১৯২৬ সালে অস্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে মনোনীত হবার সংবাদ যখন হ্যারল্ড লারউড অধিনায়ক আর্থার কার-এর কাছ থেকে পেয়েছিলেন (এখন আর 'সে' নয়, 'তিনি'), তখন বিনীত সৌজন্যের সঙ্গে অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যকে বরণ করে বলেছিলেন—'ইংলন্ডের পক্ষে খেলব—এত-খানি যোগ্যতা কি অর্জন করতে পেরেছি স্কিপার!'—তখন লারউডের পিছনে আছে কয়লাখনি ছেড়ে আসার পরে তিন বছরের নিরন্তর সাধনার ইতিহাস। 'আমি এমনি কিছু পাইনি, সহজাত কিছু নয়, আমার নৈপুণ্য কষ্টার্জিত'—লারউড বলেছেন।

জো হার্ডস্টাফ (এই নামে পরবর্তীকালে সুপরিচিত ব্যাটসম্যানের পিতা) লারউডকে বড় ক্রিকেটের দরজায় পৌঁছে দেন। গাঁয়ে লারউডের খেলা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, ছেলেটির মধ্যে খুব বড় খেলোয়াড় হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নেটে যারাই তাকে দেখল তারাই হতবাক্। এই প্যাংলা ছেলেটা, ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি মাথায়, ফ্যাকাশে রোগা—এ হবে ফাস্ট-বোলার—হা ভগবান! তারপর সে যখন সোয়েটার খুলে ফেলে মেপে-মেপে কুড়ি পা দূরে গেল বলের দৌড় আরম্ভ করার জন্য—তখন সবাই হাসিতে, করুণায় অস্থির—'বাহা রে! ও বল করবে—অ্যাঃ! উইকেট পর্যন্ত দৌড়ে আসতে পারবে তো!'

কিছু জোরে, সদস্যদের অনুকম্পা নষ্ট করার মতো জোরে, নিশ্চয় ছেলেটি বল করেছিল, নচেৎ প্র্যাকটিশের শেষেই তার সঙ্গে ক্লাব-কর্তৃপক্ষ কণ্ট্রাক্ট করে ফেলতেন না। সপ্তাহে ৩২ শিলিং—খনিতে যা পেত—তাতেই সে রাজি। বেশি চাইল না কেন? খনি থেকে মুক্তি—তার আনন্দই তো সবচেয়ে বড় পাওনা!

জিমি আয়ারমঙ্গারের কাছেই লারউড মূলত শিক্ষা পান। সে কৃতজ্ঞতা তিনি চিরদিন স্বীকার করেছেন। কঠোর পরিশ্রমের পথেই শিক্ষা নিতে হয়েছিল। প্রাকটিশের জন্য আধঘণ্টা হেঁটে স্টেশনে, তারপর আধঘণ্টা ট্রেনে, তারপর কুড়ি মিনিট হেঁটে মাঠে। প্র্যাকটিশশেষে ফেরারও একই রীতি। ক্রিকেটের জন্য শরীর তৈরি রাখার অন্য ব্যায়ামের সুবিধা না থাকায় শীতকালে এক বন্ধুর সঙ্গে রাত্রে মাইলের পর মাইল হাঁটা। 'ছোট্ট বেঁটে মানুষ, ভারী ভদ্র, খুব সিরিয়াস, সরে থাকতে ভালবাসে অথচ চোখ কান সম্পূর্ণ খোলা'—আর্থার কার এইকালের লারউড সম্বন্ধে বলেছিলেন। লারউড শান্ত, তবে অশান্ত একটি কামনায়—ব্যাটসম্যানকে আউট যদি করতে হয়, বোল্ড করব, কট-আউটে সুখ নেই। এইকালে একদিন তিনি সানন্দে জুতা পরিষ্কার করেছিলেন মরিস টেটের। জুতা পরিষ্কারের কাজে তিনি নটিংহ্যামের ড্রেসিংরুম-ভৃত্যকে সাহায্য করতেন। টেটের জুতা পরিষ্কার করতে পেরে নিজেকে ধন্য বোধ করলেন। 'জুতা পরিষ্কার? জুতোর শুকতলা খেয়ে ফেলতে পারতুম'—কেননা টেট ছিলেন লারউডের অন্যতম দেবতা। [illegible] আগে দু' শিলিং বকশিস করে

গেলেন, যে-টেটকে একদিন তিনি সরিয়ে দেবেন ক্রিকেট থেকে!!

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে লারউড ভালভাবে ঠাঁই করে নিলেন। তার পথে প্রথম বৃহৎ পদক্ষেপ, সাটক্লিফের উইকেট আদায় করেই। সাটক্লিফ আগের মরশুমে অস্ট্রেলিয়ায় সেরা খেলা দেখিয়ে এসেছেন। সাতটা টেস্ট ইনিংসে তাঁর রান: ৫৯, ১১৫, ১৭৬, ১২৭, ৩৩, ৫৯, ১৪৩। তাঁর এবং তাঁর ইয়র্কশায়ার-দলের বিরুদ্ধে বল হাতে নিয়ে যখন লারউড দাঁড়ালেন, তখন 'বহু বছরের মধ্যে সেরা ফাস্ট-বোলারে'র চেহারা দেখে অনেকেই হেসে গড়িয়ে পড়ল। সে হাসি কিছুটা কমল, যখন তীব্র গতিতে প্রথম বলটি সাটক্লিফের উইকেটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এবং সে-হাসি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল, যখন দ্বিতীয় বলটি বিখ্যাত ওপেনারের ব্যাটে ধাক্কা খেয়ে সোজা ছুটে এল আর্থার কারের নির্ভুল হাতে।

সাটক্লিফের নামের আগে যে-সুমহান গৌরবময় নামটি যুক্ত—তা হল হবস্। হবস্-সাটক্লিফ। হবস্ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ব্যাটসম্যান। বহু ইংরেজের কাছে মাঠের ঈশ্বর—লারউডের কাছেও। এ'রই খেলা দেখবার জন্য ১২ মাইল পথ হেঁটে বালক লারউড একদিন গিয়েছিল মাঠে। ১৯২৬ সালে সারের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে লারউড ট্রেন্টব্রিজে এই বিখ্যাত ব্যাটসম্যানকে (লারউডের মতে সেই সময়ে পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যান) যখন অফ থেকে হঠাৎ-বাঁক-নেওয়া একটি বলে বোল্‌ড্ করে দিলেন অল্পকালের মধ্যে, তখন সকলের সঙ্গে অবাক হয়েছিলেন হবস্ও। কোন নতুন বোলারের পক্ষে হবস্‌কে বোল্‌ড্ করে দেওয়া মহাগৌরবের বিষয়। সুতরাং সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হুমড়ি খেয়ে প্রশ্ন করল 'দি মাস্টার'কে। তিনি উত্তর দিলেন, ও কিছু নয়—হঠাৎ হয়ে গেছে—ফ্লুক। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে যখন একই 'ফ্লুক' অচিরে ভেঙে দিল চ্যাম্পিয়নের উইকেট—তখন তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নীরব রইলেন।

সেই তাৎপর্যপূর্ণ মহান নীরবতা প্রশংসার ছন্দে বেজে উঠেছিল লর্ডসের খিলান-ঘেরা মর্যাদা-গম্ভীর কক্ষে নিশ্চয়—নিশ্চয়ই—নচেৎ কয়লাখনিতে অল্প-দিন আগেও কাজ-করা একটি প্রায়-অখ্যাত যুবক হঠাৎ কি করে ইংলণ্ডের সর্ব-শ্রেষ্ঠ খেলার প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেন? জ্যাক হবস্, মনোনয়ন-সমিতির সদস্য ছিলেন, 'খেলোয়াড়' ছিলেন এবং 'ভদ্রলোক' ছিলেন। একটি অখ্যাত ছেলে তাঁকে দুবার বোল্‌ড্ করে দিয়েছিলেন—একে ছেলেটির দোষ নয়, গুণ বলেই তিনি ধরেছিলেন।

বড় খেলার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে লারউড 'খেলোয়াড়' ও 'ভদ্রলোক'—এই দুটি শব্দের বিশেষ অর্থ বিশেষভাবে শিখলেন। ইংলণ্ডের ক্রিকেট-পৃথিবীতে ঐ শব্দ-দুটি জড়াজড়ি করে বাস করেনি। খেলাকে যারা বৃত্তি করেছে, অর্থাৎ প্রফেশন্যাল যারা, তারাই 'প্লেয়ার' বা 'খেলোয়াড়', আর যারা পিতৃপুণ্যে বা অন্যপুণ্যে অন্নবস্ত্রাদি সম্বন্ধে নির্ভাবনা হয়ে খেলার মাঠে ব্যাট বা বল হাতে ঘোরাঘুরি করতে পারে—তারা, বলাই বাহুল্য, অ্যামেচার—সুতরাং সভ্য ও ন্যায়পর ইংরেজের খেলোয়াড়ী এটিকেটের অভিধানে একমাত্র 'জেন্টলম্যান' বা

'ভদ্রলোক'। এই ভদ্রলোকেরাই ইংলণ্ডের ক্রিকেট-দলের অধিনায়ক হবার অধিকারী ছিলেন। লর্ড হক্-এর বিখ্যাত হক্ কথা: 'ভরসা করি, যেদিন ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন হবে কোনো পেশাদার সেদিন আমি এ-পৃথিবীতে নেই!'

সুতরাং, লারউড দেখলেন, জেন্টেলম্যানদের নামের আগে 'মিস্টার' বলতে হয়, প্লেয়ারদের শুধু নাম ধরে ডাকলেই চলে যায়। জেন্টেলম্যানেরা এক গেট দিয়ে মাঠে যায় আসে, প্লেয়াররা অন্য গেট দিয়ে। জেন্টেলম্যানদের সাজঘর এক, প্লেয়ারদের ভিন্ন। দুটি জিনিস দেখে লারউড আশ্বস্ত হলেন, মাঠের মধ্যে আলাদা গেট বা আলাদা ড্রেসিংরুম করা যায়নি, সেখানে জেন্টেলম্যান ক্যাচ ফেললে প্লেয়ার রাগারাগি করতে পারে, এবং...জেন্টেলম্যান যদিও ক্যাপ্টেন, তবু অনেক সময় প্লেয়ারদের চেয়ে খেলা কম বোঝেন, সুতরাং এ-পক্ষের বড় খেলোয়াড়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্যাপার-স্যাপার জেনে নিতে হয়, তাছাড়া... ড্রেসিংরুম আলাদা হওয়াই ভাল বাপু! ক্যাপ্টেন গায়ে রগড়ে থাকলে কথা-বার্তা, ফষ্টি-নষ্টির অসুবিধে।

'জেন্টেলম্যান' ও 'প্লেয়ারে'র পার্থক্যে লারউড বিশেষ অসুবিধা দেখতে পেলেন না, বিশেষত যখন জ্যাক হবসের মতো খেলোয়াড় প্লেয়ারদের মধ্যে রয়েছেন, যিনি ইংরেজের ক্রিকেট-অভিধানে যাই হোন—মূল অভিধানে গ্রেটেস্ট জেন্টেলম্যান।

'প্লেয়ার' লারউড যদি সবটা ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন!

* * * এবং উড়িয়ে দিল ঝড়ের মুখে... * * *

১৯২৬ থেকে ১৯২৮—এই তিন বৎসরে বিপুল প্রতিশ্রুতি উপযুক্ত পরিণতি পেয়েছে। ১৯২৬-এ লারউড যখন টেস্টে প্রথম সুযোগ পেলেন, তখনও বলে চরম গতি আসেনি এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও অর্জনের অনেক কিছু আছে। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে তিনি মোটামুটি বল করেছিলেন, প্রশংসাও পেয়েছিলেন মোটামুটি। তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্ট বৃষ্টিতে ভেসে গেল। পঞ্চম টেস্ট চলবে ফলাফল না-হওয়া পর্যন্ত। ইংলণ্ড বাজি ধরেছে দুজন বোলারের উপর —একজন আনকোরা নতুন, ২১ বছরের ছোকরা ফাস্ট-বোলার হ্যারল্ড লারউড, অন্যজন ৪৮ বছরের প্রৌঢ় প্রায়-অবসরপ্রাপ্ত স্লো-বোলার উইলফ্রেড রোডস, যিনি প্রথম টেস্টে খেলেছিলেন ২৭ বছর আগে।

লারউড, রোডস ও টেটের বলের গুণে, এবং অস্ট্রেলিয়ার বিচারবুদ্ধির দোষে, সেই খেলায় ইংলণ্ড জিতেছিল। বোলিংয়ের ক্ষেত্রে লারউডের ভূমিকাই অন্যদের তুলনায় বড় ছিল: প্রথম ইনিংসে ৩-৮২, দ্বিতীয় ইনিংসে ৩-৩৪।

এই জয়ের জন্য উন্মাদনার প্লাবন বয়ে গেল ইংলণ্ডের উপর দিয়ে। হবস্‌কে কাঁধে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। লারউডের অভিনন্দনের সীমা রইল না। ২১ বছরের লারউড কাঁদতে লাগলেন। জীবনের সর্বোত্তম ক্ষণ এসেছে। আনন্দ—আনন্দ—এত আনন্দ—! কয়লাখনির কালো ছায়াটা আর নেই। কারণ:

'দৈত্যবালক লারউড!'...

'ইংলণ্ডের বোলার—উঠে আসছে। এক্ষেত্রে এখনো সে টেস্ট ক্রিকেটের পক্ষে কাঁচা। কয়েক বছরের মধ্যে কী না হয়ে দাঁড়াবে!'...

শেষ পর্যন্ত গতি বজায় ছিল। ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ।'...

'রোডস ও লারউড—পাকা ও কাঁচা দুজন যেভাবে সেরা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের ব্যূহ ভেদ করে প্রবেশ করেছিল দ্বিতীয় ইনিংসে, তাতে সিডনি, মেলবোর্ন ও এডিলেডকে আতঙ্কে হাঁ করে থাকতে হবে।'...

'১৯২১-এ গ্রেগরীর বলের পরেই লারউডের বলে সবচেয়ে জোর। অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের হুমড়ি খেয়ে নীচু হয়ে পড়ার এমন মধুর দৃশ্য বহুদিন দেখিনি।'...

'এতদিনে পাওয়া গেল! ইংলণ্ড খাঁটি ফাস্ট-বোলার পেয়েছে অবশেষে।' .

উদ্যোগ-পর্বে লারউডের বলের এবং রেকর্ডের চেহারায় একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়। ১৯২৬ সালে তিনি ইংলণ্ডে কাউণ্টিবোলিং-অ্যাভারেজে শীর্ষ-স্থানে, ৯৭টি উইকেট নিয়ে। সব খেলা জড়িয়ে ১৩৭টি উইকেট। ১৯২৭-এ বোলিং-অ্যাভারেজে তৃতীয়, ১০০টি উইকেট, কিন্তু দুবার আহত হয়েছিলেন, এবং অপারেশন করতে হয়েছিল। ১৯২৮-এ বোলিং-অ্যাভারেজে শীর্ষে, ১৩৮টি উইকেট, গড় ১৪ রানে। এই বছর ওয়েস্টইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টও খেলেন।

বোলিং হয়েছে তীব্র থেকে তীব্রতর। নিজের শরীর নাশ করে ফাস্ট-বোলারকে বল করতে হয়। তাদের বিষয়ে বলা হয়, পায়ের বুটজুতোর মধ্যে তাদের মাথা লুকিয়ে থাকে। ঘর্ষণে-ঘর্ষণে পায়ের চামড়া উঠে যায়, শরীর জ্বলতে থাকে যন্ত্রণায়, লুটিয়ে পড়ে ক্লান্তিতে, কিন্তু যখন ছিটকে যায় উইকেট—আঃ, অপরূপ সে সঙ্গীত! যখন ব্যাটসম্যানের শরীরকে হিম করে দিয়ে গা ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় উষ্ণ বল—তখন কিবা উপভোগ্য সেই আতঙ্ক!—আমার বলে খেলার সময়ে ভুল করা চলবে না, কদাপি না, আমি ফাস্ট-বোলার! যদি ভুল নড়েছ—উড়িয়ে নিয়ে গেঁথে দেব স্ক্রীনে। আমি ফাস্ট-বোলার—হ্যাঁ, আমার আক্রমণ শারীরিক আক্রমণ। আমার রক্ত পুড়ে ঐ আগুনেরে গোলার মতো বল ছুটেছে।

ফাস্ট-বোলিংকে ভয় করে না কে?

জর্জ গান হুক-মারে পারদর্শী। ফাস্ট-বোলিংয়ের জাতশত্রু। একদা এক কাউণ্টি-ম্যাচে দ্রুত বলসংহার কার্য সম্পন্ন করে জর্জ গান প্যাভিলিয়নে ফিরলে তাঁকে একজন বলেছিল—'হিঃ হিঃ, জর্জ, ফাস্ট-বোলিং তোমার বড্ড ভাল লাগে দেখছি।'

'তা-ই নাকি?'—জর্জ প্যাড খুলতে-খুলতে বলেছিলেন—'জেনে রেখো, ফাস্ট-বোলিং কেউই পছন্দ করে না। তবে একজন হয়তো অন্যের তুলনায় ভাল খেলে।'

সুতরাং লারউডের দারুণ অগ্নিবাণকে কারো ভালোবাসার কথা নয়। ভারতের লাল সিং, ধর্মে শিখ, ক্রিকেট-মাঠে পাগড়ি-সহ বিরাজমান। ব্যাট করেন ভালো। হুক করতে পারেন। কিন্তু ঐ পাগড়ি জিনিসটি টুপিধারী সাহেবদের চোখে অসহ্য। অতএব সফরকারী ভারতীয়-দল যখন নটিংহ্যামের বিরুদ্ধে খেলতে আরম্ভ করল, তখন স্যাম স্টেপলস্ [illegible] ধরে বসলেন লারউডের সঙ্গে—যদি

পাগড়ি ওড়াতে পারো, এক প্যাকেট তামাক।

পরদিন সত্যই, আক্ষরিকভাবে, লাল সিংয়ের পাগড়ি উড়েছিল লারউডের বলে।

১৯২৮-এ লর্ডসে ওয়েস্টইণ্ডিজের সঙ্গে টেস্টম্যাচের সময়ে লিয়ারী কনস্টান-টাইন ভয়াবহ গতিতে বল করলেন। লারউড বল শুরু করলে, আম্পায়ার ফ্রাঙ্ক চেস্টার খোঁচালেন: 'ভেবেছিলুম, তুমি জোরে বল করতে পারো। লিয়ারী দেখছি তোমার থেকে অনেক জোর।'

অতঃপর:

আমার একটা বল এফ আর মার্টিনের টুপির পাশে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্য একটি তাঁর কপালে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে উল্টে দিল। প্যাটসি হেনড্রেন সাহায্যার্থে ছুটে এলেন। কিন্তু সকলকে নিশ্চিন্ত করে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'আমি ঠিক আছি, প্যাটসি।' জর্জ চ্যান্সেলার মার্টিনের পার্টনার—তাঁর টুপিরও সেবা হল কিছু, এবং একটা উঠতি বলের দিকে প্রায় পিছন করে তিনি বসে পড়লেন।"

চেস্টার লিখেছেন: 'লারউডের তীব্রতম রূপ দেখলাম এই দিন। হাত থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র যেন অন্য প্রান্তে পৌঁছে গেছে।'

এহেন বলাধিকার নিয়ে লারউড যখন কৌতুক করেছেন—কী মারাত্মক হয়েছে সেই রসিকতা! লিস্টারশায়ারের ফাস্টবোলার হেডেন স্মিথ বলের জোরে নটিং-হ্যামশায়ারের ব্যাটসম্যানদের কিছু নাড়া দিয়েছিলেন। সুতরাং ঐ ব্যক্তি যখন শেষের দিকে ব্যাট করতে এলেন, নটিংহ্যামের একজন লারউডকে আবেদন জানাল—লোকটিকে কিছু সুখ দিতে।

অতএব লারউডের একটি বল অফের দিকে পড়ে স্মিথের কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। পরেরটি স্টাম্প বরাবর পড়ে ব্যাটে ধাক্কা খেয়ে গালির দিকে ছুটল, সেখানে ছিলেন স্যাম স্টেপলস্—তাঁর সামনে গজখানেক দূরে পড়লে তিনি ধাপানো-বলটি ধরে নিলেন।

স্মিথ উইকেট ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—স্যাম চেঁচালেন: 'আরে, ক্যাচ ধরিনি—ক্যাচ ধরিনি—যাচ্ছ কোথায়?'

'ধরেছ—বেশ ধরেছ—শা—' স্মিথ গটগটিয়ে চলে যেতে-যেতে মুখ ফিরিয়ে বললেন।

১৯২৮-এ লারউডের এই ভয়ঙ্কর গতি। তদুপরি অভ্রান্ত লক্ষ্য। সকলে বলল—একটা পেনীর উপরে তিনি বল ফেলতে পারেন। লারউড মৃদু বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন ঠিক অতটা নয়, তবে...। বিনয় কমিয়ে বলেছেন, আমার বলের সময়ে লেগের দিকে, ব্যাটসম্যানের একেবারে গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে, ফিল্ডিং করলেও আহত হবার সম্ভাবনা থাকত না—কারণ বল ঠিক জায়গাতেই পড়ত।

অস্ট্রেলিয়াগামী পার্শী চ্যাপম্যানের এম-সি-সি-দলে লারউড যখন স্থান পেলেন, তখন তাঁর ভাবে-ভঙ্গিতে ফাস্টবোলারীর কিছু ছিল না—তাদের সেই পরিচিত লম্ফ-ঝম্প, দাঁত কিড়মিড়, স্বগত নির্ঘোষ, ব্লাডহাউণ্ড আর বুনো মোষ মিলিয়ে তৈরি-করা আচরণ—না, লারউড চেহারায় ভদ্র, ব্যবহারে নম্র, কথায় শালীন, আচারে সংযত—কিন্তু যখন ছুটে আসেন তীব্র বেগে, সুন্দর ছন্দে দুলে

ওঠে শরীর, হাত থেকে ছুটে যায় বল—সে বলে শীতল রোষ—ধাবমান নিষ্ঠুর হিংসা—তখন—

'I loved the game but hated the batsman.'

ভালবাসি খেলাকে, ঘৃণা করি ব্যাটসম্যানকে।

*** * * প্রথম অস্ট্রেলিয়া-অভিযান * * ***

অস্ট্রেলিয়াও স্বীকার করল : দ্রুততম, শ্রেষ্ঠতম ফাস্ট-বোলার। কিছু সন্দেহ ছিল গোড়ায়, কিন্তু যখন মেলবোর্নে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ৭টি উইকেট নিলেন ৫১ রানে তখন—'দুর্ধর্ষ-দুর্বার সে; সে তেমনই বল করল যেমন বল করতে তাকে জানে ইংলণ্ড; ফাস্ট-বোলারের মাতৃভূমি অস্ট্রেলিয়াকে সে দেখিয়ে দিল, খেলার পক্ষে অসম্ভব বল কাকে বলে।'

উডফুল বললেন—'এও কিছু নয়, লারউড আরও জোরে বল করতে পারে।' যাঁদের মনে সন্দেহ-ব্যাধি কিছু ছিল, তাঁরা অচিরে রোগমুক্ত হলেন। যেমন : নেটে লারউডকে দেখে বিল পন্সফোর্ডের মনে হয়েছিল, তেমন জোর কিছু নয়। অল্প রানে যখন ফিরে এলেন—পরবর্তী ব্যাটসম্যান 'স্টর্ক' হের্নড্রি মধুর স্বরে শুধালেন : 'ও পনি! যতটা ভেবেছিলে, তার থেকে একটু বেশিই জোর—কি বলো?'

হের্নড্রি অবশ্য লারউডকে জোর বোলার বলেই জানতেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল—বাম্পার দিলেই ঠেঙাও। সুতরাং প্রথম ওভারে যেই শর্টপিচ পড়ল, অমনি বিদ্যুৎবেগে ব্যাট চলল। হায়! একটু সময়ের গণ্ডগোল—বলটা সোজা এসে বুকে লাগল। হের্নড্রি উৎপাটিত।

সিরিজে ইংলণ্ড জিতল চূড়ান্তভাবে। পাঁচটি খেলার প্রথম চারটিতে জয়—শেষটিতে মাত্র পরাজয়। লারউড আসার সময়ে 'বহন করে এনেছিলেন সমস্ত ব্রিটিশজাতির উচ্চাশা, যার ধারণায় তিনি পৃথিবীর সেরা ফাস্ট-বোলার'—সে আশার মর্যাদা বহুলাংশে রক্ষা করেছিলেন, যদিও পূর্বে দেখা গেছে, অস্ট্রেলিয়ার কড়া মাটিতে, এবং আর্দ্রতাহীন পরিবেশে অনেক ইংরেজ ফাস্ট-বোলারই সুইংগ হারিয়ে অকেজো হয়ে পড়েছেন। শক্ত জমির ধাক্কায় লারউডের পায়ে ব্যথা ধরত, সত্যই ভাল সুইংগ করানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, কিন্তু খুশি হয়েছিলেন নতুন একটা প্রাপ্তিতে—অস্ট্রেলিয়ার কঠিন জমিতে ধাক্কা খাইয়ে গুড লেংথের বলকে দ্রুত ওঠানো যায়।

ব্রিসবেনে প্রথম টেস্ট লারউডের ব্যক্তিগত কীর্তির ক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি ব্যাটিংয়ে দু'ইনিংসে ১০০-র উপর রান করলেন এবং উইকেট নিলেন ৮টি (৬-৩২, ২-৩০)। সেই সঙ্গে চারটি ক্যাচ। পূর্বে কোন ইংরেজ খেলোয়াড়ের পক্ষে এ-জিনিস করা সম্ভব হয়নি।

এই ব্রিসবেন-টেস্ট কিন্তু স্মরণীয় আরও নানা কারণে—উদয় বিদায়ে ইতিহাসে চিহ্নিত। ডন ব্রাডম্যানের প্রথম টেস্ট এইটেই। এবং এই টেস্টে ব্যর্থতার কারণে পরের টেস্টে অমনোনয়ন, যা তাঁর জীবনে মাত্র একবারই ঘটেছে। হবসের পক্ষে

শ্রেষ্ঠ ইংরাজ-ব্যাটসম্যান ওয়ালী হ্যামন্ডেরও এইখানেই প্রথম টেস্ট-আবির্ভাব।' এই খেলাতেই অসুস্থ হয়ে অস্ট্রেলিয়ার চার্লস কেলেওয়েরে বিদায়, এবং সবচেয়ে বড় ঘটনা—জ্যাক গ্রেগরীর বিদায় আহত অবস্থায়।

অনেকের মতে ছ' ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চির বৃহৎ মনুষ্য বা ক্ষুদ্র দৈত্য জ্যাক গ্রেগরী অস্ট্রেলিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ফাস্ট-বোলার। গ্রেগরী-ম্যাকডোনাল্ড বোলিং-জুটি এখনো সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত হয়। ম্যাকডোনাল্ডের নৈপুণ্য যদি ঈষৎ বেশি বলে কারো মনে হয়, তাঁর কিন্তু কখনো কোনো সন্দেহ হয়নি গ্রেগরীর গতিশীল ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে। ব্রাডম্যান তাঁর থেকে ডায়ন্যামিক আর কাউকে দেখেন-নি খেলার মাঠে। সেই গ্রেগরী এই খেলাতে হাঁটু ভেঙে খেলা থেকে চিরবিদায় নেন। ড্রেসিংরুমে কিভাবে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন—অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে-ছিলেন—'আর নয়, আর নয়—আমার শেষ!'—সে জিনিস ক্রিকেটের বহুস্মৃত ঘটনার মধ্যে পড়ে।

এই ঘটনার নাটকীয় অংশের আর একটু বাকি আছে। গ্রেগরীর হাঁটু গিয়ে-ছিল—লারউডের ক্যাচ ধরতে গিয়েই!!

শ্রেষ্ঠ অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট-বোলারের জীবন্ত সমাধির উপরে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ফাস্ট-বোলারের কীর্তিস্তম্ভ রচিত হবে—তাই ভবিতব্য।

প্রথম টেস্টের পরে লারউড একটি কবিতা পান—যার মূল কথা:

দয়াময় দয়া কর, ওগো ভয়হারী,
লারউড টেটেরে ধরে ঠেঙাইতে পারি!

দ্বিতীয় টেস্টে দেখা গেল পনস্‌ফোর্ড, বিখ্যাত যাঁর চওড়া ব্যাট, তিনি লার-উডের প্রভাতী আহার্যে পর্যবসিত হয়েছেন। পনস্‌ফোর্ড অবশ্য লারউডের সঙ্গে 'গুড-মর্নিং' করতে তেমন গা করেননি, নেমেছিলেন স্থান বদলে চতুর্থ ব্যাটসম্যানরূপে, (পনস্‌ফোর্ড ওপেন করেন); হলে হবে কি, বিলেতী-মতে নাকি মধ্যাহ্নে প্রথম সাক্ষাৎ হলেও গুড-মর্নিং করতে হয়—এবং সেইজন্য পনস্‌-ফোর্ডের 'বিশেষ পরিতৃপ্তির জন্য' লারউডকে আনা হল অবিলম্বে—ফলে পনস্‌-ফোর্ড হাত ভেঙে বিদায় নিলেন মাসখানেকের জন্য টেস্ট-ক্রিকেট থেকে। মাঠে যখন পনস্‌ফোর্ড আঘাত পেলেন, তখন লারউড অবশ্য বুঝতে পারেননি যে, তাঁর হাত ভেঙে গেছে, সুতরাং তিনি তাঁর উদ্দেশে ব্যাকুল সহানুভূতিতে ধাবমান হয়নি, আরও এই জন্য যে, 'ফাস্ট-বোলারকে তার উইকেটের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়; সে যদি সহানুভূতি দেখাতে শুরু করে, তার দফা সারা; বোলিং করার সময়ে বন্ধুত্ব-বিলাসিতা তার জন্য নয়; তাকে আক্রমণের মুখভঙ্গি বজায় রাখতেই হবে; যদি সে প্রতিবার আঘাতপ্রাপ্ত ব্যাটসম্যানের কাছে এগিয়ে গিয়ে ক্ষমা-প্রার্থনাদি করে—যে-আঘাত আবার ব্যাটসম্যান নিজ-দোষে পেয়েছে এবং যেটাকে খেলার স্বভাবসঙ্গী বলেই ধরতে হয়—তাহলে সে ব্যাটসম্যানকে ফিরে উপহার দেবে তার হারানো আত্মবিশ্বাস।'

তৃতীয় টেস্টে ব্রাডম্যান ফিরে এসেছিলেন। রান করেছিলেন ৭৯ ও ১১২। 'এই ম্যাচে', ব্রাডম্যান লিখেছেন, 'আমি প্রথম দেখলাম আঠালো উইকেটে

ইংরেজরা কতদূর খেলতে পারে; খুব বাজে উইকেটের মধ্যে পড়েছিলেন হবস্ ও সাটক্লিফ, আর মেলবোর্নের আঠালো উইকেট পৃথিবীতে জঘন্যতায় শ্রেষ্ঠ। হবস্ করেছিলেন ৪৯, সাটক্লিফ ১৩৫। আজ পর্যন্ত আমার ধারণা, আঠালো উইকেটে ব্যাটিংকে কতখানি ত্রুটিশূন্য করা যায়, তার দৃষ্টান্ত সেদিন দেখেছি সাটক্লিফের খেলার মধ্যে।'

লারউড এই খেলায় উইকেট পেলেন ৩-১২৭ ও ৬-৩৭, এবং ইংলণ্ড পরপর তিনটি টেস্ট জিতে অ্যাসেজ পেল।

চতুর্থ টেস্ট বিখ্যাত—অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে প্রথম অবতরণে উনিশ বছরের আর্চি জ্যাকসনের অসাধারণ ১৬৪ রানের জন্য। এমন উম্বুদ্ধ ব্যাটিং ক্রিকেট-ইতিহাসে অল্পই দেখা গেছে। আর্চিকে সামলাতে ইংলণ্ডকে হিমসিম খেতে হয়েছিল। মেইলী লিখেছেন, আর্চির বিরুদ্ধে লারউড তাঁর বিখ্যাত 'লেগ থিয়োরী'র প্রয়োগ আরম্ভ করেন কিন্তু ফলোদয় হয়নি।* লারউড সফরের ক্লান্তি অনুভব করতে শুরু করেন এবং অনুভব করেন যে, 'অস্ট্রেলিয়ায় ফাস্টবোলিং হাম-এর মতোই এড়াবার বস্তু।'

এই টেস্ট ইংলণ্ড ভাগ্যক্রমে জিতলেও পরেব টেস্ট পরাভূত হয়। ব্রাডম্যান করেন ১২৩ ও ৩৭ নটআউট।

১৯২৮-এর অস্ট্রেলিয়া সফর যখন শেষ হল, তখন লারউডের ঝুলিতে অনেক-কিছু জমেছে। প্রথমত, পৃথিবীর দ্রুততম বোলার, এই স্বীকৃতি। প্রথম থাকের ব্যাটসম্যানকে কিভাবে ভয় পাইয়ে বা মার দিয়ে সরিয়ে দেওয়া যায়—পনস্-

* আর্চি জ্যাকসনের এই ইনিংস বহু স্তোত্র আকর্ষণ করেছে। ঐ খেলায় তাঁর পার্টনার ব্রাডম্যান লিখেছেন:

"কী ইনিংসই খেললেন! ১৯ বছরের জ্যাকসন ইনিংস আরম্ভ করার আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখলেন উডফুল, হেনড্রি ও কিপ্যাক্স বিদায় নিয়ে চলে গেলেন—বোর্ডে রান মাত্র ১৯! এই বিপর্যয়ে অদমিত জ্যাকসন এমন একটা ইনিংস খেলে চললেন, যার মারের নৈপুণ্য, শালীনতা এবং শিল্পগত সৌন্দর্য দর্শকদের স্তব্ধ, বিমোহিত করে রাখল, যার জুড়ি আমি অল্পই দেখেছি।

"বিরতির পরে জ্যাকসন যখন আরম্ভ করলেন, তখন আমি তাঁর পার্টনার। যদি আমার ভুল না হয়, আর্চির স্কোর তখন ৯৬ বা ৯৭; এবং আমি যেহেতু তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ (নিশ্চয়! পুরো এক বছরের!), আমি তাঁকে কিছু উপদেশ দেবার দায়িত্ব বোধ করলুম। লারউড নতুন বল নিয়েছেন। বললুম, 'তাড়া করার কি আছে! আটকে থাক; সেঞ্চুরি এসে যাবে।'

"পরের মারটি যাঁরা স্মরণ করতে পারেন, তাঁরা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, তার থেকে গৌরবময় স্কোয়ার-ড্রাইভ সম্ভব নয়। লারউড বা নতুন বলকে তিনি কিছুমাত্র পরোয়া করলেন না। বল ছুটল বুলেটের মতো সদস্যদের আসনের দিকে।"

লারউডও এই ব্যাপারটি স্মরণ করে লিখেছেন: "যখন তিনি ৯৮ রানের মাথায়, তখন আমার পক্ষে দ্রুততম এবং শ্রেষ্ঠতম যে-বল দেওয়া সম্ভব, তাই দিলাম। উনিশ বছরের ছেলেটির পা অল্প নড়ল, ব্যাট নিখুঁত মাপে ঘুরল এবং দর্শকেরা পাগল হয়ে উঠল আনন্দে, যখন বলটি বাজ্য খেল বেড়ায় গিয়ে।"

ফোর্ডের ক্ষেত্রে তা দেখেছেন। অস্ট্রেলিয়ার দর্শক কি চিজ্, তার আস্বাদ পেয়েছেন বেশ-কিছু।† এই লাজুক-স্বভাব, জনতাভীরু মানুষটি, যিনি নিজের বিয়ের রেজেস্ট্রির সময়ে তিনজনের বেশি লোক নিয়ে যাননি পাছে হৈ-চৈ হয়, ('হৈ-চৈ আমার একদম পছন্দ নয়')—তাঁকে হাজার-হাজার মঞ্চাসীন মানুষের ক্ষুধার্ত চিৎকারের মধ্যে ক্রিকেট-ফাইট দিতে হয়েছে, তার আতঙ্কজনক স্মৃতি জেগে আছে মনে। অস্ট্রেলিয়ার কঠিন মাটিতে ফাস্ট-বোলিং কত কঠিন, তাও বুঝেছেন—কিভাবে বলের পালিশ উঠে যায় অল্পক্ষণের মধ্যে, কিভাবে এনার্জির পালিশেও ক্ষয় হয়।

তবু লারউড হয়তো নিরাশ হননি। আর্চি জ্যাকসন এবং ব্রাডম্যানকে দেখেছেন—কিন্তু এরকম উঠতি খেলোয়াড় সব দেশেই দেখা যায়। ব্রাডম্যান ছোকরার প্রতিভা আছে, কিন্তু রক্ষণশীল নয়, রিস্ক নেয়, সেখানেই সুযোগ; আর্চি জ্যাকসনও তাই। সামনে আছে ১৯৩০-এর মরশুম, অস্ট্রেলিয়া যাবে ইংলণ্ডে; সেখানে অনুকূল দর্শকের মধ্যে ভারী বাতাসের আওতায়—আবার—

হ্যাঁ—আমি পৃথিবীর উপরে—লারউড নিশ্চয় অনুভব করছিলেন।

ব্রাডম্যানকে লারউড দেখেছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ কিন্তু বুঝতে পারেন-নি। আর...জার্ডিনকেও দেখেছিলেন, এই সফরেই, কতটুকু বুঝেছিলেন তাঁরই বা ভবিষ্যৎ?

বুঝেছিলেন কি—

একদিন অস্ট্রেলিয়া জার্ডিন-মারফত বুঝবে, ফাস্ট-বোলিং হামের মতই এড়ানো ভাল—তবে ব্যাটসম্যান-পক্ষে !!

* * * ব্যাট-হাতে খুনীর নাম—ব্রাডম্যান * * *

"তোমরা বলো, বল-হাতে আমি খুনী। ভুলে যাও কেন, ব্যাট-হাতে ব্রাডম্যান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় খুনী।"

† পঞ্চম টেস্টের আগে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে খেলার সময়ে যখন ইংলণ্ডের অধি-নায়ক চ্যাপম্যান লারউডকে বেচারা-ব্যাটসম্যান আয়রনমঙ্গারের বিরুদ্ধে আমদানী করেন, তখন মেলবোর্নের দর্শকেরা দারুণ কোলাহল তোলে। 'নটিংহ্যাম ইভনিং পোস্ট' এই ঘটনাকে 'ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি চরম কালিমাময় অধ্যায়' বলে অভিহিত করে। দর্শকদের চীৎকারে ইংলণ্ডেব পক্ষে বোলিং করা সম্ভব হয়নি, যেহেতু বল আরম্ভ করতে চেষ্টা করা মাত্র গণ্ডগোল সীমা ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম করে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এই ম্যাচের ব্যাটিং-হীরো উডফুল যথেষ্ট চেষ্টা করেন গোলমাল থামাতে, পারেন না। অগত্যা ভিক্টোরিয়ার ক্যাপ্টেন রাইডার সিদ্ধান্ত দেন, গণ্ডগোল এড়াতে চা-বিরতি নেওয়াই ভাল। ইংরেজরা অতঃপর প্যাভিলিয়নে প্রবেশ-কালে অল্প সংবর্ধনা এবং অধিক গালিবর্ষণে ভূষিত হন।

আবার অস্ট্রেলিয়ান দর্শক সম্বন্ধে বিপরীত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন লারউড। এই ঘটনার দুদিন পরে যখন লারউড ব্যাট করতে যাচ্ছেন, তখন দর্শকেরা সহর্ষে অভিনন্দন জানায়। 'অস্ট্রেলিয়ান চরিত্র আমি বুঝতে অক্ষম'—লারউড বলেছেন।

১৯৩০-এর ইংলণ্ড। ৪-১ পরাজয়ের অন্ধকারের ইতিহাস বয়ে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া এসেছে ইংলণ্ডে। দলে আছে অনেকগুলি নতুন খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়া উপায়ান্তহীন হয়ে 'নূতনের স্বপ্ন' দেখছে। সে স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তাহলে কী ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন ইংলডের পক্ষে! আসলে তা স্বপ্ন নয় সত্য, বাস্তব। মধুরতম বাস্তব হয়ে দাঁড়াল অস্ট্রেলিয়ার কাছে।

চাকা একেবারে ঘুরে গেল। যে-অস্ট্রেলিয়া সন্দেহ না রেখে আগের সিরিজে হেরেছিল, সে এই সিরিজে জিতল—সন্দেহ না রেখেই।

সমস্ত ব্যাপারটার মূলে একজন মানুষ। মানুষ?—আরে একেবারে ছোকরা, বাইশ বছরের—'বাউরালের বিস্ময়-বালক'—নাম আগেই শুনে এসেছি—ডন ব্রাডম্যান।

যে-কোনো কল্পনাই হার মেনে যায় সত্যের কাছে—

প্রথম অবতরণে ডবল-সেঞ্চুরি। পরের খেলায় ১৮৫, তারপর ৭৮, তারপর ৯, ও নটআউট ৪৮; তারপর ৬৬ ও ৪; তারপর ৪৫, তারপর ২৫২ নটআউট; তারপর ৩২, তারপর ১৯১। ফলে মে মাসের মধ্যে সহস্র রান পূর্ণ, যা ইতিপূর্বে কোনো অস্ট্রেলিয়ান করতে পারেননি।

এবং টেস্টে—৮-১৩১, ২৫৪-১, ৩৩৪, ১৪, ২৩২; মোট ৯৭৪। এ পর্যন্ত পেরোয়নি, পেরোবার সম্ভাবনা কম।

মোট রান দাঁড়াল সব খেলায়, ২৯৬০—দশটি সেঞ্চুরি-সমৃদ্ধ। ঐ ১০টি সেঞ্চুরির মধ্যে ৫টি ডবল-সেঞ্চুরি, এবং একটি ট্রিপল সেঞ্চুরি।

ডন ব্রাডম্যান—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। অন্তত বৃহত্তম রানোৎপাদক যন্ত্র।

লারউডও তো দ্রুততম ফাস্ট-বোলার! দ্রুততম বোলার শ্রেষ্ঠতম ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে কি করলেন?

প্রথম টেস্টে খেলার মধ্যে লারউড অসুস্থ হয়ে পড়েন, দ্বিতীয় ইনিংস খেলার সময়ে। উইকেট—১-১২ ও ১-৯। অনুভব করলেন ভেদশক্তি আনতে পারেননি।

দ্বিতীয় টেস্টে অনুপস্থিত।

তৃতীয়ে প্রত্যাবর্তন। প্রথম ইনিংসে ১—১৩৯।

মার খেলেন বটে ডনের হাতে—একেবারে অবনীমত—অব'ডনিত'। ডন ৩০৯ করলেন একদিনে—লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি, চায়ের আগে ডবল-সেঞ্চুরি, খেলা শেষে ট্রিপল-সেঞ্চুরি!

চতুর্থ টেস্ট—লারউডকে বসিয়ে দেওয়া হল।

পঞ্চম টেস্ট—পুনশ্চ ডনাঘাত। প্রাপ্তি ১—১৩২।

লারউডকে আগে ঢেকেছিল খনির প্রগাঢ় অন্ধকার। এবার ঢেকে দিল অত্যুজ্জ্বল আলোক—তারকার।

'ভাগ্যের পরিহাস' বলতে ঠিক কি বোঝায় লারউড বুঝেছিলেন লীডসে তৃতীয় টেস্টের সময়ে। ডন ব্রাডম্যান এই খেলায় বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন টেস্টে, হাজার পাউন্ড উপহার পেয়েছিলেন তার জন্য—এবং তাঁর ঐ খেলার জন্য বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত লারউডকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল—সেই খেলার

সমস্ত গৌরবই একটি শূন্যের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল—আম্পায়ারের উদারতার জন্য যে-শূন্যের উপরে বহু অঙ্কের প্রাসাদ নির্মিত হতে পেরেছিল।

লারউড চাঞ্চল্যকর একটি সংবাদ দিয়েছেন। কোনো রান করার আগেই ডন নাকি লারউডের বলে কট হয়েছিলেন!

"ডনের সেই ইনিংসে একটা জিনিস ঘটেছিল, যা ইতিপূর্বে কখনো লোক-সমক্ষে জানানো হয়নি। কোনো রান করার পূর্বেই তাঁকে আমি উইকেটের পিছনে কট আউট করিয়েছিলুম। তিনি-যে নির্ঘাত আউট হয়েছিলেন, এ-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহই নেই! উইকেটের চারিদিকে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই আবেদন করেন, জ্যাক হবস্ পর্যন্ত, ক্রিকেট মাঠে যাঁর থেকে ন্যায়পরায়ণ মানুষ আমি দেখিনি।

"এ নিয়ে আমি কখনো দুঃখ করিনি, কেননা মসৃণ ও কর্কশ, দুই দিকের স্পর্শই মানুষকে নিতে হয়। তাছাড়া আম্পায়ার তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। ওয়ালী হ্যামন্ড, হারবার্ট সাটক্লিফ বা জর্জ ডাকওয়ার্থের মতো ইংরেজ দলের যে-কোন খেলোয়াড় এ-বিষয়ে নিশ্চয় সাক্ষ্য দেবেন যে, ডন বল ছুঁয়েছিলেন, এবং আম্পায়ারের সন্দেহের সৌভাগ্য পেয়েছিলেন।"

লারউড দুঃখ করেননি। সত্যি? তাহলে অব্যবহিত পরেই কি জন্য লিখলেন—

"এই বিরাট ইনিংসের পরে মিঃ এ ই হোয়াইট ল' নামক জনৈক অস্ট্রেলিয়ান হিতব্রতীর কাছ থেকে 'সমাদরের স্মারক'রূপে ডন হাজার পাউন্ড উপহার পান।—আমাকে চতুর্থ টেস্ট থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়।"

মসৃণ ও কর্কশ—বস্তুর দু'দিকের স্পর্শই নিতে হয়! এই সিরিজেই লারউড ডনের ক্ষেত্রেই মসৃণ দিকের স্পর্শ পেয়েছিলেন—শেষ টেস্টে তিনি যে একটি-মাত্র উইকেট পান তা ডনের, কিন্তু ডন মোটেই আউট হননি! ব্রাডম্যান-যে সত্যই আউট হননি, তা তিনি তাঁর Farewell to Cricket গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, চিত্রযোগে। ব্রাডম্যানের বিরুদ্ধে লারউড কট-বিহাইন্ডের আবেদন করেছিলেন, আবেদন একমাত্র তিনিই করেছিলেন, উইকেট-কীপার পর্যন্ত নন—যে-উইকেট-কীপারের নাম জর্জ ডাকওয়ার্থ, যিনি লম্ফঝম্পে মাঠে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ঘটাতে অভ্যস্ত। ব্রাডম্যান-প্রদত্ত অন্য এক চিত্রে দেখা যায়, উডফুলকে কট-বিহাইন্ড করেই ডাকওয়ার্থ 'নৃত্যরসে চিত্ত মম' ইত্যাদি, অথচ ব্রাডম্যানের আউটের চিত্রে তিনি চুপচাপ বল ধরে দাঁড়িয়ে—ফার্স্ট-স্লিপে হ্যামন্ডেরও একই তুরীয় ভাব।

লারউড স্বীকার করেছেন—হয়তো ডনের কথাই ঠিক, তিনি আউট হননি, কিন্তু নিজের পক্ষে তিনি বলতে পারেন, নিঃসন্দেহ না হলে তিনি কখনোই আবেদন জানাতেন না। তাছাড়া যদি এবার বিনা আউটে ডনকে আউট করার সৌভাগ্য পান (এক্ষেত্রে আম্পায়ার সন্দেহের সুযোগ ব্যাটসম্যানকে দেননি!) —তার মূল্য কতটুকু? ডন তার আগেই ২৩২ করে ফেলেছেন।

ব্রাডম্যানের খেলার প্রশংসা করেছেন মুক্তকণ্ঠে লারউড:

"ডোনাল্ড জর্জ ব্রাডম্যান তাঁর ব্যাটিংয়ের দ্বারা আমাদের ঘূর্ণীবাত্যায় ঘুর-পাক খাইয়ে দিলেন। অস্ট্রেলিয়ায় যাকে দেখেছিলাম, তার থেকে ভিন্ন মানুষ; অনেক হিসেবী, আত্মবিশ্বাসী, ঝুঁকি কম নেন, মন্থর উইকেটে অপরাজেয়।...

"কাগজে-পত্রে দু'দল সমান-সমান। কিন্তু ব্রাডম্যান তফাতটা ঘটালেন।"

"১৯৩০ সালে ব্রাডম্যানের ব্যাটিংয়ের কোন জবাব ছিল না। আমাদের অনভিপ্রেত সবকিছু তিনি করলেন। অফে বল দিলে তাকে সামনে বা পিছনে তুলতে পারেন—বোলারের এই প্রত্যাশার উত্তর : লেগের দিকে বেদম বাউন্ডারি। আমি যত ব্যাটসম্যান দেখেছি, তাঁর চেয়ে দ্রুত দৃষ্টি আমি কখনো দেখিনি। তাঁকে আউট করার একটিই উপায়—ক্লান্ত করে বিদায় দাও। কিন্তু কখনই তাঁকে ক্লান্ত দেখা যেত না। মনঃসংযোগ ও জীবনীশক্তি অসাধারণ মনে হোত।

"নিষ্ঠুরের মতো ডন পেটাতেন—অতি বড় নিষ্ঠুরের মতো। একেবারে হিসেবের যন্ত্রের মতো আচরণ—অঙ্কের কোন গণ্ডগোলের সম্ভাবনা নেই, সর্বদাই নিজের অভ্রান্ত পথে যেতে সমর্থ। দরকার হলেই বোলারের সামনে পিচের উপরে লাফিয়ে পড়ে মারতেন—আর সে দরকার তাঁর অবিরত ঘটত।

"এখনকার বলের পিঠ-চুলকানো সুশীল ব্যাটসম্যানদের দেখার পরে কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়—ডন কী বস্তু ছিলেন। গুডলেংথ বল বুলেটের মত ছুটত বাউন্ডারিতে। বইয়ের সব মারই মারতেন—বইয়ের বাইরের অনেক মারও।

"শরীর পিছনে হেলিয়ে দিয়ে তিনি বল কাট করতেন, কিংবা বল হাত থেকে বেরোবার আগেই লেগে পেটাবার উপযোগী জায়গায় সরে যেতেন।

"প্লাম ওয়ার্নার রিপোর্টারদের একান্তে বলেছিলেন, ডনই তাঁর দেখা একমাত্র ব্যাটসম্যান, যিনি লারউডকে স্টাম্পের উপর থেকে স্কোয়ারকাট করতে পারেন।

"ওয়ার্নার একথা বলেছিলেন...ঠিকই বলেছিলেন।"

ব্যাট-হাতে ডন ব্রাডম্যান সবচেয়ে বড় খুনী—লারউড দেখলেন।

ইংলন্ড অস্ট্রেলিয়া সমান-সমান, এমন-কি ইংলন্ডই অধিক শক্তিশালী, যদি ডন ব্রাডম্যান না থাকেন—লারউডের দেশের কর্মকর্তারা দেখলেন।

* * * ওকে শেষ করো : জার্ডিনের সিদ্ধান্ত * * *

পিকাডিলি হোটেল, লন্ডন। ইংলন্ডের ক্রিকেটের চারটি প্রধান মাথা ঝুঁকে পড়েছে একটি টেবিলের উপরে। জার্ডিন, আর্থার কার, লারউড এবং ভোস। আলোচনার বিষয়—উপায় সন্ধান।

এই ভোজচক্রের পরে জার্ডিন গেলেন এফ আর ফস্টারের কাছে, তাঁর সেন্ট জেমসের ফ্ল্যাটে, একবার নয়, অনেকবার—জেনে নিলেন লেগে ফিল্ডিং সাজানোর ফস্টারীয় রীতি।

অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের রীতিনীতি খুঁটিয়ে বুঝে নেবার জন্য বিখ্যাত ক্রিকেট-স্কোরার ফার্গুসনের স্কোরিং-ডায়াগ্রাম যত্নের সংগে পাঠ করার পরেই জার্ডিন যান ফস্টারের কাছে।

পি জি এইচ ফেন্ডার জার্ডিনকে কিছু মূল্যবান উপদেশ দিলেন। কেউ বলেন, মূল্যবান উপদেশটা এসেছিল জর্জ ডাকওয়ার্থের কাছ থেকে। আবার, অন্য মতে, জি ডবলিউ সি জাগ-ই উপদেশক।

এসব ঘটনাই ঘটেছিল অস্ট্রেলিয়াগামী এম-সি-সি দল নির্বাচনের পরে। কিন্তু মহামান্য এম-সি-সি-কর্তারা নিজেরাই কি টেবিলের উপরে কখনো ঝুঁকে পড়েননি তাঁদের একান্ত পরামর্শকক্ষে? নাহলে তিনজন ফাস্টবোলার গোড়াতেই নেওয়া হল কেন, যখন অস্ট্রেলিয়ায় ফাস্ট-বোলিং 'হামের মতই এড়িয়ে চলা ভাল?' শুধু তাই নয়, নিছক ব্যাটসম্যান দলীপ সিং সরে দাঁড়ানোয় নিছক ফাস্টবোলার বিল বাওয়েসকে অন্তর্ভুক্তই-বা করা হল কেন?

অতঃপর : বোলারের উত্তর : বডিলাইন
ইংলণ্ডের প্রতিশোধ : বডিলাইন
ব্রাডম্যানের দণ্ড : বডিলাইন
দেওয়ালের লিখন : বডিলাইন

একটু ক্লাসিক্যাল রীতিতে বললে—

অতঃপর ডোনাল্ড জর্জ ব্রাডম্যানের মৃত্যু-পরোয়ানা লিখিত হইল, যাহার লেখক ডগলাস জার্ডিন, লেখনী হ্যারল্ড লারউড, মসী রক্তবর্ণ বল এবং লিখন-পত্র ১৯৩২-৩৩-এর ইঙ্গ-অস্ট্রেলীয় টেস্টম্যাচ।

ডি আর জার্ডিন। নামটি অল্প ব্যবধানে বেশ কয়েকবার উচ্চারিত হয়েছে। পরে আরও বহুবার উচ্চারিত হবে। বডিলাইনের 'বডি'র অংশটুকু যদি লারউডের হয়, ব্রেনের অংশটুকু জার্ডিনের। বডিলাইন কখনই উদ্ভূত হতে পারত না কিংবা উদ্ভূত হলেও বজায় থাকতে পাবত না—ডি আর জার্ডিনের প্রতিভা ও চরিত্র তার মূলে না থাকলে।

৬ ফুট দু'ইঞ্চি দীর্ঘ, মেদের অংশ খুবই কম, হাড়ের রেখা শরীরের ও মুখের সর্বত্র, কাঠামোটা সহজেই চোখে ধরা পড়ে, চওড়া কপাল, ছুঁচলো চিবুক, খড়্গের মতো নাক, ছুরির মতো ধারালো চোখ—ডি আর জার্ডিন জন্মেছিলেন, বিস্ময়কর কথা, ভারতবর্ষে, বোম্বায়ে, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর। পুরনো ও নিখুঁত রীতির ব্যাটসম্যান। 'রু-ব্লাড অ্যামেচার'—রু-ব্লাডের শিক্ষানিকেতন অক্সফোর্ডের 'রু'। ব্যাটিংয়ে উচ্চমানের ধারাবাহিকতা। ১৯২৮-এ ওয়েস্টইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে খেলেছিলেন এবং ১৯২৮-২৯-এ অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজ-পক্ষে হ্যামণ্ডের পরেই ব্যাটিং-অ্যাভারেজে স্থান। ১৯৩১-এ নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের অধিনায়ক। বৃত্তিতে সলিসিটর, ব্যবসায়িক সাফল্য সবিশেষ।

এই মানুষকে যখন অ্যাসেজ পুনরুদ্ধারের যুদ্ধে সেনাপতি নির্বাচন করা হল, তখন ইংলণ্ডের সেই প্রতিজ্ঞা উদ্যত হয়ে উঠেছিল, যার বলে উক্ত ক্ষুদ্র দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের মালিক।

জার্ডিনের আরও কিছু পূর্ব-পরিচয় লক্ষ্য করা যাক।

১৯২৮ সালেই অস্ট্রেলিয়াকে জার্ডিনের ঘৃণা করার এবং জার্ডিনকে অস্ট্রেলিয়ার ঘৃণা করার কিছু কারণ ঘটেছিল। অফিসিয়াল পুস্তিকায় জার্ডিনের বিষয়ে তখন লেখা হয়—'মাঠে কখনো হাসতে দেখা যায় না। তবে শুষ্ক রসিকতা সংগ্রহে আছে। খাঁটি অক্সফোর্ড-ছোকরা।' এহেন জার্ডিন যখন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে খেলায় সেঞ্চুরির দিকে এগোচ্ছেন তখন দর্শকেরা খুবই ধৈর্যশীল।

বিকালে চায়ের জন্য ফেরার সময়ে অস্ট্রেলিয়ার স্টর্ক হেনড্রি তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। উত্তরে জার্ডিন কিছু আত্মসমালোচনা করলেন—'একটু বেশি মন্থর হয়েছে খেলাটা!' দুজনে বেশ প্রসন্নভাবে কথাবার্তা বলতে-বলতে চললেন। চায়ের পরে জার্ডিন সেঞ্চুরি করলেন। কিন্তু তার পরেও খেলার গতি বাড়ার লক্ষণ দেখা গেল না। তখন দর্শক চেঁচাতে শুরু করল। স্লিপ থেকে হেনড্রি বললেন—'নেকড়েরা এবার বেরিয়ে পড়েছে।' জার্ডিন তখন বুঝিয়ে দিলেন হেনড্রিকে—অস্ট্রেলিয়ান দর্শকদের সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা অতিরিক্ত নয়। হেনড্রি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—'তাই যদি তোমার মনোভাব হয়, তুমি জাহান্নামে যাও।'

সফরে তাঁরা পরস্পর আর একটিও কথা বলেননি।

দর্শকদের সম্বন্ধে জার্ডিনের বিরূপ মনোভাবের কারণ—তাঁর রঙবেরঙের টুপি খুব ফুর্তি দিয়ে দিয়েছিল তাদের। 'রামধনু'—নাম দিয়েছিল তাঁর। জার্ডিন ভেবেছিলেন, একদিন রামধনুতে রাবণবধ করব, সুযোগ যদি পাই। জার্ডিন-চরিত্রের আরও কথা ক্রমশ প্রকাশ্য।

ডনকে সাবাড় তো করতে হবে—কিন্তু কোন্ উপায়ে, কোন্ পথে? দুর্বলতার ছিদ্র কোথায়? অনেক চেষ্টায় আলোর কোলে কালো দেখতে পেলেন বিপর্যস্ত ইংরাজগণ। ওভালে শেষ টেস্টে ব্রাডম্যান ২৩২ রান করেছিলেন—যে-ইনিংসে লারউডের হাতে তাঁর সন্দেহজনক আউটের বিষয় আগেই উল্লিখিত হয়েছে—সেই ইনিংস সম্বন্ধে লারউড লিখেছেন :

"প্লাম ওয়ার্নার, যাঁকে এখন লর্ডসের কর্মকর্তা এবং ক্রিকেটের মহান পৃষ্ঠ-পোষক ('ইংলিশ ক্রিকেটের প্রধানমন্ত্রী') বলা হয়, তিনি সারা ইংলণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন : 'ব্রাডম্যান লারউডের প্রচণ্ডতম বোলিংশক্তিকে ভোঁতা করে দিয়েছেন। আর কি উৎকৃষ্টতর কেউ নেই যাকে তাঁর বিরুদ্ধে লাগানো যায়?'

"শুধু একটিমাত্র সুযোগের আভাস যেন দেখা গেল। একটি ক্ষেত্রে ডনও যেন ভুল করেন। ওভালের ম্যাচে যেন তাঁর বর্মে ছিদ্র দেখা গেল। অল্প বৃষ্টি পড়েছিল, তার পরে আধঘণ্টা যখন পিচ শুকোচ্ছে, বোলাররা কিছু সুযোগ পেল। এ জিনিস এই টেস্ট-সিরিজে একবারই ঘটল।

"ব্রাডম্যান ও আর্চি জ্যাকসন যখন ওভাল-উইকেটে ব্যাটিং করছিলেন, তখন বলকে লাফিয়ে তুলতে পেরেছিলুম। গুড-লেংথ বল বুক ও কাঁধের উপর লাফিয়ে উঠেছিল। উইকেটে সাড়া দেখতে পেয়ে আমি প্রাণপণে বল করতে লাগলুম।...প্রতিটি বল সাঁ-ক্ করে উঠে পড়তে লাগল। আর্চিকে ধাক্কায় রাঙা করে দিলুম কয়েকবার। পুরুষের মতো সেগুলিকে গ্রহণ করে তিনি জীবনের সেরা খেলা খেলতে লাগলেন।

"ডন কিন্তু শরীরে লাফিয়ে-ওঠা বলগুলি মোটেই পছন্দ করছিলেন না। দু' একবার আঘাত পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু এই দ্বৈত সমরের বৃহৎ তাৎপর্য দাঁড়াল—ডন সরে যাচ্ছিলেন। সেটা তখনই আমার কাছে খুব বড় হয়ে ওঠেনি, কারণ আমার লক্ষ্য ছিল বলকে কতখানি লাফিয়ে তোলা যায়, কিন্তু তাঁর সঙ্কুচিত হয়ে-পড়া চোখে পড়েছিল। অন্যেরাও তা লক্ষ্য করেছিল এবং খেলার পরে সে-বিষয়ে আলোচনা করেছিল। ভাবলুম, ধারালো আক্রমণে বলে ডন কিছু

ভয় পান। আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল তাই।"

ডনের এই ছিদ্রপথে আমি লারউডের সাহায্যে ঢুকে পড়ব—স্থির করলেন জার্ডিন।

ব্রাডম্যানের স্বদেশীয় লেখকও বলেছেন, ব্রাডম্যান এই খেলায় ব্যাট হাতে স্কুলবালিকার মতো স্কিপিং করছিলেন।

ব্রাডম্যান কিন্তু এই তথাকথিত দুর্বলতার দৃষ্টান্তটিকে—যার উপরে জার্ডিন-লারউড তাঁদের আক্রমণ-পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন—শীতল বিদ্রূপের সঙ্গে খণ্ডন করেছেন। ঐ দুর্বলতাযুক্ত খেলাটির বিষয়ে তিনি আর কিছু না করে কয়েকটি সংবাদপত্রের সাক্ষাৎ-বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। যথা :

১। "লাঞ্চের পূর্বে আজ ওভালে অস্ট্রেলিয়ার গৌরবের অধ্যায় রচিত। এই সময়ে সর্বাধিক সাহসী ব্যাটিং আমি দেখেছি। অত্যন্ত শোচনীয় উইকেট সত্ত্বেও ব্রাডম্যান ও জ্যাকসন ব্যাটিংয়ে বহুমুখিতা, নৈপুণ্য ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার যে-দৃশ্য ইংরেজ-দর্শকদের দেখিয়েছেন, তেমন কদাচিৎ দেখা যায়।"

২। "মারাত্মক উইকেট সাহায্য করছিল বোলারদের, যাঁরা বল লাফিয়ে তুলছিলেন দ্রুত—লারউড বিশেষভাবে বিষাক্ত। ছেলে দুটি প্রায়ই মার খাবার পরে যন্ত্রণায় শিউরে উঠছিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত মার খেয়ে, ছিঁচে গিয়েও চালিয়ে যাচ্ছিল। এমন ভয়াবহ আঘাত ও আক্রমণ সহ্য করা দারুণ দুঃসাহসের কাজ।"

৩। "এই ব্রাডম্যান-ছোকরা সিংহহৃদয়—বাস্তবে ও অলঙ্কারে। লারউডের পাঁজরা-ভাঙা ঘূর্ণী আক্রমণের পদ্ধতি সত্ত্বেও সে ডবল-সেঞ্চুরি করেছে। যখন বুকে প্রচণ্ড জোরে একটা বল ধাক্কা দিল, তখন সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। তার অল্প পরেই লারউডের আর একটা বল তার আঙুল ছিঁচে দিল। যেভাবে সে বলকে চাবুক-পেটা করছিল, তাতে বাইরে থেকে তার যন্ত্রণার পরিমাণ বোঝা শক্ত ছিল। এই হল খাঁটি সাহসের ক্রিকেট।"

৪। "বৃষ্টির পরে যে-উইকেট সুনিশ্চিতভাবে মনোহারিতা হারিয়েছিল, তার উপর দিয়ে ধেয়ে-আসা খাঁটি বৈদ্যুতিক বলগুলির সম্মুখীন হওয়ার কালে সাহস দেখা গেল ব্রাডম্যান-জ্যাকসনের, বারবার বেদনাদায়কভাবে আহত হয়েও তাঁরা অনমনীয় মনের জোর দেখিয়েছেন।"

ব্রাডম্যান মধুরভাবে জানিয়েছেন, এ-হেন উইকেটে তিনি লাঞ্চের আগেই ৯৮ রান করেছিলেন।

সুতরাং ব্রাডম্যানের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া নয়, ব্রাডম্যানের নৈপুণ্যকে নষ্ট করাই বডিলাইন ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য। এটা 'ষড়যন্ত্রই', জার্ডিন তা যতই অস্বীকার করুন। লারউড পরিষ্কার বলেছেন—জার্ডিনের কথা সত্য নয়।

বডিলাইন উৎপত্তির পিছনে বৃহত্তম কারণ ডন ব্রাডম্যান হলেও আরও কিছু কারণ ছিল। লারউড বেদনাবিকৃত কণ্ঠে বলেছেন—'আমার ফণা ধরে লাফিয়ে-ওঠা বলগুলির মধ্যে ইংলণ্ডের উইকেটের অতি-প্রস্তুতির বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ ছিল।' ক্রিকেটে একদিন ছিল বল ও ব্যাটের সমসুযোগ। কিন্তু ক্রিকেট

যেহেতু মূলত ব্যাটসম্যানের খেলা, তাই তাদের সুযোগ দিতে নিরেট জমি তৈরি করা হতে লাগল, যাতে ব্যাটসম্যানরা সরল বলে সহজ ব্যাট চালিয়ে গড়গড়িয়ে রান তুলতে পারে। ব্যাটসম্যানদের আউট করা যাবে কি করে, যেখানে উপরে ব্যাটসম্যান এবং মাঠের নীচে গ্রাউণ্ডসম্যান জুটি বেঁধেছে বোলারের বিরুদ্ধে? এম-সি-সি-র আইনও বিচিত্রভাবে ব্যাটসম্যানের সহায়ক। অফের বাইরে বল পড়ে উইকেটের দিকে আসতে চাইলে—যে-বলে নির্ঘাত বোল্ড হবার কথা—ব্যাটসম্যান প্যাড দিয়ে তা আটকাতে পারবে। (মনে রাখতে হবে তখনো বর্তমান এল-বি আইন বলবৎ হয়নি)। ফাস্টবোলারের পক্ষে এখানে একমাত্র পথ —বাম্‌পার—যা দিতে জিভ বেরিয়ে যায়, অথচ ব্যাটসম্যান স্বচ্ছন্দে মাথা নামিয়ে অধিকাংশকে এড়িয়ে যেতে পারে। তখনই লেগ-ট্র্যাপ, লেগ-থিয়োরীর উদ্ভব, যার শোচনীয়তম রূপ বডিলাইন। 'লেগ-থিয়োরী বোলারদের বিদ্রোহ, সুযোগ-দানে পরাঙ্মুখ উইকেটের বিরুদ্ধে'—লারউড বলতে চেয়েছেন—'এ দেওয়ালের লিখন, চোখে পড়া উচিত ছিল ক্রিকেট-কর্তাদের।'

লারউড আরও বলেছেন, লেগ-থিয়োরী ইংলণ্ডের চেয়ে অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে আরও অনিবার্য, কারণ সেখানে কয়েক ওভারের মধ্যে বলের পালিশ উঠে যায় শক্ত মাটির ঘর্ষণে, ফলে ফাস্টবোলাররা বল সুইঙ্গ করাতে পারে না, এবং আউট করার উপায় সন্ধান করতে গিয়ে তাদের লেগ-থিয়োরীর স্বারস্থ হতে হয়।

ব্রাডম্যান সহাস্যে বলেছেন—ভালো ভালো, অনেক দোষের কথাই জানলাম, এবং মানলাম—তাই বলে রোগী মেরে ফেলাকে রোগ মারার উপায় করবে?

বডিলাইন একেবারে ক্রিকেটকেই মেরে ফেলছিল।

অ্যাটম বোমা যুদ্ধ থামিয়েছিল—অ্যাটম বোমাকে থামাবে কে?

এসব সত্ত্বেও বডিলাইন হয়তো কোনোদিন আবির্ভূত হয়ে পারত না, যদি-না জার্ডিনের ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধি তার পিছনে থাকত, এবং লারউডের কল্পনাতীত স্থিরলক্ষ্যশক্তি।

ব্রাডম্যানের হাতে ১৯৩০ সালে মার খাবার পরেও লারউড দমেননি। প্রফেশন্যালের দমা চলে না। তাছাড়া ইস্পাতের মতো ইচ্ছাশক্তি তাঁর। ১৯৩১-এর মরশুমে লারউড ১২৯টি উইকেট নিয়ে (গড় ১২ রানে) ইংলণ্ডে বোলিং-তালিকায় শীর্ষে; ১৯৩২-এ ১৬২-টি উইকেট, (গড় ১২ রানে) একই স্থান। এই মরশুমে দুষ্ট লারউডের বলের চেয়ে অভ্রান্ত গতিশক্তির দৃষ্টান্ত ইংলণ্ড পূর্বে দেখেনি।

জার্ডিন বুঝলেন, লারউডকে অস্ত্র করতে না পারলে লক্ষ্যভেদ হবে না। সুতরাং লারউড আহূত হলেন পূর্বকথিত পিকাডিলি হোটেলের ভোজসভায়। লারউড স্বয়ং এই ভোজসভার যে-বিবরণ দিয়েছেন, এইবার তা উদ্ধৃত করা যাক:

"ইংলণ্ড-দল ঘোষিত হবার অল্প পরে নটিংহ্যাম-দল লণ্ডনে এল একটি ম্যাচ খেলতে, সম্ভবত সারের সঙ্গে। খেলার মধ্যে আর্থার কার আমার কাছে এসে মোটামুটি এই কথা বললেন যে, 'লল্‌, আজ রাত্রে আমরা দু'একজন ছোটখাট একটা ভোজে যাব। আমার অতিথি হিসাবে তুমি যোগদান কর, আমি এই চাই।

আমি ভোসকেও আসতে বলেছি।' ক্যাপ্টেনের অনুরোধ, অর্থাৎ আদেশ। তাছাড়া এ-ধরনের ব্যাপার নতুনও নয়।

"খেলার পরে পিকাডিলি-হোটেলে গেলাম। জার্ডিনও এলেন। তাঁর আসায় বিস্মিত হইনি, কারণ আর্থার কার ও তাঁর মধ্যে ভাবসাব ভালই। দু'এক পাত্রের পরে খেতে গেলাম। কথাপ্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের কৌশল কি-জাতীয় হবে তার আলোচনা শুরু হল, এবং আমরা তাতে জড়িয়ে পড়লাম। জার্ডিন ও কারই বেশি কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন, আমি বা ভোস অল্প বলেছি। আমরা পেশাদার। অন্তত নিজেকে তাই মনে হচ্ছিল।

"লেগ-থিয়োরীর কথা উঠল। তাঁদের মনে কি আছে দেখলাম। বড় সমস্যা ব্রাডম্যান। সে-ই অস্ট্রেলিয়ার আসল লোক। জার্ডিন তাঁর রানের পরিমাণ কমাতে চান। ওভাল-টেস্টে আমার বল থেকে ব্রাডম্যানের সরে যাওয়ার কথা তাঁরা তুললেন।

"আমি জার্ডিনকে বললাম, ব্রাডম্যান সংকুচিত হয়েছিলেন। জার্ডিন বললেন, সেকথা তিনি জানেন। জার্ডিন স্থির করলেন, ন্যাটা বোলাররূপে স্বাভাবিক ইনসুইঙ্গ নিয়ে ভোস ব্রাডম্যানের লেগস্টাম্পের উপর বল ফেলবেন, সেইসঙ্গে থাকবে তাঁর পরিচিত লেগথিয়োরীর ফিল্ডিং সাজানো, যা অন্তত দু' বছর ধরে ইংলন্ডে করে আসছেন। ৬ ফুট ৩ইঞ্চি লম্বা, বিশালাকার, তীব্র গতিশীল ভোস অস্ট্রেলিয়ার অধিক দ্রুত উইকেটে গুড-লেংথের বলকে বেশ ভালই ঝাঁকিয়ে তুলতে পারবেন, একথা বোঝা গেল।

"জার্ডিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—লেগ-থিয়োরীতে বল দিতে পারব কি না?

" 'মিঃ জার্ডিন, আমি এই পর্যন্ত বলতে পারি, দু'ওভারের পরে অস্ট্রেলিয়ায় নতুন বলে সুইঙ্গ করার চেষ্টা বৃথা।'

"আর্থার কার জানতেন, আমার বল মাপে নিখুঁত। তিনি এবং জার্ডিন আমাদের জিজ্ঞাসা করে চললেন, সর্ববিষয়ে আমাদের মতামত।

"অবশেষে জার্ডিন শুধোলেন, আমি এমনভাবে লেগ-স্টাম্পের উপরে বল করতে পারব কিনা যাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে বল লাফিয়ে শরীরের উপর ওঠে এবং ব্রাডম্যান লেগে মারতে বাধ্য হন?

" 'হ্যাঁ, তা করা যেতে পারে', আমি বললাম, 'ব্রাডম্যানের কাছে বল করার সময়ে অন্য কিছুর চেষ্টা না করে গতি ও মাপের উপর নির্ভর করাই ভাল, কারণ আলগা কিছু পেলে তাকে সে একেবারে নিকেশ করে দেবে।'

"কথাবার্তার মধ্যে আরও কয়েক পাত্র ঘুরে গেল। বড় মধুর রজনী।

"অস্ট্রেলিয়ায় যে লেগ-থিয়োরী প্রয়োগ করতে বলছেন জার্ডিন—ইংলিশ কাউন্টি-দলগুলি বহুদিন ধরে তাতে অভ্যস্ত, তার থেকে পৃথক কিছু নয় বলেই মনে হল।* এই ভোজসভায় ব্রাডম্যানের বিরুদ্ধে লেগ-থিয়োরী প্রয়োগের সিদ্ধান্ত করে নতুন কিছু করছি বলে আমার মনে হয়নি। কিন্তু একই সঙ্গে

*এর থেকে সরল বাজে কথা অল্পই হতে পারে, তা লারউডের পরবর্তী উক্তি এবং ঘটনাগতি থেকে দেখিয়ে দেওয়া যায় সহজেই।

এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার মনে কোনোই সন্দেহ ছিল না : ডন সহসা-লাফানো ধারালো বলে ভয় পান; সুতরাং আমরা ভাবতে লাগলাম, যদি তাকে লেগ-স্টাম্পের উপরে ঐ বস্তু যথেষ্ট সংখ্যায় দেওয়া যায়, তাহলে সে ভয় পাবে, তার স্বাভাবিক খেলা ভুলবে, ফলে লেগের দিকে অবিরত মারবে, ও ক্যাচ দিতে বাধ্য হবে, সেখানকার ফিল্ডসম্যানদের হাতে।

"জার্ডিন বললেন, যদি লেগ-থিয়োরী ডনকে বিপর্যস্ত করতে পারে, অন্য অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানেরা ব্যতিক্রম হবে না।

"আইডিয়াটা আমার মনে ধরল। দেখলাম এই আমার একমাত্র সুযোগ। দু-তিন ওভারের পরে বল সুইঙ্গ করাতে পারব না জানতাম। তারপরে আমার দশা : জ্বলন্ত সূর্যের নীচে ঘর্মাক্ত দেহে হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটছি এবং সর্বদিকে ঠেঙিয়ে ছোটাচ্ছেন আমার বলকে ব্রাডম্যান। দু'বছর আগে (ইংলণ্ডে) যখন বল সুইঙ্গ করতে পেরেছি, তখনো সে আমাকে থেঁতলেছে, এবার কী অবস্থা হবে!

"তার সঙ্গে একটা হিসাব-নিকাশ করা আমার বাকি ছিল। আমার উপরে সে চড়ে আছে। পেশাদার হিসাবে, তাকে ঠাণ্ডা করার যে-কোনো পরিকল্পনায় আমার সায় থাকার কথা।

"ঐ নৈশাহারকালে আমি বলতে পারতাম, আমি লেগ-থিয়োরীতে বল করব না—কিন্তু বলব কেন—যেখানে দেখছি এর দ্বারা একটা সুযোগ আমার হলেও হতে পারে। মিঃ জার্ডিনের ধারণা, এটা সফল হবে। আর আমরা...আমরা তো শুধু চেষ্টা করতে যাচ্ছি। ব্রাডম্যান হয়তো লেগেই ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবেন। তবু—করার মতো কাজ।

"এইখানেই শুরু। অন্তত যতটুকু অংশে আমার যোগ, তার।

"আর পাঁচটা রাত্রির মতই এও একটি রাত্রি—বাইরে রাত্রিযাপন কিছু সময়ের জন্য।"

ব্রাডম্যানের বিরুদ্ধে লারউড যখন জার্ডিনের যুদ্ধাস্ত্র হতে রাজি হলেন, তখন লারউডের মনোভাবকে বিশ্লেষণ করে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায় :

(ক) তিনি পেশাদার; অধিনায়কের নির্দেশ মান্য করতে বাধ্য;

(খ) তিনি দেশপ্রেমিক ইংরেজ; অ্যাসেজ পুনরুদ্ধার করা তাঁর কর্তব্য;

(গ) তিনি বোলার; ব্যাটসম্যানের আধিপত্য সইবেন কেন?

(ঘ) তিনি মানুষ; ব্যাট-হাতে ব্রাডম্যানের ভাব দেখলে মনে হয় তিনি কাউকে মানুষ বলে মনে করেন না।

লারউড বলেছেন, 'ব্রাডম্যান ব্যাটিং করার সময়ে দেখিয়ে দিতেন, আমি যেন পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বোলার। এক্ষেত্রে—

* * * সত্যই কি 'বডিলাইন?' * * *

'ব্রাডম্যান-সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে ধরে নিতে হবে—যদি লারউড বর্তমান গতি বজায় রাখতে পারেন।'

'যতই যা হোক, ব্রাডম্যান অতিমানুষ কিছু নন—জার্ডিনের আক্রমণ-পরিকল্পনার ফলে দেখা যাচ্ছে। সেঞ্চুরি করার দৈবাধিকার প্রাপ্ত আমি—এ জিনিস ব্রাডম্যান আর অনুভব করবেন না। আর পাঁচজনের মতোই তাঁকেও চেষ্টাচরিত্র করে রান করতে হবে।'

'ব্রাডম্যানের অসাধারণ আত্মবিশ্বাস নাড়া খেয়েছে। তিনি সরে যাচ্ছেন—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, তিনি ভয় পেয়েছেন।'

উল্লাসে ফেটে পড়ল ইংরেজপক্ষ। অস্ট্রেলিয়া-সফর করবার জন্য জার্ডিনের অধিনায়কত্বে ইংলন্ড এসে গেছে। পঞ্চম ম্যাচ, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, যাতে এই সিরিজে ব্রাডম্যান প্রথম অংশ নিয়েছেন। সুচতুর অধিনায়ক জার্ডিন তাঁর মতলব ঢাকা দিয়ে রেখেছিলেন এতদিন, ডনের মুখের সামনে কলসীর মুখ খুলে দিলেন এবার, আর বেরিয়ে এল—দৈত্য নয়—বডিলাইন।

ব্রাডম্যান লারউডের হাতে দু' দুবার আউট! এর আগে লারউডের বিরুদ্ধে সতেরো ইনিংস খেলে মাত্র একবার আউট—১৯৩০-এ ওভালে, ২৩২ রান করার পরে কট !!—নাঃ, সেও তো ঠিক আউট নয়।—এবার—হাঃ হাঃ—দু' দুবার! আহা কি সুখ! কি সুখ! 'কী সুখকর দৃশ্য, যখন দেখা গেল ব্রাডম্যান আমার বলে জড়িয়ে-মড়িয়ে ব্যাট চালাচ্ছেন', লারউড লিখেছেন, 'আমি বুঝেছিলুম, ডনকে এবার পেয়েছি; তাঁর মনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়ে তাঁর পুরনো খেলা ভুলিয়ে দিয়েছি; লেগ-থিয়োরী আশাতীতভাবে সফল হয়েছে; ব্রাডম্যান দোনোমনো করেছেন; লেগ-স্টাম্পের উপরে লাফানো বল থেকে বাঁচবার জন্য ভড়কে-হড়কে সরে গেছেন; মাঝে-মাঝে ব্যাট চালিয়েছেন মুগুর চালানোর ভঙ্গিতে, কিংবা কুড়ুল চালানো—না কি—হাঃ হাঃ—'

ইংলন্ডের সেরা ব্যাটসম্যান খেলা থেকে অবসর নিয়ে প্রেস-বক্সে বসে। সেই জ্যাক হবস্ বললেন, 'বাপরে! আমি প্রেস-বক্সে বসে তবে নিরাপদ বোধ করছিলুম। নচেৎ মাঠের মধ্যে বোলিংয়ের চেহারা ভয়াবহ।'

এই সমস্ত ঘটনা যখন ঘটছিল তখন অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন অকুস্থলে ছিলেন না। তিনি মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। তিনি ট্রাউট মৎস্যশিকারকে অবসর-বিনোদনের বস্তু মনে করেন। ফাৎনার দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবছিলেন—ভাবছিলেন কি যে—এই মাছটা ব্রাডম্যান, এইটে উডফুল, এবং তদনুযায়ী খ্যাঁচ দিচ্ছিলেন! কিংবা এক হাজার বোমারু বিমানকে শত্রুদেশের উপরে পাঠিয়ে সেনাপতি যেমন সিগারেট ধরান (সিনেমা-অনুযায়ী বলছি) তিনিও সেইভাবে মাছ ধরছিলেন!

জার্ডিনের মৎস্যশিকার-প্রীতি নিয়ে কথা উঠল নানাদিকে। কথাটা বেড়ে গেল যখন জার্ডিন হঠাৎ দৌড়ে এলেন তাঁর মৎস্যশিকার কেন্দ্র থেকে মনুষ্যশিকার কেন্দ্রে, কেননা ভিক্টোরিয়ার বোলার ন্যাগেল ৩২ রানে এম-সি-সি'র ৮টি উইকেট নিয়ে নিয়েছেন।

বোমারু বিমান যারা পাঠায় তারা ফাইটার-প্লেনকে মোটেই পছন্দ করে না। অস্ট্রেলিয়া বলল—বাহবা রীতি! যদি বলে না পার, সবলে নাও!

ব্রাডম্যানের বিরুদ্ধে সাফল্যে লারউড খুশি হলেও সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে

পারছিলেন না, কারণ এই বামন-প্রতিভার বিষয়ে কোনো শেষ কথা নেই। ব্রাডম্যান অন্য অস্ট্রেলিয়ানের মতো বোলারকে ক্লান্ত করার পরে রান করতে শুরু করেন না। অবিলম্বে তাঁর কাজ শুরু হয় এবং 'এই খেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণী চৌম্বক তিনিই।...লেগ-থিয়োরি না থাকলে ব্রাডম্যান সহজেই দু'শো আড়াইশো রান নিয়ে পরিস্থিতির উপর আধিপত্য করতেন।'

কিন্তু ব্রাডম্যান কি 'লেগ-থিয়োরির' উপরও আধিপত্য করতে পারেন না?

ব্রাডম্যান বললেন—'না, তা করা সম্ভব নয়! বডিলাইন আয়ত্ত করা অসম্ভব।'

বডিলাইন—ব্রাডম্যানের প্রতিভার বিষয়ে সবচেয়ে বড় প্রশস্তিকার্য।

ব্রাডম্যানের উত্তরও বডিলাইনের বিষয়ে সমুচিত প্রশস্তি।

তাছাড়া—ব্রাডম্যান বললেন—'লেগ-থিয়োরি' নামের শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দিও না। ওটার একটিই নাম—'বডিলাইন!'

লারউড বললেন—কী জঘন্য নামটা! 'ফাস্ট লেগ-থিয়োরি'কে বডিলাইন বলা? তবে—হ্যাঁ—জার্ডিন যতটা নিরীহ করে শুধু 'লেগ-থিয়োরি' বলতে চেয়েছেন, অতটা নিরীহ নয় ও-জিনিস।

অধিকন্তু যথেষ্ট বিরক্তির সঙ্গে 'ফাস্ট লেগ-থিয়োরিকে' কে প্রথম নোংরা 'বডিলাইন' নামটা দেয়, লারউড সে-বিষয়ে গবেষণা করেছেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

'লেগ-থিয়োরি', 'ফাস্ট লেগ-থিয়োরি', বা 'বডিলাইন'—ব্যাপারটা কি দেখা যাক। ব্রাডম্যান একবাক্যে বলেছেন—'বডিলাইন আসলে লেগের দিকে ঘেরাও-করা ফিল্ডিংসহ ব্যাটসম্যানকে তাক্-করা দ্রুতগতি শর্টপিচ বল।'

লারউডের স্বদলের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ওয়ালী হ্যামণ্ডের মতে—বডিলাইনের লক্ষণ—তা এমন বল, যা—

(১) 'গতি'-রাজের দ্বারা নিক্ষিপ্ত,
(২) উইকেটের উপরে লাফিয়ে উঠতে পারে এমনভাবে ধাপানো,
(৩) সোজা ব্যাটসম্যানের দিকে চালিত,
(৪) লেগের দিকে ৬ থেকে ৮ জন ফিল্ডারসহ কৃত।

'এর কোন একটিকে বাদ দিলে বডিলাইন হবে না'—হ্যামণ্ড জানিয়েছেন।

জার্ডিন প্রভৃতি অপরপক্ষে এই পদ্ধতির বলকে পুরনো পরিচিত লেগ-থিয়োরির পুনরাবৃত্তির বেশি বলতে রাজি নন। তা নিশ্চয়ই বলা যায়, যদি সর্দি মাত্রই নিউমোনিয়া, এমন বলতে বাধা না থাকে।

'লেগ-থিয়োরি'র উদ্দেশ্য ছিল না বডিলাইনে অর্থাৎ শরীরলক্ষ্যে বল চালানো।'—জার্ডিনের বক্তব্য।

কিন্তু শরীরলক্ষ্যে যে বল চালানো হোত তা স্বয়ং লারউড স্বীকার করেছেন:

"একজন অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট-ব্যাটসম্যান প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, যখন তিনি তাঁর লেগ-স্টাম্পের অন্তত এক গজ বাইরে ব্যাট ধরে দাঁড়িয়েছিলেন, তখনও আমার বডিলাইন বল তাঁর দিকে সোজা ছুটেছে। তিনি ঠিকই বলেছেন। বল সত্যই সেইদিকেই ছুটেছিল।"*

---

* 'One Australian Test batsman claimed publicly that when

বডিলাইন সত্যই ষড়যন্ত্র—লারউড অস্বীকার করেননি। তাঁর মুক্ত স্বীকারোক্তি :

"এখানে আমি সেই কথা সমর্থন করছি, যা বহু ব্যক্তি সর্বসময় বিশ্বাস করে এসেছেন, এবং যার বিষয়ে আমি এই তিরিশ বছরের বেশি সময় ধরে চুপ করে আছি : বডিলাইন সত্যই ব্রাডম্যানের ব্যাটিং-প্রতিভাকে সংকুচিত করার জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল।"†

* পুনশ্চ : "আজকের ক্রিকেট-প্রেমিকরা বুঝতেই পারবেন না, ঐ খাটো লোকটি কতখানি ডায়ন্যামিক ছিলেন। আমি শুনেছি যে, এমন কথাও বলা হয়, এখনকার নর্ম্যান ও'নীল, টেড ডেক্সটার বা স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের সঙ্গে ব্রাডম্যানের তুলনা চলে। এইসব চমৎকার খেলোয়াড়দের নাড়া দিয়ে কিছু বলার অভিপ্রায় আমার নেই, শুধু এইটুকু বলব—এ'রা ডনের সঙ্গে এক পথের পথিক নন। ব্রাডম্যান, যদি সামান্য আলগা-কিছু বেরোত, তাকে একেবারে খুন করে ফেলতেন। গুড লেংথের জোরালো বল, যা অপর টেস্ট-ব্যাটসম্যানকে ঠাণ্ডা করে রাখত সহজেই—তাকে বন্দুক থেকে ছোঁড়া গুলির মতো ব্রাডম্যান ঠেঙিয়ে পাঠিয়ে দিতেন বাউণ্ডারিতে। ব্রাডম্যান প্রায় অলৌকিক।...সেসব দিনে ক্রিকেট রাজা। সাম্রাজ্যের মধ্যে বন্ধন এখনকার কমনওয়েলথ-মার্কা বন্ধনের চেয়ে অনেক জোরালো ছিল। ক্রিকেট, কল্পনাকে অধিকার করে আবেগে আগুন ধরিয়ে দিত। ১৯৩০-এর বিহ্বলকর সফরের পরে ইংলণ্ডের সামনে কঠিন সমস্যা : ব্রাডম্যানকে ঠাণ্ডা করতে কিছু একটা করতে হবে। বডিলাইন সেই কিছু-একটা।

"বডিলাইন একটা ষড়যন্ত্র। এর সঙ্গে আমার যোগ হল—ব্রাডম্যানকে ছিদ্র করার আয়ুধে আমি ফলা। কাজটা আমাকে করতে দেওয়া হয়েছিল। আমার ধারণা, আমি সেটা ভালভাবেই করেছিলুম। আমাকে বডিলাইন বল করতে বলা হয়েছিল, আমি নির্দেশ পালন করেছিলুম।‡

"আমার হাত শেষ আঘাতের জন্য যখন সাঁ করে নামছে, সেই ভগ্ন-মুহূর্তে আমি ব্রাডম্যানকে লক্ষ্য করে তাঁর মতলব আঁচ করার চেষ্টা করতুম, যাতে যদি কিছু নড়া-চড়া করেন, তাহলে যেন শেষ মুহূর্তে তাঁর শরীরের দিকে বলটি চালাতে পারি। এই রকমই তিনি—এমনই দ্রুতগতি। এক্ষেত্রে হয় তিনি—নয় আমি।"

he took block yard outside his leg stump, my Bodyline balls still came straight at him. He was right, they did.'

† 'And here let me confirm what so many people have always believed and about which I have remained silent for more than thirty years—Bodyline was devised to stifle Bradman's batting genius.'

‡ 'Bodyline was a plot and I was involved in it having been given the job of spear-heading the attack to put the brake on Bradman.

I had a job to do and I thought I did it pretty well. I was asked to bowl Bodyline and I carried out instructions.'

সিডনি। প্রথম টেস্টের প্রভাত। খেলা শুরু হতে কিছু দেরী আছে। সাংবাদিক-দল রুদ্ধভাবে অপেক্ষমাণ। জার্ডিন ইংলন্ডের দল ঘোষণা করেননি। টস হবার আগে পর্যন্ত করবেন না। তাতে যে যা ইচ্ছে ভাবুক। জার্ডিন সাংবাদিকদের পরোয়া করেন না।

ওদিকে ইংলন্ডের ড্রেসিংরুমের মধ্যে ১৭ জনের গোটা দল খেলার সবরকম সরঞ্জাম গায়ে চড়িয়ে উদ্বিগ্নভাবে বসে। না, তাঁরাও জানেন না—দলে কার ঠাঁই হবে? জার্ডিন প্রত্যেককেই প্রস্তুত রেখেছেন—যাকে ইচ্ছে নেবেন। এবং কাকে নেবেন টস্ হবার আগে পর্যন্ত সে জানবে না! জার্ডিন নিজ দলের কোনো খেলোয়াড়কেই পরোয়া করেন না। তিনি অ্যাসেজ-উদ্ধারের যুদ্ধে অবতীর্ণ। যোগ্যতাই তাঁর কাছে সমাদরের একমাত্র হেতু।

জার্ডিন—অ্যাসেজ-উদ্ধারে নিবেদিত-প্রাণ তপস্বী যোদ্ধা।

বডিলাইনের মতো ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাকে যিনি শত অপমান ও প্রতিরোধের মধ্যেও অবিচলিত বীর্যে কার্যকর করতে পেরেছিলেন, তাঁর চরিত্রের দিকে আবার দৃষ্টি ফেরানো উচিত। বডিলাইন, যে-পরিমাণে প্রকাশ্য, সেই পরিমাণে অপ্রকাশ্য সক্রিয়তা।

জার্ডিনের দীর্ঘ, কৃশ, কৃচ্ছ্রচিহ্নিত চেহারা দেখে জনৈক সাংবাদিকের এক ফ্লোরেনণ্টাইন সাধুর চেহারার কথা মনে উঠেছিল—দৃষ্টিতে সেই একই ভাব-তীব্রতা। জার্ডিন কাজ বোঝেন, এবং সেটা বুঝিয়ে দেন অচিরে।

জার্ডিন স্বভাবতই আত্মস্বতন্ত্র, যদিও দলের সকল খেলোয়াড়ের সঙ্গেই মিশতেন। তবে পড়া-শোনা-করা লোকের সঙ্গ বেশি পছন্দ করতেন। জাহাজে দেখা যেত তিনি চসার পড়ছেন।

স্নব নন, বন্ধুভাব রাখেন সকলের সঙ্গে, কিন্তু গায়ে পড়েন না, বা তাঁর গায়ে পড়ার কথা কেউ কল্পনা করে না।

আর শত্রুকে শত্রুজ্ঞান করেন অলজ্জভাবে। চতুর্থ টেস্টের আগে জার্ডিন জানিয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকদের—তিনি সেই সব সাংবাদিকদের সঙ্গেই মাত্র কথা বলবেন, যাঁরা ইংরেজ সাংবাদিক।

মধ্যবর্তীকালে অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকরা তাঁর শত্রু হয়ে উঠেছেন।

শুরু থেকেই সাংবাদিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ।

'সিডনী-সান'-এর রুড করবেট সাংবাদিক-সুলভ প্রশয় দাবির সুরে জার্ডিনকে বললেন, যদি প্রতিদিন প্রভাতে দলের নাম ঘোষণা করা হয়, তাহলে তিনি তাঁর বৈকালী সংবাদপত্রের জন্য খুব একটা 'স্কুপ' পেয়ে যান।

জার্ডিন ভ্রূকুটি করে করবেটের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে নীরস গলায় উত্তর দিলেন—'বাজে কথার সীমা আছে! আপনাদের বা অন্য কোনো সংবাদ-পত্রের জন্য স্কুপ-সরবরাহের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আসিনি।'

হতভম্ব সাংবাদিকের বিরক্তি বলাই বাহুল্য সালংকারে সংবাদপত্রে বেরিয়ে স্কুপের অনুরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল।

এই শুরু। শেষ ছিল না। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সফরের প্রথম খেলার সময়ে ইংলণ্ড মাঠে নামল ২০ মিনিট পরে। সুতরাং সংবাদপত্রে স্বভাবতই বেরুল, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক এর জন্য আইনসঙ্গতভাবেই খেলায়

জয় দাবি করতে পারতেন। আর—অস্ট্রেলিয়ান দর্শকদের বসিয়ে রেখে জার্ডিন অপমান করেছেন। তিনি নাকি দোকানে সওদা করে বেড়াচ্ছিলেন, তাই দেরি!

ইংলণ্ডের টেস্ট-দল কি হবে, খেলা আরম্ভ হবার সামান্য কিছু পূর্বে জিজ্ঞাসা করে অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকরা উত্তর পেলেন:

"দল নির্বাচিত হয়ে গেছে। এখন তা আমার পকেটে। সেখানেই থাকবে, যে-পর্যন্ত না আমি সেটিকে নিষ্কাশন করতে ইচ্ছা বোধ করি। আমরা এসেছি অ্যাসেজ উদ্ধার করতে, সংবাদপত্রের জন্য গল্পের উপাদান দিতে নয়।"

জার্ডিন যে, শেষ অবধি দলের নাম আটকে রাখতেন, তার দুটি উদ্দেশ্য: এক, অস্ট্রেলিয়ার উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ বজায় রাখা; দুই, সাংবাদিকদের চটানো।

সাংবাদিকদের সঙ্গে জার্ডিনের সংলাপের আর একটি নমুনা:

"মিঃ জার্ডিন, আপনার দলে ফাস্ট-বোলারের বিরাট সমাবেশ—তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আপনারই নিশ্চয় প্রথম ইংরাজ-দল, যেখানে চার জন ফাস্ট-বোলার আছে? আপনি কি তাঁদের সবাইকে অবিরাম ব্যবহার করে যাবেন?"

"দেখা যাবে।"

জার্ডিনের সঙ্গে সাংবাদিকদের কথাবার্তা কোনো এক সময়ে এমন সমুন্নত ভাষাপর্যায়ে উঠেছিল যে, পেলহ্যাম ওয়ার্নারকে চক্ষু মুদিত করে পাদরী-রীতিতে বলতে হয়েছিল—"ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন, আলাপচারিকে আমরা উচ্চতর ভূমিতে রক্ষা করি।"

জার্ডিনের ঘৃণার সীমা ছিল না অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকদের সম্বন্ধে, এবং তার উত্তরে অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকরাও স্বয়ং বা 'স-ভূত' তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।*

ব্রাডম্যান খেলছেন না, খেলার উপযোগী সুস্থ নন, এই নৈরাশ্যের মধ্যে

* ক্রিকেট-সাংবাদিকদের 'ভূত'-সঙ্গীদের নিয়ে লারউড অনেক কৌতুক করেছেন। বিখ্যাত ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের লেখা বই বা রচনা প্রায়ই দেখা যায়। বলাই বাহুল্য, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের 'রচিত' নয়, বড়জোর 'কথিত'। তাঁদের বাণীকে পত্রায়িত করার ভার যাঁদের উপর, তাঁরাই 'গোস্ট্' বা 'ভূত'। লারউড লিখেছেন—"অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই 'ভূত'-সঙ্গী! এই ভূতেরা হলেন সাধারণ রিপোর্টার, যাঁরা (জনৈক সংবাদপত্রসেবীর উক্তি অনুযায়ী) 'সুমহানদের কনুইয়ের তলায় বিনীত-ভাবে অবস্থান ক'রে অতি সম্ভ্রমে তাঁদের সুগভীর মতসমূহকে পাঠযোগ্য ইংরেজিতে পরিবেশন করেন'।" পুনশ্চ: "হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি যে-পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে সংবিধানগত অতি জটিল সমস্যার বিষয়ে সাতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, সেই ভাবেই এই বিশেষজ্ঞ ক্রিকেট-বিচারকেরা পরিশ্রমী ভূতগণের উপর তাঁদের মনোভাব বর্ষণ করেন, যার ফলে সংবাদপত্রগুলি অত্যুৎসাহী ক্রিকেট-প্রেমিকদের উদ্‌ভ্রান্ত করার উপযোগী বিরোধী বক্তব্যসমূহে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।"

এখানে আমরা নিশ্চয় ধরে নিতে পারি, 'ভূত'গণের বিষয়ে সহানুভূতি ও কৌতুক-পূর্ণ এই মন্তব্য করেছেন স্বয়ং লারউড—লারউডের 'ভূত' নন।

লারউডের বল ছুটল সিডনির প্রথম টেস্টে।

ব্রাডম্যান খেলছেন না, কিন্তু দেখছেন। দেখুন—ভবিষ্যতে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করছে!

জীবনের গৌরবময় বোলিং করলেন লারউড। 'আমার জীবনের সেরা বোলিং-য়ের একটি।' উইকেট নিলেন ৫-৯৬ (৩১ ওভারে), এবং ৫-২৮ (১৮ ওভারে)। ইংলণ্ড জিতল দশ উইকেটে।

খেলার শেষ দিনে ইংলণ্ড মাঠে ব্যাট করতে নামল একটি মাত্র রান করার জন্য—করলেই জিতে যায়—সেই সময়ে সাধারণ দর্শক-আসনে মাত্র একজন উপবিষ্ট। লারউড বলেছেন, 'খাঁটি ক্রীড়াপ্রেমিক।' কিন্তু আগের দিনগুলি মাঠ-ঠেসে যারা বসেছিল, তাদের বিষয়ে ঐ কথা বলতে পারেননি—তারা তাঁর বোলিং-পদ্ধতির বিরুদ্ধে এতই কোলাহল তুলেছিল।

ঐসব দর্শকেরা যে-সব তামাশা করেছিল, তার মধ্যে মুরগীর গন্ধ ছড়াচ্ছিল। রসিকতাগুলি বেশির ভাগ লাবউডের মুরগী-ব্যবসা নিয়ে। (যথা, লারউড জার্ডিনের তা-দেওয়া বাচ্ছা)। 'খুন করে ফেলব'—এমন শাসানির চিঠিও পেলেন। আবার সভ্যস্বভাব দর্শক ক্ষমা চেয়ে লিখল—দেখ, আমরা-যে চেঁচামেচি করি, তার কারণ, আমরা চাই আমাদের দল জিতুক। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কোন ব্যক্তিগত বক্তব্য নেই—বক্তব্য তোমার নৈপুণ্যের বিরুদ্ধে।

লারউডের অসাধারণ নৈপুণ্যও বিস্মিত হয়ে দেখল, বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানেরা উঠে মার দেওয়ার বদলে ডুবে পালাতে ব্যস্ত। বডিলাইন হয়তো বরবাদ হয়ে যেত যদি প্রহৃত হত—লাবউড বলতে চেয়েছেন।

কিন্তু কথাটা অংশত নিতান্ত মিথ্যে, যে-হেতু মার দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন তরুণ স্টান ম্যাককেব। বলেছিলেন—'হয় এখনি শেষ, নয় অশেষ—।' খেলা দেখতে এসেছিলেন তাঁর বাবা ও মা। বাবাকে বলেছিলেন—'দেখো, আমি ঘা খেলে মা যেন বেড়া টপকে ভিতরে লাফিয়ে না পড়ে।'

ম্যাককেব মার খেয়েছিলেন শরীরে, আর মার দিয়েছিলেন বলে। ইতিহাসের বিখ্যাত ইনিংস খেলেছিলেন—১৮৭ রানের।

সে কী ইনিংস! 'সিডনী অথবা যে-কোনো ক্রিকেট-মাঠের সাহসীতম ইনিংস।' ৮২ রানে চারটি উইকেট পড়ে গেছে, এমনি অবস্থায় ম্যাককেব মাঠে ঢুকে লারউডের মুখে দাঁড়িয়েছিলেন—যে ব্যাদিত কালান্তক মুখে ধেয়ে ঢুকছে ব্যাটসম্যানেরা—৭ রানে তখন ৩-টে উইকেট পেয়ে গেছেন লারউড। তারপর ম্যাককেব সারাদিন ব্যাট করেছিলেন—নিজের বুক, মুখ বা মাথার খুলি নামক কোনো পদার্থ আছে তা ভুলে গিয়ে, একমাত্র মনে রেখে—নৈপুণ্য ও মর্যাদাকে। দিনশেষে ১২৭ নটআউট।

পরদিন আরও ৫৫ মিনিটে তাঁর ৬০ রান। তারই মধ্যে উল্টোদিকে ১০ রানে চারজনের বিদায় ও অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস সমাপন। ঘণ্টায় গড়ে ৪৭ রান করে ম্যাককেব ১৮৭ রান করেছিলেন, যখন তাঁর ৭ জন পার্টনার মিলে করেছিলেন ৯০-এরও কম রান।

শুধু এই একটিই নয়, ম্যাককেব এমন ইনিংস পরে আরও খেলবেন; বার একটি চলাকালে (১৯৩৮, নটিংহ্যাম-টেস্ট—ম্যাককেব ২৩২ রান করেন ২৩৫

মিনিটে) অধিনায়ক ব্রাডম্যান প্যাভিলিয়নে নিজ দলের খেলোয়াড়দের ডেকে জড়ো করে বলেছিলেন—'দেখে যাও, দেখে যাও, এ জিনিস তোমরা আগে দেখোনি!' ঐকালে মাঠের মধ্যে একসময়ে ইংলণ্ডের ফাস্টবোলার কেন ফার্নেসের লেগ-স্টাম্পের বলকে ম্যাককেব যখন স্বচ্ছন্দে স্কোয়ার-লেগের উপর দিয়ে উড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন মাঠের বাইরে, তখন হতাশ ফার্নেস ম্যাককেবের সহযোগী ব্যাটসম্যান বিল ওরিলীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'বলো, একে আমি কোন্ বল দেবো! কি করব এবার?' ওরিলী বলেছিলেন, 'কি আর করবে, দৌড়ে এগিয়ে যাও, আর...অটোগ্রাফ নিয়ে নাও!'

আর একটি অদ্ভুত ইনিংস দেখা গিয়েছিল এই খেলায়, ইংলণ্ডপক্ষে। পতৌদির নবাব প্রথম টেস্ট-অবতরণে সেঞ্চুরি করেছিলেন, এবং সেই সেঞ্চুরির জন্য তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা নাকি এতই ধীর-গতিতে করা হয়েছিল। সেঞ্চুরি করতে পতৌদির লেগেছিল ৫ ঘণ্টা ১৭ মিনিট। একবার ৬৮ রানের মাথায়, তারপরে ৯৮ রানের মাথায়—দু'বার ২৫ মিনিট ধরে আটকে ছিলেন। ধীর সেঞ্চুরির জন্যই পতৌদিকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল অথবা—

অন্তত পতৌদি একথা বলেছিলেন বলে জানা যায়: "ডগলাসের সঙ্গে তো কয়েকমাস কাটালাম—কই পছন্দ করার মতো গুণ তো চোখে পড়ল না। তোমরা বলো, মেলামেশা করলে তাকে ভালবাসা যায়—কই!"

স্বয়ং জার্ডিনের খেলার চেহারা দেখে সত্যই কারও পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত, ব্যাটিংয়ে মন্থরতা দোষের কারণ: 'বডিলাইন-সিরিজের টেস্টে ৯ ইনিংসে ইনি ১৯৯ রান করেছিলেন, গড়ে ঘণ্টায় ১৬ রান।'

এই খেলাতেই ব্যক্তিগত বিদ্রোহ করলেন ফাস্টবোলার অ্যালেন, জার্ডিনের বিরুদ্ধে।

অ্যালেন জার্ডিনকে মাঠে বললেন—'ডগলাস, তুমি ভুলে গিয়েছ আমি অস্ট্রেলিয়ান।'

অ্যালেন জার্ডিনকে আরও বলেছিলেন—'যদি চাও, আমি ইংলণ্ডের জাহাজ এখনি ধরতে পারি, কিন্তু লেগে ভর্তি লোক নিয়ে আমি বল করতে পারব না।'

জন্মে অস্ট্রেলিয়ান অ্যালেন মস্ত ক্রিকেটার, বিরাট লড়ায়ে চরিত্র, তদুপরি ইটন ও ও কেমব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অ্যামেচার। সুতরাং তিনি যে-কথা বলতে পারেন—সে-কথা যদি আমি বলতাম!—বিষন্ন পরিহাসের সঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন লারউড।

কিন্তু উল্লাসের সঙ্গে গবেষণা করেছেন—এই খেলায় তাঁর বলের গতি কত হতে পারে। নানা সাক্ষ্য-প্রমাণে স্থির করেছেন, যদি ওয়েসলে হলের বলের গতি হয় ঘণ্টায় ৯০ মাইল, তাহলে তাঁর অবশ্যই ১০০ মাইল।

ওদিকে মাঠের বাইরে বসে ব্রাডম্যান খেলা দেখছিলেন আর ভাবছিলেন। পৃথিবীর সর্বোত্তম ব্যাটিং-প্রতিভা সর্বোচ্চ গতির রূপ দেখে প্রশংসাবোধ না করে পারেননি:

"এই খেলায় আর একটি (ম্যাককেবের ব্যাটিং ছাড়া) অসাধারণ ঘটনা, লারউডের অপূর্ব বোলিং, যাঁর বলের সর্বক্ষণের অভ্রান্ত পরিমাপ এবং প্রচণ্ডতম

গতি সর্বমহলে প্রশংসা অর্জন করেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে লারউড ১৮ ওভারে, ২৮ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। এই ইনিংসে তিনি আমার দেখা অপর যে-কোন বোলারের তুলনায় দ্রুততর গতিতে দীর্ঘতর সময় ধরে বল করেছিলেন।"

এই প্রচণ্ড গতি এবং লেগের দিকে অর্ধচক্রাকার ফিল্ডিং-এর চেহারা দেখছিলেন আর ভাবনায় মগ্ন ছিলেন ব্রাডম্যান। কি হবে তাঁর ভাবী আক্রমণ-পদ্ধতি! অবশ্য ইতিমধ্যেই, ইংলণ্ডে নয়া বোলিং-নীতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরেই, তিনি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন—এ-বস্তু ক্রিকেট নয়, একে চলতে দিলে ক্রিকেট মরে যাবে। কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেননি। অথচ মাঠে তাঁকে নামতে হবেই—লক্ষ-লক্ষ অস্ট্রেলিয়ান সমর্থকের বহু প্রত্যাশার ফুল-ছড়ানো পথ মাড়িয়ে। প্রত্যাশা যদি ব্যর্থ হয়! ফুলের সাপ তো তখন বেরিয়ে এসে ফণা ধরবেই!

ব্রাডম্যানের ভাবনার অন্ত নেই।

* * * শ্যেন-বিহঙ্গ...আর ভুজঙ্গ... * * *

মেলবোর্নের অর্ধলক্ষ দর্শকের হৃৎপিণ্ড আঁতকে স্তব্ধ। কোনো অদৃশ্য শীতল হস্ত গোটা মাঠের গলা টিপে দম বন্ধ করে দিয়েছে।

শ্মশানের নীরবতার মধ্যে ডন ব্রাডম্যান ফিরছেন প্যাভিলিয়ানে শূন্য হাতে। একেবারে প্রথম বলেই আউট।

অথচ ক্রিকেট-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় উল্লাসধ্বনির মধ্যে ব্রাডম্যান উইকেটের দিকে হেঁটেছিলেন মাত্র কয়েক মুহূর্ত পূর্বে। এমন অভিনন্দন খেলার মাঠে কখনো দেখেননি ইংরাজরা। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন তাঁরা। যখন কোন মানুষ গোটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ হয়ে ওঠেন, তখনি এমন সংবর্ধনা পান।

অস্ট্রেলিয়ার গৌরবসূর্য ব্রাডম্যান, নীতিহীন বোলিংয়ের কালো পর্দা ছিঁড়ে শত-শত রানের কিরণধারা আবার বর্ষণ করবেন, মিথ্যে হয়ে যাবে সমস্ত আশঙ্কা, আতঙ্ক—তারই উজ্জ্বল প্রত্যাশা বেজেছিল করতলে ও কণ্ঠে।

তার পরের অবস্থা—ওয়ালী হ্যামণ্ডের বর্ণনায়—

"৬০ হাজার লোককে একসঙ্গে নৈরাশ্যের অনিবার্য আর্তনাদ করতে কখনো শুনেছ? সেই—'ও—হোঃ—হোঃ'—মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমার কানে বাজবে। তারপরেই একেবারে প্রাণশূন্য নৈঃশব্দ্য—ব্রাডম্যান তখন প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটছেন। আমাদের কারোরই বলবার মতো মনের অবস্থা ছিল না—'মন্দ বরাত, দুঃখিত!' টেস্ট-ম্যাচের মধ্যে এমন নিস্তব্ধতার চেয়ে শিরু-শিরে অস্বস্তিকর আর কিছু হতে পারে না।"

বাওয়েসের নিতান্ত বাজে একটা বলে ডন ব্রাডম্যান যখন আউট হলেন, তখন মাঠের ৬০ হাজার দর্শকের চেয়ে তিনি কম মর্মবিদ্ধ হন নি। বডিলাইনের একটা উত্তর তাঁর প্রতিভা প্রস্তুত করেছিল, সেটা প্রকাশিত হবার আগেই তাঁকে বিদায় নিতে হল।

কিভাবে ডন প্রস্তুত হয়েছিলেন, সে বিবরণ দিয়েছেন জনি ময়েস। টম ল্যাংরিজের সমুদ্রতীরের কুটিরে ডন গিয়েছিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। সেখানে শরীর সারছিল কিন্তু মাথার কাজ থেমে ছিল না। তিনি তাঁর পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন।

সিডনিতে যখন ডন ফিরে এলেন, তখন অনেকটা সুস্থ দেখালেও সম্পূর্ণ সুস্থ তিনি নন। তবু অপেক্ষা করা যায় না। সক্রিয় হতেই হয় এবার। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে তাকে প্রতিঘাত করবার যে-পরিকল্পনা তিনি রচনা করেছেন, তাকে প্রয়োগ করতে হবে বাস্তবে।

ব্রাডম্যান বিশ্রামক্ষণে স্বগত চিন্তা করেছেন অনেক, একান্তে অনেক স্বগতোক্তি। কিন্তু এবার একজন বন্ধু ও বুদ্ধিমান বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে পরিকল্পনাটির সব দিক যাচাই করে নেওয়া দরকার। সুতরাং গেলেন জনি ময়েসের অফিসে।

ডন : জনি, একটা মতলব করেছি—

ময়েস অপেক্ষা করে রইলেন।

ডন : তোমার কাজ হল, আমার সব কথা ভালভাবে শুনে, কোথায় ফাঁক আছে খুঁজে বার করা।

ময়েস মনে-মনে হাসলেন। ডনকে তিনি চেনেন। সে যখন কোনো কিছু স্থির করে, অনেক চিন্তার পরেই তা করে। অন্যের কথা আগেই মনে-মনে খণ্ডনের উপায় ভেবে রাখে। 'এ থিংকিং মেশিন', ডন ব্রাডম্যান, শুধু 'রান-গেটিং মেশিন' নয়। এখন সে-যে ময়েসকে ত্রুটি আবিষ্কার করতে বলছে, এ শুধু নিজের মতকে দৃঢ়ভাবে ধরবার জন্য। সিদ্ধান্তটা নিশ্চয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরের মনের সংঘাতে নাড়া খেয়ে আরও তীব্রভাবে নিজের মনে সক্রিয় হতে চাইছে।

ডন : অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আমাকে কিছু রান করতেই হবে। দর্শক আর ছেড়ে দেবে না। কেউই ছেড়ে দেবে না। তাদের চাহিদা মেটানো যাবে কি করে ?

ময়েস : হ্যাঁ, চাহিদা আর সরবরাহের পুরনো কথা।

ডন : সরবরাহ কি করে করা যায়, তাই প্রশ্ন। লারউড অসম্ভব জোরে বল করে। মুহুর্মুহু বাম্পার। তবু সে যে-জিনিসই দিক, তাকে এড়িয়ে চলতে পারি। সারাদিন এড়িয়ে যেতে পারি—যদি তাতেই চলে যায়।

ময়েস : কিন্তু—

ডন : ঠিক। বড় আকারে সেই 'কিন্তু' হল—ডিয়ার ব্রাডম্যানের কাছ থেকে দর্শক জিমন্যাসটিকসের উত্তম প্রদর্শনী চায় না, রান চায়—রীতিমতো জোরের সঙ্গে চাইছে। এক্ষেত্রে একটা সহজ মতলব করেছি—

ডনের 'সহজ' মতবলটি শোনার জন্য ময়েস উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করেন।

ডন : তা হল...তোমার কানে হয়তো অদ্ভুত ঠেকবে...আমি উইকেট ছেড়ে পেছিয়ে গিয়ে অফের দিকে বল পাঠাতে চেষ্টা করব। যদি পারি, তাহলে বোলারের মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে, প্রথমত মার খাওয়ার জন্য, দ্বিতীয়ত ফিল্ডিং সাজানো ভেস্তে যাওয়ার জন্য। এক্ষেত্রে লেগ থেকে লোক সরিয়ে অফে লোক বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। তা সে যেমনি করুক—

ডন উৎসাহিত হয়ে ওঠেন—

ডন : তখনি স্বাভাবিক খেলা শুরু করে দেব।

ময়েস, বলাই বাহুল্য, সপ্রশ্ন।—ব্যাপারটা সোজা নয়, তাছাড়া অনেকগুলি বিষয় জড়িত—

ডন : এছাড়া উপায় কি? অভিনব ব্যাধির অভিনব প্রতিষেধক। রান আমাকে করতেই হবে, যে উপায়েই হোক।

ময়েস মুখ খুললেন—

ময়েস : কিন্তু ধর যদি কোন বল অস্বাভাবিক জোরে নীচু হয়ে ঢুকে আসে, দেখা যাবে তুমি পা ফাঁক করে ক্রশ-ব্যাট ধরে দাঁড়িয়ে আছো।

ডন : যে-বল অনেক আগে উইকেটে ঠোকা হয়েছে, তা উইকেটের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যদি গুড-লেংথ জাতীয় কিছু হয়, আমি মোটেই সরব না। আর, বল যদি আমার দিকে আসে তাহলে উঁচু বা নীচু যাই হোক, লেগ-স্টাম্পের বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

ময়েস : তুমি কি হুক মার ছেড়েই দেবে? তুমি তো একভাবে নয়, দুভাবে হুক মেরে থাকো। উঠতি বলে টেনিস-মার ধরনের কতকগুলো হুক মারো, যেগুলো, মিড-অন পেরিয়ে যায়। অন্যগুলো সকলে যেভাবে মেরে থাকে সেই-ভাবে। এসব কোনো মার মারারই চেষ্টা করবে না—সে কি?

ডন : নাঃ, হুক এক্ষেত্রে কোনো কাজের নয়। সাধারণ বোলারের ক্ষেত্রে হুক চলে, কিন্তু লারউড শরীরে ঢুকে আসে। একবার ফসকানো মানে থেঁতলানো মুখে, ভাঙা মাথায় সোজা হাসপাতাল। তাতে কার উপকার, আমার নিজের, না অস্ট্রেলিয়ার?

কিন্তু ফাস্টবোলিং সায়েস্তা করার চিরাচরিত রীতি হুক মারকে বর্জন করা ব্যাপারটা মেনে নেওয়া শক্ত। সুতরাং ময়েসের প্রশ্ন থামল না।

ডন : দেখো, একটা কথা ভুলে যাও কেন, আমি লম্বা নই। অনেকের কাছে যা কোমর-উঁচু বল, আমার কাছে তা মাথা-সমান। সেই বলকে মেরে মাটিতে নামানো সম্ভব নয়।

ময়েসের প্রতিটি যুক্তিকে খণ্ডন করে বাতিল করে দিলেন ব্রাডম্যান। ব্রাডম্যান তা পারেন, সব কিছুতেই তিনি পারদর্শী। কিন্তু তিনি একটি জিনিস পারেন না—অন্যের মনের সম্পূর্ণ সংশয় ছেদন করতে। ব্রাডম্যান ব্যাটিংয়ের প্রতিটি প্রচলিত রীতিকে লঙ্ঘন করছেন, এর জন্য ক্রিকেটের পাঠশালায় তিনি তিরস্কৃত হবেন সন্দেহ নেই, সেই গোঁড়ামির উপরে উঠবার মতো সহজবুদ্ধি ময়েসের ছিল। তিনি জানতেন, চ্যাম্পিয়ান সর্বদা নিজের গ্রন্থ নিজেই রচনা করেন। না, তা নয়, আসল কথা, ডন ব্যাপারটাকে যত সহজ করে দেখিয়েছেন, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। লারউডের বলের চেহারা ময়েস দেখেছেন। কল্পনাতীত ভয়ঙ্কর গতি। সেই বলের মুখে দাঁড়িয়ে ডন ব্রাডম্যান, হ্যাঁ তিনিও, কল্পনাতীত প্রতিভার অধিকারী, তবুও পরিকল্পনাকে সফল করতে পারবেন কি...

না, ডনের প্রতিভার প্রখর আলোকও ময়েসের মনের সন্দেহের গর্তগুলির অন্ধকার দূর করতে পারেনি!

একমাত্র ব্রাডম্যানই পারেন! পারলেন—দ্বিতীয় ইনিংসে। হ্যামন্ড লিখেছেন: "তারপর ব্রাডম্যান এলেন। যখন হেঁটে যাচ্ছেন উইকেটের দিকে, তখন যে-কেউ দেখতে পাবে—'ও জিনিস আর নয়' কথাটা যেন লেখা আছে আগুনের অক্ষরে আকাশের গায়ে।"

অস্ট্রেলিয়া করল ১৯১, ব্রাডম্যান তার মধ্যে ১০৩ নটআউট।

জন ময়েসকে যে-রীতিতে রান করবেন বলেছিলেন, সেই রীতিতেই করলেন। ও-জিনিস ব্রাডম্যানের প্রতিভাই সম্ভব করতে পারে। উচ্ছ্বসিত হয়ে লারউড লিখেছেন:

"এই সেই ব্রাডম্যান যাঁর ক্রিকেট-জীবন শেষ হয়ে গেছে—জনৈক ভাষ্যকারের তিন সপ্তাহ পূর্বে ঘোষিত মন্তব্য। বোর্ড অব কন্ট্রোল যখন বিধান দিল যে, ব্রাডম্যান একই সঙ্গে লিখতে এবং খেলতে পারবেন না, এবং যখন তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রথম টেস্টে নামতে পারলেন না, তখন ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞ জনৈক শখের সাংবাদিক সিডনির এক সংবাদপত্রে 'আবিষ্কার'-খবর ছাড়লেন। স্তম্ভিত দেশবাসীর চোখের উপরে তিন কলমব্যাপী শিরোনামা বেরুল: ব্রাডম্যানের দুরারোগ্য রক্তশূন্যতা। তিনি আর কখনো খেলতে পারবেন না। এ সেই ধরনের 'আবিষ্কার', যা সম্পাদকেরা পরে ভুলে যেতে ভালবাসেন। গল্পটা ফেঁসে গেল এই অতি সরল কারণে—ডন দুরারোগ্য রক্তশূন্যতার ধারে-কাছেও ছিলেন না। এর পরেও প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁকে ৪৭টি সেঞ্চুরি-সহ ১১,০০০ রান করতে হবে, তবেই তাঁর ক্রীড়া-জীবনের সমাপ্তি ঘটবে।

"ডনের শূন্য রানে আউটের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নানা পাগলামির ব্যাখ্যা শোনা গেল।...

"ডনের ঐ দ্বিতীয় ইনিংস তাঁর জীবনের সর্বোত্তমের একটি। যথেষ্ট শারীরিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতির যোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর স্বাভাবিক খেলা অনুসরণ করতে পারছেন না, তা স্পষ্ট দেখা গেলেও, তিনি এমন খেলেছিলেন যাতে আমার মনে হয়েছিল—হয়তো বডিলাইনকে তিনি বশীভূত করে ফেলবেন, যদিও উইকেট এতই নিষ্প্রাণ ছিল যে, তা আমাকে কোনো সুযোগই দেয়নি।...

"ডনকে যখনি উইকেটের উপরে এধারে-ওধারে ছটফট করে বেড়াতে দেখলাম, তখনই বুঝলাম, আমি তাঁকে উদ্বেগ দিচ্ছি। ডনের দিকে বল করার সময়ে আমি নিজেকে বলতাম—'আমি তোমাকে ভয় পাইয়েছি। এখন দাঁড়াও—এটা কি যাচ্ছে দেখা!'

"কিন্তু আমাকে জয়ধ্বনি দিতেই হল—ডন এমন-কিছু মার মারলেন! যে-ভাবেই হোক, ব্রাডম্যান একটা দারুণ ব্যাপার।

"ডন গাড়িটা প্রায় উল্টে দিচ্ছিলেন—যখন বল দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে সরে গিয়ে সেটিকে স্কোয়ারকাট করবার জায়গায় দাঁড়াচ্ছিলেন, কিংবা অফের দিকে মারবার জন্য ব্যাটকে গাঁইতির মত ব্যবহার করছিলেন। তাঁর লেগস্টাম্পের উপরে পূর্ববৎ বল করার সময়ে আমি তাঁকে লেগের দিকে মারাতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু তাতে বাধ্য হবার লোক তিনি ছিলেন না।

"যখন লেগের দিকে সরে আমাকে অফের দিকে মারার চেষ্টা করতে লাগলেন,

তখন আমার পক্ষে তা করতে দেওয়া সম্ভব ছিল না। অধিনায়ক আমার জন্য যে-ফিল্ডিং সাজিয়েছেন, তার মতো করেই আমাকে বোলিং করে যেতে হবে। আমাকে কাটবার জন্য যখন ডন ঐ পথ নিলেন, তখন ব্যাপার দাঁড়াল—হয় তিনি নয় আমি।

"সুতরাং আমার হাত ঘোরার আগে ভগ্ন মুহূর্তে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। অধিকাংশক্ষেত্রে তিনি লেগের দিকে সরছিলেন, কিন্তু কখনো-কখনো অফে দ্রুত এক পা সরে উঠতি বলকে লেগের দিকে সুইপ করে নামিয়ে দিচ্ছিলেন। পুরনো 'কাউ শট'-এর রীতিতে থাবড়ে নামানো।

"ডন কি করতে যাচ্ছেন, তা আন্দাজ করার চেষ্টা করেছি। যদি দেখেছি, তিনি লেগের দিকে সরতে যাচ্ছেন, সেই ক্ষণ-মুহূর্তে বলকে তাঁর দিকে সরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। অফের ক্ষেত্রেও তাই করেছি। মনে হয়, 'শরীর লক্ষ্য করে ছোঁড়া'—ব্যাপারটা তাই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কি উপায়—তিনি তাই দাঁড় করিয়েছিলেন।"

ক্রিকেট-ইতিহাসের সবচেয়ে লোমহর্ষণ সংঘাতের কাহিনী—যুযুধান দুই যোদ্ধার একজনের মুখে শোনা গেল। কিন্তু এই বর্ণনা থেকে ব্যাপারটার ভয়াবহ রূপ কি সত্যই বোঝা সম্ভব? ব্রাডম্যান যখন তাঁর পরিকল্পনা জনি ময়েসের গোচর করেছিলেন, তখন ময়েসের সন্দেহ হয়েছিল, ও-জিনিস লারউডের ঝটিকাগতির সামনে ব্রাডম্যানের পক্ষেও করা সম্ভব কি না! ব্রাডম্যানেরও সংশয় কম ছিল না, যখন তিনি জানতেন যে, বডিলাইন বলে "যদি কোনো ব্যাটসম্যান আত্মরক্ষা করে খেলে, সে অবশ্যই শর্ট-লেগে ফিল্ডসম্যানের দ্বারা কট-আউট হয়ে যাবে; হুক করতে চেষ্টা করলে বাউণ্ডারির ধারে তখনি বা কিছু পরে কট; ব্যাটসম্যান যদি বিশেষভাবে সৌভাগ্যবান না হয়, আক্রমণ বা আত্মরক্ষা কোনো ক্ষেত্রেই পরিত্রাণ নেই; গুড-লেংথ বলকে খেলে অন্যগুলোকে এড়িয়ে যাও, এই নীতি-বাক্য শুনতে ভালো, কার্যে অসম্ভব; এ চেষ্টায় ব্যাটসম্যানকে আহত হতে হবেই।"

ব্রাডম্যান কেন—বিপক্ষ ইংলণ্ডের প্রধান ব্যাটসম্যান ওয়ালী হ্যামণ্ড কি বলেন দেখা যাক:

"লারউডের বলের গতি ও নিখুঁত মাপ বডিলাইনকে সম্ভব করেছে। সে যখন সবচেয়ে দ্রুত, তখন কেউ সরে যেতে পারবে না—নড়বার আগেই গায়ে এসে পড়বে। অগত্যা গা বাঁচাবার জন্য ব্যাট তুলতে হবে। তাতে হয় লেগের দিকে ক্যাচ উঠবে, কিংবা হাত থেকে ব্যাট খসে যাবে, যা অনেক অস্ট্রেলিয়ানের হয়েছিল। তুমি যদি লেগের দিকে সরে যাও, একটি সোজা বল এসে উইকেট উড়িয়ে দেবে। ব্যাট সামনে ধরলে ক্যাচ, না ধরলে মাথায় কিংবা বুকে বোমার আঘাত।

"আইনে এর বিরুদ্ধে, কিছু নেই। কিন্তু আমি অবশ্যই স্বীকার করব, ব্যাটসম্যান হিসেবে যারা এর মুখোমুখি হতে গররাজি, আমি তাদেরই একজন। আমি লিখিতভাবে কোনো অভিযোগ করিনি, কিন্তু জ্যাক হবসের মতোই বলব, এ-জিনিস ধারাবাহিকভাবে চলতে দিলে খেলা ছেড়ে দেব।...এটা সত্যই

বিপজ্জনক।—কে পারেন দেখি অস্বীকার করুন? কেউ-যে বডিলাইনের দ্বারা একেবারে খুন হয়ে যায়নি, তা ভাগ্যবশে—উল্টোটাই ছিল স্বাভাবিক।...বডি-লাইনের বিরুদ্ধে খেলে ব্যাটসম্যান—হয় আহত, নয় আউট—যে-কোনো একটি হওয়ার স্বাধীনতা নিতে পারে।"

ব্রাডম্যানের, একমাত্র ব্রাডম্যানের প্রতিভাই বডিলাইনের একটি উত্তর আবিষ্কার করেছিল—এবং সে উত্তরদানের সাধ্য একমাত্র তাঁরই। কিন্তু এই অরক্ষণশীল রচনায় অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রিকেটের জাত গেল-গেল রব তুলেছিলেন! যেমন ফিঙ্গলটন। এ'দের ধারণা, দাঁড়িয়ে মার খাওয়াই একমাত্র বীরত্ব, যেমন ফিঙ্গল-টন খেয়েছিলেন। মার দেওয়া, ও সেইসঙ্গে মার এড়ানোও যে প্রতিভার লক্ষণ, একথা এ'রা বুঝতে চাননি। ব্রাডম্যানের মনোরম উত্তর :

'১৯৩২-৩৩ মরশুমে আমি বডিলাইন প্রতিরোধের জন্য অরক্ষণশীল পদ্ধতি নিয়েছিলুম, যাতে লেগের দিকে সরে গিয়ে অফে বল কাট করার প্রয়াস ছিল। আমার বিবেচনায় পুরাতন রীতির অপেক্ষা এই নূতন রীতিতে মারাত্মক আঘাতের সম্ভাবনা আরও বেশি। এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ সফল না হলেও চারটি টেস্ট-ম্যাচে চারবার ইনিংসপিছু পঞ্চাশের উপর রান করেছিলুম।

"ম্যাককেব ও রিচার্ডসন পুরাতন রীতিতে বডিলাইনের সম্মুখীন হয়েছেন। দু'জনেই অত্যন্ত সমর্থ ও প্রাণবন্ত, চমৎকার হুক-কারিয়ে। তথাপি ঐ চারটি ম্যাচে তাঁদের দু'জনের কেউই একবারের বেশি ৫০ পেরোতে পারেননি।... আমার পদ্ধতির জন্য নানা মহলে তিক্ত বিরূপ সমালোচনা বর্ষিত হয়েছে। সমসাময়িক খেলোয়াড় জ্যাক ফিঙ্গলটন পরে লেখা এক বইয়ে আমার কৌশলের বিরুদ্ধে সবিশেষ কটাক্ষ করেছেন। পাঠকদের এখানে জানানো যায় যে, জার্ডিনের দলের বিরুদ্ধে তাঁর শেষ তিনটি টেস্ট-ইনিংসে তিনি ১, ০, ০, করেছিলেন, যার জন্য অস্ট্রেলিয়ান দল থেকে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়। ঐ একই তিন ইনিংসে আমি ১৭৭ করি, গড় ৮৮·৫। এই সংখ্যাগুলি আমার পদ্ধতি সমালোচনায় ফিঙ্গলটনকে কোনোই অধিকার দেয় না। বোঝা গেল, আমাকে প্রতিবার সেঞ্চুরি করতে হবে, এবং সেইসঙ্গে অন্যের তুলনায় বেশি-বার আঘাত পেতে হবে—কারো-কারো রুচির সম্মানার্থে!"

লারউড বলেছেন, উডফুল ও ব্রাডম্যান এমনভাবে লাফিয়ে পালিয়ে যেতেন, দর্শকেরা মনে করত আমি বুঝি তাঁদেরই তাক করে বল করছি, অথচ এই সিরিজে ৯ ইনিংসে ব্রাডম্যানকে একবারের বেশি আঘাত করতে পারিনি।

আনন্দে না বিষাদে এই উক্তি জানি না।

ব্রাডম্যানের ব্যাটিং এবং ওরিলির বোলিংয়ের জন্য (১০টি উইকেট) অস্ট্রে-লিয়া জিতল দ্বিতীয় টেস্টে।

এই খেলার পরেও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কন্ট্রোল-বোর্ড বডিলাইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল না। সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল—ব্রাডম্যান দেখলেন। যখন ফলাফল সমান-সমান তখন প্রতিবাদ জানালে একথা উঠত না যে, হেরে গিয়ে অস্ট্রেলিয়া প্রতিবাদ করেছে।

অস্ট্রেলিয়ার সর্বনাশের ভাবী চেহারাটা ব্রাডম্যান সাদা চোখেই দেখেছিলেন।

হো—হো—হো—। মার্—মার্—মার্! বেজন্মাগ্নলোকে মেরে ফেল্—শেষ করে ফেল্—! ওগ্নলো দস্যু—খ্নী—জানোয়ার—

ক্রিকেটের অমাবস্যা—নোংরা কালো দিন—সর্বনাশের প্রহর—

যদি কেউ পিস্তল ছোঁড়ে? যদি হাজার-হাজার লোক বেড়া টপকে মাঠে নেমে পড়ে? লারউড স্টাম্পের কাছে দ্রুতপদে গিয়ে দাঁড়ান—সেক্ষেত্রে স্টাম্পগ্নলোকে অন্তত আত্মরক্ষার অস্ত্র করা যাবে।

অস্ট্রেলিয়ান-বোর্ড প্রতিবাদ জানাল, সত্যই জানাল। তখন কিন্তু অবস্থা আয়ত্তের বাইরে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা বা নষ্টের ভার নিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান জনতা। মনের ভারসাম্য ও শালীনতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে একেবারে।

ক্রিকেট ইতিহাসে সত্যই মহারাত্রি—মোহরাত্রি—

শ্নক্রবার ১৩ই জান্য়ারি, ১৯৩৩। এডিলেডে ইঙ্গ-অস্ট্রেলীয় তৃতীয় টেস্টের প্রভাতে যখন মাঠের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন জার্ডিন ও উডফ্নল, পরস্পর করমর্দন করেছিলেন উষ্ণভাবে, তখন মনে হয়েছিল, কালো ছায়াটা প্রায় ফিকে; এবার সত্যিই একটা স্নস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাবে। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া দ্ন' দলই একটি করে খেলা জিতে সমান-সমান অবস্থায়—সমানে-সমানে খেলা—য্নদ্ধ নয়।

ইংলণ্ড খেলা আরম্ভ করে প্রথম ইনিংসে করল ৩৪১। শনিবারের বারবেলায় অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ইনিংস স্নচনা করতে নামলেন ধৈর্যশীল অধিনায়ক উডফ্নল এবং ধরিত্রী-সহিষ্ণ্ন ফিঙ্গলটন। ফিঙ্গলটনকে অবশ্য বেশিক্ষণ সহ্য করতে হয়নি, অ্যালেনের বলে প্নথিবীকে শ্নন্যময় দেখে চলে গেলেন।

ওপেনার-সঙ্গীর বিদায়ে বিষণ্ণ উডফ্নল গড় রক্ষা করতে লাগলেন বীরত্বের সঙ্গে। সেই সময়ে সহসা—একশো মাইল বেগে ছ্নটে-আসা একটি গোলা চোখের পলকে বাঁক নিয়ে ব্নকের ঠিক মাঝখানে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে গেল। লারউডের তৃতীয় ওভারের শেষ বল।

কিছ্ন শর্ট-পিচ বলটি খেলবার জন্য উডফ্নল উইকেটের ওপরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। বলের ম্নখোম্নখি একেবারে সোজা ব্নকে দাঁড়িয়ে তিনি বলটি আটকাতে চেয়েছিলেন। ব্যাট এড়িয়ে বল প্নর্ণ গতির সঙ্গে ব্নকে গিয়ে বাজল।

খসে গেল হাতের ব্যাট—অসীম যন্ত্রণায় দ্ন' হাতে ব্নক চেপে ধরলেন—মরণাহত অশ্বের মতো টলতে-টলতে উইকেট থেকে সরে গিয়ে গ্নঁজে পড়লেন—

এতখানি ন্নশংসতা! রোষে-ক্ষোভে গর্জে উঠল হাজার-হাজার লোক—হা-হা করে আছড়াতে লাগল হিংস্র স্বর—ঠিক সেই সময়ে—জার্ডিন এগিয়ে গেলেন লারউডের দিকে—

'চমৎকার বল লারউড! চমৎকার! ধন্যবাদ!'—জার্ডিন বললেন।

দর্শকের চীৎকারে বোলারের মনোবল নষ্ট না-হয় দেখা অধিনায়কের কর্তব্য। জার্ডিন দেখে খ্নশি হলেন যে, তাঁর দলের সেরা ব্যাটসম্যান হ্যামণ্ড একইভাবে বোলারের মনোভাবের পরিচর্যা করছেন।

লারউডকে জার্ডিনের প্রশংসা করার সময়ে খ্নব কাছে দাঁড়িয়েছিলেন ব্র্যাডম্যান। জার্ডিন সেজন্য গলা নামানোর দরকার মনে করেননি।

লারউড পরে বলেছেন—ডনের সামনে ইচ্ছে করে ও-কথা বলা হয়েছিল ডনের মনোবল নষ্ট করার জন্য।

বলের ওজন এবং তাঁর বলের গতির হিসেব করে লারউড আরও বলেছেন—ঐ বলে আঘাত মানে ৫০ মণ জিনিস আছড়ে পড়ার আঘাত!

কয়েক মিনিট অর্ধচেতনের মতো কাটল উডফুলের। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ব্যাট করবেন, হ্যাঁ, মাঠের বাইরে যাবেন না জার্ডিনের দয়াভিক্ষা করে। এখনো তিনি সম্পূর্ণ মারা যাননি, দাঁড়াতে পারছেন।

জার্ডিনও দয়া খরচায় রাজী হলেন না: উডফুল পোক্ত ক্যাপ্টেন, তিনি জানেন যে, অনুরোধ করলে এখনি তাঁকে মাঠের বাইরে চলে গিয়ে ঘা সামলে আসার সুযোগ দেব, তা তিনি যখন চাইছেন না, তখন তিনি নিজের খেলা খেলুন এবং আমরা আমাদের খেলা খেলি—

'অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—' বিস্ময়ে ঠেলে বেরিয়ে এল দর্শকদের চোখ। উডফুল উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাট ধরা-মাত্র লারউডের ইঙ্গিতে...লেগের দিক ফিল্ডসম্যানে ঠেসে গেল!! এবার—উপযুক্ত সময়ে—শুরু হল বডিলাইন—এতক্ষণ যা ছিল না।

এতখানি ঘৃণা দর্শক কখনো বোধ করেনি, কারণ এতখানি নৃশংসতা তারা কখনো দেখেনি।

বুক চাপড়ে যিনি লুটিয়ে পড়েছিলেন, তীনি উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় বল পেলেন—গর্জিত বাম্পার। হাতের ব্যাট ছিটকে বেরিয়ে গেল তার ধাক্কায়। ব্রাডম্যান এধার-ওধার সরে, ডুব গেলে, না-মেরে এবং একটা আধা-মেরে আউট হয়ে চলে গেলেন অল্প রানে। 'প্রথম টেস্টের বীর' ম্যাককেব এলেন, এবং সহজতম ক্যাচ দিয়ে বিদায় নিলেন। উডফুল দারুণ সাহসের পরিচয় দিয়ে ২২ রান পর্যন্ত করতে পারলেন। তারপর আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাবার কিছু পরে মাঠে অ্যামপ্লিফায়ার বেজে উঠল—'ডাক্তার কে আছ, এখনি চলে এসো।'

ঘৃণায় আতঙ্কে অবর্ণনীয় অবস্থা তখন মাঠে।

না, উডফুলের জন্য ডাক্তার ডাকা হয়নি, ভোসের পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা ধরার জন্য ডাক্তারকে ডাকা।

অন্য আর এক নাটক একই কালে অভিনীত হচ্ছিল ড্রেসিংরুমের ভিতরে। বাইরে পনস্‌ফোর্ড মারের পর মার খেয়ে যাচ্ছেন—এগারোটি বড় ধরনের মারের দাগ তাঁর পাঁজরায়, কাঁধে, পিঠে পরে ধরা পড়েছিল—মার খেয়ে-খেয়ে রান করে চলেছেন (৮৫ করেছিলেন)—এধারে ড্রেসিংরুমের টেবিলে শুয়ে নিজের যাতনার শুশ্রূষা এবং পনস্‌ফোর্ডের যাতনার কথা চিন্তা করছেন উডফুল—

এমন সময়ে দরজা ঠেলে ঢুকলেন এম-সি-সি'র সুসভ্য ম্যানেজার পেলহ্যাম ওয়ার্নার। এসেছেন সহানুভূতি জানাতে।

উডফুল সমবেদনা-বচনের যা উত্তর দিয়েছিলেন, সেই সর্বোত্তম 'শেষ উত্তর' ইতিহাসে বিখ্যাত:

"মিঃ ওয়ার্নার, আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে অভিলাষী নই। ওজানে দুটো

দল রয়েছে, তাদের মধ্যে একটি দলই ক্রিকেট খেলছে। ক্রিকেট খুব বড় খেলা, তাকে নষ্ট করা উচিত নয়। এই খেলা থেকে কিছু লোকের সরে যাওয়াই ভাল।"

ভদ্রতার সব আচরণ খসে গেল এবার। চোখের চামড়া উপড়ে ফেলে সবাই লাল গোল চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল। উডফুলের তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তরের সংবাদ ফাঁস হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সংবাদপত্রে।

কে সংবাদটি ফাঁস করেছে? নিশ্চয় খেলোয়াড়-সাংবাদিক ফিঙ্গলটন—পেলহ্যাম ওয়ার্নারের তাই মনে হল। আর বাড়াবাড়ি সহানুভূতির ভঙ্গি তিনি রাখলেন না, যখন একান্তে লারউডকে ডেকে বললেন—'তুমি এক পাউন্ড পাবে, যদি ফিঙ্গলটনকে অবিলম্বে সরিয়ে দিতে পার।'

দিনের খেলা শেষ। অভিশাপ উচ্চারণ করছে সার দিয়ে জড়ো হওয়া দর্শকেরা—তার মধ্য দিয়ে ইংলন্ডের ক্রিকেটাররা প্যাভিলিয়নে ড্রেসিংরুমে গেলেন। ক্রিকেটারের সাজ ছেড়ে যখন তাঁরা বেরুচ্ছেন—পুলিস অফিসার এগিয়ে এলেন—

'কোন্ জন লারউড?'—পুলিসের হুঙ্কার।

বিল ভোস্ দেখিয়ে দিলেন।

'কেন, আমি কি দোষ করেছি'—লারউডের জিজ্ঞাসা।

'কিছু নয়, তবে বাইরে বিরাট জনতা অপেক্ষা করছে—'

'না না, পুলিসের কোনো দরকার নেই'—ভোস্ ভরসা দেন। তাঁর ছ' ফুট তিন ইঞ্চি উঁচু ভীমবপুর দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা ও আশ্বাস বোধ করেন লারউড। কিন্তু কোনোই আশা বোধ করেননি পুলিস অফিসার—'হ্যাঁ, আপনারা অবশ্যই নিরাপদ, তবে কিনা আমাদের সঙ্গে থাকা ভাল, নেহাতই যদি দরকার হয়।'

'কেউ গায়ে হাত দেয়নি—সৌভাগ্য!'—পুলিস-পাহারায় গালাগালির প্রবাহের মধ্য দিয়ে এগোবার সময়ে লারউড ভাবলেন।

অত্যন্ত সভ্য, অত্যন্ত ভদ্র, সুশিক্ষিত, শান্ত ও সহিষ্ণু অস্ট্রেলিয়ান-অধিনায়ক পর্যন্ত ধৈর্যহারা হয়ে ইংলন্ড-দলের অখেলোয়াড়োচিত আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন—সে খবর শোনার পরে অস্ট্রেলিয়ার দর্শকেরা ইংলন্ড-দলের প্রতি সম্ভ্রম রাখার কোনোই হেতু বোধ করেনি। তাদের ধৈর্য-নাশের পিছনে খেলার ফল নিয়ে বাজি ধরা, দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি, যার মূলে ইংলন্ডের দান যথেষ্ট বলে অনুমান, এবং অস্ট্রেলিয়া-নামক দ্বীপ-মহাদেশবাসীদের দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা রয়েছে—এসব কথা বলা হলেও উত্তেজনার মূল কারণ যে ইংলন্ডের অভিনব আক্রমণ-পদ্ধতি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তৃতীয় দিনে এডিলেড-ওভালের পঞ্চাশ হাজার দর্শক রুদ্ধশ্বাস রোষে কিংবা শ্বাসমুক্ত গরল উদ্গিরণ করে খেলা দেখছিল—কেননা "এ কোনো সাধারণ ক্রিকেট ম্যাচ নয়—ইংলন্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সেরা ক্রিকেটাররা ক্রিকেট-ইতিহাসের তিক্ততম সংঘর্ষে অংশ নিয়েছেন—এ হল বডিলাইন!"

বডিলাইন ক্ষমা করে না, করতে জানে না। প্রথম ইনিংসে ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার রান ৬ উইকেটে দুশো পেরিয়ে গেছে। ইংলন্ডের ৩৪১ রান ধরবার জন্য দৃঢ়পদে সে অগ্রসর। ব্যাট ধরে সেই পথে এগোচ্ছেন—ব্রাডম্যান—উডফুল—পনস্‌ফোর্ড নন—বার্ট ওল্ডফিল্ড, উইকেট-কীপার। ওল্ডফিল্ড কোনো চোখ-লাগা ব্যাটসম্যান নন, তবে মাঝে-মাঝে মন্দ রান করেন না, শেষের সংগ্রহে অনেক সময় ভাণ্ড ভরান, চল্লিশের কাছাকাছি এখন—'বাঃ বাঃ, চমৎকার লেগ-গ্লান্স'—দর্শকেরা বাহবা দিয়ে ওঠে যখন লারউডের বল বাউন্ডারির বেড়ায় ঠোকা খেল।

কণ্টক ক্ষুদ্র হইলেও বিদ্ধ করিবার শক্তি অসাধারণ। দাঁতে দাঁতে পিষে লারউড স্থির করলেন—কাঁটা উপড়ে দেব এবার। বল ছোঁড়ার আগে পায়ের ডগের উপর শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে উঠলেন, বলটাও লাফিয়ে উঠল হিস্‌ করে শেষনাগের মতো নিশ্বাস ফেলে। রক্তমাতাল দাঁতাল হিংসা। ওল্ডফিল্ড হুক করতে গেলেন—পারলেন না—ডান পাশের রগে বল ঘা দিল ভয়াবহ গতিতে—ছিটকে গেল হাতের ব্যাট—দু'হাত দিয়ে কপালের দু'পাশ চেপে ধরে অসহ্য কষ্টে হাঁটুর উপর উপর ভর করে ঝুঁকে পড়লেন। সর্বনাশ হয়েছে। ইংরেজ খেলোয়াড়রা পর্যন্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে ছুটে এসে ঘিরে ধরল। বডিলাইন মানুষ মারতে পারে—সত্যি মেরে ফেলল নাকি?

ওধারে ছিটকে লাফিয়ে উঠলেন উডফুল। ড্রেসিংরুমে খেলোয়াড়দের মধ্যে বসে দুদিন আগেকার আঘাতের পরিচর্যা করছিলেন—ছুটে গেলেন উন্মাদের মতো মাঠের মধ্যে সাধারণ পোষাকেই—গলা চিরে চিৎকার করে বললেন—'এ ক্রিকেট নয়—যুদ্ধ—যুদ্ধ—'

মাঠ তখন পাগল। একটা কিছু হবে—হয় বুঝি! আগ্নেয়গিরির বিদারণ ঘটে বুঝি! অভিশাপের নিশ্বাস কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিল—এবার বুঝি অগ্ন্যুদ্গার হয়—লাভার মতো গড়িয়ে পড়বে জনস্রোত মাঠের উপরে—অশুভ সংকেতে থর্‌ থর্‌ করছে চারদিক—

'আর দেখতে পারছি না—উঠে যাচ্ছি, একটা কিছু ঘটবে—মরবে—মরবে কেউ—' মরিস টেট উঠে চলে গেলেন ড্রেসিংরুমের মধ্যে।

ওল্ডফিল্ড লুটিয়ে পড়ার পরে লারউডই প্রথম ছুটে গিয়েছিলেন তাঁর দিকে—'হা ভগবান! এ জিনিস তো চাইনি!' ওল্ডফিল্ডকে আঘাতের কোনোই অভি-প্রায় ছিল না তাঁর। অফস্টাম্পের উপর বল দিয়েছিলেন।—'তাঁকে কখনো মারতে চাইনি—কখনো চাইনি—' ওল্ডফিল্ড বেঁচে আছেন তো!

ওল্ডফিল্ড বেঁচে গিয়েছিলেন। তাঁর মাথার টুপি তাঁকে অনেকটা বাঁচিয়েছিল। এক ইঞ্চি তলায় লাগলে মৃত্যু ছিল অবধারিত—ডাক্তার বলেছিলেন। খুলির একটা হাড় ভেঙেই এ-যাত্রা নিষ্কৃতি। ওল্ডফিল্ড চোখ মেলে দেখলেন—ঝুঁকে আছে ইংরেজ খেলোয়াড়েরা। লারউডের ভয়ার্ত বিষন্ন মুখ—

'আমি দুঃখিত বার্টি—'

'না না, তোমার দোষ নয় হ্যারল্ড'—কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে প্রথমেই বললেন ওল্ডফিল্ড।

ধরাধরি করে ওল্ডফিল্ডকে যখন মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—সংযম হারিয়ে ফেলে এলেন জনৈক অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকা-সম্পাদক—চিৎকার করলেন—

পুট দি বুট ইনটু দেম। জুতো মার্ ওদের।

'থুঃ থুঃ! চাই না অ্যাশেজ্, ওদের নিয়ে যেতে দাও! ওটা অ্যাশ্—ছাই পাঁশ—থুঃ থুঃ থুঃ—'

আরো ভয়ঙ্কর মাঠের অন্য দিকের অবস্থা, যেখানে সাধারণ দর্শকেরা রয়েছে। —হু-ডু-ডু—খুনী—জল্লাদ—অমানুষ—বেজন্মা—

লারউড আবার বল করতে শুরু করেন। দৌড় আরম্ভ করেছেন—হাজার-হাজার গলা একসঙ্গে তাঁর প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে চিরে-চিরে বলে—

এক! দুই! তিন! চার! পাঁচ! ছয়! সাত! আট! নয়! জাহান্নমে যায় নচ্ছার—বাস্টার্ড—!!!

বেজন্মা বাড়ি যা—বেজন্মা 'পমি'—বাড়ি যা—

'বাস্টার্ড— বাস্টার্ড—বাস্টার্ড—'

ওরিলী নেমেছেন। ইতিমধ্যে আরও পুলিস-অফিসার মাঠে জুটেছেন। ওরিলী দাঁতে দাঁত চেপে। ক্ষ্যাপার মতো ব্যাট চালালেন লারউডের বলে। পর পর তিনটি ফসকালো। সতর্ক হবার দরকার আছে লারউডেব, আর না আঘাত লাগে। 'যে-কোন একটা ভুল পদক্ষেপে সর্বনাশ ঘটতে পারে।' লারউডের স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল—খুব অল্প রানে বাকি তিনটি উইকেট গেল। অস্ট্রেলিয়া ২২২।

ইংলন্ড যখন ফিরছে, লারউড সবিস্ময়ে দেখলেন, শান্ত ও সংযত বলে খ্যাত এডিলেডের সদস্যদের মুখে পর্যন্ত অশ্রাব্য কথা।

পরের দৃশ্য—

"ড্রেসিং-রুমে সাটক্লিফ ও ওয়াট প্যাডের স্ট্র্যাপ এঁটে নিচ্ছিলেন তৎপর হয়ে, ইংলন্ডের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করার জন্য। বাইরের অবস্থা কিছুটা শান্ত হলেও যথেষ্ট শান্ত নয়—তখনো ভেসে আসছে আওয়াজ। সকলকে অবাক করে দিয়ে জার্ডিন এক কোণে সরে গিয়ে প্যাড পরতে শুরু করে দিলেন—যাঁর নামার কথা চার নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে।

"হতভম্ব সাটক্লিফ ও ওয়াট পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাটক্লিফ উঠে গেলেন ক্যাপ্টেনের দিকে।—'আমাদের উপর নির্দেশ কি, স্কিপার?' জার্ডিন তখন উত্তর দিলেন না। বাইরের যে-সব বিচ্ছিন্ন আওয়াজ ছেঁড়া-ছেঁড়া হয়ে প্রবেশ করছিল তার দিকে কান একটু বাড়িয়ে শুনতে চাইলেন। অবশেষে বললেন—'বাস্টার্ডদের চেল্লানি শোনো। আমি নিজে যাব মনে করেছি—তাদের আরও কিছু চেল্লাবার চিজ্ দিতে'—"

হ্যাঁ, চেল্লাবার চিজ্ তারা যথেষ্ট পাবে—যাতে শুরুতেই পায় তার জন্য জার্ডিন ব্যাগ হাতড়ে তাঁর রঙ-বেরঙের হারলেকুইন ক্যাপের মধ্যে সবচেয়ে যেটা জেল্লাদার আর চালিয়াতির ছাপ-মারা সেটিকে খুঁজে বার করলেন। সে-ই 'রামধনু'-মার্কা টুপি—যা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান দর্শক প্রচুর আমোদ করেছে চার বছর আগে। অস্ট্রেলিয়ানরা তাঁকে স্নব বলে, বাতিল-আভিজাত্যের ধ্বজাধারী মনে করে, মনে করে ওস্তাদ 'ড্যান্ডি'—তাদের চোখে আর মনে খোঁচা দিতে-দিতে জার্ডিন মাঠের মধ্যে হাঁটতে শুরু করলেন—যেন 'গাঁয়ের সবুজ মাঠে প্রাতঃ

বোলারের বল হাঁকড়াতে বেরিয়ে পড়েছে ডোণ্ট-কেয়ার ছোঁড়া।'

বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে লারউড জার্ডিনের সাহসের রূপ দেখলেন। দাউ-দাউ করে যে-সাহস, উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে বিপদের মাঝে যা ঝাঁপিয়ে পড়ে, এ-জিনিস তা নয়, এ হল কঠিন শীতল সাহস—যে-কোনো পরিণতির মুখে এগিয়ে যেতে পারে স্থির পদক্ষেপে।

জার্ডিন গার্ড নিলেন। উগ্র রঙের টুপির তলায় জ্বলতে লাগল বাজপাখির মতো চোখ, বাঁকা হয়ে রইলো শকুনের মতো নাক, অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধার রেখা ঝুলে রইল ঠোঁটের কোণে—জার্ডিন ব্যাট করে চললেন ধীরতম গতিতে।

প্রতিটি বল পড়বার আগের মুহূর্তে চিৎকার ওঠে—'ওরে বাস্টার্ড! তুই আউট! তুই আউট!'

অস্ট্রেলিয়ার ফাস্টবোলার ওয়াল প্রাণপণে বল করার চেষ্টা করছেন। চিৎকার আছড়াতে লাগল—'শালার মাথা উড়িয়ে দাও ওয়াল—ওটাকে মেরে ঠাণ্ডা করে দাও—'

জার্ডিনের ব্যাটের হ্যাণ্ডেল ভেঙে গেল। যখন ড্রেসিং-রুমে ব্যাট চেয়ে পাঠালেন—

'ব্যাট আর দরকার হবে না তোর, ওরে বেজন্মা—'

'কোন অধিনায়ককে এমন জঘন্য গালিগালাজের আর দারুণ পরিস্থিতির মধ্যে খেলতে হয়েছে কিনা সন্দেহ'—জার্ডিনের খেলা দেখতে দেখতে লারউড ভাবতে থাকেন। সমস্ত বিরোধিতার মাঝখানে কালো কঠিন পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে, রূঢ় অবজ্ঞার দ্বারা দর্শকদের আরও ক্ষিপ্ত করে, জার্ডিন খেলে চললেন, যা শেষ পর্যন্ত চার ঘণ্টা পনেরো মিনিটে করা ৫৬ রানের এক ইনিংস হয়ে দাঁড়াবে।

হ্যাঁ, পুরুষ মানুষ, লারউড স্বীকার করলেন। একে চালানো যায় না, এই চালাবে সকলকে—অনুভব করলেন। বুঝলেন যে, এর উপরে চড়ে থাকা অসম্ভব।

অল্প কয়েকদিন আগেকার একটি ঘটনা মনে জ্বলজ্বল করছে।

দ্বিতীয় টেস্টের পরেই ভিক্টোরিয়ার একটি স্থানীয় দলের সঙ্গে এম-সি-সি-র খেলা। ম্যানেজার ও জেণ্টেলম্যানদের সঙ্গে জার্ডিন (সাটক্লিফই ঐ দলে একমাত্র 'খেলোয়াড়' সঙ্গী) জনৈক মেজরের আতিথ্য গ্রহণ করলেন, পেশাদাররা পড়ে রইলেন হোটেলে। মেজর-ভবনে যাত্রার আগে তিনি হোটেলের চিঠির বাক্সের কাছে দলের নাম টাঙিয়ে দিয়ে গেলেন। দেখা গেল লারউড—দ্বাদশ ব্যক্তি।

আপাদমস্তক জ্বলে গেল লারউডের। কী-ই-ই! পর-পর পাঁচটা খেলা? দুদিন আগে দ্বিতীয় টেস্টে মুখের রক্ত তুলে বল করেছেন ৩৫ ওভার, মেলবোর্নের হাড়-ভাঙা পিচে। ক্রিকেট থেকে অব্যাহতি নিয়ে কয়েকদিন ভিক্টোরিয়ার পল্লী-অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবেন ঠিক-ঠাক। এমন সময়ে এই কাণ্ড—দ্বাদশ ব্যক্তি হয়ে মাঠে অবতরণ!

কখনো খেলবো না—যাচ্ছেতাই। স্বহস্তে নিজের নাম কেটে দিলেন লারউড। লারউডের রাগ ও অস্বীকারের কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। ছুটে এলেন ম্যানেজার প্যালারেট ও জার্ডিন। লারউডকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন—লারউড অনমনীয়।

তখন জার্ডিন লারউডের স্পর্শকাতর অংশে ঘা দিলেন। তিনি বিপক্ষ দলের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেললেন, যাতে ইংলণ্ডের ১২ জনই ব্যাট করতে পারে। এর দ্বারা লারউডকে দেখালেন, দ্বাদশ ব্যক্তি করা হয়েছে, এই অসম্মানের জন্যই যেন লারউড খেলতে চাইছেন না, যা মোটেই আসল ব্যাপার ছিল না। এবার লারউডের না-খেলে উপায় রইল না।

লারউড মনে-মনে চটে গিয়েছেন অনেক সময় যখন জার্ডিন তাঁকে দিয়ে অতিরিক্ত বল করিয়েছেন। এমনকি স্থানীয় খেলাতেও মরিস টেট প্রভৃতি বোলার উইকেট নিতে না পারলে বল ধরিয়ে দিয়েছেন লারউডের হাতে। লারউড বিরক্ত হলে জার্ডিন বলেছেন—'আমি তোমাকে বহাল তবিয়তে রাখতে চাই। তোমাকে ম্যাচের আবহাওয়ায় রেখে তাজা রাখা দরকার।' লারউডকে দ্বাদশ ব্যক্তি করার উদ্দেশ্যও তাই ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ভালই ছিল, যদিও তখন সেটাকে বড় কঠোর বলেই ধরেছিলাম। পরে আমি বুঝতে পারি যে, তিনি যাই করুন, তার পিছনে উদ্দেশ্য থাকে। তাঁর দৃঢ়তার প্রশংসা আমাকে করতেই হবে' —লারউড স্বীকার করেছেন।

লারউড-কথিত প্রশংসনীয় দৃঢ়তা যখন ব্যাট হাতে করে জার্ডিন দেখাচ্ছেন, সেই সময়ে অতি বড় চাঞ্চল্যকর একটি ঘটনার আয়োজন হচ্ছে নিকটেই, যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী ক্রিকেট-ইতিহাসে, যাতে জড়িয়ে পড়বে দু'দেশের খেলার দুটি দল নয় শুধু—মূল দুটো দেশই।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কণ্ট্রোল-বোর্ডের অধিবেশন বসেছে বডিলাইনের পাপ বিষয়ে আলোচনার জন্য। আলোচনার শেষে দু'দলের মধ্যে 'একটি দল-যে ক্রিকেট খেলছে না', সেই কথা এবার অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সরকারীভাবে বিজ্ঞাপিত হল।

এক ঐতিহাসিক তার-বার্তা! সে তার 'সেতার' বলে ঠেকল অস্ট্রেলিয়ান সমর্থকদের কাছে, ইংলণ্ড পক্ষে বে-তার, ছেঁড়া তার।

সভাশেষে ক্রিকেট কণ্ট্রোল-বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ বিল জিনস্ সাংবাদিকদের হাতে তুলে দিলেন এম-সি-সি-র কাছে পাঠানো তারবার্তার কপি।—'ছাপাতে পারেন আপনারা।'

চোখ বিস্ফারিত করে সাংবাদিকরা তারবার্তার কপি পাঠ করলেন। অস্ট্রেলিয়ার মনোভাব ঠিক-ঠিক প্রকাশিত হয়েছে তাতে। তবু যতটা মনের তীব্রতা, লেখার তীব্রতা তার থেকে একটু কমই থাকে, বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে। এখানে তার ব্যতিক্রম। জার্ডিনের সবচেয়ে শত্রু-সমালোচক জনৈক অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন—'শেষ বাক্যটা কি তুলে দিলে হয় না? ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্কের বিষয়ে লেখা ঐ অংশটিতে কি একটু অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ নেই—'

'তার পাঠানো হয়ে গেছে'—মিঃ জিনস্ জানালেন।

তারের বক্তব্য ছিল এই :

'বডিলাইন-বোলিং এমন আকার ধারণ করেছে যা ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ স্বার্থের পক্ষে আপদস্বরূপ। শরীর রক্ষাই ব্যাটসম্যানের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' আহত হচ্ছে খেলোয়াড়। তাদের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্রতম মন-কষাকষি।

আমাদের মতে, বডিলাইন খেলোয়াড়ী নয়। এখনি বন্ধ না করলে অস্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ওলটপালট করে দিতে পারে।'

অস্ট্রেলিয়ান-বোর্ড বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য কমিটি গঠন করল। সদস্য হলেন, বিল উডফুল, ভিক্টর রিচার্ডসন, রজার হার্টিগান, এবং এম এ নোবল।

বিবাদ মেটাবার জন্য, বা বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করা হল।

ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্য। অ্যাঁ—ক্রিকেট এতদূর এগোতে পারে? তা দেশে-দেশে প্রীতিনাশের মতো শক্তিশালী ব্যাপার? ক্রিকেট বিভিন্ন দেশের মধ্যে হৃদয়-বিনিময় ঘটায়, একথা যখন প্রীতিভোজ-সভায় বক্তারা বলতেন, সেটা কী অসার কথা তাহলে!

ক্রিকেট এমন জায়গায় গিয়েছে যেখানে 'বিদ্যুৎগতি', 'বিধ্বংসী' লারউডের বিরুদ্ধে খেলতে হলে বেসবলারের মতো মুখোস আর বর্ম না পরে উপায় নেই —তবু অনেক বিবেচক অস্ট্রেলিয়ানের কাছে লারউডের দোষ কম মনে হল তাঁর অধিনায়কের তুলনায়। উডফুলের পূর্বেকার অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক জ্যাক রাই-ডার বডিলাইন সম্বন্ধে আতঙ্ক জানাবার পরে বললেন—'অনেক দিক থেকে আমি লারউডকে সম্মান দিই। যাঁদের বিরুদ্ধে আমি খেলেছি তাঁদের মধ্যে দ্রুততম ও শ্রেষ্ঠতম বোলারদের তিনি একজন। যে-পদ্ধতি তিনি নিয়েছেন তার দ্বারা খ্যাতিমান হওয়ার চেয়ে তিনি বড় খেলোয়াড়। পরিস্থিতির দায়িত্ব অধিনায়কের।...লেগ-থিয়োরিকে থামাবার মতো কোন আইন নেই; আর জার্ডিন আইনের সব সুযোগই নিতে চান।'

অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ক্রিকেট-লেখক জনি ময়েসও উডফুল ও ওল্ডফিল্ডের আঘাতের ব্যাপারে লারউডকে অব্যাহতি দিলেন, কেন না তাঁরা যে-দুই বলে আঘাত পেয়েছিলেন সেগুলি স্টাম্পের উপর বাম্পার, 'বডিলাইনে' বাম্পার নয়, কিন্তু পরবর্তী কাজের দায়িত্ব থেকে জার্ডিন বা লারউডকে অব্যাহতি দেননি, যখন তাঁরা উডফুলের আঘাতের পরেই বডিলাইন-ফিল্ডিং সাজিয়ে-ছিলেন।—'এ যেন কোনো মানুষ পড়ে যাবার পরে তার পাঁজরায় লাথি মারা।'

ইংলণ্ড কিন্তু উল্লসিত। তৃতীয় টেস্টে ইংলণ্ড জিতেছে, সুসংবাদ, সুসংবাদ। অস্ট্রেলিয়ানরা ঐ রকমই—গাঁওয়ার—হেরে গেলে চেঁচায়। নেভিল কার্ডাস পর্যন্ত (যিনি লেগ-থিয়োরী পছন্দ করেন না: 'আধুনিক লেগ-থিয়োরী মোটেই ভালবাসি না।') লারউডের উদ্দেশ্যে আশীর্বচন করলেন—'অতি চমৎ-কার উইকেটে ব্যাটসম্যানকে চকিত ও সংক্ষিপ্ত জীবনে খণ্ডিত করার ব্যাপারে লারউডের সামর্থ্যের প্রশংসা না করে আমি পারি না।'

যদি সুবিজ্ঞ কার্ডাস প্রশংসাপর হন, তাহলে অন্য ইংরাজদের মধ্যে উল্লাস এবং অশুভ উল্লাস যে জাগবে, তাতে সন্দেহ কি? স্টার পত্রিকা লিখল—'ইংলণ্ডের কাজ জেতা, আইন বজায় রেখে। সে তাই করতে যাচ্ছে।' ডেইলী টেলিগ্রাফ মিষ্ট করে বলল—'অস্ট্রেলিয়ার বুড়ো টেস্ট-খেলোয়াড়রা কাগজে-পত্রে যে হৈ-চৈ বাধিয়েছে, খেলার আসল বর্ণনার সঙ্গে তো তা মেলে না! দেখা যাচ্ছে, মারাত্মক বোলিং নয়, খেলোয়াড়ের নৈপুণ্যের অভাবই আঘাতের কারণ।'

নিউজ ক্রনিকল আরও খোলামুখ—'সব বিতর্কই গোলমেলে। লেগ-থিয়োরি ক্রিকেট নয় কেন? যদি অন্যায় করেই প্রয়োগ করা হয়, আম্পায়ার আপত্তি করেননি কেন? সব ফাস্ট-বোলিংই বিপজ্জনক...'

আম্পায়াররা সত্যই আপত্তি করেননি, কারণ তাঁরা আইনের দাস-রাজা। তাঁরা শুধু ভয় পেয়েছিলেন। অন্যতম আম্পায়ার জর্জ হেল পরে বলেন—উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়—হ্যাঁ, আমি রীতিমত ভয় পেতুম—

'খুনী লারউড' একটি ক্ষুদ্র নাটকীয় সংলাপের বিষয়বস্তু হয়ে কিছু বেদনা পেয়েছিলেন। একটি ভোজসভায় তাঁকে দেখিয়ে একটি বাচ্চা মেয়ে অবাক গলায় তার মাকে বলেছিল, 'ও মা-মণি! ও তো লোক, খুনী কোথায়?'

অপর দিকে তিনি সুগভীর আনন্দ পেয়েছিলেন মৃত্যুপথযাত্রী আর্চি জ্যাকসনের টেলিগ্রামে: 'অভিনন্দন! অপূর্ব বোলিং! আগামী সকল খেলার জন্য শুভেচ্ছা।' অধিকন্তু পনেরো দিন আগে জ্যাকসনের একটি রচনা সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল; তাতে লেখা হয়—

"যদি লেগ-থিয়োরি বোলিংকে বরবাদ করবার জন্য আইন করা হয়, ক্রিকেট পঙ্গু হয়ে যাবে, হয়ে দাঁড়াবে এক-পদ মনুষ্যের মতো, যা কিছুটা তৃপ্তি দিলেও চরম ক্রিয়াশীলতা সৃষ্টি করতে পারবে না।

"লারউড চমৎকার মানুষ, পছন্দের যোগ্য, নিরীহ—একটা মাছিকেও তিনি মারবেন না। তাঁর সাফল্যের মূলে ভয় দেখানোর কৌশল নেই, আছে নিছক নৈপুণ্য, সেই সঙ্গে দৃঢ়তা ও শক্তি।"*

লারউডের মনে পড়ল—এই জ্যাকসনকে তিনি ১৯৩০-এ ওভালে মারের পর মার দিয়েছিলেন, বীরবালক তা সয়েছিল পরাক্রমের সঙ্গে, যেখানে ব্রাডম্যান সরে যাচ্ছিলেন (!)।

আনন্দের চেয়ে বেশি প্রয়োজন আশ্বাস, চলতি জীবনের পক্ষে। আশ্বাস চাই অন্নের ও অন্নদাতাদের। লারউডের ক্লাবের বড়কর্তা স্যার জুলিয়েন কাহ্‌ন বললেন—'লারউডের বিরুদ্ধে আমি কোন কথা শুনতে চাই না, কারণ সে আমার দলের লোক।'

* * * দেশে-দেশে 'তার'-স্বরে ঘৃণা বিনিময় * * *

কালো মেঘ উগ্‌রে-উগ্‌রে পাক খেয়ে-খেয়ে উঠে গোটা আকাশকে ঢেকে ফেলল ব্রিসবনে চতুর্থ টেস্টের আগে। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্টম্যাচ কি সত্যই আর কখনো অনুষ্ঠিত হবে? এম-সি-সি-র উত্তর এসেছে। লর্ডসের মহাশাসকেরা লিখে পাঠিয়েছেন:

"মেরিলীবোন-ক্লাব আপনাদের তারবার্তায় দুঃখিত। অখেলোয়াড়োচিত খেলা

---

*মৃত্যুপথযাত্রী জ্যাকসনের এই অভিনন্দনের মহিমা স্বীকার করেও বডিলাইন-বিরোধীরা বলবেন, জ্যাকসন যদি ক্ষয়রোগে মারা না গিয়ে বডিলাইন-রোগে মারা যেতেন, তাহলে তাঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী অধিক মর্মগ্রাহী হত।

হয়েছে, একথা আমরা অনুমোদন করি না। দল, দলাধিনায়ক এবং দলের ম্যানেজারদের উপর আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা আছে, এবং আমাদের স্থির প্রত্যয় যে, তাঁরা এমন কিছু করবেন না, যার দ্বারা ক্রিকেটের আইন অথবা ক্রিকেটের মর্যাদা লঙ্ঘিত হতে পারে।

'আমাদের আস্থা অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হয়েছে, এমন কোনো তথ্য আমরা পাইনি। উডফুল এবং ওল্ডফিল্ডের দুর্ঘটনায় যেমন আমরা দুঃখ বোধ করি, তেমনি মনে করি, উভয় ক্ষেত্রেই বোলারের দোষ ছিল না। যদি অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড অব কণ্ট্রোল কোনো নূতন আইন বা নূতন আইনের কোনো ধারা প্রস্তাব করেন, যথাসময়ে তা মনোযোগ ও বিবেচনা লাভ করবে। আশা করি, আপনাদের তারবার্তার দ্বারা অবস্থার যে-আকার সূচিত হয়েছে, অবস্থা সত্যই সেইরূপ সঙ্কটময় নয়। কিন্তু যদি সত্যই এমন কিছু হয়, যার দ্বারা ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার উত্তম সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এবং আপনারা যদি মনে করেন সফরের অবশিষ্ট ভাগ বাতিল করাই শ্রেয়, তাহলে আমরা সম্মত, যদিও গভীর অনিচ্ছার সঙ্গে।'

এবার আর উডফুল-ব্রাডম্যান বনাম জার্ডিন-লারউড নয়, এবার অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড অব কণ্ট্রোল বনাম মেরিলীবোন ক্রিকেট-ক্লাব। কিন্তু মেরিলীবোন ক্রিকেট-ক্লাব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ বিধানসভা ও মহাকরণ, তার হেডকোয়ার্টার লর্ডস হল গিয়ে ক্রিকেটের গর্ভমন্দির—তার মর্যাদার সঙ্গে লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডের পেরে ওঠা মুশকিল। বিশেষত রাগের মাথায় অস্ট্রেলিয়ান কর্তারা একটা অতীব হঠকারী মন্তব্য করেছিলেন, 'খেলোয়াড়িতা' তুলে গাল দিয়েছিলেন যাঁরা ঐ কথাটার স্রষ্টা, তাঁদের। যাঁরা এতদিন ধরে বচনে ও লিখনে 'ক্রিকেট' শব্দটির উপরে মন্ত্র-মহিমা আরোপ করেছেন, তাঁরা 'মন্ত্রহারা'—এমন অপবাদ শোনেন কি করে?

অতএব অস্ট্রেলিয়াকে ঢোক গিলতে হল। তাছাড়া, লারউড অন্তর-টিপ্পনী দিয়ে বলেছেন, বডিলাইনের দৌলতে মাঠভরা দর্শক, আর বাক্সভরা টাকা বোর্ডের, সেখানে টেস্ট বন্ধ করা চলে না। অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড দ্বিতীয় তার পাঠাল নম্র গর্জনে:

"আসল খেলা স্বচক্ষে না দেখে তার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে আপনাদের অসুবিধার কথা আমরা বুঝি। আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত, এই সিরিজের কয়েকটি খেলায় প্রযুক্ত বডিলাইন ক্রিকেটের ভাবাদর্শের বিরোধী এবং তা খেলোয়াড়ের পক্ষে অনাবশ্যকভাবে বিপজ্জনক। খেলার আদর্শ বজায় রাখার বিষয়ে আমরা গভীর চিন্তান্বিত এবং সেইজন্য আমরা একটি কমিটি নিয়োগ করেছি, যাঁর সদস্যেরা ১৯৩৩-৩৪ মরশুম থেকে অস্ট্রেলিয়ায় এই জাতীয় বোলিং বন্ধ করার ব্যাপারে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা যায় সে-বিষয়ে উপায় নির্দেশ করবেন। এই কমিটির সুপারিশগুলি আপনাদের বিবেচনার জন্য আমরা প্রেরণ করব, এবং সকল শ্রেণীর ক্রিকেটে যাতে সেগুলি প্রযুক্ত হয়, সে বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা আশা করব। সফরের বাকী অংশ বাতিল করা আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি না।"

এবার নাড়া খেল জার্ডিনের মর্যাদাবোধ। অসভ্য, অশিক্ষিত দর্শকদের গালি-

গালাজ তিনি উপেক্ষা করেছেন ঘৃণাভরে। খেলার মধ্যে জলপানের সময়ে তিনি ব্রাডম্যানকে যখন গ্লাস এগিয়ে দিয়েছেন, তখন দর্শক চেঁচিয়ে বলেছে—'ডন, সাবধান, ও বেটাকে দিয়ে আগে জলটা খাইয়ে দেখে নাও, বিষ-টিষ মিশিয়ে দিয়েছে কি না!' এ-ও শুনেছেন, কিন্তু কান দেননি। কিন্তু যাঁদের আমন্ত্রণে তাঁর দল খেলতে এসেছে, তাঁরাই, ক্রিকেট-বোর্ডই, চরম গাল দেবে 'অখেলোয়াড়ী' বলে! নানা শিক্ষিত মহল থেকেও আগেই নিন্দাবাদ এসেছে—এমনকি সেগুলিকেও জার্ডিন অগ্রাহ্য করেছেন। যেমন ভিক্টোরিয়া প্রদেশের জনৈক মেয়র তৃতীয় টেস্টের আগে সরকারী ভোজসভায় ভব্যতার ভাণ না করে সোজাসুজি আক্রমণ করে বলেছিলেন—'উডফুল লেগ-থিয়োরি নেননি, তাতে আমরা খুশি, আপনাদের তাই করা উচিত। অস্ট্রেলিয়ায় আমরা নৈপুণ্যের ভক্ত। ক্রিকেট ভদ্রলোকের খেলা। বর্বর বলের কাছে নৈপুণ্য মার খাক, এ আমরা চাই না।' এই চপেটাঘাতের উত্তর জার্ডিন সংযতভাবেই দিয়েছিলেন। লারউডের বোলিং-যে উইকেটের উপরেই ছিল তা প্রমাণ করতে লারউড কতজনকে বোল্ড করেছেন, তার উল্লেখ করেছিলেন।

জার্ডিন মুখে সংযত এবং বলে ভীষণ হওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়ার অনেক শিক্ষিতজনকে ভীষণমুখ হতে হয়েছিল। যেমন অস্ট্রেলিয়ার জনৈক বিচারপতি লিখেছিলেন—'লেগ থিয়োরি ক্রিমিন্যাল আইনের আওতায় পড়ে। অসংযত ও বেপরোয়াভাবে আঘাত করা আইনের চোখে অপরাধের পর্যায়ভুক্ত, বিশেষত যেখানে বিদ্বেষের কোন হেতু নেই।*

বিচারপতির এই উক্তিতে তুমুল চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক খেলার মাঝখানে কি পুলিসী হস্তক্ষেপ ঘটবে—ঘটতেই পারে, যদি এই অবস্থা চলতে দেওয়া হয়—অনেকেই কিছু কৌতুকে, ততোধিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে ভেবেছিল।

* Truth নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা লেখে: "লারউড তাঁর বর্তমান বোলিং-পদ্ধতির দ্বারা কি নির্বোধের মতো নিজেকে আইনের অসন্তোষের লক্ষ্য করে তুলছেন? তাঁকে থামাতে পুলিসী হস্তক্ষেপ কি যুক্তিসংগত হয়ে দাঁড়াবে? ধরা যাক, তাঁর দ্রুত বলের আঘাতের ফলে কেউ মারা গেল, সে ক্ষেত্রে কি কোনো করোনার তাঁকে নরহত্যার দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবেন?"

"এই সকল অতীব আকর্ষণীয় সম্ভাবনাগুলির বিষয়ে Truth-এর প্রতিনিধির সঙ্গে জনৈক খ্যাতনামা আইনজ্ঞের আলোচনা হয়ে গিয়েছে। উক্ত আইন-বিশেষজ্ঞ লেগ থিয়োরিগত ফাস্টবোলিং-এর আঘাত থেকে মৃত্যু ঘটলে আইনের কোন্ এক্তিয়ারের মধ্যে তা পড়ে, সে-বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট।

"এই বিশেষজ্ঞ বলেন, 'ব্রিটিশ আদালতের দ্বারা ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে যে, ফুটবল ক্রিকেটের মতো প্রীতিখেলায় যদি কোনো খেলোয়াড় বেআইনি কাজের দ্বারা অন্য খেলোয়াড়ের মৃত্যু ঘটায়, তাহলে সে নরহত্যায় দোষী। খেলার নিয়মের মধ্যে থেকে ঐ কাজ করলেও তবু তা বেআইনী হবে, যদি মারাত্মক আঘাতের উদ্দেশ্যে তা করা হয়।

"নিউ সাউথ ওয়েলসের বিচারপতি শেরিডন ইতিমধ্যেই আইনের মারাত্মক দিকটি দেখিয়ে দিয়েছেন, এবং সে বিষয়টি স্বীকৃত হলেই মঙ্গল।"

মেলবোর্নের 'ট্রুথ' পত্রিকায় এক তীব্র ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ রচনায় যুদ্ধের পরিভাষায় ক্রিকেটের বর্ণনা করা হয়েছিল, যার সূচনায় লেখা হয়—'ইংলণ্ড চায় তার লোকেরা বলে আউট করুক, না পারলে সবলে একেবারে আউট করে দিক।' ঐ লেখায় ক্রিকেটের মহামৃত্যুর কথা ছিল, যার কবরে ইংলণ্ড কয়েকটি লম্বা পেরেক পুঁতেছে। এবং 'ভণ্ড বচনবীর' জার্ডিনকে কলমের খোঁচায় কলঙ্কিত করা হয়েছিল সর্বাঙ্গে। আমরা সামান্য কিছু উদ্ধৃত করছি রচনাটি থেকে—

"অস্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের চতুর্থ টেস্ট বিরাট যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। অস্ট্রেলিয়া মাত্র ছ'জনের মৃত্যুর বিনিময়ে জয়লাভ করে, যার মধ্যে তিনজন যুদ্ধক্ষেত্রেই সরাসরি নিহত হয়। সংঘর্ষে ইংলণ্ডের আটজন নিহত এবং তিনজন নিখোঁজ। অস্ট্রেলিয়ার কাঁদানে গ্যাস, বিষ-গোলা প্রভৃতির আক্রমণব্যূহ এড়িয়ে কিভাবে ঐ তিনজন নিখোঁজ হয়, নির্ণয় করা যায়নি। ক্রিকেট বোর্ড অব কণ্ট্রোল ডিফেন্স-ডিপার্টমেণ্টের সহযোগিতায় এ ব্যাপারে তদন্ত করছে।

"তদন্তের ফল কি দাঁড়াবে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে স্যার জর্জ পীয়ার্স তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেন, 'কিছুই না', কারণ তাঁর মতে, অতিবড় বন্ধুত্বের মনোভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হয়।...

"উডফুল ও ফিঙ্গলটন আর্মার্ড-কারের অন্তর্গত হয়ে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে আরম্ভ করলেন। প্রধান দর্শক-মঞ্চের পিছনে এক সুবিধাজনক সামরিক অবস্থানে থেকে লারউড আঠারো পাউণ্ডের কামানে গোলা বর্ষণ করে চললেন। দুটি ফাউণ্টেন পেন ও কয়েক ডজন টেলিগ্রাম ফর্ম-এর দ্বারা সুসজ্জিত জার্ডিন হ্রাস-মূল্যে শোক-সংবাদ প্রেরণের জন্য তৈরি ছিলেন...যেমন, 'উডফুল একটি হাত হারিয়ে বেঁচে গিয়েছেন; একটি চোখের দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে; এই ঘটনার জন্য আমি ও লারউড দুঃখিত।'

"জার্ডিনের বার্তাদূতরূপে কার্যরত প্লাম ওয়ার্নার জানতে চান, স্কিপার ও লারউডের এই দুঃখ কি উডফুলকে আরও মারাত্মকভাবে আহত করতে না-পারার জন্য? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে জার্ডিন অস্বীকার করেন, কারণ চুক্তি-অনুযায়ী এ-বিষয়ে কোন মন্তব্য করা নিষিদ্ধ।

"এই সকল ঘটনা যখন ঘটছিল তখন ব্রাডম্যান এসেছেন প্রথম ট্যাঙ্কের পতনের পরে। রণক্ষেত্র দর্শনের পরে তিনি চলে যান। তারপর প্রজাপতিতে চড়ে নীচু দিয়ে লারউডকে এড়িয়ে উড়তে থাকেন। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা থাকার পরে তাঁর বিপর্যয় ঘটে যখন ফিঙ্গলটনের আর্মার্ড-কারের খুব কাছ দিয়ে উড়ছিলেন। স্থির করা হয়েছে যে, শিলিং-চাঁদার দ্বারা একটি অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপন করা হবে ডনকে রবারের চাকার গাড়ি কিনে দেবার জন্য।

"জার্ডিন মিসেস ব্রাডম্যানের কাছে লেখা শোকজ্ঞাপক চিঠিতে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর কিছু করার আছে কিনা? মিসেস ব্রাডম্যান উত্তরে বলেন, 'নিশ্চয়, এক শিলিং চাঁদা পাঠাবেন।'

"খেলা আধঘণ্টা স্থগিত থাকে যখন ইংরাজ ম্যানেজারগণ বলেন, মাঠের দর্শক-আসনে বহু মৃতদেহ জমে গেছে, সেগুলি সরিয়ে পয়সা-দেনেওয়ালা পৃষ্ঠপোষকদের জায়গা করে দেওয়া চাই। এহেন পৃষ্ঠপোষকেরা মূক এবং

বধিরদের আশ্রয়ভবন থেকে এলেই ভাল হয়, কেন না সেক্ষেত্রে জার্ডিন তাঁর কাজে বাধাপ্রাপ্ত হবেন না।

"স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে টেস্টম্যাচ গোপন যুদ্ধরূপে সংঘটিত হবে। জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে না। কেউই লারউড বা জার্ডিনকে চীৎকারে বিরক্ত করবে না। আর ইংরেজদল অস্ট্রেলিয়ায় নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করবে। এইভাবে পশুবৎ জনসাধারণকে সরিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে টেস্টখেলা চলবে, যে-নীরবতা কেবল বিঘ্নিত হবে হাড় ভাঙার শব্দে।"

অস্ট্রেলিয়ার কাগজ যদি তামাশা করতে পারে, ইংলণ্ডই বা ছেড়ে দেবে কেন, বিশেষত এক্ষেত্রে সে যখন গরবিনী ধনী। ইংলণ্ডের প্রত্যুত্তরের কিছু নমুনা :

"অভিযোগপত্রে ভবঘুরে খেলোয়াড়রূপে কথিত হ্যারল্ড লারবোর্ড নটিংহ্যামবাসী, বয়স ২৮, অস্ট্রেলিয়ান কমনওয়েলথের কিছু নাগরিককে বেপরোয়া ও অসংযতভাবে আঘাতের অভিযোগে এডিলেড কোয়ার্টার সেসন্স্ কোর্টে অভিযুক্ত। লেগ-ট্র্যাপ নামক একটি চর্ম-জাতীয় অস্ত্রের দ্বারা অস্ট্রেলিয়ান একাদশকে বিপাকে ফেলাই আসামীর উদ্দেশ্য।

"গোয়েন্দা কউনস্টক জানান যে, যখন লারবোর্ডকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তার অধিকারে কঠিন গোলাকার পদার্থের দ্বারা নির্মিত একটি মারাত্মক যন্ত্র ছিল, যা সন্দেহজনকভাবে হাতবোমার সমরূপ। আসামী এই অস্ত্রটি ব্রাডম্যানের শরীরের দিকে নিক্ষেপকালে ধরা পড়ে।

"বিচারপতি শেরীডাউন, কোর্টে বিশেষ হাস্যোদ্রেক করেন যখন প্রশ্ন করেন—'এই ব্রাডম্যান ব্যক্তি কে?'

"পরবর্তী সাক্ষী বেতার-ঘোষকরূপে বর্ণিত মিঃ অ্যালান কোপেক্স লেগ-ট্র্যাপ কী, ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, অস্ট্রেলিয়ানদের বিনা রানে আউট করবার জন্য এ একটি পদ্ধতি, যাতে প্যাভিলিয়নের দিকে বল না করে উইকেটের দিকে বল করা হয়। বিচারপতি শেরীডাউন সমস্ত ব্যাপারটি সংক্ষেপে উপস্থিত করতে গিয়ে বলেন—লেগ-থিয়োরি মারাত্মক অপরাধ, তদনুযায়ী তিনি লারবোর্ডকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি ঘোষণা করেন—অস্ট্রেলিয়ায় থাকাকালে তাকে টেনিস বলে আণ্ডারহ্যাণ্ড বোলিং করে যেতে হবে।"

এই সকল প্রতি-বিদ্রূপে জার্ডিন সান্ত্বনা পাবার পাত্র নন। অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড তাঁর খেলোয়াড়-মর্যাদায় আঘাত করেছেন, তার প্রতিবিধান চাই, বিশেষতঃ উডফুলের অভিযোগ যখন প্রত্যাহৃত না-হয়ে সামনে ঝুলছে। উডফুল গোটা এম-সি-সি দলকে খেলোয়াড়ী মনোভাবহীন বলে অভিযোগ করেছিলেন পেলহ্যাম ওয়ার্নারের কাছে, ওয়ার্নার মুখরক্ষার জন্য যদিও বলেছিলেন, উডফুল তার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু উডফুল সত্যই তা করেননি। যে-দলের বিরুদ্ধে খেলতে হচ্ছে, সেই দলের অধিনায়ক সভ্য খেলোয়াড়ের মর্যাদা দিতে চান না, এবং ঐ অধিনায়ককে নিয়োগ করেছে যে-বোর্ড, সে বোর্ড অধিনায়কের বক্তব্যকেই সমর্থন করে—সেখানে সত্যই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো মানুষের পক্ষে সহ্য করা শক্ত। জার্ডিন এটিকেটে পোক্ত মানুষ।

তাছাড়া জার্ডিন আরও অন্তর্বাতনায় ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদপত্রে কথাও করে বেরিয়েছিল বডিলাইনের ব্যাপারে এম-সি-সি খেলোয়াড়দের মধ্যে

মতভেদের সংবাদ। বডিলাইন বল করতে অ্যালেনের অস্বীকারের প্রকাশিত সংবাদের কথা পাঠকদের স্মরণে আছে। দলের মধ্যে অ্যালেন ছাড়া সহাধিনায়ক বব ওয়াট বডিলাইন অপছন্দ করতেন। মরিস টেট পরিষ্কার বডিলাইন-বিরোধী। টেট বডিলাইন-নৃশংসতা পছন্দ করতেন না, তদুপরি জার্ডিনের নতুন কৌশলের বলি হয়ে তাঁকে টেস্টদলের বাইরে চলে যেতে হল। এই অতি-শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় তাঁর শক্তি বজায় থাকা সত্ত্বেও যখন প্রবঞ্চিত হলেন ন্যায্য স্থানলাভে, তখন তাঁর ক্ষোভের সীমা ছিল না।* পাতৌদি প্রভৃতি এই ধরনের স্থানবঞ্চিত খেলোয়াড়েরা ইতস্তত বিরাগ প্রকাশ করছিলেন। ব্যাপারটা চরমে উঠল একটি মিথ্যে খবর বিস্তৃত আকারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায়।

খবর রটল, কয়েকজন এম-সি-সি খেলোয়াড় 'দৃশ্য দর্শন' করে একটু রাত করে হোটেলে ফেরার পরে বিয়ারের বোতলসহ সহর্ষ সোচ্চারে কিছু কথা-বার্তা বলছিলেন, তখন জার্ডিন নিজের ঘর থেকে নেমে এসে সবচেয়ে জোর-গলা ব্যক্তিকে গলা সামলাতে বলেন। তাতে খেলোয়াড়টি বলেন, আমরা বিয়ার খাচ্ছি নিজের পয়সায়, তাতে কার কি বলবার থাকতে পারে? তথাপি জার্ডিনের কিছু বলার ছিল, যদিও খেলোয়াড়টির কিছু শোনার ছিল না, সুতরাং ক্যাপ্টেনের মুখবন্ধ করতে মুখের উপরে বিয়ার নিক্ষেপ।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই ঘটনার কোনোই ভিত্তি ছিল না। মেইলী তামাশা করেছেন—সেই বীভৎস গরমের রাত্রে বীয়ার ফেলে নষ্ট করার মতো মূর্খ কেউ আছে, একি বিশ্বাসযোগ্য? কিন্তু টেটের সঙ্গে মন-কষাকষির কাহিনী মিথ্যে নয়। তাছাড়া দলে স্থান না-পাওয়া খেলোয়াড়েরা অস্ট্রেলিয়ার ড্রেসিংরুমে গিয়ে নানা কথা বলে আসতেন, ফলে কাগজে গুজব ছড়াত, এবং জার্ডিনের বিরক্তি ও অস্বস্তির সীমা থাকত না। তাই এডিলেড-টেস্টের পরে একদিন তিনি দলীয় সভায় আস্থাজ্ঞাপক ঘোষণা দাবি করলেন। অধিনায়ক পদ থেকে সরে যেতে প্রস্তুত আছেন, তাও জানালেন। ভোটগ্রহণ যাতে স্বাধীনভাবে, বিনা চক্ষুলজ্জায় ঘটতে পারে, তার জন্য সভা ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তাব করলেন।

জার্ডিনকে সভা ছেড়ে যেতে হয়নি। তাঁর অধিনায়কত্বে সকলে একবাক্যে আস্থা জানিয়েছিলেন, কারণ:

"জার্ডিনের পক্ষে ভোট মানে ইংলণ্ডের পক্ষে ভোট। কয়েকজন খেলোয়াড়ের কাছে জার্ডিন প্রিয় না হতে পারেন, কিন্তু সকলেই তাঁকে সম্মান ও প্রশংসা করতেন। আবার আমরা অনেকে তাঁকে ভালবাসতাম। যখন অ্যাশেজ পুনরু-দ্ধারের প্রশ্ন এল, দলের প্রতিটি সদস্য জানতেন যে, বিজয়লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার তিনিই একমাত্র মানুষ।"

"আমাদের সকলের মধ্যে একটি সাধারণ জিনিস ছিল। আমরা অ্যাশেজ-জয়

* ঠিক একই জিনিস ঘটেছিল অনেক বছর পরে, যখন জার্ডিনের ভাবশিষ্য লেন হাটন অধিনায়ক হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় দল নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন মরিস টেটের সম-পর্যায়ের বোলার অ্যালেক বেডসার বাতিল হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ হাটন বলের ঝড়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ানদের—আর...যত প্রতিভাবানই হোন, বেডসার মাত্র মিডিয়াম-ফাস্ট!!

চাইতাম। সেই জিনিসটিই আমাদের ঐক্যবন্ধ রেখেছিল—চাপা দিয়ে রেখেছিল বিসংবাদের বিষয়গুলিকে।"

আমি 'অ্যাশেজ উন্ধারের একমাত্র লোক'—এই বন্দুকের মুখে জার্ডিন দলের আনুগত্য অধিকার করে তার মুখ ফিরিয়ে দিলেন এম-সি-সি-কর্তৃপক্ষের দিকে। দাবি করে পাঠালেন, অস্ট্রেলিয়ান তারবার্তায় তাঁর বা তাঁর দলের খেলোয়াড়ী মনোভাবের বিরুদ্ধে যেখানে সমালোচনা আছে, সেটি চাপ দিয়ে প্রত্যাহার করিয়ে নিতে হবে।

জার্ডিনের উত্তেজিত মানসিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন লারউড :

" 'টেস্টের আদেশনামা এবার কি, স্কিপার ?'

"আমরা কুইনসল্যান্ডের টুউম্বায় ছিলাম। ব্রিসবেনে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচের কয়েকদিন আগে; জার্ডিনের সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, যাতে ধমক খাওয়ার ভয় না রেখে দলগঠন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারতাম।

" 'আর কোন টেস্ট হবে না, যে-পর্যন্ত না আমি আমার তারের উপযুক্ত জবাব পাই।'

" 'সে কী—কি ব্যাপার স্কিপার ? তার কিসের ?'

"জার্ডিন আমাকে বললেন—এম-সি-সি'র কাছে খবর পাঠিয়েছেন, তিনি আর ইংলন্ডের দল-পরিচালনা করবেন না, যে-পর্যন্ত না 'অখেলোয়াড়ী খেলা' সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডের অভিযোগ প্রত্যাহৃত হচ্ছে। এম-সি-সি যাতে প্রভাব প্রয়োগ করে এই কাজ করিয়ে নেন, সে বিষয়ে এম-সি-সি'র কাছে দাবি জানিয়েছেন...

"ত্বরিতে খবর ছড়িয়ে পড়ল : 'অখেলোয়াড়ী' শব্দটি ফিরিয়ে না নিলে জার্ডিন আর অধিনায়কত্ব করছেন না। আমাদের দল তাঁকে সর্বসম্মত সমর্থন জানালো। কেউ এ-ব্যাপারে মতভেদ দেখিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। সারা-রাত্রি জেগে জার্ডিন কিভাবে এম-সি-সি'র উত্তরের প্রতীক্ষা করছিলেন তা মনে পড়ে। অত্যন্ত রুষ্ট-তিক্ত মানসিক অবস্থা তাঁর। রাত দুটো নাগাদ তিনি একটা উত্তর পান। ঐ উত্তরে কি আছে আমাকে বলেন নি, তবে ইঙ্গিত করেছিলেন, উত্তর পক্ষে গেছে।"

জার্ডিনের হুমকিতে এম-সি-সি'র জরুরী সভা বসল, তারপর জরুরী তারও বেজে উঠল অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডের কানে :

"মেরিলীবোন ক্রিকেট-ক্লাব-কমিটি সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, আপনারা সফরের বাকি অংশ বাতিল করা প্রয়োজনীয় মনে করেন না, এবং সমস্ত ব্যাপারটি সফর সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখতে রাজি। এর দ্বারা কি আমরা এই বুঝব যে, আমাদের দলের উত্তম খেলোয়াড়ী মনোভাব আপনাদের কাছে আর প্রশ্নাধীন নয়? কোন টেস্টম্যাচই অভিপ্রেত পরি-স্থিতির মধ্যে খেলা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না দুটি দলই তাদের খেলোয়াড়ী মনোভাব অপরের কটাক্ষের বস্তু নয়, এ-বিষয়ে নিঃসংশয় হয়—আপনারা এ কথা অনুভব করেন বলেই আমাদের স্থির ধারণা।"

এই বার্তা আসার পরে কয়েকদিনের মহা চাঞ্চল্য এবং প্রায় যুদ্ধকালীন তৎ-পরতা। বোর্ডের টেলিফোন-যোগাযোগ এম-সি-সি-র ম্যানেজারের সঙ্গে, ম্যানে-

জারদের ছুটে যাওয়া বোর্ডের কাছে, জনৈক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারীর আবির্ভাব, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিমধ্যে এম-সি-সি'র দ্বিতীয় তার-বার্তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে গেল। কিন্তু প্রশ্ন জেগে রইল, এম-সি-সি-র নষ্ট ধর্ম কি সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে? সংবাদপত্রের নানা বিরোধী তথ্যে ও নানা গুজবের কথায় কোনো মীমাংসার আকার দেখা গেল না। এমনি এক অনির্ণীত অবস্থার রূপ ফুটে উঠল কুইনস্‌ল্যান্ড ক্রিকেট আসোসিয়েশন-প্রদত্ত অভ্যর্থনা-সভায় পেলহ্যাম ওয়ার্নারের ভাষণে। ওয়ার্নার প্রায়-শান্তি-সেনার প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করলেন: 'শান্তির প্রার্থনা করি আমি, যেমন শান্তি চায় ব্যাকুলভাবে রাজনীতিক যখন তাঁর দেশ থাকে যুদ্ধের বিপদের মধ্যে।' একই উদার বৈরাগ্যের সুরে বললেন: 'আমি ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের পুজা করি। তাই আশা ও প্রার্থনা করি, আকাশ পরিষ্কার হোক, আবার তারা ফুটে উঠুক ক্রিকেট-গগনে।' নাটকীয় আবেগে এক সঙ্গে যোগ করলেন: 'যদি তোমরা হাত বাড়াও—সে হাত ধরব পরমাগ্রহে—'

ঐ সভায় জার্ডিন বললেন—'কিছু না বলাই শ্রেয় বর্তমান ঝঞ্ঝাটের পরি-স্থিতিতে।' তিনি যোগ করলেন—'বিশ্বাস করুন, কখনো-কখনো নীরব থাকা সবচেয়ে কঠিন কাজ।' অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড কতখানি হাত বাড়িয়েছিলেন, কয়েক-দিন পরেই বোঝা গেল—দেখা গেল তাঁদের প্রসারিত হস্তে আনুগত্যের সন্ধিপত্র লেখা। বোর্ডের তরফ থেকে এম-সি-সি-কে জানানো হল:

"আপনাদের খেলোয়াড়ী মনোভাব প্রশ্নের অধীন এমন আমরা মনে করি না। অল্প পূর্বে অনুষ্ঠিত সিডনির এক সভায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে পর্যা-লোচিত হয়েছে এবং ৩০শে জানুয়ারির তারবার্তায় তার বক্তব্য সূচিত হয়েছে। সেই তারবার্তায় উল্লিখিত, এক বিশেষ ধরনের বোলিংকেই আমরা ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ স্বার্থের অনুকূল মনে করিনি, এবং আমাদের অভিমত বহু খ্যাতনামা ইংরাজ-ক্রিকেটারের দ্বারা সমর্থিত। পরবর্তী টেস্টম্যাচগুলি চিরাচরিত প্রীতিবোধের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে, আপনাদের এই বিশ্বাসে আছে আমাদের হৃদয়ের সমর্থন।'

বডিলাইন-বলের পতাকা উড়িয়ে জার্ডিন বেরিয়ে এলেন বিজয়ী বীরের মতো। তিনি পূর্বে যা করেছেন তা 'খেলোয়াড়ী', 'আইনসম্মত' এবং ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ স্বার্থে কৃত। ভবিষ্যতেও যা করবেন—তাও একই আখ্যা পাবে। তৃপ্ত মনে জার্ডিন পরবর্তী টেস্টের দিকে তাকালেন। ব্রিসবেনে এই চতুর্থ টেস্টেই অ্যাশেজের মীমাংসা হতে পারবে। ইংলণ্ড জিতলেই সমস্যার সমাধান। খুব একটা সন্ধিক্ষণকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন নিজের মূল্য যাচাই করার ব্যাপারে।

ব্রিসবেনে চতুর্থ টেস্টের প্রাক্কালে একটি কবিতা, অনুবাদে—

চুম্বি বনিতার মুখ, ইন্সোরিয়া প্রাণ,
নির্গমিল ব্যাট ধরি কম্পমান পদে
অকালে,

ব্রিসবেনে অসহ্য গুমোট। 'ভারতের চেয়েও জঘন্য।' ভোস খেলছেন না শারীরিকভাবে উপযুক্ত না থাকায়। সুতরাং লারউড ও অ্যালেনের উপর ফাস্ট-

বোলিংয়ের ভার। এবং তা প্রথম প্রভাতেই, কারণ অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নেমেছে।

আর্থার মেইলী সূচনার রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাকে বর্ণনা করেছেন:

"লারউড যখন বোলিং শুরু করেন, আবহাওয়া তড়িৎস্পৃষ্ট। প্রত্যেকে উত্তেজনার ডগার উপরে দাঁড়িয়ে, একটা কিছু নাটকীয় ঘটবে।...লারউড উইকেটের দিকে দৌড় দিতে শুরু করতেই সকলে খাড়া হয়ে বসল আসনের উপরে। উডফুল একটু ঝুঁকে পড়লেন ব্যাটের উপরে। বোলারের হাত থেকে বল পড়ে সোঁ করে একঝলকে উডফুলের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল উইকেট-কীপারের হাতে। প্রত্যেকে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। বলটি ফিরিয়ে দেওয়া হল লারউডের হাতে। আবার আমরা গতির প্রত্যেকটি অবস্থা লক্ষ্য করতে লাগলাম। আবার শ্বাস ফেললাম। এইরকম তীব্রতম মনঃসংযোগ প্রত্যেককে করতে হল যখনই লারউড বল দিতে লাগলেন।...এই দিনের ক্রিকেট সবচেয়ে তীব্রতাপূর্ণ, আমার স্মৃতিতে।...ক্রিকেটে একটা নূতন আকর্ষণের সূচনা হয়েছে দেখলাম।"

প্রথমদিনে কিন্তু লারউডের বোলিংয়ে ফললাভ হয়নি। অস্ট্রেলিয়া এইদিন ভালই রান করেছিল—৩ উইকেটে ২৫১, ব্রাডম্যান ৭১ নটআউট।

ব্রিসবেনের দমবন্ধ-করা আবহাওয়া লারউডের শক্তির অনেকটা হরণ করে অস্ট্রেলিয়ানদের ফিরিয়ে দিয়েছিল তা।

এইদিন লারউড কোনোই উইকেট পাননি। উদ্দীপ্ত হয়ে খেলেছিলেন ভিক্টর রিচার্ডসন। সকলের আনন্দ বিধান করে যখন তিনি লারউডকে হুক করলেন প্রচণ্ডভাবে, তখন গর্বিত অধিনায়ক উডফুল অপরপ্রান্ত থেকে এগিয়ে এসে বললেন—'দেখো, উইকেট যেন কোনমতে না যায়। ওর উৎসাহ আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়!'

'না না, কিছু ভাববেন না স্কিপার, আমি বাস্টার্ডটাকে দেখিয়ে দেব, সে বল করতে পারে না।'

সত্যই পারে না। রিচার্ডসন আউট হলেন হ্যামণ্ডের বল পেটাতে গিয়ে, স্টাম্পড্ হয়ে, ৮৩ রান করে।

অস্ট্রেলিয়া বৃহৎ স্কোর করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দিন-শেষে ফিরে গেছে। কিন্তু ঘরে রাত্রিবাস সেদিন অসম্ভব, এমনই অসহ্য ভ্যাপসানি। রাত্রে পথে-পথে বিয়ার-উৎসব। লারউডের পক্ষে ঘরে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সারাদিন বেদম প্রহার, আর তা সহ্য করে বোলিংয়ের পীড়ন লাঞ্ছনা। অস্ট্রেলিয়ার এত রান! অ্যাশেজ দূরবর্তী হয়ে যাবে? 'বেজন্মাটা বল করতে পারে না'—কথাটা সত্যি হবে? শুকনো গলা লারউড ভিজোতে থাকেন বিয়ারে। অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকদের সঙ্গে বিয়ারের আসরে বসে থাকেন তিনি। জার্ডিন রাত এগারোটার সময়ে সেখানে হাজির হয়ে অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন, তোমরা মদ খাইয়ে লারউডকে বেসামাল করার তালে আছ। কথাটা অবশ্য মোটেই সত্য নয়।

কিন্তু লারউডের সঙ্গে বাজি হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকের। দশ শিলিং বাজি, লারউড বললেন, 'বিস্ময় বালক'কে তিন ওভারের মধ্যে তিনি বোল্ড করে দেবেন।

'হাঃ হাঃ হাঃ, খুব বলেছ'—অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকরা হেসে ওঠেন—'ডনের আরও একটা ডবল-সেঞ্চুরি—মনে রেখো।'

ব্রিসবেনের 'মৃত উইকেট' ধড়পড় করে উঠল পরদিন সকালেই যখন ব্রাডম্যানের বেল উড়ে গেল লারউডের বলে, সেইসঙ্গে ভেঙে গেল পনস্‌ফোর্ডের উইকেট, ৮৯ রানের মধ্যে সাত জন অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান ফিরে গেলেন, এবং অস্ট্রেলিয়া শেষ করল ৩৪০ রানে। অস্ট্রেলিয়ার বিরাট রানের কল্পনা ভেঙে গেল মধ্যদিনে, মধ্যবিত্তে। অতঃপর ইংলন্ড।

ইংলন্ড? আতঙ্কিত ইংলন্ড হাসপাতালের বিছানার মধ্যে খেলোয়াড় সন্ধান করছে। ইংলন্ডের সর্বনাশ হয়েছে ওরিলী ও আয়রনমঙ্গারের বলে। ইংলন্ড ৬ উইকেটে ২১৬, অ্যাশেজ সুদূরপরাহত, বডিলাইনের সব আয়োজন ব্যর্থ, যদি-না কিছু-একটা করা যায়।

প্রথম দিনে টনসিলাইটিস হয়ে যে-এডি পেণ্টার হাসপাতালগত হয়েছিলেন, তাঁকে কম্বল জড়িয়ে তুলে আনা হল এবং পোশাক পরিয়ে, মদ খাইয়ে চাঙ্গা করে মাঠে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল যখন, তাঁর মুখ একেবারে সাদা, শীর্ণ, কিন্তু প্রতিজ্ঞায় স্থির।

না, তাঁকে অস্থির করবার জন্য ব্যস্ত হননি উডফুল। স্কুলমাস্টার উডফুলের জীবনদর্শন সলিসিটর জার্ডিনের জীবনদর্শনের চেয়ে ভিন্ন। বুকে আঘাত পেয়ে লুটিয়ে-পড়া উডফুল দাঁড়িয়ে উঠে ব্যাট ধরা মাত্র বডিলাইন ও বাম্‌পারে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন জার্ডিন, কেননা মাঠে থাকলেই মাঠের তাপ ভোগ করতে হবে, এই নীতি জার্ডিনের। অপরপক্ষে এডি পেণ্টার মাঠে ছিলেন, মাঠে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সুবর্ণ সুযোগের কালে, অ্যাশেজ লড়াইয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, কিন্তু, লারউড লিখেছেন, 'তাঁর (পেণ্টারের) ইনিংসের প্রতিটি মুহূর্তে উডফুল কত-না বিবেচনা দেখিয়েছিলেন, আমার মনে পড়ে তা।'

অস্ট্রেলিয়ার সহৃদয়তার পটে পেণ্টারের বীর-গাথা লিখিত হয়েছিল।

অসামান্য খেলেছিলেন পেণ্টার—যে-খেলা ইংরেজ খেলে যুদ্ধক্ষেত্রে, শেষ পরিখা রক্ষা করার জন্য—যে-খেলা খেলাতে পারেন ইংরেজ-সেনাপতিরা—খেলার মাঠে যার নমুনার নাম—ডগলাস জার্ডিন।

খেলার প্রথমদিনের পরে অসুস্থ হয়ে পেণ্টার যখন হাসপাতালে যান, তখন জার্ডিন মহা খাপ্পা। অসুস্থ হওয়ার জন্যই রাগ নয়। পেণ্টার নিশ্চয় দল মনোনয়নের সময়ে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য কিছু বোধ করেছিলেন—বলেননি কেন?

ইংলন্ডের যখন ৬ উইকেটে ২১৬ রান, এবং দেখা গেল, ইংলন্ডকে একজন কম ছাড়াই ইনিংস শেষ করতে হবে, তখন জার্ডিন স্থির করলেন, পেণ্টারকে টেনে আনতে হবে, যার দায়িত্বহীন আচরণে ইংলন্ডের জয় বিঘ্নিত হচ্ছে। পেণ্টারের শারীরিক অবস্থার কথা তুলে আপত্তি করলেন কেউ-কেউ। জার্ডিন বললেন—'তাহলে সেই লোকগুলি কি করে জ্বর-গায়ে কান্দাহারের দিকে মার্চ করে গিয়েছিল।'

জার্ডিন খেলাকে যুদ্ধের এতটুকু কম মনে করতেন না।

এই ঘটনাকে স্মরণ করে কয়েক বৎসর পরে অস্ট্রেলিয়ার লেখক বিস্ময় প্রকাশ না করে পারেননি, যখন বিশ্বযুদ্ধকালে ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর পাশে জার্ডিনকে সেনাপতিরূপে জুড়ে দেওয়া হল না—যে-জার্ডিন 'সামরিকনীতিতে তাঁর টেস্ট-দল পরিচালনা করতেন, দু'-একটি জিনিস দয়া করে বাদ দিয়েছিলেন—যথা—মাঠের মধ্যে স্যালুট!'

সুতরাং জার্ডিন সোজা হাসপাতালে গেলেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পেণ্টারকে বললেন যে, তাকে ইংলণ্ডের হয়ে ব্যাট করতে হচ্ছে।*

সেদিন পেণ্টার ২৪ রান করে নটআউট ছিলেন। খেলা-শেষে তাঁকে গরম জলে চান করিয়ে, গলায় শ্যাম্পেন ঢেলে পুনশ্চ কম্বল জড়িয়ে হাসপাতালে পাঠানো হল। পরদিন আবার বিছানা থেকে তুলে মাঠে দাঁড় করানো হলে ৮৩ রান কবলেন, যার জন্য ইংলডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রান-সংখ্যা পেরনো সম্ভব হল। ইংলণ্ড করল ৩৫৬।

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে করল মাত্র ১৭৫। জয় এবং অ্যাশেজ চোখের সামনে ঝুলিয়ে ইংলণ্ড ব্যাট করতে নামল। মাত্র দেড়শোর মতো রান করলেই ইংলণ্ড জেতে, আর...অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে কোনো বডিলাইন নেই। কিন্তু ওরিলীর নৈপুণ্য তো আছে! সুতরাং ইংলণ্ডের অধিনায়ক এই পরিস্থিতিতে ব্যাট তুলতে পারেন না। খুঁটে-খুঁটে রান করতে লাগলেন। একটা সময় গেল যখন তিনি ৮৩ মিনিট মাঠে দাঁড়িয়ে থেকেও কোন রান করেননি—এবং ৮২টি বল খেলেছেন কোনো রান না করেই।

সুতরাং ইংলণ্ডের ম্যানেজারের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল ড্রেসিংরুমে প্রতীক্ষা। স্নায়ুপীড়নে কাতর হয়ে তিনি ড্রেসিংরুম ত্যাগ করে গেলেন যখন জয়ের জন্য প্রয়োজন মাত্র ৫৩ রান। ক্রিকেটের মহাঐতিহাসিক পেলহ্যাম ওয়ার্নার যে জানেন, ৫৩ রানের কমেও ইনিংস শেষ হয়েছে!

শেষ বলটি পর্যন্ত লড়াই করার অস্ট্রেলীয় অভ্যাস সহাস্যে পরিত্যাগ করে ম্যাককেব স্বেচ্ছায় ফুলটস্ বল দিলেন পেণ্টারের ব্যাটের উপরে, বলটা ওভার-বাউণ্ডারিতে উড়ে গেল। যথার্থ বীরের উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়ার শ্রদ্ধা এবং ইংলণ্ডের বিজয়রব ঘোষিত হল একসঙ্গে। ইংলণ্ড জিতল ৬ উইকেটে। এ-টেস্ট পেণ্টারের। না, ভুল বলা হল। এ-টেস্ট জার্ডিনের। পেণ্টারের মধ্যে

*এখানে আমি এম-সি-সি-সি-র ভাইস ক্যাপ্টেন বব ওয়াটের বিবরণ অনুসরণ করছি। লারউডের বিবরণ অন্যপ্রকার। তাঁর মতে, বিল ভোস পেণ্টারকে মাঠে আনার ব্যাপারে মূল ভূমিকা নেন। তিনি পেণ্টারের শয্যাপার্শ্বে ছিলেন। খেলার খবর নিতে তিনি বাইরে গিয়ে যখন ইংলণ্ডের শোচনীয় অবস্থার কথা শোনেন তখনই হাসপাতালে ফিরে যান, এবং তাঁর মুখে সে-কথা শুনে মর্মাহত ও উত্তেজিত পেণ্টারও তাঁকে মাঠে নিয়ে যাবার জন্য জোর করেন। তদনুযায়ী ভোস তাঁকে মাঠে আনেন। কিন্তু আমাদের ধারণা, ক্যাপ্টেনের নির্দেশ ভিন্ন ভোস পেণ্টারকে মাঠে আনতে সাহস করতে পারতেন না। আরো আগে কান্দাহার যুদ্ধে অসুস্থ ব্রিটিশ সৈন্যের বিষয়ে জার্ডিনের যে-উক্তি উদ্ধৃত করেছি, তা সংগৃহীত হয়েছে পেলহ্যাম ওয়ার্নারের আত্মজীবনী থেকে। তাতেই প্রমাণিত যে জার্ডিনের কথায় পেণ্টারকে আনা হয়।

জার্ডিনেরই প্রতিজ্ঞার ছায়া।

পেণ্টারের বল যখন শূনে উড়ছে—শূন্য তখন ভাবাতুর হয়ে আর্দ্র নিশ্বাসকে ঝরিয়ে দিতে শুরু করেছে। খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। ব্রিসবেনের অসহ্য শ্বাসরোধী আবহাওয়ার উপরে এবং অনুরূপ ক্রিকেটের উপরে বর্ষিত হল শান্তিজল। কী নিশ্চিন্ত শান্তি! ইংলণ্ড বলল। আর সামান্য পূর্বে বৃষ্টি নামলে সর্বনাশ হয়ে যেত। ভেসে যেত অ্যাশেসের ছাই।

বাইরে বৃষ্টির সুন্দর ঝরঝরে শব্দ। ভিতরে আনন্দরব। ইংলণ্ডের শ্যাম্পেন-প্যানোৎসবে যোগদান করেছে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রাও। 'কথাবার্তা হচ্ছে, যেভাবে হওয়া উচিত।' বিশ্রী আবহাওয়া আর নেই।

ঠিক তখনি অস্ট্রেলিয়ার পতাকা অর্ধনমিত। শ্যাম্পেনের পানপাত্রে একটি তরুণ দীপ্ত মুখের ছায়া—তা ছায়াই এখন। অকালে বিদায় নিয়েছেন আর্চি জ্যাকসন। প্রভাত-সঙ্গীতকে ঢেকে ছড়িয়েছে সন্ধ্যা-সঙ্গীত।

অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়েরা কফিন বয়ে নিয়ে চলেছেন। লারউড ভাবলেন, অস্ট্রেলিয়ার বেপরোয়া শৌর্যের সৌন্দর্য বাহিত হয়ে চলেছে কবরের দিকে।

'জীবন ও ক্রিকেট অপ্রত্যাশিত ক্ষণে সূর্যালোকের সঙ্গে ছায়াকে মিশিয়ে দেয়।'

* * * খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ফিরে গেল বিজয়ী বীর... * * *

'লণ্ডন শহর অনেক বাজে স্মৃতিস্তম্ভ আর মূর্তিতে ভর্তি হয়ে আছে। তেমন একটা জায়গা পরিষ্কার করে সেখানে বসিয়ে দাও লারউডের মূর্তি। নিঃসন্দেহে সে আজ জাতীয় বীর।'

নেভিল কার্ডাস পর্যন্ত ঐ কথা লিখেছেন! সুতরাং অন্যান্যদের উচ্ছ্বাসের রূপ বোঝা শক্ত নয়।

কেননা অ্যাশেজ ফিরিয়ে এনেছে ইংলণ্ড। বহু সমুদ্রপারে, পর্বত-প্রান্তরময় এক দ্বীপদেশে হরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 'ভস্ম'-সুন্দরীকে (এ ভস্ম মুক্তাভস্ম, না বললেও চলে)—ব্রাডম্যান নামক এক গুণ্ডা ছোকরা মারপিট করে হঠাৎ কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল সতর্ক হবার আগেই—তাকে ঠাণ্ডা করে, সেই অ্যাশেজকে আবার উদ্ধার করা হয়েছে—

অভিমন্যুবধে হস্তিনাপুরে উল্লাসের মতো ইংলণ্ডে উগ্র উল্লাস।

'ইংলণ্ড বডিলাইনের বিরুদ্ধে কথাটি কইল না'—লারউড লিখেছেন।

বরং অপরপক্ষে, অতিশয় বিরূপ দর্শকদের মধ্যে কষ্টকর পরিস্থিতিতে সংগ্রামশীল লারউডের 'নৈতিক শক্তি' প্রভৃত প্রশংসিত হল।* ইংলণ্ডের উৎসাহ তখন এমন প্রচণ্ড যে, ক্রীড়ামন্দির ও ধর্মমন্দির একাকার হয়ে গেল। 'ক্যাথলিক হেরাল্ড' পত্রিকা লিখল: "বহুসংখ্যক অস্ট্রেলিয়ান এখন বড়ই বোকা বনে গেছেন। 'অখেলোয়াড়ী' লেগ-থিয়োরির বিরুদ্ধে খেলা অসম্ভব, এ-কথা বলার পরে অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কমিশনকে নিশ্চয় মাথায় হাত দিয়ে বসতে হয়ে-

*অস্ট্রেলিয়া শুনে আমোদ করে ভাবল, 'নৈতিক', তবে বলনৈতিক।

ছিল যখন দেখা গেল—তাদের পান্ডারা বডিলাইনের বিরুদ্ধে তিন উইকেটে ২৫০ রান করে বসেছে! ব্যাটসম্যানেরা লেগ-থিয়োরির বিরুদ্ধে রান করতে অবশ্যই পারেন, যদি তাঁরা গ্যালারির দিকে খেল্ না দেখিয়ে ক্রিকেটে মন দেন।

"বাম্পার থেকে কী যে দারুণ বিপদের সম্মুখীন তিনি হয়েছেন, তা দর্শক-দের চাক্ষুষ দেখাবার জন্য উডফুল ঘাড়গুঁজে নীচু হলেন—তখন বলটি তাঁর পেটে লাগল! তারপর পনস্‌ফোর্ড এবং সেই অননুকরণীয় ব্রাডম্যান উইকেট থেকে পুনঃ-পুনঃ সরে গিয়ে সবিশেষভাবে বডিলাইনের বিপদ সম্বন্ধে দর্শক-দের সচেতন করার কালে শুনলেন—পিছনে কাঠের প্রাসাদ হুড়মুড়িয়ে পড়েছে এবং তা ঘটেছে পায়ের পিছন দিয়ে ছুটে যাওয়া বলে। অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড অব কন্ট্রোল 'অখেলোয়াড়ী' কথাটা প্রত্যাহার না করে ভালই করেছেন, শব্দটার আসল ঠাঁই স্থির হয়েই আছে, যদি অবশ্য তাকে স্বাধীনভাবে নড়ে-চড়ে স্থান নির্বাচন করতে দেওয়া হয়।"

কার্ডাস—অন্যের অসাধ্য তাঁর অভ্যস্ত রচনারীতি নিয়ে ভেঙে পড়লেন লার-উডের মঙ্গলগানে :

'লারউড আজ জাতির বীর। তিনি টেস্ট-ক্রিকেটের মুখের চেহারা বদলে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায়। এক কি দু'বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট-ক্রিকেট হয়ে উঠেছিল বিকারগ্রস্ত, অসুস্থ। ব্যাটসম্যানেরা ফুলে উঠেছিল রানে। সেঞ্চুরি গিলে-গিলে পেটমোটা। সুখমসৃণ পিচে তাদের অলস বিশ্রাম। ফলে খেলাটি প্রাণ ও তেজের অভাবে নিঃঝুম। এই মেদস্ফীত নিম্নপতনকে লারউড রোধ করেছেন। সবল বাহুর দ্বারা তিনি অস্ট্রেলিয়ার ঘুম-জড়ানো ক্রীড়া-উদ্যানকে করেছেন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম-ক্ষেত্র।

"বহু বছর পরে আমরা অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট-ক্রিকেটকে বোলারের শক্তির দিক দিয়ে বিচার করতে বসেছি। তা আর বিজয়ী ব্যাটসম্যানগণের অভ্যস্ত নাম-কীর্তন নয়—সেই ব্রাডম্যান, পনস্‌ফোর্ড, হবস্, সাটক্লিফ : সাটক্লিফ, হবস্, পনস্‌ফোর্ড, ব্রাডম্যান! নটিংহামশায়ারের খাটো শক্ত মানুষটি অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়েছেন, অবসান ঘটিয়েছেন আরাম-শয়নে ব্যাটসম্যানের ঝিমুনির। ব্রিসবেনের এই খেলায়, আফ্রিকা-মার্কা রৌদ্রতাপের তলায় তিনি খাঁটি ক্লাসি-ক্যাল ফাস্টবোলিং-পদ্ধতিতে স্টাম্প-লক্ষ্য বলের দ্বারা কীর্তি রচনা করেছেন। ইংলন্ডের ঘনীভূত সংকটকালে পরিষ্কার বোল্ড করে দিয়েছেন ব্রাডম্যান ও পনস্‌ফোর্ডকে। ব্রাডম্যান ও পনস্‌ফোর্ড যদি আরও পনেরো মিনিট কাটাতে পারতেন, তাহলে বাকি দিন কাটিয়ে দেওয়াও আশ্চর্য ছিল না।...তিন ওভারে লারউড অস্ট্রেলিয়ার শিরদাঁড়া ভেঙে দিলেন। তিন ওভারের মধ্যে সারাদিনের রৌদ্রস্নানের সম্ভাবনা থেকে নিজ দলকে অব্যাহতি দিলেন, উডফুলের মুঠি থেকে ছিনিয়ে নিলেন ক্রীড়া-পুরস্কার, অস্ট্রেলিয়ার আত্মবিশ্বাসকে ডুবিয়ে দিলেন নৈরাশ্যে, এবং—এ সকলই করা হয়েছে এমন ফাস্টবোলিংয়ের দ্বারা, টম রিচার্ডসন থাকে প্রীতিভরে বহুমান দিতেন। ব্রাডম্যান ও পনস্‌ফোর্ড যেভাবে আঙ্গিকগত নিতান্ত প্রাথমিক ত্রুটি দেখিয়ে মহাসুযোগকে ফসকে যেতে দিয়েছেন, সে বিষয়ে কি ভাবা উচিত?...আমাকে অগত্যা এখন ভাবতে হচ্ছে, লেগ-থিয়োরির অপব্যয় করা হয়েছে কয়েকজন বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ানের

ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যেই আমার স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, আমাদের মধ্যে যাঁরা খ্রীস্টীয় বদান্যতায় অস্ট্রেলিয়ান দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহানুভূতি বোধ করছেন, তাঁরা অস্থানে কৃপাবর্ষণ করছেন—যদি ক্রিকেটের সামগ্রিক মঙ্গলের কথাটা আমরা মনে রাখি।

"টেস্ট-ক্রিকেটারের পক্ষে দ্রুত সোজা বলের সামনে উইকেট অরক্ষিত রেখে কখনই আড়াআড়ি ব্যাট চালানো উচিত নয়। সন্দেহ হয়, লারউড যদি উইকেট-লক্ষ্যে বেশি মনোযোগ দিতেন, তাহলে এই সফরে তাঁর সাফল্য অধিকতর হত। যে-ব্যাটসম্যান অফ বা লেগ-স্টাম্পের উপর জোর বল সামলাতে পারে না, তার মাথার চার ধার দিয়ে বল উঁড়িয়ে দেবার এত কি প্রয়োজন?"

খনির বালক অনেক দূর এসেছে। এবার চাই একটু বিশ্রাম। পিট বয়... নেশনস হীরো! ৩২ শিলিং হপ্তা-পাওয়া খনির ছেলে এখন জাতীয় বীর!! পৃথিবীর মধুরতম সঙ্গীত যে-প্রশংসার সুর, তা যতক্ষণ ঝঙ্কারিত হচ্ছে চারিদিকে, সেইপর্যন্ত যদি ক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম-শয্যায় ঢেলে দিয়ে আস্বাদনে রোমন্থনে কাটাতে পারা যায়...

'এ টেস্টে আমি খেলতে চাই না'—লারউড জানালেন জার্ডিনকে।

'খেলতে চা-ও-না! কেন?'—সবিস্ময়ে জার্ডিন শুধোন।

'অ্যাশেজ তো পেয়েই গেছি আমরা। তাছাড়া বল করে-করে আমি সারা। অ্যাশেজের চাপ যখন নেই, তখন বিশ্রাম পেতে পারি।'

জার্ডিন আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। মনে হল তিনি রাজি হতে পারেন। উৎসাহিত হয়ে লারউড বললেন—একটু সুখলজ্জার সঙ্গে—'তাছাড়া আমি কখনো টেস্টম্যাচ দেখিনি, দেখতে বড় ইচ্ছা—'

'তা হয় না হ্যারল্ড'—জার্ডিন হঠাৎ জেগে উঠে জোরে বললেন—'আমি দুঃখিত, তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারলাম না।' ডান হাতের বুড়ো আঙুল টেবিলের উপর সজোরে চেপে ধরে, পিষে ঘুরিয়ে চাপা তীব্রস্বরে বললেন—'বাসটার্ডগুলোকে এখানে গুঁজে রেখেছি, এখানেই গেঁথে রাখব।'

অস্ট্রেলিয়া শুরু করল। শূন্য রানে ফিরে গেলেন রিচার্ডসন—লারউডের বলে কট। বল করার সময়ে রিচার্ডসনের পূর্বেকার তিক্ত উক্তি লারউডের মনে ছিল। উডফুল গেলেন অল্প রানে, এবং ব্রাডম্যান নাতিদীর্ঘ রানে। দুজনই বোল্ড লারউডের হাতে।

অ্যাশেজ-প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সিডনী মাঠ দর্শকে ঠাসা, কারণ বডিলাইন নামক আকর্ষণ তখনো জীবন্ত। যে-আকর্ষণে দর্শক ছুটে এসেছে, সেই বস্তুটি যখন সত্যই আবির্ভূত হল খেলা আরম্ভের কয়েক ওভারের মধ্যেই, তখন আকর্ষণ নয়, বিকর্ষণ দর্শকের ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিহত হতে লাগল মাঠের নানা দিকে। অ্যাশেজ জয় হলেও অস্ট্রেলিয়াকে আরও একবার হারাবার সুযোগ যখন আছে, তাকে হেলায় নষ্ট করতে পারেন না জার্ডিন।

অস্ট্রেলিয়ার পালের গোদারা অনধিক রানে বিদায় নিলেও পালরাজত্ব পর-

বর্তী অনতিখ্যাত রাজাদের শ্বারা দীর্ঘায়ত হল। বার্ট ওলডফিল্ড, যিনি লারউডের বলে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত না হয়ে জ্ঞানোদয়মাত্রে শিয়রের কাছে লারউডের স্নেহবিহ্বল করুণা-ছলছল আঁখি দেখে নিজদোষ তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তিনি যখন কয়েক টেস্ট বাদ দিয়ে আবার উইকেটে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর মুখ একেবারে রক্তশূন্য। লারউড বলেছেন—'আহা রে আহা, তা তো হবেই?' তিনিও ৫২ করে তবে রানআউট। ওরিলীও ১৯ রান না করে পারলেন না, যদিও ব্যাট ধরার আগে লারউডকে উইকেট দেখিয়ে বলেছিলেন —'ভোঃ হ্যারল্ড, এই যে—তোমার নেওয়ার জিনিস।'

অস্ট্রেলিয়ার রান ৪৩৫। ফাস্টবোলার লারউড আবার এক সুদীর্ঘ কল্পনাতীত কষ্টের বোলিং করেছেন—৩২·২ ওভার; উইকেট পেয়েছেন ৯৮ রানে ৪। ক্লান্তি ধুয়ে ফেলতে কলের জলের নির্ঝরের তলায় বসে আছেন—আঃ কী সুখ—শান্তি—অব্যাহতি—

জার্ডিন এসে হাজির স্নান-ঘরে। সদ্য আউট হয়েছেন। ইংলণ্ড এক উইকেট ডাউন।

'হ্যারল্ড, প্যাড পরে নাও'—জার্ডিন বললেন।

'প্যাড পরে নেব...কিসের জন্য?' দশ নম্বর ব্যাটসম্যান লারউডের ঘোর বিস্ময়।

'হয়তো তোমাকে পাঠাবার দরকার হবে আমার—'

'কী-ই-ই, আমি? নিশ্চয়ই নয়...?' জার্ডিন অদৃশ্য হয়ে গেছেন ইতিমধ্যেই। ঝরঝরে জলের তলায় বসে রাগে পুড়তে থাকেন লারউড—না, কখনো নয়, কখনো নয়—

কিন্তু জার্ডিনের উপরে কেউ চড়ে থাকতে পারে না। সুতরাং উপদেশ দিল কেউ-কেউ, অধিনায়কের নির্দেশ মানাই ভাল।

'এটা ভাল হল না'—লারউডের রাগ পড়তে চায় না—'এইমাত্র জিভ বার করে বল করে এলাম, এখনি আবার রাতের পাহারাওয়ালার চাকরি—'

কিন্তু ঠাণ্ডা হতেই হয়, যেহেতু 'জার্ডিনের উপর কেউ চড়ে থাকতে পারে না'। লেসলি এমস ও মরিস লেল্যাণ্ডের সঙ্গে প্যাড পরে চেয়ারে বসে পুটপাকে জারিত লারউড—

পৌনে ৬টা, বাইরে একটা হৈ-চৈ, সুতরাং কেউ একজন আউট, এবং—

জার্ডিন এসে বললেন—'হ্যারল্ড, এবার তুমি মাঠে যেতে পার।'

লারউড এমস্‌কে বললেন—'তৈরি থেকো। এখনি আউট হয়ে ফিরছি।'

ওয়ালী হ্যামণ্ডের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে ওরিলীর থেকে পাওয়া প্রথম বলেই কভারে হাঁকড়ে লারউড ডাক দিলেন রানের, এবং ছুটতে শুরু করলেন।

'ফিরে যাও, ফিরে যাও হ্যারল্ড'—কারণ—সর্বনাশা ফিল্ডার ব্রাডম্যান সেখানে দাঁড়িয়ে। শকুনের মত ছোঁ দিয়ে সে তোলে এবং তীরের মত সাঁ করে সে ছোঁড়ে।

তাতে ভয় কি, তাই তো চাই—লারউড দৌড় থামালেন না। তিনি জানতেন, ব্রাডম্যান হ্যামণ্ডকে নয় তাঁকেই আউট করতে চাইবেন বোলারের দিকে বল ছুঁড়ে, এবং সত্যিই তাই চাইলেন, বরং বেশি চাইলেন, একেবারে 'বোল্ড' করে

দিতে, সুতরাং ব্রাডম্যানের বল বোলারের হাতে না গিয়ে ছুটে গেল সোজা উইকেটে, এবং...ফস্‌কালো—বাউন্ডারি। লারউড প্রথম মারে পাঁচ রান পেলেন, তারপরেই আম্পায়ার বেল তুলে নিলেন। দিনের খেলা শেষ।

ব্রাডম্যানের লক্ষ্যভ্রষ্টতায় কি লারউড আনন্দিত হয়েছিলেন? যদি হয়ে থাকেন, তেমন আত্মঘাতী সুখ অল্পই সম্ভব।

পরদিন রাগে-রসে লারউডের ব্যাট যথেচ্ছ ঘুরতে লাগল এবং আগুনের ফিন্‌কির মতো রান ঠিক্‌রে পড়ল। অস্ট্রেলিয়ার ফাস্টবোলার 'বুল' আলেকজান্ডার কিছু বাম্‌পারও ছিটোতে লাগলেন লারউডের গায়ে। সিডনির দর্শকেরা যথারীতি বাসটার্ডটাকে খতম করবার জন্য উৎসাহিত করতে লাগল বোলারকে। তাদের বাসনা প্রায় চরিতার্থ হল যখন একটি বল লারউডের নাকে হাওয়া লাগিয়ে বেরিয়ে গেল। উইকেট-কীপার ওল্ডফিল্ড বললেন—'হিঃ হ্যারল্ড, একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল, কি বলো?'

'আরে না না, কি যে বলো, বলের সেলাই পর্যন্ত গণবার সময় পেয়েছিলাম।'

লারউড মিথ্যে কথা বলেছিলেন ওল্ডফিল্ডকে। ফিঙ্গলটনের কাছে পরে স্বীকার করেছেন, তাঁর গা হিম হয়ে গিয়েছিল। লারউড হয়তো বুঝেছিলেন, নাকের পাশ দিয়ে বল বেরিয়ে যাওয়া যদি এই হয়, নাকে লাগার মানে কি।

কিন্তু তাই বলে লারউডের ফাস্ট-ব্যাটিং থামেনি। নির্বিঘ্ন নিরঙ্কুশ অগ্রগতি। প্রথম থমকালো মন, যখন লেল্যান্ড বললেন, হ্যারল্ড একটু সামলে, ৯৮ রানে উঠে আছ।

৯৮ রান! তার মানে, টেস্ট-সেঞ্চুরি! কী বিচিত্র! পাওয়ার আর বাকি রইল কি? আশায় বিস্ময়ে যেটুকু অন্যমন হলেন তারই অস্বস্তিতে বল শূন্য দিয়ে মাঠের বাইরে না গিয়ে থমকে নামতে লাগল বেড়ার ধারে...না ভয় নেই, সেখানে দাঁড়িয়ে আয়রনমঙ্গার, যে ট্রাম পর্যন্ত থামাতে পারে না, ফিল্ডার হিসাবে এমনই খ্যাতি।

আয়রনমঙ্গার ক্যাচ ধরে তাঁর পক্ষে অসাধ্যসাধন করলেন এবং লারউডের পক্ষে অসাধ্যসাধন থামালেন।

লারউড সেঞ্চুরির চৌকাঠে পা দিয়েও ফিরে এলেন। এই শেষ নয়...

লারউড পরে বুঝলেন, জার্ডিন কেন তাঁকে বোলিং করে ফেরা মাত্র আবার মাঠে পাঠিয়েছিলেন। জার্ডিন তাঁকে বিশ্রাম দিতে চাইছিলেন। আউট হয়ে এলেই সবচেয়ে নিশ্চিন্ত দীর্ঘ বিশ্রাম; প্যাড পরে প্রতীক্ষার উদ্বেগ থেকে অব্যাহতি। জার্ডিন তাঁর তূণের সবচেয়ে ধারালো অস্ত্রটির ধার বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

বিরক্তি থেকে যাত্রা শুরু করে অনুরক্তিভরে ঠেঙিয়ে, কয়েক ঘণ্টা মাঠে কাটিয়ে লারউড যখন সেঞ্চুরির দিকে এগোচ্ছেন, তখন জার্ডিন কি তাঁর বোলারশ্রেষ্ঠের ব্যাটিং-সাফল্যে আনন্দবোধ করেছিলেন?

মরচে ধরে নষ্ট হওয়ার চেয়ে ঘর্ষণক্ষয়ে শেষ হওয়া অনেক ভাল—এই মহাবাক্যের প্রযুক্তি লারউডের জীবনে দেখে কতখানি সুখী হয়েছিলেন জার্ডিন?

৯৮ রানে আউট হয়ে লারউড যখন ফিরছেন, তখন আকাশ বিদীর্ণ করে জয়ধ্বনি দিল অস্ট্রেলিয়ার দর্শক। সেই সহর্ষ অভিনন্দনের ঝড়ে হাওয়া

উড়িয়ে নিয়ে গেল লারউডের সর্বাঙ্গভর্তি নিন্দার ধূলিরাশিকে। লারউড সহসা ছবির অপর পিঠ দেখতে পেলেন :

'সিডনি ক্রিকেট-মাঠের প্রতিটি মনুষ্য উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিনন্দিত করল। সিডনি-হিলের উপর দর্শকদের করতালি ও উৎসাহধ্বনি এক কথায় কানে তালা ধরানো। ঠিক এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত আমি অস্ট্রেলিয়ান জনতার মনোভাবের চরিত্র বুঝতে পারিনি। দেখলাম, অস্ট্রেলিয়ানরা লড়ায়েকে পছন্দ করে, পতিত সংগ্রামীর প্রতি তাদের সহানুভূতি, এবং তারা ভাল ক্রিকেট ভালবাসে, তা সে যেখান থেকেই আসুক না কেন। তারা চড়া, কড়া। তারা নাড়া দিতে ব্যারাক করে, কিন্তু আক্রমণ করলে খুশি হয়। যে গাল তারা আমাকে দিয়েছে, তারও পরে তারা দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাবে আশাই করিনি। যদি তাই জানতাম, তাহলে বাকি দুটো রান করে নিতাম।'

লারউডের ৯৮ এবং হ্যামণ্ডের সেঞ্চুরি ছাড়া ইংলণ্ডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার রান-সংখ্যা পেরোনো সম্ভব হত না।

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে যখন লারউড বল হাতে নিলেন, তখন তাঁর পিছনে আছে ৩২ ওভার বলে ৪টি উইকেট এবং ব্যাটিংয়ে ৯৮ রান; সামনে আছে এক সিরিজে সর্বাধিক টেস্ট-উইকেট সংগ্রহের রেকর্ড-সম্ভাবনা (তখন বলবৎ রেকর্ড মরিস টেটের—৩৮টি উইকেট), আর মাত্র ৬টি উইকেট হলেই হয়ে যায়—সুতরাং জাগো, জাগো লারউড, জেগে ওঠো! কয়লাখনির গুহাগর্ভ থেকে যে-যাতনার আবেগ নিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়েছিলে সেই আবেগ বোধ করো! বিশেষত সামনে যখন রিচার্ডসনের উইকেট গেল শূন্য রানে, রিচার্ডসন লারউডের দেওয়া চশমা চড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন—এখন সামনে উডফুল ও ব্রাডম্যান।

লারউড প্রাণপণে নিশ্বাস টেনে নেন। চেতনার তারকে টেনে বাঁধেন। স্নায়ু শিরাকে শক্ত করে ছুটতে শুরু করেন—এ কী হল! বাঁ পা এত ভারী কেন? সহসা কঠিন যন্ত্রণার অসহ্য মোচড়—এ কী—অ্যাঁ—ওঃ হো—হাঁটতে পারছি না যে—!

উদ্বিগ্ন মুখে জার্ডিন এগিয়ে আসেন।—'কি হল হ্যারল্ড?'

'পায়ে কী একটা হয়েছে! হাঁটতে পারছি না। হাড় ভেঙেছে বোধহয়।'

দেহের যন্ত্রণার সঙ্গে মনের যন্ত্রণা। গ্রেগরীর বিদায়-দৃশ্য হয়তো চোখের সামনে ভেসে উঠল।

'তোমাকে হাঁটতেই হবে। তোমাকে ওভার শেষ করতেই হবে।'—কঠিন মুখে জার্ডিন জানালেন।

ভিতরে ফেনিয়ে উঠল রোষ—'পারব না'।

'পারতেই হবে তোমাকে।'

পাঁচটা বল বাকি। কান্নাভরা একটা হাহাস্বর বুক তোলপাড় করে বয়ে গেল : কেউ কি জিজ্ঞাসা করবার দরকার মনে করল না যে, এমন ক্ষেত্রে ওভার শেষ করতেই হবে, এ-কথা আইনে লেখা আছে কি না! ক্রীজের উপর দাঁড়িয়ে হাত ঘুরিয়ে বল ছুঁড়বার সময়ে ক্রোধে হতাশায় বেদনায় অভিমানে অবরুদ্ধ স্বরে লারউড বললেন, 'পাঁচটি বলে পাঁচটি বাউণ্ডারি।' রথচক্র যখন মেদিনী গ্রাস

করেছে তখন নিরুপায়ে মার খেতেই হবে। শুনতেও হবে জনতার উল্লাসধ্বনি।

উডফুলের দিকে লারউডের মৃদু বলটি গিয়ে পড়ল—ঠিক তেমনি মৃদু ব্যাটের চাপড় খেয়ে বলটি ফিরে এল। লারউড নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। পরের বলটি একই ধরনের, এবং একই ধরনের ফিরে আসা। পর পর পাঁচটি বল তাই।

লারউডের বুক ভরে নিশ্বাস পড়ে। মানুষ মহৎ হয়, এই তার দৃষ্টান্ত। উডফুল বুঝেছেন লারউড আহত। রীতিরক্ষার জন্য ওভার পূরণের বলগুলি দিচ্ছেন। সেই বল থেকে রান তোলার প্রবৃত্তি নেই তাঁর, মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলে মাঠের প্রাপ্য বুঝে নিতে হবে, এমন জীবন-দর্শন তাঁর নয়। এ সেই উডফুল, যিনি অসুস্থ এডি পেণ্টারকে সযত্ন দৃষ্টিতে ও সহানুভূতিতে সারাক্ষণ লক্ষ্য করেছিলেন। 'সেই মুহূর্তে উডফুল আমার চোখে উঠে গেলেন শিখরে।'

'এবারে যেতে পারি, স্কিপার?' ওভারশেষে ক্লিষ্ট গলায় লারউড জিজ্ঞাসা করলেন।

'নাঃ'—ব্রাডম্যানের দিকে চোখ রেখে জার্ডিন বলেন।

'সে কী! আমি চলতে পারছি না। আমি কোনো কাজে লাগব না। আমাকে যেতে হবেই।'

'কভারে গিয়ে দাঁড়াও।' জার্ডিন অঙ্গুলি-নির্দেশ করেন। 'ওখানে তোমার পিছনে একজন থাকবে। এই বেঁটে বাস্টার্ড যে-পর্যন্ত আছে, তুমি যেতে পাবে না।'

জার্ডিন লড়াইয়ে নেমেছেন, উডফুলের মতো মহত্ত্ব দেখাতে বসেননি। ব্রাডম্যান যতক্ষণ উইকেটে, ততক্ষণ স্নায়ুর চাপ একটুকু হ্রাস করা চলে না।

লারউডমুক্ত ব্রাডম্যানের খড়্গ দ্রুত ঝলসাতে থাকে, ভেরিটির আহত বলের ফিনিক্ দেওয়া রক্ত ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। ইংলণ্ডের সৌভাগ্য, সে কিন্তু বেশিক্ষণের জন নয়। কয়েক ওভার পরেই ৭১ রানে বোল্ড হয়ে গেলেন।

ব্রাডম্যান ফিরতে শুরু করলেন।

হাতে তালি দিয়ে জার্ডিন লারউডকে ডাকলেন—'এবারে যেতে পারো তুমি।'

ব্রাডম্যানের পাশেই হাঁটছেন লারউড, ফিরছেন, কিন্তু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে। দুজনের মধ্যে একটিও কথা হল না। ক্রিকেট-মাঠের দুই বিরাটতম শত্রু ফিরল একসঙ্গে।

টেস্ট-সেঞ্চুরি হল না। টেস্ট-উইকেটের বিশ্বরেকর্ডও নয়। 'শ্রেষ্ঠতম ব্যাটসম্যানকে' কি হারাতে পেরেছি—নাকি নিজেই হেরে গেছি! ব্রাডম্যানের দৃঢ় পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে পা টেনে চলতে-চলতে লারউড হয়তো ভাবলেন।

দয়াহীন, মায়াহীন, নির্বিকার সেনাপতি জার্ডিন—হ্যাঁ, নিজের বিষয়েও।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে বুল আলেকজাণ্ডারের বাম্পারের পর বাম্পার চমকে-চমকে উঠতে লাগল জার্ডিনের বিরুদ্ধে। তীব্রগতি একটি উঠতি বল লাগল তাঁর কোমরের নীচে। প্রচণ্ড আঘাতে শীর্ণ মানুষটি উপড়ে গেলেন প্রায়। ফিল্ডসম্যানেরা ছুটে এল সহানুভূতিতে—স্ফূর্তিতে চেঁচাতে লাগল দর্শকে। জার্ডিন জানালেন—ঠিক আছি, সাহায্যের দরকার নেই। তিনি ব্যাট

করে চললেন।

কিন্তু যন্ত্রণাও অসহ্য। আহত স্থানে হাত বুলোতে গেছেন—ও-হো-হো করে উঠল বিদ্রূপে জনতা। জার্ডিন হাত বুলানো বন্ধ করে দিলেন। আরও আঘাত লাগল। অটল রইলেন। আউট হলেন ২৪ করে।

প্যাভিলিয়নে ফিরলে অনেকে দেখতে গেল তাঁর আঘাতের রূপ। আঘাত ভয়ঙ্কর। প্রচণ্ড চোট লেগেছে হাড়ে। প্রচুর রক্তপাতে পরিধেয় সিক্ত। দারুণ যন্ত্রণা, বোঝা গেল। তবু কথাটি বললেন না—একটিও না।

হ্যাঁ, এই মানুষ বলতে পারে—কেন, অসুস্থ সৈন্যেরা কি কান্দাহারে মার্চ করেনি? হ্যাঁ, এই মানুষই ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত—ভেঙে যাওয়ার পরেও—লারউডকে ব্যবহার করবার যোগ্য।

তবু জার্ডিনের রক্তাক্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে লারউডের মনে না উঠে পারল না—তাহলে তাঁর বলে কি হয়েছে অস্ট্রেলিয়ানদের! কতগুলি বিরাট ব্যাটসম্যানের ক্রিকেট-জীবন তিনি নষ্ট করেছেন! 'অ্যালেন কিপ্যাক্স প্রথম টেস্টের পরে বিদায় নিয়েছেন। বডিলাইন খেলতে তিনি অসমর্থ। ব্রিসবেন-টেস্টের পরে পনস্‌ফোর্ড দল থেকে বাতিল। এডিলেডের পরে ফিঙ্গলটন। আরও বহু খেলোয়াড়কে মেরে তচ্‌নচ্‌ করেছি।'

খোঁড়াতে-খোঁড়াতে মাঠ থেকে একেবারে বিশেষজ্ঞকক্ষে হাজির হয়েছিলেন লারউড, একথা প্রায় বলা চলে। শুনলেন, অপারেশন ছাড়া গত্যন্তর নেই। অতিরিক্ত বোলিংয়ের ফলে শক্ত মাটির ধাক্কায়-ধাক্কায় পায়ের এই অবস্থা। জার্ডিনের জন্য লারউড বিশ্বখ্যাতি পেয়েছেন, আর হারাতে বসেছেন খেলার পা।

অস্ট্রেলিয়া সফর-শেষে জার্ডিন দল নিয়ে যাবেন নিউজিল্যাণ্ডে। যে-বিশ্রাম তিনি অস্ট্রেলিয়ায় দিতে পারেননি লারউডকে, তাই দেবেন নিউজিল্যাণ্ডের জমিতে, প্রতিশ্রুতি দিলেন।—'হ্যারল্ড, তুমি আমাকে অ্যাশেজ জিতে দিয়েছ। এখন বিশ্রাম তোমার পাওনা। ছুটি কাটাতে এস না আমাদের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ডে'—জার্ডিন বললেন।

না, ধন্যবাদ। বাড়ির টান ধরেছে মনে। তাছাড়া পায়ের ব্যাধি যতশীঘ্র সম্ভব দূর করাই মঙ্গল। দলবল নিয়ে জার্ডিন ধরলেন নিউজিল্যাণ্ডের এবং লারউড ইংলণ্ডের জাহাজ।

যাবার আগেও ক্ষমাহীন জার্ডিন নীরব ঘৃণা ছিটিয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়ান দর্শকদের উপরে। এডিলেডে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সফরের শেষ খেলায় ইংলণ্ড দলের দশ জন খেলোয়াড়ের জন্য রঙিন হার্লেকুইন টুপি বেরুল। তারা দশটি 'রামধনু' হয়ে নামল মাঠে। একাদশ ব্যক্তি জার্ডিনের মাথায় শুধু সাধারণ কাউণ্টি-টুপি!

দর্শক দেখল, এতদিন মাঠে ছিল দশটি 'বকোমধ্যে' একটি হংস; এখন—দশটি 'হংসোমধ্যে' একটি বক। অর্থাৎ আমরা সবাই এক চরিত্রের, সবাই সমান জনবুষ, আমরা এক জাতি, এক প্রাণ, একতা।

নইলে কি ৪-১ হারো তোমরা! হাঃ হাঃ হাঃ। জার্ডিন কখনো মাঠে হাসেন না। নিঃশব্দ অদৃশ্য ভয়ঙ্কর হাসি হাসেন না, কে বলে?

আর লারউড, ঝটিতি জাহাজ ধরার সময়ে ঘরের কথা ভাবছেন, পত্নীর কথা, শিশুকন্যাটির কথা। ভাবছেন নিজের পায়ের কথা, অপারেশনে কি হবে, সেই কথা। ভাবছেন—প্রাপ্য এবং প্রাপ্তির কথা।

কী পেয়েছি, তারই মিলন-সঙ্গীত ভরে থাকুক কিছুক্ষণ শ্রবণভরে :

"আমাদের বিজয়ে লারউডেরই মুখ্য ভূমিকা। উইকেট নিয়েছেন বলেই নয় —ব্রাডম্যানকে খেলা বদলাতে বাধ্য করেছেন বলে।

"ডনকে দমিয়ে রেখেছিলেন তিনি—সম্পূর্ণ আধিপত্য। ইংলণ্ড ছাড়ার সময়ে আমি ভেবেছিলাম, যদি প্রতিবার একটি করে সেঞ্চুরির বিনিময়ে ব্র্যাডম্যানের হাত থেকে অব্যাহতি পাই, তাই যথেষ্ট। দুশো বা তারও বেশি—তারই ভয়ে আতঙ্কিত ছিলাম।

"ডনের গড় আজ ৫৬। এই আপেক্ষিক হ্রস্বাকারের মূলে লারউড। ব্রাডম্যানকে সাধারণ ব্যাটসম্যানের স্তরে টেনে নামানো হয়েছে। আর বাকি ব্যাটসম্যানেরা তো কার্যত—'লেজ'-ধরা। স্পষ্ট বোঝা গেল, ব্রাডম্যান নিজেকে বোঝালেন, 'যদি আমি আঘাত পাই, আমার ক্রিকেট-জীবন শেষ। সেটা হতে দিতে ইচ্ছে নেই।' সুতরাং তিনি খেলার জুয়া খেললেন, আঘাতের কোনোই ঝুঁকি নিলেন না।* আর তাঁর হালকা চেহারার কথা ভেবে আমি তাঁকে কোনোই দোষ দিই না, যদিও সর্বসময় এমন সম্পূর্ণ পরিহার তিনি না করলেও পারতেন।

"আসল কথায় এলে দেখা যাবে, আমরা অ্যাশেজ জিতেছি, চারটি টেস্টে জয়লাভ করে, যদিও টসে হেরেছি চারবার। এর হেতু, লারউডের অপূর্ব বোলিং, জার্ডিনের অসাধারণ লড়ায়ে নেতৃত্ব, জয়লিপ্সা, এবং অনবদ্য যৌথ দলীয় চেষ্টা। এক কথায়, আমাদের ছিল বিরাট একটি দল, সম্ভবত ১৯১১-১২-র দল বাদ দিলে সর্বশ্রেষ্ঠ দল, যা ইংলণ্ড পাঠিয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়।"

লিখেছিলেন অন্য কেউ নন স্বয়ং জ্যাক হবস, ব্রাডম্যানের পূর্বে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান এবং পৃথিবীর সর্বোত্তম ভদ্রলোকদের একজন।

তিনি লারউডের বোলিং সম্বন্ধে আরও কিছু কথা, অন্য কিছু কথা, বলেছিলেন—দরকার কি সে-কথা স্মরণ করে এই মুহূর্তে!

* * * লারউডের প্রত্যাবর্তন : বীরের সংবর্ধনা * * *

ইংরাজ-জাতি বীরবন্দনায় পশ্চাদ্‌পদ একথা কেউ বলবে না। নেপোলিয়ান-বিজয়ী নেলসন-স্তম্ভের পাশে ব্রাডম্যান-বিজয়ী লারউড-স্তম্ভের কথা কেউ ভাবেনি, এমন বলতে পারব না। কার্ডাস তো সত্যই মূর্তির কথা বলেছিলেন।

সুতরাং ইংলণ্ডে লারউডের বিপুল জনসংবর্ধনার কথা বলাই বাহুল্য। সাংবাদিকদের মৌমাছির ঝাঁকের কথাও। লারউডকে দিয়ে সবাই কিছু বলিয়ে নিতে চায়। সবাই আরও কিছু চাঞ্চল্যের প্রত্যাশী।

লারউড ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বসে রইলেন। কথাটি নয়—যে-পর্যন্ত না তিনি

*ব্রাডম্যান এই কথা স্বীকার করেন না। তিনি নিজের পদ্ধতিকে অধিক ঝুঁকিযুক্ত মনে করেছেন।

চুক্তিমুক্ত হয়ে কথা বলার স্বাধীনতা ফিরে পাচ্ছেন। এম-সি-সি নিউজিল্যাণ্ড-সফর শেষ করে দেশে না-ফেরা পর্যন্ত লারউডের মুখ বন্ধ।

জার্ডিন ফিরলেন। লণ্ডনে অবতরণ-মাত্রে হাজার-হাজার লোক ঘিরে ধরল তাঁকে 'Good old Jardine' ধ্বনি তুলে। জার্ডিনের বাবা-মা ছেলের কাছে ঘেঁষতে পারলেন না, তাঁদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তাঁকে কাঁধে তুলে নেবার চেষ্টা করা হল। এই বডিলাইন-সংবর্ধনা থেকে কোনক্রমে বডি বাঁচিয়ে জার্ডিন একটা হোটেলে ঢুকে পড়লেন। সেখানে বন্ধ দুয়ারে জনতার দাবি আছড়াতে লাগল। ফলে ব্যালকনিতে দাঁড়াতে হল বীর-নায়ককে। তিনি সেখান থেকে নিজ দলের আনুগত্য ও মহিমা সম্বন্ধে উচ্চ কৃতজ্ঞতা জানালেন।

দলের সদস্যেরা চুপ করে রইলেন অতঃপর। নীরবতায় তাঁরা প্রতিশ্রুত—এবং মোহিত বোনাসের স্বপ্নে। বিরাট লাভ করে এম-সি-সি দেশে ফিরেছে।

সবাই চুপ—লারউড ছাড়া। সংবাদপত্রে উপর দিয়ে অতঃপর ছুটে গেল লারউডের ভয়ঙ্করতম বডিলাইন-বচন। দেখা গেল, লারউডের বল কেবল হাতেই নয়, মুখেও।

সানডে এক্সপ্রেসে প্রকাশিত বিবৃতি-বোমাটির প্রথম স্ফুলিঙ্গ এই :

"এবার আমি মুখ খুলতে পারি। মেরিলীবোন ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে আমাদের শর্ত অনুযায়ী কয়েকমাস আমাকে চুপ করে থাকতে হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ায় আমার এবং আমাদের বরাতে কি ঘটেছিল—বিশেষত আমার বরাতে, কেননা এই হতভাগ্যের মস্তকোপরিই সেখানকার দর্শকদের উদ্‌গিরিত বিষ ও অগ্নি সর্বাধিক পরিমাণে বর্ষিত হয়েছিল—সে-বিষয়ে আমি কিছুই বলতে বা লিখতে পারিনি।

"এ-পর্যন্ত আমাকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার দর্শকদের বিদ্রূপ ও গালিগালাজকে। আর শুধু দর্শকেরই নয়, সংবাদপত্রগুলিও আমাদের ধ্বংসের অভিযানে যোগ দিয়েছিল।"

এর পরে কিভাবে অ্যাশেজ-উদ্ধারের জন্য লেগ-থিয়োরিতে আক্রমণ চালাবার মতলব করেছিলেন জার্ডিন, তার কথা লারউড বলেছেন। জার্ডিনের মাথায় প্রথম এই ফন্দী এলেও দলের সকল সদস্যই এর আলোচনায় ও প্রয়োগে অংশ নিয়েছিলেন। সুতরাং লারউড পূর্ব-পরিকল্পনা মতো দলের জয়-অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন, যা করা প্রতিটি ক্রিকেটারের কর্তব্য।

তারপর :

"এই কাজ করার জন্য চার মাস ধরে জনতার ক্রোধ আমাকে সহ্য করতে হয়েছে, যারা ক্রিকেটের সূক্ষ্ম দিকটির কিছুই বোঝে না। অন্য রীতির বোলিংয়ের তুলনায় লেগ-থিয়োরি বোলিংয়ে খেলতে হলে বেশি নৈপুণ্যের দরকার হয়।...এখানেই গণ্ডগোলের সূচনা। বিখ্যাত সিডনি হিলের উপরে কিংবা অন্যান্য মাঠের সস্তা আসনে যারা খেলা দেখতে যায়, বিশেষত এডিলেড মাঠে—তারা ক্রিকেট দেখতে যায় না, যায় অস্ট্রেলিয়ার জয় দেখতে। একমাত্র ঐ জিনিসটিই তারা চায়। সর্বোপরি তারা চায় ব্রাডম্যানের রান দেখতে।

"ব্রাডম্যানের খেলায় সেখানে তুমুল উত্তেজনা। সে-সব খেলা থেকে অস্ট্রেলিয়ান দর্শকেরা ব্রাডম্যানকে অলৌকিক ব্যাটসম্যান বলে ধরে নিয়েছিল।

আমরা দেখিয়ে দিলাম, তিনি তা নন। আর জনতা তাদের আদর্শ দেবতা সম্বন্ধে আমাদের ঐ আচরণ পছন্দ করল না। সেই সঙ্গে উডফুল। তিনি সারাদিন উইকেটে কাটিয়ে দেবার ভরসা করেন, যার সুযোগে অন্যেরা রান করে যাবে। তিনি ব্যর্থ হলেন। জিজ্ঞাসা করা হয়, ব্রাডম্যান ও উডফুল কেন আমার ফাস্ট-লেগ-থিয়োরি বোলিংয়ে রান করতে পারেননি? আসল কথা বলব? উডফুল অত্যন্ত শ্লথগতি এবং ব্রাডম্যান অত্যন্ত ভয়াতুর। হ্যাঁ— 'ভয়াতুর'- আসল কথা তাই। ব্রাডম্যান সইতে পারতেন না ও-জিনিস। সদাই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন। তা আমি জানতাম। তা সবাই জানত। অগণ্যবার আমার বলের সামনে থেকে তিনি পালিয়েছেন।

"ব্রাডম্যান নামার সময়ে যদি আমি বোলিং না করতুম, জার্ডিন অবিলম্বে আমাকে বল ধরিয়ে দিতেন।...রিচার্ডসন ও ম্যাককেব আমাকে ঠিকই খেলেছিলেন, উডফুল ও ব্রাডম্যান পারেননি।

"অস্ট্রেলিয়া হারছিল, সুতরাং দর্শকেরা খেলোয়াড়ী মনোভাব কাকে বলে সে-বিষয়ে পরোয়া না করে যারা জিতছিল তাদের পিছনে মুখ ছোটাচ্ছিল। ভেবে দেখুন আমার মনের অবস্থা, যখন ৫০ হাজার লোক উইকেটের দিকে আমার প্রতিটি পদক্ষেপের তালে-তালে দুয়ো দিয়েছে। বোলার যখন অনুভব করে যে, সে কেবল ব্যাটসম্যানের সঙ্গে খেলছে না, জনতার সঙ্গেও খেলছে, তার মানসিক পরিস্থিতি কল্পনা করে নিন।

'আগের সফরেও আমি একই ব্যবহার পেয়েছিলাম। তখন আমি মাত্র ২৪ বছরের ছোকরা। ব্যারাকিং ও ক্রুদ্ধ চিৎকার আমাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। এত কষ্ট পেয়েছিলাম যে, নিজের বিষয়ে সুবিচার করতে পারিনি।...মাঠের অবস্থা বা ব্যাটসম্যানেরা গতবারে আমাকে পরাভূত করেনি—করেছিল দর্শকেরা। তারা চেয়েছিল আমি ব্যর্থ হই। তারা সফল হয়েছিল।...এবার আমার বয়স চার বছর বেড়েছে, অভিজ্ঞতাও, জান আরও কড়া। জনতা তাদের অবিচার আর শত্রুতার দ্বারা আমাকে ধ্বংস করতে পারেনি। তারা যতই গাল দিয়েছে, দুয়ো দিয়েছে, ততই দাঁতে দাঁত বসেছে আমার, ততই কঠিনতর হাতে বল করেছি।... প্রথম সফরে আমি হয়েছিলাম বিপর্যস্ত, এবার উদ্দীপিত। পরের বার সম্ভবত উপভোগ করব। যদি নির্বাচিত হই, আমি স্বেচ্ছায় আবার সফরে যেতে রাজি। শুনতে পাই, আমি নাকি বলেছি, আর সফরে যাচ্ছি না। একথা নিতান্ত মিথ্যা। এ-কথা আমি কখনো বলিনি!...জার্ডিনকে আমার সেলাম—যেভাবে তিনি জনতা-নিক্ষিপ্ত গাল সহ্য করেছেন—আর সে কী গালাগালি! সে কী জনতার চেহারা!

"ইংলণ্ডে যে-সব লোকে ক্রিকেট শুধু দেখে যায়, তাদের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-পাগলদের হতাশ ক্রোধের রূপ কল্পনা করাও সম্ভব নয়। খেলাটির উপর তাদের এমনই প্রভুত্ব যে, বোর্ড অব কণ্ট্রোলকে বাধ্য হয়ে আমাদের পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হল। বোর্ড-অব-কণ্ট্রোল!! মরি মরি! নামের কি বাহার! নিজের দেশের দর্শকদের পর্যন্ত কণ্ট্রোল করতে যে অসমর্থ! যার অর্ধেক সংখ্যক সদস্য একটা ক্রিকেট-বলের ওজন কত, তা পর্যন্ত বলতে অসমর্থ।

"অস্ট্রেলিয়ানরা আমার বোলিং পছন্দ করেনি। হ্যাঁ, আমিও বলি, আমি তাদের 'হাউলিং' পছন্দ করিনি।"

সত্যিকারের বাঘের পরে এবার কাগজের বাঘের পালা। লারউডের কাগজের বাঘ সত্যিকারের বাঘের মতোই, কিংবা তারো চেয়ে জোরে কামড় দিল অস্ট্রেলিয়াকে। তুমুল প্রতিবাদ স্বভাবতই। অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ই ই বীন্ সরোষে প্রশ্ন করলেন, একজন পেশাদার খেলোয়াড় কি করে এই ধরনের ব্যক্তিগত বিদ্বেষপূর্ণ বিবৃতি দেয়? এটা কি আনুগত্যের অভাব নয়? এ-ধরনের বিবৃতি যদি প্রকাশিত হতে দেওয়া হয়, তাহলে কি—ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট বন্ধ হয়ে যাক কিছুদিনের জন্য—এই দাবিই জোরদার হবে না? বোর্ডের সদস্যেরা বলের ওজন জানেন না, এই অসৌজন্যকর উক্তির প্রতিবাদ করলেন আম্পায়ার ক্রোকেট। ডবলিউ জে জনসন নামক অস্ট্রেলিয়ান নির্বাচক মুখের উপর জানিয়ে দিলেন, অস্ট্রেলিয়া সাধুতায় বিশ্বাস করে, মন মুখ আলাদা রাখার রাজনীতিতে নয়, তাই সে লারউড-কোম্পানীর আতঙ্কসৃষ্টি চেষ্টার প্রতিবাদ করেছে। পরবর্তীকালে লারউডের বড় সখা ফিঙ্গলটন পর্যন্ত (যিনি সেইকালেই ব্রাডম্যানের নতুন ব্যাটিং-রীতির সমালোচনা করেছিলেন, এ-কথা নিশ্চয় পাঠকদের স্মরণে আছে) লারউডের পদ্ধতি বিষয়ে ক্রুদ্ধভাবে লিখলেন, 'অস্ট্রেলিয়ান দর্শক লারউডকে কেমনভাবে চিরে-চিরে ছিঁড়েছে তার অতি বেদনাময় ছবি এঁকেছেন তিনি, কিন্তু কিভাবে তিনি মতলব করে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের মুণ্ডু কাঁধ থেকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন অসংখ্যবার —সে বিষয়ে কোনোই চোখের জল অবশিষ্ট রাখেননি। লারউড ও ভোস যখন অস্ট্রেলিয়ানদের পাঁজরে ছুরি মারছেন, তখন তাঁদের অবলম্বিত নীতির ঔচিত্যের বিষয়ে সন্দিহান তাঁর দলীয় কিছু খেলোয়াড়, আহা, লেগের দিক ঘিরে আলো করে দাঁড়িয়ে ছিলেন!' অন্যতম অস্ট্রেলিয়ান নির্বাচক ডাঃ সি ই ডলিং লারউডের মতো বড় বোলারকে পাঁক ঘাঁটতে দেখে বেদনাবোধ করলেন। লারউড পূর্ব-পরিকল্পিত যে আক্রমণরীতির কথা বলেছেন, তার দ্বারা বডিলাইন সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়ার মনোভাব সম্পূর্ণ যৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়েছে—তিনি জানালেন।

প্রায় সকলেই আপত্তি করলেন ব্র্যাডমান-উডফুলকে কাপুরুষ করে দেখানোর বিরুদ্ধে। সুবিবেচক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার-লেখক মেইলী, যিনি বডিলাইন-রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি, তিনিও বললেন, ও'রা ভয় পেয়েছিলেন, একেবারে বাজে কথা। স্বয়ং ব্র্যাডম্যানও অপবাদের প্রতিবাদ জানালেন। পুরনো পদ্ধতিতে মার খাওয়ার নামই বীরত্ব, একথা ব্র্যাডম্যান কদাপি স্বীকার করেন না। 'লারউডের বিবৃতির একটা সাফল্য অবশ্যই হয়েছে—অর্থনৈতিক সাফল্য'—ব্র্যাডম্যানের বিদ্রূপ। 'লারউডের পক্ষে ব্র্যাডম্যানকে কাপুরুষ বলে সংবাদপত্রে গাল দেওয়ার একটিই অর্থ—অর্থ!'—একটি কাগজ লিখল—'যত নিন্দা তত অর্থ।'

অস্ট্রেলিয়ার প্রতিবাদের প্রতিবাদে ইংলণ্ড পেছিয়ে রইল না। ভি ডবলিউ সি জাপ, যাঁকে বডিলাইনের উদ্ভাবনকর্তাদের অন্যতম মনে করা হয়, তিনি বললেন, ব্র্যাডম্যান নির্ঘাত ভয় পেয়েছিলেন, স্লো-মোশন পিকচার দেখলেই

বোঝা যাবে। তাছাড়া ঐ বোলিং-রীতির দায়িত্ব এম-সি-সি-র কম নয়, তাঁরা জানতেন কি ঘটতে যাচ্ছে। দলে জায়গা না-পাওয়া মনঃক্ষুণ্ণ ডাকওয়ার্থ পর্যন্ত এ-বিষয়ে চড়াসুরেই জানালেন—'অস্ট্রেলিয়ান অস্বাচ্ছন্দ্যগারের পিছনে আছে সোজা একটি জিনিস—কোনো-কোনো অস্ট্রেলিয়ান যাদুকর লারউডের বল দেখে ভয়ে মরে গেছলেন।' লারউডের বুড়ী মা পর্যন্ত এগিয়ে এসে বললেন, হ্যাঁ গো, সত্যি, আমার হ্যারল্ডের বলে ব্র্যাডম্যান একেবারে কাপড়েচোপড়ে। ওদের লোকেরা খুব গাল দিয়েছে হ্যারল্ডকে, বাছা আমার কানই দেয়নি, তাতেই তো ওরা অত রেগে গেল। আমার মাণিক ভাল জিনিসই দিয়েছিল, ওরা নিতে পারল না, তা কি হবে?

ডেইলী টেলিগ্রাফে টমাস মোল্ট একটা কথা পরিষ্কার করে দিলেন, লেগ-থিয়োরি বোলিংয়ের বিরুদ্ধে কোনো-কোনো ইংরেজ-খেলোয়াড়ের তাত্ত্বিক বা নৈতিক আপত্তি থাকলেও তাঁরা অ্যাশেজ-জয়ের উদ্দেশ্যে লারউডের ব্যবহারে জার্ডিনকে বিনা দ্বিধায় সমর্থন করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ান জনতার অশালীন গালিগালাজ সম্বন্ধে তিনি জার্ডিনের শীতল বিদ্রূপের উল্লেখ করলেন। জার্ডিন নিউজিল্যান্ডে বলেছিলেন—'আমরা সদ্য এমন একটা দেশ থেকে আসছি যেখানে আমাদের পিতৃপরিচয় সন্দেহজনক এবং আমাদের শেষ গতিবিধি নিতান্ত অনিশ্চিত।' *

এই বিতর্ক-ঝড়ের মধ্যে লারউডের পক্ষে জোরালো এক সমর্থন এল অস্ট্রেলিয়ার কাগজ থেকে। 'সিডনী ট্রুথ' লিখল অতি তীব্র ভাষায়—'ক্রিকেটের কুকুর-লড়াই আবার আরম্ভ হয়ে গেছে। যে-সব লেখক ও খেলোয়াড় লারউডের বিরুদ্ধে ঘেউ-ঘেউ করেছে আগে, তারাই আবার নিজেদের কাজের সাফাই গাইতে এগিয়ে এসেছে।' কাগজটি অপদার্থ কন্ট্রোল-বোর্ডকে প্রচণ্ড আক্রমণের পরে লিখল, পদত্যাগ করে যোগ্যতর লোকের হাতে কাণ্ড ছেড়ে দেওয়া উচিত। লারউড অন্তত একটা জিনিস করেছেন, পত্রিকাটি জানালো, বোলারদের সহায়তা করবার জন্য আইন তৈরি করো, এই কুম্ভীরাশ্রুপাত কিছুদিন বন্ধ হয়েছে। 'খাঁটি কথা যদি বলতে হয়', পত্রিকাটি লিখল, 'জনতা বডিলাইন বা ঐ জাতীয় জিনিসের বিরোধী নয়, তারা লারউড-বিরোধী, যিনি নিজের সামর্থ্যে আমাদের ব্যাটসম্যানদের ঠাণ্ডা করে অ্যাশেজ কেড়ে নিয়ে গেছেন। সুতরাং ইস্কুলের বখাটে খোকারা, খেলোয়াড়েরা, এবং খেলার পরিচালকেরা চান লারউডকে সরিয়ে দাও। হা ভাগ্য!'

পত্রিকাটি অবশ্য জার্ডিনকে ছেড়ে দিল না। দর্শকদের চেঁচামেচির মূলে জার্ডিনের বিবেচনার অভাব। ভবিষ্যতে জার্ডিন না এলে অস্ট্রেলিয়ার ব্যারাকিং থাকবে না। 'জার্ডিন বিরাট ক্রিকেট-নেতা, খাঁটি ভদ্রলোক, কিন্তু সম্পূর্ণ রস-বোধহীন, ক্রিকেটের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র মাত্র।'

* জনৈক অস্ট্রেলিয়ানের উক্তি আমরা অল্প পূর্বে উদ্ধৃত করেছি যিনি কূটনীতি নয়, সত্যভাষণকে অস্ট্রেলিয়ান চরিত্রের লক্ষণ বলেছিলেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে অন্তত কথাটা সত্য। স্বাস্টার্ড' গালটা অস্ট্রেলিয়ান দর্শকে দিয়েছিল খোলাখুলি চেঁচিয়ে,

লারউড সূত্রপাত করেছেন, সেই সূত্রে টান দিয়ে জট পাকিয়েছেন অনেকে। ব্রাডম্যানও লিখেছেন। এখন বাকি জার্ডিন, প্রধান তিন পাত্রের একজন। এবার তিনিও মুখ খুললেন। 'বডিলাইন' কথাটা তাঁর কাছে অর্থহীন, ওটা নিজেদের পরাজয় ঢাকা দেবার জন্য, পরাজয়ের সাফাই গাইবার জন্য, অস্ট্রেলিয়ান প্রেসের চালাকি। শব্দটা মরেই যেত, যদি-না বোর্ড অফ কন্ট্রোল তাঁদের দুঃখজনক তারবার্তায় শব্দটাকে স্বীকৃতি দিতেন।'

জার্ডিনের কাছে বডিলাইন লেগ-থিয়োরি ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকডোনাল্ড কিংবা জে স্কট কিভাবে এই লেগ-থিয়োরি ব্যবহার করেছিলেন, তার ইতিহাসকথা কিছু শোনালেন। লারউডও ১৯২৮-২৯-এ একই জিনিস অস্ট্রেলিয়ায় চালিয়েছিলেন, কিন্তু ফলোদয় হয়নি, এবার হয়েছে।

জার্ডিনের অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল : "মেরিলীবোন ক্রিকেট-ক্লাব অস্ট্রেলিয়াকে সম্মান জানিয়েছিল তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দল পাঠিয়ে। আমরা আমাদের বিপক্ষ-দলকে সম্মান জানিয়েছি, সর্বোত্তম খেলা দিয়ে। যদি মেরিলীবোন ক্রিকেট-ক্লাব বা আমরা একটুও কম করতাম, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার প্রতি সম্মান-জ্ঞাপনেই ঘাটতি ঘটত, যদিও এই ব্যাপারটি কোনো-কোনো মহলে উচিত মর্যাদা পায়নি।"

অস্ট্রেলিয়ান দর্শকদের যথারীতি নিন্দা এবং তাদের সামলাতে বোর্ডের অসামর্থ্যের বা অনিচ্ছার যথোচিত অপ্রশংসার পরে নিজ দলের প্রতি মুক্ত প্রশংসা অর্পণ করলেন জার্ডিন। 'এমন অদম্যদের অধিনায়ক হতে পেরেছি—যে-কোনো অধিনায়কের পক্ষে গৌরবের বস্তু।' 'কোনো অধিনায়ক খারাপ দলকে ভাল করতে পারে না, কিন্তু বিরাট দল সাধারণ অধিনায়ককে খানিক উপরে তুলে দিতে পারে'—জার্ডিন কৃতজ্ঞ বিনয়ে জানালেন, এবং 'উত্তম মনুষ্য ও যথার্থ বিজয়ানুরাগী'-সমন্বিত নিজ দলের মধ্যকার একটি খেলোয়াড়ের নাম মন্ত্রের মত পুনঃ পুনঃ বাজতে লাগল জয়ব্রতী জার্ডিনের মনে ও মুখে...

১৯৩৩-এ নটিংহ্যাম ও সারের ম্যাচ। সেই ম্যাচে জ্যাক হবস্ ও জার্ডিন খেলছেন। খেলার মাঝখানে মাইক্রোফোন বেজে উঠল। কুড়ি হাজার দর্শক সচকিত হয়ে শোনে জার্ডিনের কণ্ঠ ভেসে আসছে...

'ইংলণ্ড যে অ্যাশেজ পেয়েছে তার মূল কারণ—লারউড...'

জার্ডিন লারউডের হাতে একটি রূপার 'অ্যাশ-ট্রে' তুলে দিলেন, যাতে লেখা : 'অ্যাশেজের জন্য হ্যারল্ডকে। ইতি কৃতজ্ঞ স্কিপার।'

জীবনের পূর্ণতার ভরা পাত্র। অপারেশন হয়ে গেছে পায়ে। খেলা বন্ধ হবে না চিরতরে। বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন কিন্তু সে জালও ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছেন। এম-সি-সি-র বিশ্বাসভাজন অধিনায়ক জার্ডিন প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন উপহারসহ। ইংলণ্ডের সংবাদপত্র ও ক্রিকেট-রসিকেরা স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর ভূমিকার মূল্য এবং খেলোয়াড়-মহিমা। অস্ট্রেলিয়ান সফর থেকে পেয়েছেন ৮০০ পাউণ্ড, এবং নটিংহ্যামের সমর্থকদের কাছ থেকে ৪০০ পাউণ্ড উপহার। এই টাকা দিয়ে নিজের মুরগীর ব্যবসাকে

মধ্যে ধ্রুকতে না হয়, এবং—

১৯৩৩-এর মরশুমের শেষের দিকে মাঠেও নেমেছেন, যদিও বল করেননি, শুধু ব্যাটিং করেছেন...সামনে উজ্জ্বল দিনগুলি...

* * * অকস্মাৎ—প্রাণদণ্ড!!! * * *

লিফট্ নামছে সাঁ-সাঁ করে। দিনের আলোর হঠাৎ মৃত্যু। অন্ধকারের সাঁড়াশী উপড়ে নিয়েছে চোখ, পিষ্ট করেছে কণ্ঠনালী। নরকের জমাটবাঁধা আতঙ্কে নিক্ষিপ্ত হল একটি মানুষ।

এ কি হল! এ কি হল! কি হতে কি হয়ে গেল!

ভূমিগর্ভ থেকে মানুষটি উপরের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল। কারা তাকে হাত-পা বেঁধে লিফ্‌টে ঠেলে দিয়েছিল—কারা তারা? তাদের মুখ কি দেখা যাচ্ছে? না—উপরে পাষাণ আঁধার। তবু শেষ আলোকের স্মৃতি মনে আনল কয়েকটি মুখ—শত্রুর মুখ কি সেগুলি? না—একেবারে নয়—সব বন্ধুর মুখ।

বন্ধু! ব্রুটাস, তুমিও বন্ধু!

ইংরেজ মহান জাতি। অপরূপ তার বিচার-পদ্ধতি। ন্যায়বিচারের জন্য সারা পৃথিবীতে সে বিদিত-খ্যাতি। তার ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংসের দল ছলে-বলে সাম্রাজ্যস্থাপন করে। সেই সাম্রাজ্যের রক্তধারা প্রবাহিত হয়ে ইংলণ্ডের মৃত্তিকা সুজলা সুফলা হয়; নগর গড়ে ওঠে, উঁচু প্রাসাদের একটির নাম ধর্মাধিকরণ। আর একটির নাম পার্লামেণ্ট। সেই প্রাসাদগুলির অভ্যন্তরে ইংলণ্ডের বিবেক বক্তৃতা করে। বক্তৃতা করেন বার্ক। ইংলণ্ডের ন্যায়বিচার ছি-ছি করে ওঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ক্লাইভ-হেস্টিংসের দল সম্মান হারান নিজদেশে। জয়ধ্বনি ওঠে বিদেশে। ইংলণ্ডের প্রফুল্ল বিবেক আরও প্রস্তুত হয় নূতন দোষের উদ্‌ঘাটনে, নূতন অন্যায়ের প্রতিবিধানে, কেননা ইতিমধ্যে সাম্রাজ্য-শোষিত রসধারায় জাতির স্বাস্থ্য আরও ফিরেছে, তৈরি হয়েছে নূতন নগরী, নূতনতর ধর্মাধিকরণ।

লারউড ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য-সৈনিকদের অন্যতম। তিনি সখেদে লিখেছেন: "যে-কোনো আইনজ্ঞ বা পণ্ডিত-ব্যক্তি বলে দেবেন, পৃথিবীর সভ্যতায় ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠতম দান তার বিচার-পদ্ধতি। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বহির্বর্তী পাশ্চাত্ত্য-জগতের প্রতিটি দেশের কাছে এটি ঈর্ষার বস্তু। আর কোথাও মানুষ, বিশেষত দরিদ্র মানুষ, নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের এই জাতীয় প্রভূত সুযোগ পায় না। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ যাই হোক না কেন, ব্রিটিশ বিচার তাকে নির্দোষ ধরে নিয়ে অগ্রসর হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে চিরাচরিত বৃটিশ ন্যায়বিচার প্রযুক্ত হয়নি।"

ইতিমধ্যে দ্রুত ঘুরেছে চাকা। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এবার স্রষ্টাকে গ্রাস করতে উদ্যত। হিরোসিমা-নাগাসিকিতে অ্যাটম বোমা পড়ে পড়ুক, তাই বলে ইংলণ্ডে পড়বে!

ওয়েস্টইণ্ডিয়ানরা অ্যাটম বোমা ফিরিয়ে দিল ইংরেজদের। ১৯৩৩ সালে

ইংলণ্ড সফর করতে এসে মার্টিনডেল ও কনস্টানটাইন বডিলাইনের চাকা ঘুরিয়ে দিলেন সজোরে। ওয়েস্টইণ্ডিজ দলে উডফুল নামক অধিনায়ক ছিলেন না, যিনি সম্ভবক্ষেত্রেও বডিলাইন চালাতে গররাজি।

ওল্ড ট্রাফোর্ডের টেস্টে যখন বডিলাইনের সাপ হিস্-হিস্ লাফিয়ে উঠতে লাগল শরীরের উপরে, তখন বীর অধিনায়ক জার্ডিন ভয় পাননি, অধিকন্তু সেঞ্চুরি করেছিলেন, আর মার খেয়েছিলেন প্রচণ্ড। সে এমন মার যে পরের টেস্টে খেলতে নামার সাধ্য রইল না বডিলাইনের জন্মদাতার।

অসাধারণ সাহস দেখিয়েছিলেন জার্ডিন ঐ খেলায়।

কনস্টানটাইন উচ্ছাস্যের সঙ্গে বলেছেন, ঐ সাহসের সমাপ্তি অনেক আগেই হয়ে যেত যদি মাঠটি ওল্ড ট্রাফোর্ডের মতো মন্থর পিচের না হয়ে লর্ডস বা ওভালের মত দ্রুতগতি হোত।

হ্যামণ্ডও তাই বলেছেন—ওল্ড ট্রাফোর্ডের ঐ বডিলাইনের জাত ও ধাত অস্ট্রেলিয়ায় চালানো বডিলাইন থেকে অনেক আলাদা।

অধিকন্তু জার্ডিন দীর্ঘদেহ, দীর্ঘহস্ত।

ব্রাডম্যান সুস্মিতভাবে ঐসব তথ্যগুলির উল্লেখ করেছেন।

হ্যামণ্ড যখন পরে ওয়েস্টইণ্ডিজের আধা-বডিলাইনের ভয়ঙ্করতার বিষয়ে লিখেছিলেন, তখন নিশ্চয় তাঁর চিবুকের পুরনো ব্যথাটা জেগে উঠেছিল। কেননা ম্যাঞ্চেস্টার-টেস্টে তাঁর চিবুক দুফাঁক হয়ে গিয়েছিল একটা উঠতি বলের গুঁতোয়। হ্যামণ্ড বলেছিলেন, এরকম চললে তিনি প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াবেন। হ্যামণ্ড জানতেন, মানুষের প্রাণ একটিই হয়।

হবস্ও একই কথা বলেছিলেন।

যে-হবস্ লারউডকে বোলার-হিসেবে শিরোপা দিয়েছেন, যে-হবসের খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি সম্বন্ধে কারো সন্দেহের অবকাশ নেই, তিনিই বডিলাইন সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'বডিলাইন চরম বিষাক্ত জিনিস। অস্ট্রেলিয়ার মতোই ইংলণ্ডেও তা প্রাণঘাতী হবে। এ জিনিস এখনি না বন্ধ করা হলে একেবারে ক্রিকেটকেই মেরে ফেলবে।' তিনি সবিস্ময়ে বলেছিলেন, পেশাদার খেলোয়াড়েরা বডিলাইনের বিপদ বুঝছে না—কি আশ্চর্য! বডিলাইন, খেলার আকর্ষণ নষ্ট করে পরিশেষে গেটের টাকায় ঘাটতি ঘটাবেই।

হবস্ বলেছিলেন, আমি খুশি যে ওয়েস্টইণ্ডিয়ানরা ইংলণ্ডে বডিলাইন চালিয়েছিল। এর দ্বারা ইংলণ্ডের লোক বডিলাইন কাকে বলে তার কিছুটা আন্দাজ পেয়েছিল।

পরিতৃপ্তির সঙ্গে ব্রাডম্যান বীর্যবান ইংরেজদের সামনে একটি প্রশ্নের পোস্টার তুলে ধরলেন, যাতে লেখা—'Could Body-line be mastered?'

উত্তর দিলেন জ্যাক হবস্—ডব্লিউ জি গ্রেসের পরে যিনি শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ব্যাটসম্যান—বললেন—'না'।

উত্তর দিলেন হ্যামণ্ড—হবসের পরে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ব্যাটসম্যান। বললেন—'না'।

না না না—আর্তনাদ করে বলতে লাগল কাউণ্টিদলের পেশাদার খেলোয়াড়েরা; কারণ ইতিমধ্যেই ভোস, বাওয়েস, ক্লার্ক প্রভৃতি বডিলাইন চালাতে আরম্ভ করে দিয়েছেন কাউণ্টি-খেলায়। যাদের উপযুক্ত ফাস্টবোলার নেই, সেই সকল

কাউণ্টিদল সাহসের কিংবা দুঃসাহসের দর্শন ত্যাগ করে ফেলল অচিরে। অ্যাশেজের ছাই ভেদ করে বলগুলো গায়ে বিঁধতে লাগল ইংরেজদের।

লারউড যাঁর থেকে বড় হুক-মারিয়ে প্রায় দেখেননি, সেই হেনড্রেন ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে এম-সি-সি-র পক্ষে লর্ডসে যখন খেলতে নামলেন, তখন দেখা গেল, বেশ কয়েকটি কাউণ্টি-ক্যাপ একসঙ্গে চাপিয়ে তিনি রীতিমত শিরস্ত্রাণ তৈরি করে নিয়েছেন। হ্যামণ্ড লিখেছেন, এরকম করার কারণ, কয়েক-দিন আগে লারউডের বল তাঁর কান ছুঁয়ে কিছু প্রেমের বার্তা বলে গিয়েছিল। ব্রাডম্যান আবার হাসলেন। বড়-বড় ইংরেজ রথী, মহারথীরা বলেছেন যে, 'সত্যিকারের' বডিলাইন এক লারউড ছাড়া কেউ দিতে সমর্থ নয়। পায়ের হাড় ভেঙে লারউড যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখন 'মিথ্যেকারের' বডিলাইনে ইংরেজ-বীরগণের এই দুর্দশা! একেবারে খেলা ছেড়ে দেব! কিংবা আপাদমস্তক বর্মাবৃত হয়ে মাঠে অবতরণ!!

ব্রাডম্যান খেলা ছেড়ে দেব বলেননি। তিনি খেলতে চেয়েছিলেন, তাই খেলা নষ্ট করে দিতে চায় এমন জিনিসের অপসারণ চেয়েছিলেন।

কিন্তু এম-সি-সি অনমনীয়। অস্ট্রেলিয়া যতই চেষ্টা করুক, আইনের বদল অত সহজে হয় না। আইন ও শৃঙ্খলা—এই নিয়ে ব্রিটিশশাসনের ভিত্তি। যদি কেউ মনে করে, শৃঙ্খলা নষ্ট করে দিলেই আইন বদল করাতে পারবে, সে ভুল করেছে। সেখানে ইংরেজ শৃঙ্খলারক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করবে আইনের সম্মান-রক্ষার জন্য। একথা আগেই এম-সি-সি বেশ বুঝিয়ে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডকে, যখন বোর্ডের হঠকারী টেলিগ্রামের কঠোর প্রত্যুত্তর সে দিয়েছিল। তবে ঐ প্রত্যুত্তরে একথাও ছিল যে, অস্ট্রেলিয়া প্রস্তাব করুক, উপযুক্ত সময়ে তার উচিত বিবেচনা হবে।

অ্যাশেজ ফিরিয়ে আনার পরে উপযুক্ত সময়ে এম-সি-সি তার উচিত-বিবেচনার সভা বসাল ১৯৩৩-এর মে মাসে। একটি সাবকমিটি নিযুক্ত হল ব্যাপারটি সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবার জন্য। জার্ডিনকে ডাকা হল বিবরণ দিতে এবং প্যালা-রেটকে, এবং পেলহ্যাম ওয়ার্নারকে এবং সম্ভবত হ্যামণ্ড ওয়াট প্রমুখ কয়েক-জন প্রধান খেলোয়াড়কে। জার্ডিন ও প্যালারেট বডিলাইনের পক্ষে বললেন। ওয়ার্নার বললেন বিপক্ষে।

অস্ট্রেলিয়া এপ্রিল মাসের মধ্যেই বডিলাইনের বিরুদ্ধে আইন পাস করে ফেলল, যে-আইন অবশ্য শুধু অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে। তাতে বলা হল: যদি আম্পায়ারের মনে হয় কোনো বোলার ইচ্ছে করে ব্যাটসম্যানকে ভয় দেখাতে বা আঘাত করতে বল করছে, তাহলে তার বোলিং তিনি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেবার অধিকারী।

অস্ট্রেলিয়া তার প্রতিলিপি অবিলম্বে পাঠিয়ে দিল এম-সি-সি-র বিবেচনার জন্য।

অস্ট্রেলিয়া আরও নানাভাবে বডিলাইন-বন্ধের চেষ্টা করতে লাগল। অস্ট্রে-লিয়ার সামনে ১৯৩৪-এর ইংলণ্ড সফর। তার আগেই যাতে বডিলাইন নাগ-পাশে বাঁধা পড়ে দেখা দরকার। ব্রাডম্যান তাগিদ দিতে লাগলেন। ১৯৩৩-এর

অগস্ট মাসে লেখা এক প্রবন্ধে তিনি ধারালোভাবে জানালেন, বডিলাইনের মধুর সঙ্গীত শেষপর্যন্ত শুনতে হয় খেলোয়াড়দেরই—কর্মকর্তাদের নয়।

ব্রাডম্যানের এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজনে বোর্ডের চাপ বাড়তে লাগল। এম-সি-সি কিন্তু অটল। ওয়েস্টইণ্ডিজের হাতে নিজেদের খেলোয়াড়দের দুর্দশা দেখে, এবং তাদের কারো-কারো হুমকি শুনেও, এম-সি-সি নির্বিকার। আইন অত সহজে বদলায় না।

সময় বয়ে যাচ্ছে, ১৯৩৪-এর সফর এসে গেল প্রায়, অথচ এম-সি-সি-র সাড়া নেই, ফলে অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড উত্যক্ত ও অধৈর্য। লোক আর চিঠি ছোটাছুটি করতে লাগল দ্রুতবেগে। অস্ট্রেলিয়ার প্রতিশ্রুতি চাই-ই—১৯৩৪-এর সফরের আগে।

অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধি ডাঃ রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড এম-সি-সি-র কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন—প্রায় ডনবৈঠক—কথার ও বুদ্ধির। এম-সি-সি জানালেন—আমরা কী করব না করব, তা আগে থেকে বলব না, অস্ট্রেলিয়া আসুক, তারপর দেখা যাবে।

আ-হা-হা—সিদ্ধান্তটি যে জানা চাই অস্ট্রেলিয়ান দল-নির্বাচনের আগেই—ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড নাছোড়।

কেন?—এম-সি-সি-র সবিস্ময় প্রশ্ন।

বা-রে, জানতে চাইব না? যদি আপনারা বডিলাইন বন্ধ করতে রাজি না হন, তাহলে তো আমাদের কিছু বেশিসংখ্যায় ফাস্টবোলার আনতে হয়!

বাই ঘাড্!—প্রতিশোধ!!—লর্ড হক আঁতকে উঠলেন।

না না, প্রতিশোধ কেন?—মিষ্টি করে ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড জানালেন—এই-ই পারস্পরিক আদান-প্রদান, অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যাকে বলে, তাই আর কি!

এম-সি-সি বলল, বোর্ড যদি দল না পাঠায়, ব্যাপারটা দুঃখজনক হবে, কিন্তু আমরা কিছুতে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না যে, পূর্বে যে-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, তা করা হবে না। তাছাড়া ঐ বডিলাইন কথাটা মানি না, ওটা লেগ-থিয়োরি ছাড়া কিছু নয়।

তাই বলে কি এম-সি-সি ক্রিকেটের নামে মানুষ-খুন ভালবাসে? কদাপি নয়। তাই ১৯৩৩-এর নভেম্বরে সে আইন করল: যদি ব্যাটসম্যানের উপর সোজা আক্রমণ করা হয়, সেটা বেআইনী, তবে তেমন কিছু অসৎ কাজ বোলার করছে কিনা নির্ণয়ের ভার আম্পায়ারের নয়, ক্যাপ্টেনের। 'ভয় দেখানো বোলিং' বিষয়ে এম-সি-সি কিছু বলতে রাজি হল না।

এই আইন করার সময়ে লারউডের বিরুদ্ধে কোনোই অভিযোগ করল না এম-সি-সি।

এম-সি-সি'র অনমনীয় দৃঢ়তায় যখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটল, অর্থাৎ সফর বন্ধ হবার মুখে, তখন অস্ট্রেলিয়া পূর্ব অভ্যাসে নত হল। প্রতিশ্রুতি ছাড়াই অগত্যা সে সফরে রাজি। কিন্তু অতি সামান্য সংখ্যাধিক্যের জোরে অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

এম-সি-সি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল বোর্ডকে—ক্রিকেটের আইন তৈরি করে সে-ই, এবং করবেও সে-ই নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী, কারো চাপের দ্বারা

চালিত হয়ে নয়।

লারউড স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন—ভাগ্য, ক্রিকেটের মহাভাগ্য, আইন-তৈরির ভার আছে এম-সি-সি-র হাতে, অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডের হাতে নয়।

তারপর ১৯৩৪ মরশুম...

স্যার জুলিয়েন কাহ্ন-এর কথা পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে। তিনি লারউডের ক্লাবের বড়কর্তা এবং এম সি-সি-র অন্যতম কর্তা। বডিলাইন-সিরিজের সময়ে যখন লারউডের নিন্দারবে অস্ট্রেলিয়া পূর্ণ, তখন তিনি সজোরে বলেছিলেন, আমার দলের খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে কোনো বাজে কথা শুনতে চাই না। মানুষটি বেশ মুরুব্বী আর ধনী ব্যবসায়ী, রোলস রয়েস চড়ে ঘুরে বেড়ান, দাক্ষিণ্য বিতরণ করেন হিসেব মতো।

স্যার জুলিয়েনের বাড়ির বাগানে একটি খেলা হচ্ছে, লারউড খেলছেন, খেলার মধ্যে খবর এল, লারউড যেন স্যার জুলিয়েনের সঙ্গে একবার দেখা করে আসেন।

লারউড হাজির হলে এধার-ওধার খানিক কথা চালিয়ে তিনি বললেন—'হ্যারল্ড—'

শুনেই চমকে গেলেন লারউড—এত খাতির! কি ব্যাপার! বড়কর্তা তো লারউড বলেই ডাকেন, এখন আবার শুভ-নামে ডাকা কেন?

'হ্যারল্ড, আমার আশঙ্কা হয় তোমাকে এম-সি-সি-র কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।'

'ক্ষমা—সে কি স্যার—কিসের জন্য?'

'তোমার বোলিংয়ের জন্য, হ্যারল্ড।'

লারউড আকাশ থেকে পড়লেন। হঠাৎ একি কথা! যে-অপরাধ ঘটেছে বলে এম-সি-সি স্বীকার করে না, সেই অপরাধের জন্য সে ক্ষমা দাবি করে!!

'স্যার, ক্ষমা চাইবার মতো তো আমি কিছু করিনি!'

'আঃ—হ্যারল্ড! ক্ষমা তোমাকে চাইতেই হবে। তোমার বোলিংয়ের জন্য এম-সি-সি-র কাছে ত্রুটি স্বীকার করে বলতে হবে, ভবিষ্যতে তুমি আইন-সম্মতভাবে বল করবে। তা যদি করো, তবেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে তুমি জায়গা পাবে। কিন্তু যদি এ-বিষয়ে তোমার সম্মতি না পাই, তাহলে ভয় হয়, তোমার বিষয় বিবেচনাই করা হবে না!'

লারউডের সামনে প্যাক দিয়ে ঘুরতে লাগল সারা পৃথিবী। নিজের কানকে তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না যেন। কী শুনছেন! পৃথিবীতে ন্যায়-ধর্ম-বিবেক সব রসাতলে গিয়েছে!

না, এখনো যায়নি তা। এখনো আত্মমর্যাদা আছে কোথাও-কোথাও। বড় জায়গায় না থাকলে ছোট জায়গায় আছে।

সামলে নিয়ে লারউড বললেন—'আমি ইং-রে-জ—আমি কখনো ক্ষমা চাইব না।'

স্যার জুলিয়েন কাহ্ন-এর মুখ সরে গেল। সেই মুখ আবার ফুটে উঠল অন্যত্র। স্যার জুলিয়েন নটিংহ্যামের কর্তা, আর ল্যাঙ্কাশায়ারের কর্তার নাম টি এ হিগসন। নটিংহ্যাম ও ল্যাঙ্কাশায়ার প্রতিদ্বন্দ্বী কাউন্টি-দল। কিন্তু

পর্দার আড়ালে কর্তায়-কর্তায় হাত বাঁধা।

নটিংহ্যাম ও ল্যাঙ্কাশায়ারের মধ্যে খেলা ওল্ড ট্রাফোর্ডে। খেলার আগে নটিংহ্যামের ক্যাপ্টেন আর্থার কার লারউড ও ভোসকে ডেকে নিয়ে বললেন—'এই খেলায় কি ঘটবে জানি না, কিন্তু একটা প্রতিবাদ করা হবেই।'

'প্রতিবাদ? কিসের?'—লারউড জিজ্ঞাসা করেন।

'তোমার এবং ভোসের বিরুদ্ধে'—কার জানান।

'কী-ই-ই'—দুজনে একসঙ্গে চীৎকার করে ওঠেন।

'হ্যাঁ'—কার জানান—'ভিতর থেকে খবর পেয়েছি, প্রতিবাদ করা হবেই।'

'তাহলে আর খেলে কি হবে—আমি সরে দাঁড়াই'।—লারউড বলেন।

'না, তুমি অবশ্যই খেলছ।'

'তাহলে আমি আধা-জোরে বল করব।'

'তোমার যা অভিরুচি, হ্যারল্ড।'

খেলা শুরু হল। ভোস ও লারউডের বলে ডোবাডুবি, ছোটাছুটি, হুটো-পাটির প্রতিযোগিতা পড়ে গেল ল্যাঙ্কাশায়ারের খেলোয়াড়দের মধ্যে। পায়ে অপারেশনের পরে লারউডের বলে পূর্বের জোর নেই, তাছাড়া এই ম্যাচে বলও করছেন আস্তে, কারও গায়েও তাঁর বল লাগল না, যদিও ভোসের বল দু'-একবার লেগেছিল, ডাকওয়ার্থ পর্যন্ত ৫০ রান করে ফেললেন, যিনি গোল্লা ভাঙলে মস্ত কীর্তি করেছেন ধরা হয়। খেলাটা তামাশায় দাঁড়াল। কিন্তু হাসির অংশটা ছিল লারউডের নয়, অন্যের ভাগে।

পরদিন সংবাদপত্র ভর্তি করে ছাপা হল—যদি নটিংহ্যাম লেগ-থিয়োরি ছেড়ে না দেয় তাহলে ল্যাঙ্কাশায়ার ভবিষ্যতে আর খেলছে না তাদের সঙ্গে। আহত ডাকওয়ার্থের আঘাতের ছবি ছেপে কাতরোক্তি করল সংবাদপত্র।

ডাকওয়ার্থ? হাঁ ডাকওয়ার্থ। যিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে বক্তৃতা করে ফিরেছেন বডিলাইনের পক্ষে—তিনি—তিনিই তাঁর ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কারের ছবি তুলতে দিয়েছেন সযতনে।

ডাকওয়ার্থের কাছে সোজা গিয়ে লারউড কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করেন—'মতলবটা কি?'

'মতলব আবার কি? আমি কেবল তোমার বোলিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি'—ডাকওয়ার্থ বলেন।

সেইদিনই আবার ডাকওয়ার্থ লারউডের কাছে হাজির। ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রেসিডেণ্ট মিঃ হিগসন লারউডকে ডাকছেন।

'জর্জ', শোনো, যদি তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, তিনি যেন নিজে এসে দেখা করেন, তোমার মত ইয়ে-কে দিয়ে যেন ডাকতে না পাঠান'—দাঁতে দাঁত চেপে লারউড বলেন।

এই মিঃ হিগসনই লারউডকে এবং তৎসহ আরও তিনজন ফাস্টবোলারকে অস্ট্রেলিয়া-সফরের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন—ইংলণ্ড কী জাতীয় আক্রমণ-পদ্ধতি নিতে যাচ্ছে সে-বিষয়ে পূর্ণ সচেতন থেকেই।

লারউড সব জানলেন। 'হয়' কেন 'নয়' হল—তা শুনলেন। মিঃ হিগসন বা-

সার জ্বলিয়েন কাহ্ন বা ঐ জাতীয় সকলের কানের পিছনে আছে একটি হাত, বড় কঠিন হাত, যার আপাতত নাম ডোমিনিয়ন-সেক্রেটারী জে এইচ টমাস, আসল নাম রাজনীতি। রাজনীতি সক্রিয় হয়েছে এবার।

হবে না? অস্ট্রেলিয়া আর যে ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল নিতে রাজি হচ্ছে না—সর্বনাশ! একটা লারউড, একটা জার্ডিনের জন্য জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি? তা হতে পারে কখনো? লারউড, জার্ডিনেরা সাম্রাজ্যবিস্তারের সেনা ও সেনাপতি, কিন্তু তাই বলে তাদের ম্বষলধারী যদ্বপতি হতে দেওয়া যায় না।

আর্থার কার লারউডকে জানালেন: মিঃ জে এইচ টমাস স্যার জ্বলিয়েনকে বলেছেন, লারউড ক্ষমা না চাইলে তাকে যেন খেলানো না হয়।

এখন এত-যে সমস্যা, সবকিছ্বর মীমাংসা হয়ে যায় একজনকে জবাই করলে। জার্ডিনকে জবাই করা যায় না, সে হল গিয়ে 'জেণ্টেলম্যান'। মানীর মান বড় জিনিস, তাকে নষ্ট করা মানে মান্বষটাকে মেরে ফেলা। কিন্তু 'প্লেয়ারের' আবার মান-সম্মান কি? ক্লাব কি মাইনে দিয়ে সেটা কিনে রাখেনি? এখন লারউড যদি ক্ষমা চেয়ে নেয়, যদি বলে ও-ধরনের বোলিং আর করব না, তাহলে আরও একটি হাঙ্গামা দ্বর হয়। এম-সি-সি নিজের মান রাখতে বলেছে বটে, অস্ট্রে-লিয়া যেভাবে চেয়েছে, সেভাবে সে বডিলাইন-বিরোধী নিয়ম প্রবর্তন করবে না, কিন্তু সে জানে শেষ-পর্যন্ত তা তাকে করতেই হবে। সে করাটা এখনি না করে এমন এক সময়ে করলে হয়, যখন দেখানো যাবে যে, এম-সি-সি নিজেই ব্যাপারটার প্বনর্বিবেচনা করে নতুন নিয়ম করেছে। এখনকার মতো যার কাছ থেকে ভয়, তাকে সরিয়ে নিলেই অস্ট্রেলিয়া ঠাণ্ডা হবে; তারপরে—পরের কাজ পরে করলেই হবে।

তাছাড়া, ঐ পেশাদার লারউডটার এত অহঙ্কার কেন? ওর সঙ্গী-বোলার ভোস তো ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে।

এম-সি-সি কয়েক মাস পরে, ১৯৩৪ মরশ্বমের শেষে, সত্যই বডিলাইন-বিরোধী আইন করেছিল, যার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার তৈরি করা আইনের কোনোই পার্থক্য নেই।

লারউডের ঘৃণা আর অন্তর্যাতনার পরিমাণ করা কি সম্ভব? মান্বষের কী র্বপ তিনি দেখলেন! অস্ট্রেলিয়ান দর্শকেরা আধা বর্বর। আর ইংরেজ-ক্রিকেটাররা এবং ক্রীড়া-পরিচালকেরা স্বসভ্য?? সভ্যতা যে বর্বরতারই অপর নাম, লারউড শিখলেন।

একে একে চেহারাগ্বলি ফ্বটে উঠতে লাগল।

পেলহ্যাম ওয়ার্নার: মহান পেলহ্যাম ক্রিকেটের বন্দনীয় ভীষ্মদেব। তিনিই নাকি প্রথম বডিলাইনের প্রতিবাদ করেছেন। সে বিষয়ে ব্রাডম্যান লিখেছেন: "স্যার পেলহ্যাম ওয়ার্নার, আমি যতদ্বর জানি, প্রথম ব্যক্তি যিনি লিখিতভাবে বডিলাইনের প্রতিবাদ করেছেন,* যদিও বডিলাইন শব্দটা তখনো চলিত হয়নি।

*স্যার পেলহ্যাম তাঁর আত্মজীবনী Long Innings-এর মধ্যে দাবি করেছেন,

ওভাল মাঠে ইয়র্কশায়ারের ও সারের একটি খেলার বিষয়ে লণ্ডনের মর্নিংপোস্টে ১৯৩২, ২২শে অগস্ট তিনি লেখেন, 'বাওয়েসকে নিজের রীতি বদলাতেই হবে। বাওয়েস লেগের দিকে পাঁচজন লোক দাঁড় করিয়ে বেশ কয়েকটি ধাপানো বল ছেড়েছিলেন, যেগুলি মাথা-সমান বা আরও উঁচুতে লাফিয়ে উঠেছিল। এটা ভদ্র বোলিং নয়। এটা ক্রিকেটই নয়। যদি সকল ফাস্টবোলার তাঁর পদ্ধতি নেন, তাহলে এম-সি-সি-কে এগিয়ে এসে হস্তক্ষেপ করতে এবং যে-বোলার মাঝমাঠে ধাপিয়ে এই জাতীয় বল ছাড়ে তার বিরুদ্ধে শাস্তি-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হবে।"

ব্রাডম্যান যখন এই কথা লিখেছেন, তখন তিনি ব্যাজস্তুতির পরম দৃষ্টান্ত রেখেছেন, কারণ এই সুমহান পেলহ্যাম ওয়ার্নারই ঐ বস্তু লেখার পরে চার-জন ফাস্টবোলার সমৃদ্ধ এম-সি-সি'র অস্ট্রেলিয়া-গমনে সহযাত্রী হন, ম্যানেজার-রূপে। যিনি ১৯৩২ সালের অগস্ট মাসে বাওয়েসের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে এম-সি-সি'র আইন করার প্রয়োজন হবে বলে জানালেন, কয়েক মাস পরে যখন লারউডের ঐ জাতীয় ভয়ঙ্করতম বোলিং চলল অস্ট্রেলিয়ায়, তখন তিনি নিশ্চয় এমন কোনো বার্তা পাঠাননি এম-সি-সি'র কাছে, যার দ্বারা নিজ খেলোয়াড়দের খেলোয়াড়ী মনোভাবের বিষয়ে এম-সি-সি'র আত্মতৃপ্তি চোট খেতে পারে।

লারউড পেলহ্যাম ওয়ার্নারকে ক্ষমা করেননি। ঘৃণা করেছেন। 'উইসডেন' পেলহ্যামের মৃত্যুর পরে তাঁর বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধে বডিলাইন-বিরোধিতা সম্বন্ধে তাঁর ভূমিকাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। লারউড কঠোর বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন, 'উইসডেন শুধু একটি কথা লেখেনি—পেলহ্যাম ওয়ার্নার অবশ্যই ১৯১০ থেকে বডিলাইনের প্রতিবাদ করে আসছেন, শুধু করেননি ১৯৩২-৩৩-এ অস্ট্রেলিয়ায়, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে।'

লারউড মুখোস টান দিয়ে লিখলেন: "আমার মতে এ-ব্যাপারে আর একজন লোক ছিলেন, যাঁর নাম সাধারণতঃ আলোচনার বাইরে রাখা হয়, কিন্তু অস্ট্রে-লিয়ার বিরুদ্ধে বডিলাইন প্রয়োগে যাঁর ভূমিকা অন্য কারো চেয়ে কম নয়—তাঁর নাম প্লাম ওয়ার্নার। তিনি সর্বদা বাইরের লোকের মধ্যে এই মনোভাব জাগাতে চেষ্টা করতেন যে, তিনি সব সময়ে কূটনৈতিক রজ্জুর উপর দিয়ে সাবধানে চলতে বাধ্য হয়েছেন, এবং ক্যাপ্টেনের উপর তাঁর কোনোই প্রভাব ছিলনা। কিন্তু বডিলাইনের সঙ্গে আমি যতটুকু সংশ্লিষ্ট সে-বিষয়ে বলতে পারি, তিনি এই সফরে বডিলাইনের বিরুদ্ধে এতটুকু প্রতিবাদ করেননি। মর্যাদাসম্পন্ন, অতি অমায়িক, ভদ্র ইংরেজোচিত তাঁর আচরণের পিছনে ছিল কূট মস্তিষ্ক এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, যা স্বদলের পক্ষে কোনো সুবিধা আদায়েই

তিনি সব সময়েই বডিলাইনের বিরোধী। তিনি বলেন, বডিলাইন জার্ডিনের পূর্বেও দেখা গিয়েছিল, যেমন ইংলণ্ডে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দেই, যখন অতি দ্রুত বোলার ডবলিউ বি বার্নস উরস্টার্সশায়ারের হয়ে মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে লর্ডস-মাঠে এই পদ্ধতি চালান। তারপর বেশ কয়েকবার এ-জিনিস চালানো হয়। জার্ডিনের বয়স যখন ১০ বছর, তখন থেকেই স্যার পেলহ্যাম এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি করে এসেছেন।

কুণ্ঠিত নয়। এই সেই ওয়ার্নার, যিনি ১৯০৪ সালে সিডনি টেস্টম্যাচে টসে জিতবার পরে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে একজন বোলারকে সরিয়ে ব্যাটসম্যান এ ই নাইটকে দলভুক্ত করেন, যার জন্য বাধ্য হয়ে আইনের বদল করতে হল।— পরে আইন হয় যে, টসের পূর্বে অধিনায়কদের লিখিতভাবে দলের খেলোয়াড়দের নাম বিনিময় করতে হবে।"

এই পেলহ্যাম ওয়ার্নারই, লারউডের মনে পড়ে যায়, ফিঙ্গলটনের বিরুদ্ধে লারউডকে প্ররোচিত করেছিলেন।

হ্যামন্ড : বডিলাইনের বিরুদ্ধে পরে খুবই মুক্ত-কণ্ঠ। কিন্তু উডফুল যখন আঘাত পেলেন এবং দর্শকেরা লারউডের আদ্যশ্রাদ্ধ করতে লাগল, তখন লারউডকে ইনিই উৎসাহিত করেছিলেন। পরে বলেছেন, অফিশিয়ালি বডিলাইনের প্রতিবাদ করেননি। করেননি কেন? কোন স্বার্থে?

ডাকওয়ার্থ : মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সামান্য লোক। প্রয়োজনে এদের নীতিহীন ও স্বার্থপর হতেই হয়।

ভোস্ : সঙ্গী আমার। ক্ষমা চেয়েছে। ভালই করেছে। বুদ্ধিমান। বাড়াবাড়ি আত্মসম্মান নেই। সামান্য ক্ষমা চাওয়াটুকু সবাই ভুলে যাবে, কিন্তু হাজার-হাজার লোক খাতির করে দেখবে টেস্টখেলা। তার দাম কম নয়।

অন্যান্য খেলোয়াড় : মরিস টেট সত্যই বডিলাইন-বিরোধী, কিন্তু বডিলাইন যেমন অনেক অস্ট্রেলিয়ানের খেলা শেষ করেছে, তেমনি ইংরেজ টেটেরও করেছে, এও সত্য। পাতৌদির জার্ডিন-বিরোধিতার পিছনেও আছে দলে ঠাঁই না পাওয়ার জন্য বিরক্তি। এই রকম আরও কয়েকজন।

অ্যালান ও সহাধিনায়ক বব ওয়াট সত্যই বডিলাইন-বিরোধী। অস্ট্রেলিয়া-জাত অ্যালান জার্ডিনের কাছে খোলাখুলি আপত্তি করেছিলেন। বব ওয়াট বডিলাইন পছন্দ করতেন না, এও দলের খেলোয়াড়দের জানা ছিল।* এই দুই জনের বিরুদ্ধে লারউডের কোনো ব্যক্তব্য নেই।

কিন্তু লারউড তবু এ-কথা মনে না করে পারলেন না যে, অ্যাশেজ-জয়ের যখন প্রশ্ন উঠল, তখন সকল সদস্যই একবাক্যে জার্ডিনের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছিলেন।

লারউডের কাছে সত্যকারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে এম-সি-সি—যার প্রতীক-চরিত্র পেলহ্যাম ওয়ার্নার—যা গঠিত হয়েছে স্যার জুলিয়েন বা মিঃ হিগসনদের নিয়ে। লারউডের চোখের সামনে ভেসে ওঠে পরপর :

—এম-সি-সি চারজন ফাস্টবোলার পাঠাল, অস্ট্রেলিয়াকে, বিশেষত চক্ষুশূল ব্রাডম্যানকে উড়িয়ে দেবার অভিপ্রায়ে।

—এম-সি-সি কঠোর প্রত্যুত্তর দিলে অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডকে, যারা ইংলণ্ড দলের খেলোয়াড়ী মনোভাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল।

—এম-সি-সি স্বীকারই করল না বডিলাইন বলে কিছু আছে।

* বিস্ময়ের কথা, বব ওয়াট পরে গ্রন্থ রচনাকালে বডিলাইনের বিরুদ্ধে হ্যামণ্ডের মতো খোলাখুলি আপত্তি করেননি। বরং তিনি যতখানি পারা যায় চুনকামের চেষ্টা

- অস্ট্রেলিয়া চাপ দেওয়া সত্ত্বেও এম-সি-সি অস্ট্রেলিয়ার অনুরূপ আইন করল না; সামান্য যেটুকু করল, তার মধ্যে লারউডের বিরুদ্ধে কটাক্ষ নেই।

—দল আসবে না বলে যখন অস্ট্রেলিয়া হুমকি দিল, এম-সি-সি এতটুকু নত হল না।

—সেই এম-সি-সিই আবার বডিলাইন-প্রশ্ন বিবেচনার জন্য যখন সাক্ষী দিতে নানা জনকে আহ্বান করল, তার মধ্যে লারউডের নাম ছিল না।

'মূল সাক্ষীকেই উপস্থিত হ'তে বলা হয়নি'—লারউড লিখেছেন।

অসহ্য বেদনা ও জ্বালার সঙ্গে লারউড স্মরণ করেন, এম-সি-সি-র পাঠানো তারগুলির কথা। তিনটি তার লারউড পেয়েছিলেন, সব কটির তলায় 'মেরিলীবোন' লেখা। প্রথম টেস্টের পরে প্রথম তার- 'চমৎকার বোলিং করেছ, ওহে নটিংহ্যাম!' দ্বিতীয় তার ব্রিসবেন টেস্টের মধ্যে—'চমৎকার বোলিং! অভিনন্দন!' তৃতীয় তার শেষ টেস্টের মধ্যে—'ব্র্যাভো!'

গলিত সীসার মতো কথাগুলো, লারউডের মনে হয়।

হাহাকার করেন লারউড। ইংলণ্ডের জন্য আমি কি করিনি? আমার অধিনায়কের জন্য আমি কি করিনি? যখন স্যার জুলিয়েন ক্ষমা চাইবার কথা বলেছিলেন, তখন লারউডের সমস্ত শরীর ঘুলিয়ে উঠেছিল। বেদনার মোচড়ে অস্থির হয়েছিলেন। মনে পড়ে গিয়েছিল, অস্ট্রেলিয়ায় কিভাবে সর্বশেষ শক্তি দিয়ে বল করেছেন, শরীরের পাশ নিদারুণ কন্-কন্ করেছে, তবু বল করেছেন —পায়ের ডগা দিয়ে রক্ত পড়ছে, তবু বল করেছেন—এত পরিশ্রম হয়েছে যে গলা দিয়ে খাবার নামতে চায়নি- একটানা বল দিয়ে-দিয়ে যখন প্রায় মূর্ছিত হবার মুখে, তখনো জার্ডিন এসে বলেছেন, 'আর একবার চেষ্টা করো হ্যারল্ড' —তখনি আবার হাপরের মত শ্বাস টেনে ছুটেছেন...

ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে অভিমানে লারউডের মন থম্-থমে, জার্ডিনই তো আমাকে ক্ষয় করে দিয়েছিলেন, যদি শেষ টেস্টে ওভাবে পীড়ন না করতেন

না, জার্ডিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ধরে রাখতে পারেন না লারউড। অমন শক্ত না হলে জার্ডিনের পক্ষে শৃঙ্খলা রাখা সম্ভব হত না। তাছাড়া জার্ডিন কৃতজ্ঞতা ঘোষণায় অকুণ্ঠ, এবং জার্ডিন যেমন বডিলাইনের বিরুদ্ধে খেলার সময়ে একচুল বিচলিত হননি, তেমনি নিজের গৃহীত রীতির মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন অধিনায়কত্ব থেকে। জার্ডিন জেণ্টেলম্যান নিশ্চয়ই।

কিন্তু এম-সি-সি-ও কি তাই?

"তারপর রাজনৈতিক ঝড় উঠল। যে-সব জেণ্টেলম্যানেরা আমাকে 'ব্র্যাভো' পাঠিয়েছিলেন, তাঁরাই আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। আমার নিজের ক্লাবও। নির্ভেজাল পরিশ্রম করে যে-লোক নিজের বুক চিরে বল দিয়েছিল, তাকে সাম্রাজ্যের বন্ধনরক্ষার জন্য বলি দেওয়া হল। তার গর্ব সে কিন্তু রক্ষা করেছিল।

"যখন বুদ্‌বুদ্ ফাটল, তখন কোনো খেলোয়াড়কে ফাঁসানো সম্ভব হয়নি— না, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়...

—নিয়েছিলুম নিজের গায়ে তুলে। এস্‌ট্যাবলিশমেণ্টকে কেউ হারাতে পারে না। আমার নামের উপরে রয়ে গেল কালো ছায়া।"

পুনশ্চ: "রাজনীতিকেরা অতি ব্যস্ত তখন। আমি তা জানতাম না। হোয়াইট হলে ডোমিনিয়ান-সেক্রেটারি জে এইচ টমাস এম-সি-সি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। সবকিছুই পর্দার পিছনে। সাম্রাজ্যের ফাটলকে জোড়া দিতে এবং অস্ট্রেলিয়ার সরব প্রতিবাদকে পরিতুষ্ট করতে একটি বলির পশু চাই।"

লারউডের মনে পড়ল একটি চিঠির কথা। অস্ট্রেলিয়ায় যে শত-শত গালি-গালাজে ভর্তি চিঠি পেয়েছিলেন তেমন একটি চিঠি। তারই শেষ বাক্য:

The hangman's name is Larwood.

জল্লাদের নাম লারউড।

কথাটা লারউড কখনো ভোলেননি। এখন বিশেষ করে মনে পড়তে লাগল। ব্যথা ফেনিয়ে উঠল—

"আমার হৃদয়ের গভীরে আমি অনুভব করলাম, সমস্ত ঝঞ্ঝাটের নিন্দা আমাকেই বহন করতে হবে। আমার তা করার কথা নয়, আমি জানতাম, কিন্তু আমার অবস্থা ঐ জল্লাদের অবস্থার মতোই। যদি বিচারপতি কাউকে ফাঁসি দিতে বলেন, তাকে তা দিতে হবে।

"মানুষটির মৃত্যুর দায়িত্ব জল্লাদকেই নিতে হবে।"

আর লারউডের মনে পড়ল, অস্ট্রেলিয়ায় পঞ্চম টেস্টের শেষে প্রত্যাবর্তন, ভাঙা পা টেনে-টেনে, ব্রাডম্যানের পাশাপাশি। সেদিন বোঝেননি, কিন্তু পরে বুঝলেন—সেই মুহূর্তে লারউড নামে যে ফিরছিল, সে মৃত এক মানুষ।

I had died with my boots on.

খেলার সাজে মরণ আমার।

❊ ❊ ❊ সুতরাং জীবন্ত সমাধি ❊ ❊ ❊

নিজের দীপ নিজে নিভিয়ে দিলেন লারউড—খনির অন্ধকারের ছেলে আমি, ক্রিকেটের আলোর জন্য তো অনেক লড়াই করলাম, জানতাম না ক্রিকেট এত কালো, এবার ফিরে যাওয়াই ভাল—লারউড ভাবলেন। তবে একেবারে খনির চাকরিতে যাতে ফিরতে না হয়, তার জন্য ক্রিকেটের চাকরিটুকু রাখলেন। কিন্তু মিথ্যে আলোর উপর যবনিকাপাত হোক।

লারউড আর অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট খেলবেন না, খেলতে ইচ্ছে নেই তাঁর —জানালেন।

লারউড অনুভব করলেন, ইংলণ্ডে জেণ্টলম্যানের সংখ্যা অল্প। তারা সবচেয়ে অল্প ক্রিকেটের 'জেণ্টলম্যান'দের মধ্যে। অনুভব করলেন যে, কিছু জেণ্টলম্যান আছে পেশাদারদের মধ্যে। অন্তত নিজের মধ্যে—যে এখনো পর্যন্ত রাজনৈতিক স্বার্থের পেশাদার হয়নি।

লারউডের 'শেষ বিতর্কমূলক ভয়ঙ্কর বলটি' ছুটে গেল সংবাদপত্রের উপর দিয়ে। ১৯৩৪-এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে [illegible]

বিবৃতিটি বেরুল।

স্যার জুলিয়েনের সতর্কবাণী-অনুযায়ী অমনোনয়নের অপমান এড়াবার জন্য লারউড স্বেচ্ছায় অসুস্থ হয়েছিলেন প্রথম টেস্টে। ভেবেছিলেন, সে অসুখ কিছু ব্যস্ত করবে কর্তৃপক্ষকে। কর্তৃপক্ষ অপরপক্ষে তাঁর অসুখের সুখে মগ্ন রইলেন। লারউড দেখলেন, বেনামা অসুখ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বেশিদিন। তার থেকে লর্ডসের সামনে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যাই ভালো। একটি চিঠি লিখে-ছিলেন 'আত্মহত্যার পূর্বে!' যাতে লেখা রইল, আমার মৃত্যুর জন্য লর্ডসের রাজনীতিই দায়ী।

সানডে ডেসপ্যাচ-এ ১৭ই জুন, ১৯৩৪ তারিখে লারউড ভবিষ্যতে কোনো টেস্টে খেলতে অস্বীকার করার কারণ ব্যাখ্যায় লিখলেন:

"আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আর কখনো অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলছি না। লর্ডসের কর্তাদের কারো-কারো স্মৃতি বড়ই দুর্বল। দু' বছর আগে উড-ফুল বলেছিলেন—'দুটি দল খেলছে, তার মধ্যে একটি দল ক্রিকেট খেলছে না'—সেকথা তিনি ফিরিয়ে নেননি। কথাগুলি মিঃ জার্ডিন ও আমার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ! লেগ-থিয়োরি সম্বন্ধে আমার কোনো অনুতাপ নেই। লেগ-থিয়োরিকে চাপা দেবার জন 'ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়', 'আরে চুপ আরে চুপ' চলেছে বিশেষভাবে, এবং সেইসঙ্গে 'অসাধু ও মারাত্মক বোলার'—এই ছাপটি আমার গায়ে মেরে দেবার চেষ্টা।"

ঐ বিবৃতিতে লারউড ক্রিকেট-মঞ্চের পিছনে বসে-থাকা রাজনীতিকদের সামনের পর্দা ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। পাদপ্রদীপের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে বিভ্রান্ত ও বিরক্ত কর্তারা কড়া গলায় বললেন, লারউডের সব কথা বাজে, মিথ্যে, রাজনীতি কদাপি হাত বাড়ায়নি মাঠের দিকে। ভাইকাউণ্ট হেলসহ্যাম ও মিঃ জে এইচ টমাস প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ।

অনেক বছর পর মিঃ টমাস বলবেন—এই ক্রিকেট ব্যাপারটা ঐ সময়ে তাঁকে এতই ব্যস্ত ও বিব্রত করেছিল যে, সে রকম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তাঁকে বড়-বড় রাজ-নৈতিক ব্যাপারেও হতে হয়নি।

রাজনীতি প্রথম হাত বাড়ায় সত্যের দিকে।

টেস্ট থেকে লারউডের স্বেচ্ছাবসরে অবশ্যই চাঞ্চল্য ঘটেছিল। আর একজন জেণ্টেলম্যান, লারউডের দলের অধিনায়ক আর্থার কার, লারউডের পক্ষসমর্থন করলেন প্রকাশ্য বিবৃতিযোগে। 'লারউড খেলতে অস্বীকার করে ভালই করেছেন'—কার লিখলেন—'যখন খেলার শাসকেরা তাঁকে এমনভাবে বর্জন করেছেন।' এর সঙ্গে যোগ করে দিলেন: লারউডের বোলিং-পদ্ধতির উপরে তিনি হাত দেননি অতীতে, দেবেনও না ভবিষ্যতে।

আর্থার কার চুপ করে থাকতে পারতেন। কিন্তু সত্যের পক্ষে মুখ খুললেন। তাই দেখে গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ করলেন লারউড। আবার তিনি গভীর বেদনা পেলেন যখন দেখলেন, তাঁর জন্যই কারের ক্রিকেট-জীবনে যবনিকাপাত হল। এই ব্যক্তি, নটিংহ্যাম-কাউণ্টির ক্রিকেটের জন্য জীবনপাত করেছেন, তাঁকে অধিনায়কত্ব থেকে বরখাস্ত করে দিল কাউণ্টি-কর্তৃপক্ষ—শুধু একটি চিঠির [illegible] একটি চিঠি [illegible]

দরকার নেই'—আর বেশি কিছু নয়!

বহু চিঠি এবং সহানুভূতি-বচন পেলেন লারউড। কার্টুন আঁকা হল: ডোমিনিয়ান-সেক্রেটারি মিঃ টমাস খবরের কাগজ ধরে আছেন, তাতে হেডলাইন—'ইংলণ্ড মেরে উড়িয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে—মরণ আঘাত হেনেছেন ভেরিটি।' ভেরিটি সলজ্জ কিশোরীর মতো মুখ করে বলছেন—হাঁ, মিছে বলি কি করে, কাজটা, ইয়ে, করে ফেলেছি।

ভেরিটি, পাঠকগণ নিশ্চয় জানেন, অতি ধীর বোলার।

লারউড যেসব চিঠি পেলেন, তার একটিতে লেখা ছিল, এখন থেকে উডফুল ব্রাডম্যানের দল মার্বেল খেলুক, তুমি বন্দুক হাতে নিয়ে সরে যাও।

ট্রাম্পার ও ব্রাডম্যানের মধ্যবর্তীকালে সর্বাধিক বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান ওয়ারেন ব্রাডস্‌লি লারউডকে সমসাময়িককালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফাস্টবোলার বলে অভিহিত করে লিখলেন, লারউড খাঁটি আইন-অনুযায়ীই বল করছেন, কারণ মাঠে যথেচ্ছ ফিল্ডিং সাজানোর আইনসঙ্গত অধিকার বোলারের আছে। লারউডের বিরুদ্ধে সমস্ত আন্দোলনের মূলে তাঁর নৈপুণ্য—তিনি বললেন।

সবই হল, কিন্তু লারউড মনের ভিতরে জানলেন, তিনি হেরে গেছেন। ইংলণ্ড ব্যস্ত ব্রাডম্যানের ব্যাটের মার দেখবার জন্য, মোটেই আগ্রহী নয় ব্রাডম্যানের উপর লারউডের বলের মার দেখতে। অস্ট্রেলিয়া হাজির হলে অভ্যর্থনার ছড়াছড়ি। 'জনসাধারণ স্পষ্টতই ক্রিকেট দেখতে চাইছিল'—ইংলণ্ডের এই সময়ের মনোভাবের বিষয়ে ব্রাডম্যান লিখেছেন।

'ক্রিকেট—হাঁ ক্রিকেট হচ্ছে ব্যাটসম্যানের খেলা। কি বলো?'—লারউডের বিষাদতিক্ত জিজ্ঞাসা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে খেলব না, এই কথা বলা কি হঠকারিতা হয়নি? লারউড কি বিনা চিন্তায় সেকথা বলেছিলেন? ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছিল, এই অপমানের জ্বালায় ঐ উদ্‌গিরণ—শুধুই তাই? বোধহয় নয়। লারউড অনেক চেষ্টা করেও তাঁর বেদনার গোপন অংশটুকু একেবারে গোপন রাখতে পারেননি।

ব্রাডম্যান—হাঁ ব্রাডম্যান। লারউড ব্রাডম্যানের হাতে মার খেতে চাননি। লারউড বুঝেছিলেন, অপারেশনের পরে তাঁর বলের গতি কমে গিয়েছে। বডিলাইনের সম্পূর্ণ সাফল্য কখনোই সম্ভব নয় অস্বাভাবিক গতি ভিন্ন। বডিলাইন যদি মার খায়, তাহলে 'ব্রাডম্যানজিৎ' বলে যে-ইমেজ তাঁর তৈরি হয়ে উঠেছে, তা নষ্ট হয়ে যাবেই! আর ব্রাডম্যানের যা চোখ আর শরীরের ত্বরিত পটুতা, তাতে সামান্য কিছু গতিশক্তির অভাবের ক্ষেত্রে কোনো পরিত্রাণ নেই।

তার উপরে ইংলণ্ডের কর্তাদের চোখের উপরে খাঁটি বডিলাইন চালানো সম্ভব নয়। লেগ-থিয়োরির সঙ্গে বডিলাইনের পার্থক্য লারউড মুখে না বললেও মনে জানতেন। বল যে মাঝে-মাঝে ব্যাটসম্যানের পিছনে ধাওয়া করে, তা তো পরে নিজেই স্বীকার করেছেন। সে জিনিস চোখের আড়ালে করলে ভদ্র ইংরেজের আপত্তি নেই, কিন্তু চোখের উপরে! কে না জানে, পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের স্বাধীনতা যে-জাতি হরণ করেছে, তার নিজের দেশে

সর্বোচ্চ ব্যক্তি-স্বাধীনতা!

লারউড আরও দেখলেন, জার্ডিন 'রঙ্গস্থল' থেকে সরে গেছেন। বডিলাইন যেমন লারউডের বল ছাড়া সম্ভব নয়, তেমনি জার্ডিনের নেতৃত্ব ছাড়াও অসম্ভব।

লারউড স্বীকার করেছেন: 'অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টখেলার ব্যাপারে আমি দোমনা হলাম। তাদের বিরুদ্ধে খেলার অর্থ যদি এই হয় যে, মাঠের সর্বত্র ঠেঙিয়ে আমাকে পাঠানো হচ্ছে—তাহলে তাতে আমি নেই। বিশেষত গত অস্ট্রেলিয়া-সফরকালের মতো বলের জোর আমার নেই। তাদের পিচে আমি তাদের দমিয়ে নত করেছি, সেই জিনিস তারা আমাকে ইংলণ্ডে করুক, এ-জিনিস আমি চাই না, বিশেষত তারা যখন আমাকে অন্যায়কারী বলেছে।'

লারউডের বিদায়ের আসল কথাটা এইখানে আছে। এখানে ব্যক্তিগত ট্রাজেডির পূর্ণ প্রকাশ। লারউডের দুই মূর্তি। এক মূর্তিতে তিনি ব্যাটসম্যানের হাতে মার-খাওয়া বোলারের প্রতিবাদ, অন্য মূর্তিতে, যেটা তাঁর ব্যক্তিগত মূর্তি—তিনি ব্রাডম্যানের প্রতিদ্বন্দ্বী।

"কোনো-কোনো দিক দিয়ে ব্রাডম্যান ও আমার কর্মজীবন এক ধরনের। আমরা দু'জনেই সামান্য অবস্থা থেকে এসেছি, সাধারণের উপরে উঠবার অবলম্বন দু'জনের ক্ষেত্রেই ক্রিকেট, আর দু'জনে একই যুগে খ্যাতি অর্জন করেছি।"

দু'জনেরই 'শুরু' এক, কিন্তু 'সারা' এক নয়। সংঘাত হয়েছিল ভয়ঙ্কর—'দংশনক্ষত শ্যেন-বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে'—কিন্তু তবু জয় শ্যেনেরই, তার আছে নখর, আর আছে ডানা। সে অকস্মাৎ ঝাপট দিয়ে উপরে উঠতে পারে, আবার ছোঁ মেরে নামতে পারে, ভুজঙ্গের ছোবল তাকে কাবু করতে পারে না, যদি-না নাগপাশে জড়িয়ে পড়ে।

অলঙ্কারের বাহার সৃষ্টি করতে একথা বলছি না, আক্ষরিক সত্য তা। লারউডের উক্তি শুনুন:

"আমার ধারণা, বল দেবার জন্য আমি দৌড় দিতে আরম্ভ করেছি যখন, আমার তখনকার চেহারার দিকে তাকাবার সঙ্গে-সঙ্গে নিজের গোটা জীবনচ্ছবি ব্রাডম্যানের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। জাতীয় বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত তিনি। যা কখনো সম্ভব মনে করেননি, সেই পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছেন। সময়ের হিসাবে মুহূর্তের ভুল তাঁর কেরিয়ার শেষ করে দিতে পারে। আহা, ডন যদি আর একটু চিরাচরিত মনোভাব—খেলার পুরনো রীতি—বজায় রাখতেন! সে জিনিস কত না চেয়েছি—যেমন চেয়েছি, বডিলাইনের জন্য চেঁচামেচি কখনো না উঠত।"

তবু লারউডের মধ্যে যে সভ্য বিবেচক মন আছে, তা ব্যক্তিগত বিরাগের দ্বারা কখনো সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়নি। স্বীকার করেছেন, ডন সব সময়ে রান করতে চেষ্টা করেন, মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকেন না, বোলারকে সুযোগ দেন, এবং যদিও এই 'রান-যন্ত্র' বডিলাইন-সিরিজে গতি হারিয়ে ফেলেছিল অনেকটা, তবু...ঐ সিরিজের ডনের অ্যাভারেজ ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া, দু'দলের প্রধান ব্যাটসম্যানদের ঊর্ধ্বে।

ব্রাডম্যান বোধহয় একটা অলৌকিক শক্তি, তার বিরুদ্ধে লড়াই করে বীরত্ব দেখানো যায়, তাকে ব্যস্ত করা যায়, কিন্তু জেতা যায় না, এবং...অসম্ভবের চেষ্টায় ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে হয়।

ব্রাডম্যানের বিরুদ্ধে যেই দাঁড়িয়েছে, তাকেই হতমান হতে হয়েছে—দৃষ্টান্ত যথেষ্ট।

ব্রাডম্যানের মতো 'অলৌকিক' শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ লারউডের চেষ্টা ও চিন্তার মধ্যে অসঙ্গতি না এসে পারেনি। তাঁর অনেক কথাই অবুঝ, যুক্তিহীন, কিন্তু জীবনের রক্তে রঞ্জিত, তাই দারুণ সুন্দর।

যেমন লারউড লেগ-থিয়োরি ও বডিলাইনের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেননি। সত্যই কি দেখেননি? যদি না দেখলেন তো জার্ডিনের 'লেগ-থিয়োরি' শব্দটিকে যথেষ্ট মনে না করে 'ফাস্ট লেগ-থিয়োরি' এই অভিধাকে গ্রহণ করলেন কেন? বডিলাইন শব্দটিকে ঘৃণা করেন, শুধু এইজন্য, অথবা বডিলাইন শব্দটির মধ্যে বোলারের অভিসন্ধির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা আছে তাকে এড়াবার জন্য?

লারউড বলেছেন, তিনি আঘাত করবার উদ্দেশ্যে কখনো বল দেননি, যদিও পরিষ্কার স্বীকার করেছেন, ভয় দেখানো তাঁর অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল। তার জন্য তিনি কুম্ভীরাশ্রুপাতে রাজি নন। কিন্তু ভয় দেখানোর ইচ্ছা, আর আঘাত করার ইচ্ছার মধ্যে তফাত এত সূক্ষ্ম যে, ৯০ মাইল বেগে বলের ঝড়ের মধ্যে তা চোখে পড়া সম্ভব নয়। লারউডের বল ব্যাটসম্যানকে অসংখ্য আঘাত করেছে। তিনি ইচ্ছা করলে নাকি আরও আঘাত করতে পারতেন! তাঁর সেই সম্ভাব্য 'অনিচ্ছার' হিসাব কি সত্যই নেওয়া সম্ভব? ব্যাটসম্যান তো অন্তর্যামী নয়।

লারউড, সেইসঙ্গে জার্ডিন, এই প্রসঙ্গে বারবার দাবি করেছেন, লারউডের বলে যথেষ্ট সংখ্যায় বোল্ড হয়েছে। তাঁরা একটা সহজ কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, যে-ব্যাটসম্যানের নাক বা রগের ডগা ছুঁয়ে বল বেরিয়ে গেছে, পরের বলটিতে সে শরীরধর্মে কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে পেছিয়ে যাবেই এবং সেই আন্দাজে পরের বলটি দেওয়া হোত উইকেটের দিকে। হ্যামন্ড এই কথাটি স্পষ্ট করে লিখেছেন। যন্ত্র বিকল হবার পরে যে-কোনো অঘটন ঘটা সম্ভব, যেমন, হাঁটু-উঁচু বলে মাথা নীচু করা কিংবা অফস্টাম্পের বাম্পারে আহত হওয়া।*

*লারউড তাঁর বড়-বড় কয়েকটি মারের হিসাব দিয়েছেন। বডিলাইন-সিরিজে মারের কথা বাদ দিলে, দেখা যাবে, লারউড বড় মার দিয়েছেন সাউথ আফ্রিকার উইকেট-কীপার এইচ বি ক্যামেরন, প্যাটসি হেনড্রেন এবং আর এ সিনফিল্ডকে। ১৯২৯, জুলাইয়ে লর্ডসে ক্যামেরন, মাথায় ঘা খেয়ে লুটিয়ে পড়েন, তাঁকে বয়ে নিয়ে যেতে হয় মাঠের বাইরে। প্যাটসি হেনড্রেন মাথার মারে হাসপাতালে যান ১৯৩১-এ। ১৯৩৪, জুনে সিনফিল্ডও মাথাতেই মার খান। লারউড দাবি করেন, তাঁর বলের গতির তুলনায় তাঁর মারের সংখ্যা কম, কেন না তিনি কখনো ইচ্ছে করে মারেননি। এই বিষয়ে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত সিনফিল্ডের সার্টিফিকেটের উল্লেখ করেছেন।

বডিলাইন ক্রিকেটের ভাবাদর্শের বিরোধী কি না—এ প্রশ্ন লারউডের মনে

বারবার উঠেছে। তাঁর প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে তিনি নিজে বলেন :

"বডিলাইন কি ক্রিকেট-নীতির বিরোধী? এ প্রশ্ন নিজেকে করেছি এতদিন ধরে বহু শতবার। তা যে নীতি-বিরোধী সে বিষয়ে এখনো আমি নিঃসংশয় হইনি। তবে একথা বুঝেছি যে, নীচু পর্যায়ের ক্রিকেটে এ-জিনিস নীতি-বিরুদ্ধ। অসমান, অসংস্কৃত মাঠে, হুক মারে অপারদর্শী ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে বডিলাইন নিরতিশয় বিপজ্জনক। নিম্নপর্যায়ে বডিলাইন অব্যাহতভাবে চলতে দিলে সম্ভবত ক্রিকেটের ক্ষতি হত। কিন্তু টেস্ট-ব্যাটসম্যানের কোনো দুর্বলতা থাকার কথা নয়। যদি থাকে, সে দুর্বলতার সুযোগ নেবার অধিকার আছে বোলারের।"

এই অংশটির মধ্যে স্বতোবিরোধ বা অযৌক্তিকতা এত স্পষ্ট যে, বলে দিতে হয় না। লারউড নিশ্চয় জানেন, ছোট ও বড় খেলায় মূল নিয়মের ক্ষেত্রে তফাত করা সম্ভব নয়। এক জায়গায় যা নীতিবিরুদ্ধ অন্য জায়গায় তা নীতিসম্মত হতে পারে না। উচ্চপর্যায়ের খেলায় বডিলাইন যদি চলতে দেওয়া হয় এবং নিম্নপর্যায়ের খেলায় তা বন্ধ করে দেওয়ার কথা ওঠে, তাহলে সেইসঙ্গে আরও কথা উঠবে—যে-জিনিসে গোড়া থেকে খেলোয়াড় অভ্যস্ত হয়নি, তাতে সে পরে অভ্যস্ত হবে কি করে? ব্যাটসম্যান তো নিম্নপর্যায় থেকেই উচ্চপর্যায়ে ওঠে।

লারউড বলেছেন, তিনি মারতে চাননি, শুধু চেয়েছেন ভয় দেখাতে। আবার বলেছেন, ব্যাটসম্যান সরে গেলে অনেক সময়ে ব্যাটসম্যানের দিকে তাঁর বল ধাওয়া করেছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, তা ভয় দেখাবার জন্যই। কিন্তু যদি সেইসময়ে ব্যাটসম্যান আঘাত পায়, তাহলে কি ইচ্ছে করে মার দেওয়ার অভি-যোগ প্রমাণিত হয়ে যায় না?

উঠতি যৌবনে যখন নটিংহ্যামের পক্ষে লারউড ও ভোস জুটি বেঁধেছেন, তখনকার কাউন্টি-খেলার কিছু কৌতুককথা তিনি নিবেদন করেছেন :

"লাঞ্চের পরে আমাদের দুজনের সামনে দাঁড়াতে বিদ্বেষ ও ঘৃণাবোধ করত ব্যাটসম্যান। ঐ সময়টাই বিপদকাল। স্থানীয় একটা পানশালায় মাধ্যাহ্নিক সজীবতার জন্য যেতাম, দু'এক পাঁট সেখানে হত। শরীর ঝরঝরে তার ফলে, গতরের ব্যথা নিশ্চিহ্ন—তখন আমরা আধ ক্রাউন বাজি ধরতাম—কে আগে ব্যাটস-ম্যানের পাঁজরে গোঁত্তা লাগাতে পারবে। নিজেদের চাঙ্গা করে তোলবার জন্যই এই বাজি। আমরা তারপর ঝঞ্ঝা বইয়ে দিতুম। ব্যাটসম্যানেরা ব্যাপারটা জানত। তাদের কাছে তা ছিল খুন, যতক্ষণ না বাজির মুদ্রাটা হাত-ফিরি হত।"

লারউড নিশ্চয় কৌতুক করে এসব কথা লিখেছেন, কিন্তু 'একি কৌতুক নিত্য নূতন ওগো কৌতুকময়—গো!'

ঐ আধ ক্রাউন বাজির চেয়ে অনেক বড় বাজি ধরেছিলেন লারউড ব্রাডম্যানের বিরুদ্ধে। জার্ডিন তাঁর হাতে জিগীষার ও প্রতিহিংসার বোতল ধরিয়ে দিয়ে-ছিলেন। শুধু মধ্যাহ্নভোজনের পরে নয়, সারাদিনের জন্য—শেষ টেস্টে ভেঙে পড়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত।

তাহলেও দেখা যাবে, অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কমিশনের হিসাবমত, সকল বোলারের চেয়ে লারউডের দেওয়া মারের সংখ্যাই বেশি।

ব্রাডম্যানের পাঁজরে ধাক্কা প্রায় লাগাতে পারেননি তিনি—তাঁর সেই ক্ষোভ আমরা আগে উল্লেখ করেছি। ব্রাডম্যান নিজের কেরিয়ার চোখের সামনে খোলা রেখে, খেলার মাঠে অতি বীরত্বের মৃত্যু অপেক্ষা বিস্তারিত জীবনের কীর্তি-সম্ভাবনার উপরে বেশি নির্ভর করেছিলেন—তাতে লারউডের আশাহত মনের ছবি দেখেছি।

ক্ষুদে ব্রাডম্যানের বিরাট আকারের সামনে দাঁড়িয়ে তাই বিভ্রান্ত হয়েছেন লারউড। অন্তরে অনুভব করেছেন, বডিলাইন অন্যায়, কিন্তু মুখে স্বীকার করতে পারেননি। যদি স্বীকারই করেন—তাহলে কোন্ অস্ত্র নিয়ে ব্রাডম্যানের মুখোমুখি হবেন?

ব্রাডম্যান অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, অথচ লৌকিক মনুষ্য। সুতরাং লৌকিক নীতির পক্ষপুটও দাবি করতে পারেন। লারউড অলৌকিক ব্রাডম্যানকে খণ্ডন করতে গিয়ে লৌকিক নীতির অতিরিক্ত কিছু করতে চেয়েছিলেন। সেই 'অতিরিক্ত' অংশটুকুর অন্যায়ের চেহারা খুলে ধরতে ধুরন্ধর ব্রাডম্যানের অসুবিধা হয়নি। অপরদিকে লারউড একথা খোলাখুলি বলতে পারেননি যে, একজন ব্রাডম্যানের বিরুদ্ধে যে-কোনো কাজই ন্যায়। ব্রাডম্যানের অতি-ক্ষমতা যিনি দিয়েছেন, সেই বিধাতার উচিত ছিল সেই ক্ষমতানাশের জন্য কোনো পৃথক যন্ত্রযাগের অধিকার দেওয়া, যেমন পৌরাণিক, বা মহাকাব্যিক যুগে মানুষ পেত। ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছেন যে ভীষ্ম, তাঁরই বিরুদ্ধে মহাভারত দিয়েছে মারণ-যজ্ঞের অধিকার। একালে নিয়মের রাজত্বে সেই ক্ষমতা কাউকে দেওয়া বোধহয় বিধাতারও সাধ্যাতীত। তাই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনুষ্যটি লৌকিক ন্যায়-নীতির সুবিধাও একই সঙ্গে ভোগ করে গেলেন।

ব্রাডম্যান—লারউডের দুঃখ-নিয়তি।

* * * মৃতের প্রত্যাবর্তন এবং কণ্ঠস্বর * * *

'শবরীর প্রতীক্ষা'র রামায়ণীয় কাহিনীতে পাই, একটি শবরী বালিকা রামচন্দ্রকে কামনা করে জীবন-যৌবন ক্ষয় করেছিল। ব্যর্থ প্রতীক্ষা এবং আত্ম-অপচয়ের প্রবাদবাক্য-রূপে 'শবরীর প্রতীক্ষা' কথাগুলি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এরকম উদ্ভট ঘটনা কি সম্ভব যে, শবরী রামচন্দ্রকে পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং তারপরে আবার রামচন্দ্রেরই প্রতীক্ষায় সমৃদ্ধ দেহ-মনকে অর্ঘ্যরূপে প্রস্তুত করে রেখেছিল? এরকম ঘটনা শুধু সম্ভবপর নয়, বাস্তবে সংঘটিত হয়েছিল।

লারউড অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলবেন না বলেছিলেন, কিন্তু ক্রিকেট ছেড়ে দেননি, চাকরি হিসাবে বজায় রেখেছিলেন। সুতরাং কাউন্টি খেলে চললেন। ১৯৩৪-এ অপারেশনের ধাক্কা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারলেও ইংলণ্ডে বোলিং-অ্যাভারেজে তাঁর স্থান ছিল দ্বিতীয়, ৮২টি উইকেট পেলেন। ১৯৩৫-এ ১০০টির বেশি উইকেট। এবং ১৯৩৬-এ—ইংলণ্ডে বোলিং-অ্যাভারেজে শীর্ষস্থানে!! ১১৯টি উইকেট, গড় ১২ রানে।

১৯৩৬-এ লারউডের বলের দীপ্তিতে ঝলসাচ্ছে ইংলণ্ডের মাঠ : ৫-৬৫,

৬-৫৫, ৫-৪০, ৪-৪৭, ৫-৩০, ২-৩৯, ৬-৩৪, ১-২৭, ৫-৩৫, ৫-৫০, ৪-৮১, ৬-৬৪, ৬-৩৮, ৬-৪২—এমনি সব হিসাব।

১৯৩৬ সালে ইংলণ্ডের সেরা বোলার লারউড। ১৯৩৬ সালে এম-সি-সি যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়। লারউড কি দলে যাবেন?

প্রশ্নের উত্তরে এম-সি-সি ক্রিকেট-কমিটির চেয়ারম্যান স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন বললেন—'আপনাদের মতোই তাঁর বোলিং-সাফল্য সম্বন্ধে আমরা অবহিত। তবে কিনা ব্যাপারটা জটিল। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে—প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অপরাগ।'

'টেস্ট ম্যাচের সব আকর্ষণ আমার কাছে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল'—লারউড বলেছেন—কিন্তু আকর্ষণহারা বস্তুটির জন্য দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে পারেননি। লারউডের তুলনায় যে-ভোস্ 'শ্যাম্পেনের কাছে সোডা'—সেই ভোস্ ১৯৩৬-৩৭-এ অস্ট্রেলিয়ায় রীতিমত সফল বোলার হয়ে দাঁড়লেন।

'আমাকে ১৯৩৬-এ নির্বাচন করা হল না'—বিষাদের স্বর যেন শোনা যায় লারউডের কণ্ঠে—সেইসঙ্গে আত্মদংশনের তিক্ত জ্বালাও: 'কি করেই বা নির্বাচন করবে এম-সি-সি? আমি অবিবেচকের মতো লিখেছিলাম যে, আমি আর কখনো ইংলণ্ডের পক্ষে টেস্ট খেলব না—যে-খেলার চেয়ে বড় সম্মান ইংলিশ ক্রিকেটে আর নেই। এম-সি-সি তদনুযায়ী অবশ্যই ভেবেছিল, আমাকে খেলতে প্রণোদিত করা উচিত হবে না, যেহেতু কোনো মানুষেরই সেবার জন্য সীমাতিরিক্ত মূল্য দেওয়া যায় না—জয়ের প্রশ্ন যেখানে, সেখানেও নয়।'

তারপরেই লারউডের উল্টো কথা, বিক্ষত মনের রূপ যাতে উন্মোচিত—'তাছাড়া এম-সি-সি-কে হয়তো আরও বিব্রত হতে হত, যদি আমি খেলতে অস্বীকার করতাম। তা ঠিক, আমি অস্বীকার করতামই।'

১৯৩৬-৩৭-এর সফর শেষ করে এম-সি-সি ফিরে এল। তারপর অস্ট্রেলিয়া আবার এল ইংলণ্ডে ১৯৩৮-এ। এখনো লারউড ইংলণ্ডের প্রধান বোলারদের অন্যতম। কিন্তু এবার খেলার কথাই ওঠে না। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক এবার—হ্যাঁ—ব্রাডম্যান।

লারউড অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেললেন না। কাউন্টি-ক্রিকেটে বল করে চললেন। প্রশস্তি পেয়ে চললেন যথেষ্টভাবে:

"ফাস্টবোলার-রূপে লারউড জিনিয়াস। গত দশ বছরে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার অগণিত মানুষকে বোলিংয়ের দারুণ নিয়ন্ত্রিত রোষের দ্বারা এবং সর্বনাশা গতির দ্বারা তিনি শিহরিত করেছেন।

"বল ছাড়ার মুহূর্তে তাঁর দেহচ্ছন্দ—যেন কোনো গ্রীক ভাস্কর্য-নমুনা। তাঁর নিখুঁত ভারসাম্য থেকেই তাঁর পরিমাপিত বলের সৃষ্টি। তাঁর 'ব্রেকব্যাক' এমন যে, দূরে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়েও দম বন্ধ হয়ে যায়! তাই, বিস্ময়ের কী আছে যে, তিনি চরম বীরপূজায় কিংবা চরম ঘৃণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এখানের এবং সর্বস্থানের মানুষকে। লারউড তাঁর সর্বোচ্চ গতির বল আর দেন না, বল ছাড়ার সময়ে মাটির সঙ্গে সংঘর্ষের প্রচণ্ড ধাক্কা তাঁর আহত পা আর সইতে পারবে না—হয়তো এই আশঙ্কায়।

"তবু তিনি এখনো এমন জোর যে, উইকেটকীপারকে বহু দূরে সরে দাঁড়াতে হয়। পূর্বের মতোই এখনো বজায় আছে তাঁর স্থির মাপ। তাঁর বোলিংয়ের ফিল্ম তোলা হোক। তা দেখানো হোক, স্কুলে, কলেজে এবং কাউণ্টি বোলারদের।"

প্রশস্তি—এখনো সমৃদ্ধ যৌবনের! প্রশস্তি—এখনো সম্ভাবনাগর্ভ সৃষ্টি-শক্তির!! হায়—লারউডের ট্রাজেডী পৌরাণিক শবরীর ট্রাজেডীর চেয়ে গভীর ও জটিল। শবরীর ক্ষেত্রে অনাঘ্রাত ফুলের পাপড়ি ঝরেছিল। আর এক্ষেত্রে, যৌবনে বিবাহবিচ্ছেদের পরে পুনর্বিবাহহীন জীবনে চাকরির দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন, সিনেমার দ্বারা অবসরবিনোদন, এবং বটিকার দ্বারা নিদ্রাগমন। এ-যুগ অনেক জটিল এবং জর্জর।

মহাবিদ্রোহী সুখে ঘরকন্না করছেন ছানা-পোনা নিয়ে—কেশরলালের সেই দীন মূর্তি দেখে আর্তনাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গল্পের নবাব-নন্দিনী। রবীন্দ্রনাথের গল্পের পৃষ্ঠাগুলি নবাবনন্দিনীর সশব্দ যন্ত্রণার হাহাকারে পূর্ণ, কিন্তু কেশরলালের প্রায়-নিঃশব্দ মৃত্যুর অশ্রুশ্বাসের কথা আমরা সেই রোমাণ্টিক ট্রাজেডীর পৃষ্ঠা ওলটাবার সময়ে ভুলে যাই।

একটু পেছিয়ে যাই।

১৯৩৪-এ ব্রাডম্যানের, অস্ট্রেলিয়ার, রথ গড়িয়ে চলল ইংলণ্ডের বুকের উপর দিয়ে। যে-অ্যাশেজ ছিনিয়ে এনেছিল ইংলণ্ড সদর্পে, তা আবার কেড়ে নিল অস্ট্রেলিয়া। আগের বারে অস্ট্রেলিয়ায় এম-সি-সি-র যে-সব খেলোয়াড় টেস্ট-ম্যাচের সময়ে খেলার পরিপাটী সাজ পরে অথচ মাঠে না নেমে প্যাভিলিয়নে বসে-বসেই সময় কাটিয়েছে—তাদের অনেকে আবার ফিরে এল দলে। ক্যাপ্টেন হলেন বব ওয়াট, বডিলাইনের বিরোধী-পক্ষীয়, যিনি পরে লেগের দিকে চার জনের বেশি ফিল্ডার রাখতে বাধা দেবেন বাওয়েসকে।

ব্রাডম্যান প্রথম খেলায় করলেন ২০৬। ব্রাডম্যানের নাকি শরীর খারাপ। তারপর প্রথম তিনটি টেস্টে তাঁর রান প্রায় কিছুই নয়—২৯-২৫, ৩৬-১৩, এবং ৩০। গড় ২৫-এর অল্প-কিছু বেশি।

সেই ব্রাডম্যান শেষ করলেন—প্রায় ৯৫ গড় করে। তাঁর শেষ তিনটি ইনিংসের রান—৩০৪, ২৪৪ ও ৭৭। ব্রাডম্যান নাকি অসুস্থ!!

হাঁ, সত্যিই অসুস্থ। যখন খেলতে পারছেন না—কিংবা যখন ডবল বা ট্রিপল সেঞ্চুরি করছেন—সব সময়েই অ্যাপেণ্ডিসাইটিস-ব্যাধিকে বহন করেছেন নিজের মধ্যে! এ-ব্যক্তি সাধারণ মানুষের হিসেবের মধ্যে আসেন না।

ব্রাডম্যানের ঝটিতি অপারেশন হল ইংলণ্ড। অপারেশন এবং...মৃত্যু। ব্রাড-ম্যানের মৃত্যু হয়েছে—গুজব ছড়িয়ে পড়ল বরফের গোলার মতো।

'এই সময়ে আমি নিঃসন্দেহে অনন্তে বাস করেছিলাম'—ব্রাডম্যান পরিহাস করেছেন।

অনন্তে বাস—নিশ্চয়ই—তার জন্য আরও কয়েকটি টেস্টসিরিজ খেলতে হবে তাঁকে।

১৯৩৬-এ অস্ট্রেলিয়ায় গেল ইংলণ্ড অ্যাশেজ না-কেড়ে আনবার জন্য। বডি-

লাইনের সমাধির উপরে নতুন পেরেক ঠোকার শব্দ শোনা গেল! গাবি অ্যালেন, অস্ট্রেলিয়া-জাত ইংলিশ ক্রিকেটার, এম-সি-সি'র অধিনায়ক হয়েছেন। ইনিই জার্ডিনের কাছে সজোরে প্রতিবাদ করেছিলেন বডিলাইনের বিরুদ্ধে—অস্ট্রেলিয়া তা জানত। কে না জানত!

ইংলন্ড সিরিজে হারল। ব্রাডম্যানের টেস্ট অ্যাভারেজ খুব ভাল হল না, তবে নেহাৎ মন্দ কি, দুটি ডবল সেঞ্চুরিসুদ্ধ গড় ৯০।

কাগজে লিখল, অস্ট্রেলিয়া জিতেছে, কিন্তু বর্ণহীন জয়, কারণ ইংলন্ড তার সেরা বোলারকে আনেনি।

এ সব লেখায় লাভ কি!

১৯৩৮-এ অস্ট্রেলিয়া এল ইংলন্ডে। লারউড হয়তো সান্ত্বনা পেলেন যখন শুনলেন ওভালে শেষ টেস্টে ইংলন্ডের হাতে অস্ট্রেলিয়া তার ইতিহাসের সব চেয়ে বড় একটি মার খেল। ইংলন্ড প্রথম ইনিংসে করেছিল ৭ উইকেটে ৯০৩। এবং অস্ট্রেলিয়া শোচনীয়ভাবে ইনিংসে হেরেছিল। সেই সঙ্গে হাটন ৩৬৪ করে ব্রাডম্যানের টেস্টরেকর্ড ভেঙেছিলেন। হাটনের মধ্যে জার্ডিনের ছায়া দেখা গিয়েছিল, আর...

ব্রাডম্যান পায়ের হাড় ভেঙে শেষ টেস্টে মাঠের বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু লারউড যদি সান্ত্বনা পেয়ে থাকেন, কি মিথ্যে সান্ত্বনা! সিরিজ ড্র হয়েছিল, সুতরাং অ্যাশেজ থেকে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার হাতে, এবং—

ব্রাডম্যানের টেস্ট-অ্যাভারেজ হয়েছিল—একশোর উপরে। এবং—মে মাসের মধ্যে আবার হাজার রানের রেকর্ড।

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভকালে Who's Who-বইতে ব্রাডম্যানকে ২১ লাইন জায়গা দেওয়া হল, যা হিটলারের চেয়ে মাত্র ৮ লাইন কম এবং স্ট্যালিনের চেয়ে ১৭ লাইন বেশি!!'

ব্রাডম্যানের যদি পায়ের হাড় ভাঙে, তা সেরে যায়। যদি শরীর খারাপ হয়, তবু সকলের সহানুভূতির মধ্যে রান করতে পারেন। যদি মৃত্যুর খবর রটে—সেটা দীর্ঘজীবনের পূর্ব-ঘোষণা হয়ে ওঠে।

এমন কি একটা বিশ্বযুদ্ধও, ব্রাডম্যানের মধ্যাহ্ন-জীবনের (৩০ থেকে ৩৮ বৎসর) প্রায় দশ বছর হরণ করেও, শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও, তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটশক্তি করে রাখতে পারে। ১৯৪৭ সালে যখন ব্রাডম্যানের ব্যাটিং-প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ হ্যামন্ড অগৌরবের মধ্যে বিদায় নিলেন, তখনো ব্রাডম্যান অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রস্তুত হচ্ছেন আর একটি বিজয়-অভিযান পরিচালনার জন্যে, মহানায়কের শেষ অভিবাদন গ্রহণের জন্য। ১৯৪৮-এর অপরাজিত ব্রাডম্যানীয় সফর।

সঙ্গীতহীন বিদায়ে যিনি সরে গিয়েছিলেন, যিনি ক্রিকেটের মধ্যে আলোকের সন্ধান করে তার আগুনে পুড়ে বীতশ্রদ্ধ, বিতৃষ্ণ জীবন যাপন করছিলেন একান্তে—কালের প্রলেপ তাঁর অনেকখানি জ্বালা হরণ করেছিল। বহু বছর

পরে তিনি একজন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারকে দেখেছিলেন—ফিঙ্গলটনের মধ্যে। ফিঙ্গলটন যেন তাঁর কাছে নতুন পৃথিবীর সংবাদ এনেছিলেন। সেই পরিবর্তিত জগতে পুরনো হিংসার বদলে নবীন আগ্রহের শ্রদ্ধা। বাইরের বাতাস এসে লার-উডের নির্বাসনের কক্ষে সরসরিয়ে উঠেছিল, আলোর কানাকানি যেন মেঘ-প্রাচীরের আড়ালে।

কে যেন হাতে তালি দিয়ে ডাক দিল—এবার আসতে পারো হ্যারল্ড—ও চলে গিয়েছে।

ব্রাডম্যান অবসর নিয়েছেন। এবার লারউড আসতে পারেন। হাতে তালি দিয়ে একদিন জার্ডিন লারউডকে বলেছিলেন—ব্রাডম্যান বিদায় নিয়েছেন, এবার তুমি চলে যেতে পারো। ব্রাডম্যান আউট হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন ক্রিকেট-ড্রেসিংরুমে, লারউড নার্সিংরুমে এবং অবসরে। এবার ব্রাডম্যান যখন অবসরে, তখন হাতে তালি দিয়ে যে ডাকল লারউডকে—সে ক্রিকেট নয়—জীবন।

এবং লারউড গিয়ে হাজির হলেন—পৃথিবীতে এত বড় বিস্ময়ও ছিল—ব্রাডম্যানের সংবর্ধনাসভায়!

ব্রাডম্যান অবাক হলেন লারউডকে দেখে। ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষ চাঁদা তুলে ব্রাডম্যানকে অপূর্ব এক রৌপ্য-কাপ উপহার দিয়েছিল—সেই উপলক্ষে আয়োজিত ভোজসভায় লারউড এলেন। ভোজসভায় বহু নতুন পুরনো খেলোয়াড়ের সমাবেশ হয়েছিল— ৯ জন কাউণ্টি ক্যাপ্টেন এবং ৭ জন প্রাক্তন ইংরেজ টেস্ট-ক্যাপ্টেন।

রৌপ্যকাপের রৌপ্যদ্যুতি গিয়ে ব্রাডম্যনের প্রশস্ত ললাটে পড়েছিল, সেই আলোর মধ্যে সহস্র-সহস্র ইংরেজের উজ্জ্বল অভিনন্দন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল—বৈভবে ও ভাগ্যে অনবদ্য এক জীবন। লারউড ব্রাডম্যানের হাতে হাত মিলিয়ে তা দেখছিলেন।। ক্লিক্ ক্লিক্ ক্লিক্—ছবি উঠছিল অজস্র। ব্রাডম্যান লারউড হাত ধরাধরি। অপূর্ব দৃশ্য। ব্রাডম্যান হাসছিলেন। সুমধুর স্বরে কথা বলছিলেন। 'আশ্চর্য জীবন, আশ্চর্য পৃথিবী।'

তারপরে লারউড সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন। হৈ-হৈ করে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়েরা ঘিরে ধরেছিল তাঁকে। তাঁকে নিয়ে তাদের আগ্রহ আর উদ্দীপনার শেষ ছিল না। লারউডের সঙ্কোচ হচ্ছিল—কেমন যেন লজ্জিত। কিন্তু ভালও লাগছিল। একটা মুক্তির শ্বাস। আত্মহননের রুগ্নতা থেকে অব্যাহতি।

লারউড বসেছিলেন লিণ্ডওয়ালের পাশে।—এই ছেলেটি—যে আমাকে আদর্শ করে বল অভ্যাস করেছে—আমার পরেই নাকি যার ছন্দ এবং গতি—আমি যেমন যন্ত্রণা দিয়েছিলাম অস্ট্রেলিয়ানদের, খানিকটা সেই কষ্টই দিয়েছে ইংরেজদের—ভারী ভদ্র আর নম্র—আমারই মতো...আকারে দানব নয়...

লারউড ও লিণ্ডওয়ালকে পাশাপাশি দেখে ব্রাডম্যানের মনে হল, আহা, এই দুজন যদি একই ম্যাচে খেলত দুই দলে, যদি মিলিয়ে নিতে পারতাম দুজনকে...

লারউড যখন বাড়ি ফিরছেন, তখন উজ্জ্বলতর মনে হল পথ, সূর্যালোক উত্তপ্ততর—সে সূর্য—অস্ট্রেলিয়ার।

লারউডের স্ত্রী জানতেন, এমন ঘটবে। মানুষটা নিজেকে মেরে ফেলছে গুটিয়ে

থেকে। তিনিই ঠেলে পাঠিয়েছিলেন স্বামীর 'শত্রু'র সম্বর্ধনাসভায় স্বামীকে। সংগ্রামী মানুষ শত্রু ছাড়া বাঁচাতে পারে না।

* * * আর কতদূরে... * * *

১৯৫০ সালে এক গ্রীষ্ম-দিনে লারউড আবার অস্ট্রেলিয়ার আকাশে সূর্যোদয় দেখলেন।

অস্ট্রেলিয়ায়? লারউড? সাংবাদিকরূপে? ইংলণ্ডের কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে?

না, ইংরেজ লারউড অস্ট্রেলিয়ান লারউড হতে চান। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় বসতি করতে এসেছেন।

'আশ্চর্য জীবন! আশ্চর্য পৃথিবী!'

পুরনো বুড়ো ইংলণ্ড কী দিয়েছে আমায়? আমাকে ব্যবহার করেছে নিংড়ে, তারপর ফেলে দিয়েছে ছিবড়ের মতো। ভালো চাকরিও একটা নেই। সামান্য দোকান চালিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করতে হয়।

অপর দিকে নবীন দেশ অস্ট্রেলিয়া। উজ্জ্বল সূর্যের তলায় জীবিত। তীব্র-ভাবে সে চায়। না পেলে অস্থির হয়। আক্রমণ করে। আবার ভুলে যায়। চিনে নেয় বীরত্বকে। হাত ধরে আবেগে।

লারউডের মনে ছিল ১৯৩৩ সালে শেষ টেস্টে ৯৮ রান করে বিদায় নেওয়ার সময়ে অস্ট্রেলিয়ানদের সম্বর্ধনার কথা।

ফিঙ্গলটন যখন প্রথম সাক্ষাতে এসেছিলেন ডাকওয়ার্থকে সঙ্গে নিয়ে, তখন কথাপ্রসঙ্গে লারউড বলেছিলেন, অস্ট্রেলিয়া বেশ দেশ, হয়তো কোনোদিন সেখানে বসবাস করতে পারি। সংবাদপত্রের ক্রিকেট-প্রতিনিধি সে-সংবাদ প্রকাশ করতে বিলম্ব করেননি।

তারপরে অজস্র চিঠি এল অস্ট্রেলিয়া থেকে। চাকরির প্রস্তাব এল। সাদর আহ্বান এল। এল অভ্যর্থনার প্রতিশ্রুতি।

অস্ট্রেলিয়ান-খেলোয়াড়েরা প্রীতি আর প্রশ্ন নিয়ে ঘিরে দাঁড়াল। ইংরেজ-খেলোয়াড়রা তাঁর বিষয়ে উদাসীন। তাদের ড্রেসিংরুমে তিনি অবাঞ্ছিত।—আর এরা, যাদের অগ্রজদের আমি মেরে সরিয়ে দিয়েছি, তারা এগিয়ে এল এমন করে!—লারউড ভাবাবেগ বোধ করেন। মাটির টান বড় টান। দেশের শিকড় কাটতে চায় না। স্ত্রী ও কন্যারা এতখানি অজানিত পথে পা বাড়াতে শঙ্কিত হয়। কিন্তু লারউডের জীবন—বল নয়—আবার গতিশীল।

জার্ডিন তাঁর বিশ্বস্ত সৈন্যকে ভোলেননি। একদিন বিদায়ভোজে আপ্যায়িত করলেন। উপহার দিলেন একটি পেন্সিল, জ্যাক হবস্ তাঁকে যা দিয়েছিলেন। হবসের পেনসিল জার্ডিনের হাত দিয়ে এল শ্রেষ্ঠ স্মারক-চিহ্নরূপে। জার্ডিনের দেওয়া অ্যাশট্রে লারউডের কাছে আগে থেকেই ছিল।

হবসের কাছে বিদায় নিতে গেলেন লারউড। ক্রিকেটের আচার্য—দি মাস্টার—শুনলেন যে, জার্ডিন তাঁর দেওয়া পেনসিলটিকে পুনঃ উপহার দিয়েছেন লারউডকে। 'আমি সম্মানিত হলাম', গভীরভাবে বললেন দি মাস্টার, তারপর

বললেন, 'তুমি চলে যাবে, আর শ্যাম্পেন-উৎসব হবে না—তা হয় না।'

শেষ শ্যাম্পেন উৎসব—শেষ! উদয়ে বিদায়ে, আনন্দের উম্বোধনে, বেদনার মোচনে তুমি তরঙ্গিণী—এসো!

লারউড অনেক কিছু ভুলতে চাইছিলেন। শ্যাম্পেনের রঙে মুছে যাক অতীত, জন্ম নিক ভবিষ্যৎ।

লারউড এত পান করলেন যে, পরদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন।

লারউড ভুলতে চাইছিলেন। পারছিলেন কই! গৃহস্থ হল মুসাফির। সে গাঁঠরিয়া বাঁধল। তাতে সযত্নে ভরে নিল স্মৃতির সম্ভারগুলি। ঘরের চারধারে ছবি টাঙিয়ে, স্মারক সাজিয়ে, স্মৃতির যে-কারাগারের মধ্যে জীবনের মধ্যাদিনে লারউড প্রস্থান করেছিলেন, সেই স্মৃতির পিঞ্জরকে তিনি বয়ে নিয়ে চললেন নূতন অভিযানেও। লারউডের প্রাণ, পাখি হয়ে বসে রইল সেই পিঞ্জরের দাঁড়ে, তাকে হাতে ঝুলিয়ে প্রৌঢ় একটি মানুষ বেরিয়ে পড়লেন।

ঠিক সেই মুখে—আকাশে তখন অভিনব আয়োজন। সহসা এপ্রিলের আকাশ থেকে, সচরাচর যা হয় না, তাই হল—অজস্র ঝরতে লাগল শ্বেতপুষ্প—তুষার! তুষার! বড় ভালবাসার কন্যাগুলিকে লারউড ডেকে নিলেন—'চোখ ভরে দেখে নাও! এ জিনিস হয়তো জীবনে আর দেখবে না।'

ললাটে কালিমা চিহ্ন এঁকে দিয়ে এম-সি-সি একদিন লারউডকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তা কিছুটা সে মুছে দিল 'অবসরপ্রাপ্ত পেশাদার'দের অন্যতমরূপে তাঁকে প্রথমেই এম-সি-সি-র আজীবন সদস্য করে নিয়ে। কিন্তু পেশাদারকে বিদায় দিতে এম-সি-সি-র পক্ষে কেউ এল না।

শহরতলির ঘিঞ্জি অংশ, বহু যুগের ধূমাঙ্কিত কারখানার বাঁশি, গাড়ির শব্দ —ইংলন্ড—আমার ইংলন্ড সরে গেল ধীরে-ধীরে।

যে জাহাজ লারউডকে ১৯৩২ সালে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে গিয়েছিল, সেই অরনোটস্ জাহাজেই ১৮ বছর পরে লারউড ভাসলেন অস্ট্রেলিয়ার জন্য—চির দিনের জন্য।

আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে...

*** * * কেমন আছো?—তুমি কেমন? * * ***

'আপনি কি উডফুলের সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'কি করে বলি! কিন্তু তিনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

মেলবোর্নে উপস্থিতি-মাত্রে জনতা ও সাংবাদিক ঘিরে ধরেছে। অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে তারা। বীরের সঙ্গে বীরের সাক্ষাতের অবিস্মরণীয় মুহূর্ত তারা দেখতে চায়। সে ব্যবস্থাও করে ফেলেছে।

মেলবোর্ন-হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিল উডফুল, যিনি কখনো প্রতিশোধ নিতে চাননি, তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁরা বন্ধু হলেন।

বোর্ড অব কন্ট্রোলের সেক্রেটারীর সঙ্গে এডিলেড-ওভালের মধ্যে প্রবেশ করে

লারউড কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ালেন। আঁকা ছবির মতো শান্তি ও সৌন্দর্য নিয়ে মাঠটি পড়ে আছে—এই মাঠেই, যখন ১৯৩৩ সালে বার্ট ওল্ডফিল্ডকে আঘাত করেছিলেন...তখন...

স্মৃতিভারে পড়ে আছি—সে সেখানে নাই...

বার্ট ওল্ডফিল্ড় কিন্তু স্মৃতিতে নয়, বাস্তবে হাজির হয়ে নিমন্ত্রণ করলেন। একদিন সিডনির এক হোটেলে অনেকে হাজির—পুরনো ক্ষত্রিয়েরা—স্টর্ক হেনড্রি, বিল ওরিলী, স্ট্যান ম্যাককেব—

একটিও বিরূপ কথা নয়, সর্বত্রই আদর ও আহবান। কিন্তু লারউডের বুকের মধ্যে আহত একটি স্থান ছিল—কি জানি কেন, তাতে এখনো রক্তপাত হয়।

সিডনিতে যখন সাংবাদিকেরা ঘিরে ধরল, তখন তাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করেছিল—'আপনি কি অবসর কাটাতে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছেন?'

'আমার নাম লারউড—ব্রাডম্যান নয়—'

সাংবাদিকটি যখন সেই উত্তরটি লিখে নিচ্ছেন, ফিঙ্গলটন ধমক দিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করেছিলেন। ঐ বেদনাবিকারটুকু আছেই, মানুষের জীবনে থাকেই, কিন্তু তা যেন সংবাদপত্রের লোভের বস্তু হয়ে আবার এই অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড়টিকে আঘাত না করে।

হাঁ, ব্রাডম্যান ধনী, লারউড ধনী নন। ব্রাডম্যান অপেশাদার, কিন্তু খেলাতে তাঁর দৌলত, তাঁর সম্মান। তিনি অর্থশালী এবং প্রতিপত্তিশালী। অন্যদিকে টাকার জন্যই যে খেলছে, যে পেশাদার, তাকে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়সন্ধানে স্বদেশ ত্যাগ করে আসতে হল! আর সম্মান—হায় রে—!

ঠিক, লারউড ব্রাডম্যান নন।

ফিঙ্গলটন লারউডের জন্য অনেক করলেন। লারউডের বড় মার তিনি খেয়েছিলেন মাঠে দাঁড়িয়ে। মাঠের বাইরে যে-লারউড মার খাচ্ছিলেন, তাঁর পুনর্বাসনের জন্য ফিঙ্গলটনের আগ্রহের সীমা ছিল না। লারউডকে অভ্যর্থনার জন্য তিনি ছুটে এলেন কয়েক শো মাইল দূর থেকে, তাঁকে অবহিত করলেন নানা বিষয়ে, নিয়ে গেলেন বহুজনের কাছে, হোটেলের ব্যবস্থা করে দিলেন। লারউড হোটেলের চার্জ শুনে অবাক—এত কম!

চার্জ কম নয়, লারউডের জন্য কম লেগেছিল। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন শ্রমিক প্রধানমন্ত্রী বেন চীফলে অর্ধেক চার্জ নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিয়েছিলেন ফিঙ্গলটনের মারফত। কিন্তু তা জানাতে নিষেধ করেছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি মারা যাবার পরে লারউড সে-কথা জানলেন।

অস্ট্রেলিয়াতেই একদিন লারউড দেখা পেলেন তাঁর স্কিপারের। জার্ডিন অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন ব্যবসা-সূত্রে। আর্থার মেইলী সে সংবাদ পেয়ে জার্ডিনকে পাকড়াও করলেন। পিকউইক ক্লাবে সমবেত হলেন বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা—ম্যাককার্টনি, ব্রাডসূলে, জনি টেলর, ওল্ডফিল্ড, মেইলী—সেই সঙ্গে ক্রিকেটের এক সেরা সমঝদার, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট মেঞ্জিস।

ক্রিকেটই আলোচনার বিষয় হল, এবং...বডিলাইন। বডিলাইনের উদ্ভাবক এবং এবং প্রযোজককে একসঙ্গে পেয়ে মুখ খুললেন বীরযুগের অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা। ম্যাককার্টনি বললেন, তিনি বডিলাইন বলের চামড়া খুলে নিতেন।

টেলর বললেন, শোন হে, একটা ঝাঁটাকাটি নিয়ে তোমার বডিলাইন খেলে দিতুম।
সবই কৌতুক, সবই পরিহাস। অবসরের আসনে বসে স্মৃতি চালাচালির সুখ।

ক্রিকেট আমাকে কি দিয়েছে—লারউড ভাবেন। দেয়নি কি? ছিলাম খনির ছেলে, সেখান থেকে উঠে এসে রাজার সঙ্গে করমর্দন করেছি, কত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীরা আগ্রহে এগিয়ে এসে আলাপ করেছে, কত বন্ধু পেয়েছি, দেশ দেখেছি কত—

একটা বাড়িও হয়েছে। ক্রিকেটই নিশ্চয় তার পরোক্ষ কারণ। বাড়ি কিনেছেন সিডনি ক্রিকেট-মাঠের কয়েক মাইলের মধ্যে। তার পিছনের বাগানে গিয়ে যখন দাঁড়ান, বাতাস বয়ে গেলে কখনো কখনো শুনতে পান দূর থেকে ভেসে আসছে কোলাহল—কিসের—

লারউডের কানে যেন ভেসে আসে মহাখ্যাতির—মহা অখ্যাতির—কলরব। ঐ তো সিডনি-মাঠের চীৎকার। তিরিশ বছর আগেকার লোকগর্জন যেন সহসা গতকালকার বলে মনে হয়।

'হাঁ, ক্রিকেট-ইতিহাসে আমার নাম বডিলাইন শব্দটির সঙ্গে অচেছদ্য হয়ে লিখিত হবে।'

আর...

সিডনির মার্টিন-প্লেসে হাঁটছেন একদিন—হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন—প্রায় ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল—লোকটিও থমকালো—মুখ তুলল—

'ডন? কেমন আছ ডন?'

'ভালই। তুমি কেমন হ্যারল্ড?'

ডন ব্রাডম্যান ও হ্যারল্ড লারউড সেই পথের ধারে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে লাগলেন। রাস্তা দিয়ে লোক বয়ে যেতে লাগল। কেউ তাঁদের বিশেষভাবে খেয়াল করে দেখল না।

'ডন, সে পুরনো দিন এখন আর নেই, কি বলো?'

'কি বলতে চাইছ হ্যারল্ড?'

'তিরিশ বছর আগে হলে এখন আমাদের চারধারে হাজার-হাজার লোক জুটে গেছে—'

ডন হাসলেন। চলে গেলেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে লারউড অনুভব করলেন, কেবল বডিলাইনের সঙ্গে নয়, এই লোকটির সঙ্গেও তাঁর জীবন বন্ধনীভুক্ত হয়ে গেছে ইতিহাসে।

কিন্তু ঐ লোকটির গোটা জীবনের সঙ্গে তো তিনি বন্ধনীবন্ধ নন, একাংশের সঙ্গেই।—ও তারপরে আরও অনেক পথ চলেছে—আমার চলা গেছে থেমে।

চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের মতো আলোড়িত হয় লারউডের বুক। জীবন কাউকে দেয় অঝোরে, অবাধ প্রবাহে, কাউকে আকর্ষণ করেও প্রত্যাখ্যান করে। ক্রিকেটও।

লারউড পথ চলতে চলতে হয়তো ভাবেন।

অস্ট্রেলিয়ার সুর্যোজ্জ্বল পথ দিয়ে লারউডের জীবনের বল আস্তে-আস্তে গড়িয়ে চলে।

*** দাঁড়াও পথিকবর! ***

অনেকদিন পরে...অনেক বছর...

অস্ট্রেলিয়ায় একটি শহরের সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে একটি সুদৃশ্য স্মৃতিমন্দির। অস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর ক্রিকেট-প্রেমিক মানুষেরা সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসে। সেখানে মাটির তলায় রয়েছে শতায়ু এক ক্রিকেটারের প্রাণশেষ দেহ।

স্মৃতিমন্দিরের মধ্যে একটি ফলকে লেখা আছে:

> **অস্ট্রেলিয়ার এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান এখানে চিরশায়িত। ক্রীড়াজীবনে তিনি বহু দ্বিশতাধিক ও ত্রিশতাধিক করিলেও মরজীবনে শতাধিকের পরেই তিনি অজানিত প্যাভিলিয়নের দিকে প্রস্থান করিয়াছেন।**
>
> **ইতি—কৃতজ্ঞ দেশবাসী**

ঐ সমাধিক্ষেত্রেরই আর এক প্রান্তে রয়েছে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। স্তম্ভগাত্রে রক্ষিত ফলকটিতে লেখা:

> **পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ফাস্টবোলার এখানে শান্তিতে শায়িত।**
>
> **মৃত্যু-বোলারের দ্বারা আউট হইবার সময়ে তাঁহার স্কোর ৯৮।**
>
> **ইংলণ্ডজাত এই খেলোয়াড় জীবনের শেষ ৪৬ বৎসরে অস্ট্রেলিয়াকে স্বদেশরূপে বরণ করিয়াছিলেন।**
>
> **অস্ট্রেলিয়াবাসী অনুরাগীবৃন্দের দ্বারা এই স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মিত হইল।**

হয়তো আমার কল্পনা। কী জানি!

পরিশিষ্ট

❋ ❋ ❋ বীভৎস কথাটি ❋ ❋ ❋

[রে রবিনসনের *Between Wickets* গ্রন্থের *'That Horrid Word* অধ্যায়ের অনুবাদ। এর মধ্যে বডিলাইন নামকরণের ইতিহাস লিখিত।]

ব-ডি-লা-ই-ন! কথাটি ১৯৩৩ সালে ইংরাজদের কর্ণপটহে ঢক্কানিনাদ করেছিল, অথচ এটি ইংলণ্ডে ও ডোমিনিয়ন-সমূহে অবস্থিত ব্রিটিশজাতির স্বভাবসংগত আপসরফার নিদর্শন ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আপসরফা যেমন আমাদের জাতির অগ্রগতিকে বহুক্ষেত্রেই ব্যাহত করেছে—এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই আপসের মূল উদ্দেশ্যই রক্ষিত হয়নি। আলোচ্য ঘটনার এগারো বছর পরে ব্রিটেনে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ান বৈমানিকরা বলেছে, লারউডের বাড়ির শহরে কিছু মারামারি ইচ্ছে করলে আর কিছু করতে হবে না, বললেই চলবে—লারউড বডিলাইন বোলার! .

গণ্ডগোল-হট্টগোলের পরে জার্ডিন লিখেছিলেন, 'বডিলাইন' কথাটা তাঁর কাছে অর্থহীন, যেহেতু পরাজয় ঢাকতে বা পরাজয়ের হেতু ব্যাখ্যা করতে ওটি সংগ্রহ করেছিল উত্তেজনালোভী (অস্ট্রেলিয়ান) সংবাদপত্র। লারউড বলেছেন, ও-টি একটি লাগসই নোংরা কথা—এক চতুর ফন্দীবাজ অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক বিদ্বেষবশে জোগাড় করেছিলেন—আসল ব্যাপার গুলিয়ে দেবার জন্য। এ'দের কথা থেকে বোঝা যায়, এ'রা কেউই জানেন না কথাটির উৎপত্তি ঠিক কিভাবে এবং কোন্ বদ মতলবে কথাটা তৈরি করা হয়, ও কথাটির দ্বারা কী অর্থ বোঝায়—দুজনেই সে বিষয়ে লাফ দিয়ে সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছেন।

জার্ডিন যে-ধরনের আক্রমণ প্রবর্তন করেছিলেন, তার সম্পূর্ণ চরিত্র যথাযথভাবে প্রকাশ করবার নৈতিক দায়িত্ব বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ক্রিকেট-সাংবাদিকেরা অনুভব করেছিলেন, একথা সত্য। কিন্তু সফল হননি কেউই। সমস্যার কারণ, এই আক্রমণ-রীতি ত্রি-মাত্রা—এক, বলের ধরন (দ্রুত; অধিকাংশক্ষেত্রে এমনভাবে ধাপানো যাতে যথেষ্ট উঁচু হয়ে ওঠে); দুই, বলের লক্ষ্য (প্রায়শঃ ব্যাটম্যানের শরীর বা মাথার দিকে); তিন, ফিল্ডিং-সন্নিবেশ (সাধারণতঃ লেগের দিকে সাতজন, তার মধ্যে পাঁচ-জন থাকে ব্যাটসম্যানের পায়ের কাছে—নিতান্ত ফাইনলেগ থেকে ব্যাটের প্রায় মুখের শর্ট মিডঅন অবধি গোল হয়ে ঘিরে)। এই তিন সামগ্রীকে একত্র সিদ্ধ করে একটি সহজ অথচ সার্থক শব্দে পরিণত করতে কেউই পারেননি।

অস্ট্রেলিয়ান লেখকদের মধ্যে আর্থার মেইলী-ই ব্যাপারটিকে প্রথম বোঝাতে চান একটি প্রয়োগ—*"Shock attack"* (বাংলায় অনেকটা দাঁড়ায় 'মার ধাক্কা')। কিন্তু এর দ্বারা, পূর্বে ইংরাজ ও অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা (আটটি টেস্টে লারউডসুদ্ধ) যে-জাতীয় বাম্পার-সহ জোর বল দিতেন, তার সঙ্গে লারউড-ভোস্-বাওয়েস কোম্পানীর এই ধরনের আক্রমণের নিতান্ত পার্থক্য সূচিত হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা বলত—*'Sconers'* (মুণ্ডুভাঙা)। কিন্তু সেকথা তো খুলি-লোভী যে-কোনো বাম্পার সম্বন্ধেই বলা হয়ে থাকে—এটা নতুন কোনো কথা নয়। এবং এর মধ্যে 'সহায়ক' ফিল্ডারদের বিষয়ে কোনোই ইঙ্গিত নেই—যে সাতটি মহাবামন (আহা-রে! জার্ডিন সে ভূমিকার পক্ষে আকারে অনুপযোগী!) সেই ব্যাটসম্যানকে পাকড়াতে তৈরি যে-হতভাগ্য ব্যাটের দ্বারা বলটিকে শরীর থেকে সরাতে ব্যস্ত।

"Leg-stump attack" (লেগ-স্টাম্পে আক্রমণ) প্রয়োগটি বল কোথায় ঠোকা হয়েছে, সে-বিষয়ে মোটামুটি একটা আভাস দেয় মাত্র, কিন্তু বোলাররা যদি বিশ্বাস

করেন (!) যে, তাঁরা লেগ-স্টাম্পে আক্রমণ চালাচ্ছেন, তাহলে তাঁরা লেগ-স্টাম্পটি বায়ুলোকে ভাসমান, এমন মায়াস্বপ্নে রয়েছেন। রিচার্ডসনের সাক্ষ্য: তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে তিনি প্রথমে লেগ-স্টাম্পের উপর ব্যাট করতে চেষ্টা করেন, তারপরে লেগের দিকে স্টাম্প ছেড়ে আরও ৬ ইঞ্চি সরে যান, তারও পরে এক ফুট সরেন, কিন্তু যেখানেই তিনি দাঁড়ান না কেন, বল ঠিক তাঁর শরীরের উপর ছুটে এসেছে।

"Leg-theory" (লেগ-থিযোরী) নামটির পক্ষে এইটুকু বলা যায়, লেগের দিকে ফিল্ডিং সাজানো হয়েছে, সে ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে, কিন্তু একেবারে বহিরঙ্গভাবে কথাটি সত্য, যেমন সত্য—পল রবসন (নিগ্রো গায়ক) এবং জাপানের সম্রাট উভয়েই 'কালার্ড' মানুষ।* আমি মনে করি, এই বিতর্কের সময়ে যে-সব কথা ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে অসাধু কথা ঐ 'লেগ-থিয়োরী', কারণ ক্রিকেট-খেলোয়াড় ও অনুরাগীরা ঐ কথাটি শুনে দীর্ঘদিনের পরিচিত বোলিং-পদ্ধতির ছবিই মনে এঁকেছেন। যাঁরা খেলাগুলি দেখেননি, তাঁদের মনে সর্বাধিক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে, এই কথাটিই। জার্ডিনের রীতির সঙ্গে আর্মস্ট্রং-এ লেগ-থিয়োরী (যা খেলার সময় ও আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু হননে সমর্থ নয়), বা ফ্রেড রুট বা এফ আর ফস্টারের লেগ-থিয়োরীর পার্থক্য—বজ্র-বিদ্যুতের ঝলসানির সঙ্গে ট্রাম-তারের বৈদ্যুতিক ঝিলিকের পার্থক্য। লারউডের নিজের প্রয়োগ *"Fast leg-theory"*-র (ফাস্ট লেগ-থিয়োবী) বক্তব্য: ওটা লেগ-থিযোরীই তবে দ্রুততর গতিতে। কিন্তু তাব দ্বাবা ওটা যে 'চমকপ্রদভাবে পৃথক' তা একেবারেই বোঝানো হল না। যৌগিক পদার্থের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রসায়নশাস্ত্র যেমন বলে, উক্ত যৌগিক পদার্থের প্রকৃতি পূর্ববর্তী মৌল উপাদানসমূহের প্রকৃতি থেকে পৃথক—এখানেও তাই। প্রায় দশ বছর পরে স্যার পেলহ্যাম ওয়ার্নার তাঁর *Cricket Between Two Wars* নামক বইয়ে লেখেন—'বডিলাইন লেগ-থিয়োরী থেকে সর্বাত্মকভাবে পৃথক। এই ব্যাপারটি প্রথমদিকে ইংলণ্ডে সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়নি, এখনো কোনো-কোনো মহলে স্বীকৃত নয়।'

টেস্টম্যাচগুলি আরম্ভের আগে ঐ ধরনের বলের বিষয়ে উপযুক্ত শব্দসন্ধান যখন করছি, তখন বাইশ টেস্টে ইংলণ্ডের অধিনায়ক এ সি ম্যাকলারেনের "বডি-বোলিং" (*"body bowling"*) কথাটি আমার স্মরণে ছিল। খেলোয়াড়ের দিকে চালানো বোলিং সম্বন্ধে একবার তিনি ঐ কথা বলেছিলেন। "বডি-বোলিং" কথাটি ব্যবহাব করতে আমার ঘৃণাবোধ হয়েছিল, কেননা তার দ্বাবা যদি বোঝাত যে, ব্যাটসম্যানকে মারবার জন্য ঐ বল দেওয়া হচ্ছে, তাহলে সেটা আগুনে ইন্ধনের কাজ করত এবং গোটা ব্যাপারটির নিরাসক্ত বিচার ব্যাহত হত। এর অল্পদিনের মধ্যেই মেলবোর্নের 'অস্ট্রেলিয়ান পোস্ট' কাগজে জ্যাক ওর্যালের একটি রচনা পড়ি। এঁকে সমকালের অস্ট্রেলিয়ায় বিজ্ঞতম ক্রীড়া-সমালোচক মনে করি। ১৮৮৫-৯৯ যুগের টেস্ট-ক্রিকেটার ইনি, তাহলেও অতীতের স্মৃতির ছায়ায বর্তমানকে আচ্ছন্ন কবেন না কখনো। তাঁব ঐ লেখার মধ্যে থেকে গিয়েছিল একটি বাক্যাংশ: "half pitched slingers on the body line" (মাঝ-মাঠে ধাপানো, শরীররেখায় যেন ফিঙ্গা-যোগে নিক্ষিপ্ত বল)।

এইখানেই আমার সন্ধানের শেষ। বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত 'বডিলাইন' কথাটিকে শুধু বিশেষণ করে নিলাম—যেটা পরে নিজেই বিশেষ্য হয়ে দাঁড়াল। এক সর্বজ্ঞ বার্তা-

---

* Coloured কথাটির অনুবাদ করা সম্ভব নয়। মোটামুটি কৃষ্ণকায়দের 'কালার্ড' বলা হলেও অশ্বেতকায় সকলকেই ঐ শব্দের আওতায় ফেলা হয়—পীত জাতি সুদ্ধ। কিন্তু 'অশ্বেতকায়'ও কালার্ডের ঠিক অনুবাদ নয়, কারণ শব্দটি নেতিবাচক, অপরপক্ষে কালার্ড ইতিবোধক শব্দ।

সম্পাদক এই নতুন কথাটির মধ্যে কোনই সংবাদ-মূল্য দেখেননি। যখন অস্ট্রেলিয়ার প্রধান সান্ধ্যদৈনিক 'মেলবোর্ন হেরাল্ড'-এর জন্য প্রথম কথাটি লিখেছিলাম, বার্তা-সম্পাদক মহাশয় শিরোনামা থেকে কথাটিকে খারিজ করে দেন, অবশ্য নীচে ক্ষুদ্রতর অক্ষরে মুদ্রণের অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁর নীতি, ১/৬ ইঞ্চি আকারে মুদ্রণযোগ্য কোনো শব্দ তিনগুণ বড়ো আকারে মুদ্রিত হলে অবাঞ্ছিত চরিত্র ধারণ করে!!

নতুন বোলিং-কৌশলের প্রকৃতি বোঝাতে লেখকেরা যে নাম চাইছিলেন, এই প্রয়োগটি তা পূরণে সমর্থ হয়নি। ব্যাটসম্যানের দিকে বল ধাপিয়ে ছোঁড়া হয়েছে, এর দ্বারা তা বোঝা গেলেও, একটি মূল ব্যাপারকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়নি কথাটি—লেগের দিকে সেপাই-সমাবেশের ইঙ্গিত এর মধ্যে ছিল না।—টেস্টম্যাচের গোটা ইতিহাসে উড়ন্ত ভয়ঙ্করগুলির হাত থেকে পরিত্রাণের যে-ফাঁক ব্যাটসম্যানেরা এতাবৎ পেয়ে এসেছেন, সেই 'ফাঁক' পূরণের কাজেই উক্ত সেপাই-সম্প্রদায়কে লাগানো হয়েছিল। এই ত্রুটি সত্ত্বেও 'বডিলাইন' শব্দ একটি মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিল—ক্রিকেট-রসিকগণ জানতে পেরেছিলেন যে, বাম্‌পার-কুলে এক নতুন বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম, 'বডিলাইন'-এর মধ্যে 'বডি-বোলিং' নামের উস্কানি ও কলঙ্ক-ছাপ নেই, অথচ তা নতুন কৌশলকে চিহ্নিত করতে পেরেছে।

বিশ্বাস করি, লারউড, ভোস ও বাওয়েস ব্যাটসম্যানদের আঘাত করতে চাননি। তাঁরা অপরপক্ষে, ব্যাটসম্যানের দিকে লাফানো বল নাগাড়ে ছুঁড়ে গেছেন—গায়ে লাগল কি না-লাগল সে বিষয়ে কেয়ার না করেই—যে-পর্যন্ত না ব্যাটসম্যান আতঙ্কে মনস্থির করার অনুপযোগী অবস্থায় পৌঁছেছেন। প্রেসবক্সের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে আমার ঐ ধারণা। গোলাবর্ষণের মুখে দাঁড়ালে হয়ত আমার মনোভাব কম সুমহৎ হত, যেমন হয়েছিল কয়েকজন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়ের, এবং ওয়ারউইকশায়ারের ভাইস ক্যাপ্টেন রেভারেন্ড জে এইচ পারসনের, যিনি বলেছিলেন: 'বাওয়েস বাম্‌পার দেন উইকেট নিতে নয়, খেলোয়াড়কে আঘাত করতে। জঘন্য কাণ্ড! সে কথা তাঁকে বলেছি।' বডিলাইন-টেস্টম্যাচে শর্ট-লেগে দাঁড়ানো ফিল্ডসম্যানদের সাক্ষ্য: যে-সব বল ব্যাটসম্যানদের আঘাত করত সেগুলিই সর্বাধিকভাবে তাঁদের মন ভেঙে দিত না —যেগুলি থেকে এক চুলের জন্য বেঁচে যেতেন—সেগুলিই!

সে যাই হোক, 'বডিলাইন' কথাটি নিশ্চয় "খুনী" ("Killer") কথার চেয়ে অনেক কম আপত্তিকর। ১৯৩৩ সালে বাওয়েস যখন ওল্ড ট্রাফোর্ডে ফ্রাঙ্ক ওয়াটসনকে মুখে আঘাত করেন, তখন ল্যাঙ্কাশায়ারের দর্শক চেঁচিয়েছিল "খুনী" বলে। 'বডিলাইন' শব্দের প্রয়োগ-ব্যর্থতার মূল কারণ আর কিছু নয়—শব্দটির বিরুদ্ধে বডিলাইনের উদ্ভাবক ও মারাত্মক প্রযোজকদের আক্রোশ—যাঁরা শব্দটির লাঞ্ছনা করে নিজ দেশ-বাসীর কাছে নিজেদের মান রাখতে চেয়েছেন। বডিলাইনের মতোই কিংবা অধিকতর নিন্দাত্মক শব্দ ইংলণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছে: এম-সি-সি এবং উইসডেন-গৃহীত "*direct attack*" (প্রত্যক্ষ আক্রমণ); রণজিৎ সিংজীর "*meretricious bashing attack*" (কামনির্লজ্জ জঘন্য আক্রমণ); "*queue of leg-side sharks*" (লেগের দিকে হাঙরশ্রেণী); এবং নটিংহ্যাম-অধিনায়ক এ ডবলিউ কার-এর সংশোধনী অনুতাপ-উক্তি—কেউ-না-কেউ মরবে যদি-না 'মাথা-উঁচু' বোলিং এবং 'ধাপানো বোমানিক্ষেপ' বন্ধ করা হয়। এই কার-ই সফরের আগে লণ্ডনের এক হোটেলে জার্ডিন, লারউড ও ভোসের সঙ্গে নৈশভোজে একত্র হয়েছিলেন এবং বডিলাইন-কৌশলের বিকাশে সাহায্য করেছিলেন। স্কোরার ডবলিউ এইচ ফার্গুসন বলেছেন, বডিলাইন কার্যতঃ "মনুষ্য-নির্মিত দৈত্য—জার্ডিনের জগন্নাথ—হয়ে দাঁড়িয়েছিল...খেলা বা আনন্দের সঙ্গে যার

[illegible]

কোনো সম্পর্ক থাকাই সম্ভব নয়।" ওয়াল্টার হ্যামণ্ডের বিশ্বাস, নেহাত বরাত ভালো তাই বডিলাইনের ধাক্কায় কেউ অক্কা পায়নি। ব্যাপারটা চললে তিনি খেলা ছেড়েই দিতেন।

এখন জার্ডিনের মত : পরাজয় চাপা দেওয়া বা ব্যাখ্যা করার জন্য বডিলাইন শব্দের চয়ন। এ-বিষয়ে খাঁটি তথ্য হল : অস্ট্রেলিয়া কোনো ম্যাচ হারবার আগেই উপযুক্ত শব্দসন্ধান আরম্ভ হয়; প্রথম টেস্টখেলা ও তাতে পরাজয়ের পরেই শব্দটি মুদ্রিত হয় —তা হয় ১৩ থেকে ১৯শে জানুয়ারির এডিলেড-লড়াইয়ের (যখন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কণ্ট্রোল-বোর্ড ঐ কথাটি এম-সি-সি-র কাছে প্রতিবাদের তারবার্তায় ব্যবহার করে) পাঁচ সপ্তাহ আগে। যদি জার্ডিনের কথা সত্য হয়, † তাহলে অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকেরা, চার বছর আগে (যখন অস্ট্রেলিয়া ৪-১ হেরেছিল) চোখ এড়িয়ে-যাওয়া বস্তুর সংশোধন করেছিলেন অতি মন্থর গতিতে! যাই হোক, আমাব ধারণা উভয় দেশেরই সংবাদপত্রের প্রচলিত আচরণ—হারবার পরে নিজেদের গাল চাপড়ানো, নির্বাচকদের মূর্খামি, খেলোয়াড়দের অযোগ্যতা, নির্বুদ্ধিতা, এমন কি ইচ্ছাকৃত শৈথিল্যকে গাল দেওয়া। এই রীতি এতই পুরনো যে পঁচিশ বছর আগে লণ্ডনের মর্নিং পোস্ট-এ 'Giglamps'-লিখিত এই লাইনগুলি আবির্ভূত হয়েছিল :

> ইংলণ্ডের পক্ষে যে সব লোক খেলে
> ভুল তারা করে, করবেই নির্ঘাত
> ওরিলী ও ম্যাককেবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে,
> কিংবা গ্রিমেটের গোপন বাঁকের সামনে।
> তারপরে—ব্যাটিং-ইনিংস শেষ হলে—
> খেলাটিকে হেলায় নষ্ট করতে বসে,
> বল দেয় নিতান্ত শর্টপিচ, কিংবা ততোধিক ওয়াইড,
> এবং—যদি আকাশে ওঠে বল—ক্যাচ?
> না—ক্যাচ তারা ধরতেই জানে না।
> ইংলণ্ডের নির্বাচক যে-সব ব্যক্তি
> তারা হয় নির্বোধ, নয় মাথা-খারাপ,
> তারা মিডলসেক্সের যদুকে জায়গা দিল
> ল্যাঙ্কাশায়ারের বদুকে বাদ দিয়ে—
> অহো আশ্চর্য! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!!
> ওদিকে ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন—আরে রাম!
> ঘিলু নামক পদার্থ একেবারে নেই,
> বোলিংয়ের ব্যাপারে সারাক্ষণ গণ্ডগোল,
> স্লিপে একগাদা লোক, কম করা চলত,

দানবের নাম জগন্নাথ!! ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা জানেন, জগন্নাথের রথ সম্বন্ধে মিশনারী কুৎসা থেকে শব্দটি ইংরেজি অভিধানে ঢুকেছে। অন্যের দেবতা সম্বন্ধে এ-রকম নিরেট, নিশ্চিন্ত বদ-বুদ্ধি না থাকলে অন্যকে নির্বিচারে মারা যায় না—ইউরোপের মধ্যযুগোত্তর ইতিহাস তার প্রমাণ।

† জার্ডিন বলেছিলেন, বডিলাইন নামে অভিহিত ১৯৩২-৩৩-এর বোলিং-পদ্ধতি লেগথিয়োরি ছাড়া কিছু নয়, যা চার বছর আগে ১৯২৮-২৯ সালে অস্ট্রেলিয়ায় একই লারউড ব্যবহার করেছিলেন।

সামনে মাঠের ধারে অতগুলো লোক ঠেলল—
পাশে মাঠের ধারে অতগুলো লোক না ঠেলে !!

তবে—ইংলণ্ডের পক্ষে কলম ধরেছেন যাঁরা—
হাঁ, তাঁরা অবিশ্যি ভালো ছাঁচের ভাস্কর্য,
তাঁরা লেখেন (আহা কী স্টাইল ! চূড়ান্ত !)
প্রতিটি বলের কুলজি-কথা—প্র-তি-টি বলের !
পনস্‌ফোর্ডের প্লান্স আটকাতে লোক চাই ?
তৎক্ষণাৎ সাপ্লাই দেন এ'রা—এবং—
দলটি যদিও ক্যাচ'ধরায় দুর্বল
—"আমি তো আগেই সেকথা বলেছিলাম"—
তবু সুযোগ এ'রা নষ্ট করেন না—কদাপিও।

যে-সব লোক ইংলণ্ডের পক্ষে বল দেয়,
তারা ক্লান্ত হয় কখনো-কখনো—একথা জানা,
এবং আন্ডার-পিচ্‌, ওভার-টস্‌—এসব দোষও আছে,
আর—সূচনার আগুনে উদ্দীপনা ? কিচ্ছুটি নেই—নেই-ই-ই—
কিন্তু যাঁরা ইংলণ্ডের পক্ষে লিখে চলেছেন
তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি—ক্রমে—ক্রমাগত—আরো—
প্রতিদিন খেলান্তে তাঁরা লিখে পাঠান,
প্রতিটি শুভ দিনের অন্তে তাঁরা লিখে পাঠান,
দশ দ-শ-টি হা-জা-র শব্দ !!
না—তাঁরা কখনই লেংথ হারান না নিজেদের।

ক্রমে একথা স্বীকৃত হয়েছে, চোখ-রাঙানো বোলিংয়ের গণ্ডগোলের মূলে রয়েছে ব্যাটসম্যান বনাম বোলারের লড়াই, যা দেশসীমায় আবদ্ধ নয়। সে জিনিসটি কিছু সময়ের জন্য চাপা ছিল, কারণ এই রীতি ভয়ঙ্করতম আকার নিয়েছিল ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার খেলায়, যখন চতুর কৌশলে জার্ডিন ঐ মৌল সংঘাতকে নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পেরেছিলেন।

কিন্তু প্রথম যে-ব্যাটসম্যান ক্রমান্বয় বাম্‌পারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন তিনি জাতিতে ইংরাজ—হবস্‌। ১৯৩২ সালের অগস্ট মাসের ঘটনা। হবস্‌ পিচের ধার দিয়ে বোলারের দিকে হে'টে গিয়ে একটি জায়গা ঠুকে নিজের আপত্তি দেখালেন। নীরব কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ আচরণ। পরদিন যখন শুনলেন, বাওয়েস বলেছেন, বোলারকে বল করতে মাথা ব্যবহার করতে হয়, হবস্‌ শান্তভাবে মন্তব্য করেছিলেন, 'ঠিক, তবে উনি আমার মাথা ব্যবহার করতে চাইছিলেন।' এর একমাসের মধ্যে ক্রিকেটবল-নির্মাতা এ জি টমসন প্রভৃতি যে-সব ব্যবসায়ীরা অর্নটস্‌ জাহাজে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরছিলেন, তাঁরা দেখেন, জার্ডিন জাহাজের স্পোর্টস-ডেকের নেটে তাঁর নতুন রীতির পরীক্ষা চালাচ্ছেন একটি স্টাম্প খাড়া করে।

অস্ট্রেলিয়ার সব দর্শকই কিন্তু বডিলাইনের নিন্দা করেনি—কিপ্যাক্সের বিরুদ্ধে লেগের দিকে আটজন লোক দাঁড় করিয়ে লারউড যখন বাম্‌পার ছাড়ছিলেন—তখনো নয়। বোলারের মনোভাবের পক্ষ নিয়ে মেইলী (অস্ট্রেলিয়ান বোলার) তাঁর লেখায় এই পদ্ধতির নিন্দা করেননি, বরং তা অবলম্বন না করার জন্য অস্ট্রেলিয়ানদের কল্পনাহীন বলে তিরস্কার করেছিলেন। মেলবোর্ন ও সিডনির নাক-উঁচু ক্লাবগুলির সদস্যরা

'বোলারের দৃষ্টিভঙ্গির' অধিকারী একথা কেউ বলবে না, কিন্তু তাঁদের অনেকেই ছোটলোকদের চেঁচামেচিতে কষ্ট পেয়েছিলেন এবং আরামকেদারায় সমাসীন অবস্থায় ঘোষণা করেছিলেন—তর্কাতর্কির কোনো কারণই ঘটত না ঐ হতচ্ছাড়া কাগজগুলো না থাকলে (যাদের দুটির সম্পাদক অন্ততঃ ইংরাজ)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরে বডিলাইন সামরিক পরিভাষায় পরিণত হয়েছিল—বৃটিশ গুপ্তচর-বিভাগ পশ্চিম সীমান্তে জার্মানীর দূর পাল্লার রকেট-বোমার ব্যবহার-সম্ভাবনা জানাতে গিয়ে কথাটি ব্যবহার করেছিল। খুব কম আমেরিকানই কথাটি জানত। তাই লেখক র‍্যালফ্ ইঙ্গারসোল পাঠকদের খাঁটি অর্থটি বুঝিয়েছিলেন: "ক্রিকেট-অভিজ্ঞদের কাছে এই শব্দ মাত্রাহীন আন্তর্জাতিক অন্যায়ের দ্যোতক। বডি-লাইন বোলিং ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়, অস্ট্রেলিয়ান ওস্তাদেরা যখন আন্তর্জাতিক খেলায় ইংরেজ-ব্যাটারদের আতঙ্কিত করতে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে।"*

বডিলাইনের চেয়ে যথাযোগ্য শব্দ ক্রিকেটে পাওয়া যায়নি, যদিও অনেক ব্যাপক লক্ষণযুক্ত একটি নাম সহজেই পাওয়া যেত যদি নাৎসী সেনাবাহিনী ইউরোপে তাদের আক্রমণ ১২ বছর আগে আরম্ভ করত। তখন বলা চলত—ক্রিকেটের ব্লিৎসক্রীগ আক্রমণ—যাতে বেষ্টন করা হয় ঝটিকাবেগে এবং সম্পূর্ণ উৎসাদন করা হয় সেই গতিতেই।

* আমেরিকান ইঙ্গারসোল অজান্তে মনোরম রসিকতা করেছেন। আমেরিকান হিসাবে বেসবল খেলার 'ব্যাটার' শব্দ সহজেই তাঁর কলমের ডগায় এসে গেছে, এবং আমেরিকানরূপে ক্রিকেট-ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর মজাদার অজ্ঞতা বীরদর্পে প্রকাশিত হয়েছে, যখন সবজান্তাভাবে তিনি লিখতে পেরেছেন—বডিলাইন চালিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ানরা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে।